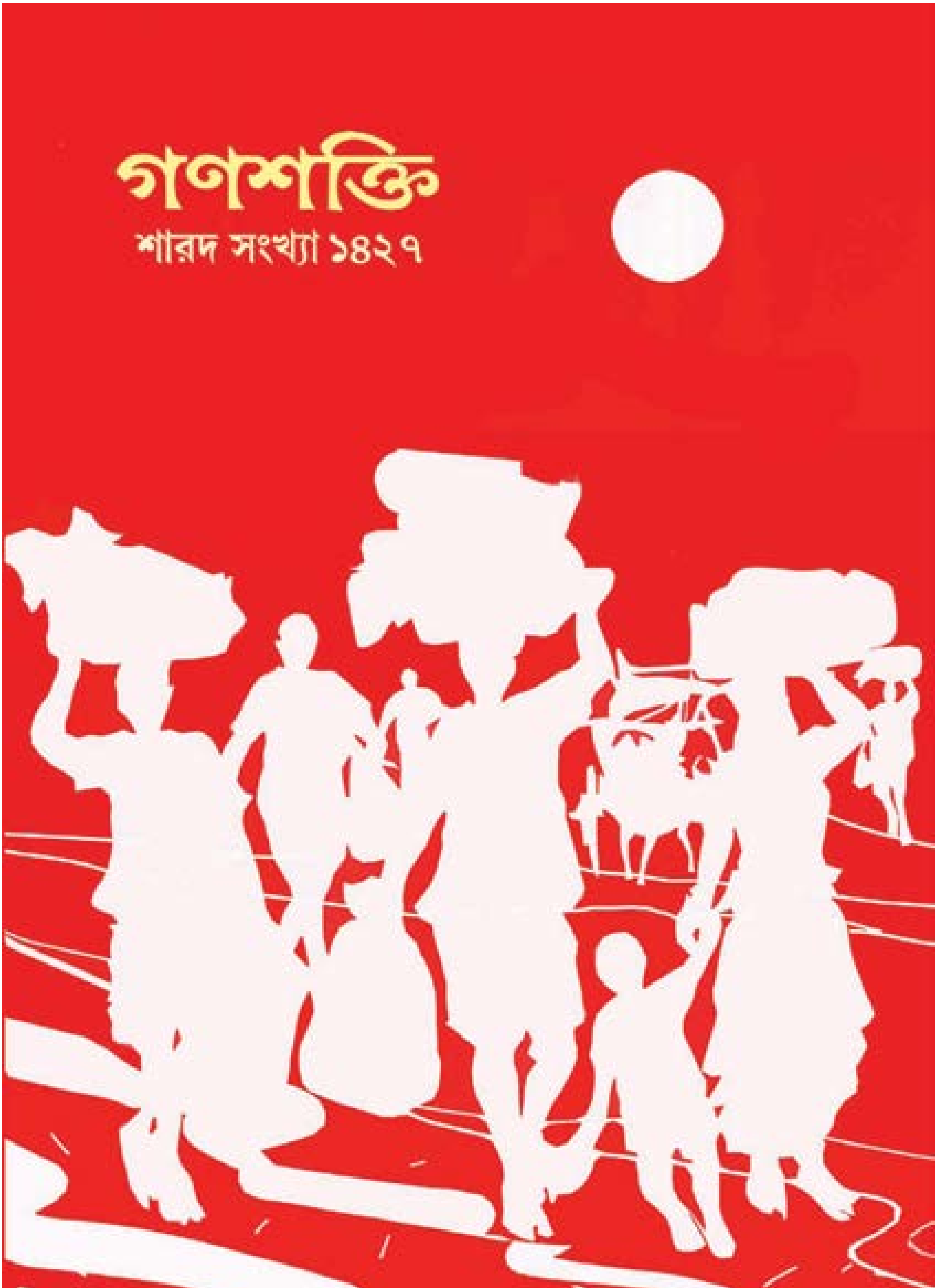
গণশক্তি
শারদ সংখ্যা ১৪২৭

Now you can sanitise your feet, like your hands. Prevent Corona!

COIRCRAFT

For dealership / distributorship enquiries, Contact:

Kerala State Coir Corporation Ltd.,
P.B.No.191, Vazhicherry Ward, Alappuzha-688001, Kerala, India.
Ph: 0477-2245044, 2240111, Mob: 9048058012, 9383433605
Email: bm@coircraft.com, coircorporation@coircraft.com | www.coircraft.com

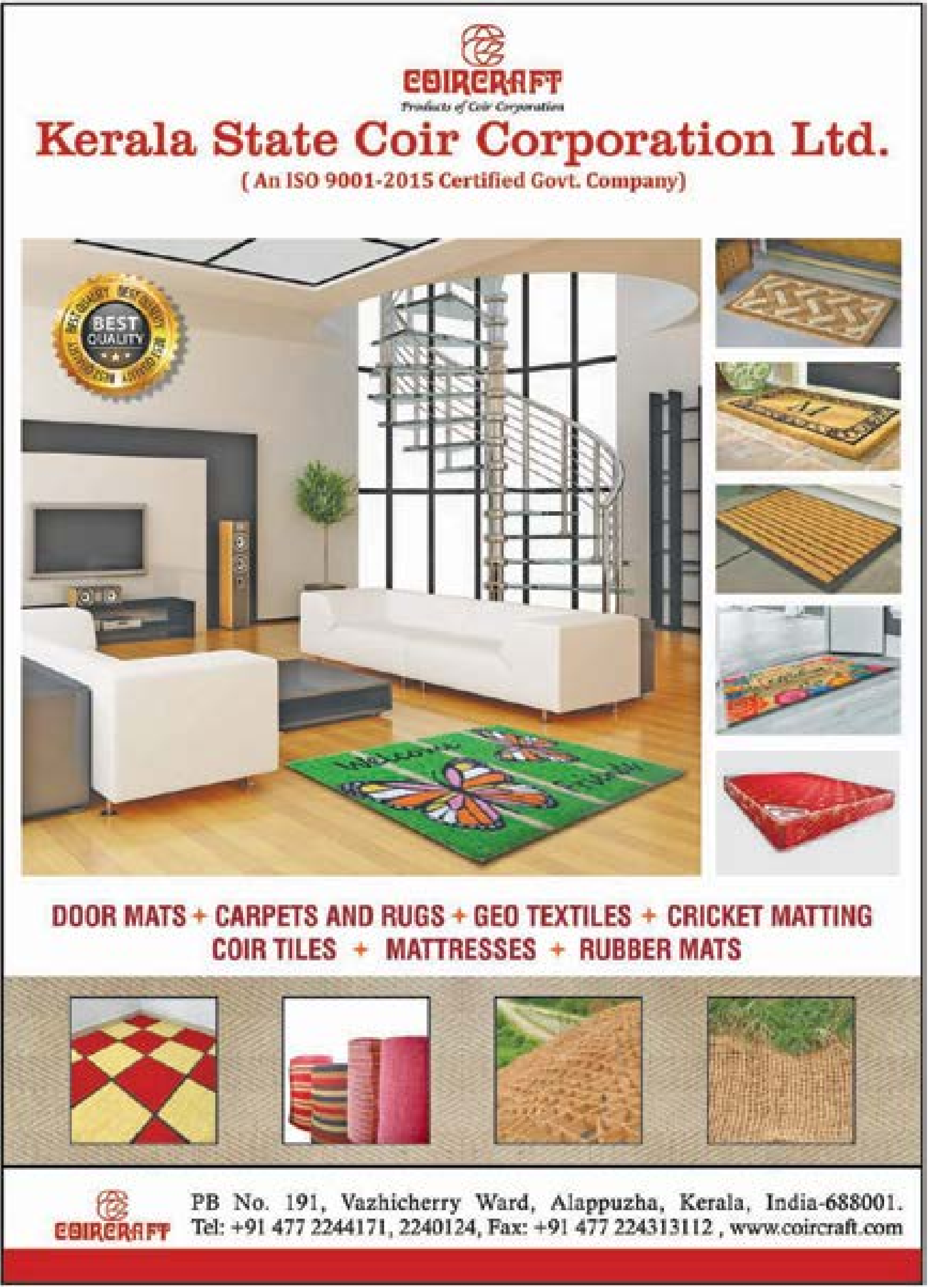
COIRCRAFT
Products of Coir Corporation
Kerala State Coir Corporation Ltd.
(An ISO 9001-2015 Certified Govt. Company)
BEST QUALITY
DOOR MATS + CARPETS AND RUGS + GEO TEXTILES + CRICKET MATTING
COIR TILES + MATTRESSES + RUBBER MATS
COIRCRAFT
PB No. 191, Vazhicherry Ward, Alappuzha, Kerala, India-688001.
Tel: +91 477 2244171, 2240124, Fax: +91 477 224313112 , www.coircraft.com

From zero to vroom,
in a jiffy
Presenting pnb Car Loan
हमारे ग्राहक...हमेशा आगे।
pnb Car Loan
Low interest rates
Reduced service charges for Women and Government Employees
pnb
Oriental
United
Together for the better
Circle office, Kolkata(East)
1-800-180-2222 or
1-800-103-2222 Toll Free
www.pnbindia.in

KACCHI GHANI
Mustard Oil
Regular consumption helps to
prevent colon tumor
reduces heart disease
reduce bad cholestrol
Helicon
Queen's CHOICE
MUSTARD OIL
NO CHOLESTEROL
Helicon
ZERO Cholesterol

FINEST QUALITY OF
CTC TEA
FROM ASSAM
CTC TEA
Our Contact
ACHERON
12, GOVT PLACE, NEAR RAJ BAHWAN
Kolkata - 700069
Phone : (033) 46032025
Helicon
PREMIUM C.T.C TEA
Helicon
PREMIUM C.T.C TEA

NATURE CURES
OBESITY NATURALLY
HEALTH AND FITNESS WITHOUT SIDE-EFFECTS. FINALLY.
Obesity
• 41 millions Indian population suffering from this dreaded ailment
• Obesity is a result of energy imbalance
• Modern eating habits
• Hormonal imbalance
Treatment
• Colon hydrotherapy
• Electro physiotherapy
• Heliotherapy
• Hydrotherapy
• Magneto therapy
• Massage therapy
• Physiotherapy
Facilities
• Exclusive diet centre
• Nine acre property
• Furnished rooms
• Peaceful meditation and yoga centre
• Facilities for outdoor and indoor games
• Gymnasium and spa
NATURE CURE & YOGA CENTRE
NATURE CURE AND YOGA CENTRE, Diamond Harbour Road, Konchowki, P.O. Bishnupur 743 503, 24 Parganas (S), West Bengal For reservations: Ph. 033 24533880/81, (M) 9674343400, Email: kon@naturekon.in
Web: www.naturecure.in www.facebook.com/NatureCure.in
This page is sponsored by IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

ANDHRA BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD

(REGD NO 3/CAL OF 1991 DATED 22.01.1991)
C/O UNION BANK OF INDIA (E_ANDHRA)
58, CHOWRINGHEE ROAD,
KOLKATA- 700 071

www.sanjibanhospital.org

করোনা হারছে, মানুষ জিতছে!

বিশ্ব করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ।

২৪ ঘণ্টাই যুদ্ধ, ২৪ ঘণ্টাই পরিষেবা। আন্তর্জাতিক মানের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, দায়বদ্ধ চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসাকর্মী নিয়ে, জীবনের লড়াইয়ে সঞ্জীবন মানুষের সাথে, মানুষের পাশে।

সঞ্জীবন

SANJIBAN

CLASS 1 SUPER SPECIALITY HOSPITAL

FULESWAR, HOWRAH

Sanjiban Hospital | Fuleswar | Howrah 711316 | Tel. 8420028468

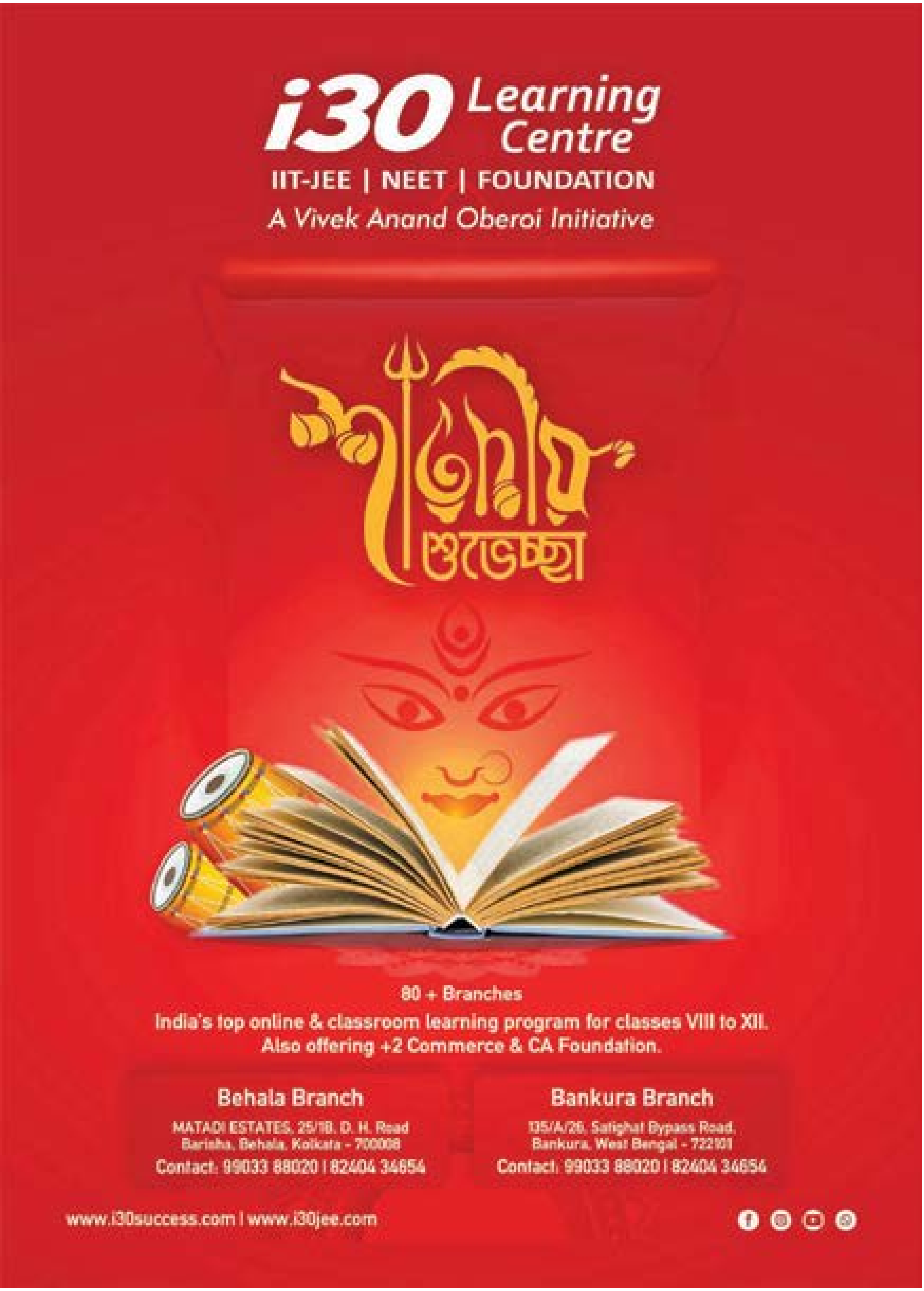
i30 Learning Centre
IIT-JEE | NEET | FOUNDATION
A Vivek Anand Oberoi Initiative
শারদীয় শুভেচ্ছা
80 + Branches
India's top online & classroom learning program for classes VIII to XII.
Also offering +2 Commerce & CA Foundation.
Behala Branch
MATADI ESTATES, 25/1B, D. H. Road
Barisha, Behala, Kolkata - 700008
Contact: 99033 88020 | 82404 34654
Bankura Branch
135/A/26, Satighat Bypass Road,
Bankura, West Bengal - 722101
Contact: 99033 88020 | 82404 34654
www.i30success.com | www.i30jee.com

THE EASTERN RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LIMITED

10, STRAND ROAD • KOLKATA - 700 001

www.erecb.com

BRANCHES

Fairlie Place • Howrah
Liluah • Asansol
Dhanbad • Danapur
Mughalsarai • Jamalpur

"A Bank of The RAILWAYMEN run by the RAILWAYMEN for the Welfare of the RAILWAYMEN"

"All our branches are now CBS Enabled With CTS Clearing facility For both South & North Grid"

FACILITIES FOR MEMBERS

➢ Loan upto Rs. 4 (Four) Lac

HOLIDAY HOMES at Subsidized rates

BENGALURU ▪ CHENNAI ▪ VELLORE ▪ NEW DELHI (A.C. & NON-AC.) ▪ HARDWAR ▪ PELLING ▪ GANGTOK ▪ DARJEELING ▪ DIGHA ▪ PURI

• Exgratia @ Rs. 5000/- to nearest kin of members in case of pre-mature death.

• Various assistance during tenure of membership:-

a) Spectacle Assistence	@ Rs. 1000/- on four occasion during service life
b) Denture Assistence	@ Rs 3,000/- on one occasion or @ Rs 1000/- for three occasions for single denture extraction during service life.
c) Educational Assistence for Passing: i) Matriculation Examination.	@ Rs. 700/- on one occasion during service life.
ii) Higher Secondary Examination.	@ Rs. 1000/- on one occasion during service life.
iii) Graduation Level.	@ Rs. 1200/- on one occasion during service life.
iv) Post Graduation Level	@ Rs. 1800/- on one occasion during service life.
d) For studying Professional Degree Level	@ Rs. 4000/- on one occasion during service life.
e) For studying Professional Diploma Level	@ Rs. 2500/- on one occasion during service life.
f) Cancer Assistance	@ Rs. 15000/- on two occasions during service life.
g) Hearing Aid	@ Rs. 3000/- on one occasion during service life.

"BE A MEMBER & DEPOSIT IN OUR BRANCHES AND BE A PARTNER OF ACHIEVEMENTS & WELFARE OF RAILWAYMEN"

Dream High With BUIE

Study **Innovation** **Placement**

BANKURA 722146

Courses Available

B. Tech

- Computer Science & Engineering
- Mechanical Engineering
- Electrical Engineering
- Civil Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Information Technology
- Electronics & Instrumentation Engineering

M.Tech

- CSE (Computer Science & Engineering)
- ECE (VLSI & Microelectronics)

BCA, BBA, B.Sc

MAKAUT-BANKURA Campus BUIE

- B.Sc. - Medical Laboratory Technology
- B.Sc (IT) – Artificial Inteligence
- B.Sc. (IT) – Data Science

Course fee same as MAKAUT main campus.

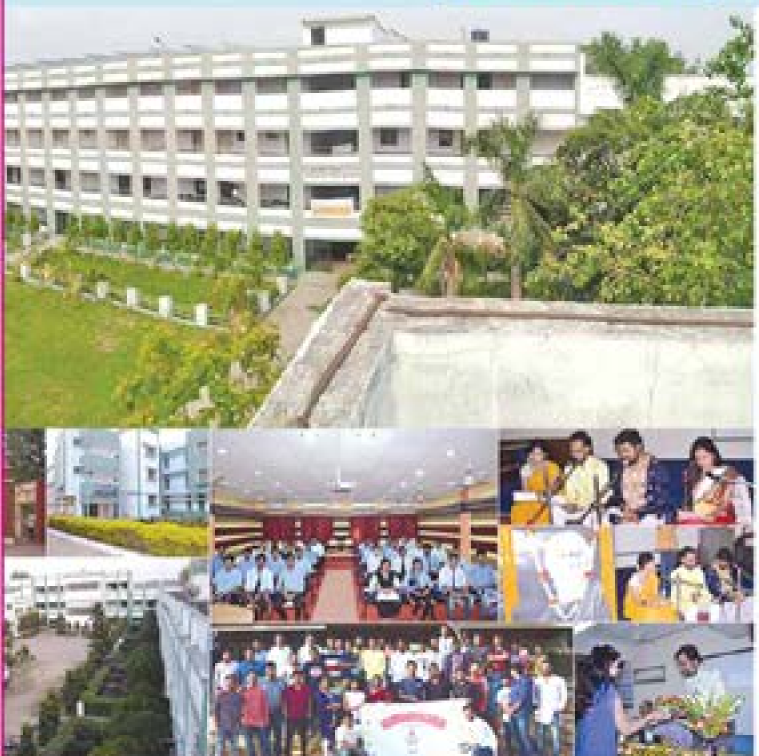

Bankura Unnayani Institute of Engineering

Estd. 1998

(Govt. Supported Engineering Institute)

A Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP), Phase II, World Bank assisted, Ministry of Human Resource Development (MHRD) sponsored Institute

Approved by AICTE & Affiliated to Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, (Formerly WBUT)WB

CAMPUS :
Bankura Unnayani Institute of Engineering
Subhankar Nagar, Pohabagan
Bankura 722146, West Bengal
Mobile : 9153056388 / 9434653299/
9434202406 / 8250141717 / 9474458652

CITY OFFICE :
Pubali (1st floor) 149 Canal Street,
Kolkata 48
Bus Stop - Sree Bhumi
Mobile : 9474642082
Toll Free No. : 1800313000222

Website : www.buie.ac.in
e-mail:buie.bankura@gmail.com / info@buie.ac.in

সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ধ্বংস
করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত
ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পাশে দাঁড়ান

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন
পশ্চিমবঙ্গ

JIS UNIVERSITY

দশভূজার আশীর্বাদে আসুক
জ্ঞানের আলো

81, Nilgunj Road, Agarpara, Kolkata - 700 109 www.jisuniversity.ac.in

শারদীয়া প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশুকল্যাণ সংস্থা

পঙ্কজ আচার্য্য স্মৃতি নিকেতন
মহিলা আবাসন

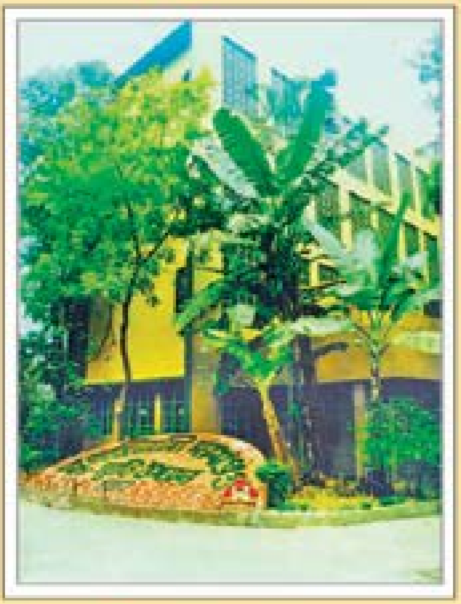

* কর্মরতা মহিলা ও ছাত্রীদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশে সুলভে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

এছাড়াও রয়েছে

* **'কলরব'** পথ শিশুদের বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়
* **'প্রণতি-শিশু-শ্রমিক বিদ্যালয়'**– কসবা শিল্পতালুক, ফেজ-৩
* হস্তশিল্প সমবায়
* কাঁকুরগাছি মহিলা টেলারিং ও সূচীশিল্প সমিতি
* পঙ্কজ শিল্পায়ন
* আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প বারাসত ২ নং ব্লক

নারী ও শিশুকল্যাণ সংস্থার সদস্য হোন এবং আর্থিক অনুদানের সাহায্যে সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মহিলা এবং শিশুদের উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিন।

Paschim Banga Nari O Sishu Kalyan Sanstha

Regd. No. - S/24229 of 1978-79

P-230/1. C.I.T. SCHEME VII M, MANIKTOLA, KOLKATA - 700 054

Email : nariosishukalyansanstha@gmail.com

দূরভাষ : ২৩৫৫-৮৯২৮

গণতন্ত্রে নতুন প্রতিবাদী জোয়ার
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
অনাদি জাদুকর দেশীয় ঐতিহ্য
পবিত্র সরকার ৬৫
মহামারীর কালবেলা : চার অ্যাকেডেমি
চন্দন সেন ৭৮
সিআইএ'র এক অন্তর্ঘাতের আত্মকথন
দেবেশ দাস ১০৩
কেন প্রেম আসে
ড. সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮
অতিমারী যুগের টুকরো কথা
ড. অমল কুমার ১১৫
করোনা মোকাবিলায় দায় নেই সরকারের
ড. কুণাল ১১৯
প্রাণের লোককথা
কুমার রাণা ১৩১
মহামারী, লকডাউন ও জামাদের মৃত্যু
জাহ্নবী সেন ১৩৪
সোশ্যাল মিডিয়া, মতাদর্শ ও অর্থনীতি : কোভিড ১৯'র শিক্ষা
প্রসূন ভট্টাচার্য ১৩৮
শুধু কি 'ভগবানের হাত'?
সাত্যকি রায় ১৪৩
কাশ্মীরে মিডিয়াকে আক্রমণ হিসেব করেই
অনুরাধা ভাসিন জামওয়াল ১৪৬
চেনা অচেনার পথে পথে
একরাম আজমল হক ১৪৯
নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ আসলে কী
সুরজিৎ মজুমদার ১৫২
মহামারী কাহন
সুপর্ণা সেন ১৫৫
অতিমারী ও অপবিজ্ঞান
অরুণাভ মিশ্র ১৫৭
উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় লোক-সংস্কৃতি
মাহবুব উল আলম ১৬০
করোনার বিনরুদ্ধিতে বাংলা সাহিত্য
অরুণ মুখোপাধ্যায় ১৬৪
কলকাতার প্রাণ 'অন্নদার' এক অজানা ইতিহাসের সন্ধানে
সৌমিত্র মজুমদার ১৬৮
অনাহারের মৃত্যু উদযাপন
কাজেম সরকার ১৭১
ওয়েব চ্যানেলের আপন ভুবন
শান্তনু চক্রবর্তী ১৭৩
ইনকিলাবের কবি
সঙ্গীতা সেন ১৭৮
সোনার হাতে সোনার কাঁকন: লিরিকেই গান, গানেরই লিরিক
সুদীপ্ত রায় ১৮১
শারদার্ঘ্য গল্প
জাদুলির আলপনাজ
শ্যামলাল ভট্টাচার্য ৬৯
প্রসঙ্গ : সত্যের পাঁচালি
পার্থ রায় ৭৩
কমেডি একেবারেন অভিনয়
নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায় ৮১
স্বরলিপি লেখা হবে চিরদিন
কার্তিক মুখোপাধ্যায় ৯১
প্রেম, কাদের বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপ মুখোপাধ্যায় ৯৪
সাক্ষাৎকার
গাড়িতে যেই জায়গাতেই আমি অভিনেতা হলো...
অনীক চট্টোপাধ্যায় ৮৪
সেই সাবিত্রী আজও আছি
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ৮৭
জন্মশতবর্ষে স্মরণ
বিজ্ঞান সংস্কৃতির অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত
শ্যামল চক্রবর্তী ১২১
এক আধুনিক মানুষ
অরুণকুমার ১২৬
লেনিন ১৫০
লেনিন মানবতার পক্ষে
জয়ন্ত ১৮

শারদ শুভেচ্ছা

নতুন প্রজন্মের সেরা জাদুকর

ইন্দ্রকল্প-র ইন্দ্রজাল

ম্যাজিক্ শো

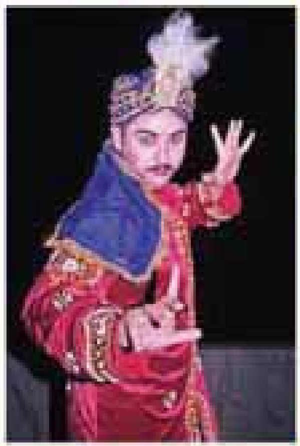

ম্যাজিক্ শো

২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের প্রদর্শনী

যোগাযোগ : 9038135347

ওয়েব : www.magicianindra.co.in

ঘনশ্যাম চৌধুরীর লেখা

দেজ পাবলিশিং-এর ত্রয়ী ধ্রুপদী উপস্থাপনা

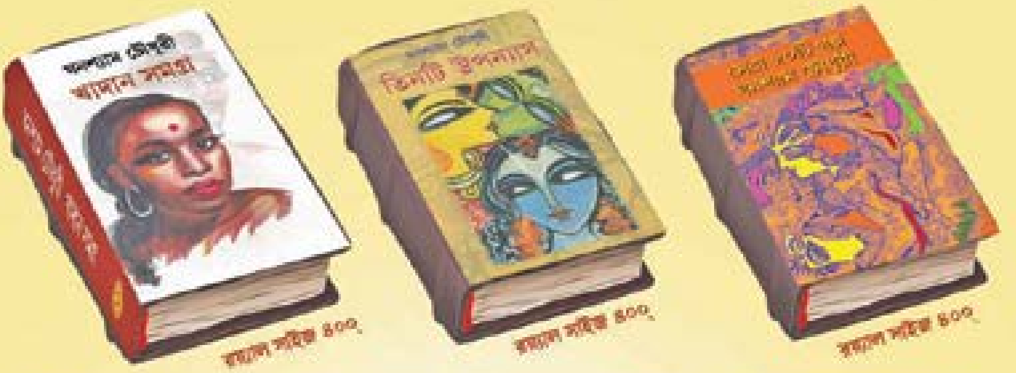

জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সরলরৈখিকও নয়। আছে বহু বাঁক ও মোড়। আছে বাধা। এই সব পেরিয়ে যে প্রণয়গাথার বুনন হয়, তাকেই নিপুণ অক্ষরমালায় সৃজন করেছেন লেখক। অসামান্য তিনটি ধ্রুপদী উপন্যাস। 'অবগাহন', বাঁশের বাঁশি' ও 'পদাবলী কথা'। ম্যাজিক রিয়ালিজমের সূক্ষ্মতর ভাষাবিন্যাসে 'পদাবলী কথা' গনগনে আগুন। কাব্যময় প্রেম, রাজনীতি ও সমাজ ভাবনার সঙ্গে জীবনের অন্তর্লীন বোধের যোগসূত্র নিবিড়তর হয়েছে অবগাহন ও বাঁশের বাঁশিতে। 'ঘনশ্যাম চৌধুরীর ৫০টি গল্পে' ব্রাত্যজীবনের নরনারীর জীবন, প্রণয়, লড়াই, জয়-পরাজয় হাসিকান্নার প্রাণবন্ত চালচিত্র। 'খাদান সমগ্র' এক অমোঘ ধ্রুপদী কথামালা। মালভূমি অঞ্চলের কয়লাখনি জীবনের রূঢ়সত্য গবেষণাধর্মী কাহিনির দুরন্ত তুফান। সাঁওতাল-আদিবাসী-উপজাতি-বাগদি বাউড়ি-ডোম-চাঁড়াল-ঘাটোয়াল নরনারী, শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘনশ্যাম চৌধুরীর দুঃসাহসী উপস্থাপনা।

ছোটদের স্বপ্নের ভুবনেও ঘনশ্যাম চৌধুরীর অবাধ বিচরণ। তাঁর **'রূপকথার ঝাঁপি'**, **'আনন্দ রূপকথা'**, **'রূপকথার সাতরঙ'** ও **'সোনারঙের দিন'** ছোটদের আলাপ করিয়ে দেয় এক ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে। যাঁর যাদু বাঁশির সুরে ছোটরা শক্তিমান হয়ে ওঠে।

ঘনশ্যাম চৌধুরীর

গোয়েন্দা কেদার-বদ্রী রহস্য সমগ্র

চারটি খণ্ড একত্রে সেট ১২০০ টাকা

আগাপাশতলা বাঙালি, ঘরোয়া জীবনযাপনে অভ্যস্ত গোয়েন্দা কেদার মজুমদার এবং তাঁর সহকারী বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি সাঙ্ঘাতিক খুনী-অপরাধীদের কাছে ভয়ানক আতঙ্ক হয়ে ওঠেন।

কমিক্স মেট্রো

গোয়েন্দা জুটি কেদার-বদ্রীকে নিয়ে কমিক কাহিনি তৈরি করছেন কমিক্স-অ্যানিমেশন শিল্পী কৌস্তভ চৌধুরী। নতুন আঙ্গিক, ভিন্নতর চিন্তার দুরন্ত গতি মাতিয়ে দেবে কমিকস পাঠকদের।

WHATSAPP : 6290212465 E-MAIL : comicsmetro@gmail.com

আসছে ! কমিক্স মেট্রোর প্রস্তুতিতে ঘনশ্যাম চৌধুরী, কৌস্তুভ চৌধুরীর
2-PART LIMITED COMICS SERIES
কেদার বদ্রী
গোয়েন্দা জুটির
অ্যাকশন থ্রিলার
কমিক্স
কমিক্স মেট্রো
ফেসবুকে কমিক্স মেট্রোর সাথে জুড়তে এই QR CODE SCAN করুন
MOBILE : 6290212465
WHATSAPP : 6290212465
E-MAIL : comicsmetro@gmail.com
ComicsMetro

NATURE CURES
OBESITY NATURALLY
HEALTH AND FITNESS WITHOUT SIDE-EFFECTS. FINALLY.
Obesity
• 41 millions Indian population suffering from this dreaded ailment
• Obesity is a result of energy imbalance
• Modern eating habits
• Hormonal imbalance
Treatment
• Colon hydrotherapy
• Electro physiotherapy
• Heliotherapy
• Hydrotherapy
• Magneto therapy
• Massage therapy
• Physiotherapy
Facilities
• Exclusive diet centre
• Nine acre property
• Furnished rooms
• Peaceful meditation and yoga centre
• Facilities for outdoor and indoor games
• Gymnasium and spa
NATURE CURE & YOGA CENTRE
NATURE CURE AND YOGA CENTRE, Diamond Harbour Road, Konchowki, P.O. Bishnupur 743 503, 24 Parganas (S), West Bengal For reservations: Ph. 033 24533880/81, (M) 9674343400, Email: kon@naturekon.in
Web: www.naturecure.in www.facebook.com/NatureCure.in
This page is sponsored by IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

ভ্রমণের পাতা
গদ্য গল্প
ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে
প্রণতী চট্টোপাধ্যায় ১৮৫
অদৃষ্টের আকাশ
শতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০৪
গল্প
ফুলগাওয়ার পুজো
মুকুলেশ গুহ ১৯৪
সর্বাণিতায়
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮
করোনার পরাজয়
অনন্যা দাশ ২০১
নদী ফণী ও পঞ্চায়েত
অমর মিত্র ২১৬
পড়ার
আশিস সান্যাল ২১৯
দুঃসময়ের ডায়েরি
তরুণ মজুমদার ২২২
অন্যরকম জন্মদিন
সার্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫
মণিরামপুর হাই স্কুল ও নীহার
রাখালদাস পাণ্ডী ২৩৫
শচীশের গল্পে
বকুল চট্টোপাধ্যায় ২৩৮
এক যে ছিল মন্দির
বিজয় দাস ২৪৩
যাদের কোভিড পজিটিভ
মদন চট্টোপাধ্যায় ২৪৩
আপজুন
মন্দাক্রান্তা সেন ২৫৪
কাবুল বিশ্বনাথ
সৌরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬২
জেলেপাড়ার গন্ধ
অমল চট্টোপাধ্যায় ২৬৪
লকডাউনে বন্দি জীবন
শাহী বিশ্বজিৎ ইসলাম ২৬৭
মা
অন্নপূর্ণা বিশ্বাস ২৭০
করোনা আক্রান্ত পরিবারী
কিংবা শচী মিত্র
সজল বসু ২৭৭
হারাবো
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮০
এখন সময় যেমন
অমল দত্ত ২৮৩
গোয়া ওভেশন রহস্য
মনোজিৎ পাঠক ২৮৭
যেমন যেন ফিরছেন
মানস সরকার ২৯৮
টেকো
শম্পী দাশগুপ্ত ৩০০
বিশেষ রচনা
আন্দোলন ও প্রবাসী চিঠি
জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় ২১১
মহামারী ও উৎসবগুলি
সৌম্যকান্তি দত্ত ২২৯
মধু গুপ্ত
সমরেন্দ্র চক্রবর্তী ২৪৮
শতবর্ষে সত্যজিৎ
ফুলতে পারি না সিনেমাকে
অশোক ঘোষ ২৪৭
নাটক
শত্রু
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ২৪০
অনুবাদ গল্প
এক হাজার বছর পরে
সুশিলা চক্রবর্তী ২৩২
ছড়া ও কবিতা
সে এক মজার দিন
কল্প দাস ১৯৪
খুশি
গৌতম হাজরা ১৯৪
খুশিতে আছে মা
শামল সেন ১৯৪
কলসে হবে, ঘরে আছে!
অমিতাভ মজুমদার ২০৪
নিরুদ্দেশ
উদয়ন ভট্টাচার্য ২০৪
সেকেন্ডারি
জয়ন্ত আচার্য ২১৫
লকডাউন
শ্যামলকান্তি দাশগুপ্ত ২১৫
অনেক-সে দূরে রাস্তাটি আমার
রাকেশ মুখোপাধ্যায় ২১৫
লকডাউনের গল্প
অপূর্বকুমার বসু ২২১
ভালোবাসা ও দুটি পাখি
চিত্রা লাহিড়ী ২২১
লকডাউনের সিংহাসন
অমিত বসু ২২১
করোনার অবসর
কৃষ্ণ দত্ত ২৩১
ইচ্ছা করে
দিব্যেন্দু আলী ২৩১
জানালা জলতলপুর
অমিতাভ গুহ ২৩১
থামার দিকে
ফুলঝরি দত্ত ২৫৭
সোনার হাতি
লক্ষ্মী দত্ত ২৫৭
সাদাকালো
অবন্তিকা হাজরা ২৫৭
প্রেসিডেন্সি ক্রিকেট মাঠে আমি
মধুসূদন মিত্র ২৭৪
এবার দেখি
সুনন্দন আহমেদ ২৭৪
আমার দুটিতে
কাজী মুর্শিদুল আরেফিন ২৮৬
ভালোবাসা
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় ২৮৬
শার্দুলরাজ
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৬
নতুনের আশা
রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৭
করোনা
মা ও ছেলের কথা
জয়শ্রী মণ্ডল ২৯৭
এই পৃথিবীর মানুষের জীবন
শিবাশিস হালদার ৩০৩
ছবির দেশের গল্প
হাসি সরকার ৩০৩
ওদের কথা
দেবাশিস বসু ৩০৫
খেলা
করোনা আতঙ্কে ক্রীড়াজগৎ
চিরঞ্জীব ৩০৪
দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি
এটাই বড় কথা
সাক্ষাৎকারে রাজা চৌধুরী ৩১৬

আপনাদের চিরপরিচিত,
দীর্ঘ ৫০ বৎসর ধরে আপনাদের
সেবায় এখন নবরূপে,
নতুন সাজে সুসজ্জিত।

পাল কোম্পানী

পিতল, স্টেনলেস স্টিলের কব্জা, ছিটকানি, পর্দার ফিটিংস থেকে শুরু করে আলমারি, খাটের লেটেস্ট ফিটিংস, হ্যান্ডেল সব, তালাচাবি, রান্নাঘরের মডিউলার কিচেনের বাস্কেট ও লেটেস্ট ডিজাইনের ঘর সাজানোর সামগ্রী সব পাওয়া যায়।

24 Hrs Lock
Opening Service

KEY DUPLICATING
IN 1 MINUTE

First Time in Behala
Duplicate Ultra Key

Locking Solution
and System

AUTHORISED
PREMIUM OUTLET &
SERVICE CENTRE

Installation and lock
Repairing also done here

PAUL COMPANY

Krishnendu Paul (Bitu)
548, D.H. Road, Behala
Manton, Kolkata – 34
Mob. : 98300 20143
paulcompany100@gmail.com

addicted to

life

ജീവിതമാണ് ലഹരി

Say No to Drinks
Say No to Drugs

Join hands with Government of Kerala and Excise Department to spread awareness of the harmful effects of Liquor and Drug consumption

Issued in Public Interest by
KERALA STATE BEVERAGES (M&M) CORPORATION LIMITED

বুকিং ৯০ দিন পূর্বে করিতে পারিবেন

হলিডে হোম

পুরীর প্রাণকেন্দ্র স্বর্গদ্বারের নিকট

পদ্মভবন (মা ভবনের বিপরীতে) ত্রিতল বাড়ি, ১৪টি ৪ শয্যা বিশিষ্ট ঘর, সংলগ্ন বারান্দা সহ প্রতিটি কক্ষেই গ্যাসসহ সুসজ্জিত রান্নাঘর ও শৌচালয় এবং জেনারেটারের ব্যবস্থা আছে। 'কৃষ্ণানন্দধাম' (অক্ষয় ধামের বিপরীতে) স্বর্গদ্বার বাজারের নিকট ১২ টি ৪ শয্যাবিশিষ্ট ঘর। (ত্রিতলে অবস্থিত) প্রতিটি ঘরে কেবল লাইনসহ রঙিন টিভি এবং গ্যাসসহ সুসজ্জিত রান্নাঘর, সংলগ্ন শৌচালয়, পরিস্রুত পানীয় জল ও জেনারেটারের ব্যবস্থা আছে।

নিউ দীঘায় ছুটির আনন্দ উপভোগ করুন

নিউ দীঘায় রেল স্টেশন থেকে হাঁটা পথে সমুদ্র সৈকতের কাছে অত্যাধুনিক ৮টি ৪ শয্যাবিশিষ্ট ঘর। প্রতিটি ঘরে কেবল লাইনসহ টিভি, সংলগ্ন শৌচালয়, পরিস্রুত পানীয় জল ও জেনারেটারের ব্যবস্থা আছে। দুটি ঘরের ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

ট্রাম কোম্পানির সদর দপ্তর (দ্বিতল)

দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

১২ নং আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

দূরভাষ : ৮৬৯৭৭৩৩৩১৭ • ৯৩৩৯২৭৯৬৯৫ (মোবাইল)

বুকিং-এর সময় সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (সোমবার থেকে শুক্রবার)

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি পরিচালিত

নিউ দীঘাতে মনোরম পরিবেশে হলিডে হোম

রথীন্দ্রকৃষ্ণ বিরাম নিলয়

Type	No.	Bed Nos.	Member	Caution Money	Non-Member	Caution Money
Cottage (Ac.)	1/A	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	1/B	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	2/A	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	2/B	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	3/A	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	3/B	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	4/A	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Cottage (Ac.)	4/B	3 Beded	Rs. 700/-	Rs. 700/-	Rs. 900/-	Rs. 900/-
Dormitory	1	4 Beded	Rs. 300/-	Rs. 300/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-
Dormitory	2	2 Beded	Rs. 300/-	Rs. 300/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-
Dormitory	3	6 Beded	Rs. 400/-	Rs. 400/-	Rs. 500/-	Rs. 500/-
Dormitory	4	6 Beded	Rs. 400/-	Rs. 400/-	Rs. 500/-	Rs. 500/-
Dormitory	5	3 Beded	Rs. 300/-	Rs. 300/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-
Dormitory	6	4 Beded	Rs. 300/-	Rs. 300/-	Rs. 400/-	Rs. 400/-
Hall	1	28 Beded	Rs.2240/-	Rs.2240/-	Rs.2240/-	Rs.2240/-
Hall	2	20 Beded	Rs. 1600/-	Rs. 1600/-	Rs. 1600/-	Rs. 1600/-
Kitchen	No. 1		Rs. 300/-	Rs. 300/-		
Kitchen	No. 2		Rs. 300/-	Rs. 300/-		

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ ঃ সত্যপ্রিয় ভবন

পি ১৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০১৩ • ফোন ঃ (০৩৩) ২২১৫-৮৮৫৬

(সোমবার দুপুর ৩টা - সন্ধ্যা ৬টা এবং অন্যান্য কাজের দিন বেলা ১২টা - সন্ধ্যা ৬টা)

SCIENTIFIC CLINICAL LABORATORY PVT. LTD.

SCL

ISO : 15189/NABL ACCREDITED LABORATORY

WHERE QUALITY MEETS COST EFFECTIVENESS

Serving the people for over 60 years under the leadership of renowned pathologist

Prof. (Dr.) Subir Kumar Dutta

ALL PATHOLOGICAL SERVICES AVAILABLE

MOLECULAR DIAGNOSTICS DIVISION STARTED [PCR]

HOME COLLECTION FACILITY AVAILABLE

SCINTIFIC CLINICAL LABORATORY PVT. LTD.

(DR. SUBIR KUMAR DUTTA)

2, RAM CHANDRA DAS ROW, KOLKATA-700013

✆ 033 22651098, 033 22658309, 7605803833

email: scientificlab86@gmail.com

website : www.scrl.org.in

শারদ শুভেচ্ছা
বৃদ্ধাশ্রম দুর্গাপুর
STAR CATEGORY
অত্যাধুনিক ও বিশেষ সুবিধা:
• সবুজের পাশে ১২০ কাঠা জমি যার ৯০% খোলামেলা পরিবেশ।
• সুসজ্জিত ৩৫০ থেকে ৪৫০ বর্গফুট এর এসি সহ দ্বিশয্যা বিশিষ্ট ঘর সঙ্গে বড় বারান্দা।
• আধুনিক অ্যাটাচড বাথরুম যেখানে গরম জল সরবরাহের সুবিধা।
• প্রত্যেক রুমে ফ্রিজ, রুম হিটার, এলইডি টেলিভিশন এবং ইন্টারকম এর সুবিধা।
• নির্মল সবুজ পরিবেশ বেষ্টিত সুষম গুনমান সহ খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর থাকার ব্যবস্থা।
• ধ্যান-যোগ, ক্লাবহাউস, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগারের সুবিধাযুক্ত।
• অত্যাধুনিক কিচেন, ডাইনিং হল, বুফে পরিষেবা ও হাউস কিপিং পরিষেবা।
• ফিজিওথেরাপি ও চক্ষু পরীক্ষা পরিষেবা।
• মন্দির এবং প্রার্থনার জায়গা সঙ্গে সংযুক্ত।
• ২৪/৭ জরুরী স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মেডিক্যাল অফিসারের পরিদর্শন।
• প্রয়োজনে অ্যাম্বুলেন্স এবং নার্সিং কেয়ার।
• ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি গার্ড ও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় নজরদারি।
• ২৪ ঘন্টার পাওয়ার ব্যাক আপ, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও স্বয়ং সক্রিয় লিফট পরিষেবা।
নিবন্ধন ফী মাথাপিছু ২০,০০০ টাকা (ফেরৎযোগ্য নয়)
আহারাদি সহ স্বল্প সময়ের জন্য : মাথাপিছু প্রত্যহ ২,৫০০ টাকা
এক শয্যা বিশিষ্ট ঘর- মাসিক খরচ- ২০,০০০ টাকা- এককালীন জমা নাই • বৈদ্যুতিক খরচ আলাদা (সাব মিটার অনুযায়ী)
দুই শয্যা বিশিষ্ট ঘর- মাসিক খরচ- ৩৫,০০০ টাকা (দুইজনের জন্য)- এককালীন জমা নাই
• বৈদ্যুতিক খরচ আলাদা (সাব মিটার অনুযায়ী)
শ্রীকৃষ্ণ সেবাশ্রম
KRISHNA SEVASHRAM
A Secured Destination for Elderly People
G+6 Floor Super Speciality Old Age Home
Contact : 9333709950 / 9475300405
Site Address : Rupganj, Muchipara, Durgapur - 713212
Office Address : C-113, Ullaskar Dutta Sarani, Sector 2A,
Bidhan Nagar, Durgapur - 713212, W.B.
E-mail : info@shreekrishnasevashram.org | Website : www.shreekrishnasevashram.org

প্রচ্ছদ
Naughty Boy কৃতি
সুদীপ্ত মণ্ডল ২৯৩
রবি-শশীর হেডলাইন
সৌরভ মুখোপাধ্যায় ৩১৫
অলঙ্করণ
সুদীপ্ত মণ্ডল
দেবব্রত নন্দী
শুভনীল ঘোষ
প্রদীপ গোস্বামী
কৌশিক ঘোষ
সঞ্জয় বাড়িলা
অমল চট্টোপাধ্যায়
মনীষ দেব
প্রচ্ছদ
শুভনীল ঘোষ
হোটেলের খাবার প্রচ্ছদে
সৌরভ মুখোপাধ্যায়
পৃষ্ঠাসজ্জা
তমাল ব্যানার্জি
রবীন দাস
দুর্গারাম মণ্ডল
প্রদীপ কর্মকার
সহযোগিতায়
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট
লিমিটেড-র কর্মীবৃন্দ
পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
পার্থ রাহা
অরূপ দাস
মনীষ দেব
সমন্বয়ে
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
সঙ্কর্ষণ চট্টোপাধ্যায়
সুরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক

দেবাশিস চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক

অতনু সাহা

দাম ১২০ টাকা

গণশক্তি ট্রাস্টের পক্ষে দেবাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক
৭৪এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৬
থেকে প্রকাশিত এবং
গণশক্তি প্রিন্টার্স লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদনা, রিপোর্টিং, সার্কুলেশন, ব্যবস্থাপনা ও
বিজ্ঞাপন বিভাগের
ফোন : ২২২৭-৮৯৪৬/৪৭/৪৮/৪৯/৫০
ফ্যাক্স : ২২২৭-৮০৯০ এবং ২২২৭-৪২৬৩
গণশক্তি ইন্টারনেট :
www.ganashakti.com ই-মেল : mail@ganashakti.co.in
বিজ্ঞাপন বিভাগের ফ্যাক্স : ২২১৭-৭০৮২
ই-মেল : advtganashakti@gmail.com

P C CHANDA
&
COMPANY PVT LTD

KOLKATA

SHYAM STEEL
SHYAM TMT REBAR
WHEN TOUGH IS FLEXIBLE
The perfect combination of strength and flexibility.
Virat Kohli

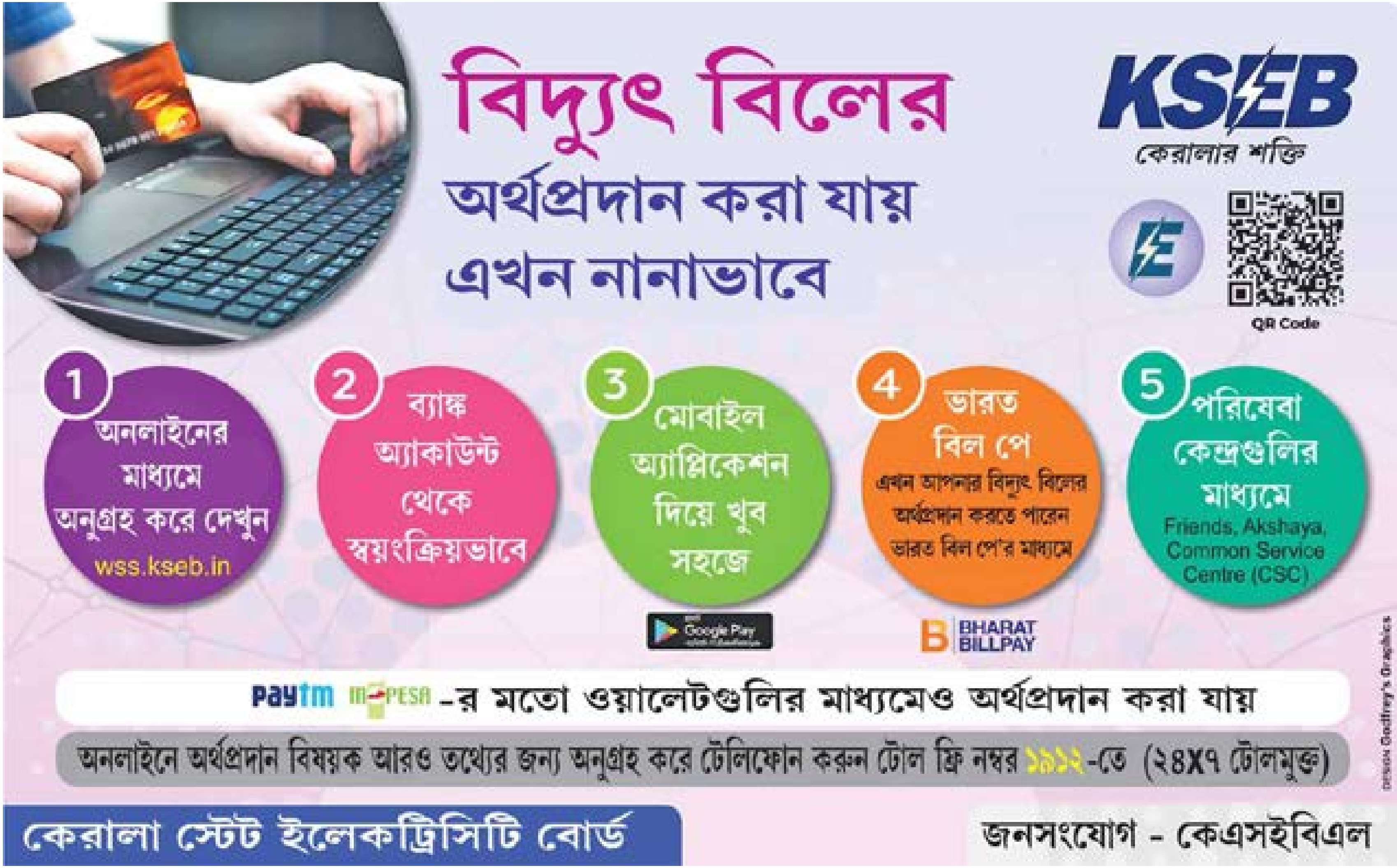
বিদ্যুৎ বিলের
অর্থপ্রদান করা যায়
এখন নানাভাবে
KSEB
কেরালার শক্তি
QR Code
1
অনলাইনের মাধ্যমে
অনুগ্রহ করে দেখুন
wss.kseb.in
2
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে
3
মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে খুব সহজে
Google Play
4
ভারত বিল পে
এখন আপনার বিদ্যুৎ বিলের অর্থপ্রদান করতে পারেন ভারত বিল পে'র মাধ্যমে
BHARAT BILLPAY
5
পরিষেবা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে
Friends, Akshaya, Common Service Centre (CSC)
Paytm M-PESA -র মতো ওয়ালেটগুলির মাধ্যমেও অর্থপ্রদান করা যায়
অনলাইনে অর্থপ্রদান বিষয়ক আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে টেলিফোন করুন টোল ফ্রি নম্বর ১৯১২-তে (২৪X৭ টোলমুক্ত)
কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড
জনসংযোগ - কেএসইবিএল
DESIGN Godfrey's Graphics

সমবায়ী
অভিবাদন সহ

দি হুগলী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ

রায় বাহাদুর এস. সি. মুখার্জি রোড ■ চকবাজার ■ হুগলী

গৌরবময়

১০০ বছর

তাহেরপুর প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

তাহেরপুর, নদীয়া

শারদ শুভেচ্ছা

মানব সমাজের সৃষ্টি থেকে যেমন মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হয়েছে তেমনই যখন সে নিজের পায়ের নিচের মাটিটুকু আর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য রুটিটুকু ব্যবস্থা করতে পেরেছে তখনই নিজের পরিশ্রমে গড়া বাড়িতে সে পরিবার পরিজন নিয়ে অবসর বিনোদনের জন্য কোনও না কোনও অজুহাতে মিলন উৎসবের সূচনা করেছে। সেই শুরু, অনুষ্ঠানের সংখ্যা পরিধি ব্যাপকতা সব বৃদ্ধি পেয়ে ঘরের দাওয়া-বাড়ির উঠোন থেকে আজ রাস্তা, মাঠ-ঘাট, মন্দির-মসজিদ আর গুরুদ্বোয়ারা, গীর্জায় পাকা আস্তানা করে নিয়েছে। কিন্তু গঠিত মানব সমাজের শাসন ব্যবস্থা প্রণীত হবার পর পুঁজিপতি বুর্জোয়া ব্যবস্থায় অর্থ পিপাসু ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক দলের নীতিহীন নেতৃত্বরা তাকে ব্যবসায়ে পর্যবসিত করে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে কু-সংস্কার আচ্ছন্ন করে সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসের বিষ ছড়িয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশের মসনদে থাকা ব্যবস্থাকে পাকা ইমারতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই আগ্রাসনের ফলে শুধু যে ঐতিহাসিক শিল্পকলা, সৌধ ধ্বংস হচ্ছে তাই নয়, মানব সভ্যতা ও মানবতার প্রধান ভিত্তি মূল্যবোধও ধ্বংসে হতে বসেছে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনই এর একমাত্র প্রতিকার। আর একটা কথা না বললেই নয়, ঔপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ যত দিন অস্ত্রের বাজার খুঁজতে যুদ্ধকে হাতিয়ার করবে ততদিন আমাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, এই ব্যবস্থার পরিবর্তনে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে এই বলে শেষ করতে চাই, আবেগ যেন চেতনাকে আচ্ছন্ন না করে করোনা (CORONA) কে জিতিয়ে আমাদেরকে বিপন্ন করে না তোলে। সুতরাং আনন্দ হোক, উল্লাস হোক সবই নিয়ন্ত্রিত আবেগে। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

"আমরা জিতবই"

শ্রী রতন রঞ্জন রায়
চেয়ারম্যান
প্রশাসকমণ্ডলী
তাহেরপুর প্রজ্ঞাপিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
তাহেরপুর, নদীয়া

"... মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, খণ্ড খণ্ড ভাবে জীবিকার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ্ সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

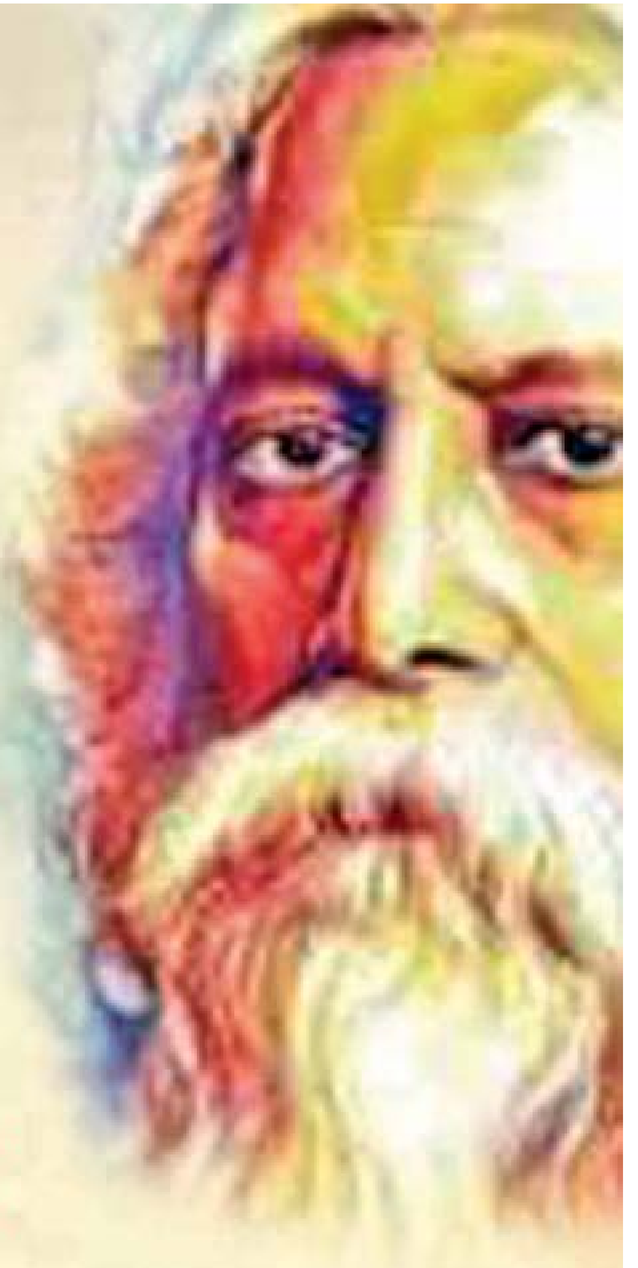

পল্লীসেবা (শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত)

– সমবায়ী সাথীরা

আমি
পেরেছি।
ক্যান্সার থেকে মুক্ত হয়ে আজ আমি সুস্থ।
আমার ক্যান্সার থেকে মুক্ত হবার লড়াইয়ে সবসময় পাশে পেয়েছি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ক্যান্সার হস্পিটালের সমস্ত ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের।
আর এভাবেই তারা সমস্ত ক্যান্সার আক্রান্ত রুগীর পাশে আছেন,
সব সময়।
সমস্ত রুগীর যত্নে আমরা সব সময় তৎপর।
লিম্ফোমা ক্যান্সার
ব্রেস্ট ক্যান্সার
মূত্রথলির ক্যান্সার
মুখের ক্যান্সার
ব্রেন টিউমার
পেটের ক্যান্সার
গল ব্লাডার ক্যান্সার
ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার
*আরও অন্যান্য
খরচ অন্যান্য সব বেসরকারি হস্পিটাল থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।
। সাধ্যের মধ্যে, ক্যান্সার পরিষেবা।
নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ক্যান্সার হস্পিটাল
(হিমাদ্রি মেমোরিয়াল ক্যান্সার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের একটি বিভাগ)
৩০৮১ নয়াবাদ, নিউ গড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ০৯৪ (১বি বাস স্ট্যান্ডের পাশে)
কবি সুভাষ মেট্রো এবং নিউ গড়িয়া / গড়িয়া রেল স্টেশন থেকে ৫ মিনিট
ফোন: +৯১ ৩৩ ৭১২২ ৩০০০, ৯৮৭৪২ ১০০০৭/ ৩
ইমেল: info@nscri.in ওয়েবসাইট: www.nscri.in
HOPE
NCRI
Since 2000

আমাদের কথা

এ এক আঁধারঘেরা দুঃসময়। মহামারীর ছোবল শুধু মৃত্যুই আনেনি, কেমন অমানবিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আধিপত্যে রয়েছি আমরা, তা-ও সামনে এনেছে। তথাকথিত উন্নত দেশেও যত্নহীন, সংবেদনহীন মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে গেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমাদের দেশে মহামারী প্রাণ কেড়েছে, কাজ কেড়েছে, ঘর কেড়েছে, খাবার কেড়েছে।

এই সময়ে শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার বিষাক্ত দর্শনও শেখানোর চেষ্টা হয়েছে। অনুভূতিহীন বর্ণমালার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার এই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র।

এখানে আত্মমগ্ন মননের নিভৃতবাস ছেড়ে ক্ষতবিক্ষত সমষ্টির স্পর্শে নবপ্রাণের নবরবিকিরণে জেগে ওঠার লড়াই।

গণশক্তি চেষ্টা করেছে এই অভিমুখে পরিক্রমার।

গণশক্তির সমস্ত পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা, শুভার্থীকে অভিনন্দন, এই অভিযাত্রায় আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য।

Roy Traders

Prop: Provat Kumar Roy

39/2, Canal West Road
Kolkata- 700004
Mob.: 98302 45543

মোদীদের লক্ষ্য, আমাদের লড়াই

সীতারাম ইয়েচুরি

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

এই বছরের শারদোৎসব উদ্‌যাপন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে। ভারতে এই উৎসবের আয়োজন হচ্ছে, যখন মহামারী এবং গভীর অর্থনৈতিক মন্দার জোড়া আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে ভারতীয় জনগণকে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দৈনিক সংক্রমণ এবং মৃত্যু নথিভুক্ত করা দেশে পরিণত হয়েছে ভারত। বিশ্বের ২৫টি বড় দেশের মধ্যে ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হারে সবচেয়ে বেশি অবনমন ঘটেছে (মাইনাস ২৩.৯ শতাংশ) ভারতে। আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ক্ষুধা এবং ভেঙে পড়া জীবনজীবিকার কারণে প্রবল দুর্দশা ও যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন।

মহামারী মোকাবিলা এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের দিকে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান আরএসএস-বিজেপি চালিত কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব পালনের মনোভাব ত্যাগ করেছে এবং তার আসল গোপন কর্মসূচির আগ্রাসী বাস্তবায়ন শুরু করেছে। তারা সেই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করছে, যা আমাদের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক-সাধারণতন্ত্রের কাঠামো ধ্বংস করছে এবং আগ্রাসীভাবে আমাদের জাতীয় সম্পদ লুট করে আন্তর্জাতিক এবং দেশি কর্পোরেট পুঁজিকে সর্বাধিক মুনাফার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক: কিছু বৈশিষ্ট্য

করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী এই মহামারী নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দেউলিয়া অবস্থা এবং সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্কটের মোকাবিলা করেছে এবং তাদের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করেছে, তা পুঁজিবাদী দেশগুলির অভিজ্ঞতার বিপরীত। জি-২০'র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে চীন একমাত্র দেশ, যাদের জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় যেখানে মুনাফার সর্বাধিকীকরণই উদ্দেশ্য, সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ের

বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য খাতে এর নেতিবাচক পরিণতি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ পুঁজিবাদী দেশগুলিকে মহামারীর কার্যকর মোকাবিলায় অক্ষম করে তুলেছে। বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের রাষ্ট্র পরিচালিত সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, শোষণমুক্ত ও মানুষের স্বার্থবাহী আর্থ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়াও এই অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা মন্দাকে গভীরতর করে তুলছে তার কোনও সমাধান নয়া উদারবাদী কাঠামোর মধ্যে নেই। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই সময়কালে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য পূরণের উদগ্র প্রচেষ্টা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার তীব্র পতন ঘটিয়ে সঙ্কট তৈরি করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যা উৎপাদিত হয়, তা যদি বিক্রি না হয়, তবে লাভ হয় না এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিও হয় না। কিন্তু মুনাফার মাত্রা যদি বাড়ানো নাও যায়, তবে অন্তত তা বজায় রাখার জন্য নয়া উদারনৈতিক পুঁজিবাদ এমন নীতি অনুসরণ করে, যা ক্রমাগত জনগণের ক্রয়ক্ষমতাকে আরও কমিয়ে দেয়। স্পষ্টতই, নয়া উদারনীতির পথ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে এবং এই সঙ্কট থেকে পুঁজিবাদকে বের করে আনার জন্য কোনও সমাধান তার কাছে নেই। এই সঙ্কটের সমাধান কেবল পুঁজিবাদের বাইরে থেকেই হতে পারে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক বিকল্পই সেই সমাধান।

এখন প্রশ্ন, সমাধানের সম্ভাব্য অভিমুখ কী হতে পারে? ব্যাপক রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ করতে হবে পরিকাঠামো তৈরির জন্য, বিশেষত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে। এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তার পরিণতিতে শ্রমিকদের রোজগার ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এর প্রভাবে অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়াকে পুনরায় চালু করবে।

কিন্তু নয়া উদারনীতির প্রবক্তাদের এই পদ্ধতিটি খুবই অপছন্দ। কারণ, এটি পুঁজিকে অন্য জায়গায় আটকে দেয়, বেসরকারি মালিক ও কর্পোরেট সংস্থাগুলি কেবল তাদের মুনাফার জন্যই যার ব্যবহার দেখতে চায়। অতএব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের তরফে ঘোষিত তথাকথিত ‘স্টিমুলাস প্যাকেজগুলি’তে আমরা যা দেখি, তা হলো– রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকে বহুলাংশে সম্প্রসারিত না করে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিলকে ঋণ হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারপরে সেই পুঁজিকেই তারা বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করে মুনাফা বানাতে পারে। তবে এই কৌশলটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, এই ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগগুলি যা উৎপাদন করবে, তার জন্য কোনও ক্রেতা থাকবেন না। সুতরাং এই ধরনের স্টিমুলাস প্যাকেজগুলি কেবলমাত্র বেসরকারি কর্পোরেশনগুলিকে আরও বেশি মুনাফা বানানোর এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরও গভীর করার পথ করে দেবে। নয়া উদারনীতির সমাধানগুলি তাই সঙ্কটের সমাধানের বদলে সঙ্কটকে আরও জটিল করে তোলে।

রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থার উত্থান

জনজীবনে এই দ্বৈত আক্রমণের ফলে ব্যাপক অংশের জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ দেখা দেয়, যা শ্রেণি আন্দোলনের সম্ভাবনাকে তীব্র করে তোলে এবং পুঁজির শাসনের সামনে বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। এভাবে প্রচলিত ব্যবস্থা নিজেই পুঁজিবাদের বিপদ ডেকে আনে। শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের বর্তমান দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হন। আর এই ঐক্যে বিভাজন ঘটিয়ে বিপদের সম্ভাবনাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে শাসকরা। বিভাজনমূলক নানা কৌশলে এবং জনগণের একাংশকে জনগণের আরেক অংশের বিরুদ্ধে খেপিয়ে ও নানা আবেগ জাগিয়ে তুলে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের লড়াইয়ের ঐক্যকে ভাঙা হয়। এই ঘটনা আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পষ্টই দৃশ্যমান। আমেরিকায় ব্যাপক জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী আন্দোলন ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’-এর প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘হোয়াইট পাওয়ার’-এর স্লোগান সামনে নিয়ে আসেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসাবে দ্বিতীয় বারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আমেরিকান সমাজের মেরুকরণ করছেন। এভাবে বর্ণবাদ ও অভিবাসীদের নিয়ে আতঙ্ককে তিনি তীব্র করে তুলছেন। একইভাবে ব্রাজিলে বলসোনারো, তুরস্কে এরদোগান এবং ভারতে মোদীর নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী সরকারগুলি তাদের দেশগুলিতে এই ধরনের বিভাজনমূলক আবেদনকে প্রয়োগ করে সামাজিক মেরুকরণ ঘটাচ্ছে। স্বৈরাচার ও কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে নিজেদের শাসন চালিয়ে যাওয়াই এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। বরং নয়া উদারনীতির জমানার তীব্র শোষণ বজায় রাখার জন্যও এই সরকারগুলি এমন ভূমিকা পালন করছে।

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত

ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক সাধারণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়াই প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়া উদারনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতা এবং তাদের নিজস্ব শাসন টিকিয়ে রাখার চেষ্টার পাশাপাশি ভারতে বিজেপি-আরএসএসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোবাসনা পূরণের লক্ষ্যও রয়েছে এই কর্মসূচিতে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আরএসএস জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারা, যা স্বাধীন ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে কল্পনা করেছিল, তার পরিবর্তে তারা ভারতকে ‘হিন্দু(ত্ব) রাষ্ট্র’-র চেহারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে একটি ভয়ানক অসহিষ্ণু, ধর্মতাত্ত্বিক, ফ্যাসিবাদী ‘হিন্দু রাষ্ট্র’-তে রূপান্তরিত করার রাজনৈতিক প্রকল্প রূপায়ণই ছিল তাদের ভাবনায়।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ণ করতে হলে আগে অবশ্যই বর্তমান সংবিধানিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে হবে এবং এর জায়গায় ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রের কাঠামো স্থাপন করতে হবে।

এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেই বর্তমান মোদী সরকার সর্বাধিক জোরালো তৎপরতা চালাচ্ছে।

এই সরকারের গত ছয় বছরে যে প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা মহামারীর সময়ে আরও তীব্র হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহামারীর পরিস্থিতি এবং লকডাউনের নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ব্যবহার করে মোদী সরকার এই লক্ষ্যেই নানা উদ্যোগকে তীব্র করেছে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সত্তর বছরে ভারতকে আমরা যেভাবে চিনেছি ও

জেনেছি, তা ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালিয়েছে। বর্তমানে যা ঘটছে, তাতে এটাই ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

আরএসএসের ফ্যাসিবাদী প্রকল্প রূপায়ণ

আরএসএসের ফ্যাসিবাদী প্রকল্পটি সফল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির সমর্থন প্রয়োজন। এর অর্থ, ভারতের শাসক শ্রেণির সমর্থনকে তাদের পক্ষে আরও সক্রিয় করতে হবে। এই দু'টি বিষয় মিলে যা দাঁড়াচ্ছে, তার অর্থ হলো– অর্থনৈতিক সংস্কারের নয়া উদারবাদী প্রক্রিয়াকে আগ্রাসীভাবে কার্যকর করতে হবে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পুঁজির সর্বাধিক মুনাফার পথকে সুগম করতে।

এই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহামারীর পরিস্থিতিকে মুনাফা সর্বাধিকীকরণের বৃহত্তর সুযোগ তৈরির জন্য ব্যবহার করে ঢালাও বেসরকারিকরণ এবং জাতীয় সম্পদ লুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আত্মনির্ভর ভারতের নামে ঘোষিত ২০ লক্ষ কোটি টাকার 'স্টিমুলাস প্যাকেজ' আসলে বৃহৎ পুঁজির হাতে পরাধীন ভারত গঠনের নীল নকশা। অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় রেলপথ, বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, ব্যাঙ্ক, বিমা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি সব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের কথা বলা হচ্ছে। এর ফলে ক্রমবিকশিত ধান্দার ধনতন্ত্রের সমর্থনও এই শাসকরা পাবে। ভারতকে লুট করার জন্য, ভারতের প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদকে লুট করার জন্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে খোলাখুলি আমন্ত্রণ জানানোর পদক্ষেপ অবশ্যই এই সরকার এবং তাদের কার্যকলাপের প্রতি পুঁজির সমর্থনকে আরও শক্তিশালী করবে। পরিণতিতে ভারতের জনগণ, বিশেষত শ্রমজীবী জনগণ আরও তীব্র শোষণ, দুর্দশা, ক্ষুধা ও যন্ত্রণার কবলে পড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এই নীল নকশাটির সফল রূপায়ণ নিশ্চিত করার জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণ তীব্র করার জন্য আট ঘণ্টার শ্রম দিবস সহ সমস্ত শ্রম আইন বাতিল করা হচ্ছে। এই মোদী সরকারের শ্রেণি চরিত্র নির্মমভাবে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থবিরোধী, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী হিসাবে উন্মোচিত হয়েছে। জনগণের বিরুদ্ধে তীব্রতর শ্রেণি আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তারা।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে লাগাতার শান

মহামারী এবং লকডাউনের মধ্যেই আরএসএস-বিজেপি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অস্ত্রে অবিরাম শান দিয়ে চলেছে। আক্রমণের লক্ষ্য সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিমরা। এখন ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করে এনআরসি-এনপিআর ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-বিরোধী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দিল্লির সাম্প্রদায়িক হিংসাকে। সরকারি হিসাবেই এই হিংসায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫৩ জন। হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে একের পর এক আন্দোলনকারীকে, বিশেষ করে মুসলিমদের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সংসদে এই প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব হাজির করেছিলেন। দিল্লি পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন তিনি। পরপর ঘটনায় সেই তত্ত্বটির প্রকাশ ঘটছে।

সত্য এই যে, জঘন্য ঘৃণার ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতারাই এই হিংসায় মদত জুগিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় হুহু করে এই ভাষণের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরও এঁদের কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। না পাওয়ার কোনও কারণ নেই, তবু দিল্লি পুলিশ দিল্লি হাইকোর্টে জানিয়েছিল, এমন কোনও ভাষণ তাদের হাতে আসেনি। দিল্লি হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বিচারপতি আদালত কক্ষে ভিডিও চালিয়ে এমন একটি বিদ্বেষ-ভাষণ শুনিয়ে দিয়েছিলেন। বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই বিচারপতি। রাতারাতি তাঁকে বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। আদালতে তাঁর নির্দেশও বদলে যায়!

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়কে আঘাত করার জন্য আইন তৈরি করা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি অর্ডিন্যান্সে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার দায়ে জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, আঘাতের লক্ষ্যবস্তু মুসলিমরা। বিপুল অঙ্কের জরিমানা চাপানোয় তাঁরা তা দিতে পারেননি, ফলে জেলে পাঠানো হয়েছে। একটি আইনে বলা হয়েছে, হিন্দু-মুসলিম বিবাহ 'লাভ জেহাদ' এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অযোধ্যা: মন্দির নির্মাণ

চলতি বছরের ৫ আগস্ট অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণ শুরুর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কার্যত ঘোষণা করে দেওয়া হলো, হিন্দুরাষ্ট্র বাস্তবায়িত। প্রকৃত বিচার দিতে অক্ষম সুপ্রিম কোর্টের ত্রুটিপূর্ণ রায়ে একটি ট্রাস্ট গড়ে তার হাতে মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার বদলে প্রধানমন্ত্রী, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী এবং আরএসএস প্রধানের উপস্থিতিতে হিন্দু ধর্মীয় রীতি পালন করে হিন্দুরাষ্ট্রের ধ্বজা তুলে ধরার অনুষ্ঠান বিশ্বের সামনে সম্প্রচার করা হলো। আগামী দিনে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে তীক্ষ্ণ করতে এই কর্মসূচিকে ব্যবহার করা হবে।

নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যনির্মাণ

মন্দির নির্মাণ কর্মসূচি হয়েছে ৫ আগস্ট। জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক মর্যাদার ৩৭০ এবং ৩৫ক নম্বর ধারাকে আগের বছর ওই দিনই বাতিল করা হয়েছিল। একটি নতুন ভাষ্য তৈরি হয়েছে– ১৯৪৭'র ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু ৫ আগস্ট ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তথাকথিত স্বাধীনতার এই ধারণা হিন্দুরাষ্ট্রের ভাবনার উপর ভিত্তি করে আরএসএসের ঘৃণা, হিংসা ও ফ্যাসিবাদী আক্রমণের ধারণায় পুষ্ট।

কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিস্তসুলভ আক্রমণ

গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জনগণের নাগরিক স্বাধীনতার উপর আঘাত এই কর্মসূচির তৃতীয় দিক। বিরোধিতার প্রতিটি ঘটনাকে বলা হচ্ছে দেশদ্রোহ। চাপানো হচ্ছে কঠোর ইউএপিএ, এনএসএ এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন। সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবীদের দু'বছর ধরে জেলে আটকে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে চাপানো রয়েছে ইউএপিএ'র মতো আইন, যাতে তাঁরা জামিনের আবেদন করতে না পারেন।

যুক্তিবাদী এবং যাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে প্রচার করেন, রাষ্ট্রের মদতে তাঁদের আক্রমণ করছে সংকীর্ণ, অন্ধ মতবাদে চালিত একদল লোক। বিজ্ঞানমনস্কতাকে উৎসাহিত করা দূরে থাক, হিন্দুত্বের ভাবাবেগ চাগিয়ে তুলতে বিজেপি এবং আরএসএস প্রকাশ্যে সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে মদত দিচ্ছে।

ভুল হবে। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য মেহনতি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করা, সংসদের অধিকার খর্ব করা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর নিপীড়ন তীব্র করা।" দিমিত্রভ আরও বলছেন, "ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র কায়েমের আগে বুর্জোয়া সরকারগুলি সাধারণভাবে প্রাথমিক স্তরের একাধিক পর্বের মধ্য দিয়ে যায় এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ নেয়, যেগুলি সরাসরি ফ্যাসিবাদের আরোহণে সহায়তা করে। প্রাথমিক স্তরে যারা বুর্জোয়াদের এই প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপগুলির বিরোধিতা করে না, ফ্যাসিবাদের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার সংগ্রাম করে না, তারা ফ্যাসিবাদের বিজয় রোধ করার মতো অবস্থাতেই থাকে না। শুধু তা-ই নয়, বস্তুত তারা ফ্যাসিবাদের বিজয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।"

আজকের ভারতে সঠিক ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে খর্ব করা

চতুর্থ দিক হলো প্রতিটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে খর্ব করার তীব্র প্রয়াস। এর সূত্রপাত হয়েছে সংবিধানের কার্যক্রমে গুরুতর কাটছাঁটের মধ্য দিয়ে। সদ্য সমাপ্ত বাদল অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব বাতিল করা হয়েছে। সংসদের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতার শর্ত খারিজ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রীয় মর্মবস্তু হলো জনগণের সার্বভৌমত্ব, যা কার্যকর হয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। তাঁদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে সরকার। সংসদের কার্যক্রমকে পঙ্গু করা হলে সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়ে।

দেশের কৃষি এবং কৃষকদের ধ্বংস করার দুই বিল যেভাবে গায়ের জোরে রাজ্যসভায় অনুমোদন করানো হলো, তাতে ফ্যাসিস্তসুলভ লক্ষণ স্পষ্ট। আরএসএস এবং বিজেপি'র কর্মসূচির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে সিপিআই(এম) সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচিতে (২০২০ সালের) ব্যাখ্যা করেছে। বলা হয়েছে, "বিভেদকামী ও সাম্প্রদায়িক মঞ্চের ভারতীয় জনতা দল একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মর্মবস্তুর ভিত্তি হলো অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা ও উগ্র জাত্যভিমান। বিজেপি কোনও সাধারণ বুর্জোয়া দল নয়, কেননা ফ্যাসিস্ত ধাঁচের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের পরিচালনা করে, আধিপত্য করে। বিজেপি ক্ষমতায় আসায় রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন সংস্থায় প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে আরএসএস। হিন্দুত্ব মতাদর্শ পুনরুত্থানবাদকে মদত দেয়, হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে।"

ফ্যাসিস্তসুলভ প্রবণতাকে তীব্রতর করার সঙ্গে আরএসএসের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই লক্ষ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতীয় সাংবিধানিক সাধারণতন্ত্রকে আগ্রাসী অসহিষ্ণু ফ্যাসিস্তসুলভ 'হিন্দু(ত্ব)' রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে রক্ষা করার জন্য ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিস্তসুলভ প্রবণতারগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন জর্জি দিমিত্রভ। ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মূল্যবান বিশ্লেষণে তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র কায়েমে বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপগুলির গুরুত্বকে খাটো করে দেখলে গুরুতর এবং বিপজ্জনক

আমরা দেখছি, কীভাবে বিচারবিভাগ কাজ করছে। সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫ক নম্বর ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনগুলি ২০১৯'র আগস্ট থেকে পড়ে রয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদন পড়ে রয়েছে একইভাবে। বিচারে বিলম্বের অর্থ বিচার প্রত্যাখ্যান।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন কার্যধারা সমানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত একতরফা সিদ্ধান্ত এবং যে নির্বাচন কমিশনার লোকসভা ভোটের প্রচারে বিধি ভাঙার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে যাঁর আসীন হওয়ার কথা ছিল, তাঁর সরে যাওয়া পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়, কীভাবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

সিবিআই অগ্রণী তদন্ত সংস্থা হিসাবে কাজ করার বদলে সরকারের রাজনৈতিক লেজুড় হয়ে উঠেছে। এনফোর্সমেন্ট বিভাগও রাজনৈতিক কর্তাদের ইচ্ছায় চলছে। এই সবই ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে খর্ব করছে, শক্তিশালী করছে বেড়ে চলা কর্তৃত্ববাদী আক্রমণকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে খর্ব করা

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নীতির মতো সংবিধানের মৌলিক উপাদানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সব ধরনের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে সর্বশক্তি নিয়ে।

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের মূল লক্ষ্যই হলো, দেশের নাগরিকদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে নজরদারি রাষ্ট্র তৈরি করা। নাৎসি আমলে ইহুদি-বিরোধী প্রচারের জেরে বহু মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কয়লা অথবা চক দিয়ে ইহুদিদের বাড়ি চিহ্নিত করা হতো হামলার জন্য। খুন করা হতো বাড়ির লোকজনকে। এখন মোদীর রাজত্বে এই সবের কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। কারণ, এখন সব তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে তথ্য ভাণ্ডারে। এই সব তথ্য ইতিমধ্যে আমাদের সবার থেকে সংগ্রহ করে নিয়েছে সরকার।

তা ছাড়া এই ধরনের কেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে, যা সমস্ত কর্তৃত্বকে কুক্ষিগত করে আরএসএসের মতাদর্শে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে সমস্ত নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে অমান্য করা হচ্ছে। জিএসটি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো ন্যায্য পাওনা থেকেও রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়ার মতো রসদটুকুও রাজ্যগুলিকে দিচ্ছে না কেন্দ্র।

নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ফেলার চক্রান্ত

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো, নির্বাচিত সমস্ত অ-বিজেপি সরকারকে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ। এও সেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠাকে শক্তিশালী করার প্রবণতা। ধান্দার ধনতন্ত্র, নির্বাচনী বন্ড সহ এই ধরনের সন্দেহজনক ক্ষেত্র থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে অন্য দল ভাঙতে ব্যাপক হারে বিধায়ক কিনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করা হচ্ছে। অর্থের এই প্রলোভনের পাশাপাশি নানাভাবে হুমকি এবং সিবিআই, ইডি'র মতো সংস্থাকে দিয়ে হেনস্তা করে বিরোধীদের জবরদস্তি নিজেদের দিকে টেনে আনার চেষ্টা চলছে। যাঁরা অন্য দল ভেঙে বিজেপি'র সঙ্গে যাচ্ছেন, তাঁদের দুর্নীতি বা অন্যান্য অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত থাকলেও রেহাই দেওয়া হচ্ছে। আর যাঁরা প্রতিরোধ করছেন, তাঁদেরকে হেনস্তা করা হচ্ছে, এমনকী তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাও ঠুকে দেওয়া হচ্ছে।

আক্রমণের লক্ষ্য বামপন্থীরাই

বামপন্থীরা, বিশেষত সিপিআই(এম)-কেই আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে আরএসএস-বিজেপি। কারণ, বামপন্থীরাই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি, যারা ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বিজেপি-আরএসএসের ফ্যাসিস্ত কর্মসূচির অবিরাম বিরোধিতা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুরক্ষা এবং ভবিষ্যতে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা। অতীতে আমরা এই ধরনের আক্রমণ দেখেছি ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে। এখন কেরালার এলডিএফ সরকারকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে। সিপিআই(এম) এবং বামপন্থীরা অবশ্য এই আক্রমণ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ নিতে অনড়। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এবং আরএসএস-বিজেপি দেশে যে নতুন ভাষ্য চাপিয়ে দিতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়— এমন সমস্ত শক্তিকে একসূত্রে বাঁধতে বদ্ধপরিকর সিপিআই(এম) সহ বামপন্থীরা ।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বহু আঞ্চলিক দল আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও বস্তুত তারা একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিপদ মোকাবিলায় জোরদার করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের মধ্যে সাড়া ফেলতে পারে এমন লড়াই-আন্দোলনকে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার পাশাপাশি ধ্বংস করছে গণতন্ত্রকেই। এই ধরনের আচরণ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই উলটে সহায়তা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে ভাগ করার উদ্যোগ চলবে আরও। দু'দলই মনে করছে, এই মেরুকরণ থেকে ফায়দা লুটবে। দু'দলই মানুষের মধ্যে বিভাজনকে মদত জোগাচ্ছে এমনভাবে, যেন যাঁরা ওই সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি এবং এর ভয়াবহ রূপায়ণ সম্পর্কে অবিহিত, তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন। আবার যাঁরা তৃণমূলের সন্ত্রাসের রাজনীতি এবং অগণতান্ত্রিক হামলার বিরোধী, তাঁরা প্রতিষেধক হিসাবে বেছে নেবেন বিজেপি-কেই। এরই পরিণতিতে দু'ধরনের সন্ত্রাস এবং ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ও ঘৃণার প্রবণতার জেরে অতিষ্ঠ অবস্থা রাজ্যবাসীর। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জমিতে ফসল ফলাতে চাইছে বিজেপি। অন্যদিকে বাঙালি সমাজের ঐতিহ্যবাহী সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ ভিতকে হাতিয়ার করে ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। স্পষ্টই বলা যায়, বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্য ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অতুলনীয় অবদান বজায় রাখার ক্ষেত্রে দু'দলের কেউই বিকল্প নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, স্বাধীনতার পরে প্রগতিশীল আধুনিক ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এদের কোনও অবদান নেই। এই অবস্থায় বামপন্থীদের নেতৃত্বে বিকল্পের পথ দেখাচ্ছে বাংলা, যা ওই দুই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই অস্বীকার করতে চাইছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং সন্ত্রাসের রাজনীতির অগণতান্ত্রিক হামলাকে বর্জন করা ছাড়া নির্বাচনে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর সামনে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাধীন শরিক

এই অতিমারী এবং লকডাউনের সময়ে মোদী সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাধীন শরিক হিসাবে নিজের অবস্থানকে আরও পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যৌথ সামরিক মহড়ার মধ্য দিয়ে ছোট শরিকের স্বীকৃতি আরও প্রসারিত করেছে ভারত। এরই সঙ্গে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক কৌশলকে সম্প্রসারিত করতে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তীব্রতা বাড়াতে চতুর্ভুজ সামরিক বোঝাপড়ার মতো আঞ্চলিক সংযুক্তিকরণেও শামিল হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে এই বশ্যতা মোটেই ভারত তথা দেশবাসীর স্বার্থবাহী নয়।

সাড়া জাগানো প্রতিরোধের তীব্রতা বাড়ানো

এই পরিস্থিতিতে অবিরাম আক্রমণের হাত থেকে ভারতীয় সংবিধান এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখতে আন্দোলনকে জোরদার করাই সর্বাধিক দায়িত্ব হওয়া উচিত প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর। দেশ এবং দেশবাসীর উপর এই সর্বগ্রাসী আক্রমণ হলো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণি আক্রমণ আর ভারতের ভবিতব্য সম্পর্কে ধর্মাশ্রয়ী ফ্যাসিস্ত দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণ। মূল উদ্দেশ্যই হলো অপ্রতিহতভাবে ওই লক্ষ্যে পৌঁছানো। এই জন্য বামপন্থী, বিশেষত সিপিআই(এম)'র উপর ক্রমাগত আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে।

তবে একে প্রতিহত করতেই হবে। আমরা জানি, ভারত এখন কেমন অবস্থায় আছে। একে বাঁচাতে হবে আগামী দিনে আরও উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে।

এই শারদোৎসবের সময়ে এই সঙ্কল্পের মাত্রাকে দ্বিগুণ করাই একমাত্র অঙ্গীকার হওয়া উচিত।

বর্তমান পরিস্থিতি ও বিকল্পের জন্য সংগ্রাম

সূর্য মিশ্র

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

অভূতপূর্ব পরিস্থিতি বাংলায়

আমাদের রাজ্যে তৃণমূল সরকারের প্রায় দশ বছর হয় গেল। এই দশ বছরে আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ দিয়ে এই সরকার যাত্রা শুরু করে। নির্বাচনের আগে 'বদলা নয় বদল চাই' স্লোগান ছিল তাদের। কিন্তু তারা সরকারে আসার পরে ২২২ জন বামপন্থী কর্মী সমর্থক খুন হয়েছেন, হাজার হাজার কর্মী ঘরছাড়া হয়েছেন, বহু মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে। অন্যান্য দলের এবং শাসকদের দলীয় কোন্দলে নিরীহ মানুষও জীবন দিয়েছেন। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। নারীসমাজের নিরাপত্তাহীনতায় নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। অপরাধীদের আড়াল করেছে সরকার। বামপন্থীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সভা মিছিল ইত্যাদি রাজ্যে বহুদিন ধরে বহু জায়গায় করতে দেওয়া হয়নি। সর্বশেষ পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচনেও আমরা এই সরকার ও শাসকদলের হিংসাত্মক অভিযান দেখেছি। পৌরসভার নির্বাচন যা বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো, এখন রাজ্যে তা অনিয়মিত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির নির্বাচন সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশ সরকার মানেনি। তার জন্য আমাদের আদালতে যেতে হয়েছে, আন্দোলন করতে হয়েছে নির্বাচনের জন্য। তারপরে নির্বাচন কিরকম 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ' হয়েছে তাও দেখা গিয়েছে। নানা সময়ে যাঁরাই সরকারের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের ওপর, এমনকি সংবাদমাধ্যমের ওপরেও চাপ তৈরি করা হয়েছে, বিরোধী ব্যাক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান শাসকদল ও সরকারের আক্রমণের শিকার হয়েছে। এমনকি শাসকদলের লোকেরাও প্রতিবাদ করলে রেহাই পাননি।

প্রথম থেকেই দেখা গিয়েছে, এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কাজে তা পুরোপুরি লঙ্ঘিত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে ঢালাও বিজ্ঞাপনে, সর্বত্র ছড়ানো হোর্ডিংয়ে বড় বড় কথা আগেও দেখেছি, এখনও দেখছি। কিন্তু যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, প্রতিক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের রাজ্যের শিল্পক্ষেত্র সঙ্কটগ্রস্ত। সিঙ্গুরে ৯০ শতাংশ তৈরি হয়ে যাওয়া কারখানা তাড়ানোর পরে সেই জায়গাটা এখন মরুভূমি, মুখ্যমন্ত্রীই এই ধ্বংসের বীজ বপন করেছিলেন। নন্দীগ্রাম নিয়ে শুধু মিথ্যা প্রচারই করেননি, সেখানকার মানুষের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেখানকার অবস্থা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানা যা বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে অনেকটাই এগিয়েছিল, তা পুরোপুরি বন্ধ।

শারদ শুভেচ্ছা

HALDIA STEELS LIMITED

FACTORY

Unit - I & II Raturia Industrial Area, Angadpur, Durgapur
PIN - 713215, (W.B.) Phone (0343) 2590815/6

REGD. OFFICE

37, Shakespeare, Sarani, Kolkata- 700 017, India
Phone- 2287-8631, 2287-8635, 2287-8709
Fax - 91-033-2240 8820, 2287 0925
e-mail - brandalloys@vsnl.com, website - www.brandalloys.com

কিছুই হয়নি। রাজ্যের কোনও একটা জায়গাতেও শিল্পের উন্নতি এবং অগ্রগতি হয়নি। বিপুল খরচ করে বছরে বছরে অনেক শিল্প সম্মেলন হয়েছে, কিন্তু শিল্পে বিনিয়োগ হয়নি। বারাকপুর, কল্যাণী, দুর্গাপুর, হলদিয়া, খড়গপুর, হাওড়া, উত্তরবঙ্গের সমস্ত শিল্পাঞ্চলে অগ্রগতির বদলে সঙ্কটে। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন ছোট মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান ছিল সর্বোচ্চ, গুজরাট আমাদের রাজ্যের অনেক পিছনে, দ্বিতীয় স্থানে ছিল। আমরা প্রথম ছিলাম। এখন সবটাই সঙ্কটে। ছোট ও মাঝারি শিল্পেরও বেশিরভাগই বন্ধ। এটা ঠিক যে কেন্দ্রের নীতি এর পিছনে অনেকটাই দায়ী। করোনা অতিমারীতে সেই সঙ্কট আরও বেড়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে শিল্পের সঙ্কটটা ২০১১ সালের পর থেকেই। কৃষিতেও সঙ্কট বেড়েই চলেছে। কৃষকদের আত্মহত্যা বেড়েছে। এই সত্যকে চাপা দিতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো-তে কৃষক আত্মহত্যার রিপোর্ট দেওয়াই আমাদের সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। আমরা সেই পরিসংখ্যান দিয়ে সরকারকে কৃষকদের সঙ্কটের কথা বলেছি। কলকাতায় রানি রাসমনি রোডে সভা করে আত্মঘাতী কৃষকদের পরিবারকে নিয়ে এসে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছি। তবুও সরকার সত্য আড়াল করে গিয়েছে। একদিকে কৃষকরা ফসলের দাম পাননি, অন্যদিকে বাজারে তখন কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়ছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের দাবির সঙ্গে বাস্তবতার কোনও মিল নেই। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আজগুবি দাবি করে ৯০ লক্ষ কাজ দেওয়া হয়ে গিয়েছে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৯০ শতাংশ কাজ করে দিয়েছি তিনি বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো বছরের পর বছর স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ যা অতীতে নিয়মিত হতো সেগুলো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকায় মামলাও হয়েছে। সরকার সেই সব ত্রুটি শুধরে নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। কোথাও পরীক্ষার পর প্যানেল হলেও নিয়োগ হয়নি। জীবিকা সেবকদের অনেকের ১১ মাস মাইনে নেই। সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পঙ্গু করে দিয়েছে এবং তার বদলে একটা নতুন নিয়োগ বোর্ড করেছে যা সংবিধান সম্মত নয়। দুর্নীতি ও নৈরাজ্য চলছে পিএসসি'তে। নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন নৈরাজ্যের নজির নেই। তাহলে কর্মসংস্থান হবে কোথা থেকে? কাজের জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন এরাজ্যের যুবরা, তারপরে সেই পরিযায়ীদের প্রতি সরকার অমানবিক আচরণ করেছে। লকডাউনের সময়ে ভিনরাজ্যে বিপন্ন পরিযায়ী শ্রমিদের ঘরে ফেরানোর জন্য সাহায্য করেনি, ফিরে আসার পরে তাঁদের খাদ্য টাকা কিছুই দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর যা ঘোষণা ছিল তার কিছুই মানা হয়নি। সঙ্কট এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে রাজ্যে নতুন নিয়োগ নেই, যাঁদের কাজ ছিল তাঁরাও কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছেন। শিল্প কৃষি সবেতেই সঙ্কট তীব্র হচ্ছে। মানুষের রোজগার বিপন্ন।

তার সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও চলছে নৈরাজ্য। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব প্রকাশ্যে শিক্ষক অধ্যাপকদের আক্রমণ চলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া নিয়ে দুর্নীতি চলছে, কাটমানি আর কমিশন লুটছে শাসকদল। পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি থেকে ফলপ্রকাশে স্বচ্ছতার অভাব প্রকট। শিক্ষকদের সঙ্কটও আমরা দেখছি। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগ নেই, পরিকাঠামোর অভাবে জর্জরিত আর শাসকদলের তৈরি করা নৈরাজ্যে কলেজগুলিতে কেউ অধ্যক্ষ হতে চাইছেন না। ফুলটাইম শিক্ষক কম, পার্টটাইম শিক্ষক নির্ভর হয়ে রয়েছে কলেজগুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। মুখ্যমন্ত্রী অনেকগুলো নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা করলেও পরিকাঠামো সমেত শিক্ষাদানের উপযোগী হয়ে সেগুলোকে কার্যকর হতে দেখা যায়নি এখনও।

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী প্রচারের জলুসে যতটুকু আড়াল করে রাখতে পেরেছিলেন, করোনা মহামারীতে তা একেবারে বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব পালন করেনি, সেইসঙ্গে রাজ্য সরকার যা করতে পারত তাও করেনি। কিছু কিছু রাজ্য কিছু কিছু কাজ করেছে, আমাদের দেশের দক্ষিণের রাজ্য কেরালা করেছে। কিন্তু আমরা এই দশ বছরে অনেক পিছিয়ে পড়েছি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিগুলির বিচারে পশ্চিমবঙ্গ আগে প্রথম চারটে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে থাকতই। মহামারীর সময়ে আমরা দেখছি, পশ্চিমবঙ্গ প্রথম দশটা রাজ্যের মধ্যেও নেই। কোভিড টেস্টিং'এর বিচারে জনসংখ্যার অনুপাতে আমরা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির থেকে অনেক পিছনে। জনস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধমূলক কাজের ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে গিয়েছি, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়েছি। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে কেবল কিছু নীল সাদা রঙের বিল্ডিং হয়েছে, সেখানে চিকিৎসা পরিকাঠামোর কোনও ব্যবস্থা হয়নি।

একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী অনেক প্রচার করেছিলেন কিষান মান্ডির কথা বলে। কিন্তু নতুন কিষান মান্ডি যা হয়েছে সেগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। নির্মাণক্ষেত্রের ঠিকাদারদের কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়ে নীল সাদা রঙের বিল্ডিং পড়ে আছে, কৃষকের কোনও কাজে লাগেনি, তাঁদের অভাবী বিক্রয়ই করে যেতে হচ্ছে ফড়েদের কাছে। রাস্তাঘাট কিছু হয়েছে। কিন্তু গ্রামের ভিতরে নতুন রাস্তা হয়নি, যেগুলো ছিল সেগুলোরও রক্ষণাবেক্ষণ নেই। আমাদের রাজ্যে সিইএসসি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির এলাকায় বিদ্যুতের মাশুল অন্য রাজ্যের থেকেও অনেক বেশি বেড়েছে। অপেক্ষাকৃত কম ইউনিট ব্যবহারকারীদের বেশি মাশুল দিতে হচ্ছে। কৃষকদেরও ফসল উৎপাদন খরচ এরফলে বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি কার্যত বন্ধের মুখে। কারণ রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়েনি, কারণ রাজ্যে নতুন শিল্প তৈরি হয়নি, পুরানো শিল্পেরও অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। শিল্পায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে আমরা বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলাম, তা এই সরকারের হাতে বাস্তবায়িত হয়নি।

শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো সহ সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাশাপাশি এরাজ্যের প্রশাসন ও শাসকদলের সর্বোচ্চ স্তরে খোলাখুলি যে পরিমাণে দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে তা অতীতে কখনো কল্পনাও করা যেত না, এমনকি বামফ্রন্টের সমালোচকরাও কখনো দুর্নীতি নিয়ে এমন অভিযোগ করেনি। নারদ সারদায় আর্থিক অপরাধের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এরাজ্যের শাসকদলের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি। আর রাজ্য সরকার তদন্তে সহযোগিতা তো দূরের কথা, অপরাধের তথ্যপ্রমাণ চাপা দিয়েছে। এরফলে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে এমন কাণ্ড হয়েছে, যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। অপরাধ

উদঘাটনে ও শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, শাসকদল প্রশাসনিক আধিকারিকদের ব্যবহার করেছে অপরাধে মদতদানে এবং তা ধামাচাপা দিতে। শীর্ষস্তর থেকে এই দুর্নীতি তলার স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আমফানের ক্ষয়ক্ষতির পরে ত্রাণ নিয়ে এই দুর্নীতি একেবারে গ্রামস্তর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। গরিব মানুষ, ঝড়ে যাঁদের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা ত্রাণ বা ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। সচ্ছল কিন্তু শাসকদলের ঘনিষ্ঠরা যাদের ক্ষতি হয়নি, তাঁরা পেয়েছেন। মানুষ এই লুটের প্রতিবাদ করায় গ্রামস্তরে শাসকদলের কিছু লোক টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সরকার আইনানুগ তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। রাজ্যজুড়ে তোলাবাজি ব্যাপক আকার নিয়েছে। কোনও ক্ষেত্র বাদ নেই, বালিখাদান হোক, নির্মাণ শিল্প হোক বা অন্যকিছু। কাজের জন্য কাটমানি দেওয়া এবং উপরের স্তর পর্যন্ত তার ভাগ পৌঁছে যাওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে গেছে। রাজ্যের ঋণ বহুগুণ বেড়েছে, তারপরেও সরকার লাগামহীনভাবে ঋণ নিয়ে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী কথায়

কথায় ৩৪ বছরের ঋণভারের কথা বলে থাকেন, কিন্তু আমরা সরকার ছেড়ে আসার সময় রাজ্যের ঋণভার যা ছিল, তার পরে ঋণ রেকর্ড হারে বেড়েছে। রাজ্যের অর্থনীতি এমন সঙ্কটে পৌঁছেছে যে পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন। এই সরকার থাকলে সেই বিপদ আরও বাড়বে। শুধু বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যৎকেও এরা অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

তৃণমূলের মদতে বিজেপি'র প্রসার

কেন্দ্রে বিজেপি'র যে সরকার রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভূমিকা এবং আমাদের রাজ্যের সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, বিজেপি'র সঙ্গে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক, এই নিয়ে আমরা বামপন্থীরা বারে বারে বলেছি। এই সম্পর্ক আজকের নয়, আরএসএস'এর সূত্রে এই সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং এখনও তা অটুট রয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন এনডিএ সরকারের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি আরএসএস'এর মুখপাত্র পাঞ্চজন্যের অফিসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের হটাতে তাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। আর ওরাও তাঁকে মা দুর্গা বলেছিল। আরএসএস আসলে একটা পরিবার, সঙ্ঘ পরিবার। বিজেপি পরিচালিত হয় তাদের দ্বারা। অন্য অনেক দলেও তাদের লোক ঢোকানো আছে। তৃণমূল সরাসরি আরএসএস'এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে, বিজেপি'র সঙ্গে তার ভাইবোনের মতো সম্পর্ক। ভাইবোনের মতো ঝগড়াও হয়তো হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কখনো আরএসএস'এর বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। নীতি বা দুর্নীতির প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীরা যে লড়াই করেছে তার থেকে এই জন্য তৃণমূল নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। কাশ্মীর নিয়ে, সর্বশেষ অযোধ্যা নিয়ে যা ঘটেছে তাতেও এটাই দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত, মতাদর্শগত অবস্থানের থেকে তৃণমূলের অবস্থান আলাদা এমন কোনও নজির নেই।

এরফলে এরাজ্যে আরএসএস বহুগুণ বেড়েছে। আমরা বামপন্থীরা যখন মিটিং মিছিল বা রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি পাইনি, আরএসএস কিন্তু অস্ত্র হাতে মিছিল প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এসব করেছে। পশ্চিমবঙ্গের আনাচেকানাচে এই সুযোগে আরএসএস ছড়িয়েছে, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণিত যে ওরা মেরুকরণের রাজনীতিকে নিয়ে যেতে পেরেছে। এটা ঠিক যে গোটা দেশের সামনে বিপদ আরএসএস-বিজেপি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল থাকলে এরাজ্যে তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা অসম্ভব। তৃণমূলের সময়েই আরএসএস-বিজেপি'র বিস্তার। তার আগে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সম্প্রতি বাংলার মাথা হেঁট করে দিয়ে বিধাননগরে মুসলিম শিক্ষকদের তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য একটি গেস্ট হাউস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা অতীতে কল্পনাও করা যেত না এবং এটা সম্ভব হয়েছে তৃণমূলের শাসনে আরএসএস'র অবাধ প্রসারের জন্যই। কাজেই সারা দেশে বিজেপি বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গের অবদান যদি ঐতিহ্যের সঙ্গে পালন করতে হয়, তাহলে এরাজ্যে তৃণমূল সরকারকে হটাতে হবে। সেই সঙ্গে তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী লড়াইতে সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়তে হবে। একই সঙ্গে আমাদের পার্টির নিজস্ব স্বাধীন লড়াই, বামফ্রন্টের

লড়াই, তার বাইরের বামপন্থী ও সহযোগীদের নিয়ে লড়াই এবং তার বাইরে কংগ্রেস সহ যারাই তৃণমূল-বিজেপি'র বিরুদ্ধে লড়তে চায় তাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে। একটাই নজর রাখতে হবে যেন কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ঠাঁই না পায়। তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয় তারজন্যই একাজ আমাদের করতে হবে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইকে জোরদার করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার লড়াই করতে হবে, রাজ্যকে নৈরাজ্য থেকে বাঁচিয়ে আবার পুনর্নির্মাণের লড়াই করতে হবে।

বামপন্থীদের লড়াই বিকল্পের জন্য

এটা শুধু নিছক নির্বাচনের লড়াই নয়, মানুষের জীবনজীবিকার দাবিগুলো নিয়ে একইসঙ্গে লড়াই করতে হবে। তার জন্য বামপন্থীরা কেবল নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে না, ইতিবাচক দায়িত্বও পালন করে। কেবল না বলা নয়, মানুষের স্বার্থে যা করা দরকার এবং যা করা যায় তা আমাদের করতে হবে এবং সেটা আমরা করেওছি। এটা নতুন নয়, আগেও বন্যা ও দুর্যোগে আমরা সাধ্যমতো এই চেষ্টাই করেছি। এবারও আমফানে করেছি। এই কোভিড অতিমারীতে আমরা গোড়া থেকেই সর্বদলীয় বৈঠকে সরকারকে গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমরা সহযোগিতার কথা বলেছিলাম সরকারকে। বলেছিলাম যে এই পরিস্থিতিতে সবাইকে এক হয়ে লড়তে হবে। সর্বদলীয় বৈঠকে একথা বলেছি, পরে বামপন্থীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেও বলেছি। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, আমাদের পরামর্শগুলো মানা হয়নি।

আমরা যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের দাবি নিয়ে লড়েছি, তখন এই সরকার আমাদের গ্রেপ্তার করেছে। তৃণমূল বা বিজেপি যখন নিয়মকানুন না মেনেই সভা করেছে, কর্মসূচি করেছে, তখন সরকার আপত্তি করেনি। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানুষের দাবির কথা তুলতে গিয়েও আক্রান্ত হয়েছি। এমনকি হাওড়ায় আমাদের রক্তদান শিবিরও আক্রান্ত হয়েছে। আমরা অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করলে তাতেও বাধা। আমরা বিকল্পের জন্য সরকারের কাছে দাবি করেছি, সেই বিকল্পের ধারণা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছি। বিপদের মধ্যে থাকা মানুষের কাছে সাবান স্যানিটাইজার মাস্ক খাদ্য নিয়ে গিয়েছি। আমাদের পার্টি, বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠন রাজ্যের নানা প্রান্তে অনেক কমিউনিটি কিচেন চালাচ্ছে নানা নামে। বাইরের রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সরকারকে হেল্পলাইন নম্বর করতে বলেছিলাম আমরা, সরকার করেনি। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সেই হেল্পলাইন করেছে এবং বিশেষ করে অন্য রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের সাহায্য করেছে সেই সব রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেই সব পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরে আসার জন্য তাঁদের পরিবহণের ব্যবস্থা, ফেরত আসার পরে কোয়ারান্টিন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা, খাদ্য ও চিকিৎসাসহ নানা সাহায্যের ব্যবস্থা করা এমনকি রক্তের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কেবল হাওড়া জেলাতেই হাজার ইউনিট রক্তদান হয়ে যেত যদি সেদিন রক্তদান শিবিরে শাসকদলের আক্রমণ না হতো। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা বিকল্পের জন্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাতে সহযোগিতার বদলে বাধা দেওয়া হয়েছে। সরকার নিজে যে কাজ করেনি, আমাদেরও সেই বিকল্পের কাজে বাধা দিয়েছে।

বিকল্প কর্মসূচি

আমরা বামপন্থীরা একটা কর্মসূচি নিয়েই নির্বাচনী সংগ্রামে যাব, সেটা বামফ্রন্টের ইশ্‌তেহার হয়ে প্রকাশিত হবে। কিন্তু তার আগে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চাই। এটা খালি বামফ্রন্টের বিষয় নয়। যত বেশি সম্ভব মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে ও ব্যাপক মতামত নিয়ে যাতে এটা করা যায় তার চেষ্টাই আমরা করব। কিন্তু আমাদের অবশ্যই যা করতে হবে সেটা হলো বামপন্থীদের বিকল্প, যা আমরা সবসময়ে বলে থাকি, সরকার চালালে সেগুলো রূপায়ণের চেষ্টাও করে থাকি। সেই বিকল্পই সামনে রাখা হবে।

প্রথমত, সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের স্লোগানই ছিল কাজ, কর্মসংস্থান। কাজ না দিতে পারলে ভাতা দিতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ ৪০ বছরের নিচে। এদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ এদের ওপরই নির্ভর করছে। এদের বিরাট সৃজনশীল ক্ষমতা আছে, তাকে ব্যবহার করতে হবে। তারজন্য কর্মসংস্থান করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এর গুরুত্ব বাড়ছে। বামফ্রন্ট সরকারই কেন্দ্রীয় আইনের আগেই এখানে দারিদ্রসীমার নিচের অংশের মানুষের জন্য দুই টাকা কিলো চাল দেওয়ার প্রকল্প শুরু করেছিল, পরে সেটা প্রসারিতও করেছিল। আর এখন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে রেশন ব্যবস্থায় দশ কেজি করে পাওয়ার কথা সকলের। কেউ পান? আমরা খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্ব দেব এবং গণবন্টনকে সম্প্রসারণ করব। আগের যাবতীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সময়োপযোগী করে মানুষের জন্য প্রকল্পগুলো রূপায়ণ করতে হবে। দশ বছর আগে যা করা সম্ভব ছিল না, এখন তা করা সম্ভব হলে সেটাই করতে হবে।

তৃতীয়ত, কাজ, খাদ্যের পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপদ পানীয় জল, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা সব মানুষের জন্য করতে হবে। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় পাকা ছাদ দরকার, বন্যাপ্রবণ এলাকায় কাঁচা ঘর চলে না। যেমন আমফানে সরকারের তৈরি বাড়িও উড়ে গিয়েছে। এই সব দিক বিবেচনা করে সবাইকে বাড়ি দিতে হবে।

চতুর্থত, এর সঙ্গে চাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। আমরা বামফ্রন্ট সরকার বারো ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক করেছিলাম। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা চাই। বাধ্যতামূলক করতে শিশু শ্রম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপরে তাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে ঠিকমতো পরিচালনা করতে হবে, স্কুল আরও করতে হবে, শিক্ষক বাড়াতে হবে, স্কুলে ভর্তি আরও বাড়াতে হবে।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং মধ্যবর্তী স্তর আগেই ছিল। যেটা দৃঢ় করতে হবে তা হলো বিনামূল্যে চিকিৎসা। সর্বোচ্চ স্তরে আমরা ৩০ শতাংশ পেইং বেড করেছিলাম। এখন সেখানে কেবিন করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা ভালো হয়নি। সরকারি ক্ষেত্রের সবটাই বিনামূল্যে করতে হবে এবং জনস্বাস্থ্যে সরকারকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। মহামারী এবং

রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যকেও অগ্রাধিকারে রাখতে হবে।

পঞ্চমত, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে পুনর্গঠন দরকার। এটা জরুরি হয়ে পড়েছে। কৃষিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিরাট বিপদ নিয়ে আসছে, তারা সংসদীয় রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে কৃষি সংক্রান্ত বিলগুলি পাশ করিয়েছে কৃষি ও কৃষকদের সর্বনাশ করে কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষা করতে। প্রক্রিয়াটা আগেই শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রের মতো এরাজ্যের সরকারও এপিএমসি অ্যাক্ট আগেই বেসরকারি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে আইন সংশোধন করেছিল। গত দশ বছরে অনেক রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কৃষক কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে প্রতিদিন হাজর হাজার কৃষক উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন। কারণ কৃষি লাভজনক থাকছে না, অন্য কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এখন কেন্দ্র কৃষকের হাতে নির্ভর না করে কৃষিকে কর্পোরেট হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারমানে আরও কৃষক উচ্ছেদ হবেন। কিন্তু কৃষক যাতে কৃষিতে থাকতে পারেন তার জন্য সরকারের ভূমিকা আছে। ভূমিসংস্কারে যাঁরা জমি পেয়েছিলেন তাঁরা অনেকে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছেন। তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার জন্য চাষকে লাভজনক করতে হবে, মিনিকিট, সার সেচের জল এগুলোতে সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প করলে ফসলের দাম পাওয়া যায়। আমাদের সময় এই প্রচেষ্ঠা হয়েছিল, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি এই ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছিল, যাতে মূল্যযুক্ত করা যায় কৃষি ফসলে। তাই সংরক্ষণ, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি বৈচিত্রে জোর দেওয়ার দরকার আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সময় সামাজিক বনসৃজন বড় ব্যাপার ছিল। তা ধ্বংস করা হয়েছে। এটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এছাড়াও প্রাণীপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, রেশম তসর চাষ, ইত্যাদি সবগুলো নিয়ে আমাদের কৃষি ক্ষেত্রের পুনর্গঠন করতে হবে।

আর আমাদের মূল কর্মসংস্থানের ভিত্তি ছিল ছোট ও মাঝারি শিল্প। সেটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্যকে পাশে দাঁড়াতে হবে। এবং অবশ্যই আমাদের বৃহৎ শিল্পের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের অধরা কাজ আমরা করার চেষ্টা করবই। পরিস্থিতি তার অনুকূল নেই। কিন্তু কেবল ছোট ও মাঝারি শিল্প যথেষ্ট নয়। বৃহৎ শিল্প দরকার, প্রতিকূল পরিস্থিতি হলেও বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে বড় শিল্পের রূপায়ণের সম্ভাবনাকে দেখতে হবে।

এছাড়াও তফসিলি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, মহিলা, এদের জন্য যে উন্নয়ন কর্মসূচি ছিল, স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, তাদের কেউ নিজেদের ব্যাঙ্কও তৈরি করতে পেরেছিল, নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছিল, সেই সব উদ্যোগ এখন ভেঙেচুরে গিয়েছে। এটাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এই অংশের মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন দরকার। তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্প, অনেক লড়াই করে যা আদায় করতে পেরেছিলাম কেন্দ্রের কাছ থেকে, সেগুলির অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করে, ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করতে হবে।

এরসঙ্গে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারই এটা করেছিল পঞ্চায়েত পৌরসভার নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে। সম্পদের বন্টনের জন্য স্টেট ফিনান্স কমিশন করা হয়েছিল। তাকে পুনরুজ্জীবিত করে সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। গ্রামসভা থেকে ওয়ার্ড সভা, তাতে মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে, পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ, তার নজরদারি, স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে হবে। এসবের জন্য দরকার গণতান্ত্রিক কাঠামো, বিরোধীদের কাজের ক্ষেত্র, তাদের অধিকার যেন প্রসারিত হতে পারে, তার জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও রাজ্যস্তরে স্পষ্ট হতে হবে।

রাজ্যে কিছু বিশেষ এলাকা আছে, যেমন পাহাড়ে সংবিধান সম্মত বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, যা এই সরকার করেনি। আমরা সংবিধানের তফসিল অনুসারে পাহাড়ে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন এরা রাজ্য সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে নির্ভরশীল থেকে গিয়েছে। আমরা চাই সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্বশাসনের অধিকার দিতে পাহাড়ে। অন্যান্য বিভিন্ন জনজাতি ও তাদের ভাষা রয়েছে, তাদের নিজস্ব সমস্যাও আছে। তাদের জন্য আমরা যে কাজ শুরু করেছিলাম সেগুলো আবার পুনর্গঠিত করতে হবে। পশ্চিমাঞ্চল, সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের কাজ, পরিকল্পিত নগরায়নের কাজ এখন দিশাহীন। সেগুলো ঢেলে সাজানো দরকার, পুনর্গঠন করতে হবে।

এছাড়াও গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হলো, বিরোধী রাজনৈতিক মতের অধিকার। কোনও কারণেই সরকার প্রতিহিংসামূলক হতে পারে না, তা সুনিশ্চিত করতে হবে যা প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে সরকারে এসেই করেছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিয়ে। সেই ঐতিহ্যকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। হাজার হাজার মিথ্যা মামলা থেকে এখনও মুক্তি দিতে হবে। এছাড়াও খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা দরকার, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করছি। একটা খসড়া প্রকাশ করে মতামত নিতে চাই। তার ভিত্তিতে একটা বিকল্পের জন্য লড়াই করতে হবে, এটা নিছক ভোটের ব্যাপার নয়। একটা বিকল্পের জন্য সংগ্রাম। সারা দুনিয়া, দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, রাজ্য কোন অবস্থায় আছে, সেই দিকে তাকিয়ে সব সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতাকে বিচারের মধ্যে রেখেই এখন কী কী বিকল্প রূপায়ণ করা যায়, তার ওপরেই জোর দিতে হবে। এটা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর মতো প্রতিশ্রুতির গল্পকথা বা ভাঁওতা নয়। বামপন্থীরা বা বিকল্প শক্তি সরকার গড়লে প্রকৃত বিকল্প কি হাজির করতে পারে তার জন্য সংগ্রাম। নির্বাচন কবে আসবে তার জন্য বসে থাকলে চলবে না। বিকল্পের জন্য সেই সংগ্রাম চলছে, লড়াই হচ্ছে বিকল্পের দাবি নিয়েছে। সেই সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে নিয়ে যেতে হবে। নির্বাচন একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম। সেটা খালি বিধানসভা বা পঞ্চায়েত পৌরসভার ভিতরের নয়, মাঠে ময়দানের লড়াই। সংসদের ভিতরের ও বাইরে লড়াই। বাইরের লড়াই থেকেই সংসদের ভিতরের লড়াই তীব্র হয়। তাই বাইরের লড়াইকে শক্তিশালী করতে হবে। সেই সংগ্রামের সংগঠন প্রতিটি বুথ জনপদ পর্যন্ত গড়ে তুলতে হবে এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এটাই হলো আমাদের সামনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তৃণমূল ও বিজেপি'কে পরাস্ত করাই বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র চাহিদা ও প্রধান কর্তব্য। বিকল্প হিসাবে একটি ন্যূনতম বিনম্র কর্মসূচির ভিত্তিতে বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির একটি বিকল্প সরকার গঠনই পারবে বাংলাকে সর্বনাশ থেকে রক্ষা করতে।

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন: ফিরে দেখা

বিমান বসু

১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট বাংলা তথা ভারতের গণআন্দোলনের একটি মাইলফলক। ৬১ বছর আগে এই দিনটিতে দুপুর দেড়টায় সেই সময়কার অক্টারলোনি মনুমেন্ট যা আজকে শহীদ মিনার হিসাবে পরিচিত, সেখানে বাংলার বুভুক্ষু মানুষের এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঠিক ছিল, স্বল্প সময়ে বক্তব্য রেখে মহামিছিল মহাকরণের দিকে যাবে। কিন্তু তৎকালীন সরকার বহু ট্রেনের সময় হঠাৎ পরিবর্তন করায় ব্যাপক গ্রামবাংলার মানুষের বিভিন্ন লোকাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছাতে বিলম্ব ঘটে। উল্লেখ্য, ঐদিন দুপুরে কিছু সময়ের জন্য বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে অনেক পরে স্বল্পসময়ের সভা অনুষ্ঠিত করে পৌনে চারটার সময় মিছিল শুরু হয়। ওই দিন ওই মিছিলে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কমরেড জ্যোতি বসু সহ প্রথম সারির অনেক নেতাই অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাঁরা আত্মগোপনে ছিলেন বলেই এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেননি।

গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে দেশভাগের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে আসায় এ-রাজ্যে খাদ্য ঘাটতি হয়। আবার কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় খাদ্য ঘাটতি মেটাতে না পারা এবং চটকলগুলিতে পাট সরবরাহ করতে ধীরে ধীরে চাষের জমিতে পাট চাষ শুরু করায় খাদ্য সঙ্কট অব্যাহত ছিল। অন্যদিকে, চালকল মালিক, পাইকারি ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের খাদ্যশস্যের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজ্যে নির্বাচিত সরকার থাকা সত্ত্বেও চালকল মালিক ও মজুতদারেরা সরকারের নির্দেশ অনুসারে তাদের দেয় লেভি সরকারকে দিত না। ফলে খাদ্যের কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করার সুযোগ ছিল কালোবাজারিদের। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ১৯৫৪ সালে সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ড. সুরেশ ব্যানার্জিকে সভাপতি করে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে উঠেছিল। বলা চলে এই সময় থেকেই রাজ্যে খাদ্য আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৫৮ সালে রাজ্যে তীব্র খাদ্যসঙ্কট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিরোধে আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ‘মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি’ নতুন করে গঠিত হয় এবং আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়। কিন্তু ১৯৫৮-সালের ‘মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি’-র আন্দোলন বাংলার

জনগণের মধ্যে তেমনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৯৫৮ সালে খাদ্য আন্দোলনের পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছিল যে গ্রামবাংলা ও শহরগুলিতে অসাধু ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে এবং খাদ্যের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে দুর্বল প্রচার মূলত দায়ী। ১৯৫৯ সালে এই কমিটি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে স্থির করে ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে প্রচার সংগঠিত করে ব্লক অফিসে মূল্যবৃদ্ধিরোধ ও জনগণের মুখে খাদ্য জোগানোর দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং ব্লক অফিসে দাবিপত্র পেশ করতে হবে। অনুরূপভাবে এপ্রিল-মে মাসে মহকুমা ভিত্তিতে মহকুমাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করতে হবে। সব ক্ষেত্রেই সমাবেশ সংগঠিত করে তা করতে হবে। আরও স্থির হয়েছিল, জুন মাসের ২০ তারিখের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র কৃষকসহ সমাজের সব স্তরের মানুষকে যুক্ত করে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করতে হবে। ২৫জুন রাজ্যব্যাপী হরতাল-ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। স্থির হয়েছিল, শ্রমিক-কর্মচারী-ছাত্র-যুব-মহিলা ও সংস্কৃতিকর্মীদের মিলিত উদ্যোগে ১০ আগস্টের মধ্যে জেলাগতভাবে প্রচারের শীর্ষে সমাবেশের মাধ্যমে জেলাশাসকের কাছে দাবিপত্র পেশ করতে হবে। আর ৩১আগস্ট কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। একইসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছিল, ৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় সারা রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট করেই সরকারের অমানবিক ও জনবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদী কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

১৯৫৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিল, ‘‘আমরা মনে করি এখনও সময় আছে। এখনও সর্বনাশ ঠেকানো যায়। কারণ, বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান চাল এখনও বড় বড় মিল মালিকদের, পাইকারি ও মজুতদারদের হাতে চলিয়া যায় নাই। ১) ৫লক্ষ টন সরকারি মজুতভাণ্ডার, ২) কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ ঘাটতিপূরণ, ৩) সর্বত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত খাইবার যোগ্য চাউল সরবরাহ, ৪) খুচরা বিক্রেতাদের জন্য চাউলের ব্যবস্থা, ৫) মিলমালিক ও পাইকারদের খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স বাতিল ও তাহাদের খুচরা দোকানদারদের চাউল সরবরাহ করিতে বাধ্য করা– এই ব্যবস্থাগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক।’’ কিন্তু বিধান রায়ের সরকার ছিল নির্বিকার। বিধানসভায় জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে স্মারকলিপি দেওয়ার পর রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য পথসভার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বিধান রায় সরকারের নীরব ও নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক অংশের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

তখনকার সময়ে রাজ্যের কী পরিস্থিতি ছিল তা ‘মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি’র পক্ষ থেকে জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, নিরঞ্জন সেন, মাখন পাল, তারা দত্ত ও নীহার মুখার্জির যুক্ত বিবৃতি থেকে কিছুটা অনুমান করা যাবে। তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি: ‘‘খোলাবাজারে চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা, চাউলের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, শস্যের ব্যাপারে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে, তাহাতে ‘দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি’ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। খাদ্যাবস্থায় এইরূপ অবনতি ঘটায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহা ক্রমশ ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করিতেছে। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ মুনাফারোধ আইন ও ধান-চাউলের মূল্যনিয়ন্ত্রণ আদেশ গত কয়েকমাস যাবৎ রাজ্যব্যাপী চালু ও বলবৎ রহিয়াছে। ইহা লক্ষণীয় বিষয় যে, ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত আইন ও আদেশকে লঙ্ঘন ও ফাঁকি দিয়া তাহাদের অসাধু কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছে এবং জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে।...সরকারের এইরূপ অসহযোগিতামূলক ও দলীয় মনোভাবের প্রতিবাদের কমিটি খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভা বর্জন করিতেছেন। কমিটির সুস্পষ্ট অভিমত, বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির অবনতির জন্য সরকারি নীতি ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দায়ী। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া কমিটি সরকারকে অবিলম্বে খোলাবাজারে চাউল সরবরাহ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইতেছে। কমিটি সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থা ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে চালু করার দাবি জানাইতেছে। কমিটি সরকারের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া জনসাধারণকে এই বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক করিয়া দিতেছে এবং খাদ্যাবস্থার অবনতি রোধের জন্য এবং ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য রাজ্যব্যাপী প্রবল জনমত ও আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইতেছে।’’

এরপর রাজ্যে ১ মার্চ ’৫৯ একইদিনে সর্বত্র পথসভার আয়োজন করে প্রচার সংগঠিত করা হয় এবং ৪ মার্চ কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ দেখে এবং সরকার জনগণের কাছে খাদ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য এপি জৈন কলকাতায় এলেন তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি ‘সহজ, স্বাভাবিক ও স্বস্তিদায়ক’। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যদের এরকম বাস্তবজ্ঞানশূন্য কথাবার্তায় রাজ্যবাসী যারপরনাই ক্ষুব্ধ হতে থাকলেন। ফলে ১৫ জুন রাজ্যজুড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্তার প্রতিবাদে মানুষ গর্জে উঠলেন। কলকাতায় ২০ ও ২১ জুন সর্বত্র প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৫জুন রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট সর্বাত্মকভাবে সফল হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যখন ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় ছিলাম, তখন যুক্ত বাংলায় বারবার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষ করে, স্বাধীনতার কয়েকবছর আগে ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ ‘গ্রেট ফেমিন’ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই দুর্ভিক্ষে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় ৩০ লক্ষের বেশি মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তখনকার দিনের মানুষদের কাছে শুনেছি, কাতারে কাতারে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে এসে আর্ত আবেদন করেছে, ‘মা, একটু ফ্যান দাও, একটু ভাত দাও!’ এ এক মর্মন্তুদ আর্তনাদ! বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের অনেকেরই প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে কৃত্রিমভাবে অভাব তৈরি করে মজুতদার ও কালোবাজারিরা দুর্ভিক্ষের পরিবেশ তৈরি করে নিজেরা মুনাফা লোটে। স্বাধীনতার পরেও এই একই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

এবার একটু দেখা যাক, ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট সত্যিকারের কী হয়েছিল? লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান শহীদ মিনারে তিন লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। আর ওই সমাবেশ যখন শহীদ মিনার থেকে সাড়ে তিনটে বা পৌনে চারটেয় সময় বেরিয়ে রাজভবনকে বাঁদিকে রেখে এবং

ডানদিকে সুরেন্দ্রনাথ পার্ককে রেখে দৃপ্ত মিছিল স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের একটু আগে পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিলের গতিরোধ করে। প্রায় দেড়ঘণ্টা পুলিশ কোনও নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। কেন গতিরোধ করা হলো, জিজ্ঞাসা করলে কোনও উত্তরও দেয়নি। আমরা যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে চেন করে সামনের দিকে ছিলাম, তারা স্লোগান দিচ্ছি, কিন্তু কী হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না। সূর্য যখন পশ্চিমদিকে প্রায় ডুবুডুবু, সেই সময় হঠাৎ ব্যাপকভাবে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া এবং একইসঙ্গে বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু হয়ে গেল। গ্রাম থেকে প্রথমবার আসা যাঁরা কলকাতার রাজপথে, তাঁরা তো আর রাস্তাঘাট চেনেন না! সবথেকে অসুবিধা হয়েছিল মহিলারা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের। সম্ভবত, ওইদিনই প্রথম কলকাতায় অতবেশি মহিলাদের অংশগ্রহণ হয়েছিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! যে যেদিকে পারছেন, ছুটছেন, জানেন না কোথায় যাচ্ছেন! অনেকে আকাশবাণীর দিকে, ময়দানের দিকে বা ধর্মতলার দিকে ছুটছেন তো ছুটছেনই! আমি কলকাতাবাসী হয়েও কাঁদানে গ্যাসের জ্বালায় কোনদিকে ছুটছি জানতাম না! হঠাৎ একটা দোকানের সামনে অর্ধেক দরজা বন্ধ এক ভদ্রলোক হাত ধরে টেনে তার দোকানের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল, আর বলতে লাগল, ‘বেটা, আঁখোমে পানি লাগা!’ কিন্তু আমি তো কিছু দেখতেই পাচ্ছি না। তা বুঝতে পেরে নিজেই বালতি থেকে দু’হাতে আঁজলা করে জল আমার চোখে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। পরে চোখ মেলতে পারার পর দেখলাম, একটু বয়স্ক লুঙ্গি পরা একগাল দাড়িসমেত এক ভদ্রলোক। এলাকাটি ছিল চাঁদনির একটি গলি। এখন যেখানে সুভাষ বসুর মূর্তি রয়েছে, সেখানে, আর পুরানো কার্জন পার্কে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) ব্যাপক মানুষ বিধান রায়ের পুলিশের নির্মম নিষ্ঠুর লাঠির আঘাতে শবদেহে পরিণত হয়েছে। আমার বন্ধু, কমরেড হরিনারায়ণ অধিকারী সুরেন্দ্রনাথ পার্কের ভেতরে আন্ডারওয়্যার পরা ও গেঞ্জি গায়ে মৃত মানুষের মতো পড়েছিল। তাঁর কাছে শুনেছি, লাঠির আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে যাঁরা গোঙরাচ্ছিলেন, তাঁদের লাঠি দিয়ে মাথাগুলো ফাটিয়ে দিয়েছিল। অধিকারী বলেছিলেন, যখনই আশপাশে পুলিশের ভারী বুটের শব্দ পেয়েছেন, তখনই চোখ বন্ধ করে দম আটকে মৃতের মতো পড়েছিলেন। অনেকে লেখেন, এমনকি কিছু বইতেও প্রকাশিত হয়েছে, ৩১ আগস্ট গুলি চলেছিল। সত্যি ঘটনা টিয়ার গ্যাস শেলিং-এর শব্দটা গুলির মতো শোনালেও তা তো গুলি নয়! সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা-৭টার মধ্যে ৮০ জনকে লাঠিপেটা করে খুন করেছিল বিধান রায়ের পুলিশবাহিনী। রক্তাক্ত আহত মানুষজনকে হাসপাতাল নিয়ে গেলে ডাক্তারবাবুরা অনেককেই বাঁচাতে পারতেন। এখানে উল্লেখ্য, মিছিলের শুরুর সময়তে যত পুলিশ ছিল, আক্রমণের সময়ে খুব কম হলেও তার দশ গুণ বেশি পুলিশকে মোতায়েন করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে একবার সোয়েটোতে পুলিশ লাঠির আঘাতে অনেক মানুষকে খুন করেছিল। সম্ভবত, ৩১ আগস্টে নিরস্ত্র, নিরপরাধ, বুভুক্ষু মানুষ খাদ্যের দাবিতে প্রতিবাদ জানাতে এসে দেড়-দু’ঘণ্টার মধ্যে ৮০ জনের শহীদীবরণের ঘটনা সারা পৃথিবীতে বিরল। ৫০ বছর পূর্তির সময় ২০০৯ সালে আমরা বেশ কিছু শহীদ পরিবারকে কলকাতার সভায় হাজির করেছিলাম, তাঁদের খোঁজখবরও নিয়েছিলাম। এই শহীদ পরিবারগুলির প্রতি আমরা যারা আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত আছি তাদের ঋণ অপরিসীম। এটা আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত। এবং তাদের সকলের সংবাদ রাখাও উচিত।

৩১আগস্ট, ’৫৯-কে ফিরে দেখার সময় আমাদের বিস্মিত হলে চলবে না। সারারাজ্যে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খাদ্য আন্দোলন পথ দেখিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মপ্রত্যয় থাকলে এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার রেখে জনগণের জীবনযন্ত্রণা লাঘব করার কাজে আত্মত্যাগ করতে হয় এবং ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার পথের পথিক হতে হয়।

বর্তমান কোভিড-১৯-র আক্রমণে যে অতিমারী পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রে মি. মোদীর সরকার ও রাজ্যে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির সরকার জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধা করতে না পেরে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। উভয় সরকার জনগণের মধ্যে জাত, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি সুকৌশলে করে চলেছে। সংবিধানের মর্মবস্তুকে ধ্বংস করে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের অধিকার হরণ করে এক দুর্বিষহ পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই-সংগ্রামকে কমিউনিস্ট, বামপন্থী ও বাম-সহযোগীদের দায়িত্ব হিসাবেই দেখতে হবে। যেভাবে সরকার গণতান্ত্রিক রীতি ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে শাসকদল তার বিরুদ্ধে যত রাজনৈতিক দল ও ধর্মনিরপেক্ষ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐক্যের বৃত্তটাকে বড় করা যায়, সেই পথেই চলা হবে আমাদের ইতিহাসনির্দিষ্ট কর্তব্য।

অবিলম্বে, সমস্ত বামপন্থী ও বাম সহযোগী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশ ও রাজ্যের সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতিসমূহ সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের সামনে তুলে ধরতে নিজস্ব দলের স্বাধীন কর্মসূচি এবং যুক্ত আন্দোলনের অংশ নিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকদিনের লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এবং রাজ্যসভায় গায়ের জোরে স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষিসংক্রান্ত বিলগুলি পাশ করিয়েছে যাতে কৃষকসমাজের সর্বনাশ হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্পোরেট ও বড় ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বাড়বে এবং কৃষক-খেতমজুরসহ সাধারণ মানুষ দুর্দশায় পড়বে। অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি ও তৃণমূল কংগ্রেস জনগণকে ভুল বোঝাতে রাস্তায় প্রচারে নামছে এবং প্রচারের নানা মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে, প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ভ্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে। তাই, আমাদের দায়িত্ব হবে জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা এবং সমস্যা নিয়ে স্থানীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। আবার খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে, এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মজুতদার-মুনাফাখোরদের পক্ষে দাঁড়াবে এ-ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। কৃষক-খেতমজুর, শ্রমিক সংগঠিত বা অসংগঠিতদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে শাসকশ্রেণি যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কর্পোরেট ও বড় ব্যবসায়ীদের লুটের রাস্তা মসৃণ করতে নীতিগ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে বড় লড়াই-সংগ্রামে আমাদের সকলকে যুক্ত হতে হবে।

ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনকে স্মরণে রেখে এখন আমাদের ‘মে হোয়াট কাম’ দৃষ্টিভঙ্গিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে।

গণসংগ্রাম ও শ্রেণি সংগ্রামকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে

মানিক সরকার

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যাত্রারম্ভের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক ছিল, আছে, থাকবে। এ বিতর্কের মূলে রয়েছে সূত্রপাত বা উত্থানের সময়ে এর বাহ্যিক চরিত্র বা ধরন নিয়ে। একে ভিত্তি করে একদল অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানী বলেছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে এর পথ চলা শুরু। একদল বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন এবং নেদারল্যান্ডে এর প্রাথমিক সংহত আধুনিক রূপ পরিস্ফুট হয়। এইসব কিছু থেকে এটা পরিষ্কার পুঁজিবাদ ইতোমধ্যে পাঁচ শতাব্দী অতিক্রম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বয়স কম হলো না।

কিন্তু বলার বিষয় হচ্ছে সুদীর্ঘ চলার ও অগ্রগতির পথে পুঁজিবাদ যে তার স্বর্ণ যুগকে পেছনে ফেলে এসেছে তার সময়ও একেবারে কিন্তু কম হলো না। শতবর্ষ অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে বিরোধ উৎপাদন শক্তির অগ্রগমন ও বিকাশ সাধনে পুঁজিবাদ বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল তার অবসান ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ফ্রান্সের প্যারিস দখল ও প্যারি কমিউন গঠন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল তাৎপর্যমণ্ডিত মৌলিক আঘাত। প্যারি কমিউন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল মাত্র বাহাত্তর দিন। কিন্তু এ যে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাছে সে সময়ে অশনি সঙ্কেত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার সুযোগ সেদিন যেমন ছিল না তেমনি

আজও নেই। বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না ফরাসি দেশের এই অবিস্মরণীয় বিপ্লবী সংগ্রামের অভ্যুদয় দিয়েই পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগের অভিযাত্রায় ছেদ নেমে এসেছিল। অপরদিকে সামনে চলে এসেছিল শোষিতের মরণজয়ী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির কালজয়ী পথ প্রদর্শকের বিপ্লবী ভূমিকা।

প্যারি কমিউনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছেচল্লিশ বছরের ব্যবধানে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল রাশিয়ার বুকে। উচ্ছেদ হয়েছিল জারের শোষণ ভিত্তিক অমানবিক শাসন ব্যবস্থা। প্যারি কমিউন যে স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিল সেই প্যারি কমিউনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাশিয়ার বুকে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবীদের বিপ্লবী মৈত্রীর ভিত্তিতে বাস্তবের মাটিতে অভ্যুদিত হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। প্যারি কমিউনকে বাদ দিয়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখবার সুযোগ নেই। বলা যায় ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাধা বন্ধনহীন আগ্রাসী স্বর্ণ দুয়ারের সামনে প্রত্যয় দৃঢ় বাধার প্রাচীর গড়ে দিল। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল।

পৃথিবী নতুন আবহে প্রবেশ করল। তৎকালীন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পরিসরে ঘটতে থাকল ক্রমপরিবর্তন। মেনে নিতে পারছিল না পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পুঁজির স্বার্থে, মুনাফার লক্ষ্যে, বাজারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ যেমন পৃথিবীর উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল ১৯১৪ থেকে ১৯১৮, তেমনি পরবর্তিত পরিস্থিতিতে দুই দশকের ব্যবধানে চাপিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে লক্ষ্য রেখে এ ছিল পৃথিবীকে গিলে ফেলার সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসিস্ত আগ্রাসন। বীরের রক্তস্রোতে ভেসে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত পৃথিবীকে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসন থেকে রক্ষা করল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান ঘটতে থাকল। একের পর এক স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় ঘটতে থাকল। সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটতে থাকল। পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিসরে শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকল। কিন্তু সব কিছুতে উলোটপালট ঘটে গেল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিপর্যয়ে। রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকল। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আমদানি করল নয়া স্লোগান– বিশ্বায়ন। এ ছিল পুঁজির বিশ্বায়ন। চালু হলো নয়া উদার অর্থনীতি। কিন্তু এত সবকিছু করেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার আজন্ম সমস্যা ও সঙ্কট থেকে রেহাই পেল না– পাচ্ছে না। পাবে না। পেতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই যে তার সমস্যার বীজ বা মৌলিক কারণ নিহিত রয়েছে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সমস্যার গভীরে যখন হাবুডুবু অবস্থা তখন তার থেকে বের হয়ে আসতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করে কোনও না কোনও বিশেষ ব্যবস্থা। এতে আপাত দৃষ্টিতে সমস্যার অবসান হবে বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থে সমস্যার নিরসন হয় না বা সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে নিস্তার পায় না। বরং একটা সমস্যা থেকে বের হতে গিয়ে নতুন অনুসৃত পদ্ধতি আর একটা সমস্যার সৃষ্টি করছে। সমস্যাকে গভীর থেকে গভীরতর করছে। এটা হতে বাধ্য। কারণ মুনাফা-অতিমুনাফা-সর্বাধিক মুনাফার লালসা যে পুঁজিবাদকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। একে বাদ দিয়ে তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কৌশল-পন্থা-প্রকরণ নির্ধারিত হয় না। তাই যা হবার তাই হতে দেখা গেছে এবং দেখা যাচ্ছে।

২০০৮ সাল থেকে গভীর অর্থনৈতিক মহামন্দার কবলে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। নানা দাওয়াইয়ের মাধ্যমে এখানে সেখানে সময়ের ব্যবধানে হয়তো কিছু পরিবর্তন বা উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। সাধারণভাবে সামগ্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ইতিহাসের এক দীর্ঘমেয়াদি মন্দার হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না বরং সমস্যা আরও গভীরতর হচ্ছে। কোভিড-১৯'এর অপ্রত্যাশিত মারণ থাবা সঙ্কটের এ ক্ষতকে আরও দগদগে করে তুলেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমানবিক লোভাতুর ঘৃণ্য চেহারাকে দেশে দেশে এবং পৃথিবীর সামনে দিবালোকে বেআব্রু করে দিচ্ছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, কোভিড-১৯'এর থাবা বিস্তারের পূর্ব পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী দেশসমূহে মন্দাক্রান্ত অর্থ ব্যবস্থার দায় ও ভার শ্রমজীবী সহ সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক-বাহকরা। তাদের মুনাফার ধারা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ শোষণ লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং কোনও কোনও দেশে জঙ্গি আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। কোভিড-১৯'এর হানা মানুষের উপর নেমে আসে প্রাণ সংহারী আক্রমণ হিসাবে। এর থেকে মানুষকে, বিশেষ করে শ্রমিক-শ্রমজীবীসহ আয়-উপার্জনহীন অসহায় মানুষদের রক্ষায় গুটিকয়েক দেশের ব্যতিক্রমী প্রাথমিক কিছু ব্যবস্থা বাদ দিলে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া মানুষকে ছেড়ে দিয়েছে অজানা ভবিষ্যতের হাতে। এরই পাশাপাশি কোভিড-১৯ আক্রমণের বিস্তার প্রতিহত করতে আগে পিছে শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হিসাবে লকডাউন পদ্ধতি অনুসরণের কারণে মন্দাক্রান্ত অর্থনীতি আরও বেহাল হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটাপন্ন ডুবন্ত জাহাজকে ভাসিয়ে রাখতে আবারও ব্যাপক অর্থনৈতিক আক্রমণ নামিয়ে আনে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। সবমিলিয়ে এ হচ্ছে উপর্যুপরি মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো দানবীয় আক্রমণ।

কিন্তু মানুষ নিশ্চুপ থেকে সব মেনে নিচ্ছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মননশীল অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানীরা নীরবতা ভেঙে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতা, অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে মুখর হচ্ছেন। বিকল্পের কথা বলতে শুরু করেছেন। শ্রমিক-শ্রমজীবীদের আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে। নতুন চেহারা নিচ্ছে। অন্যান্য অংশের বিশেষ করে মধ্যবিত্তরাও ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে শ্রমিক-শ্রমজীবীদের সংগ্রামের সাথে। চোখে পড়ার মতো হচ্ছে যুব অংশের সক্রিয় এবং পরোয়াহীন জঙ্গি মনোভাব। আওয়াজ উঠছে এই পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সামনে চলে আসছে বিকল্পের ভাবনা। এ থেকে জন্ম দিচ্ছে নতুন চেহারায় শ্রেণি ও গণআন্দোলন। এর প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আঙ্গিকে।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজবাদী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করার মতো অনেক কিছু উপস্থাপন করার, বলার, দেখাবার থাকলেও বর্তমান সময়ে এইসব কিছু বাদ দিয়ে কোভিড-১৯'এর বিষ ফণা থেকে মানুষকে বাঁচাতে এই কঠিন ও জটিল সময়ে মানুষের পাশে প্রকৃতই আন্তরিকতা নিয়ে দাঁড়াবার প্রশ্নে দুই সমাজ ব্যবস্থার ফারাক বুঝতে আবারও বিশেষভাবে সাহায্য করছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুধু নিজের দেশের মানুষকে সুরক্ষিত করতেই ব্যস্ত নয়। মানবিকতার

ডাকে সাড়া দিয়ে একাধিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক দায়িত্ব প্রতিপালনে নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি ও সামর্থ্য নিয়েই শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ ভুলে ছুটে যাচ্ছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পান্ডা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্যস্ত কোভিড মোকাবিলার ওষুধের আন্তর্জাতিক বাজার নিজের কুক্ষিগত করে অতিমুনাফা ও ঢালাও লুটের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে। মৃত্যু ব্যবসায়ী কাকে বলে! ভারতবর্ষে এ থেকে আলাদা কিছু হবে ভাববার সুযোগ নেই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত অনুজ সহযোগী বিজেপি দলের একটানা ছয় বছরের শাসন দেশকে সবদিক থেকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে। ব্যতিক্রম মুনাফা শিকারি মুষ্টিমেয় শোষকরা। কোভিডের আক্রমণের অনেক আগে থেকেই দেশের অর্থনীতি মন্দার করাল ছায়ায় প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কৃষিতে সঙ্কট। এর প্রভাব পড়ে শিল্পে। কর্মরতরা কাজ হারাতে থাকেন। নতুন কর্মপ্রার্থীদের কাজের সুযোগ নেই। বিরাট সংখ্যক মানুষের উপার্জন প্রায় বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিচে নেমে গিয়েছিল। চাহিদা কমে গিয়েছিল। বাজারের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে। পরবর্তীতে উৎপাদন ও জোগানের উপরও এর প্রতিফলন ঘটে। প্রতিফলন ঘটে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে। সবদিক থেকে দাবি উঠে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। রাষ্ট্রকে এ ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। কে শুনে কার কথা। বিজেপি সরকার ব্যস্ত শ্রমিক-কৃষক-যুবক-ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-দলিত সহ মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে একের পর এক কালাকানুন তৈরিতে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংস্র পরিকল্পিত আক্রমণে। আক্রমণ নামিয়ে এনেছে সার্বিকভাবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে। সংসদীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সর্বোপরি সংবিধানের বিরুদ্ধে। এই প্রেক্ষাপটে নেমে আসে কোভিড-১৯-এর আকস্মিক অভাবনীয় আক্রমণ। এ যাবৎ সব দেখে মনে হচ্ছে এ আক্রমণ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিবেচিত হচ্ছে নিদারুণ অভিশাপ হিসাবে। অপরদিকে এ যেন অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ শোষক-শাসকদের জন্য। এই যদি না হবে তাহলে কোভিড সংক্রমণ প্রতিহত করতে, আক্রান্তদের সুচিকিৎসার জন্য, চিকিৎসক সহ চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য সমাজের সব দিক থেকে সোচ্চার দাবি উত্থাপনের পরেও বিজেপি সরকার সদর্থক কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না কেন? আয় উপার্জনহীন দুঃস্থ মানুষদের জন্য অর্থ-খাদ্য-কাজ'এর ব্যবস্থা করছে না কেন? কোভিড আক্রমণের বিষয়টিকে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে লকডাউনের নামে সারা দেশকে গৃহবন্দি ও জেলখানায় পরিণত করে, মানুষের অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো একের পর এক হরণ করে, মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রেখে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি, কর্পোরেট পরিবার, বহুজাতিক সংস্থার লুটের সুযোগ দরাজ করে দিতে উদার অর্থনীতির অসম্পূর্ণ কর্মসূচি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একের পর এক কী করে কার্যকর করে চলেছে? মানুষের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা আছে? দায়বদ্ধতা তো শোষক ও লুটেরাদের স্বার্থরক্ষায়। ক্ষয়িষ্ণু পুঁতিগন্ধময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্ধ অনুসারী একটি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের কাছ থেকে এর ব্যতিক্রম কিছু আশা করা কি বাতুলতা নয়? কিন্তু ছেড়ে দেওয়া যাবে না। দেশে দেশে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষ সেখানে পিছিয়ে থাকবে কেন? বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্যকারণে জীবন ধারায় আবশ্যিক যে পরিবর্তন নেমে এসেছে তার গতি প্রকৃতির উপর অবশ্যই নজর রাখতে হবে। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, শোষণ-বঞ্চনার অবসানের জন্য প্রকৃত ও যথার্থ বিকল্পের জন্য সংগ্রাম থেমে থাকতে পারে না। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাজুয্য রক্ষা করে ভিন্ন ভাবনাচিন্তা কৌশল অবলম্বন করেই গণসংগ্রাম ও শ্রেণি সংগ্রামকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। ভারত অভ্যন্তরে এই সংগ্রামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশে দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষণমুক্তির সংগ্রামে পরিবর্তিত আবহে যে ঢেউ উঠেছে তাকে বেগবান হতে যেমন সাহায্য করবে তেমনি দেশের মাটিতে গণ ও শ্রেণি সংগ্রামের গুণগত পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে। এটাই পথ। এর কোনও বিকল্প নেই। এই পথ ধরেই এগতে হবে ইপ্সিতের লক্ষ্যে।

সঙ্কটের সময়েই পরিবর্তন ঘটে

মহম্মদ সেলিম

করোনা মহামারি উত্তর আমাদের পৃথিবী আর একই রকম থাকবে না। পৃথিবীর পরিবেশ পরিবর্তন, প্রকৃতির পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে মানুষের প্রকৃতির উপরেও, বৈশিষ্ট্যের উপরেও। দুনিয়া জুড়েই এই অতিমারি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, লেখালেখি চলছে। লিখছেন অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিকরা, তাঁরাও বলছেন মহামারি উত্তর পৃথিবী আজকের মতো আর থাকবে না। আমরা মার্কসবাদীরাও মনে করি দুনিয়া পরিবর্তনশীল। কিছু কিছু পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটে, কিন্তু প্রভাব বিস্তার করে অনেক বেশি।

মহামারির সময়েই দেখেছি আমাদের দেশের অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারা। মহামারির আগে থেকেই চলছে সঙ্কট। বামপন্থীরা বার বার চিহ্নিত করেছে অর্থনৈতিক সঙ্কটকে। কিন্তু কেন্দ্রের সরকার হেঁটেছে অস্বীকারের রাস্তায়। তারা মানতেই চায়নি অর্থনীতির বেহাল অবস্থার কথা। সরকার অস্বীকার করেছে, তথ্য গোপন করেছে। সরকার বারংবার বলে গিয়েছে অমুক ঋতুতে অবস্থার পরিবর্তন হবে, তমুক ঋতুতে অবস্থার ভোল পাল্টে যাবে। নিদারুণ সঙ্কটকে অস্বীকার করেও সরকার ফেরি করেছে মিথ্যা আশাবাদের কথা।

সাম্প্রতিকতম জিডিপি'র তথ্যে পরিষ্কার, বিশ্বের কুড়িটি দেশের মধ্যে অর্থনীতির হাল সব থেকে খারাপ আমাদের দেশের। শুধু নিম্নগামী জিডিপি নয়, প্রভাব পড়েছে মানুষের জীবন জীবিকার ওপর। কৃষিতে, শিল্পে, ছোট ব্যবসায়, স্বনির্ভর ব্যবসায়, পরিবহণ শ্রমিকদের মধ্যে, বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রে, পর্যটন ক্ষেত্র সহ সব ক্ষেত্রেই। প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই আর্থিক দুরবস্থা মানতে রাজি নন, কারণ স্বীকার করলে তাঁদের ব্যর্থতা মানতে হবে। তাঁরা মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির গল্প শুনিয়েছিলেন। এমনকি বাজেটের পরেও মহামারির সময় চলেছে কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজের নামে ভাঁওতা।

আর্থিক সঙ্কটের প্রভাব সর্বগ্রাসী হতে বাধ্য। বামপন্থীরা মহামারির শুরু থেকে স্পষ্ট করে বার বার জানিয়েছে মহামারি মোকাবিলার করার ব্যবস্থার কথা। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো দরকার, ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে অর্থনীতির চাহিদা বাড়ে। শিল্প উৎপাদন, কৃষি উৎপাদনের বাজার তৈরি হয়, ক্রেতা উপভোক্তা তৈরি হয়। বামপন্থীরা যেমন বারংবার দাবি জানিয়েছে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে তেমনি মানুষের হাতে সরাসরি অর্থ সাহায্য তুলে দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে লড়াইও চলছে।

বামপন্থীদের যা দাবি তার ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছে সরকার। মানুষের হাতে টাকা দেওয়ার পরিবর্তে বাজার থেকেই টাকা তুলে নিতে শুরু করলো সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের মহার্ঘভাতা বন্ধ

করা হল, পিএম কেয়ার্স ফান্ডের নামে টাকা তোলা শুরু হতে লাগলো। সরকারি খরচও কমলো, পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ কমালো। বিনিয়োগের বদলে ঘটতে শুরু করলো বিলগ্নি। রেল থেকে খনি, প্রতিরক্ষা থেকে জীবন বীমা। মোদী নিজে বলেছেন সঙ্কটকে সম্ভাবনায় পরিবর্তন করতে হবে! তার চেহারা কেমন আমরা দেখলাম চিকিৎসা ব্যবস্থায়। সরকারি চিকিৎসা কাঠামো কার্যত ভেঙে পড়েছে, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নতির বদলে সরকার হাত গুটিয়ে নিয়েছে, চিকিৎসা ক্ষেত্র পুরোটাই চলে গিয়েছে বেসরকারি হাতে। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবীমার প্রয়োজনীয়তার কথা যা বলেছেন যা ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের মত জনবহুল দেশে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামোর উন্নতি না করে মহামারি সামাল দেওয়া যায় না। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও তাই দেখা যাচ্ছে ।

মানুষের আগে যারা মুনাফাকে বসায়, শিক্ষায় স্বাস্থ্যে যারা মুনাফা খোঁজে সেই সব দেশগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে মহামারি মোকাবিলায়। মহামারির সময়ও চলেছে মুনাফা নির্মাণ। আমাদের দেশে দেখছি যখন মানুষের আয় কমেছে, যখন পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে মজুরি হারিয়ে নিরন্ন হয়ে ঘরে ফিরেছেন সরকার তাঁদের পাশে নেই। সরকার আম্বানি-আদানিদের মুনাফা বৃদ্ধির সেবায়, বৃহৎ পুঁজির সম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যস্ত ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন নিদারুণ সঙ্কটে, ছন্নছাড়া অবস্থা, মানুষের জীবনের যখন ছন্দপতন হয়েছে তখন নতুন করে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবন, ছন্দ ফিরিয়ে আনার বদলে এই মহামারির সুযোগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ শানালো। বিরোধী স্বরকে থামানোর জন্য শুরু হলো একের এক মিথ্যা মামলা, একের পর এক ষড়যন্ত্র। যা স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ করতো তাই এখন করছে মোদী সরকার। যারা সরকারের পক্ষে তাদের জন্য আইন এক রকম আর বিরোধীদের জন্য মিথ্যা মামলা, ধরপাকড়। জেএনইউ-এর পড়ুয়া থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী ছাড় পাননি কেউই।

দিল্লি দাঙ্গার চার্জশিটে নাম যুক্ত করা হয়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সরকারের বিরোধী ভাষ্যের মানুষদের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, দিল্লি পুলিশের যেন একটাই কাজ ঝুটা মামলা দেওয়া। এই ষড়যন্ত্র টিকবে না। মহামারি মোকাবিলায় যখন সবার সাহায্য দরকার, যখন এক দেশ আরেক দেশের পাশে দাঁড়াচ্ছে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় ভাইরাসের, তখন ঠিক উল্টো কাজ করেছে সরকার। বিভিন্ন কর্পোরেট মিডিয়াকে ব্যবহার করে মহামারির সময়েও ধর্মের নামে ভাগ করার কাজ চলেছে, তবলিঘি জামাতকে দায়ী করা হয়েছে। আসলে সবটাই করা হয়েছে মূল সমস্যা, সঙ্কট থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য। যখন দরকার স্যানিটাইজার-মাস্ক-পিপিই-টেস্ট-ওষুধ-হাসপাতালের বেড-ভেন্টিলেটর, সেই সময় সরকার এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়কে লড়িয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল।

যখন পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি করোনা মোকাবিলা করে মহামারিকে সামাল দিতে সফল হল, কিউবার মত ছোট্ট দেশ সংহতির হাত বাড়িয়ে দিল বাকি দেশগুলির দিকে তখন আমাদের দেশে চলছে পারস্পরিক দোষারোপ, তথ্য গোপনের মাধ্যমে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টায়। কিন্তু সত্য চাপা দেওয়া যায় না এখন। আমাদের দেশ এখন সংক্রমণের নিরিখে আমেরিকাকে ছাপিয়ে প্রথম হওয়ার দিকে। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, কালকের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাচ্ছে আজকের রেকর্ড। সরকার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল 'সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং'র, যাতে সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষ সংগঠিত হতে না পারেন। কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠতে না পারে।

কোন প্রশ্ন করাও যাবে না, নিদান দিয়েছে সরকার। সংসদে প্রশ্ন করা যাবে না, বিধানসভায় না, সাংবাদিক সম্মেলনে না। এমনকি মিডিয়ায় যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন হাজির করবেন, বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্ন তুললে, চিকিৎসকরা প্রশ্ন তুললে দমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছে সরকার।

এর ঠিক বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে বামপন্থীরা। বামপন্থীরা প্রথম থেকে বলেছে, ভাইরাস মোকাবিলায় হোক 'ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং' কিন্তু হোক 'সোশ্যাল সলিডারিটি'ও। বিপদের সময় আরও জোট বেঁধে থাকতে হয়। শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকুক কিন্তু সামাজিক সংহতি অক্ষুন্ন থাকুক। ভাবনার দিক থেকে, সহমর্মিতার দিক থেকে সহযোগিতার দিক থেকে এককাট্টা থাকার প্রয়োজন। সরকার ঘৃণা ছাড়াতে ব্যস্ত, ধর্মের নামে কখনো কোভিড আক্রান্ত রোগী ও তাঁর পরিবারকে একঘরে করার নামে, কখনো ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিলেন বানানোর নামে। তখন বামপন্থীরা ছিল মানুষের সাথে, মানুষের পাশে। বামপন্থীরা পাড়াব পাড়ায় মাস্ক বিলি করেছে, স্যানিটাইজার বিলি করেছে, সস্তায় স্যানিটাইজার বানিয়েছে। বামপন্থীরা কমিউনিটি কিচেন চালিয়ে গরিব মানুষকে খাবার দিয়েছে, বিনামূল্যের সবজি বাজার চালিয়েছে, হাসপাতাল স্যানিটাইজ করেছে, কৃষকদের ফসল তুলে দিয়েছে, ঘরে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের কোয়ারিন্টিন সেন্টারে খাবার যুগিয়েছে। পাড়ায়, সরকারি অফিসে, রাস্তার মোড়ে স্যানিটাইজ করেছে নতুন তরতাজা ছেলেমেয়েরা, মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে 'রেড ভল্যান্টিয়ার্সরা। এখনও চলছে বামপন্থীদের কর্মকাণ্ড। প্রতিদিন নতুন কিচেন চালু হচ্ছে, শ্রমজীবী ক্যান্টিন চালু হচ্ছে।

চারের দশকের বাংলার মন্বন্তরের সময়েও মানুষের পাশে ছিল বামপন্থীরা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেদিন ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী আর অভিধানে যুক্ত হচ্ছিল কালোবাজারি, মজুতদারি, মুনাফাখোরের মত শব্দ। ফড়ে, মুনাফাখোরদের ছিল বাড়বাড়ন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনার জন্য বাংলার খাদ্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন মজুতদার, কালোবাজারিদের পক্ষে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ গত সত্তর বছরে তাঁর নাম মুখে আনেনি, এখন নতুন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম পরিচিত করে তোলার চেষ্টা চলছে। সেই সময় খাদ্যের সঙ্কটে চল্লিশ লক্ষ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা গিয়েছিলেন। রাস্তায় পড়ে থাকতো ভুখা মানুষের লাশ। তখনই জন্ম নিয়েছে লঙ্গরখানা, তখন এগিয়ে এসেছে আইপিটিএ। গানে কবিতায় উঠে আসছে মানুষের আকালের ছবি, ছবি আঁকছেন জয়নাল আবেদিন, সোমনাথ হোড় প্রমুখেরা । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠানের মারফত সংহতি গড়ে তুলছেন গণনাট্যের শিল্পীরা। পাঞ্জাবের কৃষক সভা ট্রেন ভর্তি খাবার পাঠিয়েছিল বাংলার মানুষের জন্য। সেদিনের লঙ্গরখানা আজ হয়েছে কমিউনিটি কিচেন। বামপন্থীরা বরাবরই ছিল মানুষের পাশে, স্বাধীনতার আগে সেই সময়ের সঙ্কটেও। আজকের মহামারির সঙ্কটের সময়েও মানুষের পাশেই বামপন্থীরা।

মহামারির সময়েও এরাজ্যে বিজেপি চালিয়ে গিয়েছে সাম্প্রদায়িক প্রচার, বিভাজনের রাজনীতির চেষ্টা চালিয়েছে। উড়ে খবর, গুজব ছড়ানো হয়েছে আইটি সেল, সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে। মহামারির আবহেও চন্দননগরের তেলেনিপাড়ায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সামাজিকভাবে মানুষ ছিলেন মানুষের পাশে। মানুষ সংহতির বার্তা দিয়েছেন। করোনা আবহে বন্ধ ছিল সংসদ, বন্ধ ছিল বিধানসভা। সরব ছিল গুজব। কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না, কর্পোরেট মিডিয়া থাকবে সরকারের পাশে। সেই সময় দেশের সম্পদ বিক্রির খেলায় নামলো সরকার। রেল বিক্রির সিদ্ধান্ত, খনি বিক্রির সিদ্ধান্ত, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানা বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ানো হল, সরকার রেল চালাতে পারে না অথচ প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দামের সঙ্গে কৌশলে যাত্রীভাড়া বাড়ানো হল।

কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী দেশবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মানুষ বসে থাকেননি। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। সংসদের বাদল অধিবেশনে গায়ের জোরে পাশ করানো হয়েছে তিনটি কৃষি বিল, পাশ করানো হয়েছে তিনটি লেবার কোড বিল। অত্যাবশকীয় পণ্য আইন সংশোধনের ফলে ইচ্ছে মত ধান, গম, আলু, পেঁয়াজ মজুত করতে পারবে বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। চলতি বাজারেই ফড়ে আড়ৎদাররা যে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে তাকে সরকারি বৈধতা দিল কেন্দ্র। কৃষকদের কর্পোরেটদের দিনমজুর বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে নয়া কৃষি আইনে।

কৃষি বিলের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদ নেমে এসেছে আলপথ থেকে জাতীয় সড়কে। অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ। কৃষক সংগঠনগুলি একযোগে রাস্তায়। কার্যত বনধের চেহারা নিয়েছে পাঞ্জাব হরিয়ানার মত রাজ্যগুলি। চলতি সময়ের মধ্যেই আমরা দেখছি পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে, সময়ের পরিবর্তন ঘটছে। সময় একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। উত্তাল হয়ে উঠছে দেশ নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে, এটিই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে, সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে কার কি ভূমিকা মানুষ যাচাই করে নিয়ে পক্ষ নেবেন।

একাজে এগিয়ে আসতে হবে বামপন্থীদের। বামপন্থীদের মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে পৌঁছতে হবে মানুষের কাছে। মানুষের অভাব অভিযোগ সমস্যার মোকাবিলার পাশে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সংগঠিত করতে হবে, সক্রিয় করতে হবে লড়াই সংগ্রামে। সরকার চাইছে মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে। আমাদের দায়িত্ব মানুষকে সক্রিয় করে তোলা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমস্যা সংকট তাই মোকাবিলা করতে হয় যূথবদ্ধভাবে। সরকার যখন বলছে এক দেশ এক কর, এক দেশ এক রেশন তখন কেন জাতীয় সম্পদ সবার হবে না। এটাই আসল লড়াই। দুনিয়াব্যাপী দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদীদের সঙ্কটের সময় মোকাবিলা করতে গিয়ে পুঁজিবাদীদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে দেশে দেশে সরকারগুলি। ২০০৮'র সময় থেকে সঙ্কট বাড়লেও পুঁজিপতিদের সম্পদ বেড়েছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়েছে। এই সঙ্কটের সময়েও পুঁজিবাদের সঙ্কট বেড়েছে অন্য দিকে সাধারণ মানুষ ডুবে গিয়েছেন দারিদ্র্যের অন্ধকারে।

জনগণ চায় এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে, জনগণ চায় ভালোভাবে বাঁচতে। ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই সমতা, সাম্য, সম্পদের সম বন্টন, সমান অধিকার। কমিউনিটি কিচেনগুলি যা স্লোগান তুলছে 'কেউ খাবে আর কেউ খাবে না' তা হবে না, এই স্লোগানকে বাস্তবায়িত করতে হবে। শুধু নিজের জন্য নিজের প্রাণ আগলানোর জন্য লড়াই করলে কেউই নিরাপদ থাকবেন না। সবাই মিলে বাঁচার জন্য তাই যূথবদ্ধতা। মানব সভ্যতার ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে এরকম সঙ্কটের সময়ই পরিবর্তন ঘটে, এভাবেই বারেবারে রাজনৈতিক সমাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপে প্লেগের সময় দেখা গেছে সমাজে রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। ঝুটা প্রতিশ্রুতির হোর্ডিং'র পরিবর্তন নয়। সব মানুষের আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করতে, সমানাধিকার, সমতার সমাজ নির্মাণে বামপন্থীদেরই কার্যকরি ভূমিকা নিতে হবে। আলপথের শেষে সাঁকো নির্মাণ করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সংগঠন এবং আন্দোলনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

K I C METALIKS

is a leading producer & exporter of Pig Iron Castings
and Portland Slag Cement having manufacturing facilities
at Durgapur in West Bengal

KIC METALIKS LTD.

Regd. Off. : 25A Shakespeare Sarani, Kolkata 700017 (INDIA)
Phone : #91-33-22836354/55/56/57/58, Fax : #91-33-22836360
Email : info@kicmetaliks.com Website : www.kicmetaliks.com
Factory : Raturia, Angadpur, Durgapur 713215
Phone : 3432590723/20 Fax : 03432590720

Govt. Recognised golden Export House

বিশ্বায়ন ও ধনতন্ত্রের সঙ্কট

প্রভাত পট্টনায়েক

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, ধনতন্ত্রের বর্তমান সঙ্কট শুধুমাত্র করোনা মহামারীর জন্য। এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, মহামারী ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সমূহ ক্ষতি করেছে। কিন্তু পাশাপাশি আরও বড় সত্য হলো, মহামারীর আগেও এই সঙ্কটের অস্তিত্ব ছিল, মহামারীর পরেও এই সঙ্কট থাকবে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, দীর্ঘকালীন সময় ধরেই থাকবে। এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ একটাই– সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে সেই সময়ে, যখন নয়া উদার অর্থনীতি ছুঁয়েছে তার চরম সীমা। আমরা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিভিন্ন প্রকাশকে নিয়ে আলোচনা করব এই নিবন্ধে।

১

বর্তমান বিশ্বায়নের আগেও যদি আমরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আলোচনা করি, তবে তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে ধরা পড়বে। প্রথমত, শ্রমশক্তি কোনও দিনই দক্ষিণ (অনুন্নত) অর্থনীতি থেকে উত্তর (উন্নত) অর্থনীতিতে বিনা বাধায় যেতে পারেনি এবং আজও পারে না।

দীর্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দী, যাকে আমরা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অবধি প্রসারিত করতে পারি, সারা বিশ্ব জুড়ে প্রত্যক্ষ করেছে দু'-দু'বার অভিবাসী বা দেশান্তরিত হওয়ার উত্তাল ঢেউ। প্রথম দেশান্তরিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যখন ইওরোপ থেকে সাদা চামড়ার মানুষরা কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং জোর করে জমির উপর অধিকার কায়েম করে সেখানকার আদি অধিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেন। এইভাবে তাঁরা যেমন একদিকে নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমন তাঁদের স্বদেশে শ্রমশক্তির অভাব মূল মজুরি বৃদ্ধিতেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। একে বলা যায় উচ্চ মজুরিভুক্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল থেকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অভিবাসন বা দেশান্তর।

পুঁজির প্রয়োজনে বা বলা যায় পুঁজির নির্দেশে দেশান্তরিত হওয়ার দ্বিতীয় জোয়ার আমরা লক্ষ্য করি ভারত বা চীনের মতো গ্রীষ্মপ্রধান বা প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, মানুষজন স্থানান্তরিত হন অন্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এবং নিযুক্ত হন কুলি বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে খনিতে, খেত-খামারে বা নির্মাণ শিল্পে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, যে দেশগুলিতে দেশান্তরের ঘটনা ঘটেছিল, তারা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছে শিল্পে ব্যাপক বিপর্যয় এবং ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের পতন। আর সেই জায়গা দখল করেছে বৃহৎ পুঁজির মাধ্যমে উৎপাদিত বড় বড় শহর থেকে আমদানি করা পণ্য। তার ফলে কর্মচ্যুত হয়েছেন বহু মানুষ, অভূতপূর্ব চাপ পড়েছে দেশের সীমিত পরিমাণ জোত-জমির উপর। এরই পাশাপাশি অস্বাভাবিক হারে প্রকৃত মজুরির সঙ্কোচন ঘটেছে। সুতরাং দ্বিতীয় দফাকে আমরা অভিহিত করতে পারি মূলত নিম্ন মজুরি ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল থেকে অন্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে অভিবাসন বলে।

প্রতিটি দেশান্তরের ঢেউয়ে যুক্ত ছিলেন প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ। কিন্তু তাঁদের সবাইকে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের শ্রমিকদের অবাধে যেতে দেওয়া হয়নি ইওরোপে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, যেখানে সাদা চামড়ার মানুষরা বসতি স্থাপন করেছেন, সেখানেও তাঁদের যাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এমনকী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অনুন্নত থেকে সমৃদ্ধশালী দেশগুলিতে যে ব্যাপক হারে অভিবাসন ঘটেছিল, তাও ছিল পুঁজির প্রয়োজনে ভীষণভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক কথায়, শ্রমশক্তির অবাধ যাতায়াত কোনও কালেই ছিল না।

বিশ্বায়ন-পূর্বের ধনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পুঁজিকে কিন্তু কোনও দিনই উন্নত অর্থনীতি থেকে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করা হয়নি। এর জন্য কোনও আইনগত বাধা ছিল না। পুঁজির সামান্য বিনিয়োগ ঘটেছিল শুধু মাত্র আবাদের কাজে, খনিজ শিল্পে, রপ্তানির ক্ষেত্রে বা রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণে, যেমন রেলে (যেখানে অদ্ভুতভাবে বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ঔপনিবেশিক শাসকরা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকত)। কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ঘটেনি উৎপাদন শিল্পে, যদিও অনুন্নত অর্থনীতিতে প্রকৃত মজুরি ছিল খুবই কম। তাই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী বাজারের চাহিদা মেটাতে উল্লেখিত দেশগুলি উৎপাদনের মূল কেন্দ্র হতে পারত এবং এর ফলে উৎপাদন শিল্প অবশ্যই অনেক বেশি লাভজনক হতো। কেন উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত অর্থনীতিতে উৎপাদন শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ হয়নি, সে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা আর সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করব না। শুধু মনে রাখব যে, পুঁজি উন্নত থেকে অনুন্নত অর্থনীতিতে যায়নি। সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদিও কোনও আইনগত বাধা ছিল না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, অনুন্নত দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর উন্নত দেশগুলির বিপুল হারে শুল্ক ধার্যের ব্যবস্থা। এর ফলে নতুন দেশীয় উদ্যোগপতিরা ঔপনিবেশিক শাসনের হরেক বাধা অতিক্রম করে হয় তো কোনওক্রমে একটা শিল্প স্থাপন করতে পারলেন, কিন্তু উন্নত দেশে তাঁদের পণ্যের প্রবেশের সুযোগ আগেভাগেই রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল শুল্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে। তাঁরা বাধ্য হয়েই শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন এবং সেখানেও যাবতীয় সংরক্ষণের অভাবে তাঁদের অসম লড়াই লড়তে হতো বিদেশ থেকে আগত পণ্যের সঙ্গে।

এই তিনটে বৈশিষ্ট্যের নিট ফল— বিশ্ব অর্থনীতির দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অনুন্নত অর্থনীতির বিপুল অব্যবহৃত শ্রমশক্তির উন্নত অর্থনীতির প্রকৃত মজুরিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সচল রাখতে উন্নত অর্থনীতিতে সব সময়ে মজুত থাকত অব্যবহৃত শ্রমশক্তি (পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাস্তবে মজুত অব্যবহৃত শ্রমশক্তি ব্যতীত অচল)। এরা উন্নত দেশের প্রকৃত মজুরিকে হয় তো অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল যে, তাদের প্রভাবে কোনও দিনই উন্নত দেশের প্রকৃত মজুরি জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়নি।

বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে বলা যায় যে, বিশ্বের পুঁজিবাদকে সচল রাখতে শ্রমশক্তির দু'টি মজুত বাহিনী রয়েছে। একটি 'উত্তর'-এ, যার আকার তুলনামূলকভাবে ছোট এবং যার অস্তিত্ব উত্তরের মজুরিকে কিছুটা সংযত করলেও মজুরি বৃদ্ধিকে কখনই প্রতিহত করে না, কেননা ট্রেড ইউনিয়নের চাপে মজুরির সেখানে বৃদ্ধি ঘটে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। অন্যদিকে, শ্রমশক্তির বিপুল মজুত রয়েছে 'দক্ষিণ'-এ এবং যার ফলে দক্ষিণের মজুরি কখনই শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। আবার শ্রমশক্তির এই বিভাজনের দরুণ দক্ষিণের মজুত শ্রমশক্তি উত্তরের মজুরির বৃদ্ধিকে আটকাতে পারে না। সুতরাং, মূল বিষয়টি হলো, উত্তরের প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দক্ষিণের প্রকৃত মজুরি বিপুল শ্রমশক্তির চাপে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণেই বাঁধা পড়ে থাকে। শ্রমশক্তির বিভাজন অর্থনীতিতে জন্ম দিয়েছে স্থানীয় স্তরে বৈপরীত্যের এবং সাধারণভাবে আমরা একেই অভিহিত করি উন্নত ও অনুন্নত অর্থনীতি বলে।

এর পাশাপাশি প্রকৃত মজুরির এই বৃদ্ধি 'উত্তর'-এ অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। প্রকৃত মজুরি ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি চাহিদার অভাবজনিত সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করেছিল।

প্রকৃত মজুরি ও তার সঙ্গে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে চাহিদার অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধের আবশ্যিক শর্ত নয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে অনেকটা সাহায্য করে এবং সব সময়ে সামগ্রিক চাহিদার স্তরকে যে কোনও বিনিয়োগ থেকে উদ্ভূত চাহিদার স্তরের উপরে রাখে ।

২

বর্তমান বিশ্বায়ন পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্তরের ও দক্ষিণের তথাকথিত বিভাজনকে ভেঙে দিয়েছে। যদিও এখনও শ্রমিকরা 'দক্ষিণ' থেকে 'উত্তর'-এ অবাধে যেতে পারেন না, কিন্তু পুঁজি উত্তর থেকে দক্ষিণের কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে এবং এই রপ্তানির পণ্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে উত্তরের দেশগুলিতেও যাচ্ছে। এর ফল দাঁড়াচ্ছে একটাই, উত্তরের শ্রমিকরা এখন দক্ষিণের বিপুল মজুত শ্রমশক্তির সঙ্গে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এর একটি সুস্পষ্ট তাৎপর্য হলো, উন্নত দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। মার্ক্স তাঁর 'দ্য পভার্টি অব ফিলোজফি' বইয়ে বলেছিলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মুল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে যথাসম্ভব সীমিত রাখা। বিশ্বায়নের মাধ্যমে উত্তরের শ্রমিকরা আজ দক্ষিণের শ্রমিকদের সঙ্গে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শামিল, ফলে উত্তরের ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। একদিকে উৎপাদনকারী কারখানা উত্তর থেকে দক্ষিণে স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে যাওয়ায় কর্মহীনতার আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন উত্তরের শ্রমিকরা।

আর একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, 'দক্ষিণ'-এর বিপুল মজুত শ্রমশক্তির প্রভাবে উন্নত দেশের প্রকৃত মজুরি আর শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে না, মোটামুটিভাবে তা এখন স্থির। তার মানে এই নয় যে, উন্নত দেশের প্রকৃত মজুরি এখন অনুন্নত দেশের প্রকৃত মজুরির সঙ্গে এক হওয়ার দিকে হাঁটছে (কোনও দিনই তা সম্ভব নয় কিছু অপরিবর্তনযোগ্য কারণের জন্য এবং অন্য কোনও কারণ না থাকলেও যার প্রধান কারণ অবশ্যই রাজনীতি)। বরং উন্নত ও অনুন্নত দেশের প্রকৃত মজুরির গতি এখন মোটের উপর স্থির হয়ে আছে, যদিও বিশ্ব অর্থনীতিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অনেকটাই বেড়েছে। তাই এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রকৃত মজুরি এক অর্থে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত মজুরির গতিহীনতা বিশ্ব অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধিকেই ইঙ্গিত করছে। এর অর্থ, বিশ্বে আয়গত বৈষম্য বাড়ছে। যখন উদ্বৃত্ত হয় বাস্তব অর্থাৎ যখন চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যা থাকে না, তখন অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে বাধ্য। যেখানে উপযুক্ত চাহিদার অভাবে উদ্বৃত্তের কিছুটা অংশ অব্যবহৃত থাকে, সেখানেও কিন্তু মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে আপেক্ষিক আর্থিক বৈষম্য বাড়ে। বিশ্বের আয়গত বৈষম্য বিশ্বায়নের যুগে বাড়তেই থাকবে, যতক্ষণ না বিশ্বে মজুত শ্রমশক্তি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হবে। বাস্তবে মজুত শ্রমশক্তির বিলুপ্তি ঘটছে না এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এরকম ঘটার কোনও সম্ভবনাও নেই।

অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যুৎপাদনের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ শ্রমিকরা মালিকের তুলনায় তাঁদের আয়ের বৃহৎ অংশ ব্যয় করে ফেলেন এবং ফলত সামগ্রিকভাবে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমে যায়। এই অবস্থার কারণ মজুরি হ্রাস ও উদ্বৃত্তের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। এই প্রবণতার মানে এই নয় যে, অর্থনীতিতে সত্যি কোনও সঙ্কট বর্তমান এবং একই কারণে অর্থনীতিও গতিহীন হয়ে পড়েছে। কেননা চাহিদা সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সব সময় এই প্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে (বারান ও সুইজি তাঁদের বই 'মনোপলি ক্যাপিটাল'-এ বলেছেন, যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় সামগ্রিক চাহিদাকে ধরে রাখতে প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেছিল সামরিক ব্যয়, যদিও অতি উৎপাদনের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির ফলে)।

এবার আমরা আসি বর্তমান বিশ্বায়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের আলোচনায়। পুঁজি বা মূলধনের বিশ্বায়নের যুগে লগ্নি পুঁজির গুরুত্ব সর্বাধিক এবং সেই মতো সমস্ত রাষ্ট্রই, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, অর্থনৈতিক বিপন্নতার ভয়ে লগ্নি পুঁজির দাবিকে সর্বাধিক মান্যতা দিয়ে থাকে। না হলে তাদের লগ্নি যদি একসঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে অর্থনীতির পক্ষে সমূহ বিপদ

ঘনিয়ে আসবে। অন্যদিকে, ফিনান্স ক্যাপিটাল বা লগ্নি পুঁজি দেশের চাহিদা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে।

আমাদের সাধারণ ধারণায় লগ্নি পুঁজি বুঝি সব রকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী। তা নয়। তাদের দাবি, জাতি-রাষ্ট্র সমন্বিত আজকের বিশ্বে প্রতিটি রাষ্ট্র অর্থনীতিতে নীতিগত হস্তক্ষেপ করুক শুধুমাত্র তাদেরই একক স্বার্থে। দেশের চাহিদাকে ধরে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, যার মাধ্যমে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান কায়েমের চেষ্টা করে রাষ্ট্র, লগ্নি পুঁজি সেই উদ্যোগের ঘোরতর বিরোধী। এই বিরোধিতার প্রেক্ষিতে লগ্নি পুঁজি 'পোক্ত আর্থিক ব্যবস্থা'র উপরে জোর দেয় (যেখানে লগ্নি পুঁজির চাহিদা হলো, রাষ্ট্র সব সময়ে বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা বজায় রাখবে এবং না হলে নিদেনপক্ষে বাজেট ঘাটতি যেন কিছুতেই জিডিপি'র নির্ধারিত শতাংশের বেশি না হয়)

এখন বর্ধিত সরকারি খরচ যদি শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষদের উপর কর বসিয়ে মেটানোর চেষ্টা করা হয়, তবে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমনিতেই শ্রমজীবী মানুষের আয়ের অধিকাংশই খরচ হয়ে যায়। এঁদের উপর সরকার অতিরিক্ত কর আরোপ করলে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদাও কমে যায়, যার ফলে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় কোনও কাজে আসে না। অন্যদিকে আবার নয়া উদার অর্থনীতিতে সরকার না ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর বসাতে পারে, না বর্ধিত বাজেট ঘাটতির শরণাপন্ন হতে পারে। যদি দুটোর মধ্যে সরকার একটা পন্থার দিকে ঝোঁকে, তবে লগ্নি পুঁজি সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে উবে যাবে এবং অর্থনীতি আরও গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি হবে। বিভাজিত বিশ্ব অর্থনীতিতে এবং এই রকম সঙ্কটকালে কোনও সরকারের পক্ষেই তাই অতি উৎপাদনের প্রবণতাকে রোধ করা সম্ভব নয়।

প্রাথমিকভাবে বাজেট ঘাটতির বিরুদ্ধে লগ্নি পুঁজির জেহাদকে একটু বিস্ময়কর ঠেকতে পারে। কিন্তু এই বিরোধিতার কারণ নিহিত আছে পুঁজিবাদের অত্যন্ত গভীরে। এর মূল কারণ একটাই– অর্থনীতিতে চাহিদা সৃষ্টিতে সরকারের বারবার হস্তক্ষেপ পুঁজিপতিদের সামাজিক ভূমিকাকেই শুধু চরম প্রশ্নের মুখে ফেলে না, বরং তার চেয়েও বড় কথা– মানুষ স্পষ্টত প্রশ্ন করতে শুরু করেন যে, সঙ্কট মোচনে সরকারকেই যদি বারবার এগিয়ে আসতে বাধ্য হতে হয়, তবে পুঁজিপতিদের দরকারটা কী?

বাজেট ঘাটতির বিরোধিতা অবশ্য আগেও ছিল এবং কিছু ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বিরোধিতাকে অতিক্রমও করা গিয়েছিল (যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পুঁজিবাদের অস্তিত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সমাজতন্ত্র)। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আজকের নয়া উদার অর্থনীতিতে। এর কারণ হলো– রাষ্ট্র রয়ে গিয়েছে জাতি-রাষ্ট্রের চেহারায়, অন্যদিকে লগ্নি পুঁজি আন্তর্জাতিক চেহারা ধারণ করেছে। যদি জাতি-রাষ্ট্র বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, তবে লগ্নি পুঁজি একযোগে সেই দেশ ছেড়ে পালাবে ও সেই দেশ দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

পুঁজিপতিদের হাতেও এখন আর আগের মতো বিশাল ঔপনিবেশিক বাজার নেই, যাকে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী ইচ্ছা মতো ব্যবহার করা যাবে। আবার চাহিদা সৃষ্টিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে বিশ্বায়িত বা আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি একদম বরদাস্ত করতে পারে না। এই সঙ্কটে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে তখন একমাত্র প্রতিষেধক হিসেবে সম্পত্তির মূল্যকে কেন্দ্র করে একটা বুদবুদ তৈরি করা হয়। মূলত ফাটকাবাজির উপর নির্ভরশীল এবং সম্পত্তি থেকে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন এই বুদবুদ সম্পত্তির মূল্যকে এমন এক উচ্চতায় নির্ধারণ করে যে, সম্পত্তির মালিকরা এর ফলে নিজেদেরকে অত্যন্ত ধনী বলে মনে করেন এবং আরও বেশি করে ভোগের পিছনে ছোটেন। কিন্তু যখন এই বুদবুদ ফেটে যায়, তখন অর্থনীতি গভীর মন্দায় নিমজ্জিত হয়।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, অর্থনীতিবিদদের কাছে চাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেইনসের দর্শনের গুরুত্ব যে দিন থেকে হ্রাস পেয়েছে, সে দিন থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের গড় উন্নয়নের হারও কমেছে। ব্যতিক্রমে যেখানে উন্নয়ন নজরে এসেছে, তা তথাকথিত এক একটা বুদবুদকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকে 'ডট-কম' বুদবুদ এবং এই শতাব্দীর প্রথম দিকে 'হাউজিং' বুদবুদ।

এর পরই বুদবুদের অপব্যাখ্যা শুরু হলো বুর্জোয়া অর্থনীতিতে। বলা হলো, এই ধরনের বুদবুদকে সামান্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সম্পূর্ণ সমস্যা মুক্ত পুঁজিবাদ কায়েম করা যাবে। এই চিন্তাধারার ভ্রান্তি হলো, এই জাতীয় বুদবুদ ব্যতীত সমসাময়িক পুঁজিবাদ যে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও কর্মহীনতার দিকে এগিয়ে যায়, সেই মূল সমস্যাকেই আসলে এরা উপেক্ষা করল। সমসাময়িক পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় দুর্দশা হলো, এ শুধু বুদবুদের উত্থান বা পতন প্রত্যক্ষ করেনি, যা অবশ্যই এড়ানো যেত। তার চেয়েও বড় কথা, বুদবুদ ছাড়া অর্থনীতি আরও বেশি সঙ্কটে নিমজ্জিত থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও ব্যাপক কর্মহীনতা থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার জন্য পুঁজিবাদ এখন কার্যত বুদবুদের উপরেই নির্ভরশীল।

বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কট যেমন একদিকে বুদবুদের ধ্বংসের মধ্যে নিহিত, তেমনই তার চেয়েও বড় কথা– পুঁজিবাদ এখন কাঠামোগত দুর্দশার শিকার, যে অবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও ব্যাপক কর্মহীনতাই শুধুমাত্র ভবিতব্য এবং যেখানে এই ধরনের বুদবুদ শুধু মাঝে মাঝে সঙ্কট থেকে সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি দেবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অর্থনীতিতে বুদবুদ ইচ্ছামাফিক তৈরি করা যায় না এবং বারংবার তার সুযোগও মেলে না। এ ছাড়া মানুষ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছেন, বিশেষত লাগামছাড়া ফাটকাবাজি সম্পর্কে তাঁরা এখন অনেক বেশি সতর্ক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাউজিং বুদবুদের পতনের পর ওই মাপের আর কোনও বুদবুদের দেখা মেলেনি উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অতিরিক্ত উৎপাদন এখন নয়া উদার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজ নয়া উদার অর্থনীতি তার অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়েছে।

অনুবাদ: অরবিন্দ দাস

অতিমারীর কালে মেয়েরা

মালিনী ভট্টাচার্য

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

রাজস্থানের বিকানীরে একটি অনেকদিনের জনপ্রিয় মন্দির আছে কর্নি-মাতা নামে কোনও স্থানীয় দেবী যার অধিষ্ঠাত্রী। সাম্প্রতিক লকডাউন পর্বের শেষদিকে একদিন শোনা গেল অতি প্রত্যূষে সেই কর্নি-মাতার মন্দিরের তালাবন্ধ দরজা নাকি নিজে থেকেই খুলে গেছে এবং দেবী পুরোহিতদের মারফত প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন যে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলে তিনি রোগব্যাধির হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করবেন। অতএব এলাকার মেয়েদের ডাক পড়ল মন্দিরে গিয়ে দরজা ও দেওয়ালে কুমকুমের ছাপ লাগিয়ে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করতে এবং চারিদিকে কুমকুমের জল ছেটাতে। এ কাহিনি সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজস্থান শাখার মেয়েদের কাছে শোনা। মেয়েরা নাকি বিপুল সংখ্যায় এতে যোগ দিয়েছিলেন এবং এব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে কোনও সংশয়ের উচ্চারণে কান দেননি। বিকানীরে রোগের প্রকোপ এতে কমল কিনা সে বিষয়ে অবশ্য কিছু শোনা যায়নি।

গত শতকের অতিমারীগুলির সময়েও যেমন, এখনও তেমন এধরনের কিছু কাহিনি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমরা পাচ্ছি যেখানে অতিমারীর সামনে অসহায় মানুষ মনে করছে এ এক আধিদৈবিক উৎপাত এবং এর হাত থেকে বাঁচতে দৈব উপায়ের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্মপরায়ণতার বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বহুলপ্রচারিত তত্ত্বটি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এবং দৈবকে ঠেকাতে তাদের আচার-আচরণ খবরে বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। খোদ পশ্চিমবাংলাতেও আর পাঁচটা রাজ্যের মতোই আবির্ভাব ঘটেছে এক 'করোনা-মাঈ'য়ের, যিনি নিজে মহিলা এবং অন্যান্য অতিমারীর দেবতার মতোই খামখেয়ালি এবং বদমেজাজি। তাঁর বিশেষ প্রভাবও মেয়েদের ওপরে। কলিকালে মেয়েরা কর্তব্যপালনে তেমন তৎপর নয় এবং তাদের দোষে পরিবার ও রাজ্য নাশ হতে পারে, একারণেই তাদের বিশেষ ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন দেবতার রোষ ঠেকাতে এবং নিষ্ঠাভরে শুদ্ধিকরণের সব আচার-আচরণে দল বেঁধে যোগ দেওয়ায়।

গল্পের এই ছকটি অনেকদিনের পুরানো। কিন্তু ২০২০ সালে আধিদৈবিকের প্রতি মেয়েদের বিশেষ পক্ষপাতের কাহিনিগুলির প্রেক্ষিতে উপরোক্ত তত্ত্বটিকে আরেকটু খতিয়ে দেখার একটি সুযোগ ঘটছে এবং একটা জিনিস একটু স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েরা একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রোগের প্রতিকারে চিকিৎসার চাইতে ব্রত উপোস মানত ও নানা 'শুদ্ধাচার'এর কর্মসূচির ওপর বেশি নির্ভরশীল একথা প্রমাণ করা খুব মুশকিল। বরং কর্নি-মাতার মন্দিরের পুরোহিতরা যদি না ঘোষণা করতেন যে মন্দিরের দরজা খুলে গিয়েছে তাহলে মেয়েদের সেখানে যাওয়ার তাগিদ হতো কিনা সন্দেহ। ক'দিন আগে আমাদেরই রাজ্যে বিশেষ তিথিতে যে বিখ্যাত পীঠস্থানটি খুলে দেওয়া হলো সেটা মহিলাভক্তদের আকুলতায় হয়েছে এটা কি বলা যায়? বস্তুত সেখানে উপচে-পড়া ভিড়ে তো পুরুষদের কিছু কম দেখা গেল না। তাছাড়া মেয়ে বা পুরুষ, মন্দিরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট আহ্বান না থাকলে কি কেউ নিজের তাগিদে লকডাউন ভেঙে সেখানে হাজির হতেন? সরকার যদি দৃঢ়ভাবে জানাতো সংক্রমণ বৃদ্ধির সময়ে মন্দির খোলা যাবে না, তাহলে কী হতো? আবার তেলেঙ্গানার খবর এই যে সঙ্ঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু প্রতিষ্ঠান মাঠে নেমেছে। সঠিক ধর্মাচরণে মেয়েদের শৃঙ্খলাবদ্ধ না করতে

পারলেই দুর্যোগ ঘটে, এই ধুয়ো তুলে তাদের তারা রোজ ভোরে সংকীর্তনে শামিল করছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি, মেয়েদের বা সাধারণভাবে ভক্তদের ধর্মপিপাসার অজুহাত দেখিয়ে কেউ না কেউ ধর্মীয় সংস্কারের নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণ করে চলেছে। আমাদের দেশে—হয়তো এখন সারাবিশ্বেই—মেয়েদের জীবনে অনিশ্চয়তা অনেক বেশি, কারণ সাধারণত তাদের জীবন সবদেশেই নানাবিধ প্রথাগত সামাজিক সম্পর্কের ওপর এখনও অনেক বেশি নির্ভরশীল, সেটা পারিবারিক জীবনেই হোক বা কর্মক্ষেত্রেই হোক। তাদের শতকরা ৯৪% শতাংশের রুজি অসংগঠিত শ্রমের ক্ষেত্রে, এখনো পিতার গৃহ থেকে স্বামীর গৃহে তাদের অভ্যস্ত গতিপথ। এখনও শিশুপালনের দায়িত্ব প্রধানত তাদেরই পালন করতে হয়। তাদের অধিকাংশের ইচ্ছার স্বাধীনতা তাই অনেক সীমিত। ফলে যৌথ ধর্মীয় আচার-আচরণও পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কাছে অনেক বেশি বাধ্যতামূলক বিষয়। মন্দিরে গিয়ে যদি কুমকুমের জল ছেটানোর কাজ মেয়েদের দেওয়া হয়ে থাকে দেবতার প্রত্যাদেশ বলে, তাহলে সেটা তার কাছে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার সবসময়ে থাকে না, যোগ না দিলে তার সর্বত্র কোণঠাসা হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণভাবে পুরুষের তুলনায় বেশি। মেয়েদের তথাকথিত ধর্মপরায়ণতা বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতার মধ্যে এই নিঃশব্দ বাধ্যবাধকতার উপাদানকে অস্বীকার করা যায় না।

এখন আমরা এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি যেখানে খেটে-খাওয়া সীমিত আয়ের মানুষের মধ্যে মেয়েদের বেশি অসুবিধা হচ্ছে নাকি পুরুষদের, এরকম প্রতিযোগিতামূলক কোনও বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। যেখানে এধরনের পরিবারের সমস্ত শিশু জন্মের পরে স্বাস্থ্য বা পুষ্টি থেকে বঞ্চিত সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের সাধারণ পুষ্টি প্রকল্পগুলিকে রক্ষা করার কথাই বলতে হবে, শুধু শিশুকন্যাকে রক্ষার কথা নয়। এই সময়ে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার ফলে মেয়েদের মধ্যে ড্রপ-আউটের হার অবশ্যই বাড়ছে, কিন্তু ছেলেদের মধ্যেও কি বাড়ছে না? পরিযায়ী যে পুরুষ-শ্রমিক রোজগার-ব্যতীত সরকারি সহায়তার অভাবে ভিনরাজ্যে আটকে আছেন তাঁর বিপদটা বেশি না যে নারী সন্তানসন্ততি সহ তাঁর ফেরার অপেক্ষায় উপোস করে ঘরেই দিন গুনছেন, তাঁর বিপদ? এই প্রশ্নের সত্যি কোনও মানে হয় না। তবু মেয়েদের ওপর বিভিন্ন সামাজিক চাপের খতিয়ান না করেই তাদের স্বাভাবিকভাবে কুসংস্কারগ্রস্ত বলাটা যেমন একটি পিতৃতান্ত্রিক মানসিক অভ্যাস, বাস্তব বিশ্লেষণ নয়, ঠিক সেইভাবেই অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঙ্কটকালে লিঙ্গ-অসাম্য অর্থহীন হয়ে যায় এমনটা মনে করা বাস্তবকেই অগ্রাহ্য করা।

মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা থেকে গত ২২ জুনের এক মর্মান্তিক সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। মঙ্গলা ওয়াঘ নামে এক আদিবাসী মা তিন বছরের শিশুকন্যা রোশনিকে নিজের শাড়ির ফাঁসে গাছের ডাল থেকে ফাঁসি দিয়ে তারপর নিজেও একইভাবে আত্মহত্যা করেছে। স্বামী দিলীপ ওয়াঘ পুলিশের কাছে বিবৃতিতে বলেছেন, রোজগারের অভাবে সংসারের হাল দেখে সে দিশাহারা বোধ করছিল। ঘরে যা খাবার ছিল তাতে তাদের সকলের খেয়ে বাঁচার উপায় ছিল না। বলা যায়, নিজেরা না খেয়েও বাড়ির পুরুষদের পাতে রুটি জোগানো মেয়েদের চিরন্তন অভ্যাস । কিন্তু তার মানে কি এই যে পুরো পরিবারটিই অনাহারের কিনারায় ছিল না? অনেক পুরুষকেও কি এই পরিস্থিতিতে পরিবারের ভরণপোষণে অপারগ হয়ে নিরুপায়তার কারণে আত্মহত্যা করতে দেখা যায়নি? খাদ্যের অধিকার কাজের অধিকার তো তাদের সবারই ছিল। কিন্তু মঙ্গলা ওয়াঘের কন্যাকে খুন করে আত্মহত্যা যে সংবাদে এতটা আলোড়ন তুলেছে তার কারণ মেয়েদের কাছ থেকে নীরবে সহ্য করে যাওয়াটাই যেন প্রত্যাশিত। আমাদের রাজ্যে ক'দিন আগেই কোভিড-হানায় স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিবন্ধী সন্তান সহ স্ত্রীর আত্মহত্যার খবর দেখাচ্ছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারেও সঙ্কটকালে মেয়েদের বিশেষ সঙ্কট কম নয়। এ যেন তাদের মরে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তারা মরেনি।

এখানে কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে। সরকারি হিসাবে আমাদের দেশে পরিযায়ী শ্রমিকের মোট সংখ্যা ৮ কোটি যার মধ্যে ৩ কোটিই মেয়ে; আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাবে এসংখ্যা আরও বেশি— মোট ১২ কোটি শ্রমিকের শতকরা ৩০%ই মেয়ে। সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয় আর এও আমাদের জানা যে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা দেশের বাইরেই শুধু নয়, দেশের মধ্যেও গত দু'তিন দশকে অনেক বেড়ে গিয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, তার মধ্যে পরিযায়ী নারী-শ্রমিকদের সম্পর্কে কিন্তু এখনো ততটা তথ্য আমরা পাইনি। মিডিয়াতে কিছু ছবি থেকে আমরা জানতে পারি, কখনো বাচ্চা সঙ্গে নিয়েও এই মেয়েদের অনেকে পুরুষদের মতোই লকডাউনের সময়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছেন, কিছু মৃত্যুও ঘটেছে। নেহাৎ বালিকাও ছিল তাদের মধ্যে, যেমন ছত্তিশগড়ের সেই মেয়েটি যে অন্ধ্রের মরিচখেত থেকে হেঁটে নিজরাজ্যে ফেরার সময়ে ক্ষুধা এবং অসুস্থতায় মৃত্যুর কবলে পড়ে। তথাকথিত 'শ্রমিক ট্রেনে'র মধ্যেই ২৪ জন মেয়ে সন্তান প্রসব করেছেন। কতজন রাস্তাতেই সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছেন তার এখনো কোনও হিসাব নেই। পরিযায়ীদের মধ্যেও মেয়েরা তাঁদের বিশেষ প্রয়োজনে কিন্তু কোনও বিশেষ সুবিধা পাননি।

'মনরেগা' বা একশো দিনের কাজে নির্ধারিত দৈনিক মজুরি ৩৭০ টাকা; সাধারণত খুব কম রাজ্যেই শ্রমিক ২৩০ টাকার বেশি পান; মেয়েরা পান আরও কম, ১২০ টাকার মতো। তাছাড়া লকডাউনের বাজারে অন্য কাজের ওপর যে সাংঘাতিক রকম কোপ পড়েছে তার ফলে এখন যেখানেই এই প্রকল্পে কাজ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে তার চাহিদাও দ্রুত বর্ধমান। ফলে যেটুকু কাজ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে পরিবারের যিনি মাথা সেই পুরুষটিই প্রাধান্য পাচ্ছেন; মেয়েরা সুযোগ পাচ্ছেন কম, বিশেষ করে যেখানে মেয়েটিই সংসার চালান, বা যদি তিনি বর্ষীয়সী বা একক নারী হন। Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) র পর্যবেক্ষণ থেকে মার্চ ২০১৯'র মার্চ ২০২০'র হিসাবে গড়ে ৪৩০ লক্ষ মেয়েদের কর্মরত থাকার কথা আমরা জানতে পারছি যেটা এপ্রিল ২০২০-তে একধাক্কায় নেমে এসেছে ২৬০ লক্ষে। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষা বলছে গ্রামীণ অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে ৭১% মেয়ে এবং ৫৯% পুরুষ আর শহরের অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে ৮২% মেয়ে এবং ৮০% পুরুষ এই সময়ে কাজ হারিয়েছেন। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১টি রাজ্যে ১৭২৬ জন গৃহ-পরিচারিকাকে নিয়ে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে গত মার্চ এবং এপ্রিলে যথাক্রমে এঁদের ৪১% এবং ৬১% কোনও বেতন পাননি। ২৪ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে এঁদের ৫৯%কে বলা হয়েছিল কাজে না আসতে, ১৫ এপ্রিল থেকে ৪ মে'র মধ্যে ৮০%কে।

এই পরিসংখ্যানগুলির দিকে তাকালে বোঝা যাবে কর্মক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রনেতারা যে নীতি নিয়ে চলছেন তার মধ্যে মেয়েদের পক্ষে নিজের জায়গাগুলি ধরে রাখা স্পষ্টতই কত বেশি কঠিন। কাজ করতে হলে তাঁদের ক্রমশই আরও নিকৃষ্ট কাজ আরও কঠোর শর্তে শ্রমের জগৎ থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়ে করতে হবে। এমনিতেই অস্থায়ী অসংগঠিত কর্মীর বাড়বাড়ন্ত। স্থায়ী নিয়োগের ব্যাপার শিকেয় উঠেছে। তার মধ্যে যে মেয়েদের কোনও রোজগার আছে তাঁদের ৯৪% তো অসংগঠিত ক্ষেত্রেই রয়েছেন, অস্থায়ী কাজে বা 'স্বনিয়োজিত' কাজে। অনেক ক্ষেত্রে আবার পরিবারের একজন হিসাবে শ্রমদান করেন

বলে দাদনদারের কাছে তাঁদের আলাদা কোনও পাওনা হয় না। তদুপরি লকডাউনের আড়ালে শ্রম আইন পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর চক্রান্তটি কোনও কোনও রাজ্যে কার্যকর করার যে অপচেষ্টা চলছে তাতে শুধু মজুরি আরও অনির্দিষ্ট হবে, গৃহকর্মের সঙ্গে কাজের বর্ধিত সময়ের তাল মেলাতে নাভিশ্বাস উঠবে তাই নয়, শ্রমিক হিসাবে মেয়েদের অধিকাংশের হয়তো কোনও সরকারি স্বীকৃতিও আর থাকবে না। মেয়েদের কম-রোজগারি বেরোজগারির আলাদা মাত্রাটি সামগ্রিকভাবেই আরও বাড়াচ্ছে শোষণের তীব্রতাকে এবং পরিবারগুলিকে আরও বেশি করে শোষকদের খপ্পরে ঠেলে দিচ্ছে।

কেউ কেউ জানাচ্ছেন, গ্রামীণ এলাকাগুলিতে খাদ্য ও অন্য ন্যূনতম সামগ্রী গ্রহণ ৫০% হ্রাস পেয়েছে। ১৮,০০০ দরিদ্রতম পরিবারকে নিয়ে মধ্য-এপ্রিলের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তাদের ৪৫% কোনও র‍্যাশন পাননি। বহুলপ্রচারিত 'জন-ধন' একাউন্টে ৭০% ভাগেরই কোনও অর্থ জমা পড়েনি। গত ২০ জুন প্রধানমন্ত্রী ঢাকঢোল পিটিয়ে গৃহ-প্রত্যাগত পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান' নামে ৫০,০০০ কোটির একটি প্যাকেজ ঘোষণা করলেন। তাতে যে আসলে একটিও বাড়তি টাকা বিনিয়োগ হয়নি, নানা প্রকল্পকেই নতুন নাম দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে এই নিষ্ঠুর ভাঁওতা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে যখন আসে তখন বুঝতে হবে মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত। শ্রমজীবীদের মধ্যে আবার নারী শ্রমজীবীদের বেশি করে শোষণ করা যায় এই জ্ঞান তাদের নিশ্চিন্তির একটি বড় কারণ। যে সামাজিক চাপের ফলে পরিবারে নানা ধর্মীয় সংস্কার মেয়েদের বেশি বেশি মেনে চলতে হয় কর্মক্ষেত্রেও সেগুলির উপস্থিতি তাদের অধিকতর শোষণেরও শিকার বানায়। সংস্কারমুক্ত হওয়াটা শুধু মেয়েদের ব্যাপার নয়। এটা শোষণমুক্তিরও আবশ্যিক শর্ত।

যে মেয়েরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে বা পুষ্টিপ্রকল্পে কাজ করছেন তাঁদের প্রতি সরকারি অনীহা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। চাপ বাড়ানো হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশা কর্মীদের ওপর। অন্যান্য সব শ্রমজীবী মানুষের মতোই সরকারের চূড়ান্ত অবহেলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার খেসারত তাঁদের কাউকে কাউকে জীবন দিয়েও দিতে হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় ডাক্তার ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের মতোই এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন নার্সরাও। কোনও কোনও জায়গায় কাজ থেকে ফিরে বাড়িতে ঢুকতেও পারেননি। এছাড়া ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থার পটভূমিতে বিশেষ বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন আসন্ন প্রসবারা। কারণ জন্মের মুহূর্ত লকডাউন মানে না। দিল্লির নিজামুদ্দিন বস্তির যে ২৫ বছরের মেয়েটি হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে এইমস'র সামনে রাস্তায় সন্তান প্রসব করতে বাধ্য হলো, মহারাষ্ট্রে ঠানের মুম্বরা এলাকার বা কলকাতার কসবা এলাকার যে আসন্ন প্রসবারা কোনও সহায়তা না পেয়ে অটোরিকশার মধ্যেই মারা গেল, উত্তর প্রদেশের শামনগরে বাইশ বছরের যে আমরীন হাসপাতালে ঢুকতে না পেরে বাড়িতেই প্রসব করল মৃত সন্তান, পরে নিজেও প্রাণ হারালো তাদের নাম আমি কেবল মেয়েদের বিশেষ সমস্যার তালিকা দেবার জন্যই পেশ করছি না। আমি বলতে চাইছি এইসব বর্বরতাও যাতে সাধারণ মানুষ অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেয় তারই জন্য তাদের সংস্কারের অন্ধকারে আরও বেশি করে নিক্ষেপ করা আজ শাসকের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। একাজে মেয়েদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই ধর্মের নামে তাদের শামিল করার এত আয়োজন।

কোনও কোনও জায়গা থেকে এরকম খবর পাওয়া যাচ্ছে যে লকডাউনের সময়ে গার্হস্থ্য নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেছে। এপ্রিল মাসে জাতীয় মহিলা কমিশন জানায় আগের মাসে তাদের কাছে যতো এধরনের অভিযোগ এসেছিল একমাসে তার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। দুঃখের বিষয় মাঝেমধ্যে তাদের কাছ থেকে এরকম কিছু বার্তা পেলে বিষয়টি বুঝতে আমাদের সুবিধা হতো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা মৌনতা অবলম্বন করেছে। পরিস্থিতি বিচার করলে এর সম্ভাব্যতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার একটি কারণ পরিবারগুলিতে চূড়ান্ত আর্থিক অনটন, যা সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ, বাদবিতণ্ডা এবং হিংস্র আচরণের বাড়াবাড়ি ঘটাতে পারে। এইসময়ে গৃহকর্মের বোঝা মেয়েদের ওপর আরও বেশি করে চেপেছে, তারা কী করে পরিবারের ক্ষুধার খাদ্য জোগাবে তা ভাবতে দিশাহারা হচ্ছে এবং পরিবারের পুরুষটির কর্মহীন অবস্থায় সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকা তাদের ওপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, কর্মহীনতা এবং নেশার অভ্যাস একত্রে কাজ করছে, মেয়েদের কষ্টের সঞ্চয় জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে নেশা করা– গার্হস্থ্য হিংসার প্রেক্ষাপট এটাও। মদের দোকান গোড়ার দিকে বন্ধ থাকলেও বেআইনি ঠেকের তো অভাব নেই। আমাদের রাজ্যসহ বেশ কটি রাজ্যে মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্র হয়ে পাড়ার ভাঁটিখানাগুলিকে ভাঙতেও দেখা গেছে।

আসলে পরিবারের ভিতরেই তো নয়, বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও শুধু গার্হস্থ্য হিংসা নয়, গত ক'বছরে যৌন হিংসাই সাধারণভাবে অসম্ভব বেড়েছে। আমাদের রাজ্য এদিক থেকে যথেষ্ট এগিয়েই ছিল, কিন্তু সারাদেশেই এ জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। যোগী আদিত্যনাথের আমলে উত্তর প্রদেশে মেয়েদের ওপর নৃশংসতার ঘটনায় বেশ কিছুদিন হলো ভয়ঙ্কর সব রেকর্ড তৈরি করে যাচ্ছে। কোভিড পর্বে তা আরও চরমে উঠছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ এখনই হাতের কাছে নেই। তবু অতিমারীর আতঙ্ক এবং লকডাউনের দেশজোড়া বিশৃঙ্খলাকে অজুহাত করে প্রশাসনিক এবং আইনি প্রতিকারগুলি যে মেয়েদের হাতের আরও বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এমনকী নির্যাতিতাদের জন্য আশ্রয়গৃহগুলিও সরকারি অবহেলায় এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নজরদারিহীন অবস্থায় মেয়েদের পক্ষে কোতলখানায় পরিণত হচ্ছে। কিন্তু এখানে মূল অপরাধ নিশ্চয়ই অতিমারীর নয়। যে হিংস্রতার জন্ম সমাজ এবং রাষ্ট্রের সবচেয়ে ওপরতলা থেকে, যাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা তাদের ক্ষমতা-বাড়ানোর নিজস্ব তাগিদ থেকে, মেয়েদের ওপরে নানাবিধ হিংসার বাড়বাড়ন্ত তারই প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির কতগুলি এলাকায় কয়েকদিন ধরে সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটল। এটা কোনও কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে ঠিক তার আগেই দিল্লির জনৈক বিজেপি সাংসদ নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগে মহিলাদের জমায়েতের উদ্দেশে হুঙ্কার ছেড়ে বলে, তাঁরা ভালোয় ভালোয় তা তুলে না নিলে তাঁদের ফল ভুগতে হবে। এই দাঙ্গায় প্রধানত মুসলিমরা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং মৃতের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই বেশি ছিল। সম্পত্তি নষ্টের কাহিনি তো বেশুমার। যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় তা হলো এটা নিছক দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল না। এমন সংঘর্ষ ঘটলে পুলিশের কাজ তো নিরপেক্ষভাবে যে কোনও ধর্মের দাঙ্গাকারীকে আইনশৃঙ্খলাভঙ্গের কাজ থেকে বিরত রাখা। অমিত শাহের পুলিশ যে সেকাজ থেকে হাত তুলে নিল, এমনকী আরএসএস'র লোকদের সঙ্গে মিলে মুসলিমদের পেটানো এবং মসজিদ-সহ বাড়িগুলিতে আগুন লাগানোতে অংশ নিল, সেটা পূর্বপরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়। শাহিনবাগের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াই ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তির অগ্রাধিকার।

হিংসা যেখানে রাষ্ট্রের অনুমোদন পায়, সেখানে সমাজের ওপরতলা থেকে নিচতলা অবধি মানুষের একক এবং যৌথ কদর্যতম প্রবৃত্তিগুলি এই বার্তা পায় যে শক্তিমানের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে আইনকানুনকে

বুড়োআঙুল দেখানো যায়, সবচেয়ে বড়ো অপরাধীও পার পেয়ে যেতে পারে। সেখানে মেয়েদের নিরাপত্তা বলে যে কিছু থাকবেনা তাতে আশ্চর্য কী! খোদ 'যোগী' আদিত্যনাথের রাজত্ব যে ধর্ষক ও খুনেদের স্বর্গরাজ্য তার কারণও অন্যকিছু নয়। আগেই বলেছি, আমাদের রাজ্যও এসব ব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে এবং নারীনির্যাতনের ব্যাধির একটি প্রধান 'ফোকাস' হয়ে উঠেছে। যোগীর রাজত্বে সংগঠিত 'এনকাউন্টারে' অভিযুক্তকে খুন করে ফেলার ঘটনা—যাতে সে মুখ খুলে ওপরওয়ালাদের জড়িয়ে ফেলতে না পারে—এখনও হয়তো এরাজ্যে আমরা দেখছি না; কিন্তু অপরাধীদের সাহায্যে রাজত্ব চালানোর সেই একই প্রকরণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও ভালোই আয়ত্ত করেছেন। অনিমা বেশরা, ছবি মাহাতোরা জঙ্গলমহলে নৃশংসভাবে খুন হবার পর্বে যে ছত্রধর মাহাতো সেখানে নৈরাজ্যসৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক গৌরবময় প্রত্যাবর্তন এই বার্তাই আমাদের দিচ্ছে।

যেখানে গণতন্ত্র আক্রান্ত, যেখানে সংগঠিত বদমাশদের হাতে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সেখানে মেয়েদের ওপর পারিবারিক বা যৌন নির্যাতনের প্রতিকার আদায় করার সম্ভাবনাও সুদূর। মহিলা কমিশনগুলি ঠুঁটো জগন্নাথ। গার্হস্থ্য হিংসার প্রতিষেধক আইন বা কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের প্রতিকারের আইন কার্যকরী করতে মজবুত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। অনেক রাজ্যেই অনেক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে-তোলা সেসব পরিকাঠামো সরকারি অবহেলায় বিপর্যস্ত। প্রশ্ন হলো, এই বিনাশের ছবি তো ২০১৪ সাল থেকে একটানাই দেখতে হচ্ছে আমাদের। অতিমারী কি তাতে নতুন কোনও মাত্রা সংযোজন করল? এই পরিস্থিতি আমাদের নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে মেয়েদের জন্য অতীতে যতো অধিকার কিয়ৎপরিমাণেও কার্যকর করা গেছে তা কখনোই লড়াই ছাড়া আদায় হয়নি। অতিমারী আমাদের হাত থেকে লড়াইয়ের চিরাচরিত হাতিয়ারগুলি কেড়ে নিয়েছে। শাসকদের পরোক্ষ সহায়ক হয়েছে তাদের আতঙ্কের জমানা তৈরির কাজে। আমাদের নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

এই নিবন্ধের শুরু যেকথা দিয়ে করেছিলাম এখন ফিরতে হয় সেখানে। অতিমারীর আক্রমণ শুরু হবার আগে থেকেই আতঙ্ক ছড়ানোর কাজ রাষ্ট্র এবং সমাজকে ব্যবহার করে নানাভাবে চলছিল। এটা শাসকের উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় যে একেবারে গোড়া থেকে ব্যাধিকে রোখার রাজনৈতিক সংকল্পের সম্পূর্ণ অভাব থাকলেও ব্যাধি যে আতঙ্কসৃষ্টির একটি বড় হাতিয়ার হতে পারে এটা তারা ধরতে পেরেছিল। আন্তর্জাতিক স্তর থেকে প্রাথমিক সতর্কতাবার্তাগুলিকে অগ্রাহ্য করে, দেশের মধ্যেই কেরালার উজ্জ্বল উদাহরণকে উড়িয়ে দিয়ে তারা ব্যাধির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা তো নিলই না, কিন্তু খুব দ্রুতগতিতে অবিজ্ঞানের এক উৎসব শুরু করে দিল। এক অমানবিক লকডাউন নামিয়ে আনা হলো আমজনতার ওপর। অথচ প্রতিপদে সতর্কতার বিধিভঙ্গ করা চলল রাষ্ট্রশক্তির উঁচুমহলে।

লকডাউনের গোড়াতেই অযোধ্যায় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ধুমধাম করে রামলালার বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করলেন মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর তার আস্তানা থেকে পূর্বগঠিত একটি সাময়িক বাসস্থানে। আবার ৫ আগস্ট সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাবধানতার মুখে তুড়ি মেরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জাঁকজমকপূর্ণ ভূমিপূজায় অংশগ্রহণ করলেন। যদি মাঝখান থেকে রামমন্দির ট্রাস্টের সভাপতি সহ কয়েকজন করোনা আক্রান্ত হয়ে না পড়তেন তাহলে নিশ্চয়ই বলা হতো প্রধানমন্ত্রীর 'জয় সিয়ারাম' ধ্বনিতেই করোনা পালিয়েছে। কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে রাষ্ট্রীয় আতঙ্কের সহায়ক হলো অতিমারী-লালিত অযুক্তি। যখন বিজ্ঞানকে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল তাকে একপাশে সরিয়ে ধর্মীয় সংস্কার পেল অগ্রাধিকার। চিরাচরিত প্রতিবাদের রাস্তাগুলি যে কেবল সরকারি বিধিনিষেধে বন্ধ হলো তা নয়, অজানা ভাইরাসের আতঙ্ককেও মানুষের মনে সঞ্চারিত করল সরকারের শৃঙ্খলাহীন অযৌক্তিক আচরণ। জনতাকেও বিশৃঙ্খল করে তুলল এবং ধর্মের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়সম্বন্ধে মুগ্ধতা বাড়ালো।

এর প্রভাব মেয়েদের মধ্যে কতোটা গভীর তা নিয়ে দু'রকমের অভিজ্ঞতাই আমাদের আছে। যারা দু'বেলা অন্নের সংস্থান করতেই হন্যে হচ্ছে, ধর্মীয় আচার-আচরণে মন দেওয়া তাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। অযোধ্যায় ভূমিপূজা উপলক্ষে দীয়া জ্বালানোর উৎসবে মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তেমন ছিল না, ধুমধামটাতে সরকারি উদ্যোগই ছিল প্রধান। আবার এটাও ঠিক যে ব্যাধির হাত থেকে পরিবারের সুরক্ষার আশা দিয়ে অসুখের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ধর্মস্থলে তাঁদের শামিল করা যাচ্ছে, না গিয়ে আধিদৈবিক রোষের উদ্রেক করে অপরাধী হতে পারেন এই ভয়টাই সেখানে প্রধান। তবে এই অবৈজ্ঞানিক ঝুঁকি যে তাঁরা শুধু ধর্মের কারণে নিচ্ছেন তা নয়। যখন বেঁচে থাকার তাগিদ সবচেয়ে প্রবল এবং কোনোদিকেই সুরাহা পাওয়া যাচ্ছে না তখন নিয়ম ভেঙে স্বতঃস্ফূর্ত রোষের প্রকাশ এরাজ্যে এবং অন্য রাজ্যে দেখা গেছে।

গ্রামের মধ্যে কোয়ারান্টিন সেন্টার তৈরির প্রতিবাদে বা এরাজ্যে আমফান-পরবর্তী সময়ে ত্রাণের ন্যায্য দাবিতে যে মানুষ রাস্তা আটকেছেন, জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাব চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কম ছিল না। মুশকিল এই যে, এরোষের বাস্তব ভিত্তি আছে, সেটা হলো সরকারি অবহেলায় তাদের অসহায়তা, কিন্তু কোয়ারান্টিন সেন্টার ভেঙে দেওয়া বা অসুস্থকে পাড়াছাড়া করার মধ্যে তার যখন প্রকাশ ঘটে তখন কিছুতেই তাকে বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক বলা যায় না। এমনকী আমাদের রাজ্যে ত্রাণ নিয়ে শাসকদলের ছিনিমিনির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও স্বতঃস্ফূর্ত বলেই অনেক জায়গাতে সেই বিজেপি'র হাতেই চলে যাচ্ছে যাদের দল সারাদেশে মানুষের দুর্দশার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। আমরা সশরীরে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারছি না, অন্যসময়ে যেমন থাকতাম, সেটাই বিজেপি'র প্রসারের একমাত্র কারণ নয়,আমাদের কর্মীরা এরাজ্যসহ অনেক রাজ্যে অসমসাহসিকতা দেখিয়ে মাঠে নেমেও পড়ছেন, কিন্তু আজ আরও জরুরি মেয়েদের ক্রোধের অভিমুখকে তারা যাতে বাস্তব দাবির উত্থাপনে সংহত করতে পারে সেই চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

তার জন্য অবশ্যই 'অনলাইন প্রচার' যথেষ্ট নয়, সেখানে বিজেপি-আরএসএস, এমনকী আমাদের রাজ্যে তৃণমূলের অনুপ্রবেশও অনেক বিস্তারিত। রাজ্যে রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলন এ প্রয়াস চালাচ্ছেন তাঁদের সংগঠন অনেক জায়গায় দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও। আমরা আমাদের সংগঠন থেকে তাঁদের সঙ্গে জোট বেঁধে কিছু কাজ করছি নরেন্দ্র দাভোলকরের শহীদীর দিবসকে স্মরণে রেখে। আগামী সময়ে আমরা আশা করছি এইসব যৌথ কর্মসূচিকে আমরা আরও জোরদার করতে পারব। আমাদের আসল জোরটা মাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা আমাদের ইউনিটগুলোর মধ্যে। এদের সাহায্যেই আমরা রাজ্যে রাজ্যে মেয়েদের হৃৎস্পন্দনের হদিশ করতে পারি। ইউনিটগুলিকে তাদের নিজেদের এলাকায় মেয়েদের সঙ্গে সংযোগসাধনের মানসিক রসদ নিয়মিতভাবে জুগিয়ে, তাদের নিজস্ব উদ্যোগে উৎসাহিত করে আমরা সেইসব কাজে অধিকতর সাফল্য পেতে পারি যা হয়তো বড় বড় জমায়েতের মাধ্যমে হতো না। চেতনার লড়াইটা আজ ক্রমেই আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তার সবরকমের সুযোগ যদি আমরা নিতে পারি তাহলে অন্তত বলতে পারব অতিমারী শুধু বিপর্যয়ই আনেনি, আমাদের লড়াই করার নতুন কিছু কৌশলও শিখিয়েছে।

করোনা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবহে ভারতীয়
নারীদের সংগ্রাম

মারিয়াম ধাওয়ালে

আমাদের দেশের মানুষ আগামী বহু বছর এই ২০২০ সালটিকে ভুলতে পারবেন না। দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ উচ্চবিত্ত ছাড়া বাকি সবার জীবনে নেমে এসেছে মারাত্মক বিপর্যয়। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপের মধ্যে, এই বছরেই গরিব মানুষের প্রতি নির্মমতা ও অসংবেদনশীলতার জন্য দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের চরিত্রও সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখছি এক উদ্ধত সরকারকে, যে নিজেকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ বলেও মনে করে না।

দেশের বিপুল সংখ্যক গরিব ও প্রান্তিক মানুষ এখনও তাঁদের খণ্ড-বিখণ্ড জীবনকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন নতুন পথের সন্ধানে, মোকাবিলা করছেন করোনা মহামারীর মতো একটি নজিরবিহীন বিপর্যয়ের। এই পরিস্থিতি বিশেষ করে মহিলাদের জীবনে যে বিপর্যয় নামিয়ে এনেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। একদিকে খিদে, অভুক্ত শিশু আর পরিবারকে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার অপরিসীম চাপ, আর অন্যদিকে অসুস্থতা ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই– মহিলাদের এই দুর্দশার কোনও পরিমাপক নেই।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি (এআইডিডব্লিউএ) এমন বিপুল সংখ্যক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার চেষ্টা চালাচ্ছে নানাবিধ উপায়ে, যেহেতু সামাজিক দূরত্ববিধির কারণে জনসমাবেশ সীমিত। বহু জায়গাতেই করোনা সংক্রমণের ভীতির কারণে মহিলাদের বাইরে বেরনোর উপরে পারিবারিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবুও এই পরিস্থিতি দাবি করছে, প্রতিবাদ সংগঠিত করতেই হবে, যাতে সরকারের দায়বদ্ধতা আদায় করে নেওয়া যায়। তাই প্রতিবাদ হচ্ছেও। আর সেই সব প্রতিবাদে যখন মহিলারা অংশ নিচ্ছেন, তখন বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তাঁদের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার।

এই কঠিন সময়ে সারা দেশে হাজার হাজার এআইডিডব্লিউএ কর্মী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

প্রবল অনাহার ও খিদে

লকডাউনের ছ'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়ে চলেছেন। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য গ্রহণের

পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ব্যাপক হারে। খিদের অতিমারী গ্রাস করেছে দারিদ্রকে। একটি সর্বজনবিদিত সত্য হলো, ঘরে যখন খাবারের আকাল দেখা দেয়, তখন ঘরের মহিলারাই সবার শেষে খান। আর তাই তাঁরাই সব থেকে কম পরিমাণে খান। খাদ্যের এই বিপুল অভাবকে কি সরকার কোনও গুরুত্ব দিয়েছে? না। 'ভাগ্যের হাতে' জীবনকে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছেন দেশের গরিব মানুষ। দুধ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম, ধান ও গম উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে থেকেও বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১০২তম (১১৭টি দেশের মধ্যে)। সারা বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস ভারতে। অপুষ্টির শিকার শিশুদের মধ্যে ৩০.৮ শতাংশই ভারতে। এখানে প্রতি পাঁচ জন শিশুর মধ্যে এক জন শিশু অপরিণত এবং স্বাভাবিকের থেকে কম ওজনের।

ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া-র ১ জুন, ২০২০-র তথ্য বলছে, ভারতে খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে ১০.৪ কোটি টন। নিয়মিত ও জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের থেকেও ৮.৩ কোটি টন বেশি। দেশের সমস্ত অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে সেই খাদ্যশস্য না দিয়ে বাড়তি মজুতকে সরকার ব্যবহার করছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনে। এটা অপরাধ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কীভাবে এই চরম সঙ্কটের মোকাবিলা করছেন মহিলারা, তার অজস্র কাহিনি ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে। গুজরাটের তাঁত কারখানায় কাজ করে এক মহিলা তিন সন্তানকে নিয়ে দিন যাপন করতেন। এখন সেখানে কাজের বরাত নেই। তিন সন্তানকে নিয়ে একবেলা খেয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছেন তিনি। আমেদাবাদে এক ঠিকাদারের অধীনে সেলাইয়ের কাজ করে পোশাক পিছু সামান্য মজুরিতে যিনি সংসার চালাতেন, তিনি আজ কর্মহীন। ঘরে সামান্য যা জমানো টাকা ছিল, তা শেষ। প্রতিবেশীর দেওয়া রেশনের ভরসায় বেঁচে আছেন তিনি। এমনই অগণিত করুণ সংগ্রাম আর দারিদ্রের নির্মম শোষণ আজ লক্ষ লক্ষ মহিলার জীবনের বাস্তবতা। সেই বাস্তবতাকে অনুধাবন করলে অনুভব করা যাবে খিদের ব্যাপকতার অদৃশ্য মুখকে। সে মুখ আসলে কোনও মহিলার।

আমাদের অসংবেদনশীল সরকারের ধারণা ছিল, জনধন অ্যাকাউন্টের ৫০০ টাকাই অনেক! তা একটি পরিবারের মাসিক খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট! গত এপ্রিলের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ডালবার্গ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী ১৮ হাজার পরিবারকে নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছিল, ৪৫ শতাংশ পরিবারের বিনামূল্যে রেশন মেলেনি এবং ৭০ শতাংশেরও বেশি পরিবার জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোনেও অর্থ পায়নি। এই কারণেই আয়করের আওতাভুক্ত নয়, এমন পরিবারগুলিকে নগদে মাসিক সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়ার যে দাবি জানানো হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপক বেকারত্ব

করোনো বিপর্যয় এবং দেশজুড়ে চলা লকডাউনের জেরে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের জীবন এখন অনিশ্চিত। রাতারাতি কর্মহীন ও গৃহহীন হয়েছেন কয়েক লক্ষ মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসাবে এঁদের মধ্যে রয়েছেন ১২ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁদের ৩০ শতাংশই মহিলা। প্রকৃত সংখ্যাটি এর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, অভ্যন্তরীণ (যাঁরা রুজির জন্য বাসস্থান ছেড়ে রাজ্যের মধ্যেই অন্যত্র যান) ও মরশুমি পরিযায়ীদের এই হিসাবে ধরা হয়নি।

ঘরে ফিরতে চাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক, সেই সঙ্গে মহিলা শ্রমিকদেরও দুর্দশা অবর্ণনীয়। তাঁদের প্রতি সরকার, প্রশাসন ও পুলিশের যে অমানবিক ও নির্মম আচরণ দেখা গিয়েছে, তা বিস্ময়কর এবং ক্ষোভের উদ্রেক ঘটায়। নিদারুণ অবসাদ আর খিদের জ্বালায়, এমনকী দুর্ঘটনাতেও প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। কোলে শিশু নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে গিয়েছেন সন্তানসম্ভবা মহিলা শ্রমিক। নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়েই কখনও রাস্তায়, কখনও অটোরিকশায়, আবার কখনও বা হাসপাতালের গেটেই জন্ম দিয়েছেন সন্তানের। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনেই সন্তান প্রসব করেছেন ২৪ জন প্রসূতি। কত মহিলার যে গর্ভপাত হয়ে গিয়েছে, তার হিসাব তো কারও জানাই নেই। লকডাউনের ঠিক আগেই যাঁরা সন্তান প্রসব করেছেন, যাঁদের প্রসবোত্তর পরিচর্যার একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাঁদেরও খবর কেউ রাখেননি।

দ্য সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমিক্স-এর তথ্য বলছে, ১৫ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়েছেন এই লকডাউনে। দিনমজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৯৪ শতাংশ মহিলা এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গেই জড়িত। এ ছাড়াও ২.১ কোটি বেতনভুক্ত কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন লক্ষাধিক মহিলা। অদূর ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাহের কোনও উপায় নেই জেনেও গ্রামে ফিরতে হয়েছে শ্রমিকদের। আবার করোনা সংক্রমণের বিপদ আছে জেনেও পেটের টানে রুজির খোঁজে পুনরায় শহরের পথে পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁদের এক বড় অংশকেই! এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকের হাহাকার, ''এইভাবে গ্রামে পড়ে থাকলে আমরা মরবই, খিদের জ্বালাই আমাদের মেরে ফেলবে।'' এই চরম পরিস্থিতিতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে নারী পাচার চক্র। বাল্যবিবাহের শিকার হতে হয় বহু মেয়েকে।

বেহাল জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা

শোচনীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা আর সেই সঙ্গে অতিমারীর প্রকোপে সাধারণ নাগরিকরা যে অপরিসীম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের ক্ষমতাসীন সরকার সাধারণ মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধাটুকু দিতেও অক্ষম। জিডিপি'র ১ শতাংশেরও কম ব্যয় করা হয় স্বাস্থ্য খাতে। ম্যালেরিয়া আর আমাশয়েই ভারতে যে সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়, তা নজিরবিহীন। প্রতি বছর ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সী ১ কোটিরও বেশি শিশু নিউমোনিয়া ও ডায়েরিয়ার মতো প্রতিরোধযোগ্য রোগে মারা যায়। এই বিষয়গুলিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

করোনা চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে আশাকর্মীরাও। দেশের ৯ লক্ষ জনস্বাস্থ্যকর্মীর ৯০ শতাংশই রয়েছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের ৭০ শতাংশই মহিলা। আর এঁদের বেশিরভাগই করোনার সংস্পর্শে আসছেন। কারণ, তাঁদের পিপিই দেওয়ার কোনও ব্যবস্থাই নেই। সংসদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে স্বাস্থ্য মন্ত্রী নিজের বয়ানে রীতি মতো গলা ফুলিয়ে জানিয়েছেন, যে সব ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের

করোনার গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের কোনও সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারের কাছে নেই!

নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান হিংসা

মোদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় থেকেই উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে নারীদের বিরুদ্ধে গর্হিত অপরাধ ও নজিরবিহীন হিংসার ঘটনা। নির্ভয়া প্রকল্প, ধর্ষণের শিকার মহিলাদের জন্য গঠিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মতো প্রকল্পগুলির কোনওরকম উন্নতিসাধন করা হয়নি। 'বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও' স্লোগান আরও একটি 'জুমলা' ছাড়া আর কিছুই নয়। দলবদ্ধ ধর্ষণ, অপহরণ, শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন, নীতি-পুলিশি, অনার কিলিং বা পরিবারের সম্মান রক্ষার দোহাই দিয়ে খুন– এ সবই বৃহত্তর প্রচলিত ব্যবস্থার জ্বলন্ত সমস্যা। বিজেপি-আরএসএস'র পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছে সংবিধান বহির্ভূত ও স্বনিযুক্ত নজরদারির দল, যারা লুটপাট, খুন, দল বেঁধে প্রহারের মতো অপরাধের পরও লাগামহীন এবং বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ন্যূনতম শাস্তি ছাড়াই। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রতি তিন মিনিটে নারীদের উপর কোনও না কোনও অপরাধ সংগঠিত হয়ে চলেছে। প্রতি ২৯ মিনিটে ধর্ষিতা হচ্ছে একজন মহিলা এবং পণের বলি হচ্ছেন প্রতি ৭৭ মিনিটে এক জন। ১০টি ধর্ষণকাণ্ডের মধ্যে ৬ জন মেয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক।

লকডাউন চলাকালীন এপ্রিলেই এনসিডব্লিউ'র (জাতীয় মহিলা কমিশন) হেল্পলাইনে গার্হস্থ্য হিংসার এত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, যা তার আগের মাসের মাসের তুলনায় দ্বিগুন। এনএফএইচএস-৪'র পরিসংখ্যান বলছে, বিবাহিত মহিলাদের এক-তৃতীয়াংশ (৩১ শতাংশ) তাঁদের স্বামীদের হাতেই শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ এবং বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার। এমতাবস্থায় নির্যাতনকারীর সঙ্গে আপস করা ছাড়া এক বিরাট সংখ্যক মহিলার সামনে আর কোনও পথই খোলা থাকছে না বিকল্প পরিকাঠামোর অভাবে। গার্হস্থ্য হিংসার এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নির্যাতিত মহিলাদের বিকল্প আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক। আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে বাল্যবিবাহ ও নারী পাচারের মতো ঘৃণ্য ঘটনাও।

বিজেপি-আরএসএস'র সাম্প্রদায়িক প্রচার

লকডাউনকে কাজে লাগিয়েই বিজেপি সরকার তার হিন্দুত্বের কর্মসূচীকে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে প্রতিশোধমূলক নিপীড়নের নিন্দনীয় নীতিকে। সেই সঙ্গে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে অনুসরণ করছে তাদের কর্তৃত্ববাদী, নয়া উদারনৈতিক অর্থ ব্যবস্থাকে।

ধর্মের নামে মানুষকে বিভাজিত করার কাজে একযোগে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি-আরএসএস। একদিকে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, আর অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হিংসায় উসকানি, সঙ্গে চালানো হচ্ছে বিদ্বেষমূলক প্রচার।

সিএএ, এনআরসি, এনপিআর'র প্রতিবাদে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ, এনএসএ'র মতো কঠোর আইনকে কাজে লাগিয়ে চলছে ক্রমাগত গ্রেপ্তারি এবং জেল। নাগরিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক শ্রেণির অধিকার নিয়ে লড়তে থাকা বিরোধী কণ্ঠকে রুদ্ধ করা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার আইনের নিপীড়নে। ইউপিএ'র ধারায় বন্দিদের বেশ কয়েক জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জামিন দিতে অস্বীকার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্ররোচনা দিয়েও অনুরাগ ঠাকুর, পরবেশ বর্মা এবং কপিল শর্মার মতো বিজেপি নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন খোলা ময়দানে। অতিমারীর ভয়াবহকালে মানুষের দুর্দশার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে, মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এভাবেই তাদের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করছে বিজেপি সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার তো অনেক আগেই তার জনবিরোধী নীতি আর দমননীতির মাধ্যমে স্বেচ্ছাচারিতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। বিগত নয় বছর যাবৎ পুলিশি সাহায্যে ভাড়া করা গুন্ডাবাহিনী দিয়ে নিরপরাধ মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তৃণমূল।

এই দুই হিংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধেই ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বামফ্রন্ট এবং বামপন্থী গণসংগঠনগুলি। কোভিড অতিমারী, আর্থিক দুরবস্থা, আমফানের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধরত ও দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বামেরা।

এক ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশের জন্য লড়াই

উদারীকরণের যুগে বৈষম্য ও অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুন। দেশের মোট সম্পদের ৫৮.৪ শতাংশ কুক্ষিগত হয়েছে মাত্র ১ শতাংশ অতি বিত্তশালীর হাতে। আশ্চর্যজনকভাবে ১০ শতাংশ শীর্ষ বিত্তশালীর হাতেই রয়েছে দেশের ৮০.৭ শতাংশ সম্পদ। আর দেশের শেষ সারির ১০ শতাংশর কাছে পড়ে আছে মাত্র ০.২ শতাংশ সম্পদ। সম্পদের এই ভয়াবহ কেন্দ্রীকরণ দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণকে করেছে নিঃস্ব। বিশ্বে শোচনীয় দারিদ্রের মাপকাঠিতে ভারত শীর্ষে। এই শোচনীয় দারিদ্রের সিংহভাগের উৎপত্তি হয় মহিলাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়ে।

আমরা, আজ সমস্ত ভারতবাসী যে পরিস্থিতির অভিমুখে দাঁড়িয়ে আছি, মূলত মহিলারা সেখানে চরম ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের যে ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা বিজেপি-আরএসএস চালাচ্ছে, তা একটি বিপজ্জনক ভবিতব্যকেই নির্দেশ করছে।

সংবিধানের পরিবর্তে মনুস্মৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা আমাদের রুখে দিতেই হবে। ধর্ম ও ঘৃণাকে হাতিয়ার করে মোদী সরকারের যে মেরুকরণের রাজনীতি, তার বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ। জাতপাতের নিদারুণ নৃশংসতায় আজ সবচেয়ে অসুরক্ষিত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজন। অনুন্নত সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরই।

একটি হিন্দুরাষ্ট্রের ভিত তৈরি হয় শ্রেণি বিভাজন আর বহিষ্কারের নীতির প্রয়োগে, যা উচ্চবর্ণের আধিপত্য আর পুরুষতন্ত্রের কাঠামোকেই আরও শক্তিশালী করে। ভারতরত্ন ড. আম্বেদকরের কথায়– "ভারতে যদি হিন্দু রাজ বাস্তব চেহারা নেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে এই দেশের পক্ষে বৃহত্তম বিপর্যয়" (If Hindu Raj does become a fact, it will no doubt be the greatest calamity for this country)। সেই সঙ্গে তিনি সাবধানও করেছেন এই বলে যে, "তা (হিন্দু রাজ) হবে গণতন্ত্রের পরিপন্থী" (It is incompatible with democracy)। আসুন সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে সঙ্কল্প করি, ভারতবর্ষের বুকে আমরা মনুস্মৃতিকে কখনই অনুমোদন করব না।

অনুবাদ: অলকানন্দা দেবনাথ

বাংলা, শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়, ব্রজভূমি ও মুঘল

ইরফান হাবিব

অঙ্কন : মনীষ দেব

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আগ্রার মুঘল সংগ্রহশালার নাম বদলে ছত্রপতি শিবাজীর নামে করবেন বলে সদর্প ঘোষণা করেছেন। ওখানে মুঘল আমলের পুরাতত্ত্ব নিশ্চিহ্ন করে ব্রজভূমির নানা নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। বস্তুত, ইতিহাসকে বারবারই অজ্ঞতার আঘাতে দীর্ণ হতে হয়। যোগীজী হয়তো জানেনই না যে, ব্রজভূমি মুঘলদের অধিকৃত অঞ্চল ছিল এবং প্রশাসনিক কাজকর্মও সুনির্দিষ্ট করা ছিল। তা ছাড়া মহারাষ্ট্র নয়, বাংলার যোগসূত্র ধরেই ব্রজভূমি একটি পবিত্র অঞ্চল হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

এখানে ছোট করে গল্পটা বলা যেতে পারে। বাংলা থেকে শ্রীচৈতন্য ওই অঞ্চলে আসার পরেই যমুনার ধারে মথুরার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল বৃন্দাবন (কথ্য ভাষায় যা বিন্দ্রাবন, এমনকী বিন্দাবনও) নামে পরিচিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই বৃন্দাবনই হয়ে ওঠে 'ব্রজ মণ্ডলী'র রাজধানী। একেই ব্রজভূমি বলে। স্থানীয়রা ওই অঞ্চলকে ১৫৯৪ সালের (আকবরের রাজত্বকালের শেষ দিকে, ১৫৫৬-১৬০৫) আগে ব্রজভূমি নামে অভিহিত করতেন না। কিন্তু এরপর থেকে স্থানীয় কৃষকরাও জমি বিক্রির সময়ে দলিলে নিজেদের ব্রজবাসী বলে পরিচয় দিতে শুরু করলেন। আকবরের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে চৈতন্যের প্রথম পর্যায়ের দুই শিষ্য রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়ই বৃন্দাবন গড়ে তোলেন। তবে জমির মূল ক্রেতা ছিলেন ওঁদের ভাইপো জীব গোস্বামী। এই তিন জন শুধু নয়, চৈতন্যের সমস্ত শিষ্য এবং অনুগামীই বাঙালি ছিলেন। এঁরা গৌড়ীয় সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। এ কথা স্থানীয় ব্রজ এবং ফারসি নথিতেও পাওয়া যায়। আবার বৃন্দাবনের জমি প্রথম অধিগ্রহণ করেন আলি খান নামে স্থানীয় এক মুসলিম।

তখনই মুঘল প্রদেশের আওতায় চলে আসে বৃন্দাবন। ১৫৬৫ সালে এক ফরমান জারি করে আকবর ২০০ বিঘা জমি দান করেন বৃন্দাবনের মদনমোহন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত গোপালদাসকে। তিনিই ছিলেন সনাতন গোস্বামীর উত্তরাধিকারী। তিনি

বছর পর ১৫৬৮ সালে বৃন্দাবনের মদনমোহন এবং গোবিন্দদেব মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসাবে ঘোষণা করে জীব গোস্বামীর স্থিতিকে আরও পাকাপোক্ত করে দিলেন আকবর। কাকা রূপ গোস্বামী ঠিক এইভাবেই জীবকে ওই মর্যাদা দিয়েছিলেন। এরপর থেকে জীব গোস্বামী একাই ওই দুই মন্দিরের যাবতীয় উপহার এবং দান গ্রহণ করার অধিকারী হন। এমনকী এককভাবে উত্তরাধিকার মনোনয়নেরও স্বীকৃতি অর্জন করলেন। জীব গোস্বামীকে একক কর্তৃত্ব দেওয়ার ফলে পরবর্তী ৫০ বছরের জন্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে এইভাবেই এক সূত্রে গেঁথে ফেলল মুঘল প্রশাসন। জীব গোস্বামীর মৃত্যু হয় ১৬১৮ সালে।

ব্রজ নামের ব্যবহার না থাকলেও ১৫৯৮ সালে এই কথা মাথায় রেখেই অসাধারণ এক ফরমান জারি করে আকবর ব্রজভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা (সর্বমোট ৩৫টি) মন্দিরগুলিকে এক সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। ৩৫টি মন্দিরের মধ্যে বৃন্দাবনেই ছিল ১৭টি, এর মধ্যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরও আছে। এক হাজার বিঘা ইলাহি (২৪০ হেক্টর) দান করা হয়, যার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গৌড়ীয় মন্দির (গোবিন্দদেব, মদনমোহন এবং গোপীনাথ) ছিল। এরই সঙ্গে সহযোগী অন্য মন্দিরগুলির জন্য দান করা হয় ৪৪৯ বিঘা বা ১০৭ হেক্টরেরও বেশি জমি। স্পষ্টতই, রাধাবল্লভদের মতো অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকেও গৌড়ীয়দের বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল মুঘলরা। ওদের জন্য দান করা হয় মাত্র ১৮২ বিঘা বা ৪৪ হেক্টরের মতো জমি।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুগামীরা মুঘল আমলের বহু নথি অত্যন্ত যত্ন করে সংরক্ষণ করে রাখেন। এখান থেকেই আমরা জানতে পারি, তাঁরা সেই সময়ে কীভাবে বিবাহ এবং অভিবাসনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে চলতেন বাংলার সঙ্গে। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুগামীরা অনবরত নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। পরবর্তী প্রজন্মও রূপ না জীব গোস্বামী, কাকে অনুসরণ করবে, একে ঘিরেই বিরোধে জড়িয়ে পড়ে বারবার।

আকবরের পরেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রতি মুঘল পৃষ্ঠপোষকতা থেমে থাকেনি। ১৬১৩ সালে জাহাঙ্গির ২১.৫ হেক্টর জমি দান করেন মদনমোহন মন্দিরকে। ১৬৩৪ সালে জাহাঙ্গিরের উত্তরাধিকারী শাহজাহান অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন কর্মীকে ভর্ৎসনা করেন মদনমোহন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য। তিনি একে "ভগবানের পুজোয়" হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছিলেন। অবিলম্বে ওই ঘণ্টাধ্বনি চালু করার নির্দেশও জারি করেন তিনি।

ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের মন্দির নিয়ে একই নীতি অনুসরণ করে চলেন আওরঙ্গজেবও (রাজত্বকাল ১৬৫৯-১৭০৭)। ১৬৭০ সালে তাঁর মথুরার কেশব রাই মন্দির ধ্বংস আতঙ্ক তৈরি করে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। গোবিন্দদেব এবং গোপীনাথ মন্দিরের পুরোহিতরা মূর্তি সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান ভয়ে। তবে কিছুদিন পরেই ফিরে আসেন। মন্দির বা তাঁদের জন্য অনুদানের জমিও কেড়ে নেয়নি আওরঙ্গজেব প্রশাসন। বস্তুত, ১৭০৪ সালে, তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে অভূতপূর্ব অনুদান বৃন্দাবনের গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে দিয়েছিলেন আওরঙ্গজেব।

ওই বছরেই আগ্রা প্রদেশের রাজ্যপাল মুক্তার খান এক নির্দেশ জারি করে ব্রজভূমিকে সরকারি স্বীকৃতি দেন। এই ব্রজভূমিতে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮টি পরগনা, যার মধ্যে ১৩টি যমুনার পশ্চিম পাড়ে এবং বাকি ৫টি পূর্বে অবস্থিত। এই বিশাল এলাকার গ্রামগুলিকে বছরে ১ টাকা (দুই ফসল পিছু আধুলি) কর দিতে হতো বৃন্দাবনের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রধানকে, যিনি ব্রজানন্দ বলে পরিচিত ছিলেন। সব মিলিয়ে বছরে ২০০০ টাকার বেশি কর আদায় হতো। সেই সময়ে ওই অর্থ বেশ ভালো পরিমাণই বলা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যখন মুঘল সাম্রাজ্য অস্তমিতের পথে, তখনও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা বজায় থেকেছে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রতি। আকবরের আমলের বরাদ্দ পরবর্তীকালেও বজায় রাখেন মুঘল সম্রাটরা। গৌড়ীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখা হয় সব আমলেই। উত্তরাধিকারহীন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুক মারা গেলে তাঁদের সম্পত্তির দাবিদার হবে গোবিন্দদেব মন্দির, এই বিশেষ অধিকার দেওয়া হয় ১৭২১ সালে।

মুঘল আমলে কী ধরনের সহনশীলতা বজায় রাখা হতো অন্য ধর্মের প্রতি, তা এই সব তথ্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়– যা আজকের শাসকের কাছে আশা করা দুষ্কর। তবে এই তথ্য বাংলার মানুষের পক্ষে বেশ উৎসাহজনক। শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে সেই মুঘল আমল থেকেই বৃন্দাবন এবং ব্রজভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে বাংলার মানুষের।

আঁধার নামার আগেই

মৃদুল দে

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

তীব্র গতিতে মোদী রাজত্ব ও তার পরিচালক ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরিবার বা সঙ্ঘ পরিবার ছুটছে সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ঘনীভূত আর্থিক মন্দা, দুর্নীতি, আর্থিক উদারবাদের আরোগ্যহীন পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি এবং শাসন পরিচালনায় চরম দেউলিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক হতশ্রী দিশাহীনতায় যখন কংগ্রেসের ডুবন্ত অবস্থা, তখনই কর্পোরেট-হিন্দুত্বের জোট ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের দু'বছর বাকি থাকতেই মাঠে নেমে পড়ে অর্থ-মিডিয়া-সাম্প্রদায়িকতা এবং অসম্ভব-অবাস্তব-আজগুবি প্রতিশ্রুতির ঝড় বইয়ে দিয়ে। আরএসএস'র প্রচারক এবং গুজরাট গণহত্যার সংগঠক নরেন্দ্র মোদীকে এই কর্পোরেট-আরএসএস চক্র তুলে ধরে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। ভারতের রাজনীতিতে চরম দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিস্ত কর্মসূচীর প্রধান ধারক-বাহক বিজেপি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দল হিসাবে নিজেকে হাজির করে ১৯৮৯ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উত্তেজনা সৃষ্টির রথযাত্রা থেকে– ১৯৯২ সালে প্রকাশ্যে বাবরি মসজিদ ভাঙার অভিযানের পর থেকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদকে কলঙ্কিত করে তীব্র প্রচারে হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদকে এক, একমাত্র ও বিতর্কহীন করে তোলার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। এর জন্য তাদের দরকার প্রধান শত্রু হিসাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু করা; দারিদ্র, অপুষ্টি, বেকারত্ব শত্রু নয়। রাঘববোয়াল পুঁজিপতি গোষ্ঠী বা কর্পোরেটরা শত্রু নয়। নয়া উদারবাদ পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীরা শত্রু তো নয়ই। দেশের এই শত্রুদের ঘিরে থাকা লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, জালিয়াত, মজুতদার, কালোবাজারি ও লুম্পেন বাহিনীরাও শত্রু নয়– তারা হিন্দুত্ব ও ফ্যাসিস্ত প্রকল্পের পরম বন্ধু। সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিস্ত চরিত্রের জন্য গলা ফাটিয়ে বিজেপি-আরএসএস কর্পোরেট ও তাদের মিডিয়ার সহযোগে ভ্রান্ত আত্মগৌরবের প্রচারে সমাজজীবনের প্রত্যেক অংশকে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রকল্প তাদের কাছে মুখ্য। দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের উল্লাস বর্ধনে তারা আরও আগ্রাসী উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ইত্যাদির জন্য তুমুল প্রচার চালায়। সাম্প্রদায়িক-ফ্যাসিস্ত কর্মসূচি এবং আগ্রাসী উদারনীতি ও সাম্রাজ্যবাদমুখী অবস্থান– এ দু'য়ের সমাহারে বিজেপি নিজেদের অন্য ধরনের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিচয় স্থাপন করে।

জাতীয় পর্যায়ে এই শক্তি চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তি ও দল হিসাবে নিজেদের সামনে নিয়ে

আসে, যে দল বা শক্তি ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া ও জমিদারদের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও জঙ্গী অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ঐতিহ্যগত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের যে আবহাওয়া বিরাজ করছিল, তার উপর ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের রূপরেখায় তাদের আঘাতকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। বিপুল অর্থের জোগান ও দেশি-বিদেশি চরম প্রতিক্রিয়ার মদত তাদের মুঠোয়। ১৯৮৮-১৯৯২। এই পর্যায়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য ও হিন্দুত্বকে ভারতের একমাত্র গতিপথ হিসাবে গেঁথে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। আদবানির নেতৃত্বে বাবরি মসজিদ ভাঙার সময়ে দেশ জুড়ে সংখ্যালঘুবিরোধী দাঙ্গা, মৃত্যু, অত্যাচার, রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে আদবানির রথযাত্রার যাত্রাপথে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দু'ধারে এরকম দাঙ্গা পূর্ব-পরিকল্পনার ছক অনুসারে সংঘটিত হয়। সব সময়ে প্রত্যেকটি দাঙ্গার পরিণতিতে, গবেষকদের বিভিন্ন সমীক্ষায়, দেখা যায়, এই সাম্প্রদায়িক শক্তির ভোট বৃদ্ধি, আসন বৃদ্ধি। ১৯৮৪ সালে লোকসভায় ২টি আসন থেকে ১৯৯১ সালে প্রধান বিরোধী দল, ১৯৯৬ সালে ১৬১টি আসনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শেষে ২০১৮ সালে বিজেপি'র ৩০৩টি আসন লাভ পর্যায়ক্রমে এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা সংঘটিত করার ফসল। হিন্দু ভোটের জন্য 'হিন্দুত্ব' স্লোগান– এটা আদবানি গোপন করেননি। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভায় 'হিন্দুত্ব'কে দলীয় তত্ত্ব হিসাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদ অত দ্রুত সরাসরি গ্রহণযোগ্য হবে না বুঝে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' আরএসএসের পরীক্ষাগারে নতুন করে নির্মাণ করা হয়, যা ছিল সাম্প্রদায়িকতার ভদ্রস্থ ভিন্নতর নাম।

সংবিধান রক্ষা ও হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদ রুখতে কর্তব্যচ্যুত আদালত

প্রত্যেকটি নির্বাচনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি ও অভিযোগ ওঠে। নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা জমে ওঠে। ফয়সালা হয় না। ১৯৯৫ সাল থেকে ঝুলে আছে এ প্রসঙ্গে নানা মীমাংসারহিত মামলা। ১৯৯৬ সালের ১৬ এপ্রিল এ সম্পর্কিত এক মামলায় দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্বাচনে আইন অনুযায়ী ধর্ম নিয়ে প্রচারকে অসদুপায় অবলম্বন বলে মত প্রকাশ করে বলেন, এ সব প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করা হোক; কারণ, এই সিদ্ধান্তের উপর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা রক্ষা নির্ভর করে এবং এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে অত্যন্ত দায়িত্ব ও প্রত্যয় নিয়ে। দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে নির্বাচনে ধর্মীয় প্রচার, ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করতে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের কাছে মামলাগুলি পাঠানোর জন্য তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'সম্ভব হলে যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।' দু'টি বিষয় প্রধান বিবেচ্য, যে কোনও বক্তব্যের দায়িত্ব পার্টিকেই নিতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, বক্তব্যের বিষয়বস্তু ও পরিধি নির্ধারণ। 'এই সিদ্ধান্ত না হলে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।' কিন্তু সেই থেকে শীর্ষ আদালত নড়েনি। বলা যায়, হিন্দুত্ব রাজনীতির প্রাবল্যের বিরুদ্ধে বলার সাহস করেনি। যদি সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক প্রচারও হয়, তাও একই সঙ্গে নিষিদ্ধযোগ্য। ২০১৬ সালে সাত সদস্যের বেঞ্চে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ দিয়ে বিষয়টিতে প্রত্যক্ষ সমর্থন দেওয়া হয় যে, 'আমরা এই পর্বে হিন্দুত্ব বা ধর্ম নিয়ে কোনও কিছু বিবেচনা বা যাচাই করব না।' আবেদনকারীরা প্রশ্ন তোলেন, এ পর্বে না করলে কোন পর্বে করবেন! উত্তর নেই। বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে আরও দু'জন বিচারপতি কড়া অভিমত দেন, যে ব্যাখ্যা ও উত্তরই দেওয়া হোক না কেন, ধর্ম-বর্ণ-জাত-সম্প্রদায় ও ভাষার ভিত্তিতে ভোটের আবেদন করা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আমল পায়নি আদালতে; সীমিত কিছু প্রশ্নে রায় হলেও বৃহত্তর প্রশ্নে আদালত ২৫ বছর ধরে পাশ কাটিয়ে চলেছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ এমন একটা রায় দেয়, যেখানে হিন্দুত্বের প্রচার নির্বাচনী রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে কি না, এ প্রশ্ন সম্পর্কে নীরব থেকে যায়। এর পরিণাম ভয়াবহ– অযোধ্যা নিয়ে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের হিন্দুত্বের প্রতি অতি উৎসাহী, একপেশে ও নিরপেক্ষতাবর্জিত রায়। সর্বশেষ, সিবিআই আদালত বাবরি মসজিদ ভাঙা মামলায় আদবানি সহ ৩২ জন অভিযুক্তকে ন্যায়বিচারের দণ্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেকসুর খালাস করে দেয়। দুনিয়া জুড়ে পৃথিবীর সকলের টিভি-যোগে দৃশ্যমান ঘটনায় এ ধরনের রায়ের বেআব্রু নির্লজ্জতা বুঝতে আইন ঘাঁটার প্রয়োজন হয় না। আইনজীবী প্রশান্তভূষণ গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষা করার প্রশ্নে আদালতের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে ১ টাকা জরিমানায় শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু শীর্ষ আদালতের প্রতি পরপর ঘটনায় দেশের জনসাধারণের আস্থা এক বিরাট প্রশ্নবোধের সম্মুখীন হয়েছে। প্রাক্তন বিশিষ্ট বিচারপতিরাও ২০১৪ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্টের স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন করে উপর্যুপরি রায় দানের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম দিল্লি ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি মদন লোকুর এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এক আলোচনাচক্রে এমনও বলেছেন, 'সাজানো মামলায় মাসের পর মাস জেলে আটকে রাখার দানবীয় আইন যেমন এনএসএ বা জাতীয় নিরাপত্তা আইন এবং ইউএপিএ বা বেআইনি কার্যকলাপ নিবারণ আইন মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

শীর্ষ আদালতের আরেকজন প্রাক্তন বিচারপতি একে পট্টনায়েক বলেছেন, 'বর্তমানে অনেকের মধ্যে এই ভয় ঢোকানো হয়েছে যে, তাদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা চাপিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রাখা হতে পারে। কোনও ব্যক্তিকে ফাঁসানোর পেছনে অনেক উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে। একজন নির্দোষ তাঁর জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কিন্তু আইনে অনেক রক্ষাকবচ আছে। আদালত কেন যান্ত্রিকভাবে এত গুরুতর বিষয়গুলি দেখবে! ২০০২ সালে অক্ষরধামে সন্ত্রাসবাদী হামলার মামলায় একটি সম্প্রদায়ের সকল অভিযুক্তকে ১২ বছর পর সুপ্রিম কোর্ট খালাস করে দিল!' বাবরি মসজিদ ভাঙা মামলার রায়ের আগে এ সব বক্তব্য প্রাক্তন বিচারপতি লোকুরের কথায়, 'ডাঃ কাফিল খানকে কীভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে হেনস্তা করা হয়েছে! যারা জাতীয় নিরাপত্তার নামে এগুলি করছে, তারাই দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করছে। প্রতি বছর দেশদ্রোহিতার মামলা বাড়ছে শাস্তি-শূন্য।'

পরিযায়ী শ্রমিকদের চরম বিপর্যয়, উমর খালিদ সহ অসংখ্য ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অনেকে বিনা বিচারে আটক, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশ্নে আক্রান্ত সংবিধান, রাফালে কেলেঙ্কারি সহ দীর্ঘ তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে, যেখানে

বিচারবিভাগীয় কর্তব্য পালনে দৃষ্টিকটুভাবে ব্যর্থ হচ্ছে নানা আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট। তাতে আরও সুগম হচ্ছে ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ব অভিযানের রাস্তা। বিচারব্যবস্থায় এই অবক্ষয় নিম্নতম আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে, বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও। অথচ ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট তুলে ধরেছিল বাবরি মসজিদ ভাঙার সঙ্গে যুক্ত বিজেপি'র চারটি রাজ্য সরকার বরখাস্ত করার সপক্ষে রায় দিয়ে। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যায়, ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের দিল্লির দাঙ্গায়, কাশ্মীরের জনগণের ন্যূনতম বাক স্বাধীনতা সহ সকল মৌলিক অধিকার হরণ করে রাজ্যটিকে ভেঙে জনগণকে কার্যত বন্দিশালায় নিক্ষেপ করার প্রশ্নে আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের মধ্যে নিহিত আছে ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্বের বিপদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রক্ষার প্রতি বিচারব্যবস্থার অসহায় অপারগতা। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এজেন্সি যেমন দিল্লি পুলিশ, এনআইএ, সিবিআই, ইডি ইত্যাদিকে বিজেপি'র স্বার্থসিদ্ধিতে যথেচ্ছভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক বিরোধীদের দোষী-অপরাধী ইত্যাদিতে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এ সবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

আসল ও নকল সাম্প্রদায়িকতা

সংবিধান যখন প্রণীত হয়, তার মূল ভিত্তি গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ সংবিধানে না থাকলেও বিভিন্ন ধারায় তার মর্মার্থ বিস্তৃত। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে অনেক শিথিল ও স্থূল মনোভাব আছে। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক ঠিকই, তবে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের অনেকের শিরার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বিষ নানাভাবে প্রবাহিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও এবং স্বাধীনতার পরও। এর জন্য নেহরুও ১৯৫০'র দশকে দলে এই সাম্প্রদায়িক ভাবধারার প্রতি নরম মনোভাবের বিরুদ্ধে অনেকবার সুর চড়িয়েছিলেন। নেহরু এ জন্য আরএসএস'র এবং মোদীদের চক্ষুশূল। এই তাত্ত্বিক শিকড় তাদের এতই দুর্বল যে, মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও যে কোনও সাম্প্রদায়িক, বিভেদকামী এবং বৈষম্যমূলক জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে কার্যকরী লড়াই করা সম্ভব নয়। অনুসৃত ক্ষতিকর আর্থিক ও সামাজিক নীতিজনিত সমস্যার কারণে জনজীবনে ক্রমবর্ধমান দুর্দশাজনিত গণঅসন্তোষের সুযোগ যখন সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ও বিভেদকামী শক্তিগুলি গ্রহণ করে, তখন দলীয় রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক সঙ্কটও ফাটল ধরায় বুর্জোয়া দলগুলির নিজেদের অভ্যন্তরে। দল হিসাবে সাম্প্রদায়িক না হলেও কংগ্রেস সহ অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলি বরাবর কঠোর ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান নিতে প্রায়শ সুবিধাবাদী, দ্বিমুখী ও ইতস্তত-পুষ্ট রোগের শিকার হয়, সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এ দুই বিপরীত মেরুর শক্তির মধ্যে শত যোজন বিভাজন ও রাজনীতির পার্থক্য এদের অনেকের মধ্যে মুছে যায় বা গৌণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, পদ, লোভ এদের গ্রাস করে। বালাই নেই নৈতিকতার। ব্যস্ত দল বদলের কুৎসিত খেলায়। বিজেপি'র আগ্রাসী আয়ারাম-গয়ারামের ব্যবসা এ অবস্থায় ও এ কারণে এখন হিন্দুত্ব রাজনীতির এক আরও প্রিয় হাতিয়ার। এভাবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার সহ অনেকগুলি রাজ্যের সরকারের দিকে তাকালে হিন্দুত্বের গণ্ডিরেখার মধ্যে তাদের নিকৃষ্টতম চারিত্রিক রূপগুলি ধরা পড়ে। এই দুর্বল অবস্থার কারণে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পরিসর সেই অর্থে সংকীর্ণ করতে হিন্দুত্বের শক্তি অনেকখানি সফল হতে পেরেছে, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবিশেষ ও শক্তিকে 'নকল ধর্মনিরপেক্ষ' বলে প্রচার বাড়াতে সাহস পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে ডামাডোলের মধ্যে ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বিদেশি ধারণা, এই ধারণা ভারতীয় নয়– এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবার মামলাও ঠুকে দেয় এই সংশোধনী বাতিল করার জন্য। বিচারপতিরা এ সব অপযুক্তি খণ্ডন করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বহু ধর্মমতাবলম্বী বিশিষ্ট সমাজে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে, যদি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। তাঁদের মতে, ‘‘কোনও বিশেষ ধর্মমতের রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় আসে, তবে সেই ধর্মকে সরকারি ধর্ম করার ঝোঁক থাকে, অন্য ধর্মগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দেওয়ারও ঝোঁক থাকে, যা সংবিধানের প্রকল্পের বিরুদ্ধে।’’ ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পৃথকীকরণের উপর কার্যত জোর দেওয়া হয় এই তাৎপর্যপূর্ণ রায়ে।

সংবিধানের মূল কাঠামো যে ধর্মনিরপেক্ষ, এটাই মূলত প্রাধান্য পায় এই রায়ে। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাদ দিলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার অকেজো হয়ে যায়। পাকিস্তান কেন্দ্রীভূত একভাষা এক আইনের সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাষ্ট্র; সন্ত্রাসবাদ, হানাহানি, সংঘর্ষ, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকার হরণের বর্বরতায় বিধ্বস্ত। ইসলামিক রাষ্ট্রে যেমন হয়ে থাকে, ভারতেও সাম্প্রদায়িকরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে নস্যাৎ করে, একই সঙ্গে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করাও তাদের লক্ষ্য। বিজেপি-আরএসএস'র মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি এ কারণেই ফ্যাসিবাদের অর্থাৎ গণতন্ত্র ধ্বংসের কারিগর– মোদী রাজত্বে প্রতি মুহূর্তে এ কারণে হিংস্রতম সাম্প্রদায়িক অভিযান ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র ধ্বংসের অভিযান চলছে, সংসদের ভেতরেও একই ধ্বংসলীলা চলছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফ্যাসিবাদ চাপানো হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র– গ্রামসির ভাষায় যা 'আণবিক রূপান্তর'।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদেশি আখ্যা দেওয়াও বিজেপি-আরএসএস'র পরিকল্পিত বিকৃত প্রচার। 'বিদেশি' ধারণা যদি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিমূলক হয়, তা গ্রহণ করতে পারে সাম্প্রদায়িক ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিপরীতে অন্যান্য শক্তিগুলি। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষ একসঙ্গে লড়াই করেন, যা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা। এই ঐক্য ভাঙতে ব্রিটিশরাই উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভাজনের অস্ত্র প্রয়োগ করে। তার আগে ধর্ম নিয়ে বিচ্ছিন্নতা থাকলেও সম্প্রদায়গত কোনও সংঘর্ষ বা বিরোধ দেখা যায়নি। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত কানপুর দাঙ্গার তদন্ত রিপোর্টেই তা উল্লিখিত হয়েছে; উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সম্পর্কেও পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িকতার ছাপ ছিল না। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয় ইতিহাস চর্চা ও রচনায় তাদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেছে, এই ইতিহাসই প্রভাবিত করেছে তৎকালীন বেশিরভাগ দেশি শিক্ষিত অংশ এবং ভারতীয় ঐতিহাসিকদের, যা ব্রিটিশবিরোধী

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিবন্ধক এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রতি সমর্থনসূচক। সাম্প্রদায়িক শক্তি সেই বিকৃত ইতিহাসকে আরও বিকৃত করে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতি করে গিয়েছে। আজ সেই বিকৃতিকে এমন স্তরে এমন মাত্রায় হিন্দুত্ববাদীরা নিয়ে গিয়েছে, যেখানে ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক পুনর্নির্মাণকে 'নতুন ভারত'-এর নামে সরকারিভাবেই বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। গণতন্ত্র, দলিত ও মহিলা বিদ্বেষে পূর্ণ মনুস্মৃতিকে তুলে ধরা হচ্ছে অনুসরণযোগ্য সংবিধান হিসেবে। 'নতুন শিক্ষানীতি' তারই বাহক।

ভারত ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন আবদ্ধ কোনও দেশ ছিল না। বরং বাইরে থেকে কত এসেছে, হানা দিয়েছে, দখল করেছে, বসতি স্থাপন করেছে! এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই আজকের ভারতের গঠন। প্রথম ভারতে আসে আর্যরা, যারা ভারতীয় জনজাতির সঙ্গে মেলামেশার দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। খ্রিস্ট জন্মের আগের অর্ধশতাব্দী থেকে পরের অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত শক, হুন, কুষাণ, গ্রিক, পারসি, খ্রিস্টান, আরব, ইহুদি, তুর্কি, মোগল এসেছে, এরপর এসেছে ফরাসি, ব্রিটিশ, পর্তুগিজ সহ বিভিন্ন ইউরোপীয়ানরা। এই ইউরোপীয়ানরা ছাড়া বাকি সকলেই ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে দীর্ঘ, স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। হানাদার বা পরিযায়ী হিসাবে যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে ঐতিহাসিকদের গবেষণা অনুযায়ী কোনও মহিলা ছিল না। ফলে বিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে এখানেই বর্ণগত সম্পৃক্তি ঘটে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়। ভাষা, সংস্কৃতি, আচার, জীবনপ্রণালী সব মিলেমিশে অভিন্ন সমরূপ ধারণ করেছে, তা নয়। ইতিহাস এই বৈচিত্রই ভারতীয় জনগণকে উপহার হিসাবে দিয়েছে। এই বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ঐক্য অন্তপ্রবাহী। সঙ্ঘ পরিবার পরিচালিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ঘোর বিরোধী, মুসলিম মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে সব অস্বীকার করে নিজেদের বিকৃত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। এ কারণে বৈচিত্রের সম্ভারে অনন্য ও সমৃদ্ধ ভারতে সেকুলার ভাবধারার তারা ঘোর শত্রু।

মার্কসের ব্যাখ্যায় ভারত

দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জ্ঞান বিনিময়ের অন্ধ প্রাচীর ভেদ করে সুদূর লন্ডনে বসে কার্ল মার্কস ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের মধ্যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের বীজ উন্মোচন করেছিলেন। তার চার বছর আগে পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ভারত সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন যে, দেশটা শুধু ধর্মের ভিত্তিতেই বিভক্ত নয়, বিভাজিত উপজাতিতে, জাতিভেদে। এমন একটা স্থিতি সাম্যে এই সমাজের কাঠামো গড়ে উঠেছিল, যার উদ্ভব হয়েছে সমাজের সব সদস্যের মধ্যেকার একটা সাধারণ বিরাগ ও ধারাবাহিক প্রথাকণ্টকিত পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা থেকে; এমন একটা দেশ ও সমাজ, যেখানে শাসকরা সকলেই সকলের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত—এ অবস্থায় ব্রিটিশরা ঢুকে দ্বন্দ্বাকীর্ণ সকলকে অধীনস্ত করতে সক্ষম হয়, যেখানে এই দেশ কি বিজয়ের এক অনিবার্য শিকারে পরিণত হয়েই ছিল না? বাইরে থেকে ভারতে এসে যারা দেশকে প্লাবিত করেছে, তারা অচিরেই হিন্দুস্থানের জনগণের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশদের নৃশংস শাসন-শোষণ লুট প্রসঙ্গে মার্কস ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, ইংল্যান্ডই ভারতীয় সমাজের গোটা কাঠামোটা ভেঙে দেয়, তার পুনর্গঠনের কোনও লক্ষণের দেখা নেই— "বাধ্য হয়েই ইংরেজ বুর্জোয়ারা যা কিছু করুক না কেন, তাতে জনগণের মুক্তি কিংবা তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব কোনও সংশোধন ঘটবে না ... রক্ত আর ক্লেদ, দীনতা ও হীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনও কোনওরকম অগ্রগতি ঘটিয়েছে?"

এই অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য আজও ভারত সহ পুঁজিবাদী বিশ্বে বিরাজমান। পুঁজিবাদের শীর্ষে বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী যুগে শতাধিক বছর ধরে তা অনেক বেশি বর্বর, অনেক বেশি নৃশংস। চারশো বছরে ইতিহাসে পুঁজিবাদের সঙ্কট যখন গভীরতম; গোটা দুনিয়ার অস্তিত্ব বিপন্নতর; ফ্যাসিবাদ, নয়া উদারবাদ, আগ্রাসন সব দাওয়াই যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, তখন এই ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে সঙ্ঘ পরিবার সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ ওষুধে 'নতুন ভারতে' পরিত্রাণের স্বপ্ন দেখাচ্ছে!

A Grant Step to Shake

The STEEL INDUSTRY

Adhunik Group one of the largest Iron & value added Steel Manufacturing units, glorify 41 long years in the industries History of West Bengal & every promision to up lift industrial Status of West Bengal.

With a Group turnover of more than INR 500 crore, which is likely to cross INR 1500 crore in the FY 2005-06 & presence in West Bengal, Orissa, Jharkhand & Meghalaya, Stepping a giant step in Eastern India as whole

Products Manufactured

- TMT Bare / High Carbon / Low Carbon Wire Rods, Rounds.
- High Quality Sponge Iron
- Ferro Manganese, Silicon Manganese & Ferro Silicon
- Billets
- MS & GI Pipes
- PIG Iorn
- Coal

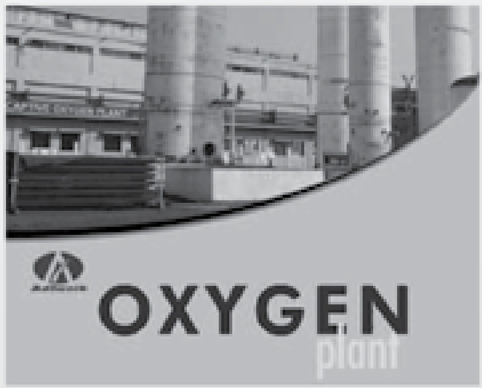

PRODUCTION FACILITIES AT

WEST BENGAL
ORISSA
JHARKHAND
MEGHALAYA

Adhunik

ADHUNIK GROUP OF INDUSTRIES

Lansdowne Towers, 2/1A, Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020, PH- 22890279-84, Fax - 91-22-22890285
E-mail : adhunikgroup@vsnl.net, Website : www.adhunik group.com

১৯৯৮ থেকে ২০০৪– এই ছ'বছর বিজেপি'র নেতৃত্বে কোয়ালিশন এনডিএ সরকার কেন্দ্রে। ২০০৪ থেকে ২০১৪– কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার। ২০০৪-র দশ বছর পর নরেন্দ্র মোদীর বা বিজেপি'র সরকার, তারও ছ'বছর অতিক্রান্ত। বাজপেয়ী সরকারের ছ'বছরে সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক যুদ্ধোন্মাদী ভূমিকা লক্ষণীয়। অন্য শরিকদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে আরএসএস নির্দেশিত বাজপেয়ী সরকার তার হিন্দুত্বের লক্ষ্যপূরণে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেনি। গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে পরোক্ষভাবে বাজপেয়ী সরকারের সমর্থন বা সঙ্ঘ পরিবারের ছকে-বাঁধা ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা সম্পর্কে নীরবতা বুঝিয়ে দেয়, এটা ভবিষ্যৎ হিন্দুত্ব অভিযানের অংশ এবং আরএসএসের মতবাদ ও দীর্ঘ অতীত কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পরীক্ষার 'সফল' কারিগররাই ছ'বছর ধরে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বেপরোয়া। প্রথম দিন থেকে সব কিছু বদল করে 'নতুন ভারত' বা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের জায়গায় নতুন খোলনলচে পালটানো কাঠামো তৈরি করার ব্যাপারে কাজ শুরু করে দেয় মোদী সরকার। সমালোচনা ও বিরোধিতা দমন করতে, বিরোধী শক্তি নিশ্চিহ্ন করতে, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন আদালত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, পুলিশ-নিরাপত্তা বাহিনী, নির্বাচন কমিশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-গবেষণাকেন্দ্র, সমীক্ষক সংস্থা– প্রায় সবগুলিকে পদানত করা হয়েছে। এই হলো নতুনত্বের নমুনা। নতুনত্বের নামে আরও পেছনে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে ঠেলে দেওয়ার আগ্রাসী অভিযান চলছে। নতুনত্ব আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আরও অধীনতা বরণ করে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক অভিযানের উৎসাহী-অংশগ্রহণ; নতুনত্ব মিডিয়াকে কুক্ষিগত করে 'হিন্দুত্ব অ্যাজেন্ডা' কার্যকর করার কাজে নামানো, বিভিন্ন অংশের মানুষের উপর পৈশাচিক বর্বরতাকে স্বাভাবিকত্ব বলে মানিয়ে নেওয়া; নতুনত্ব কর্পোরেট বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে আরও শক্তিশালী গাঁটবন্ধন। এর রাজনৈতিক অবস্থান কী? সেটা ফ্যাসিবাদ শব্দ, তার তত্ত্ব ও প্রয়োগের উদগাতা ইতালির মুসোলিনীর কথাতেই পরিষ্কার: ''ফ্যাসিবাদকে আরও উপযুক্তভাবে বলা যায় কর্পোরেটবাদ। কারণ, এটা হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে কর্পোরেট শক্তির সংযুক্তি।'' অতলগামী অবক্ষয়ী পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদ। সঙ্ঘ পরিবার এবং মোদী সরকারের নতুনত্ব ভারতীয় অবস্থায় মুসোলিনীর তত্ত্ব প্রয়োগ।

দানবীয় একনায়কতন্ত্রী স্বৈরশাসনের রাষ্ট্রনির্মাণ কোনও শাসকের মরজিমাফিক নয়, কোনও খেয়ালি ইচ্ছাপূরণও নয়। ক্রীতদাস কেনাবেচা থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এরকম রাষ্ট্র, শাসক ও শাসনপ্রণালী নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। যতই প্রাচীন ভারতকেও হিন্দুত্ববাদীরা স্বর্ণযুগ বলুক না কেন, যে স্বর্ণযুগে জাতবৈষম্যের নৃশংসতা, সতীদাহ প্রথা থেকে অনেক বর্বর ব্যবস্থা চালু ছিল, যুগ যুগ ধরে যা চলে এসেছে সমাজে। মধ্যযুগের রাজতন্ত্রের কঠোর শৃঙ্খলে বাধাপ্রাপ্ত পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ– তাকে ভাঙতেই পুঁজিবাদীরা ইউরোপ বা আমেরিকায় তীব্র লড়াই করে, ভেঙে দেয় সেই শৃঙ্খল, যে ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। তারপরেই বিপ্লব– ব্রিটেনে ১৬৪৪ সালে, আমেরিকায় ১৭৭৬ সালে, ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে। পরের ৫০ থেকে ১০০ বছরে বিপ্লব বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয় পুঁজিবাদের বিজয়। ''পুঁজির উদ্ভবের সূত্রপাত থেকেই শুরু পুঁজিপতিদের সঙ্গে মজুরি– শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব সংঘাত।'' (মার্কস 'ক্যাপিটাল', প্রথম খণ্ড)। আজও তা বহমান অনেক বেশি নৃশংসতায়। ফরাসি বিপ্লবে সমতা, গণতন্ত্র স্বাধীনতার স্লোগানে শ্রমিক-কৃষক ও পুঁজিপতিরা এক হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করে পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের বোনাপার্টের শাসন কায়েম হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার হয় রাজতন্ত্রের বৈধতা নিয়ে। এই ফ্রান্সেরই একটা অংশে ১৮৭১-এ পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক বিপ্লব সফল হয়, গঠিত হয় প্যারী কমিউন। অসাধারণ অবদান ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকদের আর্থিক-রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়। গোটা পুঁজিপতিশ্রেণি চরম হিংসাত্মক উপায়ে উৎখাত করে এই সরকারকে, বীর যোদ্ধা ও নেতাদের হত্যাকাণ্ডে ভাসিয়ে দেয় রাজপথ। শ্রমিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে সামরিক জেনারেল গালিফেটের নির্দেশে প্রায় ৩০ হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুকে গুলি করে হত্যা করা হয়, ৪৫ হাজার গ্রেপ্তার হয়, তার মধ্যে ১৫ হাজারকে মৃত্যুদণ্ড, বর্বর অত্যাচার ও দুর্গম দ্বীপে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়, বিদেশে পালিয়ে যান হাজার হাজার মানুষ। প্যারিসের অভিজাত সমাধিতে তার নাম পুঁজিপতিরা খোদাই করে রাখে ১৯০৯ সালে। আজ পর্যন্ত গোটা ইতিহাসটাই প্রতিবাদীদের রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু জয়ী হয়নি অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী, প্রতিবাদও দমিত হয়নি, হবেও না। এই ঐতিহাসিক সূত্রের লেখনে মোদী-শাহরা এবং তার পূর্বসূরিরা চোখ বুজে ছিল, আছে এবং অন্তিম পরাজয় পর্যন্ত থাকবেও।

পৃথিবীর ঘৃণ্যতম লোকদের বিভিন্ন দেশে অত্যাচারীদের জাদুঘরে সম্মানিত করা হয়েছে। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সেনাপতি বা কম্যান্ডার জন ফস্টার ডালেস-এর নামে হয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এরকম দৃষ্টান্ত অনেক। ভারতেও এখন সঙ্ঘ পরিবার পূজ্য করে তুলছে গান্ধী-হত্যাকারীকে। ইউরোপে পূজ্য করে তোলা হচ্ছে হিটলার, মুসোলিনীকে। নয়া-ফ্যাসিস্ত ও চরম দক্ষিণপন্থীরা হিংস্রতায় প্রতিবাদী কণ্ঠকে নির্মূল করার হুমকি দিয়ে সর্বত্র এভাবে ফ্যাসিবাদের জয়গান করছে। ব্রাজিলের বর্তমান রাষ্ট্রপতিকে মোদীর আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভারতে সম্মানে ভূষিত করা হয়, যে বোলসোরানো নিজেকে ফ্যাসিস্ত বলে জাহির করে ব্রাজিলে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র পত্তনের উদ্ধত ঘোষণা করেন।

ফ্যাসিবাদ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়, পরাস্তও হয়। আবার সঙ্কটের সময়ে তাকেই আশ্রয় করে পতনোন্মুখ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা দেশে দেশে আদিম উন্মত্ততায় জাতীয়তাবাদ, জাতীয় নিরাপত্তা, 'হৃত গৌরব' প্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে এখন আস্ফালন করছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারায় পুঁজিবাদী বলয়ের এই ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয়, অবিকল একই রূপে, একই রাস্তায়, একই ধাঁচে তা হওয়ার নয়। ইউরোপে যখন হিটলার-মুসোলিনীর বীভৎসতম ফ্যাসিস্ত দৌরাত্ম্য, তখন আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেনেটর হুয়েই লঙ এ কথাই বলেছিলেন, ''আমেরিকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার নামে ফ্যাসিবাদ আসবে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমার আশঙ্কা জাতীয় নিরাপত্তার নামেই আমেরিকার ফ্যাসিবাদ আসবে।'' ৪২ বছর বয়সে ১৯৩৫ সালে তিনি খুন হয়ে যান।

ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত রাজত্বই একবিংশ শতাব্দীতে ফ্যাসিবাদের লক্ষণগুলি পরিষ্কার করে দিতে পারে। ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

সামরিক বাহিনীতে কাজের পর ইতালির ভগ্নদশা দেখিয়ে মুসোলিনী দেশকে বাঁচাতে নতুন ইতালি গড়তে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক জন একনায়ক বা ডিক্টেটরের প্রয়োজনীয়তার আহ্বান জানান। দেশের বিভিন্ন জায়গায় আবেগময় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। এরকম এক জন একনায়কই পারে ব্যাপক বেকারি, রাজনৈতিক দলগুলির তীব্র বিরোধ ও ঝগড়াঝাঁটি, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের ঘনঘন ধর্মঘট-আন্দোলন ইত্যাদি স্তব্ধ করতে। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লব হয়েছে। তার আতঙ্কও ছড়ায় এই বক্তৃতায়। সাড়া দিয়ে যুদ্ধ ফেরত সামরিক অফিসারদের নিয়ে মিলান শহরে ফ্যাসিস্ত তাণ্ডব সংগঠিত করে। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজপ্রতীক দণ্ডসজ্জিত কুঠার (fasces)-কে নিজের সংগঠনের প্রতীকচিহ্ন ঘোষণা করে 'ফ্যাসিজম' তার তত্ত্ব বলে প্রচার শুরু করে। রাস্তায়, মহল্লায় সংঘর্ষ করতে স্কোয়াড তৈরি করে, যারা পরবে কালো পোশাক। এই ব্ল্যাকসার্ট বাহিনী 'ফ্যাসিস্ত' তত্ত্ব নিয়ে সমালোচনা শুনলেই পেটাই দেয়। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী বৃহৎ ব্যবসায়ী, বিরাট বিরাট সম্পত্তির মালিক, শিক্ষক, চিকিৎসকদের মতো মধ্যবিত্ত উচ্চ আয়ের পেশাজীবীদের তাৎক্ষণিক সমর্থন পায় এই ফ্যাসিস্ত আন্দোলন। মুসোলিনী ১৯২১ সালে গঠন করে ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ত পার্টি। তখনও কমিউনিস্ট, সমাজবাদী ও বামপন্থীরা যথেষ্ট শক্তিশালী ইতালিতে। ১৯২২ সালের শেষে রাজধানী রোমে হাজার হাজার লোক নামিয়ে মুসোলিনীর নতুন পার্টি সশস্ত্র তাণ্ডব শুরু করে। ভয়ে সরকারের অনেকে পদত্যাগ করে পালায়। রাজাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে। মুসোলিনি তার দাবিদার, রাজা নতিস্বীকার করে, কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী হয় মুসোলিনী। ১৯২৪ সালে নির্বাচন ডেকে বিপুল অর্থ ঢেলে, প্রচণ্ড সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে এবং ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে ছোটখাট কয়েকটি বশ্য পার্টিকে সঙ্গে নিয়ে এই ফ্যাসিস্ত পার্টি ৬৬ শতাংশ ভোটের দখল নেয়। বিলম্ব না করে আইন বানিয়ে প্রতিবাদসভা নিষিদ্ধ করা হয়। বিরোধী সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়। ফ্যাসিস্ত পার্টি ছাড়া অন্য কোনও পার্টি থাকবে না বলে পরোয়ানা জারি করে, গঠন করে রাজনৈতিক পুলিশবাহিনী। ৮-১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সংগঠন তৈরি করে তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ, সামরিক কায়দায় যুবকদের ট্রেনিং এবং ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের নীতি-আদর্শ নিয়ে শিক্ষা বা মগজ ধোলাইয়ের আয়োজন করে। ক্যাথলিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গণ্য করতে গির্জার সঙ্গে চুক্তি করে। বিনিময়ে গির্জা ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের প্রচারক হয়ে ওঠে। মহিলাদের বলা হয়, তারা কেবল সন্তানের জন্ম দেবে, যারা ভবিষ্যতে ইতালির যোদ্ধা হবে, 'গৌরব' রক্ষা করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মুসোলিনীর নামে সর্বত্র জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। তিন বছরের মধ্যে ফ্যাসিস্ত শক্তি বামপন্থী, অ-বামপন্থী উদারনৈতিক, মুক্ত চিন্তার বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উভয়ের জোট তৈরি হয়, মুসোলিনী অধীনস্ত হয় শক্তিধর হিটলার শাসনের, সায় দিতে হয় ইহুদি ধ্বংসে। বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদের রূপ ভিন্নতর হলেও কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। যেমন, রাষ্ট্র হবে কেন্দ্রীভূত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সমাজের সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এক দেশে সব কিছু হবে এক, ব্যক্তিগত যা স্থানীয় কোনও অধিকার থাকবে না, সবই সমর্পিত থাকবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের হাতে; শাসন ক্ষমতা থাকবে এক ও অদ্বিতীয় একনায়কের হাতে, অন্যেরা থাকলেও শেষ কথা বলবে ডিক্টেটর; ইউনিয়ন, ধর্মঘট, প্রতিবাদ থাকবে না। এটাই হবে শৃঙ্খলা, বৃহৎ সম্পত্তির মালিকরা রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলবে; অন্যান্য সব জাতির চেয়ে দেশের মূল জাতি থাকবে শ্রেষ্ঠ; সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে হবে, দুর্বল দেশ দখল করে মহান দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব আয়ত্ত করাই ফ্যাসিস্তদের কাছে প্রধান বিষয়। এই দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন হতো না, যদি মোদী রাজত্বে বর্তমান ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে তার সাদৃশ্য না থাকত। এটা আজকের বিষয় নয়। ১৯২৫ সালে আরএসএস'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চলে আসছে। তাই হিন্দু মহাসভার প্রথম সভাপতি বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে ফ্যাসিস্ত সংগঠন তৈরির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে ১৯৩১ সাথে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মুঞ্জে তাঁর দীর্ঘ ডায়েরি জুড়ে মুসোলিনী ও ফ্যাসিবাদের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। মারাঠা ভাষায় এই স্তুতির প্রচারও হয়। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে হিটলারের নাৎসিবাদ ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা জ্ঞাপন করে আরএসএস এবং সঙ্ঘীরা। (প্রামাণ্য তথ্য 'ফ্রন্টলাইন', ২৩ জানুয়ারি, ২০১৫)। সেই আদর্শগত ও সাংগঠনিক ধারাতেই সঙ্ঘ পরিবারের পথচলা ও ব্যাপ্তি, যার শীর্ষে বিভিন্ন কলাকৌশল খাটিয়ে বিজেপি'র নির্বাচনী ক্ষমতালাভ তাৎপর্যবহ। মোদী সরকার ও সঙ্ঘ পরিবারের ক্রিয়াকলাপ এই বৃত্তের বাইরে এক বিন্দুও নয়। জঙ্গী জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক, যুদ্ধ-উন্মত্ততা এখান থেকেই।

অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

ফ্যাসিস্ত নীতি ও ফ্যাসিস্তসুলভ কার্যকলাপ এখন দেশে দগদগে ক্ষত হয়ে উঠেছে। প্রতিরোধে আটকানো না গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভারতীয়দের এবং দেশের সমূহ ক্ষতি অবধারিত। পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭০-এর দশকে আধা-ফ্যাসিস্ত শাসনের ভয়াবহতার শিকার। তার চেয়েও দানবীয় তৃণমূলের শাসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এখনও জ্বলন্ত, যার প্রশিক্ষণ সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে রাজনৈতিক একাত্মতায়। দেশের সংবিধান, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি, আর্থিক সার্বভৌমত্ব সব কিছুই মোদী শাসনে সম্পূর্ণ বিপন্ন। ইউরোপে পুরানো, ভারতে নব্য সংস্করণ।

বেকারি, দারিদ্র সহ এর থেকে মুক্তির জন্য 'আজাদি'র স্লোগান প্রকম্পিত করেছে ভারতের জনপদকে। রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই লড়াই-সংগ্রাম, প্রতিবাদ-ধর্মঘট অব্যাহত। কিন্তু এই স্বৈরশক্তিকে পরাস্ত করার মতো শক্তি অর্জন এখনও বাকি। এ লড়াই দুনিয়া জুড়েই গড়ে উঠছে। খোদ আমেরিকাতেই শ্বেতাঙ্গবাদী ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই অন্যান্য দেশের নিপীড়িত জনগণকেও উদ্দীপিত করছে। ফ্যাসিস্ত অভিযানের নিপীড়কদের যাত্রারোধ সব থেকে বড় জাতীয় কর্তব্য হিসাবে সর্বস্তরের জনগণের সামনে হাজির হয়েছে। নতি স্বীকার নয়, ভয়ে বিনাশের শক্তির স্তাবকতা নয়; জীবনজীবিকা, স্বাধীনতা, দেশ ও সত্যকে বাঁচানোর সর্বমুখী লড়াই এটা। আঁধার নামার আগেই ভয়কে জয় করে রুখতে হবে বিপদ। 'মিথ্যা ও ধূর্ততার চেয়ে অন্য সব কিছুই ভালো।'— টলস্টয়ের আন্না কারেনিনা উপন্যাসের চরিত্রের এই উক্তি সব ক্ষেত্রেই শাশ্বত, রাজনীতির বাইরে থাকা মানুষদেরও গর্জে ওঠার সময় এটা।

জনস্বাস্থ্যে অগ্রগতির লক্ষ্যে কেরালা

কে কে শৈলজা

বর্তমানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিক থেকে দেশের এক বড় অংশকে অনেক পিছনে ফেলে সাফল্যের সঙ্গে সেরার শিরোপা আদায় করে নিয়েছে কেরালা, সঙ্গে মিলেছে হাজারো প্রশংসা। সাধারণত স্বাস্থ্য সূচক, প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, শক্তিশালী স্বাস্থ্য বলয় এবং অন্যান্য এমন তেইশটি বিচার্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পরেই এই জাতীয় স্তরের ক্রমাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। আর এই সমস্ত দিক বিচার করলে শক্তিশালী রাজকোষ যুক্ত অনেক রাজ্যের থেকেই অনেকটা এগিয়ে থাকতে পারে আমাদের কেরালা। ঠিক যেমন সদ্যজাত শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হারের নিরিখেও কেরালার অবস্থান সর্বনিম্নে, যা মুলত এই রাজ্যের উচ্চ মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থারই ইঙ্গিতবাহী। কিছুটা এভাবেই কেরালা ধীরে ধীরে তার বিকাশের লক্ষ্যমাত্রার মাইলফলক স্পর্শ করতে পেরেছে। টিকাকরণ, হাসপাতালে প্রসবের সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা শিশু জন্মের লিঙ্গ-অনুপাত, সবের ক্ষেত্রেই রাজ্য তার মান প্রশংসনীয়ভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে, দেশের অন্যতম সেরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রথম ১২টিই হয়ত এই রাজ্যের। পুঝানাড় ও কায়ুর পঞ্চায়েতের পারিবারিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটি তাদের গুণগত মানের জন্য যে শুধুমাত্র ১০০-র মধ্যে ৯৯ পেয়েছে, তা নয়। সেই সঙ্গে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানও অর্জন করেছে। আমাদের রাজ্য যে স্বাস্থ্যে জনপরিষেবায় দেশে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে যাচ্ছে, এটি তার আর একটি উদাহরণ মাত্র– যা আবারও রাজ্যের তৃণমূল স্তর থেকে বিস্তৃত উন্নত মানের এবং কার্যকরী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকেই নির্দেশ করছে।

দীর্ঘ সময় ধরে কেরালার স্বাস্থ্য বিভাগ একটি সুস্পষ্ট ও উদ্দেশ্য যুক্ত লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ আমরা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে উঠছি। তা সে ভয়ানক নিপা ভাইরাসের আক্রমণই হোক বা বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব কিংবা বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে কার্যকরী ভূমিকাই হোক। অথচ এত সুদক্ষ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ষাট শতাংশেরও বেশি মানুষ তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বেসরকারী হাসপাতাল

এবং ক্লিনিকের উপর নির্ভর করে থাকেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ও বেসরকারি হাসপাতালের হাতে সাধারণ মানুষের বেলাগাম শোষণের পায়ে বেড়ি পড়াতেই রাজ্য সরকার কেরালার ক্লিনিকাল এস্টাব্লিশমেন্ট (নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৮ কার্যকর করেছে, যা একাধারে অনন্য এবং তুলনাহীন একটি আইনি হস্তক্ষেপ। এই আইনের কড়া নজরেই সব ধরনের পরীক্ষা ও চিকিৎসার মান এবং তার খরচ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে এবং ফলস্বরূপ রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা যেমন নিশ্চিত করা গিয়েছে, তেমনই রাশ টানা গিয়েছে ব্যয়বহুল চিকিৎসায়।

কেরালা সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি ত্রিস্তরীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর একদম নিচের স্তরে আছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তারপরেই তালুক, জেলা ও সাধারণ হাসপাতাল এবং তৃতীয় স্তরে রয়েছে মেডিক্যাল কলেজ। ক্যান্সার, টিবি বা যক্ষা, কুষ্ঠ ও মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির মতো সমস্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠানও এই ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

২০১৬ সালে ক্ষমতায় আসার পরই বর্তমান এলডিএফ সরকার কেরালার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজানো ও তার আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। সরকারের মূল চারটি কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম একটি হলো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ‘আরদ্রাম’, যার উদ্দেশ্য একাধারে যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের ব্যয় হ্রাস, তেমনই দ্বিতীয় প্রজন্মের সামনে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও নির্দিষ্টভাবে জীবনযাত্রার ধরনের কারণে সৃষ্ট রোগের মোকাবিলা। আরদ্রাম কর্মসূচীটিকে ২০২০ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে যথাক্রমে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিকাশের লক্ষ্যমাত্রাকে একসূত্রে বেঁধে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (এফএইচসি) রূপান্তর এবং প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় স্তরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত সর্বত্র কার্যকরী ও আধুনিকমানের রোগী-বান্ধব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচীতে। তবে সরকারি কোষাগারের অবস্থা এবং রাজ্যের অন্যান্য আর্থিক ঘাটতিগুলির দিকে নজর দিলে প্রথমেই একে এক বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাছে রাজনৈতিক দিক থেকে জোরালোভাবে দায়বদ্ধ, যাঁরা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উপভোক্তা। তাঁদের কথা ভেবেই এই আরদ্রাম কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের স্বার্থেই এই প্রকল্পকে বিজ্ঞানসম্মত এবং সুপরিকল্পিত পরিচালন কৌশলের মাধ্যমে দক্ষতার সঙ্গে রূপায়ন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ১৭০টি পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে করা হয় ৫০৪। এমনকী বিপজ্জনক কোভিড পরিস্থিতিতেও আমরা ১০২ টি পিএইচসি বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা এফএইচসি-তে রূপান্তরিত করেছি, যার ফলে রাজ্যের মোট এফএইচসি’র সংখ্যা ৩৮৬-তে গিয়ে পৌঁছেছে। এখানকার ব্যবস্থাপনায় বিশ্বমানের ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন, কম্পিউটার-চালিত ওপি (বহির্বিভাগ), আধুনিক রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার, উন্নত বুকিং-এর সুবিধা, অপেক্ষা করার প্রশস্ত জায়গা, পরিস্রুত পানীয় জল ও পরিষ্কার শৌচালয়, মহিলাদের জন্য আলাদা পরিকাঠামো ও বিশেষভাবে সক্ষমদের উপযোগী ব্যবস্থা, প্রাক-পরীক্ষা অঞ্চল, উন্নত প্যাথলজিকাল ল্যাব, ডিসপ্লে, বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক ইত্যাদি। আরদ্রাম কর্মসূচী বাস্তবায়নে যুক্ত করা হয়েছে স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাগুলির সঙ্গে অন্যান্য দপ্তরকে।

একইভাবে দ্বিতীয় স্তরে থাকা তালুক এবং জেলা বা জেনারেল হাসপাতালেও স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক উন্নতি ও মানোন্নয়নের জন্য অনুরূপ সংস্কার কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত জেলা হাসপাতাল (ডিএইচএস) এবং জেনারেল হাসপাতাল (জিএইচএস) যাতে ‘সুপার স্পেশালিটি’র সুবিধার আওতায় আসে, তার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন, হৃদরোগের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রতিটি জেলা বা জেনারেল হাসপাতালে ক্যাথ ল্যাব এবং ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট চালু করা ইত্যাদি। রাজ্যে ডায়ালিসিস-এর সুবিধাযুক্ত মোট তালুক হাসপাতালের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৩।

মেডিক্যাল কলেজগুলি এই ত্রিস্তরীয় কাঠামোরই তৃতীয় স্তর। এলডিএফ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থাকবে। সরকার এ সব প্রতিষ্ঠানকে সেরা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবার পুনরুজ্জীবন ও তাকে সুসংগঠিত করার কাজে প্রচুর জটিল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। আর্থিক দিকই হোক বা মানব সম্পদ সৃষ্টি এবং তা পরিচালনা– সবের ক্ষেত্রেই প্রচলিত ব্যবস্থার সহজাত দুর্বলতা ছিল লক্ষণীয়। আর আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল সেই সব বাধা বিপত্তিকে পিছনে ফেলে একটি মজবুত পরিকাঠামো নির্মাণ করা। এই বার এলডিএফ সরকার যখন ক্ষমতাসীন হয়, তখন লোকবলের দিক থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর ছিল ভীষণভাবে দুর্বল। বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সেই স্বাস্থ্য বিভাগেই নতুন পদ তৈরি করে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগও হয়েছে।

কেরালা কুষ্ঠ, যক্ষা এবং এই ধরনের রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। তার জন্য ‘অশ্বমেধম’ নামে একটি অভিযান শুরু করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্যই হলো কুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক লক্ষণযুক্ত রোগীদের শনাক্ত করে তাঁদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। একইভাবে রাজ্যে যক্ষা নির্মূল কর্মসূচী জোরকদমে চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া তিরুবনন্তপুরম, এর্নাকুলাম এবং পালাক্কাডে চালু করা হয়েছে কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বুলেটরি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ক্লিনিক, যার মাধ্যমে রোগীরা বাড়িতেই ডায়ালিসিসের সুবিধা পাচ্ছেন। বাস্তবে কেরালায় ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দিন দিন ব্যাপক হারে বাড়ছে। এই রোগের কারণে শরীরে যে সব কঠিন সমস্যা দেখা দেয়, তার মধ্যে একটি হলো ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথির রোগীদের জন্য ‘নয়নামৃথুম’ নামে একটি সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরেক গুরুতর মারণ ব্যাধি হলো ক্যান্সার, যার প্রকোপ বর্তমান যুগে ক্রমবর্ধমান। ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যের ৫টি মেডিক্যাল কলেজে ক্যান্সার চিকিৎসার সর্বাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্যে আরও তিনটি ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। এরই সঙ্গে রাজ্য ক্যান্সার স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান প্রোটোকল-ও রূপায়ন করেছে।

সুস্থ সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সেই সমাজের

রাজ্য তথ্য প্রযুক্তিকে অত্যন্ত দক্ষভাবে ব্যবহার করছে ই-স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের ডেটাবেস তৈরির কাজও চালানো হচ্ছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ৩.৪ কোটি। এখন পর্যন্ত তার মধ্যে ২.৫৮ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং তা সাজানোর কাজ সেরে ফেলা হয়েছে। রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তার প্রক্রিয়াকরণের এই বিশাল ও ব্যাপক কাজ শুধু মাত্র কেরালাতেই চলছে এবং সেই কারণে রাজ্যের এলডিএফ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করতেও বাধ্য হয়েছে নীতি আয়োগ। রাজ্যের ৮৬টি সরকারি হাসপাতাল বর্তমানে এই ই-স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করছে এবং আরদ্রাম প্রকল্পের অংশ হিসাবে আরও ৮০টি হাসপাতালও শীঘ্রই এই পথে হাঁটবে।

আমরা আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সমস্ত বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিকেও রাজ্যে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকছে আয়ুষ বিভাগ। প্রতিটি স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থার এলাকায় আয়ুষ ব্যবস্থার অধীনে থাকা হাসপাতালগুলি চিকিৎসার কাজ চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও রাজ্য সরকারের ব্যাপক সহযোগিতা পাচ্ছে। কেরালায় আয়ুর্বেদের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজও চলছে জোরকদমে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, কেরালার এলডিএফ সরকার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এবং একে রোগী-বান্ধব করে তোলার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রয়াসই রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নয়া উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, রাজ্যের কেউ অসুস্থ হলে আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থানের কারণে সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা থেকে যেন বঞ্চিত না হন, তা সুনিশ্চিত করা। আমরা নিশ্চিত যে, সব বাধা পেরিয়ে কেরালার জনগণের সমর্থনে ও সহযোগিতায় 'আমরা করব জয়, নিশ্চয়'।

অনুবাদ: শাশ্বতী দত্ত

সাধারণ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বও কম নয়। সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যে একটি প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থাও কার্যকর করা হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য 'আত্মামানস' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেটিই গোটা রাজ্যে কার্যকর করা হচ্ছে।

এরই মধ্যে স্বস্তিদায়ক বিষয় একটিই। অন্যান্য যে কোনও রাজ্যের তুলনায় কেরালায় শিশুমৃত্যু এবং মায়ের মৃত্যুর হার বেশ কম। তবে এই মৃত্যুর হারকে যাতে আরও কমানো যায়, সেই লক্ষ্যে আমরা হাসপাতালগুলিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার ব্যবস্থা করেছি। শিশুমৃত্যুর হার এক অঙ্কে নেমে এসেছে, প্রতি হাজার মৃত্যুর মধ্যে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৭। যাঁরা একই সঙ্গে সন্তানসম্ভবা মা ও সদ্যজাত শিশুদের যত্ন এবং চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সবার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পাশাপাশি মায়ের মৃত্যুর হার কমানোর জন্য 'সালাভম' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। প্রসূতি অবস্থায় মহিলারা যাতে প্রয়োজনীয় যত্ন পান এবং তাঁরা যাতে রক্তাল্পতা, অপুষ্টি ও গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত না হন, স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা এবং অন্যান্য সমাজকল্যাণ দপ্তরগুলির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য দপ্তর তা সুনিশ্চিত করেছে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে। এই যত্ন এবং সুরক্ষার কারণেই কেরালা শিশুমৃত্যুর হার কম রাখতে পারছে।

দরিদ্র বা অভাবী রোগীদের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আর্থিক সহায়তা, যাতে কেউই অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে সঠিক চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার নিম্ন আর্থিক স্তরের জনগণকে চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য 'করুন্যা বেনিভোলেন্ট স্কিম' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্যে এই ধরনের আরও নানা প্রকল্প চালু ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে এই সমস্ত প্রকল্পকেই একত্রিত করে 'করুন্যা আরোগ্য সুরক্ষা পাধাথি' (কেএএসপি) নামে একটি একক প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পে প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের চিকিৎসা পেয়ে থাকেন বিনা খরচে। কেএএসপি'র আওতায় প্রায় রাজ্যের ৪০.৯৬ লক্ষ পরিবার উপকৃত হচ্ছেন।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো প্যালিয়াটিভ কেয়ার পলিসি, ২০১৯। কেরালাই প্রথম রাজ্য, যা ২০০৮ সালেই একটি প্যালিয়াটিভ কেয়ার পলিসি ঘোষণা করেছিল। বর্তমানে দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি সংশোধিত এবং নতুন পলিসি বা নীতি তৈরি করা হয়েছে। নতুন নীতিটির মূল ভিত্তিই হলো অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। যাঁদের প্যালিয়াটিভ কেয়ার বা রোগের যন্ত্রণা উপশমের জন্য পরিচর্যার প্রয়োজন, তাঁরা কেউ যেন তা থেকে বাদ না পড়েন। তাই আয়ুষ সহ সমস্ত ধরনের ওষুধের ক্ষেত্রেই এই পরিচর্যাকে যুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি, দেবে পাড়ি?

সুদর্শন রায়চৌধুরি

১৯৪০-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,/ দিল পাড়ি,/... পরিচয়হারা দেশে।/... অজানার পরে অজানায়/অদৃশ্য ঠিকানায়।'' রেলগাড়ির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ 'প্রাণ'-এর। শুধু অর্থনীতির সঙ্গে নয়। রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুর সঙ্গে। নইলে 'পথের পাঁচালী'-র কথা এখনও মনে পড়ে! অপুকে সারাজীবন বয়ে নিয়ে যেতে হয় নিশ্চিন্দিপুরে ফেলে আসা তার 'গরিব ঘরের মেয়ে' দিদি দুর্গার কথা। রোগশয্যায় শুয়ে তার সকাতর অনুরোধ 'অপু সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?' রেলগাড়িকে ঘিরে আমাদের শতেক মিলন, শতেক বিচ্ছেদ। দেশভাগের সময়ে ট্রেনের মাথায়-কামরার গায়ে-জানালা-দরজায় সেঁটে-থাকা দিশাহারা উদ্বাস্তুদের কথা, পুবে-পশ্চিমে যাওয়া-আসা রেলগাড়ির বন্ধ কামরার মেঝেয় পড়ে থাকা লাশের কথা। এখনও কি সে সব তাড়া করে না?

রেলগাড়ির কথা অমৃতের সমান। গরলেরও সমান। তার পত্তনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির উদগ্র লালসার কথা। বড়লাট লর্ড ডালহৌসির সময় প্রথম রেল চলল এ দেশে। ১৮৫৩ সাল। ডালহৌসির আগে থাকতেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিবিদদের চর্চা চলছিল শিল্পবিপ্লবের দৌলতে এবং যে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য ডোবে না সেখানের উপনিবেশগুলি থেকে লুণ্ঠনের দৌলতে বিলেতি বানিয়াদের হাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি জমেছে। এখন তা খাটাবে কোথায়, কিভাবে? ১৮৪৫ সালে হাইড ক্লার্ক ভারতের দারিদ্রকেই পুঁজি করে রেলপথ স্থাপনের জন্য ওকালতি করেছিলেন। রেল যদি চালানো যায় তবে ভারতের বিশাল সম্ভাব্য বাজারের কৌমার্য হরণ করা যাবে। রেলপথেই এ দেশ থেকে কাঁচা মাল আনা যাবে। রেলপথেই বিলেত থেকে পণ্য যাবে। একটা ঢিলে দুটো পাখির মৃত্যু।

এই পটভূমিতেই রেলপথ তৈরি হলো। সে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর ব্রিটিশ সরকারি শাসন চালু হবে। ততদিনে রেলপথের আরও বিস্তার ঘটে যাবে। ঢুকে যাবে গাঁয়ের মধ্যেও। সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসে আছে রেলপথের সেই গোড়ার দিনের কথা। গাঁয়ের মানুষের চোখে কেমন ধরা পড়েছিল রেলগাড়ি? ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের পর কোনও এক সময়ে ''জগদ্দল-স্যানপাড়ার লোকেরা নৌকা বোঝাই করে গেল সেই রেলগাড়ি দেখতে, ঢাকঢোল, সিঁদুর নৈবিদ্য নিয়ে ... সেই গাড়ি আর সে কী কাণ্ড! ... ভূমিকম্পের মতো থরথর করে মাটি কাঁপে, কার ক্ষমতা আছে সামনে থাকে।'' সেই প্রাথমিক বিহ্বলতা পরে কাটবে। রেলের সত্যিকারের রূপের ছটা ঠিকরে বেরোবে।

এই বাংলায় প্রথম রেল ছুটেছিল ১৮৫৩। কলকাতা-হুগলী। সমসময়েই বোম্বাই থেকে থানে। কিন্তু কারা চালালো রেলগাড়ি? সব বেসরকারি কোম্পানি। কোম্পানির শাসনে কোম্পানিরাই তো চালাবে। রানিমায়ের শাসনেও অনেক দিন তাই

ছিল। নইলে পুঁজি ঢালবে কে? কেনই বা ঢালবে? ক্লার্কের তিক্ত ভাষায় “সভ্য সরকারগুলোর কাজের তালিকায় এমন কোনও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যে এক বর্বর জনসমষ্টির কল্যাণ বিধানের জন্য তাদের দুর্দশা লাঘবের তাগিদে কোনও মহৎ প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। “বাস্তবে দেখা গেল অন্তত দুটি বেসরকারি রেল কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া এবং গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে কোম্পানি ১৮৮১ সাল পর্যন্ত রেল পরিষেবা বাবদ প্রাপ্ত আয়ের ৫৬ শতাংশের মালিক হয়ে বসেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই দুটি কোম্পানির আয় অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তখন পাঁচটি কোম্পানি রেল পরিষেবার ৬৮ শতাংশের মালিক। এ হিসাব ধর্মা কুমার সম্পাদিত কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অব ইন্ডিয়া, ২য় খণ্ডে জন হার্ডের লেখায় প্রাপ্ত। প্রসঙ্গত দ্বারকানাথ ঠাকুরও কলকাতা থেকে রাজমহল পর্যন্ত রেলপথ বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তা অবশ্য বাস্তবের মুখ দেখতে পায়নি।

এখানেই দেখছি উপনিবেশবাদের এক বিচিত্র বাহানা। হাজার হোক ভারতের বাজার তুমুল আকর্ষক হলেও একেবারে আনকোরা পরীক্ষার ব্যাপার। বেসরকারি কোম্পানিগুলো দেখল যদি তেমন হারে মুনাফা না হয় তো পুঁজি জলে যাবে। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসকেরা দুনিয়ার আন্যান্য দেশে যা করেছিল এ দেশেও তাই করল। কোম্পানিগুলিলোকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত নানান হারে ন্যূনতম মুনাফা লাভের প্রতিশ্রুতি বা ‘গ্যারান্টি’ দিতে হবে। ধাপে ধাপে অবশ্য সরকারও কিছু রেলপথ নির্মাণ ও পরিষেবা চালানোর দায়িত্ব নিল। সরকার মানে ব্রিটিশ ভারতে এবং নানান কিসিমের দেশীয় রাজন্যশাসিত প্রদেশের সরকার। বেসরকারি কোম্পানিগুলো অবশ্য অনেকেই রয়ে গেল। আজ মনে হয় স্বাধীন দেশেও তো খাইয়ে-পরিয়ে তাকত গড়ে তোলা রাষ্ট্রীয় অধিক্ষেত্রের মালিকানা ধাপে ধাপে বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দেওয়ার তাল ঠোকা হচ্ছে। এ যেন ঔপনিবেশিক ইতিহাসের স্বাধীনতা উত্তর পুনরাবৃত্তি।

যে যাই হোক, এটা মানতেই হবে যে মুনাফা এবং আরও পুঁজি গড়ার তাগিদে ব্রিটিশ শাসকেরা রেলওয়ে শিল্পের যে পত্তন ঘটিয়েছিল তার একটি নিশ্চিত ও দৃশ্যমান অগ্রগতিবাচক দিক ছিল। এর ধারালো ব্যাখ্যা আছে কার্ল মার্কসের ভারত সম্পর্কিত আলোচনায়। সেখানে মার্কসের রেলপথ সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন ছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আসলে দ্বৈত চেহারা ছিল। একদিকে তা যেমন ধ্বংসাত্মক, তেমন অন্য দিক থেকে নির্মাণমূলকও। ১৮৫৩ সালে মার্কস লিখছেন, “আমি জানি যে ইংরেজ শিল্পপতিরা ভারতে রেলপথ আনতে চাইছে একটাই উদ্দেশ্যে, তা হলো নিজেদের কলকারখানার জন্য কম খরচে ভারত থেকে তুলো এবং অন্যান্য কাঁচামাল নিংড়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যেখানে লোহা আর কয়লা আছে এমন কোনও দেশে একবার যদি যোগাযোগ ব্যবস্থায় যন্ত্রকে ব্যবহার শুরু করা হয় তবে নির্মাণক্ষেত্রে (ম্যানুফ্যাকচারিং) তার অগ্রগতি আটকানো যাবে না। ... তাই ভারতে রেলওয়ে ব্যবস্থা বাস্তবিকপক্ষেই আধুনিক শিল্পের অগ্রপথিক হয়ে উঠবে।” সোজা কথা এ হলো এক ধরনের ‘গুণক প্রক্রিয়া’ যার অর্থ নিরন্তর ক্রমবৃদ্ধি। রেলপথের বিকাশের ফলে প্রথমে এক, তারপর একের পর এক শিল্প গড়ে উঠবে। কত মানুষ কাজ পাবে। নতুন শহর নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠবে। অবশ্য পরের ইতিহাসে দেখি সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। স্বয়ং মার্কস ১৮৮১ সালে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, রেলপথ ভারতীয়দের “কোনও কাজে লাগল না।” এর কারণ ১৮৫৩-তেই বলে রেখেছিলেন, “ভারতীয়রা ইংরেজদের জোয়াল কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলার মতো নিজেরা যথেষ্ট তাকত না পেলে এ সব নতুন দিনের ফসল তুলতে পারবে না।” তবু এ কথা চূড়ান্তভাবে বলা যাবে না যে রেলওয়ের বিস্তারে ব্রিটিশ আমলে নতুন শিল্প স্থাপনের বীজটুকু পোঁতা হয়নি। বিশেষত কয়লা খনি অঞ্চলে এর একটা ইতিবাচক প্রভাব হয়েছিল। তার সুফল কিছুটা পৌঁছেছিল অন্যান্য শিল্পে। কিন্তু লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরি করা থেকে নতুন রেললাইন নির্মাণ বা মোটামুটি উঁচু পদের চাকরিগুলো কোনোটাই ভারতের কপালে জোটেনি। প্রসঙ্গত জন হার্ড লিখেছেন, ১৮৬৫ সালেই দেখা গেছিল, ভারতের রেলকারখানায় যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য দামে লোকোমোটিভ তৈরি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বোম্বাইয়ের বাইকুল্লা কারখানায়। তবু ১৮৬৫-১৯৪১ সময়কাল ভারতে মাত্র ৭০০টি লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরি করা হলো। আর ব্রিটেন থেকে আমদানি করা হলো প্রায় ১২,০০০ ইঞ্জিন। সরকারের ধান্দাই ছিল ‘ব্রিটিশ মাল কেনো।’ এমনকি, ১৯০৫ সালে যখন রেলের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি তৈরির উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে একটি কারখানা গড়ার প্রস্তাব উঠেছিল, মজার ব্যাপার হলো, আপত্তি উঠল যে বিলেতে অমন একটা কারখানা খোলাটাই লাভজনক। ভারতে নাকি খরচ পড়বে ৫০ শতাংশ বেশি। স্পষ্টত এটা ছিল ঔপনিবেশিক হিসাব।

কিন্তু রেলওয়ে স্থাপনের একটা মূল উদ্দেশ্যের কথা লর্ড ডালহৌসির বয়ানে ছিল— তা হলো যোগাযোগ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হবে তার মাধ্যমে এই বিশাল ভারতীয় উপনিবেশ প্রশাসনের কেন্দ্রীভবন করা সম্ভব হবে। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ছিল। সেদিন যদি ব্রিটিশ শাসকদের সৈন্য চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট মাত্রায় রেলপথের বিস্তার থাকত তাহলে হয়তো বিদ্রোহের আগুন কিছুটা সহজে নেভানো যেত। এর পুনরাবৃত্তি কিন্তু ১৯৩০-র চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সময় অবশ্য পুরোটা ঘটেনি। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসকেরা নিজেরাই সিপাহী বিদ্রোহের পর সবচেয়ে বিপজ্জনক অভ্যুত্থান বলে গণ্য করত। ১৮-১৯ মার্চ, ১৯৩০-এর রাতে বিপ্লবীদের হাতে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল হয়। ১৯ তারিখে সরকারের তরফ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে বলা হয় প্রায় ১০০ জন অভ্যুত্থানকারী চকিত আক্রমণে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করেছে। তার আগে চট্টগ্রাম থেকে ৪০ মাইল দূরে রেলপথও নষ্ট করে দেওয়া হয়। “এখনও পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না যে রেলপথের এই ভাঙন নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার না কি অভ্যুত্থানকারীদের পরিকল্পনার অঙ্গ।” বাস্তবিক পক্ষে পরিকল্পনা করেই বিদ্রোহ দমনের জন্য কলকাতা থেকে যাতে সশস্ত্র ফৌজ না এসে পৌঁছাতে পারে তাই বিপ্লবীরা রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। জালালাবাদ পাহাড়ে শেষ লড়াই চলে। সূর্য সেন (মাস্টারদা), গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বলের মতো বিপ্লবী নেতারা ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের নীতি তাদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। এই বীর বিপ্লবীরা শেষ লড়াইয়ের জন্য জালালাবাদ পাহাড় দখল করে। চট্টগ্রাম শহর জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খবর চলে গেল যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মাস্টারদার নেতৃত্বে বীর বিপ্লবীরা জয়ের পথে। বিদ্রোহীদের মধ্যে লোকনাথ বলের দুই

ভাই প্রভাস ও টেগরা যেমন ছিল তেমনই ছিল নিতান্ত সদ্য কৈশোরে পৌঁছানো ঝুনকু (সুবোধ রায়)। ঝুনকুকে কেন্দ্র করেই বেদব্রত পাইনের ফিল্ম ‘চিটাগাঙ’।

বিদ্রোহের খবর পেয়ে দার্জিলিঙের দিকে রওনা দেওয়া বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন ঝটিতি কলকাতায় ফিরে আসে। ১৯ তারিখ সকালেই ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের ফৌজ চট্টগ্রামের দিকে রওনা দেয়। পরের দিন রওনা দেয় আরও ফৌজ। জালালাবাদ পাহাড় থেকে বিপ্লবীরা লড়াই চালিয়ে যায়। তারা জানে এই অভ্যুত্থান সফল হবে– রক্তদান বৃথা যাবে না। চট্টগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়বে গোটা বাংলায়, সারা দেশে রেললাইন কাটা। ফৌজ আসবে কোত্থেকে? কিন্তু ২ এপ্রিল প্রভাস বলের চোখে পড়ল পাহাড়ের নিচে সমতলে ফৌজের আনাগোনা। এলো কোথা থেকে? আসলে রেললাইন সারিয়ে ব্রিটিশ ফৌজ আর্মি ট্রেনেই চলে এসেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে অন্তিম লড়াইয়ের স্লোগান উঠল, “বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। বন্দেমাতরম্। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।” রেলপথের দাক্ষিণ্যে আসা ব্রিটিশ ফৌজের হাতে জালালাবাদের পাহাড়ে ২২ এপ্রিল প্রাণ দিলেন ১০ জন বিপ্লবী। ২৩ তারিখে পাহাড়ের লড়াইয়ে অন্তত আহত আরও দুই বিপ্লবী শহীদ হলেন। সব মিলিয়ে ২৮ জন বিপ্লবী শহীদ হন চট্টগ্রামের বিদ্রোহে। ফের বলি, রেলপথের দাক্ষিণ্যেই সেদিন জালালাবাদের যুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের প্রাণ গিয়েছিল। লর্ড ডালহৌসির বয়ানে ভারতে রেলপথের বিস্তারের পেছনে এই দেশজোড়া প্রশাসনিক-সামরিক একাধিপত্য কায়েম করা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু পরিবহণ ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং গতিবেগ সঞ্চারের ইতিবাচক দিককেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গণবিদ্রোহের খবর, আন্দোলনের খবর, সংগঠনের প্রয়াস সবকিছুই ত্বরান্বিত করেছিল রেলব্যবস্থা। সর্বভারতীয় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও অন্যান্য সংগঠন, জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও অন্যান্য পার্টির বিকাশ ও বিস্তারে রেলপথের যে অবদান ছিল এ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। রেলগাড়ি না থাকলে স্থান থেকে স্থানান্তরে নেতারা যোগাযোগ রাখতে পারতেন না কর্মী ও জনগণের সঙ্গে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ‘হিন্দ স্বরাজ’-এ অবশ্য রেলপথের চূড়ান্ত বিরোধিতা করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালের নভেম্বরে ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার যাত্রাপথে এই বইটি লেখা। তখনও গান্ধীজীকে ‘মহাত্মা’ আখ্যায় ভূষিত করা হয়নি। সে আখ্যা আসে ১৯১৫-র জানুয়ারিতে। ‘হিন্দ স্বরাজ’-এর অনেক বক্তব্যই আমাদের কাছে আজ উৎকট মনে হতে পারে। সেখানে রেলওয়ে সম্পর্কে তার বক্তব্য ছিল “রেলওয়ের জন্যই ইংরেজরা সারা দেশে আজ দখল নিতে পেরেছে। রেলওয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে বিউবনিক প্লেগ। রেলগাড়ি না থাকলে সাধারণ মানুষ ঘর ছেড়ে দূর বাইরে যেতে পারত না। তারাই প্লেগের বীজাণু বহন করছে। ... রেলওয়ের জন্য বারবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে কারণ পরিবহণের সুবিধার জন্য মানুষ তার উৎপাদিত শস্য বিক্রি করে দিচ্ছে। সেগুলো যাচ্ছে চড়া দামের বাজারে। মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং দুর্ভিক্ষের চাপও বাড়ছে। খারাপ লোকেরা অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে তাদের বদমায়েশির মতলব হাসিল করতে পারছে।” পরেই অবশ্য গান্ধীজী একটু নরম হয়ে বলছেন, “রেলওয়ে দুর্ভিক্ষ ছড়ায় কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও বিরোধই থাকতে পারে না যে, অশুভ যা কিছু রেলওয়ে তারই প্রচারক।” কিন্তু এই তাবৎ ‘সমালোচনার’ তর্কবিতর্ক বাদ দিয়েও অস্বীকার করা যাবে না যে রেলওয়ে ভারতীয় জনসমাজের সনাতন ধাঁচাকে ভেঙে দিয়েছিল। তার সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল বর্ণাশ্রমভিত্তিক জাতিভেদ প্রথার ওপর।

কার্ল মার্কস রেলওয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, “রেলব্যবস্থার অনুসারী আধুনিক শিল্প মানুষের মেহনতের বংশানুক্রমিক সেই বিভাজনকে নিশ্চিহ্ন করবে, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতের জাতপাতের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই ভারতের প্রগতি ও শক্তির পথে চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক।” বাস্তবিক তা-ই। রেলের কামরায় বর্ণাশ্রমভিত্তিক আসনের ব্যবস্থা তো নেই। উপবীতধারী ব্রাহ্মণের পাশেই গা ঘেঁষে বসে আছে কোনও অন্ত্যজ শূদ্র। ধূর্ত পুরোহিতরা ছড়া বানিয়েছে, “বৃহৎকার্যে নাস্তি দোষম্।” অবশ্য গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢোকার আগে গায়ে গঙ্গাজল ছিটাতে হতো কি না তা বলা যাবে না। প্রসঙ্গত দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীকে কৃষ্ণাঙ্গ বলে রেলের কামরা থেকে সাদা চামড়ার সাহেব জবরদস্তি নামিয়ে দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

রেলের ধাক্কায় ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ তো হয়েছিল। তবে আধুনিক শিল্প কি হলো? দূর দেশে এখানকার তুলো রপ্তানি হলো সহজতর। সেইসঙ্গে খাদ্যশস্যের চাইতে বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন বাড়ল। কিন্তু রপ্তানিকৃত বাণিজ্যিক শস্যের দাম দুনিয়ার বাজারে বাড়লে তার সুফল পেল না ভারতীয় কৃষকেরা। অথচ দাম কমলে তার বোঝা বইতে হতো তাদের। সস্তায় কাঁচামাল রেলের ওয়াগনে চেপে বন্দরে পৌঁছাতো। তারপরে সোজা বিলেতের কলে। ফিরে আসত পূর্ণাঙ্গ পণ্য হিসাবে। তার দামও এদেশের বাজারে বেশি দিতে হবে। এক দ্বিমুখী শোষণের জাঁতাকলে পড়ল ভারতীয়রা। আগেই দেখেছি, মার্কস এই জন্যই ক্ষোভ করছিলেন, রেলের বিস্তার শেষ বিচারে ভারতীয়দের “কোনও কাজে লাগল না।” ১৯৪৭ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে কলকারখানায় কর্মরতের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের বেশি নয়। বেশিরভাগই হলো কৃষিজীবী। এবং সেখানেও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ কৃষকের সর্বনাশ হলো। তাছাড়া বাণিজ্যিক ফসলের জন্য তো লগ্নির প্রয়োজন। অনিবার্যভাবেই তাই হাত বাড়াতে হতো মহাজনদের কাছে। সুমিত সরকার তাঁর ‘মডার্ন ইন্ডিয়া (১৮৮৫-১৯৪৭)’ বইয়ে ক্লিফোর্ড গির্টজের এক মর্মন্তুদ মন্তব্যের উল্লেখ করে লিখেছেন, “কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কৃষকসমাজের মধ্যে বিভাজন এনে দিল, (কিন্তু হয়তো কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া) কোনও বাস্তব বৃদ্ধি ঘটালো না। ইচ্ছে হয় ক্লিফোর্ড গির্টজের ওলন্দাজ শাসিত জাভার প্রসঙ্গে দেওয়া মন্তব্যকে ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষেত্রেও উদ্ধৃত করতে। গির্টজ বলেছিলেন সেখানে কৃষিক্ষেত্রে এক জটপাকানো ওলটপালট হয়েছিল ; ব্যাপারটা হলো অসংখ্য কৃষক যে দুর্দশায় পড়ল তা নয় (পুঁজিবাদ আধুনিকীকরণেও তা-ই হতো), তাদের এই দুর্দশা স্রেফ অকারণ।” ১৯২০ সালে শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকার রেলওয়ে অসুখের সুলুকসন্ধানের জন্য এক তদন্ত কমিশন বানালো। ড্যানিয়েল থর্নার তাঁর ‘দ্য শেপিং অব মডার্ন ইন্ডিয়া’ বইয়ে লিখেছেন, এমন একটি কমিশনের তদন্তের ফলাফল। সে কমিশনের নেতা

ছিলেন নামজাদা ইংরেজ রেলওয়ে-অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম এ্যাকোয়ার্থ। কমিশনের অধিকাংশের সুপারিশ ছিল ‘‘ভারতীয় রেলপথে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানা ও সরকারি পরিচালনা আনতে হবে।’’ আর দ্বিতীয়ত ‘‘রেলের বজেট ও আর্থিক বিষয়াদি সাধারণ বাজেট ও আর্থিক বিষয়াদি থেকে আলাদা করতে হবে।’’ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সেটাই হয়েছিল।

বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বার জিতে এসে কেন্দ্রে যে সরকার গঠন করলেন তা এই দুই নীতির উপরেই ধারালো কুড়ুলের ঘা মারল। রেলওয়ের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া হুড়মুড় করে শুরু হলো এবং রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হলো। এ হলো, কড়া কথা শোনাবে, রেলওয়ের নয়া ঔপনিবেশিকীকরণ। যেমন হচ্ছে অনেকদিন ধরে জলপথে, যেমন হচ্ছে আকাশপথে। ছোটখাট নয়, মুম্বাই বিমানবন্দরও তুলে দেওয়া হচ্ছে মোদীবান্ধব আদানির হাতে। যদি বলেন, তথ্যপরিবহণের মহাসড়ক– তাও ক্রমশ চলে যাচ্ছে আম্বানি অথবা বিদেশি মালিকদের হাতে– সরকারি বিএসএনএল-কে পরিকল্পনা করে নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও তার স্যাঙাত দেশি-বিদেশি মালিকদের হাতের মুঠোয় সব পথ এসে মিলে যায় শেষে। যে দেশি মালিক সে-ই আবার বিদেশি মালিকের সঙ্গে অংশীদারি গড়ে তোলে। তারাই সরকারকে চালায় নাড়ায়। সরকারি ক্ষেত্রও ক্রমশ তাদের কব্জায়।

কিন্তু স্বাধীন দেশের নীতি ছিল আলাদা। এমনকি ইংরেজ শাসনের শেষ লগ্নে রেলপথ ক্রমশ চলে গিয়েছিল প্রধানত সরকারি হাতে। যে গান্ধীজী ১৯০৯ সালে রেলপথকে পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন তিনিই ১৯১৫-তে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেন রেলপথে তাঁর সত্যাগ্রহের বাণী পৌঁছে দিতে। ততোদিনে তিনি ‘মহাত্মা’। স্টেশনে স্টেশনে তৃতীয় শ্রেণির কামরার দরজায় এসে তিনি দাঁড়াবেন একবার। ‘বাপুজির’ সেই দর্শনের জন্য হাজারো মানুষে অপেক্ষায় থাকত। আর রবীন্দ্রনাথ? সদ্য তরুণ নাতি নীতীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর তার মা এবং কবির ছোট মেয়ে মীরাকে রবীন্দ্রনাথ ২৮ আগস্ট, ১৯৩২ লিখছেন, ‘‘ ... নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন ... কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক।’’ তারপরেই তাঁর ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ যে মাত্র ১১ বছর বয়সে চলে গেছে তার কথা মনে পড়ল। সে এক রেলযাত্রার অপরূপ স্মৃতি ও আত্মকথন। ‘‘শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই।’’ সত্যিই রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন, ‘‘এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি।’’

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেন্ট্রাল ও ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের উদ্বোধনলগ্নে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘‘রেলওয়ে হলো আমাদের দেশের আজ বৃহত্তম জাতীয় উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও তা এমনই থাকবে। এই ব্যবস্থা আমাদের লক্ষ লক্ষ দেবশবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে সেখানে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী থাকবে যাদের কল্যাণও রেলওয়ের বিবেচনার বিষয়।’’ সে প্রধানমন্ত্রী অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিশাল নির্মাণগুলোকে স্বাধীন দেশের ‘মন্দির’ বলে মনে করেছিলেন। আজ এতগুলো বছর পার হয়েছে। এতগুলো সরকার এসেছে-গেছে। এর মধ্যে ভারত হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বিশালতম রেলপথের অধিকারী যেখানে সোয়া দু’কোটিরও বেশি মানুষ দেশের স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়। এখনও পর্যন্ত রেল হলো দেশের বৃহত্তম নিয়োগকারী সংস্থা। প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ এখানে কাজ করে। উচ্চতম কর্মকর্তা থেকে নিম্নতম সাফাইকর্মী বা নির্জন লেভেল ক্রসিংয়ের একাকী গেটম্যান রেলকর্মচারী।

১৯৮৯ থেকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় একের পর এক বিপর্যয় দেখা দিল। বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ল। সঙ্গে ক্রমশ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। দুনিয়ায় শক্তির ভারসাম্য পালটে গেল। দাঁড়িপাল্লা ঝুঁকে পড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশিবিরের দিকে। ভারতে সে সময় কংগ্রেসের শাসন। প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। ধাপে ধাপে চালু হতে লাগল নয়া-উদার পুঁজিবাদী অর্থনীতি। তখনও তা কিছুটা সলজ্জ, কিছুটা কুণ্ঠিত। তখনও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নির্বিচারে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। বিলগ্নিকরণ হলেও বলা হলো, এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ‘জাতীয় পুনর্নির্মাণ তহবিল’-এ জমা পড়বে। এখান থেকে খরচ হবে হোঁচট খাওয়া, ধুঁকতে থাকা সরকারি ক্ষেত্রে লগ্নির জন্য। অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই ‘বিলগ্নিকরণ’ মন্ত্রক খুলল। সে ছিল অশনিসঙ্কেত। বাজপেয়ী কবিতা লেখেন, গুজরাট দাঙ্গার লেলিহান শিখায় যখন সংখ্যালঘুরা পুড়ছে-মরছে তখন আরএসএস কর্মী মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘রাজধর্ম’ পালন করতে অন্তত পরামর্শটুকু দেন। সেটুকু বহিরাভরণ দেখেই আপ্লুত বিরোধীরা কেউ কেউ অটলবিহারীর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘মন্দ সঙ্গে পড়া ভালো মানুষ।’’ মন্দ মানুষ, সেই রাজধর্ম পালন-না-করা মানুষ মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এলেন ‘আচ্ছে দিন’-এর স্লোগান তুলে। মানুষ ইতিহাস গড়ে সত্য, কিন্তু সে তো ইচ্ছেমত গড়তে পারে না। ২০১৯ সালে মোদী এলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। জবাব কে নেবে তার?

২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হয়েই উদার অর্থনীতির

জন্য দরজা পুরোপুরি খুলে দিলেন। হিন্দুত্বের উগ্র জিগির, রামমন্দির নির্মাণ (যাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনীয় বলে প্রধানমন্ত্রী ভূমিপুজন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিলেন), সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উগ্র প্রাণঘাতী ঘৃণার তরঙ্গের পর তরঙ্গ তোলা, ইতিহাসকে বিকৃত করে ন্যায়নীতি ও সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে চূড়ান্ত অপমান করা– এই সব সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে বাঁধা রইল লাগামহীন 'উদার' অর্থনীতি যা আজ স্যাঙাতদের ধনতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। নেহরু আমলের 'মন্দির'গুলো ধ্বংস করা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে উগ্র ঔদ্ধত্য ও নানান বুজরুকি দিয়ে একের পর এক বেচে দেওয়া শুরু হলো। ২০১৪ সালেই পরিকল্পনা কমিশন তুলে দিয়ে যে 'নীতি আয়োগ' গড়া হয়েছিল, তার অন্যতম সদস্য বিবেক দেবরায়ের নেতৃত্বে এক উচ্চস্তরীয় কমিটি তৈরি করেছিলেন মোদীজী। তাদের মতে সায় দিয়েই ঠিক হয়েছিল রেলওয়েকে ধাপে ধাপে বেসরকারি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেবারেই রেলস্টেশনগুলোকে বেসরকারি হাতে নেওয়ার উদ্যোগটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিরোধীদের বিশেষত বামপন্থীদের কড়া সমালোচনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সংসদে। এনডিএ শরিকেরা গদি বাঁচাতে মশগুল। আপাতবিদ্রোহী তৃণমূল নিজের রাজ্যেই সরকারি উদ্যোগগুলোকে লাটে তুলে দেওয়ার নীতি নিয়েছে। একের পর এক শিল্প সম্মেলনে বেসরকারি মালিকদের উদ্বাহু আমন্ত্রণ– টোপ দেওয়া হচ্ছে। ''এখানে শ্রমিকরা ধর্মঘট করবে না।'' সরকারি উদ্যোগের ঘাড় কামড়ে একেই বলে ''বাঘের মতো লড়া।''

এটা মানতেই হবে যে মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন প্রশাসনের আনাচেকানাচে সব রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মতো রেলওয়েরও বেসরকারিকরণের জন্য খানিকটা চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু ইউপিএ-১ তো বটেই এবং ইউপিএ-২-এর আমলেও এরকম কোনও পরিকল্পনায় হাত পড়েনি। মোদীজির দ্বিতীয় খেপের শাসনে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা হলো রেলব্যবস্থার বেসরকারিকরণের কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে তেজস এক্সপ্রেস। দিল্লি-লক্ষ্ণৌ লাইনে তেজস ছুটছে। দ্রুততর গতিবেগের কথা বলে গোটা যাত্রপথে মাত্র ১০ মিনিট সাশ্রয় হয়েছে। বিমানসেবিকাদের মতো কামরায় রেলসেবিকারা থাকছেন। ভাড়া বেড়েছে বিশাল। ৭০০ থেকে ৯০০ টাকা টিকিটের দাম। ট্রেন ছাড়ার সময় যত এগিয়ে আসবে ততোই ফ্লেক্সিফেয়ার (নরম বা স্থিতিস্থাপক ভাড়ার হার)-এর সৌজন্যে ৪,৭০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া গুণতে হবে। স্পষ্টতই এ গাড়ি আমির-ওমরাহ এবং ধনীশ্রেষ্ঠীদের জন্য।

এবার ঘোষণা হলো ১৫১টি দূরপাল্লার ট্রেন তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি হাতে। এই ট্রেনগুলো চলবে ১০৯টি রেলরুটে। মালিক হবে বেসরকারি। ভাড়া স্থির করবে তারা। খাবারদাবার বিকিকিনিও তারাই মর্জিমতো করবে। রাষ্ট্রীয় রেলওয়ের দায়িত্ব কিন্তু থেকে যাবে অনেকটাই। সে দায়িত্ব পরিকাঠামো বজায় রাখার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার। রেলপথের দেখভাল, নিরাপত্তা, সোজা কথায় ঝুঁকিটা পোয়াতে হবে সরকারকে। রেললাইনগুলো সেকেলে। তার নিত্য দেখভাল দরকার। সিগন্যালিংয়ে গোলমাল ধরা পড়ে। দুর্ঘটনা লেগেই আছে। আছে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা। লাইনের ওপর উঠে ঘোর আনন্দে রামলীলার অনুষ্ঠান দেখছে জনতা। গায়ের ওপর দিয়ে ছুটে গেল রেলগাড়ি। মরল অনেকে। পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্লান্তিতে রেললাইনের স্লিপারে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে– স্টেশন তো সামান্য দূরেই। ট্রেন চলে এল। খাওয়ার রুটি-পোঁটলাপুঁটুলি লাইনের ওপড় পড়ে রইল। মানুষগুলোই চিরকালের জন্য চলে গেল। এসব দায়িত্ব, এসব সম্ভাব্য অভিযোগ এসব ঔদাসীন্য অবহেলা সব কিছু হবে রাষ্ট্রে। কেবল গাড়ির মালিকানা বেসরকারি হাতে। সুমিত সরকার ঔপনিবেশিক ভারতে রেলপথ নির্মাণকে বলেছিলেন ''জনগণের পয়সায় ও ঝুঁকিতে বেসরকারি মালিকদের মুনাফা লোটা।'' স্বাধীন দেশেও এতকাল বাদে সেটাই হলো। ভাড়া ধার্য করবে তারা। কামরায় রূপটান দেবে তারা। আর কোন কোন স্টেশনে থামবে সেটাও তারা ঠিক করবে। তাদের ট্রেন রওনা দেওয়ার পরে এক ঘণ্টা পর্যন্ত ঐ রুটে সরকারি ট্রেন চলবে না পাছে বেসরকারি ট্রেনের রোজগারে ক্ষতি হয়। আর সে ট্রেন নাকি ছুটবে সর্বোচ্চ ঘণ্টাপিছু ১৬০ কিমি। তাবৎ ভারতবাসীকে উজবুক ঠাউরেছে সরকার। এখন যা রেললাইনের হাল তাতে খুব বেশি হলে গতিবেগ উঠবে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২০-১৩০ কিমি। গুপিবাঘাকে ভূতের রাজা যেখানে খুশি চকিতে উড়ে যাওয়ার এমনি বর দিয়েছিল বটে।

ভালো কথা, রেল চালানোয় শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করবে কিন্তু মালিকরা। তেজসের রেলসেবিকারা মাইনে পান মাসে ১৫,০০০ টাকার মতো। কাজের সময়? দৈনিক ১৮ ঘণ্টার কাছাকাছি। নিজের রূপসজ্জার ভার তাদের নিজের। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নবাগত বেসরকারি রেলকোম্পানির কর্মচারীদের মাইনে কেমন হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়। এমনও ভাবনাকে কেউ সন্দেহবাতিক বলে উপহাস করবেন না যে নবনিযুক্ত কর্মীরা প্রায় সবাই হবে 'ঠিকে' কর্মচারী। এখনই তো রেলে লোক নিয়োগ প্রায় বন্ধ। ঠিকে শ্রমিকেরাও কাজ করে প্রধানত লেবার কন্ট্রাক্টরের অধীনে। ইতিমধ্যে রেলের বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদ বাতিল করার পাশাপাশি 'স্যালুট' নামে একটি প্রকল্পে ৫৫ বছর বয়সি কর্মীদের স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। এই প্রকল্পে ট্র্যাক দেখভালের কর্মী ছাড়া ইঞ্জিন চালকেরাও আছে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ আমলেই যা চালু হয়েছিল, অ্যাকোয়ার্থ কমিটির সুপারিশে সাধারণ বাজেট থেকে আলাদা করে রেল বাজেট পেশ করতে হবে সেই রীতি স্বাধীন দেশে মোদীজির প্রথম আমলেই বাতিল করা হয়েছে। আপাতত ১৫১টি ট্রেন যে ১২টি অঞ্চলে চলবে তার মধ্যে পড়বে হাওড়া, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, সেকেন্দ্রবাদ, চণ্ডীগড়ের মতো বড় বড় শহরগুলো। ঠিক এভাবেই সেরা বিমানবন্দরগুলো ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া হচ্ছে আদানির হাতে যার এধরনের শিল্প পরিচালনার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ সহ ৭টি রেল কারখানা এক করে দেওয়া হচ্ছে যাতে এক লপ্তে বিক্রি করে দেওয়া সহজ হয়।

তবে বেসরকারি কোম্পানিগুলো সরকারকে কিছু টাকা তুলে দেবে নানান খরচ বাবদ-যেমন মালপত্র পরিবহণ ও বিদ্যুতের জোগান বাবদ টাকার এবং প্রাপ্ত রাজস্বের একটা অংশ– এটা নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উঠবে। প্রসঙ্গত আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে ভোডাফোন প্রমুখ কিছু উন্নত মোবাইল পরিষেবা কোম্পানির কাছ থেকে ট্রাইয়ের হিসাব অনুযায়ী সরকারের প্রাপ্য অর্থ পেতে কেমন ঝামেলায় পড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাই কী? বেসরকারি কোম্পানিগুলো কিভাবে কত টাকা সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বাবদ আদায় করে কেউ নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে কেউ বা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় বহাল

তবিয়তে। সুতরাং রেলবাবদ সরকারের যে টাকা বেসরকারি কোম্পানিগুলোর কাছে আইনত পাওনা থাকবে তা আদায় করতে কত কাঠ, কত খড় পুড়বে আন্দাজ করা অসাধ্য। সরকার অবশ্য বলে চলেছে, বেসরকারি কোম্পানিগুলো ৩০,০০০ কোটি টাকার পুঁজি ঢালবে। তাতেই আমরা কৃতার্থ।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ৪০০টি রেলস্টেশন বেছে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর বিশ্বমানে উন্নতিকল্পে। আপাতত ৫০টি স্টেশনে কাজ শুরু হবে। আমাদের মহানন্দ যে তাদের মধ্যে হাওড়া স্টেশন আছে। এসব স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিকিট থেকে, গাড়ি রাখার জায়গা (দু'-তিন চাকার বারণ), খাওয়ার দোকান পরিচালনা বইয়ের স্টল ইত্যাদি সব কিছু বেসরকারি হাতে থাকবে। রেল হকাররা যাবে নির্বাসনে। নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অমিতাভ কান্ত বলেছেন, এ সব স্টেশন হবে দিল্লি বা মুম্বাইয়ের বিমানবন্দরের মতো। এখানে গাড়ি ছাড়ার অনেক আগে এসে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো যাবেনা বা ওয়েটিং রুমে বসা যাবে না। মোটা কড়ি ফেলে সুরম্য লাউঞ্জে সময় কাটানোর অনুমতি নিতে হবে। ইতিমধ্যেই নগদ টাকা দিয়ে প্রতীক্ষাগারে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে বেশকিছু জায়গায়।

আসলে রেলওয়ের বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টার ওপর একটা আকর্ষক মোড়ক দেওয়া হয়েছে। তা হলো যাত্রীদের পরিবহণে ঊর্ধ্বশ্বাস গতিবেগ, আরাম, আমোদ ও আহ্লাদের সুবন্দোবস্ত করাই বেসরকারিকরণের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু যে আমজনতা এতকাল ধরে এই সহজ এবং গতিময় পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে আসছে সেই বৃহত্তর অংশের মানুষ ক্রমশ বঞ্চিত হবে বর্তমান পরিকল্পনায়। অজুহাত দেওয়া হচ্ছে রেল চালাতে ক্রমবর্ধমান লোকসানের। রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের নেতারা বলছেন রেলওয়েতে যে আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ কত টাকা খরচ করলে কত টাকা পাওয়া যাবে সেখানে দেখা যাচ্ছে ১০০ টাকা আয় করতে ১০২/৩ টাকা খরচ হচ্ছে। এই লোকসান সরকার সইবে কেন? শ্রমিক-কর্মচারীদের কথাই বা কে ভাববে? এখন আছে ১৩ লক্ষ কর্মচারী। ক্রমশ এদের কাজ চলে যাবে। বেকারবাহিনীতে তারা নাম লেখাবে অথবা তাদের কেউ কেউ যৎকিঞ্চিৎ মজুরিতে বেসরকারি পরিষেবায় নিযুক্ত হবে। প্রসঙ্গত সীতারাম ইয়েচুরির ট্যুইটে দেখছি, অতিমারীর সময়ে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালাতে গিয়ে এই জুন-জুলাইয়ে সরকার লাভ করেছে ৪২৯ কোটি টাকা।

পরিবহণ, স্বাস্থ্যপরিষেবা বা শিক্ষা এই সব ক্ষেত্র কি কোনও সভ্য দেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষণা ছাড়া চলতে পারে? এটা সত্য যে মার্কিন দেশ বা বিলেতের অনেক জায়গায় রেল পরিষেবার বেসরকারিকরণ হয়েছে। (যদিও অতিমারীর সময়ে বিলেতে কথা উঠছে ফের সরকারিকরণ করা হোক), কিন্তু এখনও উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণভাবে বেসরকারিকরণ করা হয়নি। আমাদের দেশ মেট্রো রেল পরিষেবায় কোথাও (যেমন হায়দরাবাদে) পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের পরীক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা কিছু ভালো নয় বলে জানা গেছে। বিশিষ্ট শ্রমিকনেত্রী হেমলতা তার একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে লিখেছেন, 'মেট্রোম্যান' বলে প্রখ্যাত মেট্রোরেলকর্তা ই শ্রীধরণ বলেছেন পরিকাঠামো নির্মাণে সরকার সব টাকা ঢেলে দেওয়ার পরে তা বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। বিজেপি সরকার এই নীতিকে গ্রহণ করছে 'মূর্খামি' জেনে নয়, এটাই তাদের পছন্দের 'উদার অর্থনীতি'। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে লাটে তুলে দিয়ে ধান্দার ধনতন্ত্রকে সফল করাই হলো সরকারের নীতি যেটা চমকপ্রদ এবং নিষ্ঠুরও বটে, তা হলো এই সবকিছু হচ্ছে এমন এক দুর্যোগের সময়ে যখন অতিমারী-প্রতিরোধের নামে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনের আড়ালে থেকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এধরনের মারাত্মক জনবিরোধী নীতি নেওয়া হচ্ছে।

স্বাধীনতা লাভের পর নতুন সরকার শত সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারী ও বুনিয়াদি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র নির্মাণ ও তাকে ধরে রাখার যে নীতি গ্রহণ করেছিল তাকে আজ এতদিন পরে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। আজ দেশকে 'আত্মনির্ভর' করার নামে দেশীয় বড় মালিকদের সেবাদাস হতে চাইছে সরকার। পরিহাসের বিষয় এই যে, এসব মালিকের অনেকেই ঘোরা পথে গাঁটছড়া বেঁধে নেবে বিদেশি মালিকদের সঙ্গে। আত্মনির্ভরতার স্থান নেবে আত্মসমর্পণ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের ভূত যেন মোদী সরকারের ঘাড়ে চেপে বসেছে। সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের ভাঙনের পর উদার অর্থনীতি যখন বাধাবন্ধনহীনভাবে চালু হতে সবে শুরু করেছিল, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা 'ইতিহাসের অবসান' হয়েছে বলে, সমাজতান্ত্রিকতার তত্ত্বকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে আবার গ্যাটচুক্তি নিয়ে উরুগুয়ে রাউন্ডের অলোচনা যখন ঝড় তুলেছিল তখন চক্রবর্তী রাঘবন এক অসামান্য তথ্যসমৃদ্ধ বই লিখেছিলেন ''রিকলোনাইজেশন'' শিরোনামে। আজ এতকাল পরে মোদী সরকারের চলাচল দেখে মনে পড়ে 'রিকলোনাইজেশন' কথাটি। স্বয়ং 'বিষ্ণুর একাদশ অবতার' বলে মহারাষ্ট্রে বিজেপি যাকে ঘোষণা করেছে তারই হাত ধরে ঔপনিবেশিকতার পুনরুত্থান হবে? তাই কি মানুষ হতে দেবে?

১৯৪০ সালে দেখা রবীন্দ্রনাথের 'রাতের রেলগাড়ি'-তে নিরুদ্দেশযাত্রার অভ্যাস আছে।'' অজনার পরে অজানায়/অদৃশ্য ঠিকানায়। ... দূরের কথা যে শেষ ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ্য।'' আশি বছর পরে নতুন কোনও নিরুদ্দেশে যাবে আমাদের রেলপথ? সরকার কি ইচ্ছে করলে পারে না রেলগাড়ি চালাতে? রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মাস দুয়েক আগেই তো বলেছেন যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ নিয়ে 'চারধাম' রেলযাত্রার ব্যবস্থা নেবে ভারতীয় রেলওয়ে। গোটা পরিকল্পনার রূপায়ণে খরচ পড়বে ৪৩,২৯২ কোটি টাকা। অর্চাবিগ্রহের দর্শনের জন্য সরকার এত ব্যস্ত, গরিবগুর্বোদের জন্য এক ফোঁটাও ভাববে না? তবে?

সূত্র : ভারতে ব্রিটিশ শাসন–
(ট্রিবিউন পত্রিকার প্রতিবেদন, ২২জুলাই, ১৮৫৩) – কার্ল মার্কস

দ্য কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অব ইন্ডিয়া ২য় খণ্ড–ধর্মা কুমার সম্পাদিত

রেলওয়েজ (উপনিবন্ধ) – জন হার্ড

দ্য শেপিং অব মর্ডান ইন্ডিয়া – ড্যানিয়েল থর্নার

এসেজ ইন ইন্ডিয়ান হিস্টরি– ইরফান হাবিব

কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি – অমিয়কুমার বাগচী

ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞান– দীপককুমার (অনুবাদ : মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়)

মর্ডার্ন ইন্ডিয়া – সুমিত সরকার

রেলওয়ে প্রাইভেটাইজেশন ক্যান নট বি অ্যালাউড – হেমলতা

এখনও বিশ্বাসও করি, বামপন্থাই বিকল্প

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলার বন্ধু বেণুর কথা খুব মনে পড়ে আজকাল। এই অস্থির সময়ে ওর মুখ বেশি ভাসে চোখে। কৃষ্ণনগরে এক পাড়ায় থাকতাম। আমার ফজলু কাকার ছেলে বেণু। বেণু রহমান। বেণু হিন্দুর থেকেও বেশি হিন্দু ছিল। ওঁর নিয়মকানুন মানার ঠেলায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে যেতাম। আবার আমায় বলত, পুলু তুমি এ সব একটু মানো। আমি ধমক দিতাম ওকে। মনে পড়ে রূপচাঁদ জেঠুর (রূপচাঁদ তপাদার) কথা। দুর্গাপুজোয় বাড়ি গিয়ে কেন দেখা করলাম না, সে জন্য জেঠুর সে কী বকুনি! জেঠু ছিলেন খ্রিস্টান।

বাড়িতে বড়রা এলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাই রেওয়াজ ছিল। বাবার বন্ধুরা এলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে খ্রিস্টান– এসব কোনও বাছবিচার ছিল না। ছেলেবেলায় সাম্প্রদায়িকতা শব্দটা শুনিনি এমন নয়। তবে আর পাঁচটা শব্দের মতোই আমাদের কাছে সাধারণ এক শব্দ ছিল মাত্র। কোনও বিশেষত্ব ছিল না। ফলে মাথায় গেঁথে যায়নি। বা গেঁথে যাওয়ার মতো পরিবেশও তৈরি করা হয়নি তখন। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নদীয়া জেলার কোথাওই কোনও প্রভাব পড়েনি। কৃষ্ণনগরেও না। এখন সত্যিই খুব হতাশ লাগে। আমার চেনা দেশ এখন কোন অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আদৌ সেই অন্ধকার কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না জানি না। আমি চেনা ছন্দে আমার দেশকে আর দেখতে পাব কি না, তা-ও জানি না।

ছেচল্লিশে আমি অনেকটাই ছোট। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, সে সব বোঝার বয়স আমার তখনও হয়নি। কলেজে ঢুকে যাওয়ার পর আর হিন্দু-মুসলমান বলে আমাদের কাছে আলাদা কিছু ছিল না। একটা বিষয় আমায় বরাবরই খুব নাড়া দেয়, জিন্নার 'কল ফর পাকিস্তান' মুসলমানদের অধিকাংশকে এতটা আকর্ষণ করতে পেরেছিল কেন? তীব্রভাবে মনে হয়, তখন বেশিরভাগ জমিদারই ছিলেন হিন্দু আর প্রজারা মূলত মুসলিম। ফলে নিপীড়িত হয়েছেন তাঁরাই। তখন ভেবেছিলেন, পৃথক রাষ্ট্র হলে এই সমস্যাগুলি মিটবে। পাকিস্তানে হিন্দু শাসন বা হিন্দু পীড়নের প্রশ্ন থাকবে না। কিন্তু পরে প্রমাণ হয়েছে, এই ধারণা আদপে কত ভুল। তাই আরেকবার মুক্তির লড়াই করে '৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হয়েছিল।

আজ আশ্চর্য হই, যে শত সহস্র উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা থেকে এসেছেন, তাঁদের তো মুসলমানদের উপর রাগ আছেই, কিন্তু এখন এপার বাংলার মানুষদের যেন মুসলিমদের উপর রাগ আরও বেশি। পূব বাংলা থেকে আসা মানুষদের রাগের মধ্যে অভিমানও যেমন আছে, ভালোবাসাও আছে। একসঙ্গে থাকতেন। ছেড়ে আসতে হয়েছে। সেই অনুভূতি আছে। আবার

মুসলমানরা যেমন তাঁদের উপর হামলা চালিয়েছে, তেমনই রক্ষাও করেছে– এমন ইতিহাসও আছে। ফলে ওপার বাংলা থেকে চলে আসা মানুষদের কাছে প্রতিক্রিয়াটি মিশ্র। কিন্তু এখনকার যে প্রজন্ম সে সব দিন দেখেনি, শুধু গল্পই শুনেছে, তাঁদের মধ্যে উগ্রতা যেন বেশি। কিংবা উগ্রতা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের বাড়ির দুর্গাপুজোয় কোনও ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। পাড়া-প্রতিবেশী, যিনি যে ধর্মেরই হোক না কেন, আমাদের বাড়ির পুজোয় আসতেন। অংশ নিতেন। তবে একটা জিনিস খুব চোখে পড়ত, মুসলিমরা যত হিন্দুদের বাড়ি যেতেন, হিন্দুরা তত যেতেন না মুসলমানদের বাড়ি। সে দিক থেকে আমি বলব, হিন্দুরা অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক। এখন তারই উগ্র চেহারা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বাড়িতে এমনিতেই ধর্মবিরোধী মনোভাব ছিল।

ভাবলে অবাক লাগে, যাঁর আমলে ২০০২ সালে গুজরাটে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হলো, সেই তিনিই আজ ভারতবর্ষের মসনদে। ভারতবর্ষের মানুষ এদের সহ্য করছেন। তাঁদেরই ভোট দিয়ে আবার জেতাচ্ছেন। তার একটা বড় কারণ আমার মনে হয়, মানুষ শক্তিশালী কোনও বিকল্প পাচ্ছেন না। বা বুঝে উঠতেই পারছেন না। মহামারীতে এত মানুষ আক্রান্ত, এত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, এককথায় দুঃসহনীয়। তার মধ্যেও রামের নামে চলছে রাজনীতি। মজার বিষয় হলো, যে রামের নামে মন্দির তৈরি হলো, সেই রামকে কিন্তু আমরা সকলেই ছেলেবেলা থেকে চিনি, জানি। শত সহস্র বছর ধরে রাম একইরকম জনপ্রিয়। রাম আমাদের চোখের সামনেই থাকেন। ভালোবাসা, অনুপ্রেরণার জায়গা। একটা কথা বলতে পারি। যে রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যান, সেই রাম কি এই বিপুল বৈভবের মন্দিরে থাকতেন? পিতৃসত্য পালন, বনবাস সবই যদিও কল্পকথা। এগুলি আসলে আমাদের জীবনে মূল্যবোধ তৈরি করে। মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে থাকে। কিন্তু সেই মূল্যবোধগুলো আসলে কোথায়? আমাদের সংস্কৃতিকেই আমরা অবহেলা করছি। আঁকড়ে ধরিনি ঠিকমতো।

আমার বিশ্বাস, বিকল্প কেউ হতে পারলে তা বামপন্থীরাই হতে পারেন। কিন্তু সেই দৃঢ়তা কোথায়? মানুষের মনে ভরসা তৈরি করতে পারছেন কোথায়? এই সময়েই খুব হতাশ হয়ে পড়ি। এই দেশ, এই সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বুঝতেই পারছি না। বিশ্বজুড়েই দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটছে। সব দেশের কথা বিস্তারিত জানি না। কিন্তু প্রশাসন চোখ বুজে না থাকলে এই অনাচার হতে পারে না কোথাও। এর প্রতিকার কীভাবে, সেটাই আমার জিজ্ঞাসা।

ধর্মের প্রভাব সব দেশের সব অংশের মানুষের মধ্যেই কম-বেশি আছে। কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরবে ধর্মের গোঁড়ামি অত্যন্ত বেশি। সৌদি আরবের একজন মানুষকে বোঝানো খুব কষ্টকর যে, মুসলমান হওয়াই জীবনের সব নয়। আবার ভারতেও হাতে গোনা কয়েক জনকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বোঝানো যায়। অধিকাংশই বুঝতে চান না। রামকে নিয়ে এই জায়গাতেই রাজনীতি চলছে। রাম যেহেতু প্রত্যেকের কাছেই এক অনুভবের ও ভালোবাসার জায়গায় আছেন, তাই হিন্দুত্ববাদীরা রামকেই ধরেছে নিজেদের সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য। ওঁরা জানেন, রামকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হলেও কেউ বাধা দেবেন না। কারণ অধিকাংশই মনে করেন, রাম তো আমাদের নিজের লোক। আমি তো রামেরই ভক্ত। অত্যন্ত ধুরন্ধর মতলববাজ রাজনীতিকরা এ সব করে চলেছেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যেভাবে বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে, তা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে। তাদের বিরুদ্ধে দেশে কী হয়েছে? যে রাজনৈতিক দলগুলি এতে বাধা দিতে পারত, তারা কোথায় ছিল? আমি বারবার সেই প্রশ্ন তুলব। মুখে বললেই হবে না। তাদের পতাকার তলায় লোককে জমায়েত করতে পারছে?

ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারা তো স্কুলের পাঠবই থেকে পেয়েছি আমরা। হিটলারের সময়ের জার্মানির সঙ্গে অনেকেই আজকের ভারতের তুলনা টানেন।

কিন্তু আমি কিছুতেই সেই তুলনা করতে পারি না। অন্তত শিল্পোন্নত দেশ জার্মানি, আর আমাদের দেশ একেবারেই বেনিয়াদের। তার মধ্যে কোনও তুলনা হয় না কি? তাদের বিশ্বজয়ের দরকার ছিল, তা না হলে মাল বেচতে পারবে না। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ এতই অমানবিক ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমাদের দেশে এখন গোসেবক-গোরক্ষক এই সব নাম দিয়ে কাণ্ডকারখানা চলছে। গোমূত্র পান করলে করোনা সেরে যাবে, থালা বাজালে, বাতি জ্বালালে করোনা চলে যাবে, এগুলো ঘৃণ্য অ্যাজেন্ডা ছাড়া আর কিছু না। এই ভারতের আছে কি থালা বাজানো ছাড়া? তার আবার জার্মানির সঙ্গে তুলনা! অন্যের পিছন ধরে চলে। আর কাগজে লেখা হয়, ভারত একটা বিশাল ব্যাপার। বিশাল শক্তিশালী দেশ। কীসের জোরে এই কথাগুলি বলা হয়? নিজের তো কোনও জোরই নেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এখন চীনবিরোধী কাজ চলছে। যা বলা হচ্ছে, প্রতিটি কথা চ্যালেঞ্জ করা যায়। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে? আমেরিকা বা অন্য দেশ পাশে এসে না দাঁড়ালে ক্ষমতা আছে যুদ্ধ করার? চীনের দ্রব্য বর্জন তো আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আরও প্রভাব ফেলছে। চীনের জিনিস কেনা বন্ধ হলে তো আমেরিকার জিনিস কেনাও বন্ধ করা উচিত। আমি বলব, চীন অতি নরমভাবেই দেখছে গোটা বিষয়টি।

৬০ বছর ধরে কংগ্রেস দেশ চালিয়েছে। কংগ্রেসের অনেক নেতাই দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন। প্রকাশ্যে নয় ঠিকই, গোপনে। ইতিহাস খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। আমার মতে, বামপন্থীদের মূল্যায়নেও অনেক ঘাটতি থেকে গিয়েছে। গান্ধীজীর সঙ্গে আমাদের মতের অমিল ছিল বা আছেও। কিন্তু তাঁর রাজনীতির মধ্যে যে সততা ছিল, তা অস্বীকার করার নয়। আজকের রাজনীতিকদের ক'জনের আছে সেই সততা? এখন তা নতুন করে ভাবাচ্ছে। বামপন্থীরা তখন বলতে পারতেন তো, গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ আছে। এইটুকু বলার জায়গা থাকবে না? গান্ধীজী কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনও আপস করেননি। ঘোর হিন্দু হয়েও তিনি মুসলিম-বিরোধী কাজকর্ম করেছেন, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। ভারতবর্ষকে তিনি চিনতেন তাঁর মতো করেই। জওহরলাল নেহরুর কথাও বলতে হবে এ প্রসঙ্গে। অন্য অনেক বিষয়ে বিরক্তি থাকলেও এ কথা বলতেই হবে, নেহরুও কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনও আপস করেননি। আমি অন্তত সুভাষচন্দ্র বসুর থেকে বড় ধর্মনিরপেক্ষ কাউকে মনে করি না। ওঁর আইএনএ-র গঠন, কাজকর্ম দেখলে বোঝা যায়। আবার সুভাষ বসুর কাছেও ভারতের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কিন্তু গান্ধীই।

গান-বাজনার জগতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদর কমে যাওয়াকে আমি দুর্ঘটনা বলে মনে করি। যাঁরা চর্চা করতেন, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে হয় তো হিন্দু বা মুসলিম। কিন্তু আসলে তাঁরা শিল্পী। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক মারাঠি ব্রাহ্মণ, নাম ভাস্কর বুয়া। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখতে গেলেন আগ্রায়। সেখানে তো সব তাবড় তাবড় ওস্তাদরা থাকেন। তেমনই এক ওস্তাদজীর কাছে নাড়া বাঁধলেন। তো সেই ওস্তাদজী ভাস্কর বুয়াকে দিয়ে এক বছর ধরে শুধু গাড়ুতে জলই ভরাতেন। কতটা 'দিল' লাগিয়েছ, তার পরীক্ষা। কতটা ধৈর্য, কতটা সহ্যশক্তি, সে সবও পরীক্ষা করতেন। আগে দীক্ষা, তারপর শিক্ষা, তারপর পরীক্ষা। এক বছর ওভাবে ছিলেন বুয়া। একবারও ওস্তাদজী বলেননি, অমুক দিন থেকে শেখাব কিছু। একদিন বুয়া ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, হঠাৎ ওস্তাদজী বললেন, আমার খুব মাংস খেতে ইচ্ছে করছে। মাংস নিয়ে আয় তো। মারাঠি ব্রাহ্মণ হয়ে মাংস কিনতে যেতে হবে– ভেবে তো কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন ভাস্কর বুয়া। কেউ দেখলে আর রক্ষে নেই। ওস্তাদজী বললেন, তুই এটুকু করতে পারবি না। তাহলে বাড়ি চলে যা। তোর আর তালিম নিয়ে কাজ নেই। উপায় না দেখে ভাস্কর বুয়া গেলেন মাংস কিনতে। ওস্তাদজীর পায়ের সামনে রাখতেই তিনি বললেন, রান্না করতে হবে। কড়াইয়ে মাংস চাপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাস্কর বুয়ার তখন এমনই অবস্থা যে, প্রায় উনুনের উপরই পড়ে যাবেন। শেষে ওস্তাদজী বললেন, কাল থেকে তোকে তালিম দেব।

আর আজ এই যে গোরু খাওয়া নিয়ে যা চলছে, কী প্রচণ্ড রাগ হয় বলে বোঝাতে পারব না। এত সস্তায় এই হাই প্রোটিন কোথায় পাওয়া যাবে? গোটা বিশ্ব গোরু খায়। সবচেয়ে বড় কথা, কে কী খাবে না খাবে– তুমি (পড়ুন উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা) বলে দেওয়ার কে? গোমাংস ভক্ষণে কোনও হিন্দুর আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্তু সেই আপত্তি অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে কেন? কে কী খাবে, তা-ও তুমি বলে দেবে! এ কোথায় নামছি আমরা! গো-মাংসের ছুতো করে মুসলমান মারা হচ্ছে। এই ছবি আগে ছিল না ভারতবর্ষের। আমাদের দেশ কী, দেশের ভিত্তি কী, সেই চেহারা তো পাঠ্যবই থেকেই জেনেছি।

মোদী যখন রামমন্দিরের ভিতপুজো করলেন, সে দিন থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা নিয়ে খুব চর্চা শুরু হয়েছে, 'দীনদান'। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ নই। লোকমুখে শোনা। পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্য ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এ কথা অস্বীকার করার নয়। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যদি জমিদার পরিবারের সন্তান না হতেন, জমিদারি সামলাতে রবীন্দ্রনাথকে যদি গাঁয়ে-গঞ্জে যেতে না হতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই হতেন না। যুগ-যুগ ধরে ওঁর প্রাসঙ্গিকতা বিরাজ করত না। বাংলাদেশের মানুষকে এভাবে ভালোইবাসতে পারতেন না, যদি না তিনি জমিদারি সামলাতে যেতেন। শিলাইদহে গিয়ে ওঁর চোখ খুলে যায়। শহরের ছেলে হয়ে থাকলে চিনতেন কী করে দেশকে! দেশের জল-মাটি অনুভব করতেন কী করে! ভাবলেন, এই আমার দেশ। এখানে এত সমস্যা মানুষের! ব্রাহ্মবাড়ির ছেলে হওয়ায় ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি কখনওই ছিল না রবীন্দ্রনাথের। হিন্দুদের সঙ্গে বরং অনেক অমিলই ছিল। সেই সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব বড় কথা। মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করতে ইতালি চলে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রোমা রোলাঁদের বকাবকিতে নিজের ভুলও বুঝেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কথা বলব। তিনি নিজে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়েও বেদ-বেদান্তের থেকে ইংরেজি সাহিত্য, বেকন পড়ানোর উপরই জোর দিয়েছেন।

শেষে বলব, গোঁড়ামি তৈরি করতেই চালাকি করে ধর্ম আর রাজনীতি মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কে রামকে ভালোবাসল, কে রহিমকে– তা কোনও ব্যাপারই হতে পারে না। তাই বার বার মনে হয়, এসবের বিকল্প হতে পারে একমাত্র বামপন্থাই।

অনুলিখন : সঞ্চারী চট্টোপাধ্যায়

অনেকে আমাকে পছন্দ করেছেন, অনেকে করেননি

সব্যসাচী চক্রবর্তী

পঁয়তাল্লিশ বছর কাটল। এখন মনে হয়, আমার আর কিছু দেওয়ারও নেই। কিছু নেওয়ারও নেই। বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমার অভিনয় জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে খুব নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ছি।

১৯৬০ সাল। বাবা (জগদীশ চক্রবর্তী), মা (মণিকা চক্রবর্তী), পিসি (চন্দ্রা দস্তিদার), পিসেমশাই (জোছন দস্তিদার) মিলে নাটকের দল তৈরি করলেন, 'রুপান্তরী'। বাবা ও পিসেমশাইয়ের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হতো– 'বিংশোত্তরী', 'স্বর্ণগ্রন্থি', 'দুই মহল', 'কর্ণিক', 'অসমাপ্ত', 'প্রতিনিধি' ইত্যাদি। আমি তখন বেশ ছোট। রোজই সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রচুর লোকসমাগম হতো। নাটকের পোশাক, প্রপ্‌স, সেট, গান, আলো, রূপসজ্জা– বিভিন্ন জনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। মঞ্চায়নের দিন এগিয়ে এলে এলে পোস্টার, বিজ্ঞাপন, টিকিট ইত্যাদির দায়িত্ব এসে পড়ত। ব্যাকস্টেজের কাজ আমাকে বরাবরই বেশি আকৃষ্ট করত। তাই বোধ হয় আমি মিস্ত্রি হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। সেট তৈরির সময় জোগাড়ের কাজ করতাম। রাত জেগে সব কাজ হতো। বোন পাপিয়াকে নিয়ে আমি নিয়মিত শোগুলো দেখতাম।

সিনেমার প্রতি আগ্রহ জন্মায় বাবার কাজ দেখেই। বাবা ওঁর দু'টো বোলেক্স ক্যামেরায় (একটা ৮/১৬ মিলিমিটার, আরেকটা ছোট ৮ মিলিমিটার ক্যামেরা) বিভিন্ন জায়গার ছবি তুলে ট্রাভেল শর্ট ফিল্ম তৈরি করতেন। প্রোজেক্টার, স্প্লাইসার আর একটা ভিউয়ার ছিল। যেহেতু সাউন্ডট্র্যাক ছিল না, তাই একটা অডিও স্পুল রেকর্ডারে নিজের কথা ও সঙ্গীত রেকর্ড করতেন। এগুলো দিয়ে তিনটি ট্রাভেল ফিল্ম এবং চারটি শর্ট ফিল্ম তৈরি করেছিলেন। দু'একটা ছবিতে আমার অভিনয় করার সুযোগও হয়েছিল। আমি তখন খুবই ছোট, তবুও ওই যন্ত্রগুলো আমাকে মুগ্ধ করত। '৬৫ সাল নাগাদ বাবা কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিল্লি চলে যান আমাদের সকলকে নিয়ে। বছরে একবার করে কলকাতা আসতাম। তখন শুধুই নাটক দেখা হতো। দিল্লিতে দু'একজন নাট্য-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সেখানেও নাটক করা আরম্ভ হলো। প্রথমে 'দক্ষিণী' নাট্যদলের সঙ্গে, পরে নিজেদের দল তৈরি হলো, 'চলন্তিকা'। আমাকে ছোটখাটো নেপথ্য-কাজ দেওয়া হলেও স্কুল পাশ না করা পর্যন্ত অভিনয়ের অনুমতি পাইনি। কলেজে পড়ার সময়ে প্রথম নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পাই। তখনও আমরা দিল্লিতেই। ১৯৮৪ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর মা'কে নিয়ে কলকাতায় চলে আসি। বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তার আগেই।

কলকাতায় ফিরে পিসি-পিসেমশাইয়ের নাটকের দল 'চার্বাক'-এর সঙ্গে যুক্ত হই। তখনও অভিনয়ের থেকে নেপথ্যের কাজই বেশি করতাম। প্রধানত নেপথ্য সঙ্গীত এবং শব্দ প্রক্ষেপণের দায়িত্ব ছিল আমার। অভিনয় করতাম, তবে ছোট চরিত্রে। চারটি পূর্ণাঙ্গ ও চারটি একাঙ্ক নাটকে কাজ করেছিলাম। দু'বছরের মধ্যেই অডিও-ভিডিও সংস্থা তৈরি হয় এবং সিরিয়াল বানানোর কাজও শুরু হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, এবার ভিডিওগ্রাফি, অডিওগ্রাফি, এডিটিং, সাউন্ড মিক্সিং এই সব শিখব। শিখলামও। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই অভিনয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। প্রথমে একটা ছোট গল্পের সিরিয়ালে ছোট্ট একটা চরিত্র করতে বলা হলো। একটা পর্বে আমি শব্দযন্ত্রীর সহযোগী হয়ে বুমম্যানের কাজ করেছিলাম। ভিডিও ক্যামেরা কীভাবে

কাজ করে, এডিটিং মেশিনে কীভাবে সম্পাদনা হয়, অডিও রেকর্ডিং কীভাবে হয় ইত্যাদি সব কাজেই আমার উৎসাহ ছিল। তারপর হঠাৎ এল বড় চরিত্রে কাজ করার প্রস্তাব। আকাশ থেকে পড়লাম!

সিরিয়ালের নাম 'তেরো পার্বণ'। লেখক সমরেশ মজুমদার। চরিত্রের নাম 'গোরা'। খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমার ওই সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে না কি আমি নায়ক হবো! সাহস জোগালেন আমার কাছের মানুষরা। পিসি, পিসেমশাই, মা এবং আমার দুই কাকা (সুজিত ঘোষ ও শ্যামল সেনগুপ্ত)। জুতো-জামা কেনা হলো, স্পেশ্যা ল প্রপ্স কেনা হলো। আবার মোটর সাইকেল চালানোটা ঝালিয়ে নিলাম। এক একটা পর্ব দু'-তিন দিন ধরে শ্যুটিং হতো। বহির্দৃশ্যগুলো ডাবিং করতে হতো। মনের জোরে লড়ে গেলাম। দৃশ্যগুলো দেখে বুঝতাম যে, মোটেই ভালো হয়নি। তবু সবাই উৎসাহ দিতেন। অনেক দিন অপেক্ষার পর শেষে দূরদর্শন থেকে সম্প্রচারের তারিখ জানাল, কিন্তু আমরা স্পনসর পেলাম না। তারিখ আবার পিছিয়ে গেল। শেষে স্পনসর পাওয়াতে ১৯৮৬ সালের ১ মে শুরু হলো সেই সিরিয়ালের সম্প্রচার। মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম, লোকে আমায় বর্জন করুক আর আমি ফিরে আসি আমার কারিগরি বিভাগে। কিন্তু আমি অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেলাম। ব্যস, শুরু হয়ে গেল অভিনয় জীবন। ৩৯ পর্বের সেই সিরিয়াল খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। খবর কাগজে, অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ছবি বেরোল। সাক্ষাৎকার বেরোতে থাকল। লোকে আমার সঙ্গে করমর্দন করতে চাইত, আমার অটোগ্রাফ চাইত। জীবনটা হঠাৎই পালটে গেল যেন। বহু গুণী মানুষের সংস্পর্শে এসেছি তখন– রবি ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, রমাপ্রসাদ বণিক, দীপক চৌধুরি, তপন গুহঠাকুরতা, সত্যেন্দ্র মোহান্তি, সুমিতাভ রায় এবং আরও অনেকে।

অভিনয়ের জন্য প্রথম পুরস্কার পাই 'সিনে সেন্ট্রাল' থেকে। তার আগে ভাবতেই পারিনি, আমিও অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত হব। রবীন্দ্র সদনের সেই অনুষ্ঠানে মা'কে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। যদি অজ্ঞান হয়ে যাই, তাহলে মা অন্তত আমাকে দেখবেন! হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সহ তারকাদের মেলা সেখানে। সে দিন পুরস্কার পাওয়ার থেকেও বেশি গর্বিত হয়েছিলাম তাঁদের পাশে বসার সুযোগ পেয়ে এবং আমার মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু দেখে। তারপর শুরু হলো একের পর এক সিরিয়াল। 'উড়নচণ্ডী', 'সেই সময়', 'নাচনী', সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জির 'অন্তর্ধান', 'আশ্চর্য দীপক', 'গৌরব', 'আরোপ', 'গল্পগাথার দেশে', 'ছুট্টিয়োঁ কি কহানিয়াঁ', 'রূপগাথা', 'অল্প অল্প গপ্প', 'যদি হও সুজন' ইত্যাদি। আমাদের নিজেদের সিরিয়াল ছাড়া তখন আরও অনেক সিরিয়ালে কাজের সুযোগ এসেছিল। এর মধ্যেও নাটক থেমে থাকেনি। 'চার্বাক'-এর সঙ্গে 'উত্তর পুরুষ, 'এ এক ইতিহাস', 'পদ্য গদ্য প্রবন্ধ' 'কর্ণিক', 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা', 'আসল জিনিস', 'অথ শিক্ষা বিচিত্রা', 'সতী', 'প্রত্যাশা', 'বানজারা', 'মুখোমুখি', 'পাড় মিলে নাই', 'ঠিকানা' ইত্যাদি চলতেই থাকল।

এর মধ্যে হঠাৎ করেই স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক তপন সিংহের ইউনিট থেকে ডাক আসে সিনেমায় অভিনয় করার জন্য। আমি সটান হাজির হয়ে গেলাম ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম, 'অন্তর্ধান'-এ আমাকে পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য বেছেছেন। আমার সিনেমায় অভিনয়ের সেই শুরু। প্রথম ছবিতেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজের সুযোগ পাই। তারপর প্রভাত রায়ের 'শ্বেত পাথরের থালা'। তত দিনে আমার ভয়টা অনেক কমে এসেছিল। দেখলাম, প্রত্যেকটি মানুষের থেকে কত কী শেখার আছে। এরপর রাম মুখোপাধ্যায়, রাজা সেন, পিনাকী চৌধুরি, মিলন ভৌমিক, সুব্রত সেন, কৌশিক গাঙ্গুলি সহ অনেকের ছবিতে কাজের সুযোগ পেলাম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম, যেদিন সন্দীপ রায় আমাকে 'ফেলুদা'র চরিত্রে বাছলেন। ছোটবেলার স্বপ্ন সফল হলো। অভিনেতাই হবো, এমন ভাবিনি ঠিকই। কিন্তু 'ফেলুদা' হতে চেয়েছিলাম। ফেলুদার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বাবা অনেকটা ওইরকম ছিলেন।

শাশ্বত চ্যাটার্জি হলো তোপসে আর রবি ঘোষ হলেন জটায়ু। এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে। শুরু হলো 'বাক্স রহস্য' আর 'গোঁসাইপুর সরগরম' দিয়ে। টেলিভিশনের ফেলুদাও তুমুল জনপ্রিয়তা পেল। আমরাও ভীষণ উৎসাহ পেলাম। হঠাৎই রবি ঘোষ মারা গেলেন। সেই ধাক্কা সামলে ওঠা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাবুদা (সন্দীপ রায়) ঠিক করলেন, জটায়ু ছাড়া একটা গল্প চিত্রায়িত করবেন। 'শেয়াল দেবতা রহস্য' তৈরি হলো। তারপর অনুপকুমার এলেন জটায়ু রূপে, তৈরি হলো 'বোসপুকুরে খুনখারাপি' এবং 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে'। আবার একটা বিরাট ধাক্কা। অনুপকুমারও মারা গেলেন। লোকে আরও বেশি করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথা বলতে আরম্ভ করল। যিনি-ই জটায়ুর চরিত্রে অভিনয় করবেন, তিনিই না কি বেশি দিন বাঁচবেন না। তাহলে তো বলতে হয়, সিধু জ্যা ঠার চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন, তিনিও আর বাঁচবেন না। এসব বাজে কথাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন বিভু ভট্টাচার্য। উনি বহাল তবিয়তে টেলিভিশন সিরিজ করলেন, 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা', 'ডক্টর মুন্সীর ডায়েরি', 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য' আর 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'। শুধু তা-ই নয়, তারপরে আরও পাঁচটা সিনেমা করলেন। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'টিনটোরেটোর যীশু', 'গোরস্থানে সাবধান' এবং 'রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য'।

'রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য' তৈরি শেষ হওয়ার পর বিভুদাও মারা গেলেন। আমিও ঠিক করলাম, আর ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করব না। আমার সঙ্গে চার জন তোপসে, চার জন জটায়ু আর চার জন সিধু জ্যাঠা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শাশ্বত চ্যাটার্জি, পরমব্রত চ্যাটার্জি, সাহেব ভট্টাচার্য এবং গৌরব চক্রবর্তী (নাটকে) তোপসে হিসাবে, রবি ঘোষ, অনুপ কুমার, বিভু ভট্টাচার্য এবং সুবীর রায়চৌধুরী (নাটকে) জটায়ু হিসাবে এবং অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিধু জ্যাঠা হিসাবে। সন্দীপ রায় যখন 'বাদশাহী আংটি' তৈরি করেন, তখন আমি ওনাকে অনেক জনের নাম সুপারিশ করি। আবীর চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, টোটা রায়চৌধুরী, যীশু সেনগুপ্ত, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শাশ্বত চ্যাটার্জি, পরমব্রত চ্যাটার্জি প্রমুখ। উনি শেষে আবীরকেই বেছে নেন। সমস্যা হলো যে, আবীর তখন ব্যোমকেশ বক্সীর চরিত্রেও অভিনয় করছিল। তার থেকে আরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো, ফেলুদা আর ব্যোমকেশ, দু'টি ছবিই একসঙ্গে ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেল। একই মানুষকে দু'টি গোয়েন্দা চরিত্রে মেনে নিতে পারলেন না দর্শকরা। সন্দীপ রায় মহা বিপদে পড়লেন। আবার আমাকে ফিরতে বললেন। আমিও লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। শুরু হলো দুটো ছোট গল্প নিয়ে ছবি 'ডবল ফেলুদা'। 'সমাদ্দারের চাবি' এবং 'গোলকধাম রহস্য'। এই ছবিটি 'ফেলুদা' সৃষ্টির ৫০ বছরের শ্রদ্ধার্ঘ্য ছিল। তবে ছবিটি আগের মতো সাড়া ফেলেনি বলেই আমার মনে হয়। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া অবশ্য ভালোই ছিল। চলেওছিল অনেক দিন। তারপর থেকে সন্দীপ রায় জটায়ুর জন্য অভিনেতা খুঁজেই চলেছেন, কিন্তু মনের মতো কাউকে পাচ্ছেন না। অগত্যা প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে ছবি করলেন।

'ফেলুদা' ছাড়াও 'রুদ্র সেন' নামে এক গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ হয়েছে আমার। দূরদর্শনে প্রথমে ১২ পর্বের একটি সিরিয়ালে এবং পরে ই-টিভিতে ৮টি টেলিফিল্মে। সেখানেও আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ছিলাম, তবে ফেলুদার থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের। একটু ফিলিপ মারলো গোছের গোয়েন্দা। বেশ উপভোগ করেছিলাম অঞ্জন দত্তর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা। আমি 'কাকাবাবু'র চরিত্রেও অভিনয় করেছি। 'কাকাবাবু হেরে গেলেন?' এবং 'এক টুকরো চাঁদ' (দু'টিই পিনাকী চৌধুরির পরিচালনায়), আর একটি সিরিয়াল 'খালি জাহাজের রহস্য'। তবে কাকাবাবু গোয়েন্দা চরিত্র নয়। একেবারেই একজন অভিযাত্রী। ঘটনাচক্রে রহস্যে জড়িয়ে পড়েন। এগুলো ছাড়া বহু পুলিশ ও গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করেছি। আসলে আমার পুলিশ বা গোয়েন্দা করতে ভালো লাগে, অথবা বলা যেতে পারে আমার রুক্ষ চেহারাটা এই চরিত্রের সহায়ক হয়। নায়কোচিত বা প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করিনি, তা নয়। নায়ক বা নায়িকার বাবার চরিত্রে অভিনয়ের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, দুলাল লাহিড়ী, তমাল রায়চৌধুরী, গার্গী রায়চৌধুরী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চূর্ণি গাঙ্গুলী, অনুরাধা রায় প্রমুখ শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। অগ্রজদের থেকে যেমন শিখেছি, অনুজদের কাছ থেকেও অনেক শিখেছি। হিন্দি ছবিতেও বহু শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। শাহরুখ খান, সৈয়ফ আলি খান, অমিতাভ বচ্চন, অজয় দেবগন, সঞ্জয় দত্ত, নসিরুদ্দিন শাহ, আশিস বিদ্যার্থী, ফারুখ শেখ, ইরফান খান, জ্যাকি শ্রফ, মনীষা কৈরালা, রবিনা ট্যান্ডন, জয়া বচ্চন, জয়া প্রদা, টাবু, বিদ্যা বালান এবং আরও অনেকে। প্রত্যেকের নিজস্বতা দেখে খুব ভালো লেগেছে।

কম করে ১৬০টি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছি। হিন্দিতে ন'টি– 'দিল সে', 'খাকী', 'পরিণীতা', 'লাহোর', 'মাইকেল', 'ফ্রম সিডনি উইথ লভ', 'ফ্যান্টম', 'তিন' আর 'হাপ্ত'। শেষের ছবিটি এখনও মুক্তি পায়নি। দু'টি ইংরেজি ছবি করেছি 'দ্য নেমসেক' আর 'বো ব্যারাক্স ফরেভার'। আর একটি দোভাষিক ছবি 'পিয়ালীর পাসওয়ার্ড' (একই ছবিতে দু'টি ভাষায় সংলাপ) এবং একটি কন্নড় ছবি 'ভূমি থৈয়া চোচলা মগা'। বাংলা সিরিয়াল করেছি ৭০টি, আর ৪০টি বাংলা টেলিফিল্ম। হিন্দিতে ১২ টি সিরিয়াল ও তিনটি টেলিফিল্মে অভিনয় করেছি। এসব কাজই ১৯৮৫ থেকে ২০২০-র মধ্যে। এত কাজ করার পরেও মনে হয়, আমার আরও শেখার আছে। আমি সিরিয়ালে এবং সিনেমায় গানও গেয়েছি। যদিও যথেষ্ট বেসুরো, তবু দর্শকরা মেনে নিয়েছেন। অনেক রেডিও নাটকে অভিনয় করেছি। লোকজনের যথেষ্ট প্রশংসাও পেয়েছি। অনেক তথ্যচিত্রে ভাষ্যকার হিসাবে কাজ করেছি। এই ৩৫ বছর ধরে নানারকম কাজ করে গিয়েছি। অনেকে আমাকে পছন্দ করেছেন, অনেকে করেননি। সিরিয়ালে কাজ শুরু করি নাটকে কাজ করার ১০ বছর পর। অর্থাৎ ৪৫ বছর হয়ে গেল অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে। ১৯৭৫ সালে থিয়েটারে, ১৯৮৫ সালে সিরিয়ালে এবং ১৯৯২ সালে সিনেমায় এসেছি। অভিবাদন, হাততালি, পুরস্কার, স্বীকৃতি, সম্মান, ভালোবাসা, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি পেয়ে আমি অভিভূত। এতটা আমি কোনও দিন আশা করিনি। যা পেয়েছি, তা পাওয়ার আমি যোগ্য কি না, তা নিয়ে সত্যি সন্দেহ হয়। তবু অভিনয় করে যাচ্ছি। করে যাব যত দিন দর্শক চাইবেন, আর যত দিন ইচ্ছেটা বেঁচে থাকবে। ইচ্ছেটা যে ক্রমশ কমে আসছে, সেটা স্বীকার করছি। নতুন যুগের বহু প্রতিভাবান শিল্পী আজ উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন। তাঁদের আরও উৎসাহ দিতে হবে।

খল চরিত্রে অভিনয় করতে আমি বরাবরই বেশি পছন্দ করি। কারণ, সেখানে অভিনয়ের সুযোগ অনেক বেশি থাকে। অনেকেই সে সুযোগ আমায় দিয়েছেন। আবার নাটকের তারিখের সঙ্গে শ্যুটিংয়ের দিন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে অনেক সিরিয়াল-সিনেমার প্রস্তাব ফিরিয়েছি। আমার নাটকের দল আমাকে ছাড়া দুর্বল হয়ে পড়বে, অনেক শো করতে পারবে না, এসব ভেবে সিনেমার কাজ নিতে পারিনি অনেক ক্ষেত্রেই। মূলত এ জন্যই আস্তে আস্তে সিরিয়াল থেকে বেরিয়ে এলাম।

নিজের নাটকের দলের অনুমতি নিয়ে আমি অন্য নাটকেও অভিনয় করেছি। যেমন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রচিত ও অশোক মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দুঃসময়', শেকসপীয়ার অবলম্বনে চন্দন সেনের নাটক 'সীজার', অবন্তী চক্রবর্তীর 'ট্রয়' আর রবার্ট লী এবং জেরোম লরেন্স রচিত ও চন্দন সেন অনুবাদিত ও পরিচালিত 'অপবিত্র'। 'চার্বাক' ১৯৭৭ থেকে এখনও পর্যন্ত ৩০টি নাটক প্রযোজনা করেছে। আমি সবক'টিতেই অভিনয় করেছি এবং নেপথ্যের কাজও করেছি। মঞ্চে, টিভি'তে, সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগের পর এক দিন রেডিওতে নাটক করার সুযোগ এল। আমাদেরই মঞ্চস্থ করা দু'-একটি নাটক আকাশবাণীতে পরিবেশন করা হলো। আমার একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হলো। তখন একটাই মাইক্রোফোন থাকত মাঝখানে আর আমরা সবাই চরিদিকে গোল হয়ে বসতাম। পরে আলাদা আলাদা মাইক নিয়েই কাজ হতো। এই ধরনের অডিও নাটক করতে করতে শ্রুতি নাটক করার সুযোগ এল। প্রায় গোটা দশেক শ্রুতি নাটকের চল্লিশ-পঞ্চাশটা শো করেছি বিভিন্ন সময়ে। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল রেডিও মির্চি-র সানডে সাসপেন্স করার সময়ে। গানের ক্যাসেটে বা সিডি'তে বর্ণনা পাঠের সুযোগ এসেছে, এমনকী ইংরেজিতেও। অনেক তথ্যচিত্রে সূত্রধরের ভূমিকায় পাঠও করেছি। অনেক বিজ্ঞাপনেও কণ্ঠ দিয়েছি। অনেক অ্যানিমেশন সিরিয়ালে কণ্ঠদান করেছি এবং করছি।

আমি টিভিতে পরিচালনার কাজও করেছি। সোনেক্স-এর হয়ে কিছু সিরিয়ালের কিছু পর্ব পরিচালনা করেছি। পরে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার সময় টেলিফিল্ম ও সিরিয়াল পরিচালনা করেছি। জি টিভিতে, আকাশ বাংলায় এবং তারা টিভিতে বেশ কিছু টেলিফিল্ম তৈরি করেছি। 'রহস্য গল্প' নাম সিরিজ হতো ইটিভিতে, তার প্রায় ১০০টি পর্ব পরিচালনা করেছি। অবশ্য আমার সঙ্গে প্রতিভাবান সহপরিচালকরা ছিলেন বলে আমার কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। চিত্রভানু বসু, জয়দীপ মুখার্জি,

রানা পাল, রাজদীপ ঘোষ, মৃদুল সেন প্রমুখ। সম্পাদনায় শিবু সরকার ও চিত্রভানু বসু। সঙ্গীতে দেবজ্যোতি মিশ্র। এখন অনেকে জানতে চান, আমি ছবি পরিচালনায় আগ্রহী কি না। আমার জবাব, 'না'। আমি মনে করি, সিনেমা পরিচালনা করার মতো ধৈর্য্য বা ক্ষমতা আমার নেই। চট করে অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। নিজের মনের মতো না হলে মেজাজ খারাপ করি। এক জন প্রযোজকের টাকা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। তাই করব না।

এখন একটা নতুন ধরনের কাজ শুরু হয়েছে। ওয়েব সিরিজ। আমি এই ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন। অভিনয়ের কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু এখানে দেখলাম, কোনও সেন্সরশিপ নেই। অশ্লীল সব দৃশ্য চিত্রায়ন করা হচ্ছে। অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ করা হচ্ছে। অবশ্য আমাকে এখনও সে রকম কোনও কাজ করতে হয়নি। কেউ করতে বললে হয়তো সে কাজ আমার আর করা হবে না।

সিনেমা, টেলিফিল্ম ও সিরিয়ালে বহু মারপিট ও বিপজ্জনক দৃশ্য করেছি। চোট পেয়েছি, সেরে উঠেছি, আবার করেছি। যেগুলো একেবারেই আমার ক্ষমতার বাইরে, সেগুলো স্টান্টম্যানরা করে দিয়েছে। অনেক সময় ঘুঁষোঘুঁষির দৃশ্য করতে গিয়ে আহত হয়েছি। খোলা আকাশের নিচে শুটিং করলে প্রোডাকশনের ছেলেরা মাথায় ছাতা ধরেছে, আমার খুব খারাপ লেগেছে। মনে হয়েছে, আমি কোনও জমিদার। ভৃত্যদের শোষণ করছি।

আমার কোনও গাড়ির চালক নেই, আমার কোনও ব্যক্তিগত রূপসজ্জার লোক নেই, আমার কোনও সেক্রেটারি নেই, আমার কোনও প্রোডাকশন সহযোগী নেই। আমি 'তারকা' নই, আমি অভিনেতা। 'তারকা' হতে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার, সেগুলো আমার একটাও নেই। এখন কাজ কমানোর চেষ্টায় আছি। রোজগার কম আসবে। বিলাসিতা কোনও দিনই পছন্দ করতাম না। যেটুকু মাঝে মধ্যে প্রশ্রয় পেয়েছে, তাও এবার বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বেড়াতে যেতে চাইব। প্রকৃতির মাঝে। পশুপাখির মাঝে। যত দিন বেঁচে থাকব, কাজ করব। কত রকম কাজ আছে। বাড়ির কাজই তো একগাদা। অভিনয় করব, কিন্তু বেছে বেছে। করোনা ভাইরাসের দাপটে পৃথিবী আজ পালটে যাচ্ছে। এত দিন ঘরে বসে থেকে বাড়িতে থাকাটাই আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, এখন আর দৌড়াদৌড়ি করতে ইচ্ছে করে না। লেখালেখির দিকে একটু মন দিতে চাই, জানি না পারব কিনা!

শারদ শুভেচ্ছা

ক্যালকাটা কয়্যারের

নবতম প্রযোজনা - অবন ঠাকুরের

ক্ষীরের পুতুল

"আট থেকে আশি সবার মুখে হাসি"

এছাড়া বৃন্দগান ও নৃত্যায়ন, গুপী বাঘার কাণ্ড, গোপী বাঘা কা তামাসা (হিন্দি), অদ্ভুতুড়ে ভুতের গপ্পো, আলিবাবা – এই প্রযোজনাগুলি চলছে চলবে

সঙ্গীত/সম্পাদনা/নির্দেশনা : কল্যাণ সেন বরাট

ক্যালকাটা কয়্যারের পরবর্তী প্রযোজনা প্রস্তুতির পথে

যোগাযোগ : ৯৮৩১১২৫২৮৭, ৯৮৩০০২৯২৮৬

রানা পাল, রাজদীপ ঘোষ, মৃদুল সেন প্রমুখ। সম্পাদনায় শিবু সরকার ও চিত্রভানু বসু। সঙ্গীতে দেবজ্যোতি মিশ্র। এখন অনেকে জানতে চান, আমি ছবি পরিচালনায় আগ্রহী কি না। আমার জবাব, 'না'। আমি মনে করি, সিনেমা পরিচালনা করার মতো ধৈর্য্য বা ক্ষমতা আমার নেই। চট করে অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। নিজের মনের মতো না হলে মেজাজ খারাপ করি। এক জন প্রযোজকের টাকা নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। তাই করব না।

এখন একটা নতুন ধরনের কাজ শুরু হয়েছে। ওয়েব সিরিজ। আমি এই ক্ষেত্রে একেবারেই নতুন। অভিনয়ের কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু এখানে দেখলাম, কোনও সেন্সরশিপ নেই। অশ্লীল সব দৃশ্য চিত্রায়ন করা হচ্ছে। অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ করা হচ্ছে। অবশ্য আমাকে এখনও সে রকম কোনও কাজ করতে হয়নি। কেউ করতে বললে হয়তো সে কাজ আমার আর করা হবে না।

সিনেমা, টেলিফিল্ম ও সিরিয়ালে বহু মারপিট ও বিপজ্জনক দৃশ্য করেছি। চোট পেয়েছি, সেরে উঠেছি, আবার করেছি। যেগুলো একেবারেই আমার ক্ষমতার বাইরে, সেগুলো স্টান্টম্যানরা করে দিয়েছে। অনেক সময় ঘুঁষোঘুঁষির দৃশ্য করতে গিয়ে আহত হয়েছি। খোলা আকাশের নিচে শুটিং করলে প্রোডাকশনের ছেলেরা মাথায় ছাতা ধরেছে, আমার খুব খারাপ লেগেছে। মনে হয়েছে, আমি কোনও জমিদার। ভৃত্যদের শোষণ করছি।

আমার কোনও গাড়ির চালক নেই, আমার কোনও ব্যক্তিগত রূপসজ্জার লোক নেই, আমার কোনও সেক্রেটারি নেই, আমার কোনও প্রোডাকশন সহযোগী নেই। আমি 'তারকা' নই, আমি অভিনেতা। 'তারকা' হতে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার, সেগুলো আমার একটাও নেই। এখন কাজ কমানোর চেষ্টায় আছি। রোজগার কম আসবে। বিলাসিতা কোনও দিনই পছন্দ করতাম না। যেটুকু মাঝে মধ্যে প্রশ্রয় পেয়েছে, তাও এবার বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বেড়াতে যেতে চাইব। প্রকৃতির মাঝে। পশুপাখির মাঝে। যত দিন বেঁচে থাকব, কাজ করব। কত রকম কাজ আছে। বাড়ির কাজই তো একগাদা। অভিনয় করব, কিন্তু বেছে বেছে। করোনা ভাইরাসের দাপটে পৃথিবী আজ পালটে যাচ্ছে। এত দিন ঘরে বসে থেকে বাড়িতে থাকাটাই আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, এখন আর দৌড়াদৌড়ি করতে ইচ্ছে করে না। লেখালেখির দিকে একটু মন দিতে চাই, জানি না পারব কিনা!

শারদ শুভেচ্ছা

ক্যালকাটা কয়্যারের

নবতম প্রযোজনা - অবন ঠাকুরের

ক্ষীরের পুতুল

"আট থেকে আশি সবার মুখে হাসি"

এছাড়া বৃন্দগান ও নৃত্যায়ন, গুপী বাঘার কাণ্ড, গোপী বাঘা কা তামাসা (হিন্দি), অদ্ভুতুড়ে ভুতের গপ্পো, আলিবাবা – এই প্রযোজনাগুলি চলছে চলবে

সঙ্গীত/সম্পাদনা/নির্দেশনা : কল্যাণ সেন বরাট

ক্যালকাটা কয়্যারের পরবর্তী প্রযোজনা প্রস্তুতির পথে

যোগাযোগ : ৯৮৩১১২৫২৮৭, ৯৮৩০০২৯২৮৬

কে লিখেছিলেন দ্য প্লেগ ম্যানিফেস্টো?

নিবেদিতা? না, স্বামী বিবেকানন্দ?

শংকর

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ভারতকন্যা নিবেদিতা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ইংরেজনন্দিনী মার্গারেট নোবেল যেদিন কলকাতার জাহাজঘাটে নামলেন এবং স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে আনন্দে বিভোর হলেন, ১৮৯৮ সালের সেই সময়টা যে কারও পক্ষে তেমন ভালো নয়, তা ঠিকঠাক বুঝতে আমারও যথেষ্ট সময় লেগে গেল। কলকাতায় পদার্পণ করে খোদ এসপ্ল্যানেড থেকে ছোট বোন নিমকে তিনি প্রথম যে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর খোঁজ পাইনি। দ্বিতীয় চিঠিটা পার্ক স্ট্রিট থেকে লিখেছিলেন বান্ধবী মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে। এই চিঠিটা কয়েকবার পড়েছি, কিন্তু সেখানেও আসন্ন ঝড়ের কোনও ইঙ্গিত নেই, কোনও দুশ্চিন্তা নেই সহায় সম্বলহীনা বিদেশিনীর কীভাবে চলবে। ভরসার মধ্যে আর এক ইংরেজ রমণীর প্রতিশ্রুতি, তিনি মাসে পনেরো টাকা পাঠিয়ে দেবেন। সে এক মস্ত গপ্প, সে নিয়ে সময় ব্যয় করার জন্য আজকের এই রচনা নয়।

আমাদের লক্ষ্য তারিখবিহীন এক শুক্রবারে স্বামীজীর হস্তলিখিত একটা স্লিপ, "প্রিয় রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), তুমি অবিলম্বে সিস্টার নিবেদিতাকে ১০০ টাকা দাও ওঁর প্লেগ কার্যক্রমের জন্য এবং একটা প্লেগ অ্যাকাউন্ট খুলে ফেল।" এই চিরকূটের উল্লেখ দেখিনি কোনও পত্রাবলীতে। এর পরেই আর এক তারিখহীন চিঠি স্বামীজীর কাছ থেকে– "প্রিয় মার্গট, আজ আসতে পারছি না, শরীরটা মোটেই ভালো নয়।"

এরপরেই স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনী থেকে কিছু উদ্ধৃতি। "ইতিমধ্যে কলিকাতায় সংক্রামকভাবে প্লেগ দেখা দিল। বহু নরনারী ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত, ইহাতে কলিকাতাবাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়।" এই দারুণ দুঃসংবাদে স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতা অত্যাধিক বৃদ্ধি পায়। এবার শুনুন স্বামীজীর প্রিয় গুরুভাই গ্যানূসের মুখে– "স্বামীজী অমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না। চুপচাপ। একটা বালিশের ওপর মাথা গুঁজে সারাদিন বসে রইলেন। তারপর শুনলাম, কলকাতায় প্লেগে তিনভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে শুনে অবধি এই। সে সময় স্বামীজী বলেছিলেন, সর্বস্ব বিক্রি করেও এদের সেবা করতে হবে। আমরা যে গাছতলার ফকির ছিলাম, সেই গাছতলাতেই থাকব।"

সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়েই স্বামীজী যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, শহরে তখন এমনই অবস্থা যে, শিয়ালদহ থেকে বাগবাজারে আসতে ঘোড়াগাড়ি ভাড়া ছ'টাকা লেগেছিল।

স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীকার লিখছেন, অফিসে না গিয়ে প্লেগাক্রান্ত নাগরিক অধিবাসীরা বাড়ি ফিরছেন। আরও শুনলেন, গুন্ডার দল মাঝপথে ট্রাম আটক করেছে, একটু এগোলে খুন-জখম হবে। কলকাতার আবহাওয়ায় সর্বত্র একটা মহা-আতঙ্কের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীকার এবার বেলুড় নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে স্বামীজীর এক জনসভার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "আমাদের মরণভয় তুচ্ছ করে এইসব প্লেগরোগীদের সেবা করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধ দিতে, চিকিৎসা করাতে আমাদের এই নতুন মঠের জমিও যদি বিক্রি করতে হয় এবং আমাদের জীবন যদি বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও আমরা প্রস্তুত।"

প্লেগের জন্য মঠের যে কমিটি তৈরি হয়েছিল, তার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি মার্গারেট নোবেল, অফিসার ইন চিফ স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সদানন্দ, যিনি গুপ্ত মহারাজ হিসাবেই পরিচিত। এঁদের জন্য তিন সন্ন্যাসী সহায়ক– স্বামী শিবানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ।

নিবেদিতার সম্প্রতি প্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে একটি আশ্চর্যের বেনামা রচনার পাণ্ডুলিপির উল্লেখ রয়েছে। তারিখ ৪ মে, ১৮৯৮। এর শিরোনাম– 'ক্যালকাটা নোটস বাই অ্যান ইংলিশ লেডি'। ইংরেজি এই প্রবন্ধের কিছু অংশ– "গত শনিবার শহরে প্রবল সঙ্কট– সবাই প্লেগের ঘোষণা জেনেছে, কিন্তু এর মোকাবিলায় সরকার কি করতে চলেছিল তা নির্ধারিত হয়নি, এবং ধনীরা শহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছেন এবং সাধারণ মানুষের ভাগ্যের হাতে।"

রোগ সম্বন্ধে ততটা চিন্তা নেই। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবার পথে, মানুষের প্রাইভেসি ও মেয়েদের মানসম্মান ভাঙবার পথে। লোকের উদ্বেগের সীমা নেই। এই সময়ে স্থানীয় সরকার ঘোষণা করলেন, প্লেগের টিকা আবশ্যিক নয় এবং সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হবে মহামারী যতই ভয়াবহ হোক।

আরও উল্লেখ রয়েছে, ছোটলাট স্যর জন উডবার্ন নিজের দায়িত্বে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বলা বাহুল্য তাঁর জনপ্রিয়তা এই মুহূর্তে তুঙ্গে। পালাবার হুড়োহুড়ি কমতির দিকে এবং গাড়োয়ান, মাঝি ও রেলের পোর্টারদের অস্বাভাবিক উপার্জন এবার কমতির দিকে।

এরপরেই রয়েছে দাঙ্গা আক্রান্ত কলকাতা শহরের বিস্ময়কর বর্ণনা, কিছু অসহায় মানুষের মৃত্যু এবং এরই মধ্যে এক আমেরিকান বান্ধবীর সঙ্গে দুঃসাহসিনী ইংরেজ তরুণীর নেটিভ কোয়ার্টার্র ভ্রমণের অবিস্মরণীয় বর্ণনা।

আমরা শুনেছিলাম, পাড়ার পর পাড়া খাঁ খাঁ করছে, জলের ভিস্তি, সাফাইকর্মী সবাই শহর ছেড়ে পালিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় জমে উঠেছে নোংরার স্তূপ।

দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা। এবং গুজব, কিছু মস্তান পুলিশের ড্রেস পরে একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিরীহ লোকদের পাকড়াও করে প্লেগের টিকা দেওয়ার জন্য, যার নিশ্চিত ফলাফল ছ'ঘণ্টার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

ইংরেজ মহিলা ও তাঁর আমেরিকান সঙ্গিনী নেটিভ কোয়ার্টারের মধ্য দিয়ে রেলস্টেশনের দিকে এগিয়ে চলেছেন একজন বন্ধুকে ট্রেন থেকে নামাতে।

এই পথেই তখন চলেছে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের অঘোষিত লড়াই। কয়েকজন সাবধান করেছিলেন বিদেশিনীদের, আর এগোবেন না, প্রাণ সংশয় হতে পারে। বেশ কিছু কৌতূহলী লোক বিদেশিনীদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এবং বর্ণনা করছে টিকা পদ্ধতির, গলা, হাত ও পায়ে চারটি ছুরিকাঘাত এবং এই টিকা দেওয়া হচ্ছে জোর করে। বিদেশিনীরা বললেন, তাঁরাও টিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, জনতার বিশ্বাস সে টিকা হবে অন্যরকম। ব্রাহ্মসমাজের ষাট জন এই টিকা নিয়েছেন এবং গরিব মানুষের বেঁচে থাকার কোনও পথ নেই।

যাত্রাপথ কিছুটা পরিবর্তন করে এবার চিৎপুর রোডের দিকে যাওয়া। ট্রামগুলো নিঃশব্দে টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে আছে, পথে যানবাহন একেবারে নেই পুলিশের হুকুমে।

কঠিন এই পরিস্থিতিতে জনতার একাংশ বিদেশিনীদের অনুরোধ করলেন, দয়া করে আরও এগিয়ে বিপদ ডেকে আনবেন না। "আমরা বিশদ জেনেও কেন এগোতে যাচ্ছি? আমরা তবুও এগোতে চলেছি দেখে অনেকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে চাইল। আর একজন আমাদের সঙ্গ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত এসে আমাদের নৌকোয় তুলে দিয়ে নিশ্চিত হলো।

কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা যখন নিজেদের ঠিকানায় ফিরে এলাম, তখন শুনলাম, সৈন্যরা উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। চারদিকেই সন্ত্রাস, নিরাপত্তাবোধ এতই কম, আমরা নিজের চোখেই দেখে এলাম, সরকারি ত্রাসে সাধারণ মানুষ ভীষণ বিরক্ত।"

কলকাতার দুঃসময় বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা একটি অসাধারণ মন্তব্য করেছেন–ignorance, superstition and prejudice একত্রিত হয়েছে শান্তিকে বিঘ্নিত করতে। যারা রাজভক্ত তারাও বলতে আরম্ভ করেছে সরকার কাঁপছে, পতন বোধহয় আসন্ন। এরপরেই বাংলার ছোটলাটের প্রশস্তি– ঈশ্বর তাঁর সহায় হোন।

অসাধারণ এই নিবেদিতার ছদ্মনামে লেখাটি ইংরেজি একটা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমরা খবর পাচ্ছি। কিন্তু লেখিকা নিবেদিতার খোঁজ নিতে আজকের এই লেখা নয়, আমরা উদ্ঘাটন করতে চাই ভগ্নী থেকে লোকমাতার দুর্গম লক্ষ্যের যাত্রী নিবেদিতাকে।

প্লেগাক্রান্ত কলকাতা সম্বন্ধে নিবেদিতার একটি চিঠি ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় (২৮ মার্চ ১৮৯৯) প্রকাশিত হয়েছিল, যা আজও পাঠযোগ্য। এইখানেই তিনি বলছেন, আমরা সহজেই শহরের জঞ্জাল সরানোর জন্য টাকা তুলতে পারি। প্রয়োজনে আমরা এর জন্য ট্যাক্স ও বসাতে পারি। ১২ লাখ নগরবাসীর জন্য আমাদের ১২০০ সাফাইকর্মীও নেই। এই চিঠিতেই তাঁদের হ্যান্ডবিল তৈরির ইঙ্গিতও রয়েছে, যার সম্বন্ধে পরে আরও কিছু আলো-আঁধারি দূর করতে হবে। জনগণকে অবহিত না করে জনসমর্থন লাভ সম্ভব নয় তা জেনেই দূরদর্শিনী নিবেদিতা জানাচ্ছেন, কেষ্টুলিতলা এবং বাগবাজার রামকান্ত বসু লেনে দুই সন্ন্যাসীর কাছে বিশেষ লিফলেট পাওয়া যেতে পারে।

সেবিকা নিবেদিতার একটা ছবি আমার নতুন বইতে (দুঃসময়ের দিনলিপি) সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। "মঙ্গলবার দশটা থেকে একজনকে নার্সিং করলাম, সন্ধ্যায় মানুষটি মারা গেল। প্রবল জ্বর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে delirium– সামান্য ফুলো ফুলো ভাব– তারপর হার্ট কোলাপস, তারপর 'হি ডায়েড পিসফুলি'। এখন বুঝতে পারছি, কয়েক সপ্তাহ আগে যে মেয়েটি মারা গিয়েছিল, তারও প্লেগ হয়েছিল।"

এরপরে প্লেগাক্রান্ত মহানগরীর দুর্গত মানুষের উদ্ধারে নিবেদিতা কীভাবে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা আজও আমাদের পাঠযোগ্য। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য অপরিচ্ছন্ন বস্তিগুলোকে যেভাবে সম্ভব পরিষ্কার করা। কিন্তু অর্থের অভাব–"মজুরদের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য যে টাকা রেখেছিলাম, তার এক তৃতীয়াংশ যন্ত্রপাতি এবং ডিসইনফেক্ট্যান্ট কিনতে ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে, এই টাকা তোলবার অন্য কোনও সম্ভাবনা না দেখে আমি কলকাতার ইউরোপিয়ানদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।"

এই সময়েই বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে

বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে যে সভা হয়েছিল, সেখানে নিবেদিতার ভাষণ আজও পাঠের যোগ্য।

'গ্রেট পার্মানেন্ট বিজনেস' বলে চমৎকার ইংরেজি শব্দ কয়েকটি ব্যবহার করে সভায় উপস্থিত ছাত্রদের নিবেদিতা প্রশ্ন করলেন, "ছাত্রদের কর্তব্য কী? আমাকে বলা হয়েছে, বস্তি পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব বস্তির মালিকদের। আমি ভাবতেই পারি না, এমন কথা বলা যায়।"

একসময়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তিনি বললেন, "এই শহরে যাঁরা নিজেদের পুরুষ মানুষ মনে করেন, আমরা তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই, আমরা চাই প্র্যাকটিক্যাল এগজাম্পলের মধ্যে লোকশিক্ষা।"

৩১ মার্চ, ১৮৯৯ গুডফ্রাইডেতে স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে ৭ জন সাফাইকর্মী নিয়ে ঐতিহাসিক সেবাকর্মের শুরু। পরের সোমবার কর্মীসংখ্যা বেড়ে হলো ১২। বুধবার ১৯ এপ্রিল কাজ শুরু হলো শিয়ালদহ মুনসিবাজার বস্তিতে।

নিবেদিতার নেতৃত্বে নগর কলকাতায় যে অভূতপূর্ব মানব সেবাযজ্ঞের সূচনা হয়েছিল, তা বর্ণনা করার জন্য আজকের এই রচনার প্রচেষ্টা নয়। যে দিকটার দিকে নজর দেওয়া ইচ্ছা, জনসেবার যোগ্য পটভূমিকা রচনার জন্য জনসমর্থন ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নিবেদিতা বুঝতে পেরেই এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্লেগ-সংক্রান্ত 'লিফলেট' তৈরির ব্যাপারে তিনি ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এ দেশের জনসংযোগ প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই 'হ্যান্ডবিল' অথবা লিফলেটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। প্লেগ নিরোধের নাম করে সৈন্যবাহিনীর যে দায়িত্বহীন নিষ্ঠুরতা পুণা শহরের নিরাপরাধ পুরুষ ও রমণীর ওপর নেমে এসেছিল, তারই পরিণতি প্লেগ অফিসার আইসিএস র্যানন্ডের হত্যাকাণ্ড এবং তিন চাপেকার ভ্রাতার ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ। এই তিন শহীদভ্রাতার প্রতিবাদ সমস্ত ভারতকে বিশেষ আলোড়িত করেছিল এবং প্লেগ তাড়ানোর নামে ইউনিফর্ম পরা বিদেশি সৈন্যবাহিনী যে সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে না, তার সাবধান বাণী সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। বহু বছর পরে, গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে পুণায় বসবাসকারী প্রখ্যাত লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, চাপেকার ভ্রাতাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লেখো, জ্যেষ্ঠ চাপেকার যে আত্মজীবনী রেখে গিয়েছেন, তা মন দিয়ে পড়ো এবং খোঁজ করো কেন স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এদের সোনার মূর্তি গড়ে পূজা করা হোক। আরও শুনেছিলাম, একসময়ে নিবেদিতা পুণায় গিয়ে এই তিন শহীদের গর্ভধারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

সেই সময়ে এই মূল্যবান কাজে হাত দিতে পারিনি বলে শরদিন্দু কিছুটা হতাশ হলেও তিনি কোনও বিরক্তি বা হতাশা প্রকাশ করেননি। আমার মনে হয়েছিল, উনিশ শতকের প্লেগ মহামারীর দুর্দিনকে আমরা অনেক পিছনে ফেলে রেখে এসেছি, ওই অপ্রিয় বিষয় এখন মানুষ বুঝতে চায় না।

মনে পড়ছে, পুণার শরদিন্দুনিবাসে বসে, অনেক আলোচনার সময়ে শরদিন্দু বলেছিলেন, পুণা ও কলকাতার দূরত্ব অনেক নয়, পুণার হৃদয়হীন আইসিএস র্যাণ্ডের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়েছিলেন কলকাতার প্রবীণ আইসিএস জন উডবার্ন। তিনি বুঝেছিলেন, মৃত্যুভয়ে ভীত অসহায় জনগণকে জোর করে প্লেগের টিকা দেওয়ার আগে প্রয়োজন জনসমর্থন। আর নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, জনসমর্থনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে পারে কেবলমাত্র জনসংযোগের দ্বারা।

এবার আসা যাক এই মঠ-মিশনের ঐতিহাসিক প্রচারপত্রে। স্বামী অন্নদানন্দ তাঁর অখণ্ডানন্দ জীবনীতে কিছু মূল্যবান খবর দিয়েছেন। "গভর্নমেন্ট প্লেগের টিকা দিয়া সকলকে মারিয়া ফেলিতেছে– এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ দলবদ্ধ হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল। সাধারণের এই অজ্ঞতা দূর করিয়া মনে সাহস দিবার জন্য অখণ্ডানন্দ প্রচারপত্র ছাপাইয়া বিতরণের ভার গ্রহণ করেন।.... অখণ্ডানন্দ বেলুড় হইতে রওনা হইয়া বড়বাজারের একটি প্রেসে এই হ্যান্ডবিল ছাপাইতে দিলেন।

প্রচারপত্রের বান্ডিল নিয়ে হ্যারিসন রোডে নামামাত্র লোকের ভিড়ে অখণ্ডানন্দের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তিনি তাড়াতাড়ি প্রচারপত্র ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে কোনোরকমে স্ট্র্যান্ডরোড ট্যাঁকশালে পৌঁছলেন। পরে ট্যাঁকশালের নিচে বসে সমস্ত দিন এই বিজ্ঞাপন বিলি করলেন। পরের দিন দুপুর দেড়টা পর্যন্ত বিতরণের সময় কয়েকজন প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? কেন গভর্নমেন্টের এই অন্যায় কাজকে সহায়তা করছেন? ভক্তজনরা আশঙ্কিত, জনতার হাতে সন্ন্যাসীর জীবন বিপন্ন।"

পরের দিন কালীঘাটে আবার হ্যান্ডবিল বিতরণ শুরু, সেখানেও লোকের বিদ্রুপ, গভর্নমেন্টের কত টাকা খেয়েছ? আমরা আরও জানছি, নানাবিধ ব্যয়েও অকুতোভয় অখণ্ডানন্দ দেশের 'বিরাট আত্মঘাতী অজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ভগ্ন দেহ-মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল'। এই প্রচারপত্রটির হিন্দি অনুবাদ স্বয়ং অখণ্ডানন্দই করেছিলেন বলে শোনা যায়।

এখন প্রশ্ন, এই বিখ্যাত প্রচারপত্রের ইংরেজি সুপারিশটা কে করেছিলেন? স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ? না, সিস্টার নিবেদিতা? বাংলা প্রচারপত্রটির রচয়িতাও কি স্বামীজী? অতি দ্রুত এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল, তা বোঝা যায়। কিন্তু মূল প্রচারপত্র কার লেখা?

অনেক সূত্রে শুনেছি, স্বয়ং সিস্টার নিবেদিতাই তার প্রথম খসড়া করেন। কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান ঘটল। প্রথম আট খণ্ড ইংরেজি রচনাবলীর প্রকাশের বহু বছর পরে প্রকাশিত হলো মহামূল্যবান 'নাইনথ ভল্যুম', যার সঙ্গে রয়েছে স্বামিজীর পত্রাবলীর এক বিশ্বাসযোগ্য ইনডেক্স।

সম্প্রতি এই নবম খণ্ড দেখতে দেখতে নজরে এল পেজ ৩৫০, যার শিরোনাম 'দ্য প্লেগ ম্যানিফেস্টো', এর শুরু– 'ব্রাদার্স অফ ক্যালকাটা' দিয়ে। সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ফুটনোট– ১৮৯৮ মে মাসে প্লেগ বিধ্বস্ত কলকাতার নগরবাসীদের জন্য স্বামিজী বাংলায় এই 'ম্যানিফেস্টো' রচনা করেন এবং তা চৈত্র ১৩২৯ (মার্চ ১৯২৬) উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিক কারণে, এর ইংরেজি ভাষ্য 'প্লেগ ম্যানিফেস্টো' হিসাবে স্বামীজীর ইংরেজি রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। মনে হয়, যিনি বাংলায় এই আবেদনপত্র লিখেছিলেন তিনিই তাঁর ইংরেজি করেছিলেন। নিবেদিতার কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়।

কিন্তু অতি সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন সংস্করণ 'লেটার্স অফ সিস্টার নিবেদিতা'র প্রথম খণ্ডের শুরুতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে– "১৮৯৮ : ১১ মে, স্বামীজীর নির্দেশে নিবেদিতা ইংরেজিতে প্লেগ প্যামফ্লেট রচনা করলেন।" তাহলে স্বামীজি স্বয়ং কি ওই ইংরেজি ম্যানিফেস্টোর বাংলা রচনা করেছিলেন?

এ বিষয়ে সব সন্দেহের অবসান আজও হয়নি। আমাদের সামনে নবম খণ্ড এবং নিবেদিতা পত্রাবলীর ১ম খণ্ড রয়েছে।

'দ্য প্লেগ ম্যানিফেস্টো' এখন স্বামীজীর রচনাবলীর মূল্যবান অংশ। এর বঙ্গানুবাদ, বহু বছর পরে যা উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিজের চোখে দেখা হয়নি। এই প্রচারপত্রের কোনও কপি কোনও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে কি না, তাও খোঁজ করে উঠতে পারিনি।

আমাদের সামনে রয়েছে, স্বামী অম্বুজানন্দ (এক সময় উদ্বোধন সম্পাদক) রচিত 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' নামক মূল্যবান বইটি, সঙ্ঘ সভাপতি স্বামী মাধবানন্দের ভূমিকা সহ এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ পয়লা জানুয়ারি, ১৯৬৪। স্বামী সদানন্দের তুলনাহীন প্লেগ-সেবার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে লেখা হয়– "স্বামীজীর আদেশে প্লেগ-বিধ্বস্ত কলিকাতাবাসী সকলের নিকটে একটি বিজ্ঞপ্তি– বাংলা ও হিন্দিতে প্রচারিত হইয়াছিল প্লেগের প্রথম সূচনার কালেই (মে, ১৮৯৮)। রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে এই আবেদনপত্র জনসাধারণের জন্য স্বামীজী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সদানন্দের এবং নিবেদিতার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় স্বামীজীর এই ঘোষণা-বাণী কলিকাতার ঘরে ঘরে সেদিন পৌঁছিয়াছিল।..." মূল বিজ্ঞপ্তিটি স্বামী আত্মজানন্দ তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন। আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করলাম এ যুগের পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য।

১৮৯৯-এ প্লেগ মহামারীর সময়ে কলিকাতার সমগ্র সেবান্দোলনের নেতৃত্বভার স্বামীজী সদানন্দের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ওই সেবাকার্য সত্যি এক ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বামী সদানন্দ ছিলেন উহার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্পাদিকা। আর স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিত্যানন্দ সহায়ক ছিলেন।

৩১ মার্চ (১৮৯৯) হইতে সদানন্দের নেতৃত্বে কলিকাতার প্লেগ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। স্বামীজীর অনন্ত মানব প্রেমের উত্তপ্ত স্পর্শে সদানন্দের হৃদয়টিও কতখানি দ্রব হইয়াছিল, তার পরিচয় তদানীন্তন কলিকাতাবাসীরা অবগত হইয়াছেন। ড. যদুনাথ সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিক এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর প্রমুখ বিখ্যাত সমাজসেবীদের লিপিবদ্ধ বিবরণী পাঠ করিয়া ইদানীন্তনের মানুষও উহা জানিতে পারিয়াছেন। আতঙ্কিত সম্পন্ন নাগরিকরা শহর ছাড়িয়া পলায়নপর, সঙ্গতিহীন অসহায় সাধারণ মানুষ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দনরত, আর ব্যাধি-কবলিত হতভাগ্য বস্তিবাসী মৃত্যুর মুখের গ্রাস হইয়া প্রতিক্ষমাণ– এই ছিল সে দিনের মহানগরীর কলিকাতার চিত্র। সেই শ্মশানপুরীতে বিবেকানন্দ-শিষ্য সদানন্দ ছিলেন মূর্তিমান আশ্বাস ও অভয়ের মতোই। তাহার উপস্থিতিতেই মানুষের অশ্রুমোচন হইত। ১৮৯৮'র মে মাসেই কলিকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব হয়। স্বামীজী অবশ্য তখন হইতে এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই বিপুল সেবাযজ্ঞের জন্য অর্থ কোথা হইতে আসিবে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "দরকার হইলে নতুন মঠের জমি বিক্রি করে হলেও টাকা জোগাড় করব।" অবশ্য অত দূর প্রয়োজন তখন হয় নাই।

স্বামীজীর আদেশে প্লেগ-বিধ্বস্ত কলিকাতাবাসী সকলের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি– বাংলা ও হিন্দিতে প্রচারিত হইয়াছিল। প্লেগের প্রথম সূচনার কালেই (মে, ১৮৯৮) রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে এই আবেদন-পত্র জনসাধারণের জন্য স্বামীজী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

মূল বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এই :

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

কলিকাতানিবাসী ভাই সকল!

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের দুঃখে দুখী, এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা।

২। যে মহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয় তা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, কারণ তোমরা সকলে ভগবানের মূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই। যে অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতার অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৩। তোমাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা, অকারণে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় চিন্তা কর, অথবা যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা কর।

৪। ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিয়া সাধারণের মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোনও কারণ নাই। আর আর স্থানে প্লেগ যেরূপ রুদ্রমূর্তি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় কলিকাতায় সেরূপ কিছুই হয় নাই। রাজপুরুষেরাও আমাদের প্রতি বিশেষ অনুকূল।

৫। এস, সকলে বৃথা ভয় ছাড়িয়া ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস করিয়া কোমর বাঁধিয়া কার্যক্ষেত্রে নামি, শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবনযাপন করি। রোগ, মারীভয় প্রভৃতি তাঁহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া যাইবে।

৬। (ক) বাড়ি, ঘরদুয়ার, গায়ের কাপড়, বিছানা, নর্দমা প্রভৃতি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে।

(খ) পচা বাসি খাবার না খাইয়া টাটকা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্বল শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে।

(ঘ) অন্যায়পূর্বক যাহারা জীবিকা অর্জন করে, যাহারা অপরের অমঙ্গল ঘটায়, ভয় কোনোকালে তাহাদের ত্যাগ করে না। অতএব এই মহা মৃত্যুভয়ের দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

(ঙ) মহামারীর দিনে গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত থাকিবে।

(চ) বাজারের গুজবাদি বিশ্বাস করিবে না।

(ছ) ইংরাজ সরকার কাহাকেও জোর করিয়া টিকা দিবেন না। যাহার ইচ্ছা হইবে সেই টিকা লইবে।

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পরদা রক্ষা করিয়া, যাহাতে আমাদের বিশেষ তত্ত্বাবধানে, নিজের হাসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। ধনী লোক পালাক, আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি। জগদম্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায়; মা অভয় দিতেছেন–ভয় নাই! ভয় নাই!!

৭। হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা যতদূর সাহায্য হয় তাহার ত্রুটি হইবে না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও সম্ভব।

এই বিজ্ঞপ্তিপত্র থেকে এত দিন পরে এই ২০২০ সালেও আমাদের যথেষ্ট শেখবার রয়েছে। আজকের জনসংযোগ বিশেষজ্ঞরা এই বিজ্ঞাপনপত্র থেকে বেশ কিছু শিক্ষা নিতে পারেন, সঙ্গত কারণেই স্বামীজী এই প্রচারপত্রের নাম দিয়েছিলেন–'দ্য প্লেগ ম্যানিফেস্টো'।

গণসংস্কৃতিতে নতুন প্রতিবাদী জোয়ার

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ভীমা কোরেগাঁওয়ের জয়স্তম্ভে দলিত সমাবেশে ও দিল্লিতে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ অবস্থান ভাঙতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্ম্যের প্রকট ব্যভিচারের তদন্তের নামে প্রতিবাদী চিন্তক-বুদ্ধিজীবীদের একে একে বন্দি করে বিনা বিচারে বিনা জামিনে— অনেকের ক্ষেত্রে এতদিনে দু'বছর পেরিয়ে গিয়েছে— অবরুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের মুখেও নির্লজ্জ সরকার ও পুলিশ ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেনি। গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করে সংসদতন্ত্রের ঠাঁট বজায় রাখার কৃষ্ণ কৌতুক অসহনীয় হয়ে উঠেছে এতদিনে।

তারই মধ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর যুক্ত হলো পুনের জগৎবিখ্যাত কবীর কলা মঞ্চের তিন লোকগায়ক সাগর গোরখে, রমেশ গাইচোর ও জ্যোতি জগতনের গ্রেপ্তারি। চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের আবির্ভাবে ভারতে গণসঙ্গীত তথা গণসংস্কৃতির যে নব অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা সারা ভারতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে সেভাবে ততটা সঞ্জীবিত না হলেও যে ক'টি রাজ্য বা অঞ্চলে তা স্বকীয় আঞ্চলিক সত্তা আয়ত্ত করেছিল, স্থানিক পরম্পরাকে নতুন করে প্রাণদ করে তুলতে পেরেছিল, তার মধ্যে মহারাষ্ট্র (তখন রাজ্য রূপে চিহ্নিত নয় বলে হয়তো মারাঠিভাষী অঞ্চল বলে বর্ণনা করাই সঙ্গত), কেরালা, বাংলা (প্রথমে অবিভক্ত, পরে দুই বাংলাই) ও অন্ধ্রই উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে গণসঙ্গীত-গণসংস্কৃতির এই নব্যধারা বিহার, ছত্তিশগড় ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে এক একটি অঞ্চলে একটা স্বাধীন চরিত্র লাভ করে। তার বাইরে এই সংস্কৃতির প্রসার সীমিত থাকার কারণ খুঁজতে হবে আঞ্চলিক সংস্কারের মধ্যেও যেমন, তেমনই ওই অঞ্চলে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষীণবলের মধ্যে।

পাঁচের দশকজুড়ে ছয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত বাংলা ও মহারাষ্ট্রের এই জঙ্গি গণসঙ্গীত ধারার মধ্যে এক প্রাণোচ্ছল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তখন সলিল চৌধুরি মহারাষ্ট্রে তাঁর গণসঙ্গীতের জনপ্রিয়তায় যতটাই প্রতিষ্ঠিত, বাংলাতেও ততটাই মারাঠি লোক শাহীর তথা গণসঙ্গীতকার কবি আল্লা ভাউ সাধে, সিএন গভংকর ও অমর শেখ। 'আও আও নয়া তারানা আও' কিংবা 'ইয়া ওয়খ্‌ত্‌ কি আওয়াজ হ্যায়, মিল্‌কে চলো' তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠে কলকাতার মাঠে-ময়দানে বারবার উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দেয়।

একটা উপলক্ষ মনে পড়ে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে পার্কসার্কাস ময়দানে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের উদ্দেশে নিবেদিত এক সাংস্কৃতিক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক মঞ্চে ও শিবিরে যুগপৎ অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আক্ষরিক পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এসে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত যন্ত্রের দুর্লভ এক সংগ্রহের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন; সদ্যস্বাধীন কিউবার

রাষ্ট্রপ্রধান কাস্ত্রোর ব্যক্তিগত বাণী বহন করে এনে প্রবাদপ্রতিম ব্যালে নর্তকী আলিসিয়া আলোনশো উন্মুক্ত মঞ্চে জীবনে প্রথম বার তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মহত্তমদের অন্যতম জেবিএস হলডেন পরমাণুশক্তির অপপ্রয়োগের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন; ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে অচলায়তন নাটকের মার্কসীয় পাঠ উপস্থাপন করেন। উৎসবের সাতদিনই গণনাট্য সঙ্ঘের মহারাষ্ট্র শাখার চারজন সঙ্গীত শিল্পীর প্রতিনিধিদল (আল্লা ভাউ সাঠে, অমর শেখ, সিএন গভংকর ও শাইলা) কোনও না কোনও মঞ্চে তাঁদের গান পরিবেশন করছিলেন, মাতিয়ে তুলছিলেন শ্রোতাদের। একদিন সন্ধ্যায় একটি মঞ্চে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। ময়দানে তখন বিভিন্ন মঞ্চে-শিবিরে হাজার দশেকের মতো নরনারী-কিশোর-কিশোরীর সমাবেশ, ভয় ও আশঙ্কা ছড়ায় দ্রুত, দর্শক-শ্রোতারা হুড়োহুড়ি করে ময়দান থেকে বেরোবার পথ খুঁজছেন। সুসংগঠিত কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রথমেই আগুন-লাগা মঞ্চটিতে জলবর্ষণ করে, তার কাঠ-কাপড়ের কাঠামো দ্রুত ভেঙে ফেলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে ওই অর্ধদগ্ধ ভাঙাচোরা মঞ্চে আল্লাভাউ-অমর শেখ-গভংকর-শাইলাকে গান গাইতে আহ্বান করেন। তাঁদের গানের সম্মোহনী উদ্দীপকে বিপুল জনতা ফিরে আসেন ওই মঞ্চের সামনে, মৃত্যুভয় ভুলে। সমগ্র অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে।

রবীন্দ্র শান্তি মেলার সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তটা উনষাট বছর পরেও ভুলতে পারি না। আজ ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারি পঞ্চাশের দশকজুড়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-নজরুল সঙ্গীতের বাঙালি পরম্পরার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সর্বভারতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান যুক্ত করে একটা অন্য যৌথ গণসাঙ্গীতিক তথা গণসংস্কৃতিক পরিবেশ সযত্নে তৈরি করা হয়েছিল, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মানবিকবাদী-সাংস্কৃতিক প্রেরণা তার পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতাদর্শকে সুরক্ষিত করেছিল; ছয়ের দশকে তার সঙ্গে ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্ছিল আমাদের গ্রামশির সঙ্গে প্রথম পরিচিতির অভিঘাত। রাজনৈতিক আন্দোলনের এক একটি ধাপে বা পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক-সাময়িক উদ্দীপনা-প্রেরণা বা দ্রুত প্রচারের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে গান বা নাটক বা অন্য কোনও জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক বাহনকে প্রয়োগ করার চটজলদি 'ব্যবহার'-এর বাইরে জনচেতনায় একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ বা ভূমি প্রতিষ্ঠা ও সেই ভূমিতে একটা ইতিহাস গ্রথিত রাজনৈতিক চিন্তাপ্রবাহ অব্যাহত সঞ্চার ও লালন করে যাওয়ার যে প্রকল্প সাংস্কৃতিক বামপন্থার নির্ণায়ক গতিপন্থা রাজনৈতিক বামপন্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধনে অপরিহার্য সহায়, সেদিকে ওই প্রথম আমাদের দেশে দৃষ্টি পৌঁছেছিল। সংস্কৃতির সমূহ শাখা প্রশাখায় একটা সুচিন্তিত রাজনৈতিক ইতিহাস বিচার তথা বাস্তববিচারকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নানা প্রশ্ন, প্রসঙ্গ যা অদূর ভবিষ্যতে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যমুখে চলে আসতে পারে বা চলে আসা উচিত, সেগুলিকে আগেই নাটকের মধ্যে, গানের মধ্যে, পোস্টারের চিত্রিত প্রচারে, এইসব সংক্রমণকে জড়িয়ে পরীক্ষামূলক নবতর কোনও প্রয়োগে জনসাধারণের চেতনার মধ্যে, ভাবকল্পনার মধ্যে রোপণ করে তার পোষণের একটা সুযোগ খুলে যাচ্ছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে আরেকটা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয় ছয়ের দশকের শুরুতে তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু হিরোশিমা-নাগাসাকির নিপট স্মৃতি, ফ্যাসিবাদের জাতিবৈরী মারণলীলার নৃশংসতার ক্রমোদঘাটন, পারমাণবিক অস্ত্রের ক্রমোন্নয়নের ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃশ্যমান পরিপ্রেক্ষিতে একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও তার দেশীয় পরিণামের সম্ভাবনার জনমনকে সতত সচেতন ও জাগরূক অভিযানের মধ্যে নিহিত ছিল। দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির আঁধি যখন দিগন্তে ঘনায়মান, তখন এই সাংস্কৃতিক অভিযান তার ভাবগত, রূপগত ব্যাপ্তি ও জনসমাদরের বিস্তারে বহু সমান্তরাল সাংস্কৃতিক পরম্পরা ও ধারার সম্পদ জনরুচির গোচরভুক্ত করে এই ধারাগুলিকে শক্তিমান করে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক পুঁজির অন্তর্ভুক্ত করেছিল। আধা-রাজনৈতিক বা সরাসরি রাজনৈতিক সমাবেশে, যুব উৎসবে, শান্তি-সংস্কৃতি উৎসবে সলিল চৌধুরি-সুচিত্রা মিত্রের যুগ্ম গায়নে, মনুমেন্ট ময়দানে প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত মার্তণ্ড পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর সুরারোপিত বন্দে মাতরম ও 'যোগী মতোয়া' ভজন গায়ন বা হাজরা পার্কে বাস-ট্রামের কর্কশ ঘর্ঘর ধ্বনি ছাপিয়ে সদ্য মুক্ত চীন প্রত্যাগত বিলায়েত খাঁ সাহেবের সেতার বা রণজি স্টেডিয়ামে যুব উৎসবের মঞ্চে সারা রাত জেগে গোমহানি দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীর নিয়তি বনাম পুরুষকার বিতর্কে কবির লড়াই যে সম্পন্ন সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তৈরি করেছিল, তা-ই হয়তো আজকের পণ্য বিপণনসর্বস্ব মুম্বাই সিনেমার 'সংস্কৃতি'কে কিছুটা রোধ করতে; পুরোপুরি রোধ করতে না পারলেও, একটা প্রতিরোধী বিকল্প তুলে ধরতে পেরেছে। সর্বতোভাবে ভোগ্যপণ্য লোলুপ এক সমাজ নির্মাণ করে পুঁজিবাদের লাভের বাজার পোক্ত করতে পুঁজিবাদের দাসত্বে স্ববিক্রিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মুম্বাই সিনেমা ও তার বিবেকহীন ব্র্যান্ড-মার্কায় স্বীয়সত্তাহীন তারকাদের সংস্কৃতির শীর্ষে বসিয়ে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের ওই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সম্ভবনাকে ধসিয়ে দিতে সফল হয়েছে।

সংস্কৃতির পরাভবের এই দায় প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তি পাওয়ার সুরাহা মানব না। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন ও বিভাজন থেকেই সাংস্কৃতিক অভিযানের এই প্রকল্পটিই যেন সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ হয়ে গেল। নির্বাচনী প্রচার ও মাঝে মাঝে তাৎক্ষণিক কোনও প্রচারের তাগিদে সাংস্কৃতিক সামান্য কিছু কর্মকাণ্ডের বাইরে সাংস্কৃতিক বামপন্থার ভূমিকাই যেন অবান্তর হয়ে গেল। অথচ তখনও তো প্রধান বামপন্থী দলগুলির সঙ্গেই রয়েছেন বলরাজ সাহনি, অমর শেখ, এমএস সথ্যু, সলিল চৌধুরি, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, একে হাঙ্গল, উৎপল দত্ত প্রমুখ শিল্পী। রাজনীতিক্ষেত্রে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাগিদে সংস্কৃতির তাৎক্ষণিক উপযোগের সুযোগ রইলো, রইলো না সংস্কৃতির স্বতন্ত্র পরিবেশ রচনা ও রক্ষার দায়। সারা ভারতে সীমিত সাধ্য ও সহায়তার দাক্ষিণ্যে গণনাট্যের ইতিহাসকে যাঁরা ধারণ করে চলেছেন, তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন এখনও। কিন্তু সেই অভিযানের দ্যুতি বহুদিন ধরেই স্তিমিত।

আটের দশকে মহারাষ্ট্রের ভীমরাও আম্বেদকরকে তুলে ধরে দলিত চেতনার তথা দলিত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে গণআন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, তার সূচনাপর্ব থেকেই মহারাষ্ট্রের স্তিমিত লোকশাহিরি পরম্পরার পুনরুজ্জীবন ঘটে। এই পুনরুজ্জীবনের পুরোধা পুরুষ সম্ভাজী ভগৎ। সাতারার প্রত্যন্ত যে গ্রামের এক দক্ষ মুচির সন্তান সম্ভাজী নিজের রাজনৈতিক অবস্থান

জানান: 'আমি দর্শনগতভাবে সব মার্কসবাদী ও আম্বেদকরবাদীদের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কোনও বিশেষ দলের সদস্য নই।'' তাঁর জনপ্রিয় গানে তিনি গেয়ে ওঠেন:

ইন্টারনেট পে বৈঠে হ্যাঁয়, ভাই
জাম্বো জেট পে বৈঠে হ্যাঁয়, ভাই
খালি পেট পে বৈঠে হ্যাঁয়, ভাই
ফ্যাক্টরি গেট পে বৈঠে হ্যাঁয়, ভাই
ও অ্যাকটিং করতে হ্যাঁয়
ম্যায় ফাইটিং সে মরতে হ্যাঁয়।

কার সঙ্গে তাঁর লড়াই বোঝাতে গিয়ে, গান করেন:

ইয়া হিটলারকে সাথি
মুহ মে রাম নাম
মন মে নাথুরাম।

আন্নাভাউ সাঠে-অমর শেখের লোকলহরি পরম্পরাকে যে নব রূপ দিয়েছেন সম্ভাজী, তাতে তিনি শ্রোতাদের সঙ্গে সমানে কথা বলে যান, ব্যঙ্গ, পরিহাস, রাগ-যন্ত্রণায় তাঁর শরীর আন্দোলিত হয়, তারই মধ্য থেকে উঠে আসে গান, দেশীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতির সূত্রের জট ছাড়াতে ছাড়াতে চলেন তিনি। তাঁর শ্রোতারা যখন বস্তিবাসী জনতা বা শ্রমিক বা ক্যাম্পাসের তরুণ ছাত্রছাত্রীরা, তাঁর কথালাপের ভাষা ও যুক্তি ব্যাখ্যান সেই মতো পালটায়। একই গান ফিরে ফিরে আসে নতুন গানের পাশাপাশি, তাঁর গানে অভ্যস্ত শ্রোতারা অপেক্ষা করেন চেনা গানের জন্য। হাততালি উঠলে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'বলুন, জয় ভীম' ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

২০০২ সালে গুজরাটে বিজেপি-আরএসএস'র নেতৃত্বে মোদী-শাহের প্রত্যক্ষ মদতে সাম্প্রদায়িক মারণলীলার প্রতিবাদে একদল তরুণ ছাত্রছাত্রী কবীর কলা মঞ্চ গঠন করে সম্ভাজীর কাছে গান ও সেই গানের পরিবেশনা শিখতে আসেন। সম্ভাজীর অভিভাবকত্বে তা শিক্ষায় প্রশিক্ষিত কবীর কলা মঞ্চের শিল্পীরা মহারাষ্ট্রের বিজেপি-শিবসেনা সরকারের বিধানে বহুবার কারাবাস করেছেন, এখনও তাঁদের কয়েকজন বহুদিন কারান্তরালে। এবার নতুন করে বন্দি হলেন আরও চারজন। তবুও দুঃসাহসিনী শীতল সাঠের নেতৃত্বে কবীর কলা মঞ্চ গান গেয়ে চলেছে। তাঁদের গানের বিষয় মহারাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, রাষ্ট্র ও শ্রমশিল্পের অশুভ আঁতাত, জাত-পাতের শোষণ, দেশে ফ্যাসিবাদের উৎখাত। শীতল এখনও গান করেন :

আংরেজ আয়া, মেশিন লায়া,
মিল বানায়, ঝোপড় পট্টি
চামার, বুনকর, লোহার মেহনত,
সব সমায়া ঝোপড় পট্টি
গোরা যাকে আয়া কালা
টুটা ওয় সপ্‌নো কা মনজর
সাথ সালো মে চুনা লাগা হ্যায়
সাথ সালো মেঁ চুনা লাগা হ্যায়
বিকৃতি রহ গয়ী ঝোপড় পট্টি।

গণসঙ্গীতের লোকশাহিরি পরম্পরার এই পুনরুত্থান গণসংস্কৃতির এক নতুন প্রস্থানভূমি হয়ে উঠেছে। সুনীল শালবাগের নাটক 'কটন ফিফটি সিক্স পলিয়েস্টার এইট্টি ফোর' অমর শেখের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে তাঁরই গানের মাধ্যমে মুম্বাইয়ে কটন টেক্সটাইলের পতন, সিন্‌থেটিক বস্ত্রের উত্থান, পুরানো কারখানা ভেঙে 'রিয়াল এস্টেট'র ব্যবসায়ের রমরমা। তার সঙ্গে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের বিস্তার প্রকট করে তোলে। চৈতন্য, তামহানের বহু পুরস্কারে সম্মানিত মারাঠী কোর্ট ছবির মূল চরিত্র এক শাহীর, তাঁর গাওয়া গানের গীতিকার-সুরকার সম্ভাজী ভগত। সম্ভাজী ভগত, শীতল সাঠে আর কবীর কলা মঞ্চ আজ এমনই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যে, দেশের সবচেয়ে

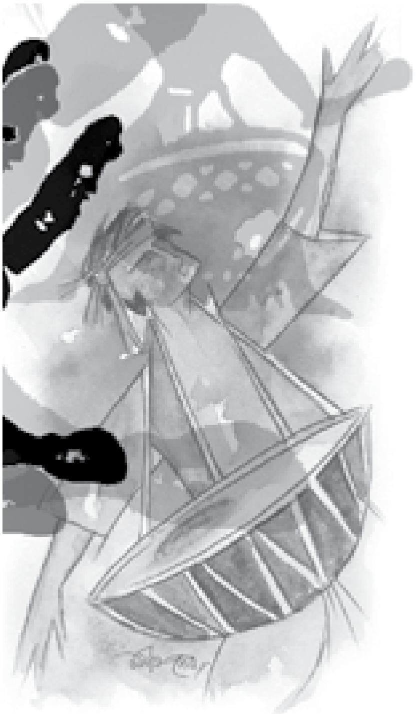

আইন-বিরোধী আইন প্রয়োগ করে রাষ্ট্র তাদের গান কেড়ে নিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বন্দি রমেশ গাইচোরকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিয়ে 'মাফিনামা' তথা ক্ষমা স্বীকৃতি জমা দিতে পুলিশ চাপ দিলে, তিনি জানিয়ে দেন, 'আমরা সাভারকরের সন্ততি নই, ডক্টর আম্বেদকরের সন্ততি। আমরা যা করিনি, তার মিথ্যা স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' কবীর কলা মঞ্চের শিল্পীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খারিজ করে তাঁদের মুক্তির দাবিতে যে জাতীয় আবেদন প্রচারিত হয়েছে, তার শুরুতেই নাম রয়েছে আদুর গোপাল কৃষ্ণনের। গণসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে গণসংস্কৃতির প্রতিবাদী স্বরের এই পুনরুন্মোচন এক নতুন ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করছে। আজও যখন শীতল সাঠে হাতে তাঁর ডফ তালবাদ্য নিয়ে দাভোলকর, কালবুর্গি, পানসারে, গৌরী, রোহিতকে নিবেদিত তাঁর গানে গেয়ে ওঠেন, 'তোমরা শুধু দেহকেই বিনাশ করতে পারো', তারস্বরেই বলেন, 'এই গান আমাকে জেলের ভিতরে বসে লিখে পাঠিয়েছে শচীন মালি, তখন প্রতিরোধের ভাষাই আরও প্রজ্বলন্ত হয়ে ওঠে। ইউটিউবে দেখি, সেই মঞ্চেরই একপাশে দাঁড়িয়ে সেই গায়নের ছবি তুলছেন তথ্যচিত্রের চিত্রকর আনন্দ পট্টবর্ধন।

আমরা পশ্চিমবঙ্গেও কি ভয়ের পাঁচিল ঠেলে আরও একবার আমাদের এই গৌরবময় পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনতে পারি না?

আনাড়ি ভাবুকের নোটবই ঐতিহ্য

পবিত্র সরকার

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

কেন এই লেখা ?

আমরা সাম্প্রতিককালে দেখেছি, যে কোনও একটা পরিবর্তনের উপক্রম হলেই সেই পরিবর্তনের বিরোধীরা 'ঐতিহ্য গেল', 'ঐতিহ্যের অসম্মান হল' বা ইংরেজিতে 'Break with tradition' ইত্যাদি কথা বলে একটা হইচই শুরু করে দেন। বছর তিরিশ আগে (১৯৮৯-এর পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বোর্ডের বাংলার সিলেবাসে) ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালি লেখকের গদ্যরচনা সাধু থেকে চলিতে রূপান্তরিত করে ক্লাস এইট পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ে দেওয়ার সময় এটা ঘটেছিল ১, আবার তার বছর পাঁচেক পরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন চিহ্নকে 'স্বচ্ছ' করে দেওয়ার সময়ে এটা ঘটেছিল (বিষ্ণু দে-র জ্যেষ্ঠা কন্যা বন্ধু ইরা আমাদের বলেছিলেন, 'আমার বাবার নাম তোমরা বদলে দিলে !')। আমি এই দুটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে আমার এ দুটির কথা মনে পড়ছে ; পাঠকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই আরও অনেক দৃষ্টান্ত যোগ করতে পারবেন। তখন থেকেই আমাদের মনে 'ঐতিহ্য' কথাটা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে হাজির ছিল। ঐতিহ্য কী ? তার সংগঠন আর উপাদানগুলি কী কী ? তা কীভাবে তৈরি হয়, বদলায়, বা ধ্বংস হয় ? তা নিজে, এবং তার সৃষ্টি, বদল এবং ধ্বংস ভালো না মন্দ ? না এ দুয়ের মাঝামাঝি কিছু ?

আমার সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদিতে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নেই, শখের কিছু পড়াশোনা আছে। তাই একজন সাধারণ মধ্যমেধাযুক্ত জিজ্ঞাসু নাগরিক হিসেবে এই প্রশ্নগুলি আমি তুলছি। আশা করি, আমার কাছে না থাকলেও অন্যদের কাছে তার উত্তর আছে, এবং এই লেখার অনুকূল বা প্রতিকূল সাড়াতে সেই উত্তরগুলি আমি পেয়ে যাব।

'ঐতিহ্য' কথাটার প্রয়োগ বাংলাভাষায় খুব বেশিদিনের নয়। ইংরেজি tradition কথাটার বাংলা হিসেবে বাংলা ভাষায় এটি ঢুকেছে। ঢুকেছে যাঁর হাত দিয়ে তাঁর কাছে বাঙালি মাথা নত করে আছে নানা কারণে–তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শব্দতত্ত্ব-র বৈশাখ ১৩৯১ সংস্করণের শেষে ৩৬৩-৩৭৭ পৃষ্ঠায় 'শব্দচয়ন : ১' অংশে ইংরেজি শব্দ বা পরিভাষার বিকল্পে বাংলা শব্দাবলির যে তালিকা আছে তাতেই 'ঐতিহ্য' কথাটি tradition, traditional-এর প্রতিশব্দ হিসেবে দেওয়া আছে২। Traditional-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ঐতিহ্য সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হতে পারে কি না তা নিয়ে আমাদের সংশয় থাকলেও৩ 'ঐতিহ্য' কথাটি বাংলাভাষার প্রয়োগে ভালোভাবেই এসে গেছে, এবং তা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। 'ইতিহাস' কথটার ব্যুৎপত্তিতে যে 'ইতি হ আস' বা 'এই রকমই আছে' কথাটা বলা হয়, তারই 'ইতি হ' অংশটা 'ষ্ণ্য' বা ওই জাতীয় কোনও প্রত্যয় যোগ করে শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। মানে হলো, 'এমনই থাকা' বা তার কাছাকাছি।

কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তিতে শব্দের সব অর্থ তৈরি হয় না, তার অর্থ দাঁড়ায় প্রয়োগে, এবং সেই প্রয়োগ থেকেই তার অর্থের নানা সূত্র আর ব্যঞ্জনা আমাদের মাথায় ঢুকে যায়। আর Traditional কথাটির বাংলা হিসেবে 'ঐতিহ্যিক' কথাটি খুব সুশ্রাব্য নয়, রবীন্দ্রনাথও সুশ্রাব্যতার অভাবের জন্য culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'কৃষ্টি' কথাটিকে গ্রহণ করেননি। 'ঐতিহ্যাগত', 'ঐতিহ্যসম্মত', 'ঐতিহ্যানুসারী', আবার উলটোদিকে 'ঐতিহ্যবিরোধী', 'ঐতিহ্যবিধ্বংসী' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদে আমরা তার নানা অর্থকে ধরবার চেষ্টা করি। উপরে 'ঐতিহ্যিক' প্রসঙ্গে বলি, তবে শ্রাব্যতার কুশ্রাব্যতার ধারণা অনেকটা ব্যক্তিগত বা সংস্কৃতিগত। হিন্দিতে 'বৈবিধ্য' 'বৈভিন্ন্য' কথাগুলি দিব্যি চলে, ব্যাকরণেও বারণ নেই, কিন্তু বাঙালির কানে

তা ভালো শোনায় না।

ঐতিহ্য একটি অত্যন্ত জটিল ধারণা। যত ভালো অভিধানই হোক, তা যে ঐতিহ্যের সমস্ত অর্থ এক সঙ্গে ধরে দিতে পারে না, তা আমরা লক্ষ্য করি। নৃবিজ্ঞানীদের দেওয়া ঐতিহ্যের সংজ্ঞাও সব সময় সাহায্য করে না। অবশ্যই তার মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত আছে। এই ধারাবাহিকতা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে যে সব ঘটনা, আচরণ, কর্ম, বিশ্বাস, সৃষ্টি আমাদের কাছে চিরকালের মতো বা বার বার অনুকরণযোগ্য, পালনযোগ্য, গ্রহণযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় সেগুলিকেই আমরা সাধারণভাবে ঐতিহ্য বলে মনে করি। এই নানা 'যোগ্যতা' সকলের কাছে সমানভাবে স্পষ্ট নাও হতে পারে, কেউ কেউ কোনও কোনও অংশ প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন, তাতেই ঐতিহ্য বদলায়। এর একটা প্রতিশব্দ হিসেবে 'পরম্পরা' কথাটা চলে। এর অর্থ অনেকটা স্পষ্ট, অর্থাৎ যা পর পর হয়ে এসেছে। তার মানে, যা এক সময় প্রথমবারের মতো হয়েছিল, তার পর সেটা কারও ভালো লাগায় বা ব্যবহারে/উপকারে আসায় তা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কাজেই ঐতিহ্যের মধ্যে একটা পুনরাবৃত্তি বা স্থায়িত্বের ব্যাপার আছে। এই স্থায়িত্বের পরিসীমা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়, কিন্তু যেহেতু ঐতিহ্যে একটা 'মেনে চলা' বা 'অভ্যাসে'র ব্যাপার আছে, তা কমবেশি স্থায়ী হয়। আর স্থায়ী হয় বলেই অনেকের কাছে 'যা পুরাতন তা-ই মান্য, যা চিরাচরিত তাই অলঙ্ঘনীয়' এই রকম একটা ধারণা গড়ে ওঠে। কেন মানব, এর কোনও সংগত বা মানবিক বা যুক্তিপূর্ণ বিকল্প আছে কি না তার সন্ধান আমরা সাধারণভাবে করি না।

ঐতিহ্য অবশ্যই মূলত একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর। কিন্তু গোষ্ঠীর সীমানা কী দিয়ে টানব ? ভৌগোলিক সীমানা কি কিছু আছে ? বিশ্ব-ঐতিহ্য কথাটাও তো চলে, যে ঐতিহ্যের অংশ পৃথিবীর পুরো মানবসমাজ। ধর্ম দিয়ে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, ইসলামি ঐতিহ্য, হিন্দু ঐতিহ্য হতেই পারে, দেশ দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য (যদিও আজকাল ভারতীয় ঐতিহ্য আর হিন্দু ঐতিহ্যের সমীকরণের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়)। আবার ইতিহাসের পর্যায় আর সময়ক্রম অনুযায়ী ঐতিহ্যের ছেদ ঘটানো যায়, যেমন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, মধ্য ভারতীয় ঐতিহ্য। ভাষা দিয়ে না অন্য কিছু দিয়ে তাই নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ধর্ম দিয়ে টানলে ভাষা গৌণ হয়, তাতে ভাষাবাহিত যে সংস্কৃতিবস্তু, যেমন সাহিত্য, সংগীত—তার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। আবার ভাষা দিয়ে টানলে নানা ধর্মের মানুষ এসে যায়, যেমন বাঙালিদের ক্ষেত্রে। ভূগোল বা জাতীয়তাও এই সীমানা-নির্দেশের দাবি নিয়ে হাজির। ঐতিহ্যে কোনটা কখন আপেক্ষিক প্রাধান্য পাবে, সে এক জটিল গণিতের ব্যাপার।

ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন

ঐতিহ্য যেহেতু ধারাবাহিক এবং প্রায়ই cumulative বা স্তূপীকরণ-নির্ভর, এবং তাতে যোগবিয়োগ ঘটে, যোগ যতটা, বিয়োগটা তুলনায় কম—সেহেতু ঐতিহ্য পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, ঐতিহ্য একটা অনড় অপরিবর্তনীয় কঠিন স্তূপ।

সংস্কৃতির মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া চলে, আমরা সরল বুদ্ধির দিক থেকে, অন্তত কয়েকটিকে নিম্নলিখিতভাবে তালিকাবদ্ধ করতে পারি –

ঐতিহ্যের নানা উপাদান

১) জীবনযাপনের প্রাথমিক ও অপরিহার্য কিছু কাজ : যেগুলি নিছক প্রাণগত অস্তিত্ব রক্ষা আর মানবপ্রজাতির অস্তিত্ব আর প্রগতির জন্যে আমাদের করতে হয়– খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যপ্রস্তুত, খাদ্য পরিবেশন ও খাদ্যগ্রহণ। তার জন্য গড়ে উঠেছে কৃষিকর্ম, স্থানীয় এবং সারা বিশ্বজুড়ে বিপণন-ব্যবস্থা, খাদ্যপ্রস্তুতের পরিবেশনের নানা স্থান, কাল, পাত্র আর নানা প্রণালী ও বিন্যাস ; শরীরের আবরণ ও পোশাক-আশাক : নানা দেশে, নানা ঋতুতে, নানা বয়সের নরনারীর জন্য কত রকমের বেশ, আর সৌন্দর্যায়নের জন্য অলংকার ; আশ্রয়-সন্ধান ও নির্মাণ—তার পরিসর, সংগঠন, স্থাপত্য, প্রতিবেশ (উদ্যান ইত্যাদি), আসবাব ইত্যাদি। মানুষের সম্বলের তারতম্য অনুসারে তার চরিত্রেরও বদল হয়। শিক্ষাপ্রণালী– তারই বা তলা থেকে গবেষণার স্তর, জ্ঞানমূলক শিক্ষা আর বৃত্তিমূলক দক্ষতার শিক্ষা, শিক্ষার বাড়ি, উপকরণ, পদ্ধতি—কত বিস্তার। নীরোগ থাকার জন্য চিকিৎসা—তারই-বা কত পদ্ধতি-প্রকরণ, ঔষধ-উপকরণ—স্থান আর কর্মী। তৈরি হয়েছে বিনোদনের– বিনোদনের হাজার উপায়—ঘর আর বাইরের খেলাধুলা থেকে নাটক, চলচ্চিত্র, জুয়োখেলা—সব বয়সের সব ধরনের নরনারীর জন্য বিচিত্র আনন্দের আয়োজন। উপরের কাজগুলির দাবিতে গড়ে উঠেছে বিশাল এক পরিবহণ-ব্যবস্থা, প্রাচীন গোরুর গাড়ি আর নৌকা থেকে শুরু করে আধুনিক জেট প্রযুক্তির রকেট পর্যন্ত। আর এগুলি যাতে উপভোক্তার কাছে সহজে পৌঁছায় তার জন্য গড়ে উঠেছে এক বিশাল জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থা। এই উৎপাদন শুধু বস্তুকে হাতে এনে দেয় তা নয়, তা বস্তুকে নানাভাবে পরিবর্তিতও করে, আবার নানা বস্তুর সংযোগে অভিনব বস্তু নির্মাণও করে। চাষি শস্য উৎপাদন করলেন বা মৎস্যজীবী করলেন মৎস্যের উৎপাদন, কিন্তু ঔষধ কারখানার শ্রমিক নানা প্রাকৃতিক জৈব আর অজৈব বস্তু মিলিয়ে তৈরি করলেন নির্দিষ্ট ওষুধ (ধরা যাক করোনার টিকা), কিংবা মোটরকারখানার শ্রমিক নানা ধাতুর পাত ও খণ্ড মিলিয়ে করলেন মোটরগাড়ি উৎপাদন। তারও বিপুল বিস্তার। উৎপাদনের পরের ধাপ হলো বিপণন—পাড়ার ছোট্ট দোকান থেকে বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানির ব্যবস্থা এই বিপণনেরই অঙ্গ। আমরা মানুষেরাও এই বিপণনে নানা ভূমিকা গ্রহণ করি। বিক্রয়ের ব্যবস্থাপক, বিক্রেতা, উপভোক্তা ইত্যাদি।

বিপণনেরই একটি উপায় হলো প্রচার, এবং প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য প্রতিযোগী দ্রব্যের তুলনায় নিজের উৎপাদনটি আকর্ষক করে তোলার জন্য বস্তুটির নিজস্ব গুরুত্ব ছাড়াও তার আধারের সুন্দর, মোড়ক, নানা মাধ্যমে তার বিজ্ঞাপনের বিচিত্র প্রণালীও গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীদেহের সৌন্দর্যকে মানুষের যৌন প্রবৃত্তির কাছে আবেদন সৃষ্টির ইচ্ছাও ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।

২) আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের উৎপাদন, বিপণন, উপভোগ ইত্যাদি নানা কর্মে আমরা যে যা ভূমিকা নেব তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত করে। কোনও শিক্ষা বংশপরম্পরাগত বা ওস্তাদ বা গুরুর কাছে শেখা, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক আধুনিক লেখাপড়ার বিশেষ দরকার পড়ে না। যেমন কৃষিকর্ম, মৎস্যজীবিকা, প্রথাগত নানা কারিগরি—কামার, কুমোর, গোরুর গাড়ি, দেশি নৌকা ইত্যাদির নির্মাণ, গৃহ ও পথঘাটের নির্মাণ ইত্যাদির তলার দিকের শ্রমদান। অর্থাৎ কুলি-কামিনের কাজ। এ ধরনের আরও নানা জীবিকা আছে—বিড়ি বাঁধা, দর্জির কাজ, বাসনকোসন তৈরি, এবং নানা কারখানায় সাধারণ শ্রমিকের কাজ, কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে টুকরো-টুকরো কাজ ইত্যাদি– যাতে খুব বেশি শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। হাতের দক্ষতা, অভ্যাসের সচলতা এবং প্রখর মনোযোগই যথেষ্ট। কিন্তু দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনার ধাপ উঁচু ধাপগুলিতে ক্রমশ শিক্ষার প্রয়োজন হয়, পরে তো

বিশেষার্থক শিক্ষা আর গবেষণাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই সব ব্যবস্থার প্রান্তে থাকে সাজাই-কর্মী প্রভৃতির কাজ, যেখান প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের খুব একটা দরকার নেই। তবে আমাদের সমাজে নানা স্তরের শিক্ষা নানা স্তরের আত্মপরিচয় তৈরি করে, এক ধরনের শ্রেণিবিভাগও খাড়া হয়ে যায়। 'ভদ্রলোক' আর 'না-ভদ্রলোক' এই পরিচয়ের একটা ভিত্তি শিক্ষা, সেই সঙ্গে বিত্ত।

৩) ধর্ম হলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বাস + বিশ্বাস-নির্দেশিত আচরণের একটা মিলিত প্রক্রিয়া। এই বিশ্বাস কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উত্তরকে ঘিরে– পৃথিবীর সৃষ্টি, জীবজগতের সৃষ্টি কীভাবে হলো, কীভাবে তা চলছে, কীভাবে তার শেষ হবে, এ সব কিছুতে পরিবর্তন কেন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নের উত্তরে সেগুলির সবগুলির একটা বা একাধিক অলৌকিক কারণ আছে–যার নাম ঈশ্বর, দেবদেবী ইত্যাদি–এমন একটা বিশ্বাস সেই গোষ্ঠীর ধর্মীয় এলিটরা (পাদরি, পুরোহিত, মোল্লা প্রভৃতি) তৈরি করে গোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেয়। এবং সেই অনুযায়ী তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক আর সামাজিক, এমনকি জাতীয় বা বৈশ্বিক, অস্তিত্বের নানা দুর্গতি কাটানোর জন্য নানা অনুষ্ঠান আর আচরণের বিধান দেয়। ধর্মের ঐতিহাসিকেরা এবং নৃবিজ্ঞানীরা যে ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনের নানা পর্যায় লক্ষ্য করেছেন তা আমরা জানি। সর্বপ্রাণবাদ (animism) থেকে ঈশ্বর, পৌত্তলিকতা ইত্যাদির উদ্ভব কী ক্রমে হলো তা আমাদের আলোচ্য নয়। এটুকুই এখানে প্রাসঙ্গিক যে এরা সকলেই বাস্তব বিশ্বের বহির্ভূত, এবং (আমাদের মতে) কল্পিত সত্তা–কিন্তু এই কল্পনার দ্বারাই পৃথিবীর সমস্ত ধর্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাসীরা চালিত হয়। এবং এদের খুশি করার জন্য, ক্রোধ উপশমের জন্য, নানা সুখ ও লাভের জন্য (যা এরা ঘটাতে পারে বলে বিশ্বাস), নানা প্রার্থনা, পূজার্চনা, ব্রতপার্বণ, উপবাস, বলি, উৎসর্গ ইত্যাদি পালিত হয়। কিন্তু ধর্মও ইতিহাসের অধীন, তারও নানা কালগত পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর সব ধর্মের ইতিহাসই সে কথা বলে। এ জন্য মাঝে মাঝেই 'মূল' বা 'বিশুদ্ধ' ধর্মে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন হয়। তা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম সব বৃহৎ ধর্মেই হয়েছে। আবার সে আন্দোলনেও নানা পরিবর্তন ধরা পড়ে। আমরা কাছাকাছি সময়ে ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাস থেকেই সে পরিবর্তনের চেহারাটা বুঝতে পারি। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম আর কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম এক ছিল না বলেই ব্রাহ্ম আন্দোলনে ভাঙন ধরেছিল।

৪) শিল্প হলো সৃষ্টিশীল (সৌন্দর্যের) কল্পনা + প্রকাশের এক প্রক্রিয়া। তা ঐতিহ্যের আর-এক উপাদান। এই শিল্পের মধ্যে চারুশিল্প–সুরশিল্প সংগীত, দৃশ্যশিল্প চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ভাষাশিল্প সাহিত্য, দেহভঙ্গির শিল্প নৃত্য ইত্যাদি মূল ধ্রুপদী শিল্প–এগুলির নানা শাখা, এবং এদের পরস্পরের মিশ্রণে জাত নানা শিল্প ধরতে হবে। বস্তুত পক্ষে শিল্পের সীমানা বহুদিন ভাঙা শুরু হয়েছে, তা শুধু উত্তর-আধুনিক যুগের অবদান নয়। সীমানা যেমন ভাঙা হয়েছে–যেমন ছবি আর স্থাপত্য মিলেছে 'স্থাপনশিল্প' বা installation art-এ, তেমনই এক শিল্প অন্য শিল্পকে সহায়তাও করছে দীর্ঘদিন ধরে– যেমন নৃত্যকে সংগীত, সুরমাত্রিক সংগীতকে কথা বা কবিতা। আর অনেক ব্যবহারিক বস্তুও নানা শিল্পের প্রয়োগে সৌন্দর্য লাভ করে যেমন খাট-পালঙ্ক, বসবার চেয়ার ও সোফা, খাদ্য-পরিবেশনের কাপ-প্লেট ইত্যাদি। সেই হিসেবে স্থাপত্য একই সঙ্গে চারুশিল্প আর কারুশিল্পের মিলন, কারণ তা একই সঙ্গে সৌন্দর্য আর ব্যবহারিকতাকে মেলায়। অন্য শিল্পগুলি অধিকাংশত বিনোদনমূলক।

এবং ধর্মের মতোই এই শিল্পও কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, শিল্পের ইতিহাস তার সুনিশ্চিত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

৫) বস্তুগত উপাদান : এগুলি ১-এর প্রসঙ্গেই আমাদের যোগ করা উচিত ছিল, কিন্তু ধারণাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য আলাদা করে বলছি। আমাদের ঘরবাড়ি, নানা কাজের যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদির নির্মাণ-প্রক্রিয়া এবং রূপও আমাদের ঐতিহ্যের তথা সংস্কৃতির অঙ্গ। অনেক সময় এক এক গোষ্ঠীর এ সব নির্মাণের একটা আলাদা আলাদা চিহ্ন তৈরি হয়ে যায়। পোশাক-আশাকে এটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তেমনই ঘরবাড়ির রূপে, কাজের যন্ত্রপাতির চেহারায়, নৌকা, নানা বাহনের গাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির চেহারাও আলাদা হয়। অবশ্যই নানা সংস্কৃতির স্পর্শে এগুলি বদলায়। এখানেই ঐতিহ্যের বদলের একটি বড় এলাকা তৈরি হয়ে যায়।

এই উপাদানগুলির মধ্যেই আমরা যুক্ত করব নানা 'প্রতিষ্ঠান' বা institution-কে। রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, উৎপাদন ও বিপণনব্যবস্থা (অন্তরবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যনীতি)। আমরা জানি যে এগুলি শুধু বস্তু নয়–এগুলি আমাদের চিন্তার প্রকাশ। কিন্তু সেই হিসেবে সমস্ত নির্মিত বস্তুই আমাদের চিন্তার প্রকাশ। এটা ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাস নয়। বস্তুর উদ্ভব বাস্তব প্রয়োজন থেকেই, অর্থাৎ চিন্তাটা আগে আসে বস্তুর অভাব থেকে। কতকগুলি বাস্তব অবস্থা সেই বস্তুর অভাব আমাদের মনে জাগায়। পরিবর্তন এ সবকেও ছাড়ে না। শহরের মধ্যবিত্তদের আজ আর কতটি পরিবার পিতল-কাঁসার থালাবাসন কলসি, ঘটি ইত্যাদি ব্যবহার করে ?

৬) ভাষা হলো মানুষের নানা চিন্তা, আবেগ + ধ্বনিশৃঙ্খলের মধ্যে তার প্রকাশের প্রক্রিয়া। ভাষা যে ঐতিহ্যের অঙ্গ তা অনেক সময় সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হয়, বাংলাদেশ, ভারতের শিলচর এবং অন্যান্য জায়গায় যেমন হয়েছে। বেশির ভাগ আধুনিক ভাষার দুটি সাধারণ রূপ–মুখের ভাষা আর লেখার ভাষা। মুখের ভাষায় যেমন বৈচিত্র আছে, তেমনই লেখার ভাষারও বৈচিত্র তৈরি হয়। দুই ভাষার সঙ্গেই মানুষের আবেগ জড়িয়ে যায়। ভাষার লিপি আর বর্ণমালাও প্রিয় হয়ে ওঠে। ইতিহাসে তার বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে।

৭) নানা বস্তু, মানুষ আর শিল্পের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। যে সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা পরিবার, সমাজ এবং জাতি ও অন্যান্য গোষ্ঠী নির্মাণ করি, সেই বহুজালজটিল সম্পর্কও আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। প্রেম ও পরিবার, স্বপ্নের বাড়ি, স্বপ্নের গাড়ি, স্বপ্নের সমাজ ইত্যাদি ভাবকল্প যেমন আমাদের পরিচালিত করে তেমনই নানা অবৈধ বাসনা-কামনা আর তার পূরণের ইচ্ছা বিপুল অপরাধ-ব্যবস্থা নির্মাণ করে। তা আমাদের মানবজাতির পঁচিশ লক্ষ বছরের ইতিহাসের অঙ্গ, তেমনই গোষ্ঠীরও ইতিহাসের অঙ্গ। এই বিপুল ও ধারাবাহিক আর যুদ্ধবিগ্রহ আর লোভ-লালসা, হিংস্রতা, বঞ্চনা, নির্যাতন আর শোষণের ইতিহাস আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ হবে কি ? উপরের যে ছয়টি ক্ষেত্র আমরা নির্দেশ করেছি ঐতিহ্যের অঙ্গ হিসেবে, তার সব ক-টিতেই দুর্নীতি আর অপরাধের প্রচুর সুযোগ আছে, অপরাধের ঘটনাও ঘটে।

জিজ্ঞাসু পাঠক নিশ্চয়ই এর অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে আরও অনেক উপাদানের খোঁজ দিতে পারবেন। আপাতত আমাদের প্রয়োজনের জন্য এই ক-টিই আমরা লক্ষ্য করব।

ঐতিহ্য বদলায়, কাজেই ঐতিহ্যের সব কিছু রক্ষার যোগ্য নয়

এখানেই ঐতিহ্যের যে একটা নেতিবাচক দিক

আছে বা তৈরি হয়ে যায় তার কথা বলা যেতে পারে। অপরাধপ্রবণতা এবং অপরাধমূলক কাজগুলিকে কেউ ঐতিহ্যের অঙ্গ বলে দাবি করে না, কারণ আইন সেগুলিকে মানতে বা আচরণ করতে বাধা দেয়, আমাদের যে নীতিবোধ তাও সেগুলিতে সায় না দিতে শেখায়। ঐতিহ্যে একটা দীর্ঘদিন ধরে মেনে আসার ব্যাপার আছে, তাতে প্রকাশ্যভাবে অপরাধমূলক আচরণের কোনও জায়গা নেই।

কিন্তু বিশেষ করে ধর্মের নামে প্রচুর অপরাধের ঘটনা ঘটে। যদিও ধর্মই একটা অপরাধ—কারণ তা এক মিথ্যা বিশ্বাসের উপর স্থাপিত—এমন চূড়ান্ত কথা নাও বলি, তার নামে নরবলি আগে হয়েছে, এখনও কখনও কখনও হওয়ার খবর পাই। ধর্মের (দেশাচার যার অন্য নাম) নামে সতীদাহও হয়েছে বাংলায়, আর জাতপাতের বিভাজন তৈরি করে সামাজিক শোষণ তো দু-আড়াই হাজার বছর ধরেই চলেছে। বাংলায় উঁচু জাতের হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যের কারণে মেয়েদের নানা খাদ্য, পোশাক আর সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, শিক্ষার আঙিনার বাইরে রাখা তো এক সময় ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এখন এ সব বর্জিত হয়েছে, কখনও আইন করে নিষিদ্ধ করতে হয়েছে।

এই নেতিবাচক দিক অনেক আছে ঐতিহ্যের। বোকা ঐতিহ্য আছে, যা আমরা না বুঝেশুনে মেনে চলি, যাতে কোনও সৌন্দর্যও নেই। কুসংস্কারগুলি এই ধরনের বোকা ঐতিহ্য, যা ধর্মের কোঁচার খুঁট ধরে থাকে। পরীক্ষা দিতে গেলে ডিম খাওয়া চলবে না, কটা চোখের মেয়ে অলক্ষুণে, চালে শকুন বসলে গেরস্থের অমঙ্গল হয়—এগুলি বহু লোক মানে, প্রশ্ন না তুলেই মানে। এই প্রশ্ন না তোলা ধর্মের ব্যাপার থেকেই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তেমনি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন না তুলে অনেক কিছু মেনে এসেছি ঐতিহ্য বলে, তা বদলাবার কথা কেউ বললেই হইহই করে ওঠার আগে কথাটার ভালোমন্দ ন্যায্য-সুন্দর বিচার করার অবকাশ খুঁজে নিতে হয়।

ফলে ফেলে দেবার মতো বহু উপাদান আছে ঐতিহ্যের, যা ফেলে দিলে কান্নাকাটির কিছু নেই। পরিবর্তনের সুখে পরিবর্তনের কথা বলে না, যে উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে ঐতিহ্যের তার স্ক্রুটিনি করার পর হল্লা শুরু করা দরকার।

এক গোষ্ঠীর ঐতিহ্য অন্য গোষ্ঠীর উপর চাপানো

সাম্প্রতিক ভারতে বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। ভারত একটি বহু ধর্ম বহু সংস্কৃতি বহু নৃগোষ্ঠীর দেশ। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনে একটি গোষ্ঠী অনেক সময় প্রাধান্য পায়, তার ফলে সেই গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা অভ্যাস অন্য গোষ্ঠীদের উপর চাপানোর একটা উদগ্র প্রবণতা দেখা যায় শাসক দলের মধ্যে। ভারতের কিছু মানুষ নিরামিষ খায়, হয়তো এখনকার শাসকদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশি, তাই নিরামিষের মহিমা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে। শুধু তাই নয়, আমিষ খেলে কোন ধরনের আমিষ খাবে তাও প্রায় নির্বাচন করে দিচ্ছে এই শাসকদল। এর মধ্যে একটি প্রাণীকে (অর্থাৎ ওই প্রাণীর স্ত্রীজাতিকে) তারা মাতা বলে জ্ঞান করে বলে তার মাংস খাওয়া তাদের কাছে মহাপাপ, তাই সেই মাংস ফ্রিজে রাখা হয়েছে বা কেউ বহন করছে সন্দেহ করে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত হয়েছে। অথচ ওই মাংসভক্ষণের ঐতিহ্য যে বৈদিক যুগে ছিল, তার লিখিত সাক্ষ্যকে তারা স্বীকার করতে চায় না। অর্থাৎ উপস্থিত স্বার্থের জন্য কোনও কোনও গোষ্ঠী ঐতিহ্যের কাট-ছাঁট বা সম্পাদনা করে ব্যবহার করতেও দ্বিধা করে না, যদিও তা করা অসম্ভব এবং হাস্যকর। যা ছিল বলে প্রমাণিত, তাকে অস্বীকার করার পিছনে যে এক ধরনের গোয়েবেলসীয় দুর্বুদ্ধি আছে তা আর অস্পষ্ট থাকে না। এ প্রায় নিজের পিতৃপুরুষের নাম আর পরিচয় সম্পাদনা করার মতো। বললেই হয় যে, বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে তারা এই খাদ্য খেত, পরে সে পরিস্থিতি না থাকায় ভারতের ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা সেই খাদ্যাভ্যাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু সংখ্যাগুরুর খাদ্যাভ্যাস ভারতের সমস্ত সংখ্যালঘুর উপর চাপিয়ে দিতে হবে, এবং তা না মানলে হত্যাকারীর ভূমিকা নিতে হবে, সেটা কোন যুক্তি? ঐতিহ্য এবং তার নানা উপাদান ও লক্ষণ এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠী প্রায়ই গ্রহণ করে, সমাজবিজ্ঞানে তাকেই বলে 'বিস্তার' বা diffusion, কিন্তু গায়ের জোরে এই বিস্তারের বর্বর চেষ্টা গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। ফ্রিজে মাংস রাখা নয়, মস্তিষ্কে আমি যদি বিশেষ চিন্তাও রাখি, যে চিন্তার নাম যুক্তিবাদ (কারও কারও ভাষায় 'নাস্তিকতা') তা হলেও দেশের ধর্মীয় সংখ্যাগুরুর এক হিংস্র অংশের অস্ত্র আমাকে হত্যা করার জন্য এগিয়ে আসে, এ কথা গোবিন্দ পানসারে, বিজয় কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশরা, বাংলাদেশে অভিজিৎ রায়েরা প্রাণ দিয়ে বুঝেছেন। এই ঐতিহ্যিক তালিবানরা, যে ধর্মেরই হোক, শুধু যে তাদের কাল্পনিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে চায় তা নয়, ঐতিহ্যের উপনিবেশেরও বিস্তার ঘটাতে চায়, মধ্যযুগীয় বর্বরতার দ্বারা।

শেষের মন্তব্য

তবে মনে হচ্ছে, হয়তো এ লেখাটা কিছুটা মশা মারতে কামান দাগা হয়ে গেল। এইটুকু তো কথা—সব ঐতিহ্য রক্ষা করবার মতো নয়, কাজেই 'ঐতিহ্য নষ্ট হলো, ঐতিহ্য ডুবে গেল' বলে চেঁচিয়ে ওঠার আগে ঐতিহ্যের ভালো-মন্দ বিচার করে এ চ্যাঁচানিতে উদ্যোগী হওয়া দরকার। পরিবর্তন জীবনে, পৃথিবীতে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য, তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আমাদের প্রগতিকে চিহ্নিত করে সেটা যেমন একটু থেমে ভাবা দরকার, আর কোন পরিবর্তন হলে আমরা 'আপদ গেছে, ভালোই হয়েছে' বলতে পারি তাও বুঝে নেওয়া দরকার। আর দ্বিতীয় কথা হলো, ঐতিহ্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের দুরাশা এই সময়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ঐতিহ্যের মধ্যে অনেক আবর্জনা জেগে ওঠে, সেগুলিকে পরিষ্কার করতে করতে আমাদের এগতে হয়। কখনও নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের দ্বারা, কখনও বিপ্লবের দ্বারা, কখনও অন্য কোনও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আলোড়নের আয়োজন করে। হয়তো এই কথাগুলো দুচার কথাতেই বলা যেত। পাঠকের উপর অবান্তর পাঠের দায় চাপানোর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

টীকা

১. এই হল্লাকারীরা ভুলে গিয়েছিলেন, বা জানতেন না যে, ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৃতীয় শ্রেণির কিশলয় বইয়ে প্রথম এ কাজটা করা হয়েছিল। আর এ কথাও শোনেননি যে, মূল রচনা বদলানোর কোনও প্রশ্নই ছিল না তাতে, শুধু ক্লাস এইট পর্যন্ত পাঠ্যে ছেলেমেয়েরা পড়বে চলিত ভাষায়। কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে এম এ পর্যন্ত তারা মূল রচনাই পড়বে। সাধু ভাষার ব্যাকরণ শিখিয়ে তাদের সাধু ভাষাতে উত্তীর্ণ করার পরিকল্পনা ছিল, বছরখানেক পরেই। কিন্তু এই সব প্রাজ্ঞরা সেসব কথা শোনেননি।

২. বিস্ময়ের কথা হলো, সতর্ক সম্পাদকেরা এই সব শব্দসংকলনের ঠিক তারিখটি দিতে ভুলে গেছেন। সুনীতিকুমারের হাতে তিনি এই শব্দচয়নগুলি অর্পণ করেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য, কিন্তু কবে প্রকাশিত হয়েছিল, বা আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কি না তা জানাননি। পার্শ্বিক তথ্য থেকে ১৯৩৩ সালের কাছাকাছি এগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল মনে হয়।

৩. রবীন্দ্রনাথের তৈরি-করা পরিভাষা বিষয়ে আমাদের মতামতের জন্য এই লেখকের পুনশ্চ প্রকাশিত চমস্কি, ব্যাকরণ ও বাংলা বানান (২০১৩) বইয়ের (২২৯-২৪০) 'পরিভাষা-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্র-পরিভাষা' দেখুন।

শতবর্ষে সত্যজিৎ

বাঙালির আপনজন

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

অঙ্কন : অমল চট্টোপাধ্যায়

ওঁর মৃত্যুর বছর দশেক আগে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ওঁর আত্মকথা রেকর্ড করে লেখার উদ্যোগ হয়েছিল। রবিশঙ্করের 'রাগ-অনুরাগ'-এর ধরনে। একটা বিস্তৃত আত্মজীবনীতে ওঁর উৎসাহ ছিল এবং ওইরকম মুখে বলে বলে। আমায় বলেছিলেন খান পঁচিশেক প্রশ্নের নমুনা করে ওঁকে দেখাতে। আমি শ'খানেক প্রশ্ন করে ওঁকে দিয়েছিলাম। আমার অফিসের কর্তাদের উনি বলেছিলেন, প্রশ্নগুলো ওঁর ভালো লেগেছে। এই সব প্রশ্নের উত্তরই উনি জীবনীতে দিতে চান।

কাজের দিনক্ষণ স্থির হওয়ার সত্ত্বেও দিনের মাথায় ওঁর প্রথম বড় অসুখটা হলো এবং বারবার সে অসুখে নাজেহাল হতে থাকলেন। অবশেষে ১৯৯২ সালের ২৪ জানুয়ারি যখন 'দেশ' পত্রিকার সত্যজিৎ সম্মান সংখ্যার জন্য ওঁর একটা সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম, তখন সেই এক দশক আগের নমুনা প্রশ্নের একটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, "এমনটা কি সত্যজিৎ আছেন, যিনি আর এক সত্যজিতের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন?"

সত্যজিৎ হেসে বলেছিলেন, "এভাবে কখনও ভাবিনি। একবার সেরেসুরে খাড়া হই, তখন আত্মজীবনী বলা শুরু করব। দেখি তখন এসবের জবাব কী দেওয়া যায়।"

বাঙালির মন্দ কপাল, সে সুযোগ আর আসেনি। এর দু'দিন পর সত্যজিৎবাবুকে ফের নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং আর ফিরলেন না। 'ফিরলেন না' কথাটা ভুল হলো; ১৯৪১'র ৭ আগস্ট পরবর্তী রবি ঠাকুরের মতো বাঙালি জীবনের প্রায় সবখান জুড়ে থেকে গেলেন এক নিটোল প্রবাদ, অথবা, phenomenon হিসাবে। রেখায়, লেখায়, সুরে, বাঙালির আত্মপরিচয়ে। উনি বেঁচে থাকাকালীন খুশবন্ত সিং একবার সরস মন্তব্য করেছিলেন বাঙালি সম্পর্কে, They fuss over Bankim, Sarat, Tagore and Ray. বলার সময় এতে খুশবন্তীয় মৃদু মশকরা থাকলেও দিনে দিনে কথাটা একটা অবিসংবাদিত চেহারা নিয়েছে।

বাঙালি জীবনে সত্যজিতের প্রভাবটা কীরকম ব্যাপক আকার নিচ্ছে, সেই খতিয়ান দেখতে ওঁর সিনেমা, সঙ্গীত, লেখালিখি, আঁকাআঁকির প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এই সবের পিছনে ওঁর গোটা মনোভাবের প্রতি একটু নজর দিলে হয়। ১৯৮২ সালে ওঁর ব্রিটিশ জীবনীকার অ্যান্ড্রু রবিনসন ('দ্য ইনার আই') জানতে চেয়েছিলেন, উনি কি ওঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যাপক আনাগোনা সম্পর্কে সচেতন। উত্তরে সত্যজিৎ বলেছিলেন, "I never had the feeling of grappling with an alien culture when reading European literature, or looking at European painting, or listening to western music, whether

classical or popular." কথাটি সে সময়ে পড়ে আমার প্রথমেই মনে এসেছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের মুখটি, জ্যোতিদাদার পিয়ানো বাজনের সঙ্গে গান তুলছেন। ঊনবিংশ শতকের উজ্জ্বলো বাঙালির গড়ে ওঠার যে ট্র্যাডিশন, সেই ঐতিহ্যেরই এক অন্তিম ধারক সত্যজিৎ। একসময়ে 'দ্য নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায় ওঁকে নিয়ে 'দ্য লাস্ট ইংলিশম্যান' বলে একটা লেখা বেরোতে বেশ চর্চা শুরু হয়েছিল ওঁর ভক্তমহলে। ওঁর আত্মজীবনীর জন্য নমুনা প্রশ্ন যেটি পড়ে (উনি নিজের মনে নীরবে পড়ে যাচ্ছিলেন, আমি অদূরে সোফায় বসে) হেসে ফেলেছিলেন, তাতে জিজ্ঞাসা ছিল 'শেষ ইংরেজ' আর শেষ ঊনবিংশ শতকীয় বাঙালি' এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোনটি ওঁর পছন্দের। এর উত্তরটা যখন ওঁর থেকে পাওয়াই হলো না, আজকেন নিজের জন্য ওঁর হয়ে ওঁরই কথার স্টাইলে একটা শিক্ষিত অনুমান রেখেই দিই : "পাক্কা স্রেফ বাঙালি!"

এখন ভাবলেও অবাক হই যে, একটা সময় অবধি সত্যজিৎ নিজেকে লেখক বলে গণ্যই করতেন না। আনন্দ পুরস্কারের জন্য ওঁর নাম ঘোষিত হতে বলেছিলেন, "আমি আবার সাহিত্যিক নাকি! আমি সিনেমা করি।" আর ওঁর বইয়ের জন্য প্রথম রয়্যালটির চার হাজার টাকার চেক হাতে পেয়ে সেটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে প্রকাশক বাদল বসুকে বলেছিলেন, "লিখেও তাহলে পয়সা পাওয়া যায়!" ওঁর এই সব প্রতিক্রিয়া গত শতকের ছয়ের দশকের শেষ দিকের। আটের দশকের গোড়ায় যখন ওঁর সঙ্গে প্রায়ই কথা হয়, তখন দেখেছি লেখালিখির দায়িত্ব নিয়ে চলছেন। লেখা দিয়ে ছোটদের শুধু মজালেই চলবে না, ওদের বড় হয়ে ওঠার মন্ত্র দিতে হবে। ১৯৮১-তে বাল্যস্মৃতি নিয়ে লেখা "যখন ছোট ছিলাম" বইটিতে পরিবার, বন্ধু, শিক্ষকদের বর্ণনার পাশাপাশি ছেলেবেলায় ওঁর অজস্র কৌতূহলের এক বিস্তৃত পট এঁকেছেন, যেখানে ওঁর গন্ধ ও খেলার নেশা, ম্যাজিক ও ম্যাজিক লণ্ঠন, সার্কাস ও সিনেমা কী নেই! পুরানো দিনের কলকাতা তো বটেই, সুন্দর বর্ণনায় ফুটেছে বাল্য-কৈশোর, দেখা লক্ষ্ণৌ ও দার্জিলিং। যে-অবাক চোখে দেখা বইয়ের নানা দৃশ্য ও বিষয়, তা যেন এক বালকের চোখে দেখা সিনেমা, যে সিনেমার চোখ তিনি ছোটদের জন্য সব লেখায় কাজে লাগিয়েছেন অবিরত। ওঁর কলম কখন ক্যামেরা হয়, ক্যামেরা হয় কলম, এই প্রশ্নটিও ওঁকে করার ছিল সেই পরিকল্পিত আত্মজীবনীতে। জিজ্ঞাস্য ছিল ওঁর সিনেমার তীব্র, সূক্ষ্ম সম্পাদনার মতো ওঁর বাংলা ও ইংরেজি গদ্যেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি শব্দও থাকে না কোন জাদুতে। এর উত্তর উনি একবার আমায় দিয়েওছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। বলেছিলেন, "ভেনিসে বসে কুরোসাওয়া আর আমি একসঙ্গে 'সদ্গতি' দেখলাম। তার আগে মিসেস কাওয়াকিতার মুখে শুনতাম– কুরোসাওয়া বলে থাকে যে, আমার ছবি নাকি ওর খুব ভাল লাগে। সেদিন ছবি শেষ হতেও আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, জানালো যে ছবি ওর ভালো লেগেছে। এই পর্যন্ত। তারপর ঘণ্টা দুয়েক পরে লাঞ্চে বসে ও হঠাৎ বলে উঠল, 'সত্যজিতের ছবিতে একটাও বাড়তি শট থাকে না।' এই বলেই আবার খেতে আরম্ভ করল। কোনও কথা নেই, বার্তা নেই, ওরকম একটা মন্তব্য শুনে আমার ভীষণ ভালো লাগল।"

ছোটদের জন্য লেখা। যে ঢিলেঢালা, আহ্লাদি গদ্যে লেখাটা উনি গোড়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছেন, তা সহজেই নজরে আসে। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান শেখানোর পাশাপাশি সহজ, সরল, টানটান বাংলা গদ্য শেখানোরও একটা চেষ্টা ওঁর গোড়া থেকেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে সত্যজিৎ নতুন করে 'সন্দেশ' বের করেছিলেন, মনে করতেন সত্যজিতের মধ্যে একজন শিক্ষক লুকিয়ে আছে, যে গল্প করে করে পড়িয়ে দেয় বাচ্চাদের। সত্যজিৎ নিজেও এই শিক্ষকতার বিষয়ে নিপুণ করে তুলে দিয়েছেন ওঁর 'শিশু চলচ্চিত্র সম্পর্কে' রচনায়। সেখানে লিখছেন, "কিন্তু সমস্যা এই যে, শিশুচিত্রে যে তিনটি গুণ না থাকলে নয়– অর্থাৎ সারল্য, সাবলীলতা ও সর্বজনীনতা– এই তিনটি গুণের সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর অভাব লক্ষণীয়। শিশুর হৃদয় দিয়ে অনুভব করে পরিণত চিন্তার প্রয়োগে শিল্পসৃষ্টি– এ বড় দুর্লভ ক্ষমতা।"

কী ওঁর বাংলা গল্পকাহিনি বা সে সবের ইংরেজি অনুবাদে কিংবা 'গুপীবাঘা', ফেলুদা ছায়াছবিতে সত্যজিৎ আজ যে বাঙালি diaspora, বিস্তৃত ভূগোলের ছেলেমেয়েদের নিত্যসঙ্গী হয়েছিল, তা ওই শিক্ষকতার গুণে। এই মুহূর্তে ভারত জুড়ে যখন শিক্ষানীতি নিয়ে বিষম চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ, তখন বাঙালির সংস্কৃতিতে সত্যজিতের শিক্ষকতার ভূমিকা বড় অবলীলায় মনে এসে গেল। বিদেশে গিয়ে একটা জিনিস খুব নজরে আসে ইদানিং। প্রায় সব বাঙালি বাড়িতে ফেলুদা পঠিত, ইংরেজি এবং বাংলায়। একটি বালিকা তো কবুলই করল, সে ভালো করে বাংলা শেখায় মন দিচ্ছে 'গীতিগুচ্ছ', ফেলুদা ও রে'র অন্যান্য গল্প অরিজিনালে পড়বে বলে।

এও শুনেছি, 'গোরস্থানে সাবধান' পড়ে অনেকেই পার্ক স্ট্রিটে সিমেটারিতে যাওয়া ধরেছে।

বাঙালির সংস্কৃতি এবং নিজের বাঙালিয়ানা নিয়ে সত্যজিতের ভাবনাচিন্তায় কোনও দিনই হ্রাস পড়েনি। জীবনের শেষ অবধি সুযোগ এলেই সে প্রসঙ্গে কিছু না কিছু বলেছেনই। একবার তো একটা হালকা চালেই ওঁর বাড়ির পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবির পক্ষে সাফাই গাইলেন। উপলক্ষ কী? না, কথা চলছিল বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে দেশিকোত্তম গ্রহণ করতে কী পোশাকে যাবেন? সত্যজিৎ দিব্যি জানিয়ে দিলেন, "কী আছে, ওই পাজামা-পাঞ্জাবিতেই যাচ্ছি। নন্দদাও (আচার্য নন্দলাল বসু) তো ওই পরেই চালিয়ে গেলেন জীবনটা।" সেই বস্ত্রেই ইন্দিরা গান্ধীর হাত থেকে খেতাব নিতে শান্তিনিকেতন গেলেন।

১৯৭৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঋত্বিক ঘটকের স্মরণসভায় ভাষণ শেষই করলেন বাঙালির প্রসঙ্গ এনে। বললেন: "ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিল, বাঙালি শিল্পী ছিল– আমার থেকেও অনেক বেশি বাঙালি। আমার কাছে সেইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেইটেই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।"

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর মতো অনুপম শিল্পীর 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথাটা ('Pad, pad, pad through the paddy field') সত্যজিৎকে কতটা বিঁধেছিল জানি না, এই মন্তব্য নিয়ে কোনও মন্তব্যও যত দূর জানি উনি করেননি। বরং ত্রুফোর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ' ছবির শেষ দৃশ্য, ওঁর সায়েন্স ফিকশন ছবির প্রশংসায় চমৎকার লিখেছেন। আর আমার সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ('নব্বই বছর বাঁচলে আশি অব্দি ছবি করতে চাই', ১৯৮২) এক জায়গায় সমীহ প্রকাশ করলেন ছবিতে ত্রুফোর নিজের জীবনের ছবি তুলে ধরার চলনকে। উনি অন্যের কাহিনি নিয়ে 'পথের পাঁচালী' করলেও ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় খুব ব্যক্তিগত ছবি– এমন একটা কথা আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যজিৎ খুশি হয়ে যোগ করলেন, "আরও বেশি মনে হবে 'অপরাজিত' দেখলে।" আরেকটু পর বললেন, "বিধবা মা ও ছেলের সম্পর্কটা 'অপরাজিত'-তে নিশ্চয়ই অবচেতনে কাজ করেছে। নিশ্চয়ই করেছে। ওই যে গ্রোইং আপ অ্যান্ড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মাদার যে ব্যাপারটা হয়, তার একটা ছায়া থাকতেই পারে। ... এগুলো আমি খুব ভালো করে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে, রিলেট করে ছবিটা করেছি।"

'অপু' ত্রয়ী যে সত্যজিতের পশ্চিমী শিক্ষাকুশল সিনেমা চোখে দেখা যায়– নিখুঁত বাঙালি জীবন। এ নিয়ে আজ আর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অথচ ওঁর নিজেরই কিন্তু-কিন্তু ছিল গোড়ায়। আমায় বলেছিলেন, "এখন 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' যে চেহারা নিয়েছে বা 'অপুর সংসার', সেটা বিভূতিভূষণ বেঁচে থাকলে সেই চেহারা নিত কি না, আমি জানি না। 'পথের পাঁচালী'-র চিত্ররূপ দেওয়ার কথা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ মারা গিয়েছেন। তিনি কোনও দিন জানতে পারেননি যে, এটা ছবি হচ্ছে।"

সত্যজিতের এই দুর্ভাবনা যে একেবারেই অমূলক ছিল, তা কিন্তু নয়। 'অপু' ত্রয়ীর বেশ কিছু দৃশ্য নিয়ে বাঙালি দর্শকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন উপরিউক্ত সাক্ষাৎকারে ...

"...এখানে অনেকে বলেছিল, এমনকী রিভিউতেও লেখা হয়েছিল যে, যেখানে অপু তার বন্ধুকে বলছে ... কেন মাকে চিঠি লেখে না এরকম কী একটা ব্যাপারে– 'ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।' 'মাকে আমি ম্যানেজ করে নেব' ... তাতে এরা বলল যে, এরকম কথা কখনও অপুর মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না। সেটা আমার ননসেন্স বলে মনে হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, সে মাকে ভালোবাসে না। ভালোবাসা থাকলেই হয়তো এটা হয়। দুটো দিকই দেখব! ক্ষমতা এখানকার দর্শকদের ভয়ানক কম। ওই অপু যে তার শালাকে চড় মারল, তারপর কাজল পাখি মারছে ... তা নিয়ে এখানে যা কথাবার্তা উঠত, তাতে বোঝা যায়, এখানকার গোটা অ্যাপ্রোচটাই একটা সেন্টিমেন্টাল নিষ্পত্তির দিকে। ... কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে, আমি যাকে রিয়্যালিটি বলে জানি, আমি সেটাকেই দেখাবো। তাতে এই হয় না যে, পাখি মারলে বাচ্চা ছেলেটা নিষ্ঠুর হয়ে গেল। বা অপু শালাকে ঘুষি মারলে নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। এটা একেবারে বাজে কথা। যদি ডিপার সাইকোলজির দিকটা দেখা যায়, তাহলে ওগুলোই সত্য।"

সত্যজিৎ রায়ের 'অপু' ত্রয়ীর দৃশ্য কল্পনা দু'দু'রকম ব্যাখ্যা আদায় করেছে পশ্চিমী দুনিয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গে। 'পথের পাঁচালী'-তে ত্রুফো যেমন 'pad, pad, pad through the paddy field', মন্থরতা দেখেছেন, বাংলার জমি ও জীবনের অবিরল প্রশ্রয় দেখছেন বাঙালি বুদ্ধিজীবী, তেমনই 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার'-এ বিদেশি চিত্রকল্প, চিত্র ভাষার আরোপ ও অনুপ্রবেশ দেখছেন। গত শতাব্দীর আটের দশকের গোড়ায় বাঙালি দর্শক ও সমালোচককুল যখন ঢের বেশি সচেতন সত্যজিতের সিনেমার চিত্রধর্ম বিষয়ে, সহসা অভিনেত্রী নার্গিস সংসদে এক অদ্ভুত অভিযোগ তুললেন পরিচালকের বিরুদ্ধে। সত্যজিতের ছবি না কি বিদেশে ভারতের দারিদ্র বেচে নাম করছে। সংসদের সেই বিতর্কের পর তিনি তা নিয়ে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, তার কিছুটা তুলে দিলেই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সত্যজিতের বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত ছবি করার সমস্যাটা পরিষ্কার হবে...

"Interviewer : What does Ray portray in the Apu Trilogy and why do you object to it?

Nargis : He portrays a region of West Bengal which is so poor that it does not represent India's poverty in its true form. Tell me something. Which part of India are you from?

Int: UP (Uttar Pradesh)

Nargis : Now, tell me, would you leave your eighty-year-old grandmother to die in a cremation ground, unattended ?

Int : No.

Nargis : Well, people in West Bengal do. And that is what he portrays in these films. It is not a correct image of India.

Int : Do people in West Bengal do such a thing?

Nargis : I don't know, … Why do you think films like 'Pather Panchali' become so popular abroad!

Int : You tell me.

Nagris: …That is the image they have of our country and a film that confirms that image seems to them authentic.

Int : But why should a renowned director like Ray do such a thing?

Nargis : To win awards. His films are not commercially successful. They only win awards.

বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ নার্গিসের এই সমালোচনার কোনও প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য এই সূত্রে উৎপল দত্ত এক তীব্র ঠাট্টা ছুঁড়েছিলেন নার্গিসকে। এবং লেখক ও চিত্র নির্মাতাদের গোষ্ঠী 'ফোরাম ফর বেটার সিনেমা' এক চোখা চিঠিতে 'মাদার ইন্ডিয়া'-র নায়িকাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সত্যজিতের দরিদ্র ভারত এবং বোম্বাই ফিল্মের নাচাগানা, চোরগুন্ডা, খুনখারাবির আধুনিক ভারতের মধ্যে দূরত্ব কোথায়, কতখানি। এই প্রসঙ্গে যখন সত্যজিৎকে বিদেশে জিজ্ঞেস করা হতো– উনি কি নিজেকে যথেষ্ট ভারতীয় মনে করেন, ওঁর এক অপূর্ব জবাব থাকত: "I can be– if the need arises."

'অপু' ত্রয়ী থেকে 'মহানগর' অবধি এগারোটা ছবি নিয়ে বাঙালি জীবনের এক অনুপম চালচিত্র যখন গড়ে ফেলেছেন সত্যজিৎ, বিদেশি ফিল্মপণ্ডিতরা তদ্দিনে ওই সব ছবির গড়ন, গঠন, কারিগরিতে প্রায় এক পাশ্চাত্য পরিচালককে আবিষ্কার করে বসেছেন। 'শেষ ইংরেজ' তকমা তখনই লেগে গিয়েছে। কিন্তু 'চারুলতা' ইউরোপে মুক্তি পেলে যা শুরু হলো, তা হলো এককথায় আত্মসাৎ। 'সিনেমা আ ক্রিটিকাল ডিকশনারি'-তে 'চারুলতা'-র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জন রাসেল টেলর লিখছেন: "'Charulata', it is tempting to say, is Ray's most western film – is discussing it one thinks at once of Ibsen or Strindberg (more in this case than of Chekhov who so often seems to offer close parallels to Ray's dramatic practice). But that is bossing the question of whether most of Ray' is not western. Obviously there are things about his films, like their frequently measured tempo (slowness, unsympathetic critics would say), which it is easiest to discuss as part of his Indianness. But apart from his subject-matter it is hard to be sure that there is anything in his films which specifically from his Oriental background and heritage: he is very much a world film-maker, influenced more by Renoir, Pino Donskoi, Wellies …and even by the theories of Pudovkin, which were among his early reading, than by Indian cinema and its circumstances. There is nothing in his films which has to be related to anything but his own artistic development and taste as an individual; like any artist he is finally independent of his background, and whatever use he may make of it is ultimately self-determined."

কিংবা জ্যঁ রনোয়া যেমনটি বলেছিলেন ১৯৭৪-এ, "He is quite alone, of course."

না, সত্যজিৎ সে-অর্থে সত্যিই একা ছিলেন না। মাও জে দঙ যেমনটি বলেছিলেন ফরাসি লেখক অঁদ্রে চালরো'র প্রশ্নে: 'Chairman, do you ever fell alone' – 'Yes, alone with the masses', সত্যজিৎও একাকিত্বের প্রশ্নে বলতেই পারতেন: "হ্যাঁ, একাকী বোধ করি, বাঙালির সঙ্গে একা।"

তবে কী, এত ভারিক্কি কথা তো সত্যজিৎ বলতেন না। বিশেষত নিজেকে নিয়ে। সম্ভবত সেই কারণে আত্মজীবনীর জন্য ওঁকে দেওয়া আমার প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যে এই প্রশ্নটা রেখেছিলাম, "একটা কি সত্যজিৎ আছেন, যিনি আর এক সত্যজিতের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন!" সেই না-পাওয়া উত্তরে আশা করা যায় ওঁর একাকিত্ব ও বাঙালিত্বের কথাও থাকত। বাঙালিত্বের কথা একটু বেশি করেই থাকত। কারণ, ভারতীয় সিনেমার থেকে বিশেষ কিছু না নিলেও বাংলার ও ভারতের সংস্কৃতির কাছে ওঁর অগাধ ঋণ। এবং অপর ঋণ ওঁর পশ্চিমী সংস্কৃতির কাছেও। এবং এই তিন ভুবনের সেরা মেলবন্ধন ওঁর সিনেমার সেরা বিশারদরা শনাক্ত করেছেন 'চারুলতা'-য়। এবং এই পর্যবেক্ষণের সমর্থনে যুক্তি রবীন্দ্রমুগ্ধ সত্যজিৎ দিতেই পারতেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "A sign of greatness in great geniuses is their enormous capacity for borrowing, very often without their knowing it; they have unlimited credit in the world market of cultures."

নানা শিক্ষা, নানা পর্ব, নানা প্রভাবের প্রসঙ্গের পর একবার ফিরে আসতেই হয় বাংলার জমিনে দাঁড়িয়ে শুটিংয়ের সময়ে সত্যজিতের পরিস্থিতির বিচারে নেওয়া সিদ্ধান্তে। আমি সে সবের থেকে একটিই বাছব এই জন্যই যে, এই দৃশ্যের বিবেচনায় আমরা নার্গিসের অপূর্ব অজ্ঞ মন্তব্য একটু আগে শুনেছি। হ্যাঁ, আমি ইন্দিরা ঠাকরুণের শবযাত্রার দৃশ্যের কথা বলছি। সে দৃশ্য নিয়েই সত্যজিতের নিজের কথা এবার শুনুন…

"ইন্দিরের শবযাত্রার দৃশ্যটি ছবির শেষের দিকে তোলা হয়। এটিও চিত্রনাট্যে ছিল না। ইন্দিরের মৃত্যু আরও মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত মনে করে এই দৃশ্যটি যোগ করা হয়। শবযাত্রার দৃশ্য মানেই বীভৎস, এমন কেউ কেউ মনে করেন। আমি তা করি না। দু'টি কারণে ইন্দিরের শবযাত্রা আমার মতে বীভৎস হয়নি। এক– যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং যে সময়ে (সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই) দৃশ্যটি তোলা হয়েছিল, এবং দুই– হরিধ্বনি বর্জন।

দর্শকের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকেন, এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা– যাঁরা 'বলহরি' শুনেই হরিবোল বলার লোভ সামলাতে পারেন না। হরিধ্বনি বর্জন করা হয়েছিল প্রধানত এঁদের কথা মেনেই এবং এই বর্জনের সংকল্প ও বুড়ির গানকে শবযাত্রার দৃশ্যে আবহসঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করা, সমসাময়িক ঘটনা হিসাবে ধরা যেতে পারে।"

বাংলা ও বাঙালিকে এভাবে সমসাময়িক করে তোলার মধ্যেই সত্যজিৎ রায়ের আধুনিকতা। এবং হয়তো সর্বকালীনতা। এবং নিশ্চয়ই বাঙালিত্ব।

কথা ছিল বাংলা সংস্কৃতি ও সত্যজিৎ নিয়ে লেখার। হয়ে গেল বাঙালি সত্যজিৎ। বাঙালির সত্যজিৎ। এই হয়!

প্রসঙ্গ: পথের পাঁচালি

পার্থ রাহা

'পথের পাঁচালি' শৈশবে দেখা প্রথম ছবি। বায়োস্কোপ। আগে আম আঁটির ভেঁপু পড়ে ফেলেছি। বারবার। অনেকবার। সেই প্রথম সিনেমা দেখা। অন্ধকার গা ছমছম করা ঘর। পাশে মা আছেন। তবু তাঁকে দেখা যায় না। সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বৃষ্টির অঝোর ধারা। দুর্গার চুল ভিজিয়ে নেওয়া। আর কাশফুল আর কাশফুল। ছন্দে ছন্দে দুলে উঠেছে। তারও পিছনে আকাশ আর সাদা মেঘের ভেলা। কাশফুল পেরিয়ে অপু-দুর্গার ছুটোছুটি। সাদা মেঘের আকাশটা কালো হয়ে যাচ্ছে রেল ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায়। রাত্রির ঘুমভাঙা ট্রেন, ছুটছে তার স্বাভাবিক গতিতে, যেখানে আকাশ মাটি ছুঁই ছুঁই করছে ঠিক সেইখানে। বাড়ি ফিরে বারবার স্বপ্নের মধ্যে ফিরে ফিরে আসত। শুধু অপুর জায়গায় পুলক মেশানো বালকটি হয়ে উঠতাম আমি।

পরে জেনেছিলাম, সে দিনের সেই বিস্মিত বালক আমি নয় শুধু, সমস্ত বাংলার মানুষ সে দিন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছিলেন। পথের পাঁচালি গতানুগতিক চিত্রধারায় একটা মহাবিপ্লব এনেছিল। যেমনটি ঘটেছিল মেঘনাদবধ কাব্য রচনায়। যেমনটি ঘটেছিল বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। নবান্নর প্রযোজনায়। পথের পাঁচালি এমনই একটি ঘটনা, যা সিনেমা মাধ্যমের পুরানো ধারণা ও চিন্তাধারা ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে নতুন চিন্তভাবনায় উজ্জীবিত।

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিল্বমঙ্গল দিয়ে বাংলা বায়োস্কোপের যাত্রা শুরু। উনিশশো একত্রিশে 'জামাই ষষ্ঠী' শুরু করল টকির যুগ। ১৯৩১ থেকে ৪০ পর্যন্ত কমবেশি আড়াইশো বায়োস্কোপ তৈরি হয়েছে। পরিচালক, তারকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকারা গাড়িজুড়ি চেপেছেন। পাঁচের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অনেক 'টকি', 'বায়োস্কোপ', 'বই' বাংলা সিনেমায় এসেছে, তারা অনেক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই ভোরবেলায় স্মরণীয়। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে। প্রথম ভারতীয় সিনেমার নাম পথের পাঁচালি। এর চেয়ে ভালো লাগা অনেক 'বায়োস্কোপ' বা 'বই'য়ের নাম করতে পারি। কিন্তু সর্বাঙ্গীন সিনেমার নাম করতে পারব না।

সিনেমা সর্বাস্তিবাদের মতোই গল্পকে, সংলাপকে, দৃশ্যময়তাকে, সঙ্গীতময়তাকে গ্রাস করে। একদা ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, ‘‘সাহিত্য ছেড়ে সিনেমায় এসেছি যেহেতু সিনেমা আরও শক্তিশালী মাধ্যম, – যেদিন এর চেয়েও শক্তিশালী মাধ্যম পাব ... এও ছেড়ে চলে যাব।’’

সত্যজিৎ সাহিত্য থেকে সিনেমায় আসেননি। সিনেমা ছেড়েও সাহিত্যে যাননি। সৃষ্টিকে প্রকাশের জন্য যেটি যখন প্রয়োজন, তখন সেটি ব্যবহার করেছেন। একদা জীবনানন্দের উক্তি ছিল 'সকলেই

কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। একইভাবে উচ্চারণ করতে পারি— অনেকেই ছবি করছেন। কিন্তু সকলেই নয়, কেউ কেউ চলচ্চিত্রকার। যেমন চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, ডি সিকা, বুনুয়েল, কোম্যান, গদার, ত্রুঁফো, যেমন সত্যজিৎ রায়। পথের পাঁচালির শেষ ক্ষণে অপু দিদির জমানো জিনিস ফেলে দেয় জলে, নিথর পুকুরের জলে। হাওয়া নেই, স্রোত নেই, শব্দ নেই, শুধু টুপ করে মালা ফেলার শব্দ। জলে বৃত্তের নকশা। বেদনা, গীতিকবিতার চূড়ান্ত অনুভবে পৌঁছে দিয়েছেন। জাপানি হাইকুর অনুভূতি। এমন চিত্রকল্প সারা ছবিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ঘরের জীবনের নিটোল প্রতিচ্ছবি— কখনও সংকীর্ণতার, কখনও ঔদার্যের আর বাইরে শান্ত পুকুরে পোকার আনাগোনা। প্রকৃতি আর বিজ্ঞানের আশ্চর্য মাখামাখি আর সব কিছু ছাপিয়ে সদ্য মেয়ে হারানো সর্বজয়ার বুক ফাটা আর্তনাদ। এ যেন বাংলার হাহাকার।

বাংলার শিল্প জগতে মহাবিপ্লব ঘটে গেল।

ভারতীয় সিনেমায় পথের পাঁচালি এক অনাস্বাদিত শিল্প সৃষ্টি। অভূতপূর্ব। তার নির্মাণও অভূতপূর্ব। ভারতীয় সিনেমায়, বোধ করি পৃথিবীর সিনেমার মানচিত্রে সত্যজিৎ রায়ই প্রথম চলচ্চিত্র স্রষ্টা, যিনি চলচ্চিত্র প্রকরণের কোনও শিক্ষানবিশী না করে পূর্ণাঙ্গ ছবিতে হাত দিয়েছিলেন। এমনকী স্টুডিও চত্বরেও তাঁকে দেখা যায়নি। সিনেমার জনক বলে কথিত ডব্লিউ ডি গ্রিফিথ এডুইন পোর্টারের সহকারী ছিলেন বেশ কিছু দিন। নিজেও বেশ কয়েকটি ছোট ছবি করেছিলেন 'বার্থ অব এ নেশন' সৃষ্টির আগে। চ্যাপলিনের শৈশবই কাটে মঞ্চে। 'দি কিড'-এর আগে তাঁর অন্তত শতাধিক দশ মিনিটের ছবি তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল। আর আইজেনস্টাইন, পুডভকিন, কুলেশভরা পাঠ নিয়েছিলেন তাঁদের দ্রোণাচার্য ঘুরু মেয়ারহোল্ড-এর ইনস্টিটিউট অব এ কসেনট্রিক আর্টিস্ট-এ, বুনুয়েল বন্ধু সালভাদোর দালিকে নিয়ে ছবি তৈরির আগে সহকারী পরিচালনায় হাত পাকিয়েছিলেন। ত্রুঁফো আর গদার চলচ্চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ লেখা দিয়ে শুরু করেছিলেন আর স্টুডিয়োর আঙিনায় কাটিয়েছেন বেশ কিছু দিন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের শৈশব আর কৈশোর কেটেছে সম্পূর্ণ অন্য খাতে। ছবি আঁকা নিয়ে তাঁর শিল্পী জীবন শুরু। বিজ্ঞাপন সংস্থার ছবি আর সিগনেট প্রেসের বইয়ের প্রচ্ছদ করার কাজ। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত প্রথম লেখা উনিশশো আটচল্লিশে দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায়। কিন্তু ছবি তৈরি করার বাসনা তখনও স্বগত চিন্তা থেকে বাইরে প্রকাশিত হয়নি, যদিও গোপনে চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। উনিশশো সাতচল্লিশে শেষ করেন 'ঘরে বাইরে'-র চিত্রনাট্য।

তখনও পথের পাঁচালি তাঁর অপঠিত। সিগনেট প্রেস 'পথের পাঁচালি'র কিশোর সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা করে, সত্যজিতের উপর বর্তায় সেই 'আম আঁটির ভেঁপু'র মলাট করার কাজ। আর তখনই পথের পাঁচালি পাঠ। একবার নয়। বারবার। বহু বার। সিদ্ধান্ত নেন, যদি কখনও ছবি করেন, তাহলে পথের পাঁচালিই হবে প্রথম অগ্নিপরীক্ষা। পথের পাঁচালি চিত্রনাট্য তৈরির কাজ শুরু হয় সংগোপনে। এরই মাঝে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির জন্ম। জঁ রেনোয়ার ভারত আগমন। সত্যজিতের বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে লন্ডন যাত্রা। সাড়ে চার মাসে বিরানব্বইটি ছবি দেখা। এই ছবির তালিকায় ছিল 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন', 'নানুক অব দি নর্থ', 'লুসিয়ানা স্টেপস'।

এমনভাবেই একজন শিল্প ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেন। গড়ে ওঠেন তাঁর চারপাশকে ঘিরে। গড়ে ওঠেন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে। আর এভাবেই গড়ে উঠল পথের পাঁচালির ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

পথের পাঁচালি এক অনন্য নির্মাণ। আর এই নির্মাণের অনন্যতার স্মৃতিচারণ করেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর এক পিতৃপ্রতিম পুরুষ মৃণাল সেন। বলেছেন: ‘‘১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেই দিনগুলি। যখন এই দেশেরই একজন, আমাদের কলকাতারই একজন। এক আচমকা বিস্ময় ঘটিয়েছিলেন এদেশেরই ছবির পর্দায়। কে তিনি? কারা তাঁর সঙ্গীসাথী? তাঁর ভাবনার চিন্তার, সেদিনের তাঁর দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটির সর্বক্ষণের সহচর? ছবির জগতে তাঁর বা তাঁদের কী কোনও পরিচিতি ছিল সে সময়ে? বিন্দুমাত্র না। কিন্তু হঠাৎ? হঠাৎই এক বিশাল ঘটনা ঘটে গেল।’’

ভারতীয় চলচ্চিত্রের আর দুই প্রাণপুরুষ, তাঁরই সমসাময়িক ঋত্বিককুমার ঘটক আর মৃণাল সেন ছবি তৈরির আগে স্টুডিয়োয় ঘুরেছেন অভিনেতা বা সহকারী পরিচালকের ভূমিকায়, কিন্তু দীর্ঘকায় যুবক একেবারে নেতার ভূমিকায়, স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে শিল্পের আঙিনায় এসেছিলেন। পিছনে ছিল বহু ভালো ছবি দেখার অভিজ্ঞতা, পুডভকিন বা 'ইভান দ্য টেরিবল'—এর নামভূমিকাভিনেতা চেরকাসভের সঙ্গে আলাপচারিতায় জঁ রেনোয়ার সঙ্গে কথা বলা। আর এই সম্বল করেই এগিয়ে যাওয়া। ‘‘কারা তাঁর সঙ্গীসাথী’’? পথের পাঁচালির চিত্রময়তার মূল কারিগর এক একুশ বছরের যুবক— সুব্রত মিত্র। তিনি কোনও দিন এর আগে মুভি ক্যামেরা চালাননি। আর যেমন আলো পাওয়া যাবে, তেমনভাবেই ছবি তোলা। বংশী চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন শিল্প নির্দেশক, যিনি এর আগে কোনও দিন স্টুডিও চত্বরে যাননি। কাহিনী চিত্রের কোনও অভিজ্ঞতা ঝুলিতে ছিল না। সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আর এক যুবক দুলাল দত্তের উপর। তাঁরও কাহিনী চিত্র সম্পাদনার নেই কোনও অভিজ্ঞতা। ছবির শিল্পীরা? সর্বজয়ার ভূমিকায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্যে একসময়ে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কথা তাঁর চিন্তাতেও সে দিন ছিল না, আর দুর্গা বা অপুও টলিউডের কুমারী অমুক বা মাঃ অমুক নয়। একেবারেই হঠাৎ পাওয়া ইস্কুল পড়ুয়া। একমাত্র কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ই পেশাদার অভিনেতা এবং সমস্ত ছবির দুর্বলতম যোগসূত্র। আর ছিলেন আশি বছরের দীর্ঘ জীবনের বঞ্চনার অভিজ্ঞতা পিঠে বওয়া এক বৃদ্ধা, চুনীবালা দেবী। মৃণাল সেন ঠিকই বলেছেন, এঁদের কোনও পরিচিতি ছিল না সে দিন। পথের পাঁচালি এক লহমায় তাঁদের ঐতিহাসিক চরিত্র তৈরি করে দিল।

ছবির শুটিং প্রথাসিদ্ধ স্টুডিও চত্বরে নয়। স্টুডিওর পরিচিত বাঁধা ধরা আউটডোর তকমা মারা লোকেশনেও নয়। শুটিং হলো বোড়াল গ্রামে। কলকাতার কাছেই।

এই প্রথার বাইরে গিয়ে প্রথম ছবি করার দুঃসাহসিক চূড়ান্ত অনিশ্চিত পরীক্ষা সন্দেহ নেই। আজ পথের পাঁচালির এই নির্মাণ পর্ব এক অনন্য ইতিহাস তৈরি করেছে, এ কথাও সত্য। কিন্তু এই 'অনন্য প্রয়াস' সবটাই পূর্ব পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত নয়। কোনও কোনও সময় সামনে কোনও উপায় নেই তাই। আর কখনও প্রয়োজনের তাগিদে। কেননা পথের পাঁচালির খসড়া চিত্রনাট্য নিয়ে প্রযোজকদের (যারা বেশিরভাগই উড়ন্ত কালোয়ার বা মহাজনী

বেওসাদার) দরজায় দরজায় ঘুরেছেন সত্যজিৎ। ‘‘গল্পের শেষে সশব্দ হাই তুলে– তাহলে আপনার ছবিতে গান নেই’’ (পথের পাঁচালির চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়– এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯০। পৃ: ২৯৩-৯৪)। এমনভাবেই প্রযোজকদের দরজা একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ ছবি করা তো শুরু করতেই হবে। বিশেষ করে পুডভকিন আর চেরকাশভের উৎসাহ তাঁকে সমস্ত হতাশাকে ছুঁড়ে ফেলে প্রেরণা জুগিয়েছিল। জাগিয়েছিল।

সুতরাং যদি ‘তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’, তবে নিজেকেই সমর্পণ করতে হবে মহা অভিযানের পথে। জীবন বিমা থেকে সাত হাজার টাকা ধার। স্ত্রীর গয়না বন্ধক। নিজের সংগ্রহের শিল্পকলার বই বিক্রি। এই অর্থ সম্বল করে টলিউডের নামীদামী কলাকুশলীদের বা তারকামণ্ডিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের এক জায়গায় জড়ো করা সম্ভব কি? সুতরাং অপেশাদার শিল্পী আর কলাকুশলীদের নিয়ে ছবি করা কোনও শিল্পতত্ত্বের তাগিদে নয়। নিতান্ত রূঢ় বাস্তব– কঠিন বাস্তবের তাগিদেই। তেমনই বাস্তব সত্য হলো, এই পুঁজি নিয়ে আট ঘণ্টা শিফটের স্টুডিও চত্বরে প্রবেশ করাও সম্ভব ছিল না। পেশাদারি আউটডোর শুটিং এলাকা ভাড়া নেওয়াও সম্ভব নয়। অতএব কলকাতার কাছে বোড়াল গ্রাম নির্বাচন। অনেকেই পরবর্তীকালে পথের পাঁচালিতে শুধুমাত্র ম্যাচ কাট-এর ব্যবহার, আর ডিজলভ বা অপটিক্যা লকে ব্যবহার না করার মধ্যে এক অনন্যসাধারণ শিল্প কৌশলের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। আপ্লুত হয়েছেন। কিন্তু সে দিনের সত্যজিতের পক্ষে অপটিক্যা লের ল্যাবরেটরির ব্যয় ছিল প্রায় বাবু বিলাসিতার সমান। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে অপটিক্যালকে। এই সমস্ত অসাধারণ প্রথাবিরোধী পদক্ষেপই এক প্রায় স্বয়ম্ভু চলচ্চিত্রের জন্ম দিয়েছে। প্রয়োজনটা শিল্প বা অর্থাভাব– যার তাগিদেই হোক না কেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এক নতুন জন্মের দিশা দেখিয়েছে, যা এর আগে কোনও ভারতীয় সিনেমাই দেখাতে পারেনি।

সত্যজিতের জগৎ তৈরি হলো গরিব মানুষের পৃথিবী নিয়ে। ক্যামেরা এখানে ‘জুম’ করল ভারতের দরিদ্র গ্রামের দিকে। টলিউডের স্বপ্নিল গ্রাম নয়– গ্রাম জীবন যেমন, ঠিক তেমন।

বাইসাইকেল থিভস যদি নব্য বস্তুবাদের উজ্জ্বলতম লক্ষ্য হয়, তাহলে যে নব্যবস্তুবাদী ছবিটি ইতিহাসের দলিল হয়ে আছে আজও, সেটি হলো পথের পাঁচালি। তবে ইতালির নব্যবস্তুবাদের কোনও অনুকরণই সত্যজিৎ করেননি। নব্যবস্তুবাদের নিজস্ব ভারতীয় রূপ পাই সত্যজিতের ছবিতে। ইতালীয় রেনেসাঁর সব লক্ষণ যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে পাওয়া যাবে না, তেমনই ডি সিকা, রসোলিনির পথে হাঁটেননি সত্যজিৎ। সব প্রতিভাই নিজস্ব আলোয় ভাস্বর। ডি সিকা নব্যবস্তুবাদের প্রধান বক্তা। সত্যজিৎ নব্যবস্তুবাদের শেষতম প্রতিনিধি। লিন্ডসে এন্ডারসন পথের পাঁচালি সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন– “you cannot make film like this in a studio nor for money. Satyajit Ray has worked with humility and complete dedication, he has gone down on his knees in the dust, and his picture has the quality of intimate unforgettable experience.”

সত্যজিৎ নতজানু হয়ে মাটির গন্ধ নিঃশ্বাসে গ্রহণ করেছেন। বাণিজ্য করার জন্য নয়। শিল্প সৃষ্টির দুরন্ত তাগিদে। পথের পাঁচালি এক নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। না হলে সেই কাশ্মীরী যুবকটি শিল্প নির্দেশনার পেশাদারি দায়িত্ব নিয়ে নির্লিপ্ত দূরত্বে অবস্থান না করে পাঁচিলে উঠে রিফ্লেক্টার ধরতেন না। সুব্রত মিত্র ক্যামেরার পিছন থেকে সরে এসে রাত্রির নির্জনতায় রবিশঙ্করের ফেলে যাওয়া অংশের সেতারের মূর্চ্ছনা নিয়ে অনুশীলন করতেন না। দুর্গার মৃত্যুর খবর যখন হরিহরের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তখন রবিশঙ্করই বা কেন পেশাদারিত্বের চোকা চাপকান ছুঁড়ে ফেলে তার সানাই বাজাবেন? কোন টানে? সেই তো মহৎ শিল্পের উৎসের সন্ধানে। পুরানো চলচ্চিত্রের সব ধারাকেই তিনি অনুসরণ করেছেন একটি নিটোল কাহিনীকে চলচ্চিত্রায়িত করতে। গল্প বলার ভঙ্গিতেই। গোদরিয় বা সিনেমা নভোর স্বতন্ত্র ভাষায় নয়। অথচ সমস্ত পুরাতনী প্রথাকে অতিক্রম করল পথের পাঁচালি।

ফাঁসোয়া ত্রুঁফো পথের পাঁচালি অর্ধেক দেখে উঠে গিয়েছিলেন, ‘‘এ ছবি দেখব কেন? এক অখ্যাত গ্রামের ধান আর ধানখেত, ধানখেত আর ধান। এ ছবি দেখার কোনও প্রয়োজন নেই।’’ কান-এ মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দলিল শিরোপা পাওয়ার পরেও। এডিনবরা, ভ্যাটিকান, ম্যানিলা, সানফ্রান্সিসকো, ভ্যাঙ্কুবার, স্ট্যাটফোর্ড, নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করার পরেও। পথের পাঁচালির অপাপবিদ্ধ নিষ্পাপ অপু। এক অজানা বিস্ময়ে তাকানো অপু। আর ত্রুঁফোর ‘ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ’-এর সমবয়সী কিশোর নায়ক পচনশীল পুঁজিবাদী সভ্যতার শিকার। এই অপরাধী কিশোর জেলখানা থেকে পালাচ্ছে। পালিয়ে পালিয়ে কোথায় সে থমকে দাঁড়ালো? এক অনতিক্রম্য সমুদ্রের সামনে। আর অপু, অপাপবিদ্ধ অপু কাশফুলের ভিতর দিয়ে ধানখেতের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন জগতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে না। একজন উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পচনশীল সমাজের ভিতর থমকে দাঁড়ানো নাগরিক কিশোর। আর একজনের সামনে একটা নতুন যুগ আসছে। তার সামনে আরও অভিজ্ঞতা আসবে। সেই অভিজ্ঞতায় হতাশা আছে। দুঃখ আছে। মৃত্যু আছে। কিন্তু নীল আকাশও আছে, আছে কাশফুল। সামনে কোনও এক অজানা স্টেশনে চলে যাওয়ার মতো এক ট্রেন, তার চলে যাওয়া। সেই গতি, সেই গতির চেহারা আমরা পেয়েছি। পথের পাঁচালি আমাদের নতুন যুগের কথা বলছে।

আগেই জানিয়েছি ১৯৪৭ সালেই সত্যজিৎ তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য শেষ করেন, রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’র। কিন্তু সে দিন এই ছবি করার খুব একটা চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়নি। কিন্তু প্রচ্ছদ করার পেশাদারি প্রয়োজনীয়তায় পথের পাঁচালি যখন তাঁর হাতে এসে পৌঁছাল, সে দিন থেকে তিনি কিন্তু আর বসে থাকেননি। রবীন্দ্রনাথ তাগিদ জাগাতে পারেননি। বিভূতিভূষণ সেই তাগিদ– অনতিক্রম্য দুর্মর তাগিদ জাগিয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণের উপন্যাস নিয়ে ছবি করার কথা আগে কেউ কল্পনাও করেননি। কিন্তু সত্যজিৎ রায় করেছিলেন। কেননা তিনি টালিগঞ্জের যে কোনও কেউ ছিলেন না। সব কিছুরই শুরু করেছিলেন শিল্পসৃষ্টির অনন্য তাগিদে।

আমাদের কালের দু’টি শিল্প মাধ্যমের হিমালয় চূড়ায় অবস্থানরত দুই ব্যক্তিত্ব মিলিত হয়েছেন এক

বিন্দুতে। সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালিকে চলচ্চিত্রে অনুবাদ করেছেন। একটির ভাষা সাহিত্য, অন্যটির চলচ্চিত্র। এক সৃজনশীল প্রতিভা যখন অন্য প্রতিভার সৃষ্টিকে নিজের আয়ত্তের ভাষায় অনুবাদ করেন, তখন সেটির সরাসরি ভাবান্তর হয় না। সত্যজিৎ পথের পাঁচালির অনন্ত অক্ষয়ী কাহিনীকে যখন তাঁর ব্যবহৃত শিল্প মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছেন, তখন বহু ক্ষেত্রেই মূল কাহিনীর পল উপল মেনে করেননি। পরবর্তীকালেও ‘নষ্টনীড়’ তাঁর হাতে হয়েছে ‘চারুলতা’। গুগা-বাবাতে চরিত্র পরিবর্তন হয়েছে। ঔপন্যাসিকের আছে কলম, চিত্রশিল্পীর হাতে তুলি, আর চলচ্চিত্রকারের কাঁধে ক্যামেরা। ঔপন্যাসিকের জন্য শব্দ, শিল্পীর জন্য রেখা। চলচ্চিত্রকারের জন্য শট। ঔপন্যাসিক শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কাহিনী নির্মাণ করেন, আর চলচ্চিত্রকার শটের পর শট সাজিয়ে কাহিনী নির্মাণ বা বিনির্মাণ করেন। চলচ্চিত্র কথা বলে ছবিতে। সেখানেই তার গৌরব। এখানেই তার সীমাবদ্ধতা। ভাষা ব্যাকরণের বেড়া ভাঙতে পারে না। চলচ্চিত্র কোনও ব্যাকরণ মানে না। দৃশ্যময়তা ছাড়া। যে কোনও মুহূর্তে সাহিত্যের যে কোনও ধারায়, শিল্পের যে কোনও মাধ্যমে সে বিচরণ করতে পারে। আবার দৃশ্যময়তাই তার সীমাবদ্ধতা। কল্পনার স্বাধীনতাকে সে বেঁধে দেয় পর্দার চারকোণে। পরিচালক কাহিনীর কখনও কখনও নির্মাণ করেন। কখনও বা বিনির্মাণ।

১৯২৯-এ প্রকাশিত পথের পাঁচালির বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ছিল স্বপ্নময়। গ্রামীণ জীবনে যেন অসুন্দরতা নেই। প্রকৃতি আর মানুষ এক নিবিড় ঘন সম্পর্কে লালিত। আর এই কারণেই পথের পাঁচালির সাহিত্য মূল্য আজও অম্লান। জীবনের শুরু এক পথে আর শেষও এক পথে। পথের পাঁচালি এই পথ চলার কথা বলছে। আদিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি অপুকে টেনে নিয়ে যায় এক কল্পনার রাজ্যে। অপুকে প্রকৃতির রাজ্যের পথ চেনায় তার দিদি দুর্গা। কিন্তু প্রকৃতির বাইরের চেহারাতেই ও বন্দি। প্রকৃতির ক্ষুদ্র দানেই তার পরম প্রাপ্তি। কখনও কাঁচা আম, কখনও বৈঁচি ফল মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির কাছে অপুর চাহিদার শেষ নেই। প্রকৃতির সেই অন্তর্লোকের চাবির সন্ধান অপু পায়। অপু আপনমনে যেন প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলে। দুর্গা বলে, “পাগল। কোথাকার একটা পাগল। কি বলছিলিরে আপন মনে?” মা সর্বজয়া ভাবেন, “কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে।” পথের পাঁচালির অপু-দুর্গা প্রকৃতির খেলার সাথি। কিন্তু তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। অপুর চিন্তা মাঝে মাঝে দুর্গাকে আচ্ছন্ন করে– “ভাইয়ের রাশি রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।” কিন্তু দুর্গার জগৎ তার ভাইয়ের জগৎ নয়, ভাই কেন্দ্রিক জগৎ। অপুর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক, অপুর অনাস্বাদিত জগতের সঙ্গে নয়।

পথের পাঁচালির জীবনের পথ ধরেই এসেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই পথেই এসেছে ইন্দির ঠাকুরণ, অতীতের গ্রাম বাংলা। ইন্দির ঠাকুরণের কুলীন স্বামী, বৈধব্যের দুঃখ আর যন্ত্রণা। সর্বজয়ার হিংস্র নিষ্ঠুরতা, আর ইন্দির ঠাকুরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অতীতের নিশ্চিন্দিপুর কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অতীতের শেষ প্রতিনিধি ইন্দির ঠাকুরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একালে চেতনা শুরু। এই পথ দিয়েই এসেছে প্রসন্ন পণ্ডিতের পাঠশালার কথা। পাঠশালার ঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই। ছেঁড়া খোঁড়া বইপত্তর। পাঠশালার মাটির মেঝে আর কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া এক চিত্রকল্প তৈরি করেছে। কত না চরিত্র এসেছে ছবির মতনই। তারা অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরিয়েছে। কিন্তু এরা সবাই ক্ষণস্থায়ী অপুর জগতে। “নীল রঙের আকাশটা অনেক দূর। ঘুড়ির কুঠির মাঠটা অনেক দূর। সে বুঝাইতে পারিত না। বলিতে পারিত না কাহাকেও। কিন্তু এসব কথায় তাহার মন কোথায় যেন উড়িয়া চলিয়া যাইত।” এখানে সর্বজয়া আর দুর্গা অপুকে ছুঁতে পারে না। দিদিকে প্রশ্ন করে রেলগাড়ির কথা। কল্পনার রথে চড়ে সেখানে সে পৌঁছে যায়। এ দিগন্তরেখা যেখানে আকাশ আর মাটি মিশেছে। যেখানে তার মনন উধাও হয়।

অপু দু’টি মৃত্যুর সাক্ষী। ইন্দির ঠাকুরণের মৃত্যু– সে শুধুমাত্র সাক্ষী। তেমনভাবে কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। দুর্গার মৃত্যুই তার মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম অভিজ্ঞতা। মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম দেখা। দিদির মৃত্যু তাকে অব্যক্ত বিরহাতুর করেছে। কিন্তু অপুকে তো আরও অনেক দূর যেতে হবে। আরও ভয়ানক মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

অপু দিদির স্মৃতি গ্রামের মধ্যে ফেলে ট্রেনে চড়ে। সেই রেলগাড়ি, যা দেখা দিদির কত দিনের সাধ ছিল। সে রেলগাড়িতে চড়ে নিশ্চিন্দপুর গ্রাম, তার দিদির স্মৃতিকে ছেড়ে কোনও এক অজানা দেশে পাড়ি দিচ্ছে। “সে বলিতে চাহিল– আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি– ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি।” বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির অপু এক দেবশিশু। এক অলৌকিক শিশুর বিচিত্র পথের কাহিনি।

কিন্তু বিভূতিভূষণের স্বপ্নঘেরা বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি

বা পুনঃসৃষ্টি সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি নয়। সত্যজিতের জগৎ বিভূতিভূষণের জগৎ থেকে ভিন্ন। বিভূতিভূষণের অপু ‘‘মন্বন্তর দ্যাখে নাই, দেশভাগ দ্যাখে নাই’’ (সুবর্ণরেখা)। আর সত্যজিতের জগৎ শুরু হয়েছে সেই অমোঘ মুহূর্ত থেকে। সত্যজিৎ যখন ছবি করতে এসেছেন, তখন তিনি সরাসরি কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু যৌবন তৈরি হয়েছে চতুর্দিক বেষ্টিত বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে। যখনই তাঁকে সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, দেশে বা বিদেশে– ‘‘আপনি কি মার্কসবাদী?’’ তিনি একই কথা জানিয়েছেন বারবার, ‘‘না, আমি মার্কসবাদী নই, কিন্তু আমার বন্ধুরা সবাই মার্কসবাদী বা বামপন্থী ছিলেন।’’ অর্থাৎ এক বামপন্থী ঘরানার জলহাওয়ায় তিনি তৈরি হয়েছেন। গড়ে উঠেছেন। তাঁর মননে তৈরি হয়েছিল এক বিশেষ যুক্তিবাদী গোষ্ঠী। উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে অগ্রসর যাঁরা ছিলেন, সেই ব্রাহ্ম যুক্তিবাদের ভিতর থেকে। যুক্তিবাদ আর বামপন্থী বস্তুবাদ এক সৃষ্টিশীল মনন তৈরি করেছে। আর সেই কারণেই দারিদ্র লাঞ্ছিত বাংলার গ্রামকে দেখানোর তাগিদ মনে মনে অনুভব করেছিলেন, পাশাপাশি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চিন্তার প্রয়োগ। এই দ্বান্দ্বিকতাই পথের পাঁচালিকে মহৎ শিল্প সৃষ্টির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই, সর্বজয়া আর ইন্দির ঠাকুরণ যখন বীভৎস কলহে, তখন অপু-দুর্গা কাশবনের কাছে আখ খেতে ব্যস্ত। দুর্গা যখন মৃত্যুপথযাত্রী, ইন্দির ঠাকুরণকে দেখতে পায়। অপু তখন বাছুরকে নিয়ে টানাটানি করছে। আর বাছুরের গলায় ঘণ্টা বাজে। গভীর দুর্যোগে যখন মৃত্যু এগিয়ে আসে দুর্গার কাছে, অপু তখন ঘুমে অচেতন। হরিহর যখন দুর্গার মৃত্যু সংবাদ পায়, সর্বজয়ার রুদ্ধশোক ফেটে বেরিয়ে আসে। বাঁধ ভেঙে যায়। অপু তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। নিশ্চুপ নিশ্চিন্দিপুরে বাংলার এক অবজ্ঞাত গ্রাম্য বিয়ের দৃশ্যে “It is a long way to tippery” সুর বেজে ওঠে।

পথের পাঁচালি ছবি করার আগে মন্বন্তর হয়ে গেছে। ফ্যান দাও, ফ্যান দাও আর্তনাদ, মৃত মায়ের স্তন্যপানরত শিশু শহরকে আচ্ছন্ন করেছে। দেশভাগ বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে নিজ বাসভূমে পরবাসী করেছে। তাই বিভূতিভূষণের স্বপ্নের নিশ্চিন্দিপুরের সহনীয় দারিদ্র দেখাতে পারেননি সত্যজিৎ। সুব্রত মিত্র ক্যামেরা অনুসন্ধানী। কিন্তু কোথাও কোনও কিছুকে সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা নেই। জলের মধ্যে লতানো ফুলের উপর ফড়িং বা সাদা মেঘের নিচে সাদা কাশফুল নিজ গুণেই সুন্দর। ক্যামেরা তাকে সুন্দর করে দেখায়নি। ইন্দির ঠাকুরণ ঠাকুমার ঝুলির স্বপ্নের বৃদ্ধা নন। এক লোলচর্ম বুড়ির শীর্ণ হাতে বাটিতে ভাত চটকানো বা সর্বজয়ার ঘৃণাভরা চোখ মোটেই নয়ন শোভন মনোরম নয়। কিংবা হরিহরের কালো দাঁত থেকে মাছের কাঁটা বার করা কোনও রোমান্টিক ক্যামেরা কোণের আবিষ্কার নয়। নিতান্তই নির্মম বাস্তব। তবু বিভূতিভূষণ বারবার ফিরে এসেছেন। শ্রীহীন দরিদ্র সংসারের পোড়া ভিটে আর ভাঙা দরজার মাঝখানে ইন্দির ঠাকুরণের দন্তহীন গাল ভাঙা হাসি আর পুকুরে পদ্মপাতার উপর হাওয়াদের আনাগোনা বিভূতিভূষণের। বিভূতিভূষণকে আমরা পাই দুর্গার মৃত্যুর পর দিন জলে মরা ব্যাং, কুকুরের গা ঝাড়া দেওয়ার দৃশ্যগুলিতে। বাস্তব যা তেমনই শুধু নয়, তার বাইরে এক স্বপ্নের জগতের ভিতরে। এই দ্বান্দ্বিকতা, যার উৎস আইজেনস্টাইনের dialectical montage বা দ্বন্দ্বমূল মন্তাজতত্ত্ব, তা চলচ্চিত্রায়িত পথের পাঁচালিকে মানব ইতিহাসের দলিল করতে সাহায্য করেছিল।

কেন সত্যজিৎ তাগিদ অনুভব করেছিলেন পথের পাঁচালির পুনঃসৃষ্টিতে? ‘ঘরে বাইরে’ ত্যাগ করে? হোক না সাময়িক, তবু? কেননা তাঁর নব্যবস্তুবাদী দর্শন আর বামপন্থী পরিবেশ অনুভব করেছিল, গ্রামবাংলার বঞ্চিত দারিদ্রমোড়া জীবন এর আগে কোনও দিন বাংলা চলচ্চিত্রে আসেনি। গ্রামবাংলা যেন সোনার তবকে মোড়া, ‘বাংলার বধূ–মুখে তার মধু’– এই ছিল সাবেক বাংলার গ্রামের ছায়াছবি। সত্যজিৎ সেই গ্রামকে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে অপু সেজেগুজে পাঠশালা যায়, দুর্গা তখন উঠোনের ধুলো ঝাঁট দেয়। সে দিনের বাংলার গ্রামের মেয়েরা পাঠশালায় যাওয়ার অধিকার পায় না। এই গ্রামকে সত্যজিৎ দেখিয়েছেন, যা বাংলা বা ভারতীয় চলচ্চিত্রে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি। তবে তিনি কেন ননী ভৌমিক বা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের কলমে আঁকা গ্রামকে বেছে নিলেন না? সে তো আরও নিষ্ঠুর। আরও নির্মম গ্রাম। কেন বিভূতিভূষণ? কেন পথের পাঁচালি? কেননা সত্যজিৎ প্রথাসিদ্ধ মিছিলে হাঁটা মানুষ ছিলেন না। রাবীন্দ্রিক আর শান্তিনিকেতনীয় ব্রাহ্ম পরিবেশ তাঁকে সুন্দরের উপাসনা থেকে দূরে রাখতে পারেনি। রোমান্টিকতা তাঁর আজীবন সাথী ছিল। পথের পাঁচালি থেকে আগন্তুক পর্যন্ত। আর এই প্রকৃতি আর মানুষের মহামিলনের কথা এমন করে কে আর বলতে পেরেছেন বিভূতিভূষণ ছাড়া? আর সেই কারণেই সত্যজিতের পথের পাঁচালি বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির পুনঃসৃষ্টি বা পুনরাবৃত্তি না হয়েও বিভূতিভূষণের উপস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

কিন্তু বিভূতিভূষণের অপু কোনওভাবেই পথের পাঁচালির অপু নয়। বিভূতিভূষণের অপুর অসাধারণত্ব; তার প্রকৃতির ভিতরের ডাক শোনার আকুলতা এবং শুনতে পাওয়া। পথের পাঁচালির অপু গ্রাম বাংলার একটি সাধারণ শিশু। সে গ্রামবাংলার যে কোনও শিশুর প্রতিনিধি হয়েছে। এক ক্লাসিক উপন্যাসের নায়ক হতে পারেনি। এই সীমাবদ্ধতা কিছুটা সত্যজিতের আর অনেকটাই চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার সীমাবদ্ধতা। কলমের ভাষা এক চরিত্রকে যে অনির্বচনীয় অলৌকিকত্বে পৌঁছে দিতে পারে, চলচ্চিত্রের নিছক দৃশ্যময়তা তাকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনে।

সত্যজিৎ এ কথা অনুভব করেছিলেন। সেই কারণেই সেই বিশ্বখ্যাত কাশবনের ভিতর দিয়ে অপু-দুর্গার আকাশ কালো করা রেলগাড়ি দেখার দৃশ্য তাঁকে রচনা করতে হয়েছিল। জানি মূল উপন্যাসে দুর্গার রেলগাড়ি ‘দেখা হয় নাই’। কিন্তু সত্যজিৎ দুর্গাকে রেলগাড়ি দেখিয়েছেন। প্রকৃতি আর বিজ্ঞান গ্রামবাংলার আগামী দিনের গ্রামের ভবিষ্যৎকে চিহ্নিত করেছে। অপু সেই আগামী দিনের ‘নায়ক’ হওয়ার দিকে এগিয়েছে।

পথের পাঁচালি বাংলার শিল্প মানচিত্রের হীরকসম রত্ন। আমরা অনেক মহৎ উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত রূপ দেখেছি। ঘরে বাইরে, পদ্মানদীর মাঝি, দিবারাত্রির কাব্য, অন্তর্জলি যাত্রা ছবির পর্দায় এসেছে। অশনি সংকেতও।

কিন্তু একমাত্র পথের পাঁচালি মহৎ উপন্যাস আর মহৎ চলচ্চিত্র। হ্যাঁ, একমাত্র পথের পাঁচালি।

মহামারীর কালনাট্য: চার অ্যানেকডোট

চন্দন সেন

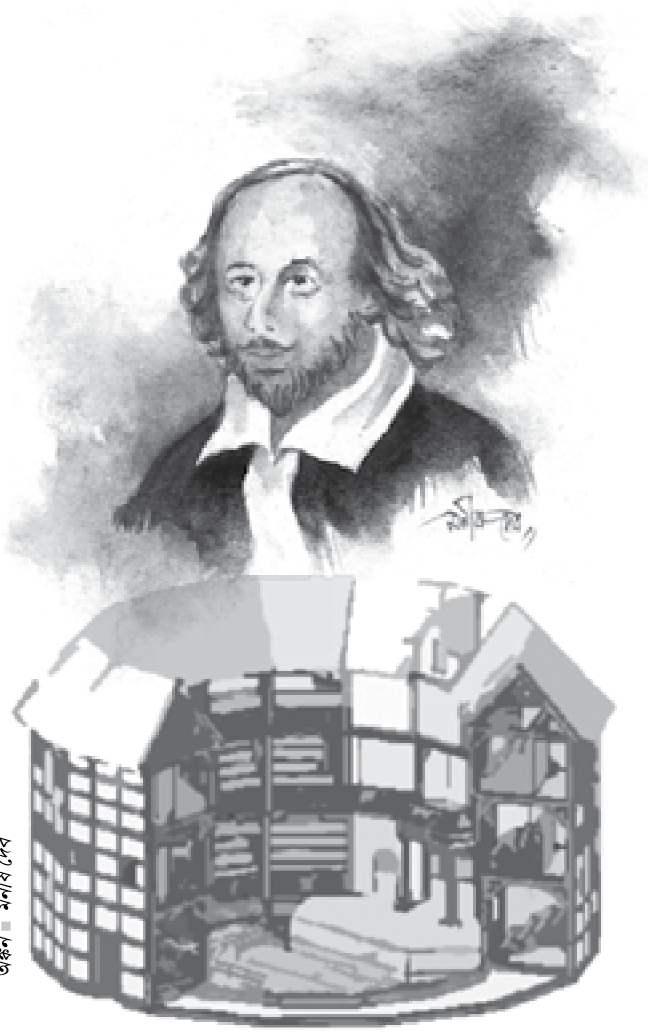

অঙ্কন ■ মণীষ দেব

অ্যানেকডোট-১

মহামারীর সাময়িকভাবে অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রধান মুখগুলোর বিবর্তন ঘটেছে কালের নিয়মে। ১৫৭৭-এর যখন এক অদ্ভুত মহামারীর প্রভাবে লন্ডনের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল প্রতিষেধকহীন চিকিৎসাহীন শত শত মানুষের মৃতদেহ, তখন চার্চ ও পৌরসভা একযোগে বিধান দিল, যত নষ্টের মূলে থিয়েটার হল আর তার মধ্যে নিয়মিত হাজির হওয়া 'মাতাল', 'লম্পট', 'ঈশ্বরদ্রোহী' দর্শক আর মঞ্চের ওপর অভিনয় করে মনভোলানো চরিত্রহীন, নীতিহীন, একদল ব্যভিচারী অভিনেতা আর, 'বেশ্যা' অভিনেত্রী। চার্চে প্রার্থনা সভায় লোক এখন কম হয়, নিষিদ্ধ ফলের খোঁজে ভিড় বাড়ে থিয়েটারে। দিনের পর দিন ঈশ্বর এই পাপ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে এমন রহস্যময় এক জীবনঘাতী রোগ লন্ডনে পাঠিয়েছেন; পাঠিয়েছেন ওইসব 'পাপী দুষ্টদের' বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতে। এতএব 'থিয়েটার হল' বন্ধ করে দেওয়া হোক। হলোও তাই। ব্রিটেনের রাজশক্তির সঙ্গে চার্চের অঘোষিত লড়াইয়ে থিয়েটারি বিনোদনপ্রেমী রাজশক্তি তখন কিছুটা ব্যাকফুটে। আশাহত শেকস্‌পিয়র কয়েকজন সহমর্মীকে নিয়ে বাইরে ক'বছর কাটিয়ে যখন লন্ডনে ফিরে এলেন, তখন ওই মহামারী (পরে যার নাম জানা যায় প্লেগ) অনেকটা স্বাভাবিক নিয়মেই হীনবল, রহস্যময় ভাইরাসের মারণ থাবা কিছুটা কমে গিয়েছে। এর মধ্যেই তিন তিনটে দারুণ কমেডির খসড়া প্রায় শেষ করে ফেলেছেন শেকস্‌পিয়র আর কিং লিয়ারের ভাবনাও গেড়ে বসেছে তাঁর সৃজনী আবেগে। চার্চ তখনও নিদান দিয়ে যাচ্ছে, 'খবরদার' ধর্মপ্রাণ নাগরিকবৃন্দ, মহামারীর নামে ঈশ্বরের অভিশাপ থেকে মুক্তির ব্যবস্থাপনায় আমরা আর আমাদের অনুগত, পৌরকর্তারাই আসল রক্ষাকর্তা। আর কোনোদিন থিয়েটার হল খুলবেন না, কেউ হলে যাবেন না।' প্রতিভাধর শেকস্‌পিয়র কিছুদিন দেশের বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এখনকার অর্ধশিক্ষিত তোষামুদে শাসকভক্ত ইন্টেলেকচুয়ালের মতো চার্চভক্ত বা তেলবাজ 'মহাজ্ঞানী' Robert Green বলে বসলেন, ওই নাটুকে শেকস্‌পিয়রটা হচ্ছে 'upstart crow' 'ভুঁইফোড় কাক'– খবরদার ওর কথায় আবার থিয়েটার হলে গিয়ে ভিড় করবেন না। 'The comedy of errors', 'Two gentlemen of Verona' আর 'Taming of the shrew'-র প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিগুলো বগলে নিয়ে লন্ডন ফেরত শেকস্‌পিয়র বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের গুটি সাজাচ্ছিলেন, বুঝতে পারছিলেন, থিয়েটারের বেঁচেবর্তে থাকতে গেলে এখন একটা পালটা

শক্তি বা দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন। ওই সময়ের সব বিষয়ে আধিপত্যবাদী লন্ডনের চার্চ আর তার মতলববাজ সহযোগীদের উপর বিরক্ত রাজা প্রথম জেমস নির্ভুলভাবেই চিনে নিলেন একসময়ের থিয়েটার হলে আসা দর্শকদের ঘোড়া রাখার আস্তাবল থেকে উঠে আসা নাট্যপ্রতিভা শেকস্‌পিয়রকে। তাঁর প্রশ্রয়েই থিয়েটার হলে শেকসপিয়রের নাটক দেখতে আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছিল। মহামারীর বিরুদ্ধে ধর্মাশ্রয়ী যুদ্ধের মুখ লন্ডনের চার্চ আর অপদার্থ অকম্মা পৌরকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা আর অনুশাসন উপেক্ষা করে প্রথমে অল্প ক'জন যারা হল থেকে বিস্ময় আর বিমুগ্ধতা নিয়ে ফিরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-জনদের ডেকে আনতে লাগল, অবিলম্বে দর্শকে ভর্তি হয়ে গেল থিয়েটার হল। বুদ্ধিমান শেকস্‌পিয়রের তখন হলের মধ্যে ও বাইরে রাজকীয় ঘোষণা– মহান ঈশ্বর চাইছেন যাবতীয় অস্বস্তি অসুখ জড়তা দূর করে তাঁর সৃষ্টির আলোয় মানুষ আনন্দে আর সংকল্পে রোগ-শোক মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাক। রাজা জেমস বুঝলেন, বুদ্ধিমান শেকস্‌পিয়র এমন গল্প নিয়ে নাটক করছে বা করবে যার পিছনে শতাব্দীর মান্যতাপ্রাপ্ত ইতিহাস আর পবিত্র হৃদয় নিয়ে আকৈশোর শোনা ক্রনিকলস। শেকসপিয়রের নজরে পড়েছে বিশেষ করে হলিনশিন্ডের ক্রনিকলসের ওপর। যার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজা রানি, শয়তানি লাম্পট্য, ভূত-পেত্নী, নাচ-গান, শেষ পর্যন্ত পূণ্যের জয় আর শয়তানের হার। বোঝা গেল ঈশ্বরের নামে শপথ নেওয়া ধান্দাবাজ অকর্মা পৌরকর্তা কিংবা পবিত্র যীশুর নাম নিয়ে নিজস্ব স্বার্থে আধিপত্য চালানো চার্চের এতকালের কথা শেষ কথা নয়। শেকস্‌পিয়র তার নাটকে আক্রমণ চালালেন ঈশ্বরকে নয়, যীশুকে নয়, সামাজিক লুণ্ঠন আর নির্বিচার রক্তপাত ঘটিয়ে চলা সামাজিক ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে। "As flies to the wanton boys, are we to the gods, they kill us for their sports". (king Lear) যেভাবে দুষ্টু ছেলেগুলো ফড়িংদের খেলার ছলে মেরে ফেলে, আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদেরও খেলতে খেলতে মেরে ফেলছে সমাজের নিষ্ঠুর দেবতারা (শেকস্‌পিয়রের কথায় gods, God নয়)।

অ্যানেকডোট-২

শেকস্‌পিয়রের আগেও মহামারীর কথা নাটক পড়ে দারুণভাবে জানা গিয়েছিল, যখন মহান গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিস লিখে ফেললেন রাজা ইডিপাসের পরিচিত আখ্যান নিয়ে এক কালজয়ী ধ্রুপদীনাট্য। সেখানেও দেখি, গ্রিক সভ্যতার অবিস্মরণীয় নিদর্শন, দারুণভাবে সাজানো সুন্দর শহর থিবস শেষ হয়ে যাচ্ছে এক রহস্যময় মহামারীর অন্তহীন মারণ খেলায়। কবর দেওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে অসহায়ভাবে পড়ে থাকছে মৃত মানুষ। এত মৃত্যু, কেউ নেই শোক করার, মৃতদেহকে সামনে রেখে কাঁদার বা কবর দেওয়ার, সব্বাই পালাচ্ছে। চারিদিকে পড়ে থাকা, পচতে থাকা মৃতরাই আরও মৃত্যুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

"Thebes is dying, so many deaths,
Numberless deaths on deaths...
Generations strewn on the ground
Unburied, unwept, the dead spreading death"

এই মহামারীর পেছনে কে? দেবতা অ্যাপোলোর অভিশাপ। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকের মতো বিবেকের মতো, নির্মম সত্যের অনুধাবক কোরাস এসে জানিয়ে দেয় ইডিপাসের অস্তিত্ব নিয়তি-নির্দিষ্ট অভিশাপের ব্যাধি। অ্যাপোলোর অভিশাপ, মহামারীর অভিঘাতে এত মৃত্যুর অভিশাপ আসলে রাজা ইডিপাসের অজ্ঞাতসারে বেপরোয়া বাসনা নিবৃত্তির ফলশ্রুতি। শেষ পর্যন্ত নির্মম সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে খুবলে নেওয়া এক সময়ের পিতৃঘাতী ও পরবর্তী সময়ে মাতৃশয্যা অপবিত্রকারী ইডিপাসের অনুতাপ আর বিলাপ। কোরাসের পিতৃঘাতী ও পরবর্তী সময়ে মাতৃশয্যা অপবিত্রকারী ইডিপাসের অনুতাপ আর বিলাপ। কোরাসের দিকনির্দেশনায় জানা গেল এবার থিবস নগরী সব রকমের মহামারী মুক্ত হবে এক মর্মান্তিক ট্রাজেডির মূল্যে। যে মহামারী "...Plague the fiery God of fever lash down on the city raging plague in all its vengeance..." সেই মহামারী থেকে অনেক মৃত্যু আর্তনাদ আর অনুতাপের মূল্যেই নগরী থিবসের মুক্তি।

অ্যানেকডোট-৩

সাহিত্য থেকে চেনা ভূগোলের ইতিহাসে চোখ রাখা যাক। ইতিহাস বলছে হাজার ১৯১৮-২০ এই দু'বছরে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস ("outbreak of an unusually deadly influenza pandemic") যে রহস্যময় অচেনা নতুন মহামারী ডেকে আনে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাভর্তি জাহাজে আরোহী হয়ে ঘরে ফেরা সৈনিকদের দ্বারা সংক্রমিত)– তার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া প্রভাবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ (১৪-১৭ মিলিয়ন দেশবাসী) বিনা চিকিৎসায় প্রতিষেধকহীনতায় মরে পড়ে রইল রাস্তায়, ঘরের মধ্যে বা বাইরে। শহর থেকে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসহায়ভাবে পড়ে থাকছিল লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ। শোক জানাবার কেউ নেই, শেষকৃত্যের কেউ নেই। অজানা ভাইরাস (পরে যার নামকরণ হয় স্প্যানিশ ফ্লু ভাইরাস) গ্রাম-শহরের ২০ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক মানুষদের উপর (বেশিরভাগ মহিলা) মারণথাবা বসাচ্ছিল। সেই সময়ের বিখ্যাত হিন্দি কবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী লিখলেন– "গঙ্গাবক্ষে ভেসে যায়, যায় ভেসে অন্তহীন শবের মিছিল।" ডাক্তার কবিরাজ লাখ লাখ খালিপদ গ্রামীণ চিকিৎসকরা দিশাহারা হয়ে চিকিৎসার উপায় খুঁজছেন। আর মানুষকে বলছেন মৃতদেহ ধরবেন না, কাছে যাবেন না, দূরে থাকুন। দূরে থাকুন। ব্রিটিশ রাজপুরুষরা দু'পাশে পুলিশ মিলিটারি নিয়ে গালাগাল খাচ্ছেন, সাময়িকভাবে তাদের লুটপাটের রাস্তাগুলো জটিল হচ্ছে, তবু দেশবাসীকে কোনও জ্ঞান দেওয়ার বা দেশবাসীর মন ভেজাতে মহামারীকে মোকাবিলা করার উপায় বাতলে দিতে অনর্থক এগিয়ে আসছেন না। তখন সমবেত আর্তনাদ আর কান্নার শব্দে হারিয়ে গিয়েছে মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার প্রাত্যহিকতা। বিনোদন বা থিয়েটার নিয়ে কেউ ভাবে না। এই প্রথম দেশের সেন্সাস রিপোর্টে (১৯১১-১৯২১) জনসংখ্যা কমে গেল প্রায় ২ শতাংশ। নিরুপায়ভাবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা মৃত্যুভয়ে বিব্রত বিধ্বস্ত নাট্যকর্মীরা কিন্তু সেই বিনোদনশূন্য আতঙ্কপীড়িত আবহাওয়ার মধ্যে নতুন দিনের স্বপ্ন, মৃত্যুর মিছিলের দিকে না তাকিয়ে জীবনের মিছিলের স্বপ্ন দেখছেন। কেরালা সাহিত্য আকাদেমির বিশিষ্ট কর্মকর্তা ইপি রাজাগোপালন মালাবার অঞ্চলে মহামারীর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে ১৯১৮-তে কোট্টালামের আর্য বৈদ্যশালার প্রধান মানুষটি সঙ্কট কেটে যাওয়ার আর সঙ্কটের বিরুদ্ধে নতুন প্রতিষেধক আবিষ্কারের অপরাজেয় স্বপ্ন নিয়ে নাটক তৈরি করেছেন। এই নাটকে দেখিয়েছেন, আর্যশালার প্রধানের চিকিৎসা বিজ্ঞানের লড়াকু স্বপ্ন আর মানুষের দুর্জয় সৃজনস্বপ্ন ১৯১৮-র মারাত্মক মহামারীর আবহেও অক্ষুণ্ণ ছিল। মহাত্মা গান্ধী ভাইরাস আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু রহস্যময় রোগ প্রতিরোধে তিনি যুক্তিহীন বাণী

বিতরণ করেননি। অসহায়দের সামনে ছাত্রজীবন ও অধ্যাপক জীবনের ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারীর আতঙ্ককে আমল না দিয়ে অধ্যাপনারত শিশির কুমার অচিরেই অধ্যাপনা ত্যাগ করে অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করছেন এবং ম্যাডান কোম্পানির রঙ্গালয়ে 'আলমগীর' নাটকে অবতীর্ণ হলেন ওই সঙ্কটের রেশ কাটতে না কাটতেই (১৯২১)। মানসিক প্রস্তুতি ১৯১৮ থেকেই নিচ্ছিলেন শিশির কুমার। ব্রিটিশরাজ পোষিত সংবাদপত্রে ছড়িয়ে পড়ছে মহামারীর খবর। কিন্তু সেখানে কোনও রাজার বাণী নেই বা ছবি নেই। ১৯২০-তে প্রকাশিত হচ্ছে বিপন্ন দেশ আর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশান্তর নিয়ে নিত্যসচেতন রবীন্দ্রনাথের নাটক 'অরূপরতন' ("আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়")। এত বড় দেশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জেলায় স্প্যানিশ ফ্লু'র মারণ থাবায় ১৩.৮৮ মিলিয়ন লোক শেষ হয়ে গেল। সাধারণ বিপন্ন মানুষ ভাবছে এই নিরুপায় মৃত্যুবরণ আসলে সঙ্কটে নীরব, নিষ্ক্রিয় ব্রিটিশরাজের অপশাসনের ফল। ১৯২০-র পর এই মহামারীর মারণথাবা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল। পরে প্রতিষেধকও বার হয়ে গেল নিরলস চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণায়।

অ্যানেকডোট-৪

সংক্ষিপ্ততম খণ্ড চিত্রাবলী

ঘটমান বর্তমান নিয়ে প্রায় একঘেয়ে খবর, তর্ক-বিতর্ক, নিত্য পরিবর্তনশীল স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপদেশ এবং সকাল-সন্ধ্যায় গেঁজে ওঠা (ফারমেন্টেড) বিনোদন শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে ঘরবন্দি মানুষের বড় অংশই এখন বিরক্তিতে অবসাদের শিকার।

দুনিয়াজুড়ে এখনো অপ্রতিরোধ্য করোনা সংক্রমণের পাশাপাশি আক্রান্তের আর মৃত্যুর সংখ্যায় 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' অনাধুনিক কবির এই অলৌকিক সদিচ্ছাকে একটু অন্যভাবে বাস্তবায়িত করতে নেমেছে আধুনিক 'দেশপ্রেমিক' প্রশাসন।

দুটি অভিনব ঘটমান বাস্তব।

আধুনিক সভ্যতা বা এতকালের জীবনযাপন পদ্ধতিকে তছনছ করে দেওয়া এই মারণ ভাইরাসের মোকাবিলার জন্য 'কি করিতে হইবে'– বিধান শোনানোর অপরিবর্তনীয় মুখ এখন রাষ্ট্রের ও রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রধান। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী, মহামারী নিয়ে অক্লান্ত গবেষকদের বক্তব্য, পর্যবেক্ষণ বা পরামর্শের জন্য নামী খবরের কাগজের পাতায় বা টিভি'র পর্দায় গৌণ স্পেস নির্দিষ্ট। নগদ (জন) স্বার্থে প্রথম পাতায় বা খবরের শিরোনামী পর্দায় অক্লান্ত ও অবিশ্রান্তভাবে দৃশ্যমান দুই মুখই করোনা মোকাবিলায় সুরেলা বরাভয় দিয়ে চলেছেন, যেন নিত্য দর্শিত সহাস্য মুখে তাঁরা রবি ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় গেয়ে চলেছেন। দিনের শেষে ঘুমের দেশে যাওয়ার পথে নিয়মিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও দৈনিক আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সংক্রান্ত খবর পরিবেশনকারী দু'-একজন কৃতী প্রবীণ 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রশাসন কর্তার মলিন মুখের ধারাবিবরণী এবং পরে বাংলার সেরা কয়েকজন গায়ক-গায়িকার কম্বুকণ্ঠে নামী (অনুপ্রাণিত) প্রকাশকের ৭৫টি বেস্ট-সেলার প্রণেতা প্রশাসনিক প্রধানের রচিত ও সুরারোপিত গান শুনতে শুনতে করোনায় এবং ভোট-যুদ্ধজয়ী ভোরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

অন্তিমের দ্বিতীয় বাস্তব। ক্ষমতায় ও প্রতিপত্তিতে অনেক বিশাল স্পেসের স্বতঃস্ফূর্ত মাহাত্ম্য নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান, যাঁকে এই মহাসঙ্কটে ১৩৫ কোটি দেশবাসীর সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে হয়, এত বিশাল দেশের সমস্ত বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে সর্ব দুঃখ ব্যাধিসঙ্কটহরণ রামমন্দিরের পবিত্র শিলান্যাস করে আরতি দিতে হয় ৫ আগস্ট আর মাত্র দশ দিন পর লালকেল্লা থেকে আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণা শোনাতে হয়, তিনি এক নয়, দুই নয়, তিন তিনটে ভারতীয় ভ্যাকসিন নির্মাণের (রসায়নাগারে তৈরি মারণ ভাইরাস জব্দের) উপায় এবং অদূর ভবিষ্যতে স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করতে হয়। স্বাধীন ভারত আর কারোর কাছে কোনও কিছুর জন্যই হাত পাতবে না। বাংলার প্রতি ঘরেও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত করোনা মোকাবিলার ধর্মাত্মক ও সর্বাত্মক উদ্যোগের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ফ্রি রেশন আমৃত্যু এই সর্বাত্মক সঙ্কটে ক্ষুধা মোকাবিলার ঘোষণা করতে হয়। ওদিকে নির্বাচন কমিশন সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে মহাব্যস্ত। কারণ ক'মাসের মধ্যেই এই বাংলাসহ পাঁচ রাজ্যে ভোট। কবি টেনিসন তার বিখ্যাত ছোট নদী (Brook) কবিতায় লিখেছিলেন, "Men may come and Men may go but I go, on forever" যতই মহামারী হোক, হাজার হাজার মৃত্যু, আর্তনাদ, অসহায় অসহযোগী অবস্থার শোচনীয়তায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, ভোট হবেই। তাই ভোট ও করোনা মোকাবিলা পরস্পর নির্ভরশীল জরুরি উন্মাদনা হয়ে উঠুক। আমরা যারা নাটকের মানুষ তাঁদের ভবিষ্যৎ– প্রত্যয়ের জন্য আছেন সফোক্লিস থেকে শেকসপিয়র, ব্রেখট থেকে রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের সৃজনশীল স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় আমরা বিশ্বাস করি। করোনা সঙ্কট একদিন কেটে যাবে, তখন আবার সমাজজীবন ও থিয়েটার একসঙ্গে আঁধারের ক্ষতিচিহ্ন বুকে নিয়েই নতুন ভোর দেখবে। ওদিকে করোনায় সর্বোচ্চ মৃত্যুসংখ্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিনা মাস্কে বলতে শোনা যাচ্ছে, অচিরেই আমরা প্রতিষেধক আনব, চীনের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই, সেই প্রতিষেধক আমাদের বন্ধুদের দেশে পাঠিয়ে দেব। গর্বাচভের যোগ্য উত্তরাধিকারী পুতিন সাহেব বলছেন, রাশিয়া করোনার টিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে। এবার আমরা দুনিয়ার দিকে দিকে তা ছাড়ব। ব্রিটেন বা ফ্রান্স সরকারও পিছিয়ে নেই– এই মহামারীর সঙ্কটের দুনিয়ার এতদিন আধিপত্য ও অধীনতাবিস্তারকারী সুপার পাওয়াররা বুঝে ফেলেছে তাদের এত সাধের এত লাভের অস্ত্রব্যবসার দিন গেল, এখন দ্রুত ডেকে আনা হোক বিশ্বস্ত বিজ্ঞানীদের। বড় হয়ে উঠুক ভ্যাকসিন বাণিজ্য কিংবা স্বাস্থ্যব্যবসা (তথ্যসূত্র : ২০১৮-র মার্চে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বিল গেটস-এর সাক্ষাৎকার এবং ২০২০-র ১২ মার্চ দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লরেন্স ডডস-এর সংবাদ প্রতিবেদন)।

কিন্তু শেষ কথা এত সিরিয়াস হবে কেন? করোনা মোকাবিলায় রাজনীতি বা ভোটের বাজারের অভিমুখের পাশাপাশি একটু কমিক রিলিফ দিয়ে এই আলোচনা শেষ হোক। সম্প্রতি ফেসবুকে একটি সঙ্কট মোচন বার্তা ঘুরছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের তরুণ এক সর্বজ্ঞ মুখ্যমুখ নাকি একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সবাইকে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে বলেছেন, কারণ তিনি জানেন, অজ্ঞরা জানে না, জনসঙ্ঘ (অধুনা বিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিরচিত সঙ্গীতই হচ্ছে শ্যামাসঙ্গীত।

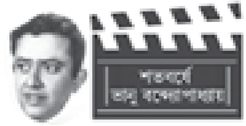

কমেডিতে এনেছিলেন অভিনবত্ব

নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর লেখা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওঁর সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন, সেটা দিয়ে শুরু করি। তিনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অতি প্রিয় নাম বাঙালির কাছে। শুধু যদি জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে দেখতে হয় তাহলে সেখানেও গত ত্রিশ বছরে তার তুলনায় জনপ্রিয় অভিনেতা কমই হয়েছে। উনি হলেন কিংবদন্তি, একটি প্রতীক, একটি ভাবমূর্তি। বাঙালি মধ্যবিত্ত তাড়িত-পীড়িত ব্যস্ত জীবনের কৌতুকদীপ্ত ভাবমূর্তি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যেমন উজ্জ্বল তেমন খুব কম অভিনেতার অভিনয় দেখেছি। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বললে তাই শুধু একটা হাসাবার যন্ত্র মনে পড়ে না – একটা জীবন সম্পর্কে, একটা জীবনধারণের মন্তব্য মনকে ছুঁয়ে যায়। আর সব থেকে তৃপ্তিদায়ক হলো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিনয়শৈলী দিয়ে জীবনভাবনা প্রকাশ করেছেন, সেটা ঘোর বাঙালি। অনেক শক্তিমান বলা ভালো স্বকীয়তার মধ্যে বাঙালিয়ানার জারকে তা পরিপাক হয়ে গেছে। এই জন্য এদের তুলনারহিত জনপ্রিয়তা। এই কারণে হয়তো ছ'দশক ধরে উত্তম-সুচিত্রার মতো কিংবা হিসাব করলে দেখা যাবে তার থেকেও বেশি করে ভানু-জহরও ছিল বাংলা ছবির একটা অত্যাবশ্যক institution অবর্জনীয়-অনিবার্য অঙ্গ। একটা ভূমিকার মধ্যে যে পরিমাণ energy উন্মাদনা এঁরা জন্ম দিতে পারেন তার সমকক্ষ বিরল।’’

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য সদ্য একশো বছর পার করে দিলেন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা আজও অটুট। ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা নবাব স্টেটের আইনি পরামর্শদাতা মা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। বাবার নাম জীতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা সুনীতিদেবী। বাবা-মা ওঁর নাম রেখেছিলেন সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা যায়, যখন সাম্যময়ের ছয়-সাত বছর বয়স সেই সময় ওঁকে ভর্তি করা হয় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। যখন ও ক্লাস সিকসে, তখন থেকেই তিনি রাজনীতির এবং অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। ওই সময় স্কুলে একটি অনুষ্ঠানে নাটক মঞ্চস্থ হয়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ‘বনবীর’ নাটকে উদয় সিংহর ভূমিকায় অভিনয় করেন। যাইহোক ওই সময় তিনি বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর সান্নিধ্য লাভ করেন। ক্রমে উনি অনুশীলন দলের সদস্য হন। ওদের যাবতীয় গোপন কার্যকলাপেরও সদস্য হন। গোপন চিঠিপত্র আদানপ্রদান, পুলিশদের খবরাখবর উনি ওদের অর্থাৎ বিপ্লবীদের দিতেন। এইজন্য ওকে সেই সময় বেশির ভাগ সময় স্টিমার ঘাটে মাঝিমোল্লা এবং এক্কাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে মিশতে হতো। তার ফলে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ওই অভিজ্ঞতাকে অভিনয়ের কাজে প্রয়োগও করেছিলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রাজনীতি সমাজ, অর্থনৈতিক জ্ঞান তার অভিনয় জীবনের পাথেয় হয়ে উঠেছিল। উনি কখনও পূর্ববঙ্গের ভাষাকে ভোলেননি। ছবিতে অথবা পেশাদারি মঞ্চে উনি এই পূর্ববঙ্গের ভাষাই ব্যবহার করতেন। এমনকি লোকজনের সঙ্গে কথাও তিনি পূর্ববঙ্গের ভাষাতেই বলতেন। এটা একটি বিরাট গুণ।

বৈপ্লবিক কার্যাবলীর সঙ্গে ঢাকার কুট্টি অর্থাৎ এক্কাগাড়ির চালকদের রসবোধ এবং ভাষার ব্যবহার রপ্ত করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ব্যবহার করতেন। এর ফলে যে বাঙালিয়ানার জন্ম সূচিত হয়, তাকে পাথেয় করে তিনি কমেডিতে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছেন এবং নিজেও জনপ্রিয় হয়েছেন। যাইহোক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপ্লবীদের গোপন চিঠিপত্র এবং নানাবিধ কাজের জন্য নিজেও অনুশীলন দলের সভ্য হন এবং বিদ্যালয়ে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। অনিয়মিত হয়ে পড়েন, ফলে তাঁকে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় এবং বাড়িতে পড়াশোনা করে ম্যাট্রিকুলেশন প্রাইভেট পরীক্ষা দেন এবং পাশও করেন। এরপর উনি জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ওইখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে বাচালের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।

দর্শকদের মধ্যে অধ্যাপক সত্যেনবাবু, কবি জসিমুদ্দিন, মোহিতলাল মজুমদাররা উপস্থিত ছিলেন। ওই বছরই তিনি ঢাকা বেতারে অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম বেতার নাটক হলো 'দুনিয়ার হাল'। ওঁর ঢাকা বেতারে 'রেশমী রুমাল'-এ অভিনয় ওঁকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে দেয়। কিন্তু ঢাকা শহরে ওঁকে বেশিদিন ব্রিটিশ সরকার থাকতে দিল না। যখন উনি বিএ পরীক্ষা দিতে যাবেন, ১৯৪১ সালে সেই সময় ওঁকে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে ঢাকা শহর থেকে বহিষ্কার করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। উনি কলকাতায় চলে আসেন, পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না। কলকাতায় প্রথমে বাদল গাঙ্গুলির বাড়িতে আশ্রয় নেন। এবং আয়রন অ্যান্ড স্টিল কর্পোরেশনে চাকরি নেন। সামান্য কেরানির চাকরি। ওঁর সহকর্মী ছিলেন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় দাশু মিত্র। ১৯৪৬ সালে উনি সঙ্গীত শিল্পী নীলিমা মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ওঁর প্রথম সিনেমায় অভিনয় বিভূতি চক্রবর্তীর 'জাগরণ' ছবিতে। বিভূতিবাবু প্রথমে ক্যামেরাম্যান ছিলেন পরে পরিচালক হন। 'জাগরণ' ছবি থেকেই সাম্যময় নামের বদলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে ওই নামেই উনি পরিচিত হন। আমৃত্যু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই ওঁর পরিচয় ছিল। যাইহোক, 'জাগরণ' ছবিটি খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের সুখ্যাতি হয়েছিল। এরপর সুশীল মজুমদারের 'সর্বহারা' ছবি এবং পরে 'পাশের বাড়িতে' ওর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। প্রায় তিনশোরও বেশি ছবিতে উনি অভিনয় করেছেন। এছাড়া বোম্বেতে হিন্দি ছবিতেও উনি অভিনয় করেন। ছবি দুটির নাম 'বান্দিশ' এবং 'এক গাঁও কি কাহিনী'। বাংলা পেশাদারি মঞ্চে নাটক অভিনয় শুরু করেন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটক দিয়ে। বিভিন্ন পেশাদারি মঞ্চে তিনি প্রায় আট-ন'টা নাটকে অভিনয় করেন। ওঁর কৌতুক নকশার গ্রামাফোন রেকর্ডের সংখ্যা ৩৪টি। এর মধ্যে একটি কৌতুক নকশা, এদেশি ভাষায় করা নাম 'কথোপকথন'। যাত্রা করেছেন ১২ টি পালা। বোধহয় ভারতবর্ষে ওঁর চেয়ে বেশি বিনোদনে সবরকম শাখায় এত বেশি কেউ অভিনয় করেনি। ১৯৮৩ সালে মার্চ মাসে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন। ওঁর দুই পুত্র, এক কন্যা বর্তমান। নাম গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কন্যা বাসবী বন্দ্যোপাধ্যায়। পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকায় থাকেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যদি শুধু অভিনেতা হতেন, তবে এতদিন লোকে মনে রাখত না। তিনি ছিলেন বাঙালির কাছে একটা institution। একটা ছবি দিয়ে বিচার করলে সেটা বোঝা যাবে না; সৌমিত্রের মতে ''ছবির পর ছবি জুড়ে বাঙালি জীবনের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনের একটা চেহারা তিনি বাঙালি দর্শকের কাছে উপস্থিত করতে পেয়েছেন।'' যে মধ্যবিত্ত তার জীবন সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত ও তাড়িত। সে হেরে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় জব্দ হচ্ছে, কিন্তু তবু সে হার মানছে না। এই যে বাঙালি মধ্যবিত্তের ছবি, সৌমিত্রর মতে এটারই একটা পরিহাস উজ্জ্বল চেহারা গত ত্রিশ বছর ধরে সৃষ্টি করেছেন। ভানু ব্যানার্জির কথা বলার ধরন সেটা স্বাভাবিকের দিকে ঘেঁষা– মনেই হয় না তিনি অভিনয় করছেন। সবচেয়ে বড় কথা বৈচিত্র। ভানু ব্যানার্জি কত বৈচিত্রের অধিকারী এবং এই অভিনয়ে বৈচিত্র ছিল বলেই তিনি তিনশোর বেশি ছবিতে অভিনয় করতে সক্ষম হয়েছেন। সেইদিক থেকে ওর পাশে জহর এবং রবি ঘোষও ম্লান।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ সেই কিশোর বয়স থেকে, সেই দীনেশ গুপ্তর আমল

থেকে তিনি অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত। বাংলার যত বিপ্লবী আছেন সবাইকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় চেনেন, সে অনুশীলন দলের হোক বা যুগান্তর দলেরই হোক। অনন্ত সিং, কল্পনা দত্ত, গণেশ ঘোষ, ননী ভট্টাচার্য এবং রাধাবল্লভ গোপী প্রমুখদের সঙ্গে ওর আলাপ ছিল। এক ডাকে সবাই ওকে চিনতেন। সেই রাজনীতি উনি তাঁর কর্মজীবনেও পরিত্যাগ করেননি। উনি বিকাশ রায়, অর্দ্ধেন্দু মুখার্জির সঙ্গে অভিনেতাদের সংগঠন অভিনেত্রী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই অভিনেত্রী সঙ্ঘ শুধুমাত্র অভিনেতাদের বিভিন্ন বিষয়ের দাবিদাওয়া ছাড়াও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে একত্র হয়ে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তিনি মনে করেন শিল্পীরাও শ্রমিক। তিনি মনে করতেন ‘‘আমরা নিজেদের রাজনীতি থেকে পৃথক করার কখনও বিশ্বাসী নই, তার কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা যুক্ত। আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা নির্ভর করছে কার্ল মার্কসের নিম্নোক্ত বাক্যের ওপর।’’

‘‘শ্রমিকশ্রেণির বন্ধন মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হলো রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে জয়ী হওয়া।’’

সারা জীবন ধরে, এই রাজনীতিকে তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন। মা সুনীতিদেবী ব্রিটিশ সরকারে চাকরি করেছেন বলে ভানুবাবুরা অতীব রাজভক্ত পরিবার ছিল এমন ভাবার কোনও কারণ নেই, বরং ট্রেনে ভ্রমণকালে এক ব্রিটিশ মহিলার অন্যায় ও উদ্ধত আচরণ দেখে সুনীতিদেবী সেই মহিলাকে ঘা কতক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় আমার শাশুড়ি বলতেন, ‘‘মিনমিনে পুরুষ আর পিনপিনে গলা মোটেও পছন্দ করি না।’’ নিজের ছেলেকে গড়ে ছিলেন সেইভাবে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বারবার বলতেন, ‘‘২৮ বা ২৯ ইঞ্চি বুকের ছাতিতেও আমার লড়ে যেতে সাহসের অভাব হয় না।’’ অনুপ কুমার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতেন ‘গোঁয়ারগোবিন্দ’। ‘‘ভানুদা মনে প্রাণে বাঙাল, আর বাঙালদের জেদ সর্বজনবিদিত। ভানুর বাঙালপনার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এক সময়ে চিত্রজগতে এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, চলচ্চিত্রে সংরক্ষণ সমিতি বনাম অভিনেত্রী সঙ্ঘ। তাঁরা তিনজন শিল্পীকে ব্ল্যাকলিস্ট করেন—আমাকে, সৌমিত্রকে এবং ভানুদাকে। এই অবস্থায় স্বভাবতই আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তিত। শুনলাম ভানুদা যাত্রায় যোগ দিচ্ছে। সবাই বারণ করল, এই বয়সে যাত্রায় যোগ দেওয়া উচিত নয়। দেখ ক’দিন বাদে চলে আসবে। কিন্তু ভানুদা পালিয়ে আসেনি। বাঙাল তো। দীর্ঘদিন নিজে দল গঠন করে সুনামের সঙ্গে যাত্রায় পরিচালনাও করলেন।

আজ যাত্রা জগতেও ভানুদা একটি নাম।’’

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি ওঁর পুত্র গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা দিয়ে। সংরক্ষণ আন্দোলনের পর থেকে অনেকদিন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উত্তমকুমারের দেখা হয়নি। একদিন স্টুডিওতে দেখা হওয়ার পর উত্তমকুমার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলেন ‘কেমন আছ’? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘আপনি কেমন আছেন’? এটা শুনে উত্তম বলেছিলেন, ‘আমি আবার আপনি হলাম কবে’? ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর ছিল, ‘যেদিন থেকে আপনি আমাকে তুমি বলতে শুরু করেছেন’। এই ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো বছরেও আজও বাঙালির কাছে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয়। পবিত্র সরকারের ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর লেখা দিয়ে ইতি টানি। ‘‘কিন্তু পরের ভানুরা ক্রমে এই অপরত্ব হারাবে নিজেদের ভাষা ভুলে তারা পশ্চিমবঙ্গের জনস্রোতে মিশে যাবে। তাই আমাদের ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও হয়ে থাকবে ইতিহাসের দলিল; একক উজ্জ্বল, স্মরণীয় এবং উপভোগ্য দলিল। আর একটা ভানু এসে সেই অভিঘাত আর সৃষ্টি করতে পারবে না।’’

বাড়িতে কেউ ভাবতেই পারেননি অভিনেতা হবো...

সাক্ষাৎকার

বোঝেনা সে বোঝেনার অভীককেও যেমন বাঙালি ভালোবাসেন তেমনই তাঁদের প্রিয় সোনাদাও। তিনি ব্যোমকেশ, তিনি-ই হয়েছেন ফেলুদা। অভিনয়ের পরিবেশে বেড়ে উঠলেও ভেবে নেননি অভিনেতাই হবেন। মেতে থাকতেন খেলাধুলো নিয়ে। সঞ্চারী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেকথাই বললেন আবীর চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির দুই প্রিয় চরিত্র– ব্যোমকেশ এবং ফেলুদা, একমাত্র আপনিই অভিনয় করেছেন। দু'টি চরিত্রে অভিনয়ের মধ্যে ঠিক তুলনা নয়, কিন্তু দুই চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি জানতে চাইব। দুই চরিত্রে অভিনয়ের আলাদা ফিডব্যাক পেয়েছেন।

আবীর: ফেলুদা নিয়ে এখন আর আমি বিশেষ কিছু বলি না। তবে ফেলুদা আমাদের সকলের শৈশবের হিরো। ফেলুদা নস্ট্যালজিয়া। ফেলুদার ছবি দেখে বড় হয়েছি। সেই চরিত্রে অভিনয় করতে পারা এক দারুণ দুর্লভ সুযোগ। ২০১৪'তে অভিনয় করি ফেলুদার চরিত্রে। খুবই উত্তেজিত ছিলাম। সেই অনুভূতি তো আছেই। নিজের ১০০ শতাংশ দিয়েই অভিনয় করি। কিন্তু তারপর আর করতে পারিনি বা করতে দেওয়া হয়নি সেটা আলাদা বিষয়। তারপর আর ওটা নিয়ে কিছু বলি না।

ব্যোমকেশও আগে পড়েছি। কিন্তু ছবি করতে গিয়ে যত একাত্ম হয়েছি, নতুন করে অনুভব করেছি ব্যোমকেশকে। অন্যভাবে চিনেছি। ২০১০ সালে অঞ্জনদা (অঞ্জন দত্ত) যখন আমায় এই চরিত্রের জন্য অফার করেন, তখন আমি মাত্র একটা ছবিতেই অভিনয় করেছি, 'ক্রশ কানেকশন'। তাও তখন মুক্তি পায়নি। কেরিয়ারের একেবারে শুরুর দিকে এমন একটা দায়িত্ব পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার। এই চরিত্রের গুরুত্ব বা দায়িত্ব সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম। তাই আনন্দ-উত্তেজনার সঙ্গেই ভয়ও পেয়েছি। 'আদিম রিপু' মুক্তি পাওয়ার পর বাঙালি যেভাবে আমায় গ্রহণ করেছেন, তা অভাবনীয়। '৬৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'চিড়িয়াখানা'। তারপর বাংলায় আর বড়পর্দায় ব্যোমকেশ নিয়ে ছবি তৈরি হয়নি। আমি আমার বড়বেলাতেই দেখেছি 'চিড়িয়াখানা'।

ব্যোমকেশের অদ্ভুত এক প্রাসঙ্গিকতা আছে। গত দু'-তিন বছরে একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করেছি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবাঙালি দর্শকরাও ব্যোমকেশ দেখেছেন। আমাকে ব্যোমকেশ হিসাবে চিনেছেন। ব্যোমকেশের চরিত্রের জন্য অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমি যেমন গর্বিত, তেমনই চিরঋণীও।

ফেলুদার চরিত্রে ভবিষ্যতে অভিনয়ের ইচ্ছা আছে?

আবীর: আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তবে মনে হয় না আর করা হবে। গত তিনবছরে গুপ্তধন সিরিজ করছি। ছোটরা ভীষণ ভালোবাসে সোনাদাকে। ছোটদের মনোরঞ্জন করতে পারা বড় ব্যাপার।

সিরিয়ালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। আবার কখনও সিরিয়ালে ফিরবেন?

আবীর: সিরিয়াল করার পরিকল্পনা এখনই নেই। তবে টেলিভিশনে কাজ করছি অন্যভাবে, 'সারেগামাপা'র সঞ্চালক হিসাবে। এই কাজের মাধ্যমে টিভিতে ফিরছি বলতেই পারি। আবার আমার কাছে এটা একপ্রকার 'ডেবিউ'। এর আগে তো এমন অনুষ্ঠান করিনি। নতুন চ্যালেঞ্জ আমার কাছে।

টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা আগেও ছিল, এখনও আছে। সিরিয়ালের ক্ষেত্রে হয়তো আগে যে রুচি বা চেতনার কাজ হতো, এখন হয়তো তা হয় না। আবার অনেক নতুন ধরনের কাজ হচ্ছে। আমাদের গোটা প্রজন্ম মানে যারা প্রায় গত ১০ বছর ধরে বাংলা ছবির সঙ্গে আছি, পর্দার সামনে বা পিছনে–

তাঁদের অধিকাংশই টেলিভিশন থেকে আসা। টেলিভিশনে-সিনেমায় একসঙ্গেও অনেকে কাজ করছেন। বহুদিন পর্যন্ত আমরা দু'ধরনের কাজই করেছি। যাঁরা এখন টেলিভিশনে কাজ করেন, তাঁদের চাপ এতটাই বেশি থাকে, তাঁরা হয়তো সিনেমায় কাজ করে উঠতে পারেন না। টেলিভিশনের একটা নিজস্ব জায়গা আছে। একটা বিপুল জনপ্রিয়তা আছে। আমাদের জীবনে টেলিভিশনের অবদান অনেক বেশি, কারণ আমাদের পথ চলা শুরুই এখান থেকেই। টেলিভিশনের একটা বড় প্রজেক্টে যেহেতু আমাকে অন্যভাবে দেখা যাবে, তাই আপাতত মনোযোগ দিয়ে সেই কাজই করতে চাই।

ছবি পরিচালনা করবেন কখনও?

আবীর: অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সকলেরই কম-বেশি ছবি পরিচালনার ইচ্ছা থাকেই। তবে ইচ্ছা আর পরিকল্পনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কোনও নির্দিষ্ট ভাবনা আমার নেই যদিও। মানে এই গল্প বা এই চরিত্র নিয়ে কাজ করব এমন কিছু। তবে সূক্ষ্ম একটা ইচ্ছা তো মনের কোণে আছেই। যদিও আমার ক্ষেত্রে লেখালেখি করতে পারলে আরও ভালো, বিশেষ করে চিত্রনাট্য লেখা।

আপনার বাবা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। আপনি নিজে কতটা নাটকের সঙ্গে যুক্ত?

আবীর: শুধু বাবাই নন, আমাদের গোটা পরিবারই নাটকের সঙ্গে যুক্ত। বাবা ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, মা রুমকি চট্টোপাধ্যায় – দু'জনেই 'লোককৃষ্টি'র সঙ্গে যুক্ত। 'লোকসৃষ্টি' ১৯৮৮ সালে তৈরি হয়। আমার ছোটভাইয়ের মতোই গুরুত্ব

পেয়ে থাকে আমাদের নাটকের দল। সল্টলেকের বাড়িতে আমি যে ঘরে থাকতাম তার পাশেই রিহার্সাল হতো, বাবাদের গ্রুপ বসতো। কাজেই একেবারে ছোট থেকেই নাটকের পরিবেশে বেড়ে ওঠা। কাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রুপের সম্পাদক। বোন মোনালিসাও তিন বছর বয়স থেকে নাটক করছে। এই মুহূর্তে তো প্রচুর নাটক করছে ও। এমন পরিবেশে বেড়ে উঠলেও আমার অভিনয় নিয়ে বাড়ির লোকজন বিশেষ ভাবেননি। কারণ আমি বরাবরই খেলাধুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু কোথাও একটা টান ছিলই। ছোটবেলায় প্রচুর নাটকে অভিনয় করেছি, স্কুলে-পাড়ায়-বাবার অফিসে যেমন সবাই-ই করে। তবে নিজেকে আমি মঞ্চের অভিনেতা হিসাবে এখনও কল্পনা করতে পারি না বলেই হয়তো নিয়মিত মঞ্চে অভিনয় করিনি। অভিনয় একেবারেই আমার পরিবারের অংশ। তাই ছোটবেলায় এমন কখনও ভাবিইনি যে বড় হয়ে আমিও অভিনেতা হবো। সেরকম ভাবনা আসেওনি। ছোট থেকেই সিনেমা দেখার চল ছিল। বাবা নিয়ে যেতেন। বাড়িতে বসে পুরানো ছবি দেখতাম। কলেজ যাওয়ার পর থেকেই বিশেষত অভিনয়ের চাগাড় ওঠে।

অভিনয় জীবনের শুরুর দিনগুলো কেমন ছিল?

আবীর: এমবিএ করার পর চাকরি আর অভিনয়ের জীবন আমার প্রায় একসঙ্গেই শুরু হয়েছিল। তার আগে গ্র্যাজুয়েশনের পর যখন বসেছিলাম, তখন হঠাৎ করেই একটা সুযোগ আসে। বাবার বন্ধু (বাবার থেকে যদিও অনেকটাই ছোট) ফাল্গুনী সান্যাল বলেছিলেন, আমি তোকে হিরো প্রজেক্ট করে একটা কাজ করব। প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম, এমনি বলছেন হয়তো। তারপর দেখলাম, ব্যাপারটা সিরিয়াসই। আকাশ বাংলায় তখন পাঁচদিনের গল্প বলে একটা টেলিসিরিজ হতো। সেটায় একটা গল্প ছিল 'লালনের দুর্গা'। দু'টো ছেলের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল। তার একটি ছিলাম আমি। সেটাই আমার ক্যামেরার সামনে প্রথম কাজ। তার পরে বড় বড় সিরিয়ালে ছোট ছোট অংশের অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি। এমবিএ পড়াকালীন মাঝামাঝি সময়ে দেবাংশুদা একটা টেলিফিল্মের জন্য আমায় বলেন। দেবাংশুদা যদিও ৬ বছর হলো মারা গিয়েছেন। ওরকম একজন শিল্পীকে যে আমরা এত অল্প সময়ে হারিয়েছি, তার জন্য আপশোসের শেষ নেই। 'স্যান্ডেল' নামে সেই টেলিফিল্মের মাধ্যমে যে আমার আসলে 'লুক টেস্ট' হয়েছিল বুঝেছিলাম অনেক পরে। কারণ, ওই বছরই মানে ২০০৪ সালের শেষদিকে দেবাংশুদা একটা সিরিয়াল নিয়ে আসে, 'বহ্নিশিখা'। বড় পাওয়া। আমি এতগুলো বছরে প্রচুর চরিত্রে অভিনয় করলেও ওই কামাল মল্লিকের মতো চরিত্র খুব কমই আসে একজন অভিনেতার জীবনে। এখনও মানুষ জিজ্ঞাসা করেন, ওই সিরিয়ালটা কেন ওভাবে শেষ হলো। তারপর চাকরি করতে করতে টুকটাক কাজ করি। তারওপর 'খুঁজে বেড়াই কাছের মানুষ' দিয়ে নিয়মিত সিরিয়ালের শ্যুটিং শুরু। অফিসের পর শ্যুটিং করতাম। যেটুকু কাজ শিখেছি, টেলিভিশন থেকেই।

অভিনেতা না হলে কী হতেন?

আবীর : বলা মুশকিল, হয়তো চাকরিই করতাম। তাতে খুব সফল হতাম বলে যদিও মনে করি না।

কোন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে আপনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন? কমার্শিয়াল মুভি নাকি তথাকথিত অন্য ধারার ছবি?

আবীর: গত পাঁচ বছরে যদি দেখা যায়, এই ধারার ব্যাপারটা মিলেমিশে গিয়েছে। আমি মূলত যে ধরনের ছবিতে অভিনয় করি, হয়তো সবাই বলবেন একটু শহুরে। কিন্তু আমি বরাবরই এমন ছবির পক্ষে যে ছবি একইসঙ্গে অনেক দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারবে আবার তার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা বিনোদনও হবে। খুব ভারিক্কি কিছু হবে না। আমি মনে করি, সুস্থ রুচির ছবিই মানুষ বেশিদিন মনে রাখেন। পরিচালকরা আমাকে শহুরে ছবিতেও যেমন সুযোগ দিয়েছেন, তেমনই তথাকথিত মূলধারার ছবিতেও অভিনয় করেছি। ১৫ বছরে বাংলা ছবির দর্শকের রুচি-পছন্দ সবেরই আমূল বদল ঘটেছে। শহর-গ্রামের যে আপাত বিরোধ ছিল, তা নেই বললেই চলে। তবে এই সবটাই বলছি কোভিডের আগের সময়ের ভিত্তিতে। করোনা-পরবর্তী সময়ে কী হবে কেউই জানেন না। এমনও হতে পারে, আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হতে পারে।

এখন এমন একটি কঠিন পরিস্থিতি, সমস্ত ক্ষেত্রই মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। অভিনয় জগত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত? কীভাবে উঠে দাঁড়াবে ইন্ডাস্ট্রি?

আবীর: কোভিডের প্রথম আড়াই মাস তো সমস্ত কাজই বন্ধ ছিল। তারপর টেলিভিশনে কাজ শুরু হওয়ায় অনেক মানুষই কাজ করছেন। শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথাই বলব না, টেকনিশিয়ানরাও কাজ শুরু করতে পেরেছেন। ওয়েবে তো কাজ হচ্ছেই। আশা করছি, সিনেমার কাজও খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

একটা বিষয় বুঝতে হবে, অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেরই কিন্তু রুজি এটাই। শুধুই জনপ্রিয়তা দিয়ে বিচার করলে হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষকে আনন্দ দিয়ে আমরা রোজগার করছি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেহেতু প্রচারের আলোকে থাকেন, তাই মনে করে নেওয়া হয় তাঁদের জীবনে কোনও সমস্যা নেই। একেবারেই ভুল ধারণা। কাজ না করলে তাঁদেরও রোজগার হবে না। আমরা যেমন আমাদের ভালোবাসার কাজ করছি, তেমনই কাজটা করে অনেক মানুষের ভালোবাসাও পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কারণে কিছু হলেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের গালমন্দ করাটা এখন সহজ ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেউ অপরাধ করছি না। আতঙ্ক, ভয়, দ্বিধা, রোজগারহীনতা এগুলো তো তাঁদের সঙ্গেও ঘটছে। একই মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরাও, এটা বুঝতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সাধারণ মানুষ, তা মনে রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর কেউই এই পরিস্থিতির সামনে পড়েননি। কীভাবে সামাল দেব, তা নিয়ে আমরা কেউই অভ্যস্ত নই। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এমনিতেই অপেক্ষাকৃত ছোট। বিনিয়োগ এবং পরিকাঠামোগত দিক থেকে দেখলে পরিসর বাড়ানোর অনেক সুযোগ রয়েছে। রোজের হিসাবে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা আরও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছেন। কীভাবে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, তা নিয়ে অবশ্যই চিন্তাভাবনা চলছে।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ আরও বেশি করে বিনোদনের দিকেই ঝুঁকেছেন। কঠিন সময়ের দুশ্চিন্তা লাঘব করে বিনোদনই। তাই শিল্পকলার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সুস্থভাবে ভাবতে আশপাশে কি হচ্ছে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, বুঝতে সাহায্য করে শিল্পই। সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে এখন অনেক কাজই হচ্ছে। তবে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কাজ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। শিল্পকলা সবসময়ই সময়ের প্রতিনিধি।

লকডাউনে ওয়েব সিরিজ বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার সুযোগ না পেয়ে মানুষ ঘরে বসেই দেখেছেন। সব স্বাভাবিক হয়ে গেলে মানুষ আবার আগের মতোই হলমুখো হবে বলে মনে করছেন?

আবীর: হাতের গোড়ায় অপশন রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলবে। এত ধরনের কাজ দেখছেন। এটাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। সিনেমা হলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে ঠিকই। তবে এরকম আগেও হয়েছে। টেলিভিশন যখন এসেছে তখন মনে হয়েছিল, সিডি যখন এল তখনও তাই। দীর্ঘদিনের ব্যাপার। আগের মতোই সিনেমা হল আবার নিজের জায়গা করে নেবে। হয়তো নিয়ম বদলাবে। সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশে না ফিরলে বুঝতে পারব না কী কী বদল ঘটে গিয়েছে। হয়ত নতুন ভাবনা উঠে আসবে। বহু মানুষ নতুন করে কাজ পাবেন। আমার মনে হয় ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন হচ্ছে। কোভিড বুঝিয়ে দিয়ে গেল, কোনও কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, জীবন কতটা অনিশ্চিত তা-ও বুঝিয়ে দিচ্ছে।

কোনও বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের ইচ্ছা আছে?

আবীর: নাহ, সেরকম কোনও বিশেষ চরিত্র নেই। যে চরিত্র পছন্দ হবে, তাতে অভিনয় করব।

অনুরাগীদের জন্য কিছু কথা...

আবীর: আমরা অনেক বেশি অস্থির, অধৈর্য হয়ে গিয়েছি। আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছি। আমরা কেউই তো এখন ভালো নেই। সকলে যদি সংবেদনশীল হই, অন্যের দোষ ধরার প্রবণতা যদি কমে, তাহলে বোধহয় চারপাশ আরও অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।

সেই সাবিত্রী আজও আছি

সাক্ষাৎকার

বাংলার অন্যতম সেরা অভিনেত্রী **সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়**। তাঁর মুখোমুখি নবীন প্রজন্মের অভিনেত্রী **পাপিয়া অধিকারী**। কথোপকথনে শৈশবের ফেলে আসা স্মৃতি, ঘর-সংসার, অভিনয় জীবন, বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনায় অকপট প্রবীণ অভিনেত্রী।

প্রথম সাক্ষাতে কাননদেবী তোমাকে টফি দিয়েছিলেন। কেন? তাঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছিল?

সাবিত্রী: আমি তখন অনেক ছোট। ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেই সময়ে কাননবালার সঙ্গে দেখা হয়েছিল টালিগঞ্জে। আমি দিদির বাড়িতেই থাকতাম। আমরা দশ বোন ছিলাম। অষ্টম দিদির শ্বশুর ছিলেন থানার ওসি। থানার কম্পাউন্ডে একটি মাঠ ছিল। বিকেলবেলা সেই মাঠে আমরা খেলাধুলো করতাম। অন্য দিনের মতো সে দিনও স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটা গাড়ি এসে থানার সামনে থামল। গাড়ি থেকে নেমেই এক ভদ্রলোক সোজা থানায় ঢুকে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর গাড়িতে বসে থাকা এক মহিলা আমাকে ডাকলেন। গেলাম। উনি ব্যাগ থেকে টফি বার করে আমাকে দিলেন। আমি তো টফি পেয়ে দারুণ খুশি। কিন্তু বান্ধবীরা অখুশি। তারা বলতে থাকল, সাবু টফি পেল, আমরা পেলাম না। রাতে আমার দিদির শ্বশুরকে বললাম, থানায় কারা এসেছিলেন। উনি বললেন, কাননবালা এবং তাঁর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য। সেই থেকে কাননবালা হওয়ার শখ জেগেছিল। এক সপ্তাহ স্কুলেই যাইনি। এরপর যা ঘটল, তা ভয়ঙ্কর। দিদি বাবাকে চিঠি লিখল, সাবু লেখাপড়া করছে না, ও কাননবালা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর! সেই চিঠির উত্তর এল সাবধানবাণী শুনিয়ে। আমি কিন্তু তখন নিজের স্বপ্নকে মনে মনে গড়ে তুলছি।

দীর্ঘ এত বছর, প্রায় ৪০০-র বেশি ছবি, বহু নাটক, সিরিয়ালে অভিনয় করার পর এখন মনে হয়, কাননবালা হতে পারিনি। হওয়া সম্ভব নয়। কাননবালা, কাননবালা-ই। সাবিত্রী চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জি-ই।

প্রথম যেদিন ক্যামেরার মুখোমুখি হলে, সেদিনটার কথা মনে পড়ছে?

সাবিত্রী: মনে তো পড়বেই। তবে সুখকর ঘটনা নয়। বোধহয় আমার মতো কোনও অভিনেত্রী এত স্ট্রাগল করেননি। প্রথম যে দিন ক্যামেরার মুখোমুখি হলাম, সে দিন থেকেই ধাক্কা খেতে শুরু করলাম। এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা...... ওরা নখ থেকে মুখ পর্যন্ত ছবি তুলতেই থাকলেন! আমি ফেড-আপ হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, আমি বাতিল। তার কারণ, ছোট মেয়েকে হিরোর সঙ্গে মানাবে না, যদিও সেটা হাসির ছবি ছিল। তা ছাড়া আমার উচ্চারণে বাঙাল কথার টান! **প্রশ্ন: তারপর?**

সাবিত্রী: তখন মাঝে-মাঝে ফাংশনে আমি নাচ করে কিছু টাকা পেতাম। এই পর্যন্তই। বেশ কিছুদিন পর ভানুদা (ব্যানার্জি) মেনা ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, ওরা কিছুতেই মেয়ে খুঁজে পাচ্ছিল না। সুধীর মুখার্জির গ্রুপটা

পাশের বাড়ি করবে, উনি আগে বরযাত্রীতে ছিলেন। বরযাত্রী হিট করে গেছে। আর যমুনা সিংহ তখন হিরোইন ছিলেন। তিনি হঠাৎ মোটা হয়ে গেছেন। তাঁকে চলবে না। ডাক পড়ল আমার। গেলাম। বললেন, তোমার দুটো শট নেব। যদি পার, তবেই নেওয়া হবে। প্রথম শটটাই না কি দারুণ দিয়েছিলাম! সে দিনই আমি মনোনীত হলাম। তাঁরা বললেন, আজই তোমার সঙ্গে চুক্তি হবে। আমি বললাম, আমি ও সব বুঝি না। আপনারা বাবার কাছে যান। ওরা এলেন। ঠিক হলো, মাসে দু'শো টাকা। যত দিন না ছবির কাজ শেষ হবে, তত দিন আমি অন্য কারুর ছবিতে কাজ করতে পারব না।

সেই যাত্রা শুরু। আজ কেমন লাগছে?

সাবিত্রী: আমি কিন্তু বদলাইনি। কত গুণী শিল্পীদের সান্নিধ্য, পরামর্শ পেয়েছি....। ভাবতে ভালোই লাগে। এত সাফল্য, পুরস্কার পেয়েও মাথা ঘুরে যায়নি। আগে যেমন দিদিদের সঙ্গে মাটিতে বসে গল্প করতে-করতে ভাত খেতাম, এখনও মাটিতে বসেই ভাত খাই। ছেটবেলার স্মৃতিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছি। বাবা স্টেশন মাস্টার ছিলেন। অর্থকষ্ট ছিল ঠিকই, তবে ঐতিহ্য হারাননি। ঐতিহ্যই জীবনের সম্পদ। আমি মাটির গন্ধ নেওয়া সাবিত্রী। সাধারণ জীবনযাপনেই অভ্যস্ত।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। শুটিং শেষে উত্তমদা এক দিন একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছবিটির নাম দো বিঘা জমিন। ওই ছবিটা দেখার পর খুব কেঁদেছিলাম। সে দিন আমার কাছে রুমালও ছিল না। উত্তমদা নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে বললেন, এটা পরিষ্কার রুমাল। চোখের জল মোছ। তারপর আমাকে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে চাইনিজ খেতে গেলেন। জীবনে এই প্রথম রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। গিয়ে তো মহা বিপদে পড়েছি। আমি তো কাঁটা চামচ ধরতে পারি না। কারুর দিকে না তাকিয়ে হাত দিয়ে খেলাম, পেটে খিদে রেখে। সবটা খেলাম না। কারণ, আমার খাওয়া দেখে যদি কেউ হাসে। পাশে আবার উত্তমদা!

তোমার জীবনে ভানু (ব্যানার্জি) জেঠুর অবদান তো অনেক?

সাবিত্রী: ভানুদা তো আমার সব। আমার জীবনে উনি ধ্রুবতারা। জীবনে দীপ জ্বেলে দিয়ে গেছেন। ভানুদারা তখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে পানের দোকানে আড্ডা দিতেন। আমি রাস্তায় মোড়া পান খেতে পছন্দ করতাম। ট্রাম ভাড়া বাঁচিয়ে সেখানে আমিও মিষ্টিপাতার পান খেতে যেতাম। হঠাৎ একদিন ভানুদা আমাকে ডেকে বললেন, আমরা একটা বাঙাল ভাষায় নাটক করছি। নাম নতুন ইহুদি। তুমি তো বাঙাল। সেই নাটকে অভিনয় করবে? আমি বললাম, আমি কিছু বলতে পারব না। আপনি বাবার কাছে যান। উনি রাজি হলে অভিনয় করব। ওরা বাবার কাছে এলেন। আমরা তখন ছোট্ট ভাড়াঘরে থাকি। ভানুদাকে দেখে বাবা বললেন, তুমি সাম্যময় তো? ভানুদার ভালো নাম ছিল সাম্যময়। তুমি তো আমাদের আত্মীয়। ঠিক আছে, সাবু অভিনয় করবে। তবে একটা শর্ত। তুমি এসে ওকে নিয়ে যাবে। ও তো সবে কলকাতায় এসেছে। এখানকার রাস্তাঘাট তেমন চেনে না। প্রথম দিন ভানুদা এসে আমাকে ভেতলায় নিয়ে গেলেন কালীন সুরের বাড়িতে। ওনার বাড়িতে রিহার্সাল হতো। ভানুদা ছিলেন ডিরেক্টর। সেখানে গিয়েও আমাকে অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সকলেই বললেন, ভানু- তুই কাকে নিয়ে এসেছিস? এটুকু মেয়ে! ওকে দিয়ে হিরোইন চলবে না! ফিরে এলাম বাড়িতে। ঘুরে ফিরে সেই ছ-সাত মাস পর আবার। রিহার্সাল শুরু। বাঙাল কথায় ডায়লগ ছিল। আমার তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বাঙাল যে..। ওদের ভালো লাগল। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, যে দিন ভানুদা রিহার্সালে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে দিন ভালো একটা জুতো পর্যন্ত ছিল না। ভানুদা কিনে দিয়েছিলেন।

সেই জুতো বহু দিন কাছে রেখে দিয়েছিলাম। তবে শেষ রক্ষা করতে পারিনি। তখন তো রাস্তায় শুধু কাঁকড় ছিল। এখন অবশ্য সর্বত্র কাঁকড়।

পুরানো স্মৃতি কিছু মনে পড়ছে?

সাবিত্রী: প্রথমেই তো ভানুদার বহু স্মৃতি ছবির মতো ভেসে ওঠে। তারপর ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, তরুণকুমারের মতো শিল্পীদের কথা বেশি মনে পড়ে। এঁদের সঙ্গে কীভাবে অভিনয় করতাম! পরামর্শও দিতেন। ছবিদা বলতেন, সাবি তুই এই জায়গাটা এভাবে কর, দেখবি দারুণ লাগবে। করতামও। দুর্দান্ত শট হতো। তারপর উনি বলতেন, তোর সুবিধা কী জানিস? একবার বলে দিলে তুই অন্তর দিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারিস! অনেকে বলেন, আমি না কি প্রতি মুহূর্তে অভিনয়ে কণ্ঠস্বর, ভঙ্গিমা ইত্যাদি বদলাতে পারি। বিশ্বাস কর, সংলাপ বুঝে আপনা থেকেই চলে আসে। আমি কোনও দিন অভিনয় শিখিনি। চেষ্টা করিনি। আমি মনে করি অভিনয়টা শেখানোর বিষয় নয়, ভেতরের ব্যাপার। জীবনে গ্লিসারিন দিয়ে কাঁদিনি। পারিও না।

আমাদের সময়ে স্টুডিওর পরিবেশ একেবারে অন্যরকম ছিল, যা আজকের দিনে ভাবাই যায় না। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে একসঙ্গে ত্রিশ জন মেকআপ করতাম। সাতটি ছবির শুটিং হচ্ছে। কারা ছিলেন জানো ? আমি, শোভা সেন, সন্ধ্যারানি, প্রণতি ঘোষ, সুচিত্রা সেন, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র। সবার নাম মনে পড়ছে না। সুচিত্রা আর আমি অন্নপূর্ণার মন্দির করেছি। ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যেও আনন্দ করে কাজ করেছি, কোনও অসুবিধা হয়নি।

একটা মজার ঘটনা বলছি। এক দিন সুচিত্রাদি আর আমি পাশাপাশি মেক আপ করছি। হঠাৎ সুচিত্রাদি বলল, সাবু পান দে। দিলাম। সেই পান চিবোতে-চিবোতে নিজের মনেই বলতে লাগল, সুচিত্রা সেন তুমি যতই মেক আপ করো না কেন, সাবিত্রী চ্যাটার্জি কোনও দিনই হতে পারবে না। তবে আমরা দিদি-বন্ধুর মতোই সকলে মিশতাম। কেউ প্রতিযোগী ছিলেন না। যে যাঁর কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের যোগ্যতাকে প্রমাণ করতাম। এখন তো যোগ্যতা নয়, কে আগে গিয়ে দৌড়ে জায়গা দখল করবে সেই প্রতিযোগিতা। আমরা খুব কষ্ট করে অভিনয়টা করেছি। এই কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ ছিল।

যেমন?

সাবিত্রী: মরুতীর্থ হিংলাজ-এর কথা সকলেই জানেন। নতুন করে কী আর বলব। বিকানির, রাজগীর, ঘাটশিলা, দীঘা, জাগুলিয়ায় শুটিং হয়েছিল। জাগুলিয়ায় তখন জঙ্গল আর জঙ্গল। বসতি নেই। আলো নেই। আমাদের চেহারা কঙ্কালের মতো হয়ে গিয়েছিল। আমরা সাত দিন একটা টেন্টের মধ্যে ছিলাম। উত্তমদা একটা খাটিয়ার মধ্যে নাগাড়ে ছিলেন। হোটেল নেই। শুধু অন্ধকার। আমরা বিকাশদা (রায়)-র মুখের দিকে চেয়ে রা কাড়তে পারিনি। প্রায় ১৫০ জনের গোটা ইউনিট তাঁবুর নিচে ছিলাম। এত গরম যে, আমাদের গায়ের চামড়া খসে খসে পড়ছিল। ওই গরম আর বালির ভয়ে আমি বহু দিন দীঘা যাইনি। এখনকার নতুন আর্টিস্টরা এ সব মানিয়ে নিতে পারবে? বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি যখন হিরোইনের পার্ট করি, তখন মাসে বেতন ছিল মাত্র দেড় হাজার টাকা!

যাক, এবার স্টেজের কথা একটু বলি। পর্দা থেকে স্টেজই আমার প্রথম প্রেম। মঞ্চে উত্তর সারথি সংস্থার নতুন ইহুদি-র পর আদর্শ হিন্দু হোটেল, শ্যামলী, পরিণীতা, শ্রীকান্ত, শ্রেয়সী, অতএব, কথা কও, ঘর, পরস্ত্রী, মল্লিকা, অমরকণ্টক, রাজকুমার, কাচের পুতুল, সেই রাত, আগন্তুক ইত্যাদি ইত্যাদি। চিরকালই দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ভালোবাসি।

কালিকা থিয়েটারে (পরে সেটি সিনেমা হল হয়) নতুন ইহুদি নাটকের বোর্ড রিহার্সালের সময়েই উত্তমকুমারের সঙ্গে আলাপ। উনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন। শুনলাম, উনি আসবেন। আমরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলাম। যেই এসেছেন, ওমনি ছুটে দেখতে গিয়ে ভাঙা টিনের বাক্সতে আমার পা কেটে গেল। রক্তারক্তি ব্যাপার। ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁকে পর্দার আড়াল থেকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। অপেক্ষায় ছিলাম, কখন উনি স্টেজে আসবেন।

তারপর উত্তমকুমার মঞ্চে উঠে এলেন। মঞ্চে উঠেই

ভানুদার কাছে গেলেন। তাঁরা দু'জনে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। তারপর ভানুদা আমাকে ডাকলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন উত্তমকুমারের সঙ্গে। বললেন, এই মেয়েটির নাম সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। আমাদের নাটকে অভিনয় করছে। প্রয়োজনে ওকে কাজে লাগাতে পারো। ভানুদার কাছে উত্তমকুমার এ কথা শোনার পর বললেন, আমাদের একটি নাটকের দল আছে। আপনি কি অভিনয় করবেন? আমি বললাম, নিশ্চয় করব। তবে বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে। এই বলে ভানুদার সঙ্গে কাজের কথা সেরে চলে গেলেন। চলে যাওয়ার পর আমার সারা শরীর শিহরিত হতে লাগল। তখন যেদিকে তাকাই, সবই যেন উত্তমকুমার!

যেমন কথা, তেমনি কাজ। একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন উত্তমকুমার। বাবা (শশধর চট্টোপাধ্যায়)-র সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। আমি বাবার পাশেই বসেছিলাম। বাবা রাজি হলেন। আমি উত্তমকুমারের নাটকের দলে অভিনয় করার অনুমতি পেলাম। কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পরই বাবা উত্তমকুমারকে বললেন, তুমি অ্যাডভান্স দিয়ে যাও। শুনে আমার মনে হলো, পৃথিবী দু'ভাগ হয়ে যাক। নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম, বাবার এত সাহস! উত্তমকুমারের কাছ থেকে অ্যাডভান্স চাইলেন! তিনিও কালবিলম্ব না করে পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বার করে বাবার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

উত্তমকুমার চলে যাওয়ার পর আমি বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বাবাকে বললাম, তুমি ওনার কাছ থেকে টাকা চাইতে পারলে? বাবার জবাব, সংসার চলে না, ঘরে অভাব, টাকা তো দরকার। তা ছাড়া তুই তো কলকাতায় কাজ করতে এসেছিস। কাজের বিনিময়ে টাকা তো প্রাপ্য। আমি বললাম, উনি তো আমার অভিনয় পছন্দ না-ই করতে পারেন। তখন? বাবা বললেন, তোর অভিনয়ের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা আছে বলেই তো অ্যাডভান্স নিয়েছি। বাবার নেওয়া অ্যাডভান্সের মর্যাদা রেখেছিলাম। সেই মর্যাদা আজও সমানে রেখে চলেছি বলেই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় হতে পেরেছি।

উত্তমকুমারের বিপরীতে প্রথম অভিনয়ের কথা মনে পড়ছে?

সাবিত্রী: মনে হয় লাখ টাকা বা অন্নপূর্ণার মন্দির। তারপর তো অনেক ছবি করেছি। নিশিপদ্ম, ভ্রান্তিবিলাস, মঞ্জুরী অপেরা, কল্যাণী, অনুপমা, ধন্যি মেয়ে, রাজা সাজা, কুহক, নবজন্ম, রাতভোর, গৃহদাহ, হাত বাড়ালেই বন্ধু, অভয়ের বিয়ে, বড় বৌদি, শেষ অঙ্ক, মৌচাক, প্রতিশোধ ইত্যাদি। বলতে কী, অভিনেতা উত্তমকুমার আমার কাছে অন্য মানুষ। অসাধারণ তাঁর অভিনয় প্রতিভা। সৌমিত্রদাও দক্ষ। আমার কাছে দু'জনেই সমান। ধরো, দু'জনেই ভাত খাচ্ছেন। তবে দু'জনের খাবার স্টাইলই আলাদা। চাহনি, ভাত মাখা, খাওয়ার মধ্যে দু'রকম ছন্দ পাওয়া যায়। ওঁদের অভিনয়েও ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ আছে। অভিনেতা সৌমিত্র, নাট্য পরিচালক সৌমিত্র, নাট্যকার সৌমিত্র আমার কাছে সমান এবং প্রিয়। পরিচালক হিসেবে নিখুঁত। অন্যদিকে, ছবিতে উত্তম-সাবিত্রীর প্রতিটি ছবি সুপার হিট। রসায়নটা ছিল অন্যরকম। আমি উত্তমদার সঙ্গে পার্ট করে দারুণ আনন্দ পেয়েছি। অসাধারণ অভিনেতা বটে। উত্তমদা, সৌমিত্রদা সম্পর্কে বলে শেষ করা যায় না। দু'জনেই পাওয়ারফুল অভিনেতা।

সত্যজিৎ রায় তোমাকে সুযোগ দেননি। আক্ষেপ হয়?

সাবিত্রী: নাহ্, কোনও আক্ষেপ নেই। উনি যে ধরনের ছবি করেছেন, তাতে ওনার মনে হয়েছে, আমাকে ছাড়া অন্যকে নিলে হবে, তাই। তবে দেখা হলেই বলতেন, আপনি দারুণ অভিনয় করেন। এবার আপনাকে নেব। কিন্তু নেননি।

ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেনের ছবিতেও আপনাকে তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। কিছু বলবেন?

সাবিত্রী: কী আর বলি। ঋত্বিকদা একবার বাড়িতে এসেছিলেন। গল্প শুনিয়ে বললেন, সাবু একটা ছবি করছি, তোমাকে নেব। ব্যস। কথাবার্তা বলে গেলেন। কিছু দিন পর উনি মারা গেলেন। আর তাঁর ছবিতে কাজ করা হলো না।

বাংলা ছবির এই হাল কেন?

সাবিত্রী: এই গল্প, সেই গল্প চুরি করে ছবি করলে সাফল্য আসবে? না। আমাদের দেশে একটু ভালো গল্প হলেই ছবি সুপারহিট হয়। এখন সিরিয়ালে ডিরেক্টর হিসেবে যাঁদের নাম পর্দায় দেখা যায়, তাঁরা কি ডিরেক্টর? আসলে তাঁরা ফ্লোর ডিরেক্টর। দীর্ঘ দিন ফ্লোরেই আসেন না। এর বেশি বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। ভালো ছবি করতে গেলে ভালো গল্প চাই। সাহিত্যকে আশ্রয় করতে হবে। আমাদের সময়ে যা ছিল আর কী।

ফিরে দেখা সাবুদি এখন কেমন আছে?

সাবিত্রী: বাব্বা, ঘুরিয়ে প্রশ্ন করার দরকার কী। (একটু হেসে) আমি এখনও সাদাসিধে সাবু-ই রয়েছি। দিব্যি আছি। তবে পরিমিত আহার, শরীর চর্চার মধ্যে দিন কাটলেও বড্ড একা লাগে। প্রিয়জনেরা খোঁজ নিলে, একটু এসে দেখা করলে, একটা পান কিনে এনে যদি বলে দিদি কেমন আছ, তখন মনে হয়, নিজের ঘরের লোককে পেলুম। তা আর হচ্ছে কই?

স্বরলিপি লেখা রবে চিরদিন

আরতি মুখোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন যশস্বী কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, প্রযোজককে কোন শব্দ প্রয়োগ করে শতবর্ষের শ্রদ্ধা জানাবো তা ভেবে উঠতে পারছি না। তবে বহুদিন আগের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এই ঘটনাটা কোথাও পড়েছি কিংবা কারুর কাছে শুনেছি তা মনে করে উঠতে পারছি না। এর সত্যতা যাচাইও করিনি। কারণ, যাঁকে নিয়ে এমন ঘটনা, তাঁর এ রকম অনেক ঘটনার সাক্ষী ছিলাম।

ঘটনাটা এ রকম ; দক্ষিণ কলকতার একটি জলসার অনুষ্ঠান-মঞ্চ। সেখানে তখনকার দিনের অনেক নাম করা শিল্পীরা গাইবেন। ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও। তিনি গান শেষে মঞ্চ ছাড়লেন। মঞ্চ থেকে যেই নিচে নেমেছেন, অমনি এক অশীতিপর বৃদ্ধা আকুলভাবে একটি ঠোঙা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, গান শুনে মন এমনি ভরে গেছে বাবা। তাও তুমি যে আমার প্রিয় গানটি শোনালে না। (ওই মহিলা বহু দূর থেকে হেমন্ত দা'র গান শুনতে এসেছিলেন। তাঁকে খাওয়াবেন বলে নিজের হাতে নাড়ু তৈরি করে এনেছিলেন।) বৃদ্ধার কথা শুনে হেমন্তদা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ গানটা? বৃদ্ধা বললেন, ওই যে 'বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই, তুমি আছো ঘুমঘোরে'! সেই বৃদ্ধার দেওয়া ঠোঙা হাতে নিয়ে ফের মঞ্চে উঠলেন হেমন্তদা। ফের হারমোনিয়াম টেনে তাঁর স্বর্ণকণ্ঠে গান ধরলেন, 'বিষ্ণুপ্রিয়া গো....'।

এই হচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তিনি তাঁর কণ্ঠশৈলী, সুরসৃষ্টিতে অমর। স্বকীয়তায় আজও উজ্জ্বল। আমাদের চেতনার প্রতিটি স্তরে, প্রতিদিন নবজন্ম লাভ করছেন। একজন শিল্পী বেঁচে থাকেন তাঁর কাজের মধ্যে। তিনি তাঁর কণ্ঠে প্রতি গানের মধ্যে প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন। অসাধারণ রোমান্টিকতায় ঋদ্ধ তাঁর কণ্ঠ। কোনও শোরগোল ছাড়া কণ্ঠ দিয়েও যে প্রিয়জনকে ভালোবাসা যায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি। আমার হেমন্তদা। সকলের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বহু, বহু বছর আগের কথা। আমি তখন কিশোরী। অল ইন্ডিয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতী শিল্পী হিসেবে সম্মান অর্জন করেছি। সেই সময় বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) হেমন্তদার বাড়িতেই ওঁর সঙ্গে আলাপ। আলাপ করিয়ে দেন একজন মিউজিক অ্যারেঞ্জার। প্রথম আলাপেই উনি সস্নেহে আমাকে আপন করে নিলেন। একজন অচেনা নতুন শিল্পীকে যেভাবে গ্রহণ করলেন তা আজও ভুলতে পারিনি। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর ব্যবহারে প্রথম সাক্ষাতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু আমি নই। হেমন্তদার ব্যবহার ওরকমই ছিল। প্রথম সাক্ষাতেই বুঝেছিলাম, কারোর ভেতর এতটুকু সম্ভাবনা দেখলে তিনি স্পষ্টভাবে বলে

দিতেন। কোনও রাখঢাক ছিল না তাঁর মধ্যে। স্পষ্ট অথচ কটুত্বহীন কথা ছিল তাঁর চরিত্রের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন বোম্বেতে হেমন্তদা খুবই ব্যস্ত ছিলেন। নিজে গাইছেন, সুর দিচ্ছেন। কলকাতা-বোম্বে ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মতোই ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটত। প্রয়োজন ছাড়া তিনি কখনও কারোর সঙ্গে অহেতুক সময় নষ্ট করতেন না। আমি তখন বোম্বেতে ছুটিতে গিয়েছিলাম। ওখানেই একদিন একটা অনুষ্ঠানে গান গাইতে গেছি। সেখানে অনেক শিল্পী ছিলেন। হেমন্তদাও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আলাপ তো আগেই ছিল। আমাকে দেখে বললেন, আরতি, আমি খবর পাঠিয়েছি, তুমি কি পেয়েছ? তোমাকে দিয়ে একটা গান রেকর্ড করাতে চাই। সিনেমার গান। লতা মঙ্গেশকর তোমার সঙ্গে গাইবে। তোমাকে গাইতে হবে। মা-মেয়ের দ্বৈতকণ্ঠের গান। তুমি মেয়ের গানটা গাইবে। সেই ছবির নায়িকা ছিলেন মীনাকুমারী। আমি বললাম, ঠিক আছে। তারপর ফের একদিন তাঁর বাড়িতে গেলাম। ফাইনাল কথা হলো। দাদার একটি রিহার্সাল রুম ছিল। সেখানকার ঠিকানা দিয়ে বললেন, ওখানে চলে এসো। লতাকেও বলে দিয়েছি। বিশ্বাস করুন, সত্যি বলছি, আমি ভাবতেই পারিনি আমাকে সিনেমার গান গাইতে হবে। ভালোবেসে গান গাই – এই পর্যন্তই। যাইহোক সেখানে গেলাম। লতাজিও এলেন। দাদা দু'জনকে নোটেশন বুঝিয়ে দেন। সেইমতো দু'জনে রিহার্সাল করলাম। লতাজিও দারুণভাবে আমার মতো নবাগতা শিল্পীকে সহযোগিতা করলেন। অবশেষে মেহবুব স্টুডিওতে গান রেকর্ড করা হলো... 'বিল্লি বাজায়ে বাজা...'

তারপর আমি কলকাতায় চলে এসেছি। কিছুদিন পর ফের বোম্বে গেলাম। হেমন্তদা আবার ডেকে পাঠালেন। গেলাম তাঁর বাড়িতে। বললেন, আগের গানটা দারুণ গেয়েছ, তোমাকে ওই ছবির জন্য আরও একটি গান গাইতে হবে। মা-মেয়ের। লতাজি আর আমি গাইলাম, 'ছমছম ছমছম...'। এভাবেই সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রথম গান রেকর্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা। ওই ছবি মুক্তি পাওয়ার পর আমার গান সকলে প্রশংসা করলেন। তখনকার দিনে বোম্বেতে গানের জগতে এত দিকপাল ব্যক্তিত্বরা ছিলেন যে, প্রশংসা পাওয়া বা আদায় করা খুব কঠিন ছিল। সেই কঠিন জায়গা থেকে আমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। এজন্য হেমন্তদা'র কাছে চিরঋণী তো বটেই।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমি যখন কিশোরী তখন হেমন্তদা বোম্বে-কলকাতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। ওখানে হিন্দি ছবির জন্য কাজ করছেন, আবার কলকাতায় সঙ্গীত পরিচালনার পাশাপাশি গান গাইছেন। যাইহোক, হেমন্তদার হাত ধরেই সেই প্রথম গান গাওয়ার পথচলা শুরু। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস। বাংলা আধুনিক, সিনেমা এবং রবীন্দ্রনাথের বহু গান তাঁর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছি। রেকর্ডিংয়ের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন। মানাদা (মান্না দে) রেকর্ডিংয়ের সময় সহশিল্পীদের সঙ্গে মজা করতেন। আকারে-ইঙ্গিতে রসিকতা করতেন। কিন্তু হেমন্তদা ছিলেন অন্যরকম। বেশ গম্ভীর। হাতে সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিয়ে অনায়াসে নিখুঁতভাবে গানটা করতেন। অনেকে ভাবেন, সিগারেটে কণ্ঠের ক্ষতি হয়। কিন্তু হেমন্তদা ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। বলতেন, সিগারেট না-খেলে গানটা ঠিক আসে না।

মান্নাদা বা হেমন্তদার সঙ্গে যখনই ডুয়েট গেয়েছি, রিহার্সাল হত কলকাতার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও অথবা দমদমে যশোর রোডে এইচএমভি'র রেকর্ডিং স্টুডিওতে। শুধু রেকর্ডিং নয়, দেশ-বিদেশ, কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় হেমন্তদা'র সঙ্গে মঞ্চে গান গেয়েছি। হাজার-হাজার রাত পার করেছি শুধুই গান গেয়ে। সেই সময় সারা বছর গানের জলসা লেগেই থাকত। বড় মাপের অনুষ্ঠান হতো রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন আর কলামন্দিরে। এ রকমই এক অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে। ১৯৭৪ বা ১৯৭৫ সাল হবে। কলামন্দিরে এক জলসার আয়োজন করেছিলেন চিত্র-পরিচালক অরিন্দম শীলের বাবা ??। শিল্পী ছিলাম মানাদা, হেমন্তদা আর আমি। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব টিকিট শেষ। আমরা গেয়েছিলাম শুধু সুধীন দাশগুপ্ত আর নচিকেতা ঘোষের সুরে গান। তখনকার শিল্পীদের ব্যবহার অন্যরকম ছিল, যা আজকের দিনে ভাবাই যায় না। ধরুন, কোনও অনুষ্ঠানে গেছি, সেখানে গিয়ে দেখি মান্নাদা, হেমন্তদা, আমি বা অন্য কেউ রয়েছেন। তখন তাঁরা বলতেন, আরতি তুমি আগে গেয়ে নাও। পরে আমরা গাইছি। এখন কেউ বলবে এমন কথা? বোধহয় না। দু'জনেই আমার কাছে অনুপ্রেরণা। ভারতবিখ্যাত শিল্পী হলেও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল দেখার মতো, শেখার মতো। আমরা তাঁদের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়ে এসেছি।

যাইহোক, আবেগবশত অন্য কথায় চলে এলাম। হওয়াটাই স্বাভাবিক। এত বছরের যোগাযোগ, পারিবারিক সম্পর্ক, একসঙ্গে গান গাওয়া, রেকর্ড করা। স্মৃতির পাতায় কত কথা ভাসছে।

তখনকার দিনে পুজোর গানের রেকর্ড বের হতো। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল, হেমন্তদার সুরে গান গাইব। সেকথা দাদাকে বলেছিলাম। উনি কাউকে নিরাশ করতেন না। যেমন বলা তেমন কাজ। সুযোগ এল ১৯৭৭ সালে। সুবীর হাজরার কথায়, হেমন্তদার সুরে গাইলাম 'কত দূর আর কত দূর, প্রেমেরই সেই মধুপুর'। সবার খুব পছন্দ হয়েছিল কাব্যধর্মী গানটি। হেমন্তদা আমায় বলতেন, 'তোর পুজোর গানগুলো, প্রত্যেকটা আলাদা রকমের।' একথা শুনে খুব আনন্দ হয়েছিল।

হেমন্তদা যেমন সিনেমা, আধুনিক গান অসাধারণভাবে দরদ-ঢালা কণ্ঠে গাইতেন, তেমনি অসম্ভব ভালো গাইতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। ওঁর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেকেই গাইতে পারতেন না। উনি নিজস্ব ঢঙে গাইতেন। এমনিতে উনি ভীষণ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ, তার ওপর সুকণ্ঠের অধিকারী। সেই কণ্ঠকে যত্ন করে লালিত করেছেন। তার ওপর ছিল গানের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ। আমি যদিও দেবব্রত বিশ্বাসের ছাত্রী ছিলাম, তবুও হেমন্তদার মতো কারো কণ্ঠে রবিঠাকুরের গান ভালো লাগত না। বলতে পারেন, আমার দুর্বলতা। দেখতাম তো একটা গান রেকর্ড করার আগে কী পরিশ্রমই করতেন। যতক্ষণ না নিজে তৃপ্তি পাচ্ছেন ততক্ষণ রেওয়াজ করেই যেতেন। দেবব্রত বিশ্বাসকে সকলেই জর্জদা বলে ডাকতেন, আমিও। জর্জদাও হেমন্তদাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনিও তাঁর গানের প্রশংসা করতেন। অনেকেই জানেন, জর্জদাকে কাকা বলে ডাকতেন হেমন্তদা। একদিন হেমন্তদা জর্জদাকে বললেন (আমাকে উদ্দেশ্য করে) কাকা, ছাত্রী কেমন গান শিখছে? উত্তরে বললেন, দারুণ, তোমাকে তো আরতি খুব ভালোবাসে! কাকা, ভাইপোর রসিকতা দেখতে-দেখতে আমিও একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠলাম।

অনেকে প্রশ্ন করেন, সলিল চৌধুরী, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর হাজরা, মুকুল দত্ত, মিল্টু ঘোষদের মতো গীতিকার না থাকলে কি

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা আমজনতার কাছে এত জনপ্রিয় হতে পারতেন? উত্তরে বলি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো কালজয়ী শিল্পীর কাছে এমন প্রশ্ন হাস্যকর বটে! তিনি এমন একজন শিল্পী যদি সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তাতেই তিনি মানুষের হৃদয়ে চিরদিন থাকতেন।

বিতর্কে না যাওয়াই ভালো।

এবার আসি সিনেমার গান প্রসঙ্গে। আমি বহু ছবিতে হেমন্তদার সুরে এবং তাঁর সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গান গেয়েছি।

ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'য় ধ্রুপদী, ধামার, ধ্রুপদ ইত্যাদি ছিল। ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই..' গানটি গেয়েছিলাম। সেই গান শুনে সকলেই খুশি। ১৯৬৫ সালের কথা। তরুণ মজুমদার (তনুবাবু) 'একটুকু বাসা' নামে একটি ছবি করবেন বলে ঠিক করেছেন। মনোজ বসুর কাহিনি। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্তদা। সেইসময় তনুবাবু ঋত্বিকদাকে বললেন, আমিও আরতিকে দিয়ে আমার ছবিতে গান গাওয়াবো। ঋত্বিকদা বললেন, ঠিক আছে। আমি গাইলাম। লিপ দিয়েছিলেন সন্ধ্যা রায়। যেমন গেয়েছিলাম, তেমন লিপ। যাই হোক তারপর থেকে তনুবাবুর ছবিতেও হেমন্তদার পরিচালনায় গান গেয়েছি। সেইসময় তরুণ মজুমদার আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুপারহিট। 'একটুকু বাসা'য় 'আমি সংসারে রব না মা' দিয়ে শুরু করে প্রায় তিন দশক হেমন্তদার সুরে বহু ছবিতে গান গেয়েছি। এখনই মনে পড়ছে 'অজানা শপথ'-এ 'ওগো বন্ধু আমার', 'পরিণীতা'য় 'লাজে রাঙা হল', 'দাদার কীর্তি'তে 'বয়েই গেছে' আর 'রজনী'তে 'তোমার দেওয়া ফুল'। সাতের দশকে 'ময়না' ছবিতে হেমন্তদার সঙ্গে আমার ডুয়েটে 'শ্যামলা গাঁয়ের কাজলা মেয়ে' অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বলতেন, এমন করে গাও, অমন করে গাও, শ্রুতিমধুর হবে। পরামর্শমতো গাইতাম। সত্যিই সেই গান অন্যমাত্রা পেত।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক, সি রামচন্দ্র একবার হেমন্তদাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো গায়ক, সুরকার, শিল্পী, প্রযোজক–সব রকম ভূমিকা পালন করেছেন। কোনটি প্রিয়। তাঁর উত্তর ছিল 'গায়ক'। আমিও তাই বলব। একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তিনি অনন্য। আমার মনে হয়, সুরকার হিসেবে নিজের মূল্যায়নে খানিকটা উদাসীন ছিলেন। সকলেই জানেন, হেমন্তদা'র সুরসৃষ্টি সম্পর্কে বাঁধা গতের কিছু কথা শুনেও অভ্যস্ত। তিনি খুব সহজ-সরল সুর করতেন। সেজন্য শিল্পীদের বেশি পরিশ্রম করতে হতো না। অথচ গভীরভাবে সেই সুর আত্মস্থ করলে বোঝা যায়, ভেতরে কী গভীর সঙ্গীতরস রয়েছে! আমার তো মনে হয় না বাংলা ছবিতে, তাঁর মতো সুর দেওয়া গান আর কারোর হিট করেছে।

কোন গানগুলির কথা উল্লেখ করি বলুন তো? 'ফুলেশ্বরী' ছবির প্রতিটি গান আজও মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। এছাড়া আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে, 'পথ হারাবো বলেই এবার', 'আমি ঝড়ের কাছে', 'গাঁয়ের বধূ', 'রানার', 'এই মেঘলাদিনে একলা', 'মুছে যাওয়া দিনগুলি', 'এই রাত তোমার আমার', 'নীড় ছোট ক্ষতি নেই', 'আমি অন্ধকারের মাঝে চলতে-চলতে'...ইত্যাদি কত গান! বলে শেষ করা যাবে না। দুঃখের গান, প্রেমের গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত– সবেতেই তিনি সফল। আমরা তখন খুব ছোট, হেমন্তদা'র কণ্ঠে 'যৌবনে আজ' গানটি শুনে মন চঞ্চল হয়ে উঠত।

হেমন্তদা আর উত্তমকুমারের যুগলবন্দিও বাণিজ্যসফল। একজনের কণ্ঠ অন্যজনের লিপ। বোঝার উপায় ছিল না। হেমন্তদা যেভাবে গাইতেন পর্দায় মনে হতো উত্তমদা-ই গাইছেন। আমার মনে হয় 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে' গানটি তিনি ছাড়া আর কারোর পক্ষে গাওয়া সম্ভব ছিল না। কেউ পারতেন না।

শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি মানুষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আরও মানবিক। নীরবে দান-ধ্যান করতেন। এ ব্যাপারে প্রচারবিমুখ ছিলেন। এই ব্যক্তিত্ববান পুরুষটি খুব 'পার্টিকুলার' ছিলেন। যখন যাঁকে কথা দিতেন, সময়ের অন্যথা হতো না। বেশ শিক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। রিহার্সাল করা, রেকর্ডিং কিংবা পাবলিক ফাংশন– সবেতেই সময় মেনে চলতেন। এই নিয়মানুবর্তিতা ছিল বলেই সারাদিন রুটিন মেনে বহু কাজ করতে পেরেছেন।

ওভারটাইমের বিরোধী ছিলেন। কারণ, প্রযোজকের পয়সা নষ্ট করতে চাইতেন না। এই গুণগুলো অনেকের মধ্যে নেই। অনেকে অনামী পরিচালকদের সেভাবে গুরুত্ব দিতেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন তিনি। সকলের কথা শুনতেন। সাধ্যমতো সহযোগিতা করতেন। সেসব করতেন বলেই অনেক পরিচালক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

কত আর বলব, শেষ নেই। শেষ হবেও না। একজন পরিপূর্ণ মানুষ, শিল্পী, সুরকার, প্রযোজক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। সকলে তাঁকে গানে, কথায়, সুরে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমার শ্রদ্ধা আরও নিবিড়। আমি তাঁকে শতবর্ষের শ্রদ্ধা জানাব 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে' এই গান দিয়ে। যাঁর কথা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর নচিকেতা ঘোষের। এই গান আর কোনোদিন হবে না। আমি বেঁচে থাকতে এ রকম হৃদয় নিঙড়ে নেওয়া গান আর শুনতে পাব নাকি জানি না। তিনি কালজয়ী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁকে প্রণাম।

অনুলিখন: অশোক সেন

হেমন্ত, বসন্তের বজ্রঘোষক

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

এক বেকার ছেলে। গান গায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা পায়নি। রেকর্ডে ‘সোলো’ গান গাওয়ার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পায় এক নামী গায়কের ফাইফরমাশ খাটার। কিন্তু তার বিনিময়েও স্বপ্নপূরণ হয় না তার। একসময় পাগল হয়ে যায় সে।

গল্পের নাম ‘শতাব্দীর আর্তনাদ’। প্রকাশ ১৯৮৮-তে।

এক খেটে খাওয়া দম্পতি। ভাতের হোটেল চালায় ফুটপাতে। একদিন ভেঙে দিয়ে যায় কর্পোরেশন। এক নামী ব্যক্তির বাড়ির গ্যারেজে সাময়িক আশ্রয় মেলে। তারপর আবার ফুটপাতের ভরসাতেই জীবন সংগ্রামে নেমে পড়ে ওই দম্পতি। এবার বাঁচিয়ে দেয় এক মন্দির আর এক মসজিদের সহাবস্থান।

গল্পটির নাম ‘রক্ষাকবচ’। গল্পটি প্রকাশ পায় ১৯৮৮-তে।

এক কেরানি। নিম্নমধ্যবিত্ত। একঘেয়ে দিশাহীন জীবন আর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলা বাজারদরের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা। সেই আণুবীক্ষণিক জীবনে যা ঘটে তার ভেতর হয়তো বড় কোনও নাটক নেই। বৈচিত্র নেই। কিন্তু সে জীবনের দেওয়ালেও কবিতা আছে। পরিবারের মানুষগুলোর একে অপরকে ধরে-আঁকড়ে বেঁচে থাকার ভেতরে। বা সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি নামার সময়ে জানলা গলে চলে আসা এক টুকরো স্বপ্ন দেখা চাঁদের মতো।

এ গল্পের নাম ‘একটি দিন’। প্রকাশকাল ১৯৫৮।

এই তিনটি গল্পেরই লেখক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমি যে গান গেয়েছিলেম

একজন জনপ্রিয় গায়কের জন্মশতবর্ষ। তাঁকে নিয়ে লেখা। অথচ লেখা শুরু করলাম কোনও গানের কলি দিয়ে নয়। বরং তিন-টুকরো গল্প দিয়ে।

কারণ গায়কের নাম যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

যিনি গান করেন, সলিল চৌধুরির কথায় ‘ঈশ্বরের কণ্ঠে’।

তিন যখন লেখেন তখন বোঝা যায় তাঁর বন্ধুদের নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ।

কিন্তু তার থেকেও বড় কথা তিনি গল্প থেকে গানে যান। গানের ভেতর ফুটিয়ে তোলেন গল্প। তাঁর সমসময়ের সুরকারদের অনেকেই জানতেন হেমন্ত কণ্ঠের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ছবি। সেই মতোই গানের কথা লেখা হতো, সুর রচনা করা হতো।

সেই ছবিই আসলে গল্প। গল্পের ছবি। যাতে ফুটে ওঠে শুধু প্রকৃতি কিংবা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস-বিষাদ নয়। বরং ফুটে ওঠে নিটোল এক-এক টুকরো চরিত্র। তাদের এক একটা অবস্থান। হাসি-কান্না-উদাসীনতার এক-এক টুকরো মালা।

সেটাই গল্প। সেটাই মানুষের গান। হেমন্তর কণ্ঠ উপমায় ‘দেবদুর্লভ’। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা বোধহয় হেমন্তর গায়ন, গায়কী, গান-গাওয়া অনেক অনেক মানুষের হয়ে, ‘মাস সং’-এর পক্ষ নিয়ে।

বহু বছর আগে নজরুল মঞ্চে এক গানের অনুষ্ঠানের আগে গ্রিনরুমে আড্ডার মেজাজে মান্না দে’র মুখে এক অদ্ভুত স্বীকারোক্তি শুনেছিলাম। বলেছিলেন, “একটা ব্যাপারে হেমন্তবাবু আমাদের

সবাইকে ছাপিয়ে যেতেন। সেটাই ছিল তাঁর 'ওভার দ্য টপ' থাকার রহস্য। তিনি এমনভাবে গানটা গাইতেন যে শুনলে সবার মনে হতো গান গাওয়াটা কী সহজ কাজ। ওই গান তো আমরা সবাই গাইতে পারি।'' অনেকদিন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেদিন মান্নাবাবুর মুখে 'ওভার দ্য টপ' কথাটা ভুলতে পারিনি।

মান্না দে'র এই কথাকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে ভাবলে সবাই হয়তো এটা ভাবতে পারবেন, হেমন্ত'র গায়নে আর একটা 'ম্যাজিক' আছে। তাঁর গান গুনগুন করতে গেলেই পুরোটা বা অনেকটা মনে পড়ে যায়। তাঁর গানের কথা মনে করা নিয়ে সমস্যা হয় না! পরপর মনে চলে আসে! কদাচ তিনি গান লেখেননি। কিন্তু গানের রানির এই আঁচড় কেটে বসা, তাঁর কৃতিত্বের ঘরেই যাবে। তিনি তাঁর গায়নে গানের কথাকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে গেয়েছেন, প্রয়োজনে কথাগুলোকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে গেছেন, তা তাঁর গানকে সবার থেকে আলাদা করেছে।

এটা ঠিক গানের মধ্যে অভিনয় করা নয় কিন্তু। কারণ একটা গানের মধ্যে তুমুল নাটকীয়তা তৈরিতে মান্না দে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেখানে যেটা করতেন, সেটা হলো একটা 'স্টেটমেন্ট' তৈরি করা। একজন মানুষ বা একটি চরিত্র তাঁর ভাবনা বা অনুভূতি দিয়ে একটা কথা বলে চলেছে। সুরটা সেখানে বাহন। বাড়তি আকর্ষণ। কিন্তু মূল লক্ষ্য ওই কথাটা, ওই বাণীটাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া।

একটি গানের উদাহরণ দেব। 'অদ্বিতীয়া' ছবিতে হেমন্তের কণ্ঠে 'যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে কেন বলো কাঁদালে আমায়' গানটি শুনুন। ওই গান লতা মঙ্গেশকরও ওই ছবিতে গেয়েছেন। আর গেয়েছেন চরম 'ঐশ্বর্যময়'ভাবে। নানা রাগ-রাগিনী মোচড়-মুড়কি সমেত। অথচ হেমন্ত যখন গান, তখন গানটা যেন একটু 'চাপা' লাগে। মনে হয় যেন নোটগুলোর গভীরে যাচ্ছেন না, আলতোভাবে ওপর থেকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন একটু নিচুচাবিতে! অথচ তিনিই তো এই গানের সুরকার। এর সুরের 'ঐশ্বর্য' সম্পর্কে তাঁরই তো সচেতন থাকার কথা সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু 'সুর, সুর, তোমার বাণী নেই, কুসুম' এমনটাতে তো বিশ্বাসী নন তিনি। পর্দায় যে মানুষটির কণ্ঠে গানটি 'প্লেব্যাক' করেন তিনি (অভিনেতা ছিলেন সর্বেন্দ্র), সেই মানুষটি তার ফেলে আসা প্রেমিকার স্মৃতিচারণা করছে, তারই কণ্ঠে একদা শোনা গানটি আওড়, ফলে তা তো স্বগতোক্তির মতোই হবে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়াই হবে। সুরের পূর্ণ প্রকাশ তো সেখানে হবে না।

এই যে একটা গান দিয়ে একটা ব্যক্তিত্বের ভেতর ঢুকে যাওয়া– এটাই তো হেমন্ত। এটাই তো হেমন্ত-গীতি। বা হেমন্ত-গায়ন। আর এখানেই তিনি বাংলা আধুনিক গানের সবচেয়ে বড় পুরুষ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সফল উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথও তো চেয়েছিলেন সুরকে ব্যবহার করে সুরকে অতিক্রম করতে। বাণীকে প্রতিষ্ঠা দিতে। গানে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া আনতে।

মনের কথাটি ওগো

ভি শান্তারাম তাঁর 'শিবশক্তি' ছবিটির সুর হেমন্ত করতে পারবেন কি না, একথা জিজ্ঞেস করায় হেমন্ত বলেছিলেন, ''আমার কাছে খনি আছে'' এবং তারপর গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের গোটা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি। 'শ্যামা', 'শাপমোচন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'মায়ার খেলা'– সবকটি নৃত্যনাট্যের সমস্ত গানই আগাগোড়া মুখস্ত ছিল তাঁর। একথা শুনলে আজ সকলে অবাক হবেন যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন নিয়ম করে গানের রেওয়াজে খুব একটা বিশ্বাসী ছিলেন না। দশ-বারোদিন অন্তর খেয়াল-খুশি মতো হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বসতেন গানের অভ্যাসে। আর তখন প্রায়শই ক্লান্তিহীনভাবে একের পর এক গেয়ে যেতেন এই রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যগুলি! সেটাই ছিল তাঁর রেওয়াজ।

বহুবার বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সুরের গমনই তাঁকে প্রাণিত করেছে সুরকার জীবনে। বলেছেন, ''রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েই আমি কথার সঙ্গে সুরের সম্পর্কটা বুঝেছি।'' তবে তথাকথিত 'শান্তিনিকেতনী স্টাইল'-এ যাতে যেতে না পারেন, সে ব্যাপারেও সচেতন থেকেছেন আগাগোড়া। পঙ্কজ মল্লিকের শিষ্য হওয়া, জর্জ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা–সবকিছু'র পরেও রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়নে তিনি চূড়ান্ত মৌলিক। তবে 'বিদ্রোহী' নন। বহু বছর আগে আত্মকথা 'আমার গানের স্বরলিপি' বলতে বসে সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার সময় মনটাকে ব্যবহার করতে শেখা উচিত।

বলেছিলেন, ''শুধু গান গাইলেই হবে না, জগতে

যা কিছু ভালো ঘটছে সেসবের সঙ্গেও পরিচয় হওয়া দরকার। তবেই না মনটা গড়ে উঠতে পারবে। আমি এটাকেই তালিম বলতে চাইছি।’’

অর্থাৎ শুধু গল্প নয়, শুধু রাগ-রাগিনীর জ্ঞান নয়, শুধু উচ্চারণ বা গায়কী পদ্ধতিও নয়, সবার ওপরে আর একটা জিনিস চাই। ছোট্ট একটা শব্দ।

মন।

ওই লেখাতেই বলা আর একটা কথা, ‘‘আমার নিজের ঢংটা যে কাউকে শিখিয়ে যেতে পারলাম না তার জন্যেও আমার কোনও আপশোস নেই। তার কারণ আমার মনে হয় এটা কাউকে শেখানো যায় না। কেউ নিজে যদি উপলব্ধি করে তবে গান শুনেই বুঝতে পারবে।’’ তার মানে এখানে আরও একটা শব্দ পেলাম।

উপলব্ধি।

এই মন থেকে উপলব্ধির দিকে যাওয়াটাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান।

বাঙালির বসন্তের অনুভবে যেভাবে মেধা লেগে থাকে। মনুষ্যত্ব লেগে থাকে।

মেধা আর মনুষ্যত্ব একসঙ্গে ঘর করছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে।

তা নাহলে, তাঁর গানের সবচেয়ে বড় সাফল্য কী, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতেন না ‘‘ভিখারি ভিড়ে করছে ‘চরণ ধরিতে’ গেয়ে, এর চেয়ে বড় সম্মান শিল্পীর পক্ষে আর কী থাকতে পারে।’’

ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম

আর একটা সাফল্য ছিল তাঁর। বাংলা গানের ধারা বদলে। ঘনিষ্ঠ মহলে বলতেন সেটা। তা হলো বাংলা আধুনিক গানকে বড়লোকদের আসর থেকে বের করে আনা, সন্ধ্যা সেনকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন প্রথম যখন গান গাইতে এলেন সেই সময়ের কথা, ‘‘তখন এদিকে ছিল বৈঠকি আসর। ধনীগৃহের ব্যাপার সেটা। সেখানে ধ্রুপদী, খেয়াল, ঠুংরি, তথা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে শুনতেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু শ্রোতা। এতবেশি পাবলিক ফাংশনের ছড়াছড়ি তখন ছিল না। মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউশনে গানের ফাংশন হতো, বেশিরভাগই ছাত্রদের আয়োজিত।’’

সেই সময়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জুটি বাঁধছেন এক অখ্যাত তরুণের সঙ্গে। যে তখন যতটা না গানের জগতের লোক, তার থেকে বেশি রাজনৈতিক কর্মী। পুলিশের তাড়া খাওয়া, আত্মগোপন করা মধ্যকুড়ির কমিউনিস্ট কর্মী। সে ছেলের ভাঁড়ারে তখন বুকভরা সাহস আর কবিতায় সুর বসানো কিছু গান দিয়ে ভাঙচুরের ইচ্ছে। কে হাতে নেবে এই আগুন, যার নাম সলিল চৌধুরি? যিনি নিয়েছিলেন তাঁর নাম ‘অকুতোভয়’ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৯-এ বেরলো ‘গাঁয়ের বধূ’। সলিল-হেমন্ত প্রথম যুগলবন্দি, ‘কমরেড ইন আমর্স’। বদলালেন হেমন্ত, নিজে-নিজেকে, এই নতুন যাত্রাপথে। এর আগে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ‘বেসিক’ গানের রেকর্ড শুনুন। নিজের সুরে ‘কথা ছিল, কথা ছিল’, শৈলেশ দত্তগুপ্তের সুরে ‘আকাশে দুটি তারা’ বা অনুপম ঘটকের সুরে ‘প্রিয়ার প্রেমের লিপি’। তফাতটা বুঝতে পারবেন।

সেখানে সুরের ঝরনা আছে। প্রেমের নিবেদন আছে। আগুন নেই।

কেমন ছিল দু’জনের সেই সাক্ষাৎকার আর সিদ্ধান্তের সন্ধ্যাটা। সলিল চৌধুরি জানাচ্ছেন, ‘‘ইন্দিরা সিনেমার পাশে ইন্দ্র রায় রোডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেটা ১৯৪৮ কী ১৯৪৯ সালের একসময় হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলো। আলাপ পরিচয় হলো।... গণনাট্যের বেশ কয়েকটি গান আমার জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই গানগুলোর কয়েকটি গেয়ে হেমন্তদাকে শোনালাম। যেমন, ‘বিচারপতি তোমার বিচার’, ‘ও আলোর পথযাত্রী’, ‘ঢেউ উঠছে কারা টুটছে’ ইত্যাদি। ...হেমন্তদা খুব তারিফ করলেন। কিন্তু বললেন, ‘এসব গান তো রেকর্ড করা যাবে না। অন্য গান থাকে তো দাও।’ অন্য গানের কথা তখন ঠিক মনে পড়ছিল না।’’

এরপর ফিরে আসার সময় হেমন্তবাবুর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সলিল

চৌধুরির মনে পড়ে গেল একখানা গানের কথা। যা তিনি অর্ধেকটা সুর করেছেন তখনও। সুরটা করেছেন নৈহাটিতে শ্যামল মিত্র বলে এক তরুণ গায়কের বাড়িতে বসে তারই হারমোনিয়ামে। শ্যামল তখন নৈহাটি আইপিটিএ’র ‘লিড’ গায়ক। সে গানের কথা শুনে আবার ওপরে ডাকলেন হেমন্ত। শুনলেন। এবং বললেন, ‘‘তুমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিয়ে এস।’’

বাকি অর্ধেকটা অর্থাৎ এই গান ‘গাঁয়ের বধূ’র ‘ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনী’র অংশটা লেখা ও সুর হলো সেই রাতেই। দিন দু’য়েকের মধ্যে পুরো গানটা সুর-সমেত রপ্ত করিয়ে এলেন হেমন্তবাবুকে। আর এর পরেই ঘটল বিপর্যয়। যে বাড়িতে ‘শেল্টার’-এ ছিলেন সলিল, পুলিশ ‘রেইড’ করল সেই বাড়ি। ধরা পড়লেন আশ্রয়দাতা দুই ভাই, দুই কমরেড সুরপতি নন্দী ও ভূপতি নন্দী। কোনোরকমে বাঁচলেন সলিল, ভূপতি নন্দীর মা তাঁর পরিচয় দিলেন পুলিশের কাছে নিজের ছোট ছেলে, ‘নৃপতি নন্দী’ বলে। পরের দিন ভোরেই সলিল চৌধুরি চলে গেলেন সন্দেশখালির ভাঙড়। আন্ডারগ্রাউন্ডে।

সেটা শেষ করে যখন ফিরলেন শহরে, এসে শুনলেন রেকর্ডে বাজছে ‘কোনো এক গাঁয়ের বধূ’। সেটাই সেবার শরতে হেমন্তবাবুর পুজোর গান। শুনে থ’ সলিল! কারণ গানের সুরটা তিনি শুনিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রেকর্ডে গানের অপরিহার্য অংশ যে ‘অর্কেস্ট্রেশান’, ‘ইন্টারল্যুড’ ও ‘প্রিল্যুড’—তার কিছুই তো তিনি করে যাননি। একখানা রেকর্ড হাতে নিয়ে দেখলেন, সুরকার হিসাবে একমাত্র তাঁরই নাম জ্বলজ্বল করছে সেখানে।

একই ঘটনা ঘটল ‘রানার’ গানের ক্ষেত্রেও দু’বছর বাদে। এবারও সলিল গ্রেপ্তারি এড়াতে আন্ডারগ্রাউন্ডে। আর এবারও সলিলের দেওয়া সামান্য ‘হিন্টস’কে ব্যবহার করে গোটা ‘অর্কেস্ট্রেশান’ করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।’

‘ক্রেডিট লিস্ট’-এ অবশ্য এ’কৃতিত্বের ভাগীদার হলেন না।

একদিকে দুনিয়া-বদলানোর আগুনকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। অন্যদিকে সে প্রশ্রয়ে মিশে থাকছে চিরন্তন বাঙালি সৌহার্দ্য, ভদ্রতা আর নিখুঁত ‘কমরেডশিপ’।

এটাই হেমন্ত। সংযমী অথচ ‘ভ্যানগার্ড’। গানে, ব্যক্তিত্বে।

সে গানের পরশ লেগে হৃদয়...

তা না হলে ওই কণ্ঠ হতে বা বোধহয় ভুল বলা হলো, বলা উচিত ওই হৃদয় থেকে (যেখান দিয়ে তিনি গানটা আসলে গাইতেন) বেরিয়ে আসতে পারে ‘নীলামবালা ছ’আনা’, ‘শোনো বন্ধু শোনো’ বা ‘নীল আকাশের নিচে এই পৃথিবী’র মতো গান? মনে রাখতে হবে এরা কিন্তু গায়কের বাছাই করা ‘বেসিক রেকর্ড’-এর গান নয়। এরা সিনেমার গান। বিশেষত প্রথম দু’টি তো ‘পৃথিবী আমারে চায়’ বা ‘শাপমোচন’-এর মতো মূল ধারার রোম্যান্টিক ছবির (যথাক্রমে ১৯৫৭ আর ১৯৫৫’র) গান। তার মানে হেমন্তর ‘গাঁয়ের বধূ’, ‘রানার’, ‘অবাক পৃথিবী’রা শুধু পুজোর গানকে বদলায়নি। বদল এনেছে সিনেমা-সঙ্গীতেও। বাইরে তখন বামপন্থা ঘেরা তারুণ্যের বসন্ত-নির্ঘোষ। আর হেমন্তর কণ্ঠ সেই কালে সুরের দুনিয়ায় সেই বসন্তের রাষ্ট্রদূত। ফলে নায়ক-নায়িকার রোমান্সের মধ্যে গলা উঁচিয়ে উঠছে ‘লোয়ার ডেপথস’ থেকে ভেসে আসা এক এক টুকরো অস্তিত্ব-গান। যেন ছদ্মবেশী গণসঙ্গীত এরা। রোমান্সের রাজা ফিরিওয়ালা হতে হেমন্ত-কণ্ঠে গেয়ে উঠছে ‘নীলামবালা ছ’আনা’। আবার কখনও অন্য ছবিতে বেজে উঠছে পুঁজিবাদী এই নগর-সভ্যতার প্রতি ব্যাঙ্গদীর্ণ ধিক্কার ‘শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা।’ হেমন্ত-ছোঁয়ায় সে যেন এক অচেনা উত্তম।

এই গানগুলোর জন্য তো সেই কণ্ঠই দরকার ছিল, যা ‘স্টেটমেন্টিভ’, যা সুরের অলিগলির আবছায়া বার করে এনেও গানের কথাগুলোকে রাখে বুলেটসম চকচকে। দরকার ছিল তো ঝকঝকে রোদের মতো উদার ওই কণ্ঠের পেছনে থাকা সেই ব্যক্তিত্বটির (সাংস্কৃতিক পঠন-পাঠনে যাকে ‘পার্সোনা’ বলে), যে গানের ভিতরের ও বাইরের জগতে অবলম্বন দেয় প্রগতিশীল, বামপন্থী আর প্রতিষ্ঠানবিরোধী একটা আবহকে। সলিল চৌধুরিকে, জর্জ বিশ্বাসকে, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘকে। এইসব ‘ফ্রেসকো’ খোদিত হেমন্ত-পথে।

আর তাই ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এর মতো ধর্মাশ্রিত ভাবনা’র একটি ছবিতেও যখন সেই কণ্ঠে ফুঠে ওঠে, ‘কতদূর আর কতদূর বল মা’র মতো গান, সেখানেও ভাবাবেগের ‘প্যারাডাইস’ সরে যায়। তা সহস্র-কণ্ঠে বেজে ওঠে যেন এক ‘কয়্যার-সঙ’ হয়ে। নানারকম শোষণে দীর্ণ, ন্যুব্জ মানুষের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসার আর্তির দ্যোতনা শুনতে পাওয়া যায় এই গানে। (একটা গল্প শোনানোর লোভ সামলাতে পারছি না। এই ছবিটিতে যখন সুর করছেন হেমন্ত তখন তিনি বোম্বেরও সফল সুরকার। অনেক বাঙালি পরিচালকই তাই তাঁকে দিয়ে সুর করাতে বা গান গাওয়াতে বোম্বে পাড়ি দেন। এ’ছবির পরিচালক বিকাশ রায়ের সে আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। খুবই আতান্তরে পড়ে তখন তিনি। একদিন কলকাতায় এসে এ’গানটির রেকর্ড-রূপ তাঁর হাতে দিলেন হেমন্ত। আশ্বস্ত করে জানালেন, নিজেই উদ্যোগ নিয়ে নিজের অর্থে বোম্বে থেকে রেকর্ড করে এনেছেন গান। সঙ্গে বাড়তি চমক। এ’গানের হামিং অংশে কোরাসে গলা মিলিয়েছেন লতা মঙ্গেশকার ও গীতা দত্ত। তাঁদের হেমন্তদা’র অনুরোধে!)

বা ধরা যাক, ‘নীড় ছোট ক্ষতি নেই’, ‘আকাশ তো বড়’ (‘ইন্দ্রাণী’) গানটি। পর্দায় নিবিড় রোমান্স-নিবদ্ধ গান। কিন্তু আলাদা করে শুনতে শুনতে মনে হতো কখন যেন এ’গানে চলে এসেছে বাড়তি ব্যাঞ্জনা। নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্ন, সান্ত্বনা, বেঁচে থাকার উড়ান যেন মিশে যায় হেমন্তর ‘স্টেটমেন্টিভ’ বা বিবৃতি-খচিত কণ্ঠে। মনে পড়ে যায় তাঁর গল্পের সেই ফুটপাতে দোকান চালানো দম্পতি বা দিনের পর দিন টেনে চলা সেই কেরানি মানুষটির কথা। সত্যিই তো তাঁদের ছোট নীড়কে বড় করে দেয় আকাশ-তলে এসে দাঁড়ানোর স্পর্ধা।

হেমন্ত’র কণ্ঠ সেই ‘ক্যাটালিস্ট’ হয়ে ওঠে। হেমন্ত’র গায়ন সেই ‘ক্যাটাস্ট্রফি’ গড়ে তোলে। আর আমরা গণনাট্যের সুরে ঢলে পড়তে দেখি প্রগতি লেখকদের ছায়াকে।

‘ইন্দ্রাণী’র ওই গান হেমন্ত গেয়েছেন ১৯৫৮’তে। আর ওই বছরেই ‘দেশ’-এ বের হয় ‘একটি দিন’ গল্পটি। এত কথার পরে আর কি একে সমাপতন বলা যাবে? ওই বছরই তো পুজোর গানে হেমন্ত বলে দিয়েছেন, ‘‘দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক...।’’

একদিনেতে হইনি আমি তোমার এই হেমন্ত

১৯৫৮ সাল। দিল্লির রামলীলা ময়দানে বসেছে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলন। ডিসেম্বরের সুঁচ ফোটানো ঠান্ডা। রামলীলা ময়দানের একপাশে সারি সারি তাঁবু। সেখানে মাটিতে খড় বিছানো, আর একটা কম্বল, সেখানেই প্রতিনিধি ও শিল্পীদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা। রাত কাটানো মানে ঠান্ডায় সারা রাত প্রায় বসে কাটানো। কেবল অতিথি বিশিষ্ট শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা দিল্লির বিভিন্ন হোটেলে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কিন্তু সে ব্যবস্থা পছন্দ হলো না। সিমলায় সেদিন বরফ পড়ছে দিল্লিজুড়ে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। তবু হেমন্ত জেদ ধরে ওই মাঠের ক্যাম্পেই থাকতে চাইলেন। এটা দৃশ্য নম্বর এক।

দৃশ্য দুই। সন্ধ্যেবেলা মাঠ ভেঙে পড়েছে তাঁর গান শুনতে। বহু বাইরের মানুষও এসেছেন হেমন্তকুমারকে দেখতে-শুনতে। তাঁদের দাবি ‘হিন্দি গানা’। হেমন্তর সাফ জবাব ছিল সেদিন, ‘‘এই মঞ্চ থেকে আমি হিন্দি ফিল্মের গান গাইতে পারব না। এ অনুরোধ করবেন না। হিন্দি শুনতে চাইলে আমি হিন্দি গণসঙ্গীত গেয়ে শোনাবো।’’

এবার দৃশ্য তিন। ওই সম্মেলনে বাজেট ছাড়িয়ে ব্যয় হয়েছিল প্রচুর। কীভাবে সঙ্কট সামলানো যাবে, মাথায় হাত সবার! একমাত্র উপায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যদি পরের দিন একটা অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু হেমন্তর পরদিন বোম্বেতে চুক্তিমতো রেকর্ডিংয়ের কাজ। যা না করলে খেসারত দিতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা। তবু সে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে সংগঠনের স্বার্থে দিল্লি থেকে গেলেন হেমন্ত। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান করলেন। তার ওপর বলরাজ সাহানি, দেবব্রত বিশ্বাসদের সঙ্গে নিয়ে কাপড় পেতে দর্শকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন অর্থ, সোনার গয়না ইত্যাদি। একথা জানতে পারি উত্তরকালে দিলীপ সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণ থেকে।

মারা যাবার ঠিক আগে হাসপাতালে যাচ্ছেন। তার আগে দেখে গেলেন পরের মাসের খামগুলো ঠিক আছে কি না। ওইসব খামের ভেতর যে ভরা নির্ধারিত অঙ্কের টাকা। যা মাস শেষে পৌঁছে যাবে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের কাছে। যা হয়ে উঠবে তাদের বেঁচে থাকার পাথেয়। নীরবে বহু বছর ধরে প্রতি মাসে এটা করতেন তিনি।

‘হেমন্ত’ নামটা উচ্চারিত হলেই তাই তাঁর এই শতবর্ষেও মনে হয়, শীত নয়, বসন্তের আর বেশি দেরি নেই।

লেনিন মানবতার পথে

শুভময়

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

মার্কস পরবর্তী সময়কাল থেকে বৈপ্লবিক শ্রমজীবী শ্রেণির আন্দোলনের ফলন হিসাবে লেনিনই মহত্তম চিন্তক। বুর্জোয়া সমাজের প্রকাশ্য পরিস্থিতির ঠিক তলায় সর্বহারার বিপ্লবের দিকে যে প্রবণতাগুলি নিজেরাই কাজ করে যাচ্ছিল নিহিতে, তিনি তাকে নির্ণয় করেছেন অব্যর্থ। ধনবাদের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে যা নির্ণয় করেছেন মার্কস ঠিক সেটাই করেছেন লেনিন বিশ শতকে, বিশ শতক পার হয়ে আমাদের সময়ের জন্য। বিপ্লবের বাস্তবতা: এটাই লেনিনের চিন্তার আদত কথা এবং এখানেই মার্কসের সঙ্গে তাঁর নির্ধারক সংযোগ। সর্বহারার বিপ্লব বিষয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের শুদ্ধতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন লেনিন। এমন নয় যে, তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের কোনও উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। তিনি একে সংযুক্ত করেছেন মার্কস-প্রয়াণ পরবর্তী সময়ে ইতিহাস ধারার অগ্রবর্তী বিকাশের তত্ত্বের সঙ্গে। সর্বহারার বিপ্লবের বাস্তবতা আর দুনিয়ার ইতিহাসের দিগন্তে নয়, আত্মমুক্তিতে সক্রিয় শ্রমজীবীর মানুষের মাথার উপর যে দিগন্ত খিলানের মতো জেগে আছে, বিপ্লব এখন কর্মসূচিতে।

আটটি পূর্ণযতি চিহ্ন দিয়ে বাঁধা উপরের বাক্যগুলি এবং বাক্যগুলি নিয়ে পূর্ণ একটি অনুচ্ছেদে চোখ পার করার পরেই গণশক্তির পাঠক, অন্তত গণশক্তির পাঠক নিশ্চয়ই ভ্রূ দুমড়ে মুচড়ে বলে উঠবেন, এতো মহা তছরুপ হয়ে গেল।

তছরুপ হয়ে গেল এই কারণে, উপরের বাক্যগুলিতে কোথাও কোনও উদ্ধৃতি চিহ্ন নেই। অথচ কথাগুলি, আধখানা বাদে কোনোটাই বর্তমান লিখিয়ের নয়। পাঠকের ধীমান নজর এড়াবার নয়। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের প্রয়াণের পর দ্রুত হাতে যে প্রয়াণ-পুস্তক লিখে ফেলেন গেওর্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১), তার প্রথম অধ্যায় থেকেই খুঁটে, খুঁটে নেওয়া হয়েছে কথাগুলি। জোড়া দেওয়ার জন্য

নেহাত কিছু শব্দ পদ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সে সবও ওই প্রয়াণলেখ থেকেই। ১৯২৪ সালেই প্রকাশিত হওয়া এই প্রয়াণ-পুস্তক (Lenin : A Study on the Unity of his Thought) ইংরেজি অনুবাদে এসেছে অবশ্য অনেক পরে, ১৯৭০ সালে। এবং এই সেই অসামান্য প্রয়াণলেখ যার প্রথম অধ্যায়েই 'ভালগার' মার্কসবাদীদের সঙ্গে লেনিনের পার্থক্য দর্শিয়ে দিয়েছিলেন লুকাচ।

বিপ্লব ও ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন নিয়ে লুকাচের এই আকর কথাগুলিরই যেন চকিত এক অসামান্য সম্প্রসারণ সম্পন্ন করে ফেলেন তারিক আলি, সদ্য পার হওয়া নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষে। তাঁর বইয়ের (The Dilemmas of Lenin : Terrorism, war Empire, love, Revolution) উপক্রমণিকাতেই মহান বিপ্লবী পূর্বজদের সঙ্গে লেনিনের পার্থক্য টেনেছেন এইভাবে : 'ক্রমওয়েল এবং রোবসপিয়ের বিপ্লবকে আলিঙ্গন করেছেন যখন তাঁদের বিপ্লবের বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁদের ছাড়াও বিপ্লব ঘটে যেত। লেনিন বিপ্লবের জন্য কাজ শুরু করেছেন ১৯১৭ সালের পঁচিশ বছর আগে থেকে। ওই বছরগুলির মধ্যে চব্বিশটিতে তিনি কাজ করেছেন আত্মগোপনে, কয়েদখানায়, নির্বাসনে। নিজের জীবৎকালে একবার বিপ্লবকে দেখবেন এমন কল্পনা না করেই তিনি বিপ্লবের জন্যে কাজ করেছেন।'

লেনিন বিপ্লবের জন্যে কাজ করেছেন দুর্বিষহ শোকে, রাষ্ট্র ও সমাজের হেনে দেওয়া অবমাননা ও নিষেধাজ্ঞার অসহ্য দিনগুলি পার করতে করতে, প্রেমে ও পাহাড় কিংবা হ্রদের দিকে পদচারণায়, পাঠের নিবিড়, প্রবল ও মেধাবী বিস্তারে, লিখনে, ভাষণে, সহযোদ্ধাদের প্রতি স্নেহে সম্মানে যত্নে এবং শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত প্লাবন ডাকা আনন্দে। লেনিন বিপ্লব নির্মাণ করেছেন।

১

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি– দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। ২৮ অক্টোবর, ১৯৩০

তবু এই গদ্য বিপ্লব-নির্মাতা লেনিনকে নিয়ে নয়। মার্কসবাদের বিশ শতকের, অনাগতকালের তত্ত্বনায়ককে নিয়েও নয়। এই লিখন মানুষ লেনিনকে নিয়ে।

তাহলে তো এই প্রশ্ন পথরোধ করে দাঁড়ায়: মানুষ লেনিন আর বিপ্লবী লেনিন, তত্ত্বনেতা লেনিন কী স্বতন্ত্রজন?

নিশ্চয়ই নয়।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সেই মানুষ যাঁর আচরণে মানবিকতার প্রদর্শন মুদ্রা তৈরি হয় না তেমন (বরং মানবিকতার প্রকাশ্য কোনও নিদর্শন ও লক্ষণকে গোপন রাখাই তাঁর অভঙ্গুর অভ্যাস), তাঁর নির্মাণে বিপ্লব পৌঁছে যায় মানবতার মোহনায়। তাঁর তাত্ত্বিক একাগ্রতায়, তাঁর প্রখর রুক্ষতায়, তাঁর দুর্ধর্ষ কঠোরতায় বিপ্লব ও বিপ্লবকে রক্ষা করার লড়াই আসলে বিনিদ্র থাকে মানবতার পরিচর্যায়।

মানবতার জন্য কঠোরতম সাধনার অবিচলতা কোথা থেকে পেয়েছিলেন ভ্লাদিমির? লেনিন রুশ ইতিাসের ফলন। যেমন আরও বড়ো করে বলেছেন লুকাচ– তিনি দুনিয়ার বৈপ্লবিক শ্রমজীবী আন্দোলনের ফলন। আমরা মুহূর্তে খুব সঙ্কোচিত হয়ে গিয়ে বলে উঠতে পারি– লেনিন গোটা উইলিয়ানভ পরিবারের ফলন।

নিজেকে নিঃশেষ করে মানবতার মৌলিক বোধকে প্রতিপালন করা, এই পাঠ ছিল তাঁর পারিবারিক প্রবাহে। এই পাঠ ছিল জনশিক্ষার জন্য প্রাণপাত করা বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উইলিয়ানভের দায়বোধে, এই পাঠ ছিল মা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না-র শোক-আঘাত সহ্য করার দৃঢ়তায়, এই পাঠ ছিল দাদা আলেক্সান্দার (সাশা) ইলিচের একুশ বছর বয়সে শহীদব্রত বরণ করার দেশব্রতে, এই পাঠ ছিল তাঁর তিন বোন আন্না, মারিয়া, ওলগা এবং ভাই দিমিত্রি– অকালপ্রয়াত ওলগা বাদে এঁদের সকলের রাজনৈতিক কর্মনিষ্ঠায়।

দাদা আলেক্সান্দারের (সাশা) কথাই প্রথম বলতে হয়। কারণ সাশার সূত্র ধরেই উনিশ শতক অবধি রাশিয়ার বিপ্লবী 'সাধক'দের দুঃখসাধনার সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচের সংযোগ। সাশার কথাই প্রথমে বলতে হয়, কারণ উনিশ শতযের শেষ দশকে রুশ বিপ্লবী মহলে ভ্লাদিমিরের পরিচয়, শহীদ আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের ভাই, আর রাষ্ট্র এবং ওখরানা সমেত জারশাহি নানা নজরদারি ও নীপিড়ন যন্ত্রের কাছে তাঁর পরিচয়– ফাঁসির আসামি আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের ভাই। সাশার কথা প্রথমে বলে নিতে হবেই, কারণ সাশার সূত্র ধরেই রাশিয়ার বিপ্লবী কথাসাহিত্য ও চিন্তনধারার অন্যতম অগ্রপথিক নিকোলাই গাব্রিলোভিচ চেরনিশ্যেভস্কি (১৮২৮-৮৯)-র সঙ্গে ভ্লাদিমিরের যোগাযোগ। মেধায়, দাবায়, অধ্যয়নের একাগ্রতায়। সাশাই ভলোদিয়ার জীবনের প্রথম নায়ক।

লেনিনের শৈশব-কৈশোরের সবুজ উপত্যকায় চোখ রাখার প্রধান দুটি উৎসপথ: দিদি আন্না ইলিনিচনা-র রেখে যাওয়া একটি স্মৃতিকথন এবং আইজাক ডয়েশ্চারের সেই চমৎকার বই Lenin's Childhood (১৯৭০)। আন্না ইলিনিচনা (আনিয়ুতা) তাঁর স্মৃতিকথনে লিখেছেন, শিশু হিসাবে বড্ডো চিল-চিৎকারের ছিল ভলোদিয়া কিন্তু তার যাবতীয় হুজ্জোতি মুহূর্তে শান্ত হয়ে যেত সাশার একটি বাক্যে, 'ভলোদিয়া, এখন এ সবের সময় নয়।' ভলোদিয়াকে তার স্মৃতি মেধা নিয়ে বাবা মা দিদি কোনও প্রশংসা করলেই, সে অনিবার্যত বলে উঠত, 'সাশার মতো?'

১৮৮৪ সালে সাশা পড়তে গিয়েছিল ভলগা পাড়ের সিমব্রিস্ক থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে দেশের সবথেকে নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাংকত পেতের্বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্র হিসাবে অসামান্য মেধাবী ছিলেন আলেক্সান্দার। যশস্বী বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিয়েভের (১৮৩৪-১৯০৭) প্রিয়তম ছাত্র। তৃতীয় বছরেই তার গবেষণাপত্র অর্জন করে নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক। বাড়ির কেউই নয়, এমনকি সাংকত পেতের্বুর্গের তখন শিক্ষক-শিক্ষণে পাঠ নেওয়া আন্নাও জানতে পারেননি, পড়াশুনায় অমন ডুবে-থাকা সাশা কখন গোপন বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছে।

মস্কোর ইনস্টিটিউট অব মার্কসিজম লেনিনইজম-এর লেনিন জীবনী (১৯৬৫) আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের জন্যে পৃষ্ঠাখানেকের বেশি ব্যয় করেনি। না করারই কথা। কারণ দু'-একটি প্রসঙ্গ বাদে সারা জীবন সাশাকে নিয়ে আবেগ কখনোই প্রকাশিত হতে দেননি ভ্লাদিমির ইলিচ। আমরা সাশাকে নিয়ে কয়েকটা কথা তুলতে প্রায় নাছোড়।

১৮৮৬ সালের নভেম্বর মাসের এক বরফ-ঢাকা সকালে সাংকত পেতের্বুর্গের কয়েকশো ছাত্র হাজির ভলফোভো সমাধিক্ষেত্রে, নিকোলাই দোব্রিল্যুবভের (১৮৩৬-১৮৬১) পঁচিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে। হাতে হাতে পোস্টার : দোব্রিল্যুবভ– আমাদের দিদেরো। নিরস্ত্র

ছাত্রদের উপর বেপরোয়া চাবুক চালায় ঘোড়সওয়ার কসাক বাহিনী। চল্লিশ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। বার করে দেওয়া হয় শহর সাংকত পের্তের্বুগ থেকে।

জবান দিতে তৈয়ার হয় ছাত্রদের একটি অংশ। কোন জবাব। ছাত্রদের একটি অংশ বলে, সমাবেশ প্রচার প্রতিবাদে– এসবে আর কোনও লাভ নেই। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জবাবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাস।

শোনা যায় আলেক্সান্দারই নাকি, পরিকল্পনার জন্য আরও ভাবনার কথা বলেছিলেন। ছাত্ররা ভাবনার কথা বলছিল না। বলছিল কাজের কথা। ১ মার্চ ১৮৮৭ ঘটানো হবে সেই কাজ। ১৮৮১ সালের মার্চেই হত্যা করা হয়েছিল জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দারকে। ছ-বছর পর ওইদিন, ওইদিনই খুন করা হবে পুত্র তৃতীয় আলেক্সান্দারকেও।

পরিকল্পনায় ফাঁক ছিল বিস্তর। সবার আগে ফাঁকগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র আলেক্সান্দার উইলিয়ানভ। তবু সে-ই লেখার দায়িত্ব নিল জারের মৃত্যু-ইশতেহার। এক মাসের চেষ্টায় জোগাড় হলো বোমা বানাবার নাইট্রিক অ্যাসিড, হাতে এল ব্যবহার করা পুরানো দুটো রিভলবার।

দু'জন ছাত্রকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে জার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ওখরানা। তাদের জেরা করে হদিশ পাওয়া যায় বাকিদের। আলেক্সান্দারের বাসাতেও হাজির হয়ে যায় পুলিশ। হত্যা-পরিকল্পনায় জড়িত ছিল ১৫ জন। সকলকেই দ্রুত তুলে নেয় ওখরানা।

যে কথাটা বলার জন্যে আমরা নাছোড়: গ্রেপ্তার হওয়ার পরই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় সাশা, সব দায় সে একার কাঁধে তুলে নেবে। বাঁচাবার চেষ্টা করবে বাকি ১৪ জনকে। তখনও একুশ পূর্ণ হয়নি তার।

মানবতার এই মহত্তম পাঠ ছিল উইলিয়ানভ পরিবারের মাটিতেই।

খবর পাওয়া মাত্র মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে মারিয়া উইলিয়ানোভার। ছোট ছেলে মেয়েদের প্রতিবেশীদের দায়িত্বে রেখে হাজার কিলোমিটার দূরে সাংকত পেতের্বুর্গে চলে আসেন মারিয়া।

সাশা, তাঁর আদরের সাশা কখন এত বড় কাজে জড়ালো। আনিয়ুতা লিখেছেন উইলিয়ানভ পরিবারের বোবা কথা: 'সারা দুনিয়ায় তোর থেকে ভালো, তোর থেকে নরম কেউ নেই তো ভাই। বোন হিসাবে এতো শুধু আমার কথা নয়, যে তোকে জানে সেই তো একথা বলবে, আমাদের আকাশ জুড়ে সূর্যের মতো ভাই আমার।'

পিয়োতর-পল কারাদুর্গ। রাশিয়ার বাস্তিল। মা ও ছেলের দেখা হয় মার্চ মাসের তিরিশ তারিখ। মায়ের সামনে নতজানু হয়ে বসে সাশা। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল সে। মায়ের কাছে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়। পরিবারের জন্য দায়িত্ব পালন করা হলো না তার। কিন্তু না, রাষ্ট্রের কাছে সে ক্ষমা ভিক্ষা করবে না। মা-ও যেন তা না করে।

যে কথাটা আমরা বলতে চেয়ে নাছোড়, জারের জন্যে যে মৃত্যু ইশ্‌তেহার লিখেছিল সাশা, সেখানে ছিল বঞ্চিত, দলিত বৃহত্তর জনতার কথা। যেন দিগন্তে মার্কসীয় চেতনার গণমানবের আভাস। জনতার জন্যে চাই: সত্য, বিজ্ঞান, স্বাধীনতা এবং বিচার।

লেনিনের একবিংশ শতকের এক জীবনী (Lenin: Robert Service, 2000) আভাস দিচ্ছে, সাশা তার জার্মান ভাষায় দখলের সুবাদে তখন অনুবাদ করতে শুরু করেছিল মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা।

বলা হয়নি, আর একটি কথা। আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের পরিবারের একজন হওয়ার গুণেই গ্রেপ্তার করা হলো দিদি আন্নাকেও। জেলখানা থেকে বিচারালয়, বিচারালয় থেকে জেলখানা, জেলখানা থেকে আর এক জেলখানা, হেঁটে যাচ্ছেন মা। সেদিন তিনি যাচ্ছিলেন সেই জেলখানায় যেখানে আটক তার মেয়ে আনিয়ুতা। ৮ মে ১৮৮৭। যাওয়ার পথে কিনলেন খবরের কাগজ। প্রথম পাতাতেই খবর। শ্লিসেলবার্গ কারাদুর্গে আরও চারজনের সঙ্গে ফাঁসি হয়ে গেছে আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের।

১৯০৫-এর মা নয়, ১৯১৭-র মা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রোভনা উইলিয়ানোভা। প্রয়াত হন ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে। নভেম্বর বিপ্লবের এক বছর আগে। কিন্তু ১৮৮৭-তেই তিনি তখন হয়ে উঠছেন অনাগত ১৯১৭-র মা।

শুধু রুশ খবরের কাগজ কেন, সোভিয়েত-জীবনী খবর দিচ্ছে ইউরোপের নানা দেশের কাগজ ছেপেছিল আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের আত্মত্যাগের কথা। ব্রিটেন আর সুইজারল্যান্ডের খবরের কাগজ ছেপেছিল বিচারালয়ে আলেক্সান্দারের উর্বর আগুন ফলানো ভাষণের কথা, যে ভাষণ শুনে মারিয়া মা, মেয়ে আনিয়ুতাকে বলেছিলেন, 'আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আমার সাশা এত সুন্দর বলতে পারে। এমন বুঝিয়ে বলতে পারে, এত উদাত্ত। আমি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু আমি আর বইতে পারছিলাম না।'

সাশা বলছিল আগুনের ফুলকির মতো, সাশার মামোচকা কাঁদছিলেন বাঁধভাঙা। এত কাঁদছিলেন, এত, মাঝপথেই তিনি বিচারালয় ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ফরাসি খবরের কাগজে ছেপেছিল, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে সাশাদের শান্ত বীরত্বের কথা। পোল্যান্ডের খবরের কাগজ সাশার সাহস আর বীরত্বকে কুর্নিশ করা কবিতা 'উইলিয়ানভ'।

না, সকলের দায় একা বহন করতে চাওয়া সাশা সকলকে বাঁচাতে পারেনি, তার সঙ্গে ৮ মে-র ভোরে ফাঁসি হয়েছিল আরও চার তরুণের: ভিভি জেনারালোভ, পিআই আন্দ্রেউশাকিন, ভিএস ওসিপানভ এবং পিওয়াই শোভিরেভ।

আনিয়ুতা লিখেছেন, 'বীরের মৃত্যু বরণ করেছে তাঁর দাদা সাশা এবং তাঁর বৈপ্লবিক শাহাদাতের জ্যোতি আলোকিত করেছে তাঁর ভাই ভলোদিয়ার পথ।' ভ্লাদিমির ইলিচ বলেছেন, 'না, আমরা ওই পথ নেব না।'

নেননি। বৈপ্লবিক জীবনের শুরু থেকে ওপথে কখনও হাঁটেননি লেনিন। কিন্তু দেশকে গৌরবের পথে আনতে যে সাধকেরা দুঃখের দুর্গম পথে হেঁটেছেন, তাঁদের প্রতি চিরদিন গচ্ছিত রেখেছেন অম্লান শ্রদ্ধা। মস্কোয় লেনিনের পড়ার ঘরে মার্কসের ছবির পাশেই ছিল স্তেপান খালতুরিন (১৮৫৭-১৮৮২)-এর আবক্ষ মূর্তি– সেই কাঠের কাজের শ্রমিক যিনি জারের প্রাসাদটাই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে লেনিন উন্মোচন করেছেন সপ্তদশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের নায়ক স্তেঙ্কা রাজিন (১৬৩০-১৬৭১)-এর মূর্তি। বৈপ্লবিক সাহিত্যে লেনিনের প্রিয় নায়ক ছিলেন চের্নিশ্যেভস্কি (১৮২৮-১৮৮৯)-র 'কি করতে হবে' উপন্যাসের রাখমেতভ, যে চরিত্র তৈরি হয়েছিল পিওতর পল দুর্গে হাতে কড়া পায়ে বেড়ি অবস্থায় পচে মরে যাওয়া দুঃসাহসী সের্গেই গেন্নাদিয়েভিচ নেচাইয়েভ (১৮৪৭-৮২)-এর আদলে। ১৮৯০ সালে ভলগা অঞ্চল ভ্রমণে লেনিন দেখতে গিয়েছিলেন একাতেরনোকোভা-য় নেচাইয়েভের বাড়ি। দেখা করেছিলেন শহীদের বাবার সঙ্গে। নভেম্বর বিপ্লবের পরই দেশে ফিরে এসেছিলেন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক পিয়োতর আলেক্সিয়েভিচ ক্রুপটকিন (১৮৪২-১৯২১)। লেনিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে পুনঃপ্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ফরাসি বিপ্লব নিয়ে তাঁর বই। মনে রাখব, ক্রুপটকিনের এই বই এবং তাঁর জীবন ও দর্শনের প্রতি গাঢ়

টান অনুভব করতেন এদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সময় ছাত্র-বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করার দায়ে প্রথম গ্রেপ্তার হন ভ্লাদিমির ইলিচ, ১৮৮৭ সালে ডিসেম্বর মাসে। জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশবাহিনীর একজন আইনের প্রথম বর্ষের সেই ছাত্রটিকে বলে, 'গোলমালে জড়াতে গেলে কেন? অল্প বয়স তোমার, দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে কেউ নিজের মাথা ভাঙে?'

তখনও আঠারো বছর বয়সে না পৌঁছানো ভ্লাদিমির উত্তর দেয় : 'দেওয়ালটা পচে গেছে। একটা ভালো ধাক্কা দিতে পারলেই ধসে যাবে।'

পরবর্তীকালে লেনিন বারংবার তার সহযোদ্ধাদের বলেছেন, পূর্বজ বিপ্লবী-সন্ত্রাসবাদী বা নৈরাজ্যবাদীদের জীবন, তাদের লেখালেখি, ইশ্‌তেহার থেকে মন দিয়ে পাঠ নিতে। পাঠ নিতে হবে ফরাসি বিপ্লবের জ্যাকোবাঁদের জীবন ও সংগ্রাম থেকে।

ধাক্কা দেওয়ার কাজটা শুরু করেছেন তাঁরা।

২

নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
জীবনানন্দ দাশ 'সময়ের কাছে', সাতটি তারার তিমির

শুভ্র মানবিকতার ভোর আনার জন্যে কৈশোর না পার হতেই লড়াই শুরু হয়ে গেল ছেলেটার। সে আলেক্সান্দার উইলিয়ানভের ভাই, গোটা পরিবারটা রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী। পরিবারটিকে ঘিরে ধরে যতরকম দুর্যোগ ঘনিয়ে তোলা যায়, কসুর করেনি জারশাহি রাষ্ট্রযন্ত্র। চক্রব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়েই চলেছে তাঁর তীক্ষ্ণতম লড়াই। আশ্চর্যের কথা হলো এই, লড়াইয়ের এত তীব্রতার মধ্যেও কৈশোরের সবুজ সারল্যকে কিছুতেই যেন হারাতে চাননি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। এবং সে সারল্য যে হারাননি তার একটি বড় সহায় তাঁর সেই পরিবার। এ পরিবার সেই ১৮৮৭ সাল থেকে জারশাহি রাষ্ট্রের কাছে পারিয়া, দাগি, দেশদ্রোহী। রাষ্ট্র আর সমাজ উইলিয়ানভ পরিবারকে যত কোণঠাসা করেছে, এ পরিবারের সদস্যরা তত যেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েও একে অপরকে ভরিয়ে তুলেছে স্নেহে, যত্নে, ভালোবাসায়।

১৮৯১, ভ্লাদিমির ইলিচ পরীক্ষা দিতে এসেছেন সাংকত পেতের্বুর্গে। ছোট বোন ওলগাও তখন রাজধানীতেই। সেই তখন দাদা ভলোদিয়ার অভিভাবক। মা'কে ওলগা লিখছে, তাদের আদরের মামোচকা যেন ভলোদিয়ার শরীর নিয়ে বেশি না ভাবেন। ভলোদিয়ার কাণ্ডজ্ঞান দারুণ। তা ছাড়া পরীক্ষাগুলো ওর কাছে কিছুই না। শনিবার তারা দু'জনে মিলে বেড়াতে গিয়েছিল নেভা নদীর ধারে।

এ চিঠি ওলগা লিখছে ২০ এপ্রিল ১৮৯১। এপ্রিলের শেষ দিকেই ভ্লাদিমির মা'কে টেলিগ্রাম পাঠায়, ওলিয়া-র টাইফয়েড। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ভয়ের কিছু নেই।

ভলোদিয়ার এ আশ্বাস ফলেনি। ২০ মে তারিখেই মারা যায় ওলগা। এত শোক আঘাত বিতর্কের মধ্যেও জীবনের কোমলতম আবেগগুলি কী যত্নে যে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন লেনিন। রাজনীতি, রাষ্ট্র, ইতিহাস– এই প্রকাণ্ড প্রেক্ষাপটের বাইরে তুচ্ছতম কয়েকটি জিনিসকে সহসা আশ্রয় করে যেন ফেননিভ হয়ে উঠত সেই কোমলতা। একটি ছিল অবশ্যই দাবা। এবং ভ্লাদিমির ইলিচের বাইসাইকেল। অথবা এগুলি রাষ্ট্র ও বিপ্লবের বাইরে ছিল না আদৌ। রাষ্ট্র, বিপ্লব ও সমাজকে অগ্রসর সূর্যালোকে পৌঁছে দেবার সাধনায় এগুলিও ছিল একনিষ্ঠার অন্যতম সূচক।

নির্বাসনের দিনগুলিতে, বিশেষত প্যারিস, ক্রাকো এবং জেনিভাতে ভ্লাদিমির ইলিচের নিরন্তর নিপুণ যত্ন জড়ো হয়েছে তাঁর বাই-সাইকেলের প্রতি। তাঁর সাইকেলের প্রতি নিজের প্রতিদিনের এতটুকু অযত্ন বা অন্যদের অবহেলা কিছুতেই সহ্য করতেন না লেনিন। তাঁকে সাইকেল চড়া শিখিয়েছিলেন ভাই দিমিত্রি। তাঁরা তখন বেড়াতে গিয়েছিলেন লিউব্লিনো-তে।

সাইকেলটাকে ধুয়েমুছে যত্ন করার সময় নির্বাসনে হয়তো ভলোদিয়ার মনে পড়ে যেত দিমিত্রির ভালোবাসার কথা। অকালে চলে যাওয়া বাবা, কয়েক মাসের মধ্যে সাশার ফাঁসি, সে বছরের শেষ দিকেই ভ্লাদিমির ইলিচের জেল– এত দুর্যোগের মধ্যেও পরস্পরকে কী ভালোবাসায় সমর্থনে যে উইলিয়ানভ পরিবারের সকলে বাঁচাটাকে বাঁচার মতো করে তুলেছিলেন।

প্যারিসে থাকার সময় সাইকেল চড়েই লেনিন প্রতিদিন যেতেন বিবলিওথেক ন্যাশিওনালে। কনস্তান্তিনোভ্না জানিয়েছেন (Memoirs of Lenin, vol 1 & 2, দ্বিতীয় রুশ সংস্করণ থেকে ইংরেজি অনুবাদ ১৯৩০) প্যারিসে থাকার সময় তাঁরা সাইকেলেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কার্ল মার্কসের কন্যা ও জামাতা লরা ও পল লাফার্গের বাড়িতে। প্যারিস থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে দ্রাভেলে।

পরবাসের দিনগুলোতে নিত্য-অর্থকষ্টেরও নিশ্চয় সাশ্রয় হতো সাইকেল ব্যবহারে। যদিও প্যারিসে সাইকেল চালানো ছিল সেই ১৯০৯-১০ সালেও খুব কঠিন। কষ্টের এবং ঝুঁকিরও। সাইকেল চালিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়তেন ভ্লাদিমির ইলিচ। শুধু তাই নয়, ক্রুপস্কায়া খবর দিয়েছেন, জুডিসি যাওয়ার পথে একদিন লেনিনের সাইকেলে ধাক্কা মারে একটা মোটরগাড়ি। মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়েছিলেন লেনিন। সেই তৎপরতায় বেঁচে যাওয়া, কিন্তু পিষে গিয়েছিল সাইকেল। পোল্যান্ডের ক্র্যাকাও-এ পরবাসকালে অবশ্য সাইকেল চড়াটা বেশ উপভোগ করেছেন ভ্লাদিমির। মাকে চিঠি লিখে জানিয়েওছেন সে কথা। কিন্তু জেনিভায় সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুরই যেন তুলনা হয় না। কতদিন আল্পসের উৎরাই ধরে সাইকেল চালিয়েছেন লেনিন। সঙ্গে কন্স্তান্তিনোভনা এবং বোন মারিয়া। বাকি দু'জন ক্লান্ত হয়ে পড়লে তরতর করে সাইকেল নিয়ে একা উঠে গেছেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

আর পাহাড়ি পথ অরণ্য-নিবিড়তা পেলে মুহূর্তে যেন শৈশবে ফিরে যান ভ্লাদিমির, মুহূর্তে যেন তিনি সাশার ভাই কিংবা দিমিত্রির দাদা ভলোদিয়া। জিমেরওয়াল্ড কনফারেন্স বসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন রক্ত-আগুন-বিকারে ভয়ানক। ৩৮ জন প্রতিনিধির অধিকাংশকেই কিছুতেই যেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তীব্রতায় আনতে পারছেন না লেনিন, যুদ্ধে আক্রান্ত জনতা চায় যে জঙ্গিপনা। ভীষণ ক্লান্ত ও বিরক্ত তিনি। সম্মেলন শেষ। ফিরে আসছেন প্রতিনিধিরা। বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ি বনপথে। ক্রুপস্কায়া লিখেছেন সহসা থেমে গেলেন ভ্লাদিমির। বৃষ্টির মধ্যেই প্রাণভরে তুলতে শুরু করে দিলেন পথের ধারে মাশরুম। ইউরোপের নানা দেশের বামপন্থী নেতারা দেখছেন, প্রখর আপসহীন খানিকটা একগুঁয়েও বটে, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বৃষ্টির মধ্যেই তুলছেন মাশরুম। হাড় পর্যন্ত ভিজছেন সবাই। ট্রেন ফেল।

অথবা জিমেরওয়াল্ড থেকে ফিরে আসার পরই কন্স্তান্তিনোভনার সেই বর্ণনা। পরের দিনই তাঁরা উঠে গিয়েছিলেন রোথর্ন পাহাড়ের চূড়োয়। চূড়োয় পৌঁছাবার পরই ভ্লাদিমির এলোমেলোভাবেই শুয়ে পড়লেন পাথরে, প্রায় বরফের উপর এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। মেঘ জমছে

পাহাড় চূড়োয় আবার ভেঙেও যাচ্ছে, রোথর্ন থেকে অসামান্য আলপ্সের দৃশ্য এবং মৃতের মতো ঘুমিয়ে আছেন লেনিন। জিমেরওয়াল্ড তাঁর স্নায়ুর উপর এত চাপ-আঘাত হেনেছিল। তাঁকে নিজের মধ্যে ফের ফিরিয়ে এনেছিল পাহাড় অরণ্য তুষার।

এবং দাবা। সেও যেন তাঁর শৈশবে কৈশোরে ফেরবার অব্যর্থ উপায়। তাঁর জন্মের সময় তাঁর ধর্মবাপ বনেছিলেন আরসেনি বেলোক্রিসেঙ্কো– ভ্লাদিমির ইলিচের বাবার দাবা-বন্ধু। দাবা উইলিয়ানভ পরিবারের জীবনচর্যার অপরিহার্য অংশ। দাবায় ওস্তাদ ছিলেন সাশা। সেই ছবিটা তো অম্লান হয়ে আছে। গোর্কির আমন্ত্রণে ইতালির ক্যাপ্রিতে এসেছেন লেনিন। দাবায় বসেছেন তাঁর একদা বন্ধু অধুনা মতাদর্শগত কারণেই বিচ্ছিন্ন আলেক্সান্দার বোগদানভ (১৮৭৩-১৯২৮)-এর মুখোমুখি। তাঁদের ঘিরে ধরে দাবা-দ্বৈরথ দেখছেন গোর্কি, লুনাচারস্কি। গোর্কি অবাক হয়েছেন, দাবায় বেকায়দায় পড়লে কেমন শিশুর মতো রেগে উঠতেন লেনিন।

আর শিশুদের সঙ্গ পেলে একেবারেই শিশু ভ্লাদিমির ইলিচ। ক্রাকোয় পরবাসকালে লেনিনের কাছে মরুদ্যান জিনোভিয়েভ-ইলিনার সন্তান স্তেপান। ভ্লাদিমির ইলিচ ঘোড়া আর তাঁর পিঠে চেপে ঘর-দুয়ার-বিছানা চরে বেড়াচ্ছে স্তেপান। সঙ্গে দু'জনের তুমুল চিৎকার। ছুটে আসতে হতো ইলিনা, কনস্তান্তিনোভনা এমনকি জিনোভিয়েভকেও। লেনিন বলে উঠতেন, 'আমাদের জ্বালাতন করো না। দেখছ না, আমরা খেলছি।'

একই ঘটনা ঘটত ভ্লাদিমির ইলিচ যখন মেতে উঠতেন আন্না ইলিনিচনার দত্তক পুত্র গোরার সঙ্গে ঘোড়সওয়ার খেলায়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর তখন সবে দেশে ফিরেছেন লেনিন। তুমুল ব্যস্ততা তাঁর এপ্রিল থিসিস নিয়ে। উঠেছেন দিদির আবাসে। সামান্য ব্যক্তিগত সময় ছিনিয়ে খেলানোয়, খেপানোয় মাতিয়ে তুলতেন গোরাকে। ভাঙচে টেবিল, উড়ছে চেয়ার। হয়তো লজ্জাই পেতেন কনস্তান্তিনোভনা, 'করছ কী ভলোদিয়া!' এমনিতে রাশভারী আন্না অবশ্য ভ্লাদিমিরকে তিরস্কার করা থেকে শত হাত দূরে। ভ্লাদিমিরকে বকা যায় না। আনিয়ুতার কাছে চির আদরের ভাই ভলোদিয়া।

৩

লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব।

'একাকার', সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তবু মানুষতার যাবতীয় কোমলতা ও প্রকাশকে বলশেভিক নৈতিকতা ও কর্তব্যবোধ, মার্কসবাদী মূল্যবোধের নিপাট আড়ালে গোপন করাই লেনিনের চিরায়ত স্বভাব।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব থেকে নভেম্বর বিপ্লব– এই তুমুল সময়কালে বলশেভিক পার্টি সব থেকে সঙ্কটের মুখে পড়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের অপরিকল্পিত দিনগুলির পর। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এই অপরিকল্পিত অসমন্বিত অভ্যুত্থানে মূলত এগিয়ে গিয়েছিল বলশেভিক পার্টির সামরিক শাখাগুলি। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর প্রবল আঘাত নেমে আসে বলশেভিক পার্টির উপর, গ্রেফতার করা হয় একাধিক শীর্ষনেতাকে, ভেঙে চুরমার করা হয় প্রাভদা কার্যালয় এবং সবথেকে বেশি আঘাত নামে লেনিনের উপরেই। আবার দেশ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সামরিক শাখার নেতৃত্বের হঠকারিতা অনুসন্ধানে পার্টির অভ্যন্তরে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয় ইয়াকব মিখাইলোভিচ সের্দলভ (১৮৮৫-১৯১৯)-এর নেতৃত্বে। একথা জানতেই, এই হঠকারিতায় সব থেকে যিনি বিরক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত সেই ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন পরামর্শ (প্রায় নির্দেশ) পাঠিয়েছেন সের্দলভকে: 'সবটা জানা প্রয়োজন। কিন্তু ওদের সাহায্য করা জরুরি, চাপ দিও না, তিরস্কারও নয়। উলটে, ওদের পাশে দাঁড়াও। যারা ঝুঁকি নিতে জানে না, তারা জেতে না। পরাজয় ছাড়া জয় আসে না।'

আবার এই বৈপ্লবিক নৈতিকতার কারণেই পার্টি নেতৃত্বের প্রতি প্রায়শই অসম্ভব কঠোর তিনি। ১৯১৮ সালের মে মাস, লেনিনের অদ্বিতীয় লক্ষ্য জনতার জন্যে খাবার সংগ্রহ করা। এই লক্ষ্যে কোনও বিচ্যুতি, সামান্যতম ঢিলেমিও তিনি সহ্য করতে নারাজ। চূড়ান্ত তিরস্কার করেছেন জাতীয় অর্থনীতি সর্বোচ্চ পর্ষদের প্রেসিডিয়ামের প্রধান ডিপি মিলিয়্যুতিনকে। বলশেভিক মিলিয়্যুতিন বাড়িতে ফিরে মনমরা হয়ে ডায়েরিতে লিখেছেন, 'এমনকি ইলিচ বলেছে যে, 'গোটা প্রেসিডিয়ামকে রুটি আর জল দিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে জেলে পাঠানোই ভালো, কিন্তু আমাদের দুর্বলতার জন্যই তিরস্কারের মধ্যেই বিষয়টাকে রাখা হচ্ছে...' সুতরাং এমনটা তো হতেই পারে শুধু জল দিয়েই আমাদের রাখা হলো অথবা জলে চুবিয়ে দেওয়া হলো। রুটি পাওয়াটা আকাশকুসুম কল্পনা হয়ে যাবে এবং খাদ্য সরবরাহের গণ কমিশারিয়েট অতটা বিলাসিতার ছাড় বোধ হয় দেবে না।'

বৃহত্তর জনতার জন্যে মনুষ্যত্বকে পুষ্পল করার লক্ষ্যে, প্রয়োজনে সহযোদ্ধার প্রতি মনুষ্যত্বের কিছু পাপড়িকে ছিঁড়ে ফেলো, অন্তত ছেঁড়ার ভঙ্গি নাও– আপৎকালে এই হলো বৈপ্লবিক নৈতিকতা। লেনিনীয় নৈতিকতা। এ নৈতিকতায় লেনিন সর্বাগ্রে অমানুষ হয়েছেন নিজের প্রতি, নিজের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির প্রতি, নিজের নিবিড় কিছু ভালোলাগার প্রতি। গোর্কি জানিয়েছেন, তাঁর লেনিন-প্রয়াণলেখতেই বেটোফেনের আপাসিয়োনাতা সোনাটার প্রসঙ্গ তুলে জানিয়েছেন, লেনিন তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি সব সময় সংগীত শুনতে পারি না, সে আমার স্নায়ুর উপর কাজ করে। ...আমাদের কর্তব্য, বুঝলে, হ্যাঁ, শয়তানের মতো কঠিন।'

১৯২০ সালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)। লিখেছিলেন,' স্পষ্ট যে বিলাসিতার প্রতি এমনকি সামান্য স্বস্তির প্রতিও তাঁর কোনও ভালোবাসাই নেই।... নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া থেকে এত দূরে থাকা মানুষ আমি কখনও দেখিনি।'

তাঁকে হত্যা করার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আততায়ীরা যখন খানিকটা সফল হয়, দুটো বুলেটের একটা তাঁর ডান দিকের কণ্ঠার হাড়ের তলায় গিয়ে বসেছিল, অন্যটা বাঁদিকে ঘাড়ের তলায় গভীরে, লেনিন প্রবল রক্তপাতের মধ্যে ক্রেমলিনে ফিরেছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে দোতালায় উঠেছিলেন, চেয়ারে বসে রক্তাক্ত হচ্ছিলেন একা। সেদিন সে বাড়িতে কোনও খাবার ছিল না। বোন মারিয়া ছটফট করছিলেন, ভলোদিয়ার জন্যে একটু লেবু জোগাড় করা যায় না... মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং সেরে ফিরে এসেছেন কনস্তান্তিনোভনা। বাড়িতে কোনও খাবার ছিল না।

তাহলে বলো, সেই অল্প বয়সে ধর্মভীরু বাবার বন্ধুর কাছে শোনা গল্পটা পুরোপুরি গল্প নয়: 'দেশসুদ্ধ লোক যতদিন/ খেতে পায়নি কমলালেবু– খাননি লেনিন।'

হতেও পারে এটা লোকপ্রবাদ। কিন্তু এসব লোকপ্রবাদকে নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো চিরকাল ফুটিয়ে তোলে, পুঞ্জীভূত করে তোলে একটি গাঢ় বাস্তব। সে বাস্তব হলো: লেনিনের জীবন ও নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব।

সিআইএ'র এক গুপ্তচরের আত্মকথন

দেবেশ দাস

অঙ্কন ▪ মনীষ দেব

নতুন চাকরি

আজ আমার শেষ ইন্টারভিউ। গত কদিন অন্যরা নিয়েছেন, আজ যে ম্যানেজারের অধীনে কাজ করতে হবে তিনি ইন্টারভিউ নেবেন। মাইনে ইত্যাদি ঠিকঠাক হলে মনে হয় চাকরিটা হচ্ছে। যে কোম্পানির মেরিল্যান্ডের অফিসে আমি গত কদিন ধরে ইন্টারভিউ দিচ্ছি, তার নাম কমসো। নির্বাচিত হলে আমার কিন্তু কমসো কোম্পানিতে চাকরি হবে না, হবে ব্রিটিশ এরোস্পেসের একটি সাবডিভিশন বিএই সিস্টেমস কোম্পানিতে। তারা তাদের লোক নেওয়ার জন্য কন্ট্রাক্ট দিয়েছে কমসো কোম্পানিকে।

আমার জীবনের আসল লক্ষ্য ছিল দেশের সেনাবাহিনি বা গোয়েন্দা দপ্তরে কাজ করা। জীবনের এই লক্ষ্য ঠিক করার পিছনে একটা লোক ছিল। তার নাম, ওসামা বিন লাদেন। ২০০১ সাল। ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক শহরে দুটি টাওয়ারের মধ্যে দিয়ে বিমান চালিয়ে ভেঙে দিল সন্ত্রাসবাদীরা। শোনা গেল, তাদের নেতা লাদেন। আমার ১৮ বছর বয়সের রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। দেশের সরকারের সঙ্গে আমি চীৎকার করে উঠলাম– শিক্ষা দিতে হবে শয়তানদের। সেই শিক্ষা দিতেই আমি ঠিক করলাম সেনাবাহিনিতে যোগ দেব। আমেরিকায় সেনা হতে গেলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে হাইস্কুল ডিপ্লোমা (ভারতে উচ্চমাধ্যমিক)। সেটা আমি পাশ করিনি। কিন্তু সময়টা অন্য, সেনাবাহিনিতে প্রচুর লোক চাই, বিশেষত টেকনিক্যাল লোক, সেখানে একটু কম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও তখন নিয়ে নিচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই নিজে নিজেই কম্পিউটার ঘাঁটা আমার স্বভাব। আমার টেকনিক্যাল আগ্রহ ও তাতে কিছুটা দক্ষতা দেখে সেনাবাহিনী আমাকে নিয়ে নিল।

শখ পূরণ হল না। কয়েকমাসের মধ্যেই একটি দুর্ঘটনায় আমার পায়ে বড়ো চোট পেলাম। আর যুদ্ধে যাওয়া যাবে না। যুদ্ধেই যদি না যেতে পারি, তবে আর সেনাদের চাকরি করা কেন। সেনাবাহিনীর সার্টিফিকেট নিয়ে বহু চেষ্টা করে চাকরি পেলাম আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে এক গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশানাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ)-তে। সেখানেই এখন

কাজ করি। তার হেড অফিস এই মেরিল্যান্ডেই। প্রযুক্তিতে, লোকবলে ও বাজেটে, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এর থেকে বড় এনএসএ। কে কী করবে, তাতে দুই সংস্থার কাজে ভাগাভাগি আছে। আমার বর্তমান কাজটা ভীষণ বোরিং– একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির রাতপাহারা দেওয়া। আমি একটু টেকনিক্যাল কাজ চাই, কম্পিউটার সম্পর্কিত। তাই নতুন চাকরি খুঁজছি।

বিএই-তে কাজ করতে চাই কারণ ওরা সিআইএ'র কম্পিউটারের নানা কাজের কন্ট্রাক্ট পায়, সিআইএ এসব কাজ নিজে করে না। বিএই-তে চাকরি পেলে সিআইএ'র কাজ করা হবে, তবে সরাসরি সিআইএ-তে কাজ নয়। এই কাজ করেই আমি দেশ সেবা করতে চাই। ইন্টারভিউতে কিছু কথার পর আমার হবু ম্যানেজার শেষ কথায় এলো।

– 'কত মাইনে চাও?'

– 'বছরে ৫০ হাজার ডলার'।

– '৬০ হাজার হলে কেমন হয়?'

– 'খুব ভালো'

– 'নাইট ডিউটিও করতে হবে, তাই বছরে ৬২ হাজার'।

– 'কোথায় অফিস?'

– 'অফিস ভার্জিনিয়ায়, সিআইএ'র হেড কোয়ার্টার'।

– 'সেখানে কী কাজ?'

– 'তা আমি জানি না। এখন থেকে সিআইএ তোমাকে সরাসরি বলবে কি করতে হবে'।

কী সাংঘাতিক, আমার সরাসরি সি-আই-এ তে চাকরি হতে যাচ্ছে। আর কি মুশকিল, যে লোকটা আমার ম্যানেজার সেজে এতক্ষণ ইন্টারভিউ নিল, সে আমার ভবিষ্যৎ কাজ সম্বন্ধে কিছু জানে না, সে আমার ম্যানেজার হওয়ার প্রশ্নই নেই, এমনকি যে সিআইএ-তে আমি চাকরি করতে যাচ্ছি, তারও কেউ নয়। হাত বাড়িয়ে দিল নিয়োগকর্তা সেই ম্যানেজার।

- 'তোমার নতুন চাকরির জন্য অভিনন্দন। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আমাদের আর জীবনে দেখা হবে না'।

সিআইএ'র হেড কোয়ার্টারে

মাটির নিচে একটা ঘর। অ্যাটম বোমা পড়লেও এই ঘরের কিছু হবে না, ঘরের ভিতর থেকেই আবার যোগাযোগ করা যাবে ওপরওয়ালাদের সাথে। এখানেই আমাকে রোজ কাজ করতে হবে। কাজ করছে সব কম্পিউটার জানা লোকজন। সকলের কাছে কনট্রাক্টরের ব্যাজ। সকলেরই নাম লেখানো আছে কোনও প্রাইভেট কোম্পানির কর্মী হিসেবে, কিন্তু ১০০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে সিআইএ। আমাকে সিআইএ'র ভুমিকা-কাজকর্ম নিয়ে একটা লেকচার দেওয়া হলো। 'কোথায় কাজ করো কাউকে বলবে না, তোমার অরক্ষিত মোবাইল এই সুরক্ষিত অফিসে আনবে না, সেই মোবাইলে অফিসের কাজ নিয়েও কিছু বলবে না'। কঠিন সমস্ত নিয়ম কানুন।

সিআইএ-র অফিসে ইন্টারনেট আলাদা। সেখানে দুনিয়ার মানুষ যে গুগল ব্যবহার করে তা চলে না। গুগল কোম্পানিই সেখানে একটা অন্য গুগল বানিয়ে দিয়েছে, তাতে অনেক বেশি তথ্য সেখানে, অন্য অনেক কিছুর হদিশ পাওয়া যায় যা সাধারণ গুগল ব্যবহারকারীরা পাবে না। দুনিয়ার বহু মানুষ যে ফেসবুক ব্যবহার করে তা সেখানে নেই। সিআইএ-র কর্মীদের জন্য নিজস্ব সংবাদ আছে, বাইরের লোকেরা সে সংবাদ দেখতে পারবে না। আবার বাইরের লোকেরা যখন হয়তো কোনও খবর দেখছে, আমরা দেখছি তা বিশদভাবে। খবরের পিছনের খবর আমরা জানি। সিআইএ কর্মীদের মোবাইলে সমস্ত খবরের নির্যাসও সময়মত যেতে থাকবে।

জাপানে আমেরিকার সেনাদের বেসে

চাকরির তিন বছরের মাথায়, আমার ২৬ বছর বয়সে ২০০৯ সালে আমাকে বললো জাপান যেতে হবে, কাজ করতে হবে এনএসএ-র হয়ে। আমার গত চার বছর ধরে গার্লফ্রেন্ড লিন্ডসেকে নিয়ে চলে এলাম। খাতায় কলমে হলাম একটি প্রাইভেট কোম্পানির কর্মী। কোম্পানিটি কিছুদিন পরে ডেল কোম্পানি কিনে নিল। আমি হলাম ডেলের কর্মী। কিন্তু ডেলের অফিসের সাথে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। আমার অফিস টোকিওর পশ্চিমদিকে একটি বাড়িতে, তার চারপাশে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী। সেখানে আমেরিকার সেনারা থাকে, আমেরিকার এয়ারফোর্স নামার একটা আলাদা এয়ারপোর্ট আছে। আমার কাজ সিস্টেম অ্যানালিস্টের।

কিছুদিন পরে জাপানে কর্মরত সিআইএ এবং এনএসএ-র কর্মীদের একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করলো এনএসএ। বিষয়; চীন কিভাবে ডিজিটাল ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি করছে। হঠাৎ আমাকে বলা হল বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য। অফিসে রাত জেগে সেই বিষয়টি তৈরি করতে লেগে গেলাম। এনএসএ এবং সিআইএ'র কম্পিউটারগুলির পুরো নেটওয়ার্ক ঘেঁটে অনেক তথ্য পেলাম। দেখলাম, আমেরিকা প্রচুর খবর রাখে চীন সম্বন্ধে। আমেরিকার ইন্টারনেট চীনে ঢোকা বন্ধ (গুগল, ফেসবুক, ইত্যাদি সেখানে চলে না)। চীনের ভিতরে বসে যে কেউই মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে, তার সমস্ত কিছুর উপর নিখুঁতভাবে নজরদারি করে সরকার, এই নজরদারির নিখুঁত ডিজিটাল প্রযুক্তিগত সাফল্য দেখে আমি অবাক। চীনের এই প্রযুক্তির বিশদ আমেরিকার এনএসএ জানে, তার বিবরণ আছে পাতার পর পাতায়।

সেদিন থেকে মাথায় ঘুরতে লাগলো একটা কথা, এনএসএ যখন চীনের এই প্রযুক্তির বিশদ জানে, তা জেনেও কি চুপ করে বসে আছে? আমেরিকায় তার প্রয়োগ করছে না? আর শুধু আমেরিকা কেন, সারা পৃথিবীর ইন্টারনেট পরিকাঠামোর ৯০ শতাংশ আমেরিকার দখলে, এর ব্যবহারকারীদের উপর আমেরিকা নজরদারি চালাচ্ছে কি? চীন যা তার নাগরিকদের উপর প্রকাশ্যে করছে, আমেরিকা কি তা দুনিয়ার উপর গোপনে করতে পারে না?

সবসময়ই আমার যোগাযোগ হচ্ছে প্রায় ১১০০০ কিমি দূরে থাকা সুদুর আমেরিকায় আমার ওপরওয়ালাদের সাথে। আমি কোথায় কখন আছি, ফোনে কথা বলি বা না বলি, পকেটে থাকা স্মার্ট মোবাইল সবসময় খবর দিচ্ছে ওপরওয়ালাকে। শুধু তাই নয়, রাস্তায় ভুল পথে চলে গেলে, সাথে সাথে জানিয়ে দিচ্ছে কোনদিকে যেতে হবে। কত নম্বর বাস, কোন ট্রেনে যেতে হবে, সবকিছু সময়মতো জানিয়ে দিচ্ছে ওপরওয়ালারা। কত বড় হয়ে গিয়েছি, বাবা মার উপর আর নির্ভর করি না। কিন্তু, ওপরওয়ালারা আমাকে সবসময় গাইড করে যাচ্ছে, খবর রেখে যাচ্ছে, যেন আমি একটা শিশু। রাস্তা হারিয়ে ফেললেও কোনও সমস্যাই নেই, শুধু ফোনে একবার বলতে হবে, 'বলতো,

যেখানে আছি সেখান থেকে কিভাবে ফিরে যাবো?' সাথে সাথে উত্তর এসে যাবে। প্রতি মুহূর্তে আমার সমস্ত খবরাখবর, আমি কোথায় গেলাম, কার সাথে দেখা করলাম, তা ওপরওয়ালার কাছে শুধু যাচ্ছে, তাই-ই নয়, বুঝতে পারি সেসব তথ্য জমিয়েও রাখা হচ্ছে। যখন তখন চাইলেই ওপরওয়ালারা তা বের করে দেখে নেবে। সরকারের কাছে আমি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। দেশের অন্য মানুষরাও কি উন্মুক্ত? তাদের সমস্ত খবরাখবর কি সবসময় জমিয়ে রাখে সরকার? সরকার কি তাদের তথ্যে তল্লাশি করে? এটা করার প্রযুক্তি তো সরকারের হাতে। দরকার এতো তথ্য জমিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা। তা কি সরকারের আছে?

আমেরিকার সংবিধানে যা আছে, তাতে কারো কোনও কিছু তল্লাশি করতে হলে, কোর্টের আদেশ আনতে হবে। ২০০৫ সালে আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ফাঁস হয়েছিল একটা গোপন লিখিত নির্দেশ। এই নির্দেশ ফাঁস করে দিয়েছিল এন-এস-এ ও বিচার বিভাগের কয়েকজন কর্মী। এই নির্দেশের বলে যদি আমেরিকায় বসে কেউ দেশের বাইরে ফোন বা ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে, তবে এন-এস-এ কে তার তথ্যের উপর নজরদারি চালাচ্ছিল। এই কর্মসূচী শুরু হয়েছিল ২০০১ সাল থেকে। মানুষকে না জানিয়ে তার ব্যক্তিগত তথ্যের উপর তল্লাশি। খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে, খুব হই চই হয়। মানুষ বলল, কোর্টের আদেশ ছাড়া এই তল্লাশি আমেরিকান সংবিধান বিরোধী। চাপে পড়ে ২০০৭ সালে সরকার বলে যে এই কর্মসুচী বাতিল। এই ফাঁসের পর, চার-পাচ বছর কেটে গেছে। সেই সময়ের চেয়ে এখন স্পষ্টতই এন-এস-এ র হাতে সকলের উপর নজরদারি করার আরও উন্নত প্রযুক্তি আছে। এখনো কি কোনও গোপন নির্দেশ আছে?

একদম অপ্রত্যাশিত। একটি ফাইল পেয়ে গেলাম হঠাৎ। 'টপ সিক্রেট'। না, আমার এই ফাইল দেখার অধিকার নেই, বিশ্বের গুটি কতক লোকের তা দেখার অধিকার আছে। এন-এস-এর কম্পিউটারের স্মৃতিতে (memory) তে আছে নানা ড্রাইভ (কম্পিউটারের মেমরি বা স্মৃতিকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়, ভাগগুলিকে বলে ড্রাইভ), এক একটা ড্রাইভে এক এক এক লেভেলের নিরাপত্তা। উচ্চ নিরাপত্তার ড্রাইভ দেখার পাসওয়ার্ড আমার কাছে নেই। এই ফাইল উচ্চ নিরাপত্তার ড্রাইভে থাকার কথা। নিম্ন নিরাপত্তার এক ড্রাইভে এই ফাইলটা চলে এসেছে। মনে হয়, উচ্চ নিরাপত্তার ড্রাইভে কেউ এই ফাইলটা খুলে, কাজ শেষ করার সময় সেই ফাইলের অনুলিপি ভুল করে কোনোভাবে নিম্ন নিরাপত্তার ড্রাইভে রেখে গেছে। তাই আমি দেখতে পারছি।

ফাইলটার একটা নোংরা সাংকেতিক নাম আছে। ফাইলে লেখা আছে পৃথিবীতে আজ সবাই পরস্পর সংযুক্ত, তার জন্য চাই বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা সংস্থা। প্রতিটি মানুষের মোবাইল, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ায় কথাবার্তা চিরকালের জন্য সংগ্রহ করে রাখছে এন-এস-এ। এত তথ্য রাখার জন্য উপযুক্ত ধারনক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটারের ব্যবস্থা করেছে সরকার। যদি কোনও মানুষের সম্বন্ধে খবর নিতে হয়, তবে কম্পিউটারে একটি মাত্র নির্দেশেই নিমিষে তার সারা জীবনের তথ্য পেয়ে যাবে সরকার। ফাইলে লেখা আছে, প্রতিটি মানুষের মেটা ডেটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। মেটা ডেটা মানে প্রতিদিন লোকটা কোথায় কোথায় গেল, কার সাথে দেখা করলো, কাকে কতক্ষণ ফোন করলো, কখন ঘুমালো, কখন জাগলো, কাকে ই-মেল পাঠাল, কী ধরনের কম্পিউটার থেকে পাঠাল, কম্পিউটারের মালিক কে, কম্পিউটারটি কোথায় ছিল, সেই ই-মেল কে কখন দেখল, সেই কম্পিউটার সম্বন্ধে নানা তথ্য, ইত্যাদি। মেটা ডেটা একটা লোকের স্বভাব, রুচি, তার বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির খবর দিচ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে লোকটা ই-মেল বা ফোনে কাউকে কি বলছে বা লিখছে, তার থেকে অনেক বেশী তথ্য। কেউ যখন ই-মেল লেখে, ফোন করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লেখে, তখন সে জানে কী লিখছে, কী বলছে। মেটা ডেটা তার অজান্তেই সবসময় সংগ্রহ হয়ে যাচ্ছে সরকারের ঘরে।

কিন্তু, অন্যের তথ্যে কোর্টের আদেশ ছাড়া এভাবে তল্লাশি চালানো তো বেআইনি। বলা আছে এত তল্লাশিতে কোর্টের আদেশ আনতে হলে, কোনও কোর্টের পক্ষে এত সমন জারী করা সম্ভব নয়। কিন্তু, এইভাবে তথ্য নিলে দেশের আইনে সরকার কি কখনো কোর্ট কেসে ফেসে যেতে পারে না? সেটা না ফাঁসার রাস্তা বলা আছে। বলাই হবে না যে কারো তথ্য তল্লাশি (search) হচ্ছে। বলা হবে, আমাদের পরিকাঠামো ব্যবহার করে সারা দুনিয়ায় যতো ইন্টারনেট চালাচালি হচ্ছে, তার একটা স্টাডি হচ্ছে। শব্দটা search হবে না, হবে acquire বা obtain, তথ্য অর্জন করা বা পাওয়া। কোর্টের এ ব্যাপারে কিছু করার থাকবে না। ফাইলটার পরতে পরতে যা লেখা আছে, তা আসলে দেশের সংবিধান, আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর নানা কায়দাকানুন।

আবার সিআইএ'র দপ্তরে, বিশাল প্রমোশন

এ আমি কি জেনে ফেললাম! আমার দেশের সরকারের কীর্তি দেখে আমি হতাশ, সব জেনে একদম বিধ্বস্ত। এরই মধ্যে ২০১১ তে জাপান থেকে ফিরে এলাম আমেরিকায়, আবার সি-আই-এ র দপ্তরে, বিরাট প্রমোশন হয়ে গেল। মাইনে অনেক বেড়েছে। কিন্তু খাতায় কলমে ডেল কোম্পানির কর্মী। নতুন বাড়ি নিয়ে উঠে গেলাম গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে।

বাড়িটা বড়ো, বাংলোর মতো। বাংলো সাজাতে হবে, নানা আসবাবপত্র কিনলাম। একদিন শপিং মলে একটা নতুন ফ্রিজ দেখলাম। ফ্রিজ কাম কম্পিউটার কাম টেলিফোন। ফ্রিজের দরজায় একটা পর্দা লাগানো আছে, কম্পিউটারের মনিটর। ফ্রিজে খাবারদাবার রাখলে, তা কতটা টাটকা আছে তার দেখভাল ফ্রিজই করে। খাবার খারাপ হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবে ফোনে মেসেজে। পুষ্টিকর খাদ্যের খোঁজ, রান্না করার পদ্ধতি বলে দেবে ফ্রিজ, আমি সাধারনত কি খাই তা লক্ষ্য রাখবে ফ্রিজ, তার কিছু ফুরিয়ে আসলে আমাকে খবর দেবে।

কী দারুন ফ্রিজটা না! মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু করলো। কি শুরু হয়েছে প্রযুক্তির অগ্রগতিতে! না, কিনলাম না ওটা। ফ্রিজটা যেমন আমার দেখভাল এতটাই করবে, এতটাই খবর রাখবে আমার সম্বন্ধে, আমার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে, তার সাথে সাথে নিশ্চয়ই হয়তো তার প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে সব খবর দিতে থাকবে আমার সম্বন্ধে – আমি কি খাই, কি খেতে পছন্দ করি, ইত্যাদি।

২০১১ সালের ১ মে আমার মোবাইলে একটা খবর এলো বদমাইশ ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানে মেরে ফেলা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি। কিন্তু এই লোকটাকে শিক্ষা দিতেই নাকি আফগানিস্তান, ইরাকে বোমার পর বোমা, দেশে দেশে ড্রোন দিয়ে নির্দিষ্ট মানুষকে হত্যা, এমনকি আমেরিকানদেরও। সেদিন দেশের শত্রু ইরাকের উপর আমেরিকান সেনারা বোমা ফেলাতে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু, ইরাক যে দেশের শত্রু, তা আমাদের কে বলেছিল? আমার দেশের সরকার। যে সরকার কোর্টে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন মিথ্যা কথা বলেছে, যে সরকার আইন, সংবিধান সচেতন ভাবেই লঙ্ঘন করছে, সেই সরকার বিশ্বাসযোগ্য? দেশের কোটি কোটি মানুষ এই সরকারের উপর ভরসা করেছে, প্রতিদানে গত দশ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের নাম করে তাদের সমস্ত তথ্যের উপর

নজরদারি চালাচ্ছে সরকার, দেশের একটা মানুষকেও সরকার বিশ্বাস করে না। এই সরকার বিশ্বাসযোগ্য? ইরাক কে যে সরকার দায়ী করেছিল, ইরাক কি সত্যিই দায়ী ছিল? না, তা সত্যি ন্য।। ইরাকের উপর বোমা ফেলাকে সমর্থন করে কি ভুলই করেছিলাম!

দুটি বিশাল প্রতিষ্ঠান আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এক আমার দেশ, আরেকটা ইন্টারনেট। এখন আবার শরীরও বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে, শরীর ভালো নয়, মৃগী দেখা দিয়েছে। সব সময় অফিস যেতে পারি না। মনের উপর চাপ সাংঘাতিক। দেশের জন্য কাজ করছিলাম, তার জন্যই সরকারী চাকরি নিয়েছিলাম। এখন দেখছি দেশ আর সরকার এক নয়। একটা country, আরেকটা state। কোনও মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে কিছু নেই, সবই state-র নির্দিষ্ট লোকজন জানে।

মাথার এ ভার নামাই কোথায় ?

আমার অনেক কিছু আছে। কিন্তু যে জিনিস আমার মাথায় গিজ গিজ করছে, তার ভার আমি আর বইতে পারছি না। যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তার তুলনায় আমি আমেরিকায় অনেক বেশী কিছুই পেয়েছি। গত পাঁচ-ছয় বছরে আমার হয়েছে বিশাল পরিবর্তন। মোটা মাইনের চাকরি, বাংলো, ভালো ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। এসবের সাথে ১০ বছর ধরে বিশ্বস্ত এক গার্লফ্রেন্ড, বন্ধুবান্ধব, বাবা-মা। ঠিক করেছি, মাথার ভার নামিয়ে আমি চিরকালের জন্য সব ছেড়ে চলে যাবো। মানুষকে জানাতেই হবে যে দেশের সংবিধান, আইন লঙ্ঘন হচ্ছে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। যে পৃথিবীতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না, সে পৃথিবীতে আমি বাঁচতে চাই না।

বলতে হবে সংবাদমাধ্যমকে। কিন্তু কিভাবে জানাবো? উড়ো চিঠি লিখে জানানো যাবে না, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। ফোন করে কোনো সাংবাদিককে জানানো যাবে না, সকলের সব ফোন রেকর্ড করা হয়। একমাত্র পথ তবে ই-মেল করা।

আগে তো বিষয়টা লিখি কম্পিউটারে, তারপরে ই-মেল। কি ধরণের কম্পিউটারে লিখবো? কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম সব লক্ষ্য রাখে ব্যবহারকারী কি করছে। একটি অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ। তার মালিক মাইক্রোসফট কোম্পানি, ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি। উইন্ডোজে যদি ইন্টারনেট ব্যবহার করি সব তথ্য সরাসরি পাঠিয়ে দিতে পারে এনএসএ-কে। তাই অপারেটিং সিস্টেম নিলাম লিনাক্স, ওপেন সোর্স ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। এর কোনও মালিক নেই, কাউকে আমার তথ্য পাঠানোর দায় নেই।

ফাইল পাঠানো মানেই আমার নিরাপত্তা নেই। একদিকে আমার নিরাপত্তা, অন্যদিকে দশের মঙ্গল। কোনটা বড়? বহু ভেবে আমি ঠিক করলাম, দশের মঙ্গলই বড়। যার কাছে আমার ই-মেল যাবে, ফাইলের মেটা ডেটা সে এমনিতেই পাবে, আমি ফাইলে সই করেই পাঠাবো। দশের মঙ্গলের জন্য ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে।

কিন্তু, যাকে পাঠাবো, শুধু সেই যেন তা জানে। সে যদি পুলিসকে না দেয় তবে আমার কিছু হবে না। যখন সব প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন গোয়েন্দা দপ্তর আমার ই-মেল খুলে দেখে নেবে আমি কাকে কাকে ই-মেল পাঠিয়েছি। ফলে একটা অন্য নামে ই-মেল খুলতে হবে। কিন্তু যে নামেই ই-মেল পাঠাই, সব ই-মেলে নজরদারি চলে। ই-মেল যে পেল আর যে পাঠাল, দুজনেই তা মুছে ফেললেও (delete) কোনও লাভ নেই, কম্পিউটারে কিছু মোছে না। একটা পথ আছে, যদি ই-মেলের তথ্য সাংকেতিক ভাবে পাঠানো যায় (encrypted), যা খুলে দেখলেও কেউ কিছু বুঝবে না, শুধু যাকে পাঠানো হয়েছে সেই খুলতে পারবে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে (decrypt)। এনএসএ জানতে পারবে ই-মেল গেছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু উদ্ধার করতে পারবে না। কিন্তু, সংকেত কেউ যদি নাও জানতে পারে, তা কি ভেঙে ফেলা যায় না? ভাঙা যায়, কিন্তু সময় লাগে।

কয়েকটা ই-মেল পাঠিয়ে উত্তর এলো এক সাংবাদিকের কাছে থেকে, সে বিষয়টা জানতে আগ্রহী, আমার ইন্টারভিউ নিতে চায়। তাকে জানিয়ে দিলাম, ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে একটা বিশেষ জায়গায়, তার ঠিকানা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

চিঠি লিখলাম অফিসে, আবার মৃগীর আক্রমণ, তাই আসতে পারছি না। ব্যাগপত্র গোছালাম, চারটে ল্যাপটপ, একটি এমন কম্পিউটার যাতে ইন্টারনেট কোনদিন লাগানো যায় না। স্মার্টফোনকে রেখে দিলাম রান্না ঘরে। সোজা এয়ারপোর্ট। ক্যাশ দিয়ে টিকিট – টোকিও। সেখানে গিয়ে ক্যাশ দিয়ে আরেকটা টিকিট- হংকং, ২০১৩ সালের ২০ মে।

সব ফাঁস, আমি আশ্রয়হীন

আগেকার কথামতো ২ জুন দুই সাংবাদিক নিউইয়র্ক থেকে চলে এলো হংকং। আমার ভিডিও সাক্ষাৎকার হল। ৬ জুন আমেরিকার দি ওয়াশিংটন পোস্ট ও দি গার্ডিয়ান পত্রিকায় খবর বেরোল, মার্কিন সরকার দেশের সমস্ত মানুষের উপর নজরদারি চালাচ্ছে। যথারীতি সরকার বলল – এসব খবরের কোনও ভিত্তি নেই। তিন দিন বাদে সেই ভিত্তিই প্রকাশ হল গার্ডিয়ান টিভিতে আমার ভিডিও সাক্ষাৎকারে। দুনিয়া জেনে গেল আমেরিকার কীর্তি। সরকার বলল, আমার তথ্যর কোনও মূল্যই নেই, আমি সিআইএ বা কোনও সরকারী সংস্থার কেউ নই, আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানি ডেল-এর কর্মচারী। খাতায় কলমে আমি সত্যিই তো তাই।

১৪ জুন আমেরিকা আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আনল, অভিযোগ আমি সরকারি গোপন তথ্য পাচার করেছি। চর হই কি করে, আমি তো কোনও দেশের কাছেই তথ্য পাচার করি নি। যা বলার প্রকাশ্যেই বলেছি। আমি প্রকাশ্যে আসার পর, হংকং-এ দুজন আইনজীবী জুটে গেল, তাদের মাধ্যমে সাথে সাথে রাষ্ট্রসংঘকে আবেদন করলাম উদ্বাস্তু হিসাবে আমাকে কোথাও আশ্রয় দেওয়ার জন্য। ২১ জুন রাষ্ট্রসংঘ জানিয়ে দিল যে তাদের কিছু করার নেই। আমেরিকাও আমাকে হংকং থেকে প্রত্যাপর্ণের দাবি জানালো। আইনজীবী ও বন্ধুরা আবেদন করলো নানা দেশে। কেউ আশ্রয় দিতে রাজী হল না। হংকং-এ তাহলে আর আমার বেশিদিন থাকা চলে না। পালাতে হবে।

কোথায় যাই? আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল যে মহিলা সাংবাদিক সে জানালো আমাকে সাহায্য করতে সারা হ্যারিসন নামে এক মহিলা সাংবাদিক আসছে হংকং। সারার কাজই হচ্ছে, যেখানে যে কেউ এইরকম কাজে কোনও সরকারের কোপে পড়ে যায় তাকে সাহায্য করা। সারার সাথে কথা বলে ঠিক হল, যাওয়া হবে ইকোডর। ইকুয়েদরের কোনও দূতাবাস হংকং-এ নেই। আবেদন করে ইকুয়েদরে থাকার পাস পেয়ে গেলাম।

– তুমি কেন আমায় এভাবে রক্ষা করে যাচ্ছ?' জিজ্ঞাসা করলাম সারাকে।

– কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি শুধু অন্যের নাক গলানোটা কঠিন করে দিচ্ছি'।

হ্যাঁ, কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ধরা আমি পড়বোই। হয়তো মেরেই ফেলবে। তার সাক্ষী থাকবে

সারা।

– তাহলে তুমি আমার সাক্ষী।

– তোমার মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাকে জীবিত দেখার জন্য একজন কাউকে তো থাকতেই হবে। ধরে নাও, সেটা আমি।

২৩ জুন নামলাম মস্কোর শেরেমেট্যেভো এয়ারপোর্টে। কাউন্টারে পাসপোর্ট দেখানোর পর, কাউন্টারের লোকটা পাসপোর্ট নিয়ে মেশিনে দিল, সাথে সাথে ফোন তুলে কাকে রাশিয়ান ভাষায় কিছু কথা বলল। কিছুক্ষণ পরে এল আরও দুটো লোক, ডেকে নিয়ে গেল আমাকে অন্য একটা আলাদা ঘরে, সেখানে অনেকে আছে। আমার অভিজ্ঞ চোখ বুঝে গেল, এরা সবাই রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের লোক। ধরা পড়ে গেছি।

- আমাদের সাথে যোগ দাও' বলল টেবিলের মাঝখানে বসা হোমরাচোমরা লোকটি ।

- দেখো, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা কারা। ...... তোমাদের সহযোগিতা করার আমার কোনও ইচ্ছা নেই । .... তোমাদের যদি আমার ব্যাগটা দেখতে ইচ্ছা হয়, দেখতে পার, ... এতে এমন কিছু নেই যা তোমাদের সাহায্য করবে।

- 'বিশ্বাস করো, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি'।

- 'খুব ভালো, তাহলে আমাদের পরবর্তী ফ্লাইটটা ধরিয়ে দাও', সারা সাথে সাথে উত্তর দিল। সারা নিজের পরিচয় দিল আমার আইনি পরামর্শদাতা হিসাবে।

- 'তোমরা রাশিয়ায় থাকতে আসোনি?'

- 'না।'

- 'কোথায় যাবে? শেষ গন্তব্যস্থল কোথায়?'

- 'ইউকেডরের কুইটো, হাভানা, কারাক্কাস হয়ে'।

- 'তুমি শোননি? তোমার পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে।'

- 'আমি বিশ্বাস করি না।'

- 'না, এটা সত্যি। বিশ্বাস করো।...... তোমার সরকার তোমার পাসপোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। তোমাকে বিমানে না চড়াতে এয়ার সার্ভিসদের বলে দেওয়া হয়েছে', বলল সেই কাউন্টারে বসা লোকটি।

কি সাংঘাতিক! কয়েকঘন্টা আগেও আমার পাসপোর্ট চালু ছিল, তার জন্যই তো হংকং-এ বিমানে চড়তে পেরেছিলাম।

চেয়ারে ফিরে গেলাম, কিন্তু বসতে পারলাম না। এবার কি করা? তিন চার তলা নিচে জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। যান বাহন চলছে। একটু দুরেই মুক্তির বাতাস, কিন্তু সেখানে আমার যাওয়ার অনুমতি নেই। প্রচুর গাড়ী, টিভি ক্যামেরা। সাংবাদিকরা গিজগিজ করছে। এতক্ষনে সারা দুনিয়া জেনে গেছে আমি রাশিয়ায়। হংকং থেকে ছাড়া ফ্লাইটগুলিতে যাত্রী তালিকা দেখে সকলেই বুঝে গেছে পাখি মস্কোয় পালিয়েছে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটি ঘুরে দাড়াল।

- 'বন্ধুর সাহায্য ছাড়া তোমার অবস্থায় একজনের জীবন খুবই কঠিন'। শুরু হল বন্ধু হয়ে সরাসরি বোঝানো। ওদের সাথে যোগ দিলে ওরা রাশিয়ায় আশ্রয় দেবে।

- 'যদি কোনও তথ্য থাকে, হয়তো খুবই সামান্য আছে, তবে সেটা বলতে পারো'। আবার বলল লোকটা।

- 'আমরা নিজেরা ভালো আছি'। আমি আর গুপ্তচর হবো না।

- 'আশা করি তোমার সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে পরে পস্তাতে হবে না', দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল লোকটা।

বারেবারে ওদের বললাম, আমাকে হাভানাতে যাওয়ার অনুমতি দিন। পাত্তাই দিল না। ইকুউদের থাকার পাস দেখানো হল, কিছু শুনল না। অতএব কি করা, দিনের পর দিন আমি আর সারা আটকে রইলাম মস্কোর শেরেমেট্যেভো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। লাউঞ্জ থেকেই মোট ২৭টি দেশে আবেদন করলাম আশ্রয়ের জন্য। একজনও আমেরিকার ভয়ে আশ্রয় দিতে রাজি হল না। সারা পৃথিবীতে কথা উঠতে লাগলো। রাশিয়ার এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে একটা দেশহীন, ঠিকানাহীন লোক এতদিন পড়ে আছে, কেউ তাকে আশ্রয় দিচ্ছে না। রাশিয়ানরাও সরকারের আচরণে ক্ষুব্ধ।

এইসময়ে বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি এসেছিলো রাশিয়ায়। মস্কোর আরেকটা এয়ারপোর্ট থেকে সে নিজস্ব বিমানে নিজের দেশে রওনা দিল ১ জুলাই। মস্কো থেকে বলিভিয়া ফিরে যেতে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের উপর দিয়ে যেতে হবে। ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল বলল, তাদের দেশের উপর দিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয়, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বিমানটিকে নামানো হল। বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতিকে নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, বিমানে আর কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। এটা বলিভিয়ার সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ। রাষ্ট্রসংঘও এটাকে নিন্দা করতে বাধ্য হল। ঘটনাটা রাশিয়ার পক্ষেও অপমানজনক, অন্য কোন দেশের প্রধান তার দেশে এলে তার নিরাপদে ফেরার নিশ্চয়তা রাশিয়া দিতে পারছে না।

রাশিয়াও বুঝে গেল, আমাকে এখান থেকে আর বিদেয় করা যাবে না। চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত পর রাশিয়ার সরকার সারা ও আমাকে শেরেমেট্যেভো এয়ারপোর্ট ছাড়ার অনুমতি দিল। চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে সারা ফিরে গেল দেশে, রাশিয়ায় আমাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হল।

সব শেষে

জীবনের সব ছেড়ে আমি এখন অন্য একটি দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী। কি পেলাম জীবনে? শুধু, একটাই সান্ত্বনা, মানুষকে জানাতে পেরেছি যে তোমাদের উপর নজরদারি হচ্ছে। তার জন্য নিজের এই স্বেচ্ছা নির্বাসন। তাতে লাভ হয়নি, তা বলা যাবে না। ২০১৩-র ইন্টারনেট ও এখনকার ইন্টারনেট এক নয়, অনেকেই ইন্টারনেট কিছু পাঠানোর সময় সতর্ক হয়েছে, কখনো সাংকেতিকভাবে পাঠাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে তথাকথিত উন্নত দেশগুলি যারা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি গোপনীয়তাকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলে, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখছে না। সরকারের সাথে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে ভালো বোঝা যাচ্ছে। আমেরিকার বিপ্লবের সময় লোকে যে বিষয়টা মানুষ চেয়েছিল তা হচ্ছে মুক্তি (liberty), ইন্টারনেট বিপ্লবের যুগে সেই শব্দটা পাল্টে হয়েছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (privacy)। সেই গোপনীয়তা রক্ষার দাবী চারিদিকে উঠছে।

আমি এডওয়ার্ড স্নোডেন। সরকারী চাকরি করতাম এককালে, এখন জনগণের কাজ করি। প্রায় তিন দশক সময় লেগে গেল আমার বুঝতে যে সরকারের কাজ আর জনগণের কাজ এক নয়। জনগণকে সি-আই-এর গুপ্তচরের হাত থেকে রক্ষা করা আমার এখন কাজ, যে গুপ্তচর একদিন আমি ছিলাম।

(এডওয়ার্ড স্নোডেনের 'পার্মানেন্ট রেকর্ড' বই অবলম্বনে)।

কেন মেঘ আসে

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

–বেশ ছিলাম, বুঝলি! দিব্যি দুবেলা ঘরের খাওয়া, বিশ্রাম, বইপত্তর নিয়ে থাকা–তবে ওই ভয়ানক ঝড়ের পর আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না!

অন্যায় হোতো, বেরিয়ে বুঝলাম ঠিকই করেছি। মানুষ যে কী অসহায় ভাবা যায় না! সামান্য একটু চাল, ডাল, একটুকরো ত্রিপলের জন্য ছ-সাত ঘন্টা জলের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে! তখন কি আর ডিসটান্সিং-এর কথা মাথায় থাকে?

বয়সের কথাটা ভেবে তোদের বৌদি অবশ্য আপত্তিই করেছিল, তারপর বুঝেছে এ লোককে এ অবস্থায় ঘরে রাখার চেষ্টা বৃথা, তখন নিজেও গেছে।

ক'দিন পরেই তো জ্বর, কাশি, গা হাত পা ব্যথা! প্রথমে আমার, তারপর বাড়ির খোদ মালিকের, আর কি! অতঃপর টেস্টিং, ডাক্তার বন্ধুদের পরামর্শে হোম আইসোলেশন,ব্যস্– কেটে গেল কটা দিন! ভয় যে একটুও পাইনি তা নয়, বিশেষ করে প্রথম আট দশ দিন–ডাক্তার সাহেবদের জিগ্যেসও করেছি, ভর্তি হওয়ার দরকার আছে কি? ওদের অভয়বাণীতেই তো রয়ে গেলাম–এখনও কিছু দুর্বলতা আছে বটে, কিন্তু আশা সেসব কেটে যাবে আর কদিন পরেই। আজ একমাস হলো, সকালে মনে হলো, তোদের সাথে দেখা হলে মন্দ হয় না! এমন একটা এক্সপেরিয়েন্স তোদের সাথে শেয়ার না করলে চলে?

সতুদা হাসতে হাসতে বলেন।

গত কয়েক মাস কার সঙ্গেই বা দেখা হয়েছে! কোভিড কোভিড নাম জপতে জপতে আর স্যানিটাইজ করতে করতে নিজের পিতৃপুরুষের নামটাই ভুলতে বসেছি। পেয়ারাতলায় ক্লাবঘরের আড্ডা এখন স্মৃতি– সে জায়গায় লকডাউন, কোয়ারেন্টিন, কনটেনমেন্ট জোন, আইসোলেশনের মতো ভারি ভারি শব্দ! এর মধ্যে সতুদা বৌদি যে পজিটিভ হয়েছেন সে খবর তো কেউই পায়নি! খবরটা পাওয়া মাত্র ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে–কী দিন এলো, সতুদা অসুস্থ আর আমরা, যাদের লোকে এতকাল 'সতুসেনা 'বলে ডাকে, তারা

জানছে একমাস পরে! ভাবা যায়?

ছটফটে ভটকাই বলেই ফ্যালে,

—এটা কিন্তু দাদা ঠিক করোনি, আমরা বড্ড দূরের লোক হয়ে গেছি যেন! একটা খবর পেলেই তো ছুট্রে আসতাম—তোমরা দুজনেই যেখানে অসুস্থ, মেয়ে বিদেশে, কত কী দরকার পড়তে পারে বলতো!

ভটকাই কে এতটা সিরিয়াস হতে আমরা কক্ষণও দেখিনি। ও যা বলছে, সেটা আসলে আমাদের সকলের মনের কথা। বৌদি পাশ থেকে বলেন,

—সেটা তোমাদের দাদা কে বোঝাও—বললেই বলত, সবাই একসাথে অসুস্থ হয়ে কী লাভ?

সতুদা ব্যাকফুটে গিয়েও সাফাই দেন,

—বুঝছি তোদের অভিমান হয়েছে, কিন্তু দ্যাখ আমাদের তো কোনও অসুবিধে হয়নি, এমনকি হেল্পিং হ্যান্ডরাও কেউ ই তো আমাদের ছেড়ে যায়নি, রেগুলার সাপোর্ট দিয়ে গেছে। আমার স্কুল ব্যাচের যাদের সাথে আমফানের কাজে গেসলাম, তাদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন ডাক্তার, ওরা নিয়মিত কনট্যাক্ট রেখেছিল তো!

আমি নিশ্চিত তোরা খবর পেলেই আসতিস, তেমন সিচুয়েশন হলে খবর কি পেতিস না, অবশ্যই পেতিস—কিন্তু এখন অন্য কথা!

যে জন্য তোদের আজ খবর দেওয়া!

সতুদার বৈঠকখানা কাম লাইব্রেরি ঘরটা দরাজ। একটু ফাঁকা ফাঁকা করে দিব্যি বসেছি আমরা আট দশজনে। আমি অর্থাৎ পলাশ, জগা, নেপাল, ভটকাই, অম্লান,পীযুষ আর সৌমিত্র। নতুন সংযোজন হিসেবে সতুদার পরিচিত গাইয়ে খোকন সান্যাল, ওনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা আর একেবারে শেষে এসেছেন সতুদার বাল্যবন্ধু চিকিৎসক শতদল বসু—রোজই উনি একবার করে খোঁজ নিয়ে গেছেন মাসভর, আজও রুটিন ভিজিটে এসে আড্ডায় ফেঁসেছেন।

এর মধ্যেই বৌদি চায়ের আয়োজন করে ফেলেছেন পিছনের ব্যালকনিতে। ফ্লাস্কের চা, কাগজের কাপ, পাশে রাখা কৌটোতে বিস্কুটও! যার যখন সুবিধে উঠে চা পানটুকু হবে, সবার মধ্যে মাস্ক খুলে আর রিস্ক নেওয়ার ব্যাপার নেই। পরামর্শটা নাকি সতুদারই।

—পাঁচটা মাসে অনেক শিখলাম!

নেপাল লকডাউনে কী কী শিখলে জানতে চায়। সতুদা একগাল হেসে ন্যাপলাকে একটি বার দেখে নিয়ে সবাইকেই একসাথে জিগ্যেস করেন,

—লকডাউনে আছো কেমন সব?

বাড়ির সব্বাই ঠিকঠাক তো?

মুখফোঁড় ভটকাই বলে—

আর লকডাউন, পুরো নকডাউন হয়ে গেছি দাদা—এ আপদ যে কবে বিদায় নেবে কে জানে!

—তোরা কিন্তু কমবেশি সকলেই একটু ওজনে বেড়েছিস!

সতুদা বলেন।

—তার মানে খাচ্ছিস দিচ্ছিস ঘুমোচ্ছিস! তোফা আছিস বটে তোরা! বলি বাড়ির কাজকম্মোও কিছু করিস তো?

সতুদা একটু তির্যক।

—সে তো আছেই, ওয়ার্ক ফ্রম হোম কি না, হোমওয়ার্ক তো করতেই হয়!

পীযুষ বলে ওঠে।

—কত লোকের কাজ চলে গেল জানিস এই কমাসে? আরও বহু যাবে! কারও সব্বনাশ তো কারও পৌষমাস—এই সুযোগে অনেকেই নিজের ঘুঁটি খেলে দিচ্ছে কিন্তু!

অম্লান, মিডিয়ার অম্লান ,গম্ভীর মন্তব্য করে।

—আহা, এখন ওইসব থাক না, কদ্দিন পর দেখা হলো—সতুদার এক্সপেরিয়েন্সটা শুনি একটু!

সৌমিত্র অন্য আলোচনায় ঢুকতে চায় না।

—সত্যিই একটা অভিজ্ঞতা। লকডাউনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একটা স্পেকট্রাম যেন! কতো যে শিখলাম! কিভাবে দ্রুত পট পরিবর্তন হলো ভাব!

—ছিল একটা ভাইরাস, হয়ে গেল একদল ডাইনোসর। প্রথম প্রথম ডিনায়েল, অস্বীকার—কি আবার হবে, আমরা অপরাজেয়!

ক্রমে একটা দুটো কেস, একটু প্যানিক! তারপর রাগ—কেন চীন এমন করলে? কেন সরকার আন্তর্জাতিক উড়ান ইত্যাদিতে আরও দ্রুত নিষেধাজ্ঞা আনছে না, কেন লকডাউন করা হচ্ছে না?

এমন অজস্র অভিযোগ। ভাইরাসটি বেশ নবীন, কারও তেমন কোনো ধারণাই নেই এটি কেমন করে ছড়ায়, কতটা ক্ষতি করে, কী বা করণীয়। লকডাউনের শুরুতে মনটা বেশ একটু অন্যরকম হচ্ছিল অনেকেরই। নতুন নতুন মুখোশের ডিজাইন, কারও আবার দিঘার সমুদ্রে বেশি বেশি জলে এগিয়ে যাওয়ার মতো মুখোশ টুখোশ আমরা পরি না, আমাদের কিস্যু হবে না, এমন বীর বীর ভাব।

সোস্যাল মিডিয়ায় তামাশার ঢল, কাঁসর ঘন্টা মোমবাতির ধামাকা!

এসবে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে মিডিয়া, মূলত ইলেকট্রনিক এবং অতি অবশ্যই সোস্যাল মিডিয়া।

ঠান্ডা স্রোতটা যদিও আসছিল। ইতালি, ফ্রান্স, ক্ষমতাবান মার্কিন দেশ সবাই যে কাঁপছে এ খবরগুলোও অহোরাত্র ভেসে আসছে। মৃতদেহের মিছিল, লোকে চিকিৎসা না পেয়ে মরছে বেঘোরে, এমন নানান খবরে লোকে ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত হয়ে পড়ছে।

নানা অব্যবস্থা, চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর খবর আসছে। মানুষ সর্বদাই নেগেটিভ খবর বেশি মনে রাখে আর এখন তো 'পজিটিভ' হওয়া মানেই নেগেটিভ খবর, তাই না?

সতুদা হাসতে হাসতে বলেন। অম্লান আবার মিডিয়ার লোক। ও এবার না বলে পারে না,

—কিন্তু মিডিয়া কি কেবল ভয়ই ছড়ায়, মানুষের অসুবিধের কথা মিডিয়া না জানালে কে জানাবে দাদা?

এবার খোকনবাবু যোগ দেন আলোচনায়,

—সংবাদ নিয়ে নয়, অনেক মানুষেরই আপত্তি সংবাদ পরিবেশনের ধরনটা নিয়ে—দশ পনেরো মিনিট টিভি চ্যানেলের নিউজ দেখলে শুধু বয়স্ক মানুষ কেন আমাদেরই পিলে চমকে ওঠে! যদিও সে পরিবেশনের এমনই গুণ যে নেশাখোরের মতো লোকে না দেখেও পারে না!

—রোজ রোজ হোয়াটস্অ্যাপের হাজারো খবর। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, ফেক বোঝা দায়!

লকডাউন সফল হবে হবে করছে—সেই সাথে অবশ্য

পাইকারি বাজারের ছবি, হট্টগোল, তাও থাকছে! এদেশের একটা বড়ো অংশের মানুষের দিনগত রোজগার, নিয়ম না মানলে একরকম বিপদ, আর মানলে না খেয়ে মরতে হবে!

সোস্যাল ডিসটান্সিং হবেটা কি করে? এর মধ্যেই আবার রাজ্যে রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া দরিদ্র শ্রমিকদের ঘাড় ধরে ট্রেন বোঝাই করে পাঠানো শুরু হলো। কারও কারও সে উপায়ও নেই!

সতুদা একটা বড় শ্বাস ফেলেন।

—মানুষ বড়ো ভয় পেয়েছে দাদা, এমন ভয় পেতে আর কখনও দেখিনি!

এবার মৃদুভাবে শর্মিষ্ঠা বলেছেন।

—এটা কিন্তু ঘটনা, কমবেশি সবাই ভয় পেয়েছে! ফস্ করে মরে যাচ্ছে লোকে, ভয় না পেয়ে উপায় আছে?

মন্তব্য বিজ্ঞ ভটকাইয়ের ।

সতুদা মিনিট খানেক কোনও কথা বলেননি, এবার ধীরে ধীরে বলেন—

এ ভয় তো অসঙ্গত নয়!

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত এপিডেমিক বা মহামারী কিম্বা প্যানডেমিক তথা অতিমারী হয়েছে, খোঁজ নিলেই জানবি বড় বড় সাম্রাজ্য, নগর, দেশ, সেনাবাহিনী ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। রাজারাজরাদেরও রেহাই দেয়নি! ভয় তো পাবেই লোকে!

—সম্রাট আলেকজান্ডারও নাকি এমন জ্বরে ভুগে মারা গেছিলেন, ভারত জয় করতে পারেননি?

অম্লান জানতে চায়।

—আলেকজান্ডারের মৃত্যুর কারণ নিয়ে অনেক মত! কেউ বলে ম্যালেরিয়া, কেউ ইনফ্লুয়েঞ্জা, কেউ কেউ আর্সেনিক অথবা স্ট্রিকনিন-এর বিষক্রিয়ায় ওনার মৃত্যু হয়েছিল বলে মনে করেন।

ন্যাপলা এতক্ষণ বিমর্ষ হয়ে বসে ছিল, রাজাগজাদের বিষয়ে ওর দারুণ ইন্টারেস্ট। এবার নড়েচড়ে বসে—

এত সুরক্ষার মধ্যেও এমন রোগ? বলো কি?

—নগরীতে আগুন লাগলে কি দেবালয় বাদ পড়ে রে?

তোদের এই করোনা বেশ গণতান্ত্রিক—ধনী নির্ধন সমান করে দিয়েছে, তাই না এত কান্নাকাটি! তবে বরাবরই শহরের লোকের উপরে মহামারীর ধাক্কা বেশি। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস, শ্রমিকের চাইতে বাবুদের প্রতিই কেমন নেকনজর কোভিডের!

—আগেকার দিনে কি প্লেগের প্রাদুর্ভাবই বেশি ছিল? করোনা টরোনা ছিল না?

এবার জগার প্রশ্ন।

—ভাল বলেছিস!

মানুষ পৃথিবীতে আসার বহু বহু আগে থেকেই কিন্তু ভাইরাস আছে। তাই ভাইরাল এপিডেমিক কম ছিল না। লোকে অবশ্য তখনও দেবতা অপদেবতার রাগ, অভিশাপ এসব ভাবত তখন, এখনও কি ভাবে না? প্রথম ভাইরাসের উপস্থিতি পরীক্ষাগারে টের পাওয়া গেল মাত্র একশ'বিশ ত্রিশ বছর আগে। ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কার আরও কিছুকাল আগে হয়েছে বটে। কিন্তু ভাইরাস তো ছিলই, নামটা ছিল না, মানুষ চিনত না বলে। এই পৃথিবীটাই তো কোনো অফিসিয়াল নাম পেত না মানুষ না এলে! আর 'প্লাগা' কথাটার মানে ধাক্কা, তাই যে কোনো মহামারীকেই প্লেগ বলা হতো। আসল প্লেগের প্রাদুর্ভাব শুরু কিন্তু ফিফথ সেঞ্চুরিতে।

সামান্য হাঁফ ধরে সতুদার কথায়।

পীযুষ প্রশ্ন করে—

এই এপিডেমিক আর প্যানডেমিকে কোনও তফাৎ আছে, সতুদা?

—এটা একটা কোশ্চেন? এপি মানে টিপি হয়ে একটা দেশেই বসে আছে আর প্যান হলো প্যানোরামার মতো—দেশের গন্ডি ছাপিয়ে একই সাথে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে!

ভটকাই চটপট উত্তর দেয়।

সতুদা দুহাত জড়ো করে ভটকাই এর দিকে দেখান,

—তুই তো জিনিয়াস রে ভটকাই, খোদ ক্যারোলাস লিনিয়াস অবদি এ জিনিস দিতে পারতো না রে....

সম্মিলিত হাসির মধ্যেই সতুদা বলেন—

শতদলকে যখন আজ পাওয়া গেল, তখন কেবল আমার কথা না শুনে একটু ডাক্তারী ভাষ্যও শোনা উচিত বলে আমার মনে হয়। সতুদার একটু দুরে আরেকটা বেতের চেয়ারে ডাক্তার বসু বসেছেন। সহাস্য মুখে জবাব দেন—

বেশ, আমি একটু বলছি বটে, তবে শেষটায় সত্যেন না বললে চলবে না। আর কী বিষয়ে সকলে শুনতে আগ্রহী সেটা জেনে নেওয়া ও তো আমার কর্তব্য!

ঘরের বাকি সবাই সতুদা আর শতদলবাবুর দিকে তাকিয়ে।

এবার কিন্তু বৌদি বলেন,

—তোমাদের সতুদার বকবক তো চিরকাল থাকবে। কিন্তু শতদলদা তো এতো কোভিড হওয়া লোকের চিকিৎসা করলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাটা শোনাও অনেক!

সতুদা বলেন, একজ্যাক্টলি !

আমার গলাটা একটু রেস্ট পাবে বরং! তাছাড়া কিছু মেডিক্যাল ফ্যাক্টস আছে, যেগুলো মেডিক্যাল পার্সন না বললে ঠিক হয় না! শুরু করো হে, আমাদের ভয় হতে অভয়ে নিয়ে চলো!

সতুদার বন্ধু শতদলদা বেশ হাসিখুশি মানুষ। চিকিৎসক হিসেবে অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। সমবয়সী হলেও চেহারায় সতুদার চাইতে কমবয়সী বলেই মনে হয়। শুরুতেই বলে নেন,

—আমার কিন্তু সত্যেনের মতো বাকপটুতা নেই আর যদিও করোনা আমার কাছেও একেবারে নতুন এক্সপিরিয়েন্স তবু আমার ধারণা, এত প্যানিক না করে প্রতিটি মানুষ নিজেদের দায়িত্ব পালন করলেই করোনা শক্তি কমাতে বাধ্য!

—কিন্তু, দায়িত্বটা যে কি তাইই তো আমরা পুরোপুরি বুঝিনি!

নেপাল বলে।

—ঠিকই, একটু খোলসা করে না বললে কনফিউসন ছাড়া আর কিছুই বাড়ছে না!

সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ভাইরাস দেখা যায় না এবং এর ধরনধারণও যেন কেমন কেমন! না জীব না জড়, কেবলমাত্র একটা জেনেটিক এক্সপ্রেসন যেন যেটি জীবিত কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেই কোষের চালিকাশক্তিকেই জবরদখল করে নেয়, করোনাও তেমনি একটা আর এনএ ভাইরাস মাত্র, যা তার অধিকারের কোষ বদল করেছে, অন্য প্রাণীর কোষের জায়গায় মানব কোষ। কেন এমন হলো, তা নিয়ে অনেক তত্ত্ব, জঙ্গল বদলে কংক্রিটের

জঙ্গল থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অবধি, সঠিক কারণ আমিও জানি না!

ভটকাইএর মন্তব্য,

—ভাইরাসটা ছবিতে দেখতে ভারি সুন্দর! ওইরকম কাঁটা কাঁটাও নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীরা দেখেছেন!

সতুদা মৃদু হেসে বলেন,

—এজন্যই তো করোনা, মুকুট পরে আছে ভাইরাস, সবসমেত চুয়াত্তর, আঁকড়ে ধরছে শরীরের কোষ, তাই না ডাক্তার?

ডাক্তার বসু তাঁর মাথাভরা আধপাকা বড় বড় চুলে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো একটু চালিয়ে নেন,

—ওগুলো ভাইরাসের এস-প্রোটিন মানে স্পাইক প্রোটিন! পছন্দসই রিসেপটরগুলিকে ওই দিয়েই তো আঁকড়ে ধরে সে। বিশেষ করে যেসব কোষে অ্যানজিওটেনসিন কনভার্টেজ এনজাইম-এর রিসেপটর রয়েছে। একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, মহিলাদের তুলনায় পুরুষের শরীরের কোষে এই এসিই-টু বেশি, কাজেকাজেই করোনা ভাইরাসের জ্বালাতনে পুরুষদের বেশি ভোগান্তির একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে!

এদিকে শরীরে ভাইরাস রাজত্ব করে চলবে আর শরীর কিছু বলবে না, তা তো হতে পারে না—ইমিউনিটির সেনাদল তবে কি করলে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্য শত্রু, যথা, অন্যান্য ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতোই করোনাও হেরেই যাচ্ছে, সামান্য কিছু অংশে পারছে না ঠেকাতে!

ডাক্তারবাবু একটু থামলেন। সেই অবকাশে গাইয়ে খোকনবাবু বলে ওঠেন,

—তবেই তো সর্বনাশ!

বসুসাহেব কন্টিনিউ করেন,

—একটা কথা বলে রাখি, আমি বোঝানোর সুবিধে হবে বলে যত সহজে এসবের বর্ণনা দিচ্ছি, তত সহজে কিন্তু সবটা হয় না। ভাইরাসটি শরীরের কাছে নতুন, তাই তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিছু অসুবিধেও তো হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমের—কখনও বা শরীর এতো বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলছে যে সে প্রতিক্রিয়ার চোটে শরীরের বারোটা বাজছে! একে বলে সাইটোকাইনস্ স্টর্ম!

—আচ্ছা বৌদি, আপনাদের কি কি হয়েছিল সিম্পটমস্?

শর্মিষ্ঠা ভিতু ভিতু গলায় জিগ্যেস করে।

—করোনা হলে বুঝবেন কেমন করে জানতে চাইছেন তো? বলছি সেটা!

ডাক্তারবাবু পরিষ্কার কথার লোক। বৌদি উত্তর দেওয়ার আগেই বলে দ্যান সটান,

—বেশ জ্বর, বিরক্তিকর কাশি, গলাব্যথা এগুলোই প্রথম দিকে হচ্ছিল—তার সাথে একটা অদ্ভুত ফিলিং, শ্বাসকষ্ট—ঠিক যেন জলে ডুবে যাচ্ছি! তবে চরিত্র বদল হচ্ছে ভাইরাসের, লক্ষণ ও বদলাচ্ছে। অনেকেরই এখন জ্বর অল্প, একশ'র ধারেপাশে—গা হাতে পায়ে খুব ব্যথা, কখনও কাঁপুনি, শীত শীত ভাব, লুজ মোশান, বুকে হাতে পিঠে স্কিনরাশ, চোখ লাল, খাবারের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না, গন্ধ পাচ্ছে না নাকে, এইরকম হচ্ছে!

—এই গন্ধ বিচারের কথা খুব শুনছি!

এবার আমিই বলি।

এটা প্রায় রসিকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, ভেতরে ভেতরে যদিও সবাই টেনশনে।

গুরুগম্ভীর জগা ওরফে জগদীশদাদা এবার ভারি গলায় জিগ্যেস করে—

কিন্তু ভয়টা তো পাচ্ছি নানান খবরে—কখনও শুনছি স্ট্রোকের মতোই হচ্ছে করোনাতে, কেউ আবার মাত্র কদিন পরেই দুম করে মারা যাচ্ছে—এসব যত শুনি, ততই চিন্তা বাড়ে। আমার আবার সুগার প্রেসার দুটোই আছে, কী সব কোমর্বিডিটি-তে মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি বলছে সবাই—একটু আলোকপাত করুন না ডাক্তারবাবু! আপনারাই তো...

সতুদা সাথে সাথে বলে ওঠেন—

আপনারাই তো, বলে কি বলতে যাচ্ছিলে জগা? ভগবান?

ওসব মোটেই বোলোনা, আমাদের মুখে ওসব মানায় না! তুমি জানো, কত ডাক্তার, নার্স আর স্বাস্থ্যকর্মীকে ফ্ল্যাটবাড়িতে, আবাসনে কীভাবে ডিসক্রিমিনেট করা হয়েছে? না, না, ভগবান টগবান বলে আর কাজ নেই, শতদল বরং আসল কথাগুলো বলো!

ডাক্তার বসু হাসতে থাকেন,

—সত্যেন একরকম থেকে গেলে!

আরে বাবা, যাদের কাজ করার তারা করবেই, এ আটকানো যায় না! ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও আরও বহু মানুষ কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেই চলেছেন, তা নইলে বিপদ বাড়তো!

আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে বলি, কোমর্বিডিটি নিয়ন্ত্রণে থাকলে এত ভাববেন না।

করোনাতে প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জনেরই ধরে নিন কিচ্ছু হবে না, অনেকে তো বুঝতেই পারবেন না যে তাদের এ রোগটা হয়েছে—রোগটা এঁদের মাধ্যমেও ছড়াচ্ছে কিন্তু! শতকরা সাতানব্বই ভাগ আক্রান্ত মানুষের এই রোগ প্রতিরোধের শক্তি নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। মাত্র তিন ভাগের ক্ষেত্রে লড়াই খুব বেশি আর আমাদের দেশে কিন্তু এ রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রতি কুড়ি হাজার আক্রান্ত মানুষের মধ্যে পাঁচজনের! পঁচাশি বছর বয়সের উপরে চাপটা খানিকটা বেশি!

এছাড়া সাইলেন্ট বা হ্যাপি হাইপক্সিয়াও কখনও কখনও হচ্ছে, মূলত ডিআইসি অর্থাৎ ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন বা রক্তবাহের মধ্যে রক্তের জমাট বেঁধে যাওয়ার প্রবণতা থেকে এমন হতে পারে। তবে তার চান্স কম!

শতদলবাবু থেমে গেলেও প্রশ্নের দরজা খুলে দিয়েছেন তিনি। পীযুষ বলে ওঠেন,

—ডেথ রেটটা কিভাবে বুঝছি আমরা?

এবার সতুদাই বলেন,

—অঙ্ক কষে!

একজন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কতজনকে রোগটা দেবেন সেটা ভাইরাসের 'আরও' মানে রিপ্রোডাকশন নাম্বারের উপর দাঁড়িয়ে।

এবার আসবে 'এফআর' অর্থাৎ ফ্যাটালিটি রেট। সংক্রামিত মানুষের কতজনের মৃত্যু হচ্ছে! ধরা যাক, এক কোটি লোকের টেস্ট করা হলো—তাদের মধ্যে এক লক্ষ লোকের রিপোর্ট পজিটিভ, সেই পজিটিভ লোকের মধ্যে আবার কতজন মারা যাচ্ছে সেখান থেকেই এই মৃত্যুর হার বোঝা যায়।

সতুদা বিশদে বলেন। সাথে সাথে অম্লান—কিন্তু অনেকেই তো টেস্ট করাচ্ছে না, তাদের টেস্ট হলে তো হিসেব উল্টে যাবে!

—না রে বাবা, এদেশে ধরে নে একশো চল্লিশ কোটির

কাছাকাছি লোক। ওই এক কোটির হিসেব থেকেই বেরিয়ে আসে সবার টেস্ট হলে কতজন পজিটিভ হতো। এবার আগের রেশিওটা থেকেই জানতে পারি কতজন মারা যাবে—এবার দেশের মোট লোকসংখ্যার সাথে কত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু অ্যাপ্রিহেন্ডেড তার হার মাপলেই বুঝতে পারবি ওই বিশ হাজার মানুষের পাঁচজনের মৃত্যুর প্রেডিকশন!

সতুদা হাঁফ ছাড়ে।

—পুরো হ য ব র ল তো!

ভটকাই টোটাল কনফিউসনে।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন—

অতি কিম্বা মহা, যে মারীই হোক না কেন সমাধানের মাত্র চারটি পিলার। প্রথম স্তম্ভ, রিসোর্স কমিউনিকেশন অথবা সেনসিটাইজেশন। যার মানে, ঘটনার গুরুত্ব কী, কতটা তার প্রভাব, আমাদের এসব সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু, লোকে যাতে প্যানিক না করে, বাজারের জিনিসপত্র সঞ্চয় করতে গিয়ে উধাও না করে দেয়, এইসব সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা ইত্যাদি হলো এই কমিউনিকেশন-এর অংশ!

—কিন্তু সেসব কি ঠিকঠাক হচ্ছে? কোথাও একটা স্বচ্ছতার অভাববোধ কি নেই?

প্রশ্ন অম্লানের।

—'দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো ওষুধ আর ভ্যাক্সিন! তবে এটুকু জেনে রাখা ভালো যে এখনও অবদি করোনার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ নেই। সিম্পটমস্ অনুযায়ী চিকিৎসা হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন।

—আর ভ্যাক্সিন?

আমরা বেশ কজন প্রায় আঁতকে উঠি।

—এখনও বলার মতো প্রায়োগিক স্তরে নেই এটুকু বলতে পারি। পৃথিবী জুড়ে চেষ্টা চলছে সেটা ঠিক!

একটু বিরক্ত ডাক্তার বসু।

—বলা যায় না, হয়তো সময়ের আগেই এসে যেতে পারে ভ্যাক্সিন, ব্যবসা এবং রাজনীতি, দুটো বিষয় ভুলে যেও না শত ডাক্তার!

সতুদার সরস টিপ্পনি। একটু ফাঁক পেতেই শর্মিষ্ঠা একটা প্রশ্ন করেছে—

হার্ড ইম্যুনিটির কি কোনও চান্স আছে এ দেশে?

সতুদা মন্তব্য করেন—

এটা একটা সত্যিকারের ভালো প্রশ্ন!

ডাক্তারবাবুও দৃশ্যত খুশি, সাথে সাথে উত্তর—

নেই মানে? আমার ধারণা হার্ড ইম্যুনিটির জোরেই আমরা তরে যাব, ইনফ্যাক্ট তরছি! আজ যত ইমিউনোকমপ্রোমাইজড মানুষ এদেশে রয়েছেন, হার্ড ইম্যুনিটি তৈরি না হলে তো নিরুপায় তাঁরা!

কমিউনিটি লেভেলে হার্ড ইম্যুনিটি তৈরি হয়েছে বলেই না পোলিও নির্মূল করার কথা আমরা বলতে পারছি! হ্যাঁ, তার জন্য কিছু মূল্য চোকাতে হয় সোসাইটিকে, কিন্তু কম্যুইনিটি স্তরে এর মূল্য অসীম!

বোধহয় মনের মতো প্রসঙ্গ পাওয়ায় ডাক্তার বসু আরও বলতে চাইছিলেন, কিন্তু আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে এবার ভোকালিস্ট খোকনবাবু তাঁর মনের কথা বলে ফেলেন—

—কিন্তু এই যে ম্যালেরিয়ার ওষুধ, হোমিওপ্যাথির নিদান, আয়ুর্বেদিক ক্বাথ্ এসব নিয়ে আমরা এত আশা করে বসে আছি, এর কোনও ভ্যালু নেই বলছেন ?

—না, কোনওটার ই এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি নেই। মনের ইনসিকিওরিটি থেকেই মানুষ যে যা বলছে তাইই করছে!

ডাক্তারবাবু বলেই চলেন—

তৃতীয় পিলারটি হাইজিন প্র্যাকটিস। কাফ এটিকেট, মাস্ক পরা, হাত ধোওয়া, স্যানিটাইজেশন সবকিছু আবার নতুন করে শিখতে হবে!

—মাস্ক পরলেই সমাধান?

তির্যক ভঙ্গিতে বলে জগা।

—যা হোক করে নয়, সঠিক মাস্ক সঠিক ভাবে পরলে তবেই! দশজনের মধ্যে আটজনই যদি এ কাজটি করে তবে সারাটাক্ষণ হাসপাতালে বেড নেই আর ভেন্টিলেটর কই, এই করে আমাদের চলতে হতো না! বিগত একশো বছরের বেশি সময় ধরে সবরকম মারীতেই মাস্ক পরাটাকে এতো গুরুত্ব দেওয়ার কারণ তো কিছু আছেই!

হোয়াটস্অ্যাপের দৌলতে তো কত রকম উদ্ভট পদ্ধতিতেই মাস্ক পরতে দেখছিস লোককে, নিজেদের চোখেও দেখিস—প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের মুখোশটা ঠিকঠাক পরিস তাতেও তো অনেক লাভ!

জীবনে কখনও কখনও কোনও কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলেও লাভ হয়! না হয় ভিতুই ভাবুক লোকে! এই ভয়ের গুণেই তো এতগুলো বছর টিকে আছে মানুষ!

এবার সতুদাই বলেন।

—লোকের মাস্ক পরা নিয়ে এতো সমস্যা কেন কে জানে!

আমার মন্তব্য।

—এর সম্ভাব্য উত্তর হলো, কোনও কাজ দীর্ঘ সময় ধরে করে চলতে গেলে যে মোটিভেশনের প্রয়োজন তা মোটামুটি দু'রকমের, প্রথমটা কন্ট্রোলড মোটিভেশন, মানে নিয়মে বেঁধে কাজটা করানো, আর দ্বিতীয়টা অটোনমি মোটিভেশন, যার অর্থ, একজন ব্যক্তি যেখানে কাজটা করার উদ্দেশ্য এবং আউটকাম বুঝে নিজে থেকেই একটা নিয়ম মানছে! লোকে তো এসবের গুরুত্বই বুঝছে না, তা নইলে আর পেট্রোল পাম্পেও লিখে রাখতে হয়, নো মাস্ক নো পেট্রোল!

মনে করে দ্যাখো, ওই পাম্পেই দুদিন আগে লিখতে হতো, নো হেলমেট, নো পেট্রোল!

কন্ট্রোলড মোটিভেশন মানেই সুযোগ পেলেই নিয়ম ভাঙার চেষ্টা, ওটাই বীরত্ব! তাছাড়া, সোস্যাল লার্নিং বলেও তো একটা ব্যাপার রয়েছে।

সতুদা থামেন এবং একইসঙ্গে বলেন,

—চতুর্থ পিলারটি বলো হে ডাক্তার!

অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা চলছে, এবার ডাক্তারবাবুরও কথা শেষ করার ইচ্ছে বোঝা যায়,

—এই শেষ পিলারটা মানতেই যত গণ্ডগোল! একে বলছে, সোস্যাল ডিসটান্সিং! ভিড় জায়গায় গেলে রোগটা ছড়ানোর ভয় আছে! তাই নিতান্ত বাধ্য না হলে বাইরে বেরোনোর দরকার নেই। যদি বা যেতেই হয় সেক্ষেত্রেও

অন্তত এক মিটার ডিসটান্স রাখতে বলা হচ্ছে! জমায়েত রুখতে লকডাউন করা হলো –শপিং কমপ্লেক্স, মল, সিনেমা হল, ধর্মস্থান, ইস্কুল, কলেজ সব বন্ধ হলো–এ যেন একটা অচেনা শহর, অজানা দেশ! উদ্দেশ্য অবশ্যই কিছুটা সামলে নেওয়া, কমিউনিটি স্প্রেড আটকানো!

–কিন্তু রাজামশাই, পাখিটার কী হলো? আর এখন যেভাবে লকডাউন চলছে তার আদৌ কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, নাকি সবটারই অন্য কোনো কারণ রয়েছে?

সেই অনবদ্য সতুদা। সেই পুরানো শ্লেষ! আশা করছি এবার আরও নতুন কিছু শুনতে পাব।

–বিগত ছমাস ধরে খবরের কাগজে, টিভি নিউজে এবং অতি অবশ্যই আমাদের মগজে করোনা ছাড়া গীত নাই! এ যেন এক ভয়ের মারী! শতদল এতক্ষণ ধরে যা বলল তার মোদ্দা কথাটা হলো চাবিকাঠিটা আমাদের হাতেই আছে।

–কিন্তু লকডাউন ছাড়া আর কি উপায় ছিল আমাদের হাতে? পৃথিবীর বাকি দেশগুলোও কি তাইই করেনি?

পীযুষ বলে ওঠে।

–অ্যাপারেন্টলি ট্রু! তবে এখন আর এর ফাঁকফোকর নিয়ে আলোচনায় যাব না, মহাভারত হয়ে যাবে! শুধু এইটুকু বলব, অন্যান্য দেশে সাধারণ মানুষকে এ সময় যে সাপোর্টটা দেওয়া হয়েছে সেটা এখানে সম্ভব হলো কিনা ভাবো আগে!

ব্যাপারটা তোর আমার না যে ডালগোনা কফি রেঁধে চলে যাবে দিব্যি, এটা লাখ লাখ মানুষের পেটের ভাত রুটির প্রশ্ন! আজ নয়তো কাল সরকার এটা ভাবতে বাধ্য! অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য বেশ কিছু পণ্ডিত যে ইন্টারমিটেন্ট লকডাউনের আইডিয়া দিয়েছেন সেখানেও সপ্তাহে পাঁচদিনের লকডাউন করে দুদিন কাজ করতে বলা হচ্ছে। আরও ভাল হয় যদি চারদিন টানা কাজ করে দশদিন লকডাউন করা হয়, যাতে করে যাঁরা কাজের সূত্রে এক্সপোজড হলেন পরের দশদিন প্র্যাকটিকালি তাঁদের কোয়ারান্টিন বা আইসোলেশন হয়ে গেল।

বলা হচ্ছে, এতে চল্লিশ শতাংশ অর্থনীতি বাঁচতে পারে, লোকে ব্রেড অ্যান্ড বাটার না পাক, ব্রেডটুকু পাবে। তবে এটা যা হচ্ছে, সেটা বোঝার পাণ্ডিত্য আমার নেই! লকডাউনের আগের দিনের বাজার আর বাসস্ট্যান্ডের ধাক্কা ধাক্কির ছবিই দেখি শুধু!

যাক্ সেসব কথা, যে কারণে তোদের খুঁজছিলাম সেটাই বরং বলি,

–দ্যাখ্ , মহামারীর ইতিহাসে আইসোলেশন, কোয়ারান্টিন কিম্বা লকডাউনের ধারণা নতুন নয় এটা সামান্য পড়াশুনা করলেই জানতে পারবি। তবে আমাদের দেশে গত একশো বছরে সেই উনিশশো আঠারো থেকে কুড়ি সালের স্প্যানিশ ফ্লু বাদ দিলে এত বড় ধাক্কা দেওয়ার মতো মারী আর আসেনি। অর্থাৎ, আমাদের জীবদ্দশায় এমন ঘটনা আমরা ফেস করিনি বলাই যায়!

এই এক শতকে দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে, উন্নতির হদ্দমুদ্দো হয়েছে–অথচ আমরা আজও ভারী অসহায়। করোনা প্রায় কান মুলে আমাদের শিখিয়ে দিলে ত্রুটি কোথায়!

প্রথমত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য ধাক্কা সামলাতে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা নেই আমাদের, সেটা আরও স্পষ্ট এখন। যে দেশের হেলথ বাজেটে এক থেকে মেরেকেটে দুই শতাংশ বরাদ্দ তাদের মরণকালে হরির নামই করতে হয়! প্রশ্ন হলো, আমরা কি এখান থেকে নড়ব?

দ্বিতীয়ত, পলিটিক্যাল উইল! ভাগ্য ভবিতব্য ভগবানের উপর সবকিছু চাপানোর অভ্যাস আমাদের এটা মনে করার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে যে, হতভাগ্য মানুষ গুলোর ফিজিক্যাল ডিসটান্সিং-এর সুযোগই নেই–রোজ রোজ মুখোশ যোগাড় করাটাও অসম্ভব!

কাজ করতে পথে নামতেই হবে, এগোলে করোনাতে মরবে, না এগোলে পরিবার সমেত পেটের জ্বালায়! অবৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তা দিয়েও কোনও কাজ হবে না!

তৃতীয়ত, রোগটা সম্পর্কে দেশজোড়া স্টিগমা! মৃত্যুভয় আমাদের ভেতরে এতটাই কাঁপন ধরিয়েছে যে সময় সময় কাণ্ডজ্ঞানই লোপ পাওয়ার দশা।

কারও বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে, কোনও পাড়ায় স্যানিটাইজেশন হচ্ছে, তার মানেই সে এসে পড়েছে! কারও করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল তো লতাপাতায় খবর, ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে! দেখে শুনে মনে হচ্ছে, কোনও রোগ হওয়াই এখন অপরাধ! অসুখটাকে ঘিরে এত বেশি ছুঁৎমার্গ আমাদের যে অসংখ্য লোকে সিম্পটম্যাটিক হয়েও চুপচাপ বসে গেছে! এমন আচরণের আড়ালে আছে অজানা ভয় !

অনিশ্চয়ের আশঙ্কায় আমাদের অনেকেই ভেবেও দেখছি না যে আচরণটা প্রতিবেশীর সাথে আজ করছি, আগামীকাল আমিই সেটা ফেরত পাবো। আর এই ভয়েই কিন্তু লোকে আর নেহাৎ নিরুপায় না হলে কিচ্ছু বলছে না, এমনই মহিমা স্টিগমার! স্বচ্ছতার অভাব শুরু থেকেই আছে, যার ফাঁকে যা রোধ করতে এত কাণ্ড সেই কমিউনিটি স্প্রেডই বাড়ছে!

চতুর্থত, কনফিউসনের প্রসঙ্গ। ঠিক বেঠিক, সত্যি মিথ্যে, এত ইনফরমেশন চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোনও সিদ্ধান্তই কনফিডেন্টলি নেওয়া মুশকিল!

কেমন মাস্ক পরতে হবে, স্যানিটাইজার না সাবান, বাড়িতে কাজের লোক ঢুকবে কি ঢুকবে না, থেকে শুরু করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্ণয়েই দ্বিধা!

সবাই সবাইকে উপদেশ দিচ্ছে বটে কিন্তু কেউই জানে না ঠিক বলছে কিনা! দেশ এবং বিদেশের সর্বোচ্চ নির্ণায়ক সংস্থাগুলিও আজ যা বলছে কাল তার উল্টো বিবৃতি দিচ্ছে। চিকিৎসক থেকে বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী থেকে ধর্মজীবী সকলেই কনফিডেন্স হারিয়েছে যখন সাধারণ মানুষই বা কি করে!

এমতাবস্থায় যে কোনও ক্রিটিক্যাল ডিসিশন নেওয়াই শক্ত!

বাড়িতে বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হলে কোথায় যাবেন জানা নেই। ডায়ালিসিস এর রোগী, যাঁরা কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি পান কোথায় যাবেন? প্রেগনান্ট মহিলারাই বা কিভাবে কোথায় পৌঁছাবেন, এমন সব প্রশ্নের উত্তর কি? করোনাতে যত লোকে মারা যাবে তারচেয়ে ঢের বেশি লোক মারা যাবে নন-কোভিড কারণে!

সতুদাকে পুরনো ফর্মে পাচ্ছি বটে কিন্তু বারবার খেয়াল করছি আজ সতুদাও কিছুক্ষণ কথা বলার পর হাঁফাচ্ছে। পোস্ট কোভিড সিম্পটমস্? শুনেছি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে মানুষ, কে জানে! সতুদাই বলতে

পারবে। বৌদি সচরাচর কিছু বলেন না, এখন মুখ খুলেছেন—

একটা কথা বুঝতে পেরেছি করোনা হয়ে, মনের জোর আর ধৈর্য, এ দুটোর খুব দরকার এখন!

—সে আর বলতে?

সতুদা আবার শুরু করে।

—এই যে লোকের এতো বিরক্তি, কবে এসব চলে যাবে, কবে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে জীবন, এ প্রশ্নের কি উত্তর হয়? আকাশ থেকে যখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে তখন কেন আজই বৃষ্টি হল, কখন থামবে, এ কি তোর আমার ইচ্ছেয় হবে? খুব দরকার হলে ছাতাটি বাগিয়ে ধরতে হবে—তাও বৃষ্টির ছাটেই ভিজে যেতে পারি—শরীর দুবলা পাতলা হলে ওখান থেকেই নিউমোনিয়া হয়ে সব্বনাশ হতে পারে, কি পারে না শতদল?

—তুমি নির্ঘাৎ কোমর্বিডিটির কথা বলছ?

ডাক্তারবাবু হিন্টস্টা ঠিক ধরেছেন। চোখ নাচিয়ে সতুদা বলেন—

বটেই তো! বৃষ্টি, ঝড়, এদের গালাগাল দিলেই তো থেমে যাবে না! সাবধান থাকতে হবে যাতে ক্ষতির পরিমাণ কমে। আর ঠিক এইজন্যই মিলেজুলে থাকতে হয়।

সোস্যাল ডিসটান্সিং, সোস্যাল ডিসটান্সিং করে মাথা খারাপ না করে পরস্পরের খোঁজ খবর রাখতে হয়!

—এমনিতেই তো আমরা একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, সব কথাই যেন সুপারফিসিয়াল!

শর্মিষ্ঠা যেন স্বগতোক্তি করে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রোগ হলে প্রে করা আর মরে গেলে রিপ!

ভটকাই, বিশুদ্ধ ভটকাই এটা।

—এ থেকে বেরোতেই হবে।

দীর্ঘ সময় ধরে স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে গেছি আমরা। শূন্যগর্ভ আস্ফালন না করে অ্যাক্সেপ্টেন্স বাড়াও আগে—শুনতে সহজ কিন্তু এ বড় কঠিন কাজ!

দৈব ইত্যাদিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা প্রথম প্রথম সুবিধা পান, কিন্তু যাঁদের জীবনের লোকাস অব কন্ট্রোলটা ইন্টারনাল, যাঁরা আত্মনির্ভর মানুষ, বেরিয়ে আসার রাস্তাটা তাঁরাই খুঁজে পাবেন, বরাবর পেয়েছেন—বিজ্ঞানকে তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে চলেন। কিছু মানুষ তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে এরপরও সেই চিরকেলে দৈবেন দেয়ম নীতিতে চলবেন তা নিশ্চিত, কিন্তু আমাদের মানবিক বোধ হারানো চলবে না।

অনেকক্ষণ বলে সতুদা থামেন।

—কি করতে হবে সতুদা, আপনি গাইড করুন আমাদের!

কথাটা মুখে জগদীশ বললেও আমরা সবাই মনে মনে বলি ।

—দ্যাখ্, আজ হোক, কাল হোক, করোনা চলে যাবে। যাবেই! তবে এমনও হতে পারে, আগামী পরশু অন্য কোনো সমস্যা, আরেকটি রোগ কিম্বা নতুন কোনও দুর্ভোগ এসে হাজির হলো?

এই দীর্ঘ সময়ের লড়াইতে কত লোকে যে ভেতরে ভেতরে অসহায় হয়ে পড়ছে, উদ্বেগ অবসাদে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, কেউ কি তার শব্দ পাচ্ছিস? পাবি না, কারণ নিঃশব্দেই ঘটে যায় এসব।

আমাদের যাবতীয় শক্তি আর বোধটুকু নিয়ে এঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে ।

আমরা তো আগে থেকেই দুর্বল, করোনা তো কেবল আমাদের ডেফিসিয়েন্সিগুলি দেখিয়ে দিয়েছে। মনে কর না, করোনা দিব্যি একটা মনের ভ্যাক্সিন! টিকে দিয়ে আমাদের লড়াই করার শক্তিটাই বাড়িয়ে দিলো! আমাদের যাবতীয় ভেদাভেদ এক লহমায় সমান করে দিলো!! মানুষের মনের শক্তি অসীম, যে আগুনে লোহা গলে যায় সে আগুনের উত্তাপে সদাভঙ্গুর ডিম কিন্তু শক্ত হয়,কি আশ্চর্য না?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি আমরা। ঘরে পিন পড়লেও হয়তো শব্দ শোনা যাবে।

সতুদা বলে চলেছেন—

আমি এটুকু বুঝি, ঘরে ঢুকে পড়া মানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়! আগের মতোই আমরা আমাদের ধারেপাশের প্রতিটি পরিবারের মানুষের খোঁজ রাখব। প্রত্যেকে অন্তত দু'তিনটে বাড়ির খোঁজ রাখতে পারবি নিশ্চয়ই?

—তিনটে কেন, অ্যাটলিস্ট পাঁচটা বাড়ি তো রাখাই যায় খেয়াল!

এটা ন্যাপলা।

—এ পাড়ায় তো তিরিশ পঁয়ত্রিশটা ফ্যামিলি! আমরাই তো দশ পনেরো জন আছি!

জগা বলে।

—বেশ, তবে টিম তৈরি করে দায়িত্ব বন্টন করে ফ্যালো। পরিবার পিছু কতজন বয়স্ক মানুষ, কোন্ কোন্ পরিবারে অসুস্থ, শারীরিক ভাবে অপটু মানুষ রয়েছেন, কারও কোনও সিম্পটম হচ্ছে কিনা, হলে কিভাবে হেল্প করা যায়, হোম আইসোলেশনে কাউকে রাখতে হলে যা যা সহায়তা প্রয়োজন সবকিছুর ব্যবস্থা এসব তো করতে হবেই উপরন্তু কাজ করতে করতেই আরও অনেক নতুন নতুন সমস্যাও আসবে তার সমাধানের কথা মাথায় রাখতে হবে।

সতুদার কথার পিঠেই ডাক্তার বসু বলে ওঠেন,

—কাজটা শুরু করে দিলেই কিন্তু অনেকে সাহায্য আসবে, ডাক্তারি সংযোগের গাইডলাইনগুলো আমিই বলে রাখব! তোমরা রেডি হও, আমার ফোন নম্বর তো আছেই, কিন্তু সত্যেন ভায়া, আজ তো উঠতেই হয়, রাত হচ্ছে তো!

—কিচ্ছু খাওয়ানো গেল না, এটা ভাল্লাগেনা!

বৌদির অস্ফুট আক্ষেপ শুনতে পেলাম যেন।

—তোমরা কর্তা গিন্নি, দুজনেই যে চমৎকার গাও সেটা তো এরা জানে না, একটা গান হবে না? মুখোশ পরেই গাও না!

সতুদার এ অনুরোধ এড়ানো যায় না, নিঝুম মৃত্যুপুরীর যাবতীয় নিরাপদ গৃহকোণে পৌঁছে যায় গানের সুর...

'আহা মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না..কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না ....'

এই তুমি যে কে, কোন্ ঈশ্বর তা জানি না, জানতে চাইও না। তবু আপাতত সত্তর পেরোনো একজন নিরীশ্বর মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে মনে হয় সত্যি সত্যিই এমন মেঘ আসাটা বেঁচে থাকার জন্য মন্দ নয়। মুহূর্তের জন্যই মনে হয়, ভাগ্যিস করোনা এসেছিল!

ভাইরাস যুদ্ধের টুকরো কথা..

ডাঃ মানস গুমটা

একটা বাজারের গল্প....

১০০ আনন্দ পালিত রোড, আমার ঠিকানা, বাড়ি নয়, একটা ছোট এপার্টমেন্ট। তারই তিনতলায় আমার আস্তানা। ফ্ল্যাটের বারান্দাটা ঝুলছে একটা বাজারের উপর। বাজারটা মূলত মধ্য কলকাতার একটা বিরল সোজা চওড়া গলি। গলিটার পশ্চিম দিক মিশেছে বড় রাস্তায় আর অন্যদিকটা হুমড়ি খেয়ে শেষ হয়েছে শিয়ালদহ দক্ষিণ ট্রেন লাইনে। ফ্ল্যাটের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তাটার দুটো প্রান্তই পরিষ্কার দেখা যায়। এমনকি বড় রাস্তার গাড়ি, ট্রেনের চলাচল। রাস্তাটার দু'ধারেই সারি সারি হরেক দোকান। প্রতিদিনের প্রয়োজনের সবই আপনি পেতে পারেন। বই,খাতা, মুদি, মনোহারি, ওষুধ, গিফট, মায় মাথার ক্লিপ, কপালের টিপ, লিপস্টিক, চিরুনি যা চাইবেন। রাস্তার দুটো ফুটপাতই সবজিওয়ালাদের দখলে। পাড়ার কিছু গরিব মানুষ আছে, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার তাজা সবজি নিয়ে আশা চাষিরাই এই বাজারের আকর্ষণ। প্রত্যেকের জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে, কে কোথায় তার ডালা লাগাবে। জায়গা বেদখল হয় না। শরীর খারাপ বা কোনও কারণে কেউ আসতে না পারলে তার বসার জায়গাটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। রাজনৈতিক দাদাদের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, ওদের নিজেদের পারস্পরিক সহমর্মিতাই আসল কারণ। বিকেলের দিকে বাজারটা পালটে যায়। দু'দিকের ফুটপাতের দখল নেয় ফুচকা, তেলেভাজা, ঝালমুড়ি, রোল, মোমোর দোকান। মানুষের প্রয়োজনে গোটা রাস্তাটাই বাজারে রূপান্তরিত। বিরাট অঞ্চলের প্রয়োজন মেটায়। বড়লোক, মধ্যবিত্ত, প্রান্তিক মানুষ। সমস্ত স্তরের মানুষের চাহিদা মেটাতে বাজারটাও তিন চার ভাগে ভাগ হয়ে আছে। সকালের ভিড়ে হাঁটাও মুশকিল। সাইকেল, মোটর সাইকেল, ভ্যান, রিকশা, গাড়ি, মানুষ। গাড়ি নিয়ে যেতে গেলে ড্রাইভারকে সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা জানতেই হবে। ভোর চারটেতেই ঘুম ভাঙে আমার। তবে পাখির ডাকে নয়, ঘুম ভাঙে সবজিওয়ালাদের চেঁচামেচিতে। আগে বিরক্ত লাগত। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙার জন্যে ঘড়িতে আলার্মের প্রয়োজন হয় না। সুবিধাও আছে বিস্তর। নিচে নামলেই প্রয়োজনের সব কিছু পেয়ে যাওয়া। আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট। এমনকি কড়াইতে তেল চাপিয়েও বাজারে যাওয়া যেতে পারে। আমার প্রতিদিনের অভ্যেস বারান্দায় দাঁড়িয়ে, সকালের বাজারের বিক্রি বাট্টা দেখতে দেখতে চা খাওয়া। গণেশ পুজো, ছট পুজো, শিবরাত্রি থেকে শুরু করে যে কোনও পুজোয় উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। কাজ থেকে ফিরে সন্ধেটা কাটে এই গলিটার একমাত্র ওষুধের দোকানের টুলে বসে। মালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পেশার কারণে। খাতির করে। একসঙ্গে চা খাওয়া এবং একটু খোস গল্প করা বহুদিনের অভ্যেস। বিগত কয়েক মাস প্রিয় বাজারের চেনা ছবিটা বদলে গেছে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। বিশেষ করে গরিব মানুষের অংশটা। আগুন দাম সব কিছুর। মুদি দোকান থেকে আলু পেঁয়াজের দোকান, বিক্রি বাট্টা তলানিতে। আতঙ্ক, হতাশা, বিপন্নতার প্রতিচ্ছবি প্রতিটি মুখে। এবছর মহালয়া আর বিশ্বকর্মা পুজো একই দিনে ছিল বলে আশা জেগেছিল, পরিচিত রূপে ফিরবে বাজারটা। না সেটা হয়নি। আগেরদিন সন্ধের আগেই ঝাঁপ ফেলেছিল বাজার। প্রতিদিন একটু একটু করে বদলে যাওয়া বাজারের ছবিটায় বুঝতে পারি গভীর সঙ্কটে সমাজের বৃহত্তর অংশ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।

চলমান ভাইরাস যুদ্ধ, স্বাস্থ্যের সঙ্কট...

একটা যুদ্ধ শুরু চলছে সারা বিশ্বব্যাপী। এলোমেলো মানব সভ্যতা। সারা পৃথিবীর শিরদাঁড়ায় হিমশীতল আতঙ্ক। যদিও ইতিহাসে পড়া অতীত বিশ্বযুদ্ধগুলোর মতো নয়। গুলি,বারুদ, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধ জাহাজ

কোনও কাজে আসছে না এই যুদ্ধে। মজুত সেনাবাহিনীর বিশেষ কাজ নেই। হেলিকপ্টার, এরোপ্লেন নয়, মাঠে নেমে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী। আমরা ভাবতাম গোলা, বারুদ, বোমা মজুত করলেই আমরা সুরক্ষিত। ভুল ভাঙালো চলমান এই যুদ্ধ। মিসাইল, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ, গোলা বারুদে অসীম শক্তিশালী উন্নত,পশ্চিমী দেশগুলিতে চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। লাল বলে যে দেশগুলোকে আমরা ট্যারা চোখে দেখে এসেছি, তারা ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা সামলাতে পারছে, এমনকি তারাই ধার দিচ্ছে যুদ্ধের সৈনিক উন্নত পশ্চিমি দেশগুলিকে। যে শত্রুকে খালি চোখে কেন, সাধারণ মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায় না তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে, হিরোশিমা, নাগাসাকিতে এক লহমায় লক্ষ মানুষ মেরে, আস্তিন গুটিয়ে পেশি দেখানো দেশটা নিজেকে বাঁচাতে, খামছে খিমছে, ভয় দেখিয়ে, নানা দেশ থেকে যুদ্ধের রসদ, হাতিয়ার তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তাদের শত্রু সম্বোধনে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি আছে। ওরাই এই পৃথিবীর আদিম বাসিন্দা, জল,স্থল, অন্তরীক্ষ সব জায়গায় ওদের অবাধ বিচরণ। শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষে বিবর্তিত হওয়া আর কত দিনের। বেশি হলে দেড় লক্ষ বছর। আর ওরা এই পৃথিবীতে আছে কোটি কোটি বছর ধরে। ওরা সিনিয়র সিটিজেন। ওদের কয়েক লক্ষ কোটি প্রজাতির মধ্যে আমাদের বিজ্ঞান চিনতে পেরেছে মাত্র হাজার দুয়েক। তারমধ্যে ২০০র কম-বেশি আমাদের সঙ্গে সংঘাত করে। বাকিদের সঙ্গে আমাদের সমঝোতা আছে। আমাদের শরীরের সর্বত্র ওদের নিশ্চিন্ত উপস্থিতি। তবে যাদের আক্রমণে গোটা মানব সভ্যতা টলমল, সেই পরিবারের সদস্য সার্স কোভি, মার্স কোভির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০০২ এবং ২০১২ সালে। তখনও যুদ্ধ হয়েছিল। তবে আমাদের শক্তি আর বুদ্ধির কাছে অল্প দিনেই হার মানে। প্লেগ থেকে শুরু করে ইবোলা, জিকা, নিপাহর বিরুদ্ধে জয়ী মানুষ ছুটকো ছাটকা শত্রু বলে পাত্তাও দেয়নি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির গর্বে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রকৃতির কথা। নির্বিচারে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করার সময় আমাদের মাথায় থাকে না প্রত্যাঘাত আসতে পারে। প্রকৃতি যেমন অসংখ্য সৃষ্টি করেছে তেমনই প্রতিটি সৃষ্টিকেই টিকে থাকার লড়াইয়ের হাতিয়ারও দিয়েছে। ২০০২ আর ২০১২তে হেরে যাওয়া, অপমানিতরা রঙ রূপ বদলে (বিজ্ঞানের ভাষায় মিউটেশন) আবার উপস্থিত। তারা সংঘাত করেই বেঁচে থাকতে চায়। ফলে যুদ্ধ চলছে গোটা বিশ্বে। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অসহায় আত্মসমর্পণ করতেও দেখা যাচ্ছে বহু দেশকে। বিশেষ করে সেই দেশগুলো যারা পরিবেশ নিয়ে ভাবেনি, যারা জনস্বাস্থ্যের পরিবর্তে মিসাইল, ট্যাঙ্ক বানাতে ব্যস্ত ছিল, যারা স্বাস্থ্যের অধিকারের কথা অস্বীকার করে স্বাস্থ্যকে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছে। যারা হাতে কার্ড ধরিয়ে (ইনসিওরেন্স, সরকারি কোষাগার স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়ে) দিয়ে স্বাস্থ্য দিলাম বলে গলা ফাটিয়েছে। যারা হেলথ সেন্টার, স্যানিটাইজেসন, পুষ্টি, পরিবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে পাঁচতারা বেসরকারি হাসপাতালকে উন্নত স্বাস্থ্য বলে বুক বাজিয়ে চলেছে। আমাদের দেশও আছে এই তালিকায়। এই যুদ্ধে জীবন জীবিকা হারিয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবন খাদের কিনারায় চলে গেলেও, স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের পৌষ মাস চলছে। যত যুদ্ধ, তত ব্যবসা,তত মুনাফা। স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা চায় যুদ্ধ চলুক। আতঙ্ক বাড়ুক। চলমান যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার ভ্যাকসিন নিয়েও চলছে স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের খেলা। কার্যকারিতা, সুরক্ষা প্রমাণিত হওয়ার আগেই তারা বাজার দখলে নেমে পড়েছে। রাষ্ট্র নেতাদেরও পৌষ মাস। প্রশ্ন করার কেউ নেই। সাম্প্রতিক অতীতে সব প্রশ্নের উত্তর ছিল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। তেমনই এখন সব প্রশ্নের একটাই উত্তর ভাইরাস যুদ্ধ। আশ্বাসের পরিবর্তে সুপরিকল্পিত আতঙ্ক তৈরি করে মানুষকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে অন্য সব রোগ জ্বালা, প্রশ্ন রাস্তার অন্য পারে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না এই যুদ্ধটা শেষ হচ্ছে। সে মা- শিশুর যত্ন হোক বা ক্যানসার, কিডনির অসুখ হোক, তাকে অপেক্ষা করতে হবে এই যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত। কৃষকের দুর্দশা,পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এটা নয়। রাষ্ট্র তাই নিশ্চিন্ত। আমার কুটিল মনে তাই হাজারো প্রশ্ন...আতঙ্কটা সংগঠিত নয়তো ? যাইহোক চলমান যুদ্ধটার নাম কোভিড যুদ্ধ। শত্রু!! একটি ভাইরাস।

ভাইরাস যুদ্ধে আমাদের দেশ...

অন্য দেশে যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেলেও আমাদের দেশ বেশ কিছুটা পরে নড়াচড়া শুরু করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানুয়ারি মাসে স্বাস্থ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেও, হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটানো দেশের রাষ্ট্রনেতাকে নমস্কার জানানোর প্রোগ্রামটা তো বাতিল করা যায় না!! লক্ষ মানুষের জমায়েত করে, লোক লস্কর নিয়ে দেশ ঘুরিয়ে, হেলিকপ্টার কেনার চুক্তি করে তবেই না স্বাস্থ্যে মন দেওয়া যায়। তখন নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের ধারণা ছিল হেলিকপ্টার দিয়েই শত্রু নিকেশ করা যাবে। আমার কুটিল মন এখনও প্রশ্ন করে যাচ্ছে যাদের নমস্কার জানালাম তারাই প্লেনে করে শত্রু নিয়ে এল না তো? দেশে যুদ্ধটা শুরু করার আগেই রাষ্ট্র বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের নিকটজনেদের ফিরিয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের প্রাথমিক শর্ত নিভৃতবাসে পাঠায়নি। আবার কুটিল মনে ছোটবেলায় শেখা বিজ্ঞানের আনাগোনা। বিজ্ঞান শিখিয়ে ছিল, মানুষের চলাচলই এক দেশ থেকে আরেক দেশে রোগ ছড়ানোর বড় কারণ। মানুষ যখন গোষ্ঠীতে থাকত, শিকার করত, সমানভাগে ভাগ করে খেত, তখনও মারণ ভাইরাস,ব্যাকটেরিয়া ক্ষয়ক্ষতি করেনি এমন নয়। তবে গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত সেই ক্ষয়ক্ষতি। মহামারী, অতিমারী তাই সাম্প্রতিক ইতিহাস, মানুষের চলাচলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

যাইহোক দেরিতে হলেও আমাদের দেশ যুদ্ধটা শুরু করে ২৫ মার্চ, চার ঘণ্টার ব্যবধানে, অতি নাটকীয় ঘোষণায়, শুরু হয় দেশজুড়ে ২১ দিনের দুনিয়া কাঁপানো লকডাউন, এক লহমায় অচল হয় গোটা দেশ। ১৩৮ কোটি মানুষকে বন্দি করা হয় ঘরে। মুহূর্তে রুটিরুজি হারায় কোটি কোটি মানুষ। চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত থাকায়, জনস্বাস্থ্যের কিছু ধারণা থাকায় বারবার মনে হতে থাকে গোটা দেশ একসাথে স্তব্ধ করাটা কি সত্যিই জরুরি ছিল ? আমার মতো আরও অনেকের এই রকম একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি দাম্ভিক রাষ্ট্র । ২১দিনে যুদ্ধ জেতার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে স্তব্ধ করা হয় গোটা দেশ। গর্বিত রাষ্ট্রের মুখে এলাম, দেখলাম, জয় করলাম মনোভাব। যেন ২১ দিন বাদে লালকেল্লার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়াটা শুধু বাকি। মুহূর্তে পালটে গিয়েছিল আমার প্রিয় বাজারের চেনা ছবি। উধাও চেনা ভিড়, ভোর চারটের চেনা চিৎকার। উধাও চেনা সবজিওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা। উধাও লোকাল ট্রেনের ভোঁ। মুদির দোকানগুলোতে উপচে পড়া অন্য রকম ভিড়। লম্বা লাইন। পয়সাওয়ালারা গোটা বাজারটাই কিনে নেওয়ার চেষ্টায়। আমার মতো ছাপোষা মানুষও প্রভাবিত হয়ে সেই লাইনে শামিলের চেষ্টা করেছিল। যে বাজারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি বার করা ছিল সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা, সেই রাস্তা সকাল দশটায় শুনশান।

পুলকিত মন। হুহু করে পৌঁছে যাচ্ছি হাসপাতাল। গাড়ি চালিয়ে এক অনাবিল ফুর্তি। অনেকটা জেনারেশন এক্সের গভীর রাতে বাইক চালানোর মতো। রোগী নেই, হাসপাতাল ফাঁকা, কাজ নেই, চেম্বার বন্ধ, তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা, দুপুরের ভাত ঘুম, সন্ধ্যায় আয়েশ করে মুড়ি, ঘরে তৈরি তেলেভাজা, জমজমাট সিরিয়ালে ব্যস্ত পরিবার। একদম অন্য রকম জীবন। ফ্ল্যাটে ঢোকা নিষিদ্ধ ঘোষিত বাইরের লোকের জন্যে। নোটিস ঝুলিয়ে। ট্রেন বন্ধ, বাড়ির কাজের লোকেরা আসতে পারছে না। যারা কাছে থাকে তাদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাট কমিটির সিদ্ধান্ত। বাড়ির কাজ ভাগ করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে পরিবারে অশান্তি। তবুও বেশ একটা অলস আরামের জীবন। মহাভারতের যুদ্ধ চলছিল ১৮ দিন। আমরা না হয় একটু বেশি দিলাম। মাত্র ২১ দিনেই যুদ্ধ জয়ের শিহরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল অনেকের কথা। এখন অনুশোচনা হয় স্বার্থপর মনটার জন্যে।

২১ দিন শেষ হওয়ার আগেই যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন চুরমার। প্রস্তুতি ছাড়া, পরিকল্পনা ছাড়া পৃথিবীর দীর্ঘতম,কঠিনতম চার দফার লকডাউনের সাক্ষী হলাম আমরা। ফলে শুরু হয়ে গেল আরেক যুদ্ধ। পেটে আগুন নিয়ে বেশিদিন থাকা যায় না।

রুটিরুজি হারিয়ে কোটি কোটি মানুষ আটকে গেছে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানায়। পেটে খাবার নেই। মালিকরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। রাষ্ট্র নির্বিকার। জীবনের তাগিদেই ফিরতে হবে ঘরে। নাহলে ভাইরাস মারার আগে পেটের আগুন মেরে ফেলবে। রাষ্ট্রের সীমাহীন নীরবতায় আমরা দেখলাম, লঙ্কাখেত থেকে পায়ে হেঁটে জামলো মকদমের ফেরার ব্যর্থ চেষ্টা। লক্ষ লক্ষ মানুষের লং মার্চ। শত শত মাইলের অনন্তযাত্রা। কাঁধে সন্তান, মাথায় বোঁচকা, হাতে টিনের বাক্স। চলতে থাকা মিছিলে, ফেরার যুদ্ধে হেরে যাওয়া হাজারো মুখ। করোনা মানে 'খিদে' উত্তর দেওয়া কাঁধে থাকা মেয়ে। গা গুলিয়ে ওঠা রেল লাইনে ছড়ানো রুটি। ছিন্ন ভিন্ন মাংসপিণ্ড। একই সঙ্গে, সারা দেশজুড়ে, রাষ্ট্রের কেনা মিডিয়ায় আছড়ে পড়া রাষ্ট্রের গুদামে মজুত খাদ্যের অহঙ্কার, ২০লক্ষ কোটি টাকা প্যাকেজের উত্তরসত্য। আবার কুটিল মনে অবান্তর প্রশ্ন!! সাতটা দিন সময় দেওয়া গেল না ওদের ?

চার দফার আনলক পেরিয়ে এখন সবাই নিউ নর্মাল। পেরিয়ে এসেছি প্রায় ছ'মাস... মদের দোকান খুলেছে। মল খুলেছে। মেট্রো চালু হয়েছে। বাস, ট্যাক্সি চলছে। ট্রেন চালু হওয়ার মুখে। শুধু বাকি থেকে গেছে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট তৈরি করা, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর মজুত করা। হাসপাতাল রেডি করা। স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা। কোটি কোটি সব হারানো মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়া। রাষ্ট্রের অবশ্য সময় ছিল না এসব নিয়ে ভাববার!! কারণ একই সঙ্গে তাকে চালাতে হয়েছে কয়েকটা রাজ্য সরকার কিনে নেওয়ার লড়াই। এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি ফেলে রাখা যায় ? এর থেকে আদর্শ সময় পাওয়া মুশকিল। ঘরবন্দি মানুষ, ভাইরাস আতঙ্কে ভীত মানুষ। মুখে লিউকোপ্ল্যাস্ট সেঁটে দেওয়া মানুষ। আমরা তাই এগিয়ে চলেছি। চলমান যুদ্ধে প্রতিদিন আহতের সংখ্যায় আমরা বিশ্বসেরা। মোট আক্রান্ত পঞ্চাশ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে কবেই। সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন যত সংক্রমণ হচ্ছে তার অর্ধেক আমাদের। প্রতিদিন নিহতের সংখ্যায় আমরা সবার উপরে। যদিও রাষ্ট্রনেতারা বলছেন আমাদের ১৩৮ কোটি জনসংখ্যায় এ আর এমনকি। রাষ্ট্রের কাছে সবই এখন কিছু সংখ্যা। আগে রাষ্ট্রনেতারা ভাইরাস নিয়ে মিটিং করত। ভাইরাস যুদ্ধের খবর শুনতে পেতাম মাঝে মাঝে। মন কি বাতে যুদ্ধক্ষেত্রের খবর পেতাম। এখন আমাদের প্রাপ্তি সন্ধের সরকারি বুলেটিনে আহত নিহতের ছোট পরিসংখ্যান। এখনও রাষ্ট্রনেতারা মিটিং করে, তবে সেগুলো রেল, এয়ারপোর্ট, খনি, ব্যাঙ্ক বিমা বিক্রির জন্যে। মিটিং হয় রামমন্দিরের নকশা নিয়ে। ছোট, বড় রাষ্ট্রনেতারা বলছে মন্দিরটা হলেই ভাইরাসটা কুপোকাত হবে। তাই মন্দির নিয়ে ভাবুন। ভাইরাস তাই উধাও মিডিয়া থেকে। রাষ্ট্র ভাইরাস যুদ্ধের সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিয়েছে নিজের সুরক্ষার দায়িত্ব তার নিজের। রাষ্ট্রের কোনও দায় নেই। সংসদে রাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছে কতজন যোদ্ধা হতাহত হলো তার হিসাব সরকার রাখছে না। ভাইরাস যুদ্ধে সংক্রমিত সৈনিকদের চিকিৎসা দূর অস্ত, মাইনে কেটে নেওয়ার ঘটনাও তাই ঘটছে যুদ্ধে হাজিরা দিতে না পারার জন্যে। নিহত হলে কফিন নেই, গান স্যালুট নেই, শোকবার্তা নেই, বলে দেওয়া হচ্ছে ভাইরাস যুদ্ধে নয় মৃত্যুর কারণ কো-মর্বিডিটি। ৫০ লাখ বিমার ঘোষণা, এই যুদ্ধের সৈনিক, চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে পরিহাসে পরিণত।

তবে আমরা ভাগ্যবান দেশের বাসিন্দা। ভাইরাস যুদ্ধের এই দীর্ঘ সময়কালে নতুন নতুন অনেক পথ এবং হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে রাষ্ট্র নেতাদের বক্তৃতায়। গোমূত্র-গোবরের পাচক, রোদে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা, ভাবিজি পাঁপড়। গোবরের মাস্ক, গোমূত্রের স্যানিটাইজার। একদম হোম মেড। সৈনিকদের ট্রেনিং না দিয়েই যুদ্ধে পাঠানো হলেও, রাষ্ট্রের নীরব সমর্থনে ট্রেনিং চলছে গোবরের মাস্ক এবং গোমূত্রের স্যানিটাইজার বানানোর। সৈনিকদের মঙ্গল কামনায় রাষ্ট্র বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছে, মোমবাতি জ্বালিয়েছে, আতশবাজি ফাটিয়েছে, ফুল ছড়িয়েছে মাথায়। এসব কি কম পাওনা ?

চারদফার লকডাউন, চারদফার আনলক পেরিয়ে নিউ নর্মালে কোটি কোটি মেহনতি জনগণ, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক, কাজ হারানো মজদুর বুঝে গেছে তাদের আবার লং মার্চে শামিল হতে হবে। কাঁধে সন্তান মাথায় বোঁচকা নিয়ে। তাই যাদের ঘামের গন্ধে নির্বাচন মাতোয়ারা, তাদের বিশ্বকর্মা বলে স্যালুট জানালেও, তারা ফিরতি ট্রেন, বাস ধরতে ব্যস্ত। পেটের আগুন এই দীর্ঘ সময়ে জ্বলন্ত চুল্লিতে পরিণত। ভাইরাস নয়, তাদের লড়াই পেটের আগুন নেভানোর।

সাপ্তাহিক লকডাউনের অলস একটি দিনের গল্প...

সাপ্তাহিক লকডাউনের দিন ছিল সেদিন। নিউ নর্মালে শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যের নতুন যুদ্ধ কৌশল। বেঙ্গালুরুর আইআইএসআর-এর গণিত নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের দেখানো পথ। তাঁরা অবশ্য পরে স্বীকার করেন মানুষের স্বাভাবিক আচরণ তাদের বিবেচনায় ছিল না। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এরকম কোনও সুপারিশের কথা আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমার বাংলা এগিয়ে বাংলা। নতুন কিছুর চমক তাই থাকবেই। ছুটির বন্যা বয়ে যাওয়া রাজ্যে অনেকগুলো এরকম পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা আমরা পেয়েছি। এই দিনগুলো সবজি বিক্রেতা, ঠেলা চালান, মুটে-মজদুর, রিকশা চালান যাঁরা, তাঁদের রুজিহীন দিন, অনেকের রুটিহীন দিনও। আমারও একটা কর্মহীন দিন। জুনিয়র সহকর্মীরা বলে দিয়েছে স্যার আজকে আর আপনার আসার দরকার নেই। রোগীর চাপ থাকবে না। আমরাই সামলে নেব। আপনি স্যার বিশ্রাম নিন। খারাপ লাগে ডিউটিতে না গেলে। অনেক ছোট ওরা আমার থেকে। আমার সন্তানের মতো। রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন চোখে একঝাঁক ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, পিজিটি। এমডি, এমএস পাশ করা তরতাজা, যুদ্ধে নিয়োজিত চুক্তির ডাক্তার এই সারিতে। ক্লান্তিহীন লড়াই লড়ে যাওয়া সৈনিক সব। ভাইরাস যুদ্ধে ওদের কোনও ছুটি নেই। শুধু সাপ্তাহিক লকডাউন কেন, সমস্ত ছুটির দিনেই রোস্টার

মেনে ডিউটি ধরা ওদের এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আতঙ্ক আছে। আশঙ্কা আছে। পরিবার পরিজনের উদ্বেগ আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। একটা কঠিন যুদ্ধের সৈনিক ওরা। যেখানে প্রতি মুহূর্তে জীবনের ঝুঁকি আছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ওদের সমস্ত ছুটি বাতিল। দিনের পর দিন টানা কাজ। তাও হাসিমুখ। প্রতিদিন সকালে দু'চার জনকে সোয়াব পরীক্ষার লাইনে দেখাটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যুদ্ধের যে পোশাক সরকার দিচ্ছে, সেগুলো এমনিতেই প্লাস্টিক, একঘন্টাও গায়ে রাখা যায় না। শরীরের ঘামে মনে হবে আপনি বৃষ্টিতে ভিজে এলেন। প্লাস্টিকের সুরক্ষা বর্ম পরে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার নজির আছে ভূরিভূরি। তার উপর যারা সাপ্লাই করে, যারা কেনে তাদের ভাবনায় সমস্ত সৈনিকরাই দৈর্ঘ্য প্রস্থে এক। ফলে নানা কায়দা করে শরীরটা ঢেকে রাখতে হয় ওদের। যুদ্ধের মাঠে অনেক সময় ছিঁড়েও যায়। তাও ক্লান্তিহীন সৈনিকরা মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলে... স্যার আরও যদি কয়েকটা সিসিইউ থাকত, অক্সিজেন বেড থাকত, তাহলে আরও অনেক বাঁচাতে পারতাম। তরতাজা যৌবনই পারে সত্যিটা এত সহজে বলতে। শুধু ওরা কেন এই যুদ্ধে শামিল সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের স্যালুট কুর্নিশ দিতেই হয়। নানা অপ্রাপ্তির মধ্যেও ওদের ক্লান্তিহীন লড়াইয়ে প্রতিদিন বাড়ি ফিরছে হাজার হাজার আক্রান্ত মানুষ। সরকারের বুলেটিনে তাই জ্বলজ্বল করে সুস্থতার হার এবং ডিসচার্জের কলাম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এতগুলো মাস বাদেও পরিকাঠামোর বিপুল ঘাটতিতে ওদের আক্ষেপ, কিছু করতে না পারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ওদের পাশে প্রতিদিন থাকার চেষ্টা করি। প্রয়োজন, বাস্তব আর প্রতিদিনের সরকারি বুলেটিনে বিস্তর ফারাক। যেখানে সাধারণ মানুষের একটা বেডের জন্যে অসহায় দৌড়োদৌড়ি দস্তুর সেখানে বেড ফাঁকা থাকার সরকারি বুলেটিন হাস্যকর লাগে। অপরিকল্পনা, অব্যবস্থায় রাজ্যের ভাইরাস যুদ্ধ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

মৃত্যুগুলো শুধুই সংখ্যা...

আমার মতো পঞ্চাশ পেরনো লোকেদের ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কিছু স্মৃতি আছে। সাইরেন বাজলেই দুড়দাড় করে জানলা দরজা বন্ধ করে দিত সবাই। আমরাও জেনে গিয়েছিলাম সাইরেন বাজলে কি করতে হবে। দরজা জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশে বিকট শব্দে প্লেনের উড়ে যাওয়া দেখা, আকাশবাণীতে যুদ্ধের সাফল্যের বিবরণী শুনতে শুনতে একটা রক্ত গরম করা উত্তেজনা অনুভব করতাম। তখন কি বুঝতাম যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি আর সৈনিকদের মৃত্যু কতটা দুঃসহ হতে পারে। চলমান ভাইরাস যুদ্ধের কার্যকরী হাতিয়ার এখনও অধরা। হাতিয়ার আবিষ্কারের বিপুল প্রয়াস চলছে দেশে দেশে। আবার সেটা নিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতির লড়াইও শুরু হয়ে গেছে। কার্যকারিতা, সুরক্ষা সেখানে গৌণ। কেউ আগে থেকেই ঘোষণা করে দিচ্ছে মার্কেটে লঞ্চ হওয়ার দিন। যেন মোবাইলের নতুন মডেল লঞ্চ হবে। অ্যাডভান্স বুক করে রাখছে উন্নত বিশ্বের নানা দেশ। সিনেমার টিকিট বুক করার মতো। অন্যদিকে বিভ্রান্ত জনগণ, বারবার প্রতারিত জনগণের একটাই প্রশ্ন স্যার ভ্যাকসিনটা সত্যিই আসবে তো? এতদিন বাদেও প্রায় খালি হাতেই লড়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ সৈনিক। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করা স্বাস্থ্যকর্মী, আশা, আইসিডিএস কর্মীদের। প্রশিক্ষণ নেই। সুরক্ষা সামগ্রীর অভাব। আহত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মৃত্যু হলে শোক বাক্য নেই। এক অদ্ভুত লড়াই। সৈনিকরা চেয়েছিল ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন, আইটিইউ, সুরক্ষা সামগ্রী, বদলে পেয়েছে রাফালে কেনার রাষ্ট্রীয় গর্ব।

রাজ্যে প্রতিদিন দু'চারজন চিকিৎসক যোদ্ধা শহীদ হচ্ছে। মানুষের মৃত্যু মিছিলেও দাঁড়ি কমা নেই। আগে সরকার তাও দুঃখ প্রকাশ করত। এখন আর করতে শোনা যায় না। নিরুত্তাপ সরকারের কাছে যোদ্ধাদের মৃত্যুগুলো এখন শুধুই সংখ্যা। এই যুদ্ধের সৈনিকদের সুরক্ষা, আহত হলে চিকিৎসা নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। প্রতিদিনের সরকারি বুলেটিনে সৈনিকদের কথা তাই আলাদা করে কিছু থাকে না। খবরের কাগজেও শহীদ যোদ্ধাদের খবরের গুরুত্ব নেই। আগে তাও দু'চার লাইন দেখতে পেতাম। এখন আর দেখা যায় না। যোদ্ধাদের শহীদ হওয়ার খবরে নাকি কাটতি নেই, বাজার নেই। অবশ্য সরকারের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ব্যবসায় ক্ষতি কে-ই-বা চায়।

ভীতু মানুষের জবানবন্দি এবং জনগণের নিজস্ব লড়াই...

তবে আমি ভীতু মানুষ। যুদ্ধ ক্ষেত্রের বারুদের গন্ধ নিয়ে যখন বাড়ি ফিরি, ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদের রহস্যজনক চাউনিতে মনের মধ্যে একটা ভয় হয়। চূড়ান্ত অস্পৃশ্যতা সমাজের মননে। ভাইরাসে আক্রান্ত হলেই ধারে কাছে কেউ ভিড়ছে না। একঘরে হয়ে যাচ্ছে মানুষ। পরিবার পরিজনও এড়িয়ে যাচ্ছে। জনতার ভয় তাই আমার থেকেও বেশি। রোগ গোপন রাখাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে বেছে নিয়েছে। দোষ দেওয়া যায় না। পাশে দাঁড়ানোর মানুষ খুঁজে না পেলে তারা কি করবে ? একদিকে আক্রান্ত মানুষের পরীক্ষা, চিকিৎসা সব কিছুতেই অভিযোগের পাথর জমতে জমতে পাহাড়ে পরিণত, অন্যদিকে সরকার ব্যস্ত তথ্য,পরিসংখ্যানের জাগলারিতে। বোঝাই যাবে না রাজ্যে কোনও সমস্যা আছে। তবে রিপোর্ট পজিটিভ হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের ফোন পাওয়া এবং বাড়িতে থাকার পরামর্শ পাওয়া মোটামুটি নিশ্চিত। বাড়ি থাকলে তো বাড়িতে থাকবে। একঘরে পাঁচজন থাকা দেশে বাড়িতে থাকুন উপদেশ পরিহাস ছাড়া আর কি হতে পারে। বাড়িতে থাকলে দেখবে কে, অবস্থা খারাপ হলে করবে কি... এসব ভাবনা সরকার জনগণের উপরই ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য বড়লোকদের জন্যে চার তারা, পাঁচ তারা ব্যবস্থা হয়েছে। গালভরা নামও দিয়েছে। স্যাটেলাইট সেন্টার। ভাইরাস যুদ্ধে বহু ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠলেও স্বাস্থ্য ব্যবসার পোয়াবারো। আগে ঘটি বাটি বেচতে হতো। এখন বেচেই যেতে হয়। যোদ্ধাদেরও ছাড় নেই, এমনকি নিজের হাসপাতালেও। সরকারও তার যোদ্ধাদের জন্যে আলাদা কোনও ব্যবস্থা করেনি। সরকার ঘোষিত আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে না বেশিরভাগ সংক্রমিত বা মৃত চিকিৎসক- স্বাস্থ্যকর্মীর পরিবার। ঘুম ছেড়ে স্বাস্থ্য কমিশন দু'চার দিন লাফালাফি করেছিল। এখন আবার শীত ঘুমে। মানুষের এই গভীর সঙ্কটে, ফড়ে নামিয়ে, সরকার নেতা কিনতে ব্যস্ত থাকলেও, লাল স্বেচ্ছাসেবক ব্যাজ পরে কিছু ছেলেমেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারাই একটু খোঁজ খবর রাখছে, বাড়ির ছোট মেয়েটার দুধ পৌঁছে দিচ্ছে, রেশন তুলে দিচ্ছে, ওষুধ পৌঁছে দিচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে গুরুতর অসুস্থকে হাসলাতালে পাঠাতে সাহায্য করছে। যুদ্ধের নিয়মাবলি শেখাচ্ছে। গোমূত্র, গোবরের পরিবর্তে বিজ্ঞানের কথা বলছে।

এসবের মধ্যেও পাড়ার ওষুধের দোকানে টুলে বসে চা খাওয়াটা আমার বন্ধ হয়নি। কেনাবেচা ভালো হচ্ছে বলে চায়ের বদলে মাঝে মাঝে কফিও চলে আসে। বাজার ম্রিয়মাণ হলেও, ওর দোকানে অনেক খদ্দের। প্রায় সবারই একই চাহিদা। দাদা জ্বর কাশির ওষুধ দিন। ভাইরাস যুদ্ধে সরকারের প্রতারণায় খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েও, রাজ্যবাসী নিজেই যুদ্ধটা লড়ে যাচ্ছে ।

করোনা মোকাবিলার দায় নেই সরকারের?

ডাঃ ফুয়াদ হালিম

চিকিৎসক হিসেবে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আমার পেশার অঙ্গ। কিন্তু এই মহামারী এবং তার অঙ্গ হিসেবে লকডাউন এক এক পর্যায়ে এক এক রকমের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে।

লকডাউন ঘোষণার পরপরই দেখলাম শহরের বহু বেসরকারি হাসপাতাল হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যাঁরা চেম্বারে প্র্যাকটিস করেন, সেই সমস্ত মোটা 'ফিজ'-এর চিকিৎসকরা হঠাৎই রোগী দেখা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে আমাদের কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকার একবার ভাবলও না, যাঁদের নিয়মিত চেকআপ করাতে হয়, তাঁরা এই পরিস্থিতিতে কী করবেন বা কোথায় যাবেন!

প্রথম থেকেই আমার রোগীরা তথাকথিত নিম্নবিত্ত পরিবারেরই। মজার ব্যাপার হলো, লকডাউনের জন্য হঠাৎ দেখলাম, আর কোনো চিকিৎসার পথ খোলা না পেয়ে মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এমনকি তথাকথিত ধনীরাও আসতে আরম্ভ করেছেন আমার কাছে! আরেকটি নতুন অভিজ্ঞতা হলো, সাধারণত কমদামের যে ওষুধ আমার চেম্বার থেকে দিই, যেমন রক্তচাপের ১০দিনের ওষুধ (১৫ টাকা) সুগারের ওষুধ ১০ দিনের (৩০ টাকা)– সেগুলিও গরিব মানুষজন দু'দিন-তিনদিনের হিসাবে কিনতে শুরু করলেন! লকডাউনের পর কিছুদিন কোনওরকমে চললেও তারপর তাঁদের হাতে আর টাকা ছিল না। এমনও হয়েছে, ১৫ দিন পর একজন রোগী এসে বলছেন-- ডাক্তারবাবু হাতে কিছু টাকা এসেছে,ওষুধ দিন। ততদিনে তাঁর বহু কষ্টে কন্ট্রোলে চলে আসা সুগার ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে!

গোড়ার দিকে কোনও একটি হাসপাতালে একজন রোগীর কোভিড পজিটিভ হলেই স্যানিটাইজেশনের নাম করে গোটা হাসপাতালই বন্ধ করে দেওয়া হতো! এই ধরনের বিজ্ঞান বহির্ভূত স্বাস্থ্য পরিষেবা চিন্তাই করা যায় না! আবার এই যে এখন আরম্ভ হয়েছে–করোনা পরীক্ষা না করা হলে একজন রোগীকে চিকিৎসক দেখবেনই না–এই যুক্তিও পুরোপুরি অমানবিক এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত। ফলে কোভিড না হয়ে অন্য কোনও অসুখ হলে তার চিকিৎসা করাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারের নির্বিকার মনোভাব, অমানবিকতা এবং নিষ্ঠুরতার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে।

লকডাউনের ঠিক আগে আগে কারও ক্যানসার বা অন্য কোনও বড় রোগ ধরা পড়লে তিনি কীভাবে কেমো নেবেন, কীভাবে ডায়ালিসিস করাবেন, কীভাবে চিকিৎসা শুরু করবেন তার কোনও দিশা পাচ্ছিলেন না। সমস্ত অস্ত্রোপচারও বন্ধ হয়ে যায়। আবার যাঁদের কেমো চলছিল কিংবা ডায়ালিসিস চলছিল, তাঁরা কিভাবে তাঁদের বাড়ি থেকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছবেন, তার কোনও পরিকল্পনা সরকার করেনি, সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক বা রাজ্য সরকার। লকডাউনে সরকারি যানবাহন, যেমন রেল এবং বাস পরিষেবা বন্ধ করা হয়, তেমনি বেসরকারি যানবাহনেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। এই পরিস্থিতিতে যে সমস্ত রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা করাতে যেতে হয়, তাঁরা অসম্ভব বিপদে পড়েন। প্রথমত, প্রশাসনের কাছ থেকে যাতায়াতের সরকারি অনুমোদন পাওয়া এবং দ্বিতীয়ত বিশেষ পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স অথবা গাড়ির চড়া ভাড়া এক নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

এদিকে, লকডাউনের প্রথম দিকে হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ডায়ালিসিস সেন্টার দুমদাম বন্ধ করে দেওয়ায় সঙ্কুচিত জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর পরিসর আরও কমে আসে। করোনা সংক্রমিতদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে বেড সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায়

আরও সঙ্কোচন ঘটে। যাঁরা টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য কিনতে অভ্যস্ত, তাঁরাও বিকল্প কিছু না পেয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যেতে বাধ্য হন। লকডাউনের প্রথম দিকে কর্পোরেট হাসপাতালের দরজা বন্ধ ছিল। ফলস্বরূপ সমাজের পয়সাওয়ালা মানুষেরা ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের অধিকাংশ মানুষ কীভাবে চিকিৎসা করান।

আমাদের রাজ্যে ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মহামারী মোকাবিলায় ঠিক কী ভূমিকা নিল, তা এখনও বোঝা গেল না! মার্চ মাসেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, মেডিক্যাল কলেজকে কোভিড হাসপাতাল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে নিজের নির্দেশ প্রণয়ন করতে পারেননি। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশাবলী রূপায়ণ করতে দীর্ঘ সময় নিয়ে নেন। অনেক পরে মেডিক্যাল কলেজের পাঁচশো মতো বেড কোভিড চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ হয়। আবার সেটাও করা হয় মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব বেড থেকেই। কোনও বাড়তি বেডের ব্যবস্থা হয়নি!

এখন এই যে বিভিন্ন হাসপাতালের এত সংখ্যক বেড কোভিড চিকিৎসার জন্য নিয়ে নেওয়া হলো, তার ফলে সেইসব হাসপাতালে অন্য অসুখের চিকিৎসার সুযোগ কমে গেল। এরকম তো কথা ছিল না! লকডাউনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল, সরকার এই সময়কে ব্যবহার করবে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রসারিত করতে। কিন্তু বাস্তবে সরকার এই ব্যাপারে চূড়ান্ত অসফল। এমনিতেই হাসপাতালে বেড কম, কোভিডের জন্য যে বেড নেওয়া হলো তা-ও তো নতুন নয়। ফলে ঘাটতি পূরণ তো দূরের কথা, ঘাটতি বাড়তেই থাকলো।

এই ছবিই প্রমাণ করে আমাদের রাজ্যের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কী করুণ অবস্থা! আবার শুধু বেড বাড়ালেই তো হয় না, লোকবলও প্রয়োজন। হার্টের সার্জন কোভিডের বেড সামলাচ্ছেন, এমন অবস্থাও হয়েছে। আমরা জানি যে নার্সিং পড়ুয়া, ইন্টার্ন এবং হাউজ স্টাফদের কোনোরকম প্রশিক্ষণ এবং যথোপযুক্ত পিপিই ছাড়াই তাঁদের উপর ডিউটি চাপিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। রাজ্যজুড়ে এক অদ্ভুত বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি হয়। আগস্ট মাসে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল যে তিন-সাড়ে তিন হাজার চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। তার মানে এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে এত সংখ্যক চিকিৎসকের অভাব ছিল! আমরা জানি যে এই সরকার এমনিতেই নিয়োগ না করার নীতি নিয়ে চলছে। অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করে দেওয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের চিকিৎসকরা যাবেন কোথায়? এমনিতেই পরিসংখ্যান বলছে সরকারি চিকিৎসক সংখ্যা ১০ হাজার থেকে কমে সাত হাজারে নেমে এসেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মহামারীর সময় তার প্রভাব পড়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরও।

দিন পেরিয়ে গেলেও রাজ্য বা কেন্দ্রের সরকার মহামারীকে গুরুত্বই দিচ্ছে না। যত নমুনা পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, তার কিছুই হয়নি! আইসিএমআর'র সেরো সার্ভে (আগস্টে) থেকে জানা গিয়েছে, ৪০ শতাংশ ভারতীয় কোভিড ১৯-এর সংস্পর্শে এসেছেন। আমাদের দেশে প্রতি একজন কোভিড পজিটিভ চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা, টেস্টিং কম থাকার ফলে আশি জনকে চিহ্নিতই করতে পারিনি। আমেরিকাতে এই অনুপাত ১:১৬। এখনও আমাদের দেশে বহু আক্রান্তই চিহ্নিত নন। সেই অনুপাত যথেষ্ট ভয়াবহ।

করোনা ভাইরাসের সঙ্গে তিনিই লড়াই করতে পারবেন, যাঁর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তখনই বাড়বে যখন সঠিক পুষ্টিমানযুক্ত খাবার খেতে পাবেন সাধারণ মানুষ। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সমীক্ষাগুলিতে দেখা গিয়েছে যে, গ্রামীণ ভারতে পারিবারিক বরাদ্দ সবজির খাতায় ২৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। অন্য কয়েকটি সমীক্ষা বলছে লকডাউনের আগের তুলনায় তিন মাস পরে ভারতবর্ষের মহিলাদের ওজন দু'কেজি এবং পুরুষদের ওজন আড়াই কেজি কমেছে। স্বাভাবিকভাবে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা একই অনুপাতে কমেছে। প্রোটিন, ভিটামিন শরীরে না থাকলে রোগ প্রতিরোধ করবেন কীভাবে কেউ? বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করতে গিয়ে দেখেছি, অপুষ্টি কীভাবে শিকড় গেড়েছে। একেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তার উপর সরকারের আচরণের কারণে বহু মানুষের মধ্যে নমুনা পরীক্ষা করানো, হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে সাংঘাতিক অনীহা তৈরি হয়েছে। এই যে কোভিডে কেউ মারা গেলে হাসপাতাল থেকে তাঁর দেহ আর দেওয়া হচ্ছে না পরিজনদের কাছে, এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের মনে মারাত্মক ধাক্কা দিয়েছে। পরে যদিও এই প্রশ্নে নীতি বদলায় সরকার। বাড়িতে কারও করোনার উপসর্গ থাকলেও তাঁরা স্থানীয় চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা করাচ্ছেন। তাতে রোগী বাঁচলে বেঁচে গেল, নাহলে কিছু করার থাকলো না। ভয়েই করোনা পরীক্ষা করাতে চাইছেন না সাধারণ মানুষ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জানা দরকার যে ইতিহাস বলে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্ম কোনোদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারের তরফে হয়নি। ৩০০ বছর আগে কোনও সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল না। উন্নয়নশীল দেশে কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন বস্তি। সেখানে কারখানার শ্রমিকরা থাকতেন। বাজার থেকে তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনতে হতো। সেই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে তাঁরা ঠিক করেছিলেন সমষ্টিগতভাবে বাজার থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনবেন। একটা ফান্ড তৈরি হয়: 'মিউচুয়াল এইড অ্যান্ড ফ্র্যাটার্নাল অর্গানাইজেশন'। তাঁদের স্লোগান ছিল, 'ওয়ান ফর অল, অল ফর ওয়ান'। একদিনের বেতন দিয়ে শ্রমিকরা তৈরি করেন সেই ফান্ড। ক্রমশ সেই ফান্ড বাড়তে থাকে। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই শ্রমিকরা সামাজিক সমস্যার প্রতিকারের রাস্তা তৈরি করেন। একসময় আমেরিকার প্রায় ২৫ শতাংশ শ্রমিকরা কোনও না কোনও মিউচুয়াল এইড সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স জাপান– পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের মধ্যে শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে এই সংস্থা চালু ছিল। এই ফান্ডগুলো বলিষ্ঠ হতে হতে আউটডোর সার্ভিস থেকে হাসপাতাল তৈরি হয়. ভাবা যায় যে একটা ফান্ড আমেরিকার নিজস্ব মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করল! শ্রমিকরা ১৭৮০-৯০ সাল নাগাদ এমনই কাজ করেছেন। আর পৃথিবীর প্রথম জনস্বাস্থ্য আইন তৈরি হয় ১৮৮৩ সালে। তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর এই আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "কীভাবে সমাজ পরিচালনা করতে হয় তা শ্রমিকরা এবং কমিউনিস্টরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং সরকারের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা উচিত, শ্রমিকদের এই প্রচেষ্টাকে প্রতিযোগিতায় ফেলার জন্য।"

সুতরাং, সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনোদিন জনস্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু করেনি! কিন্তু জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পোক্ত করার দায় যে কোনও দেশের সরকারের উপর বর্তায়। আজ মহামারী নতুন করে বুঝিয়েছে, ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের এক দেশে শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঠিক কতখানি প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রের সরকার সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন নিজেদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে।

বিজ্ঞান সংস্কৃতির অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্যামল চক্রবর্তী

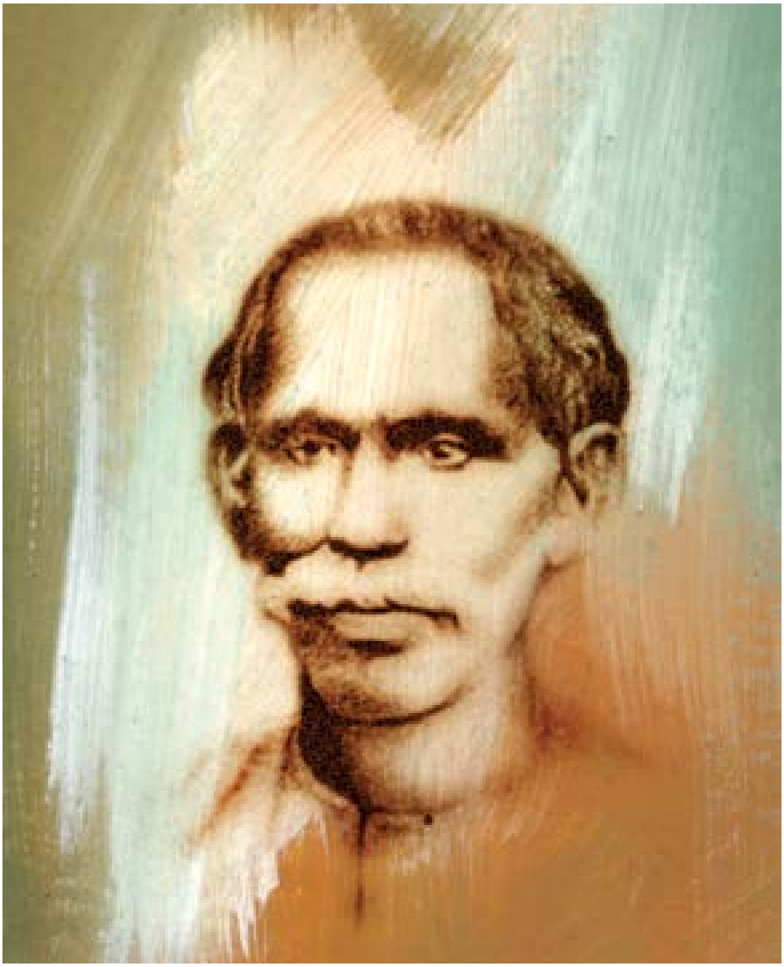

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

একেবারে গোড়ার দিকে যে ক'জন মানুষ অক্ষয়কুমারের জীবনী লিখেছেন, তাঁরা একটি কল্পিত কাহিনী যোগ করেছেন। প্রথম বইটির কথাই বলা যাক। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বাবুর জীবনবৃত্তান্ত' শিরোনামে বইটি লিখেছিলেন মহেন্দ্রকুমার রায়। সেই বইয়ে লিখিত রয়েছে:

''চুপীর ন্যূনাধিক ১।।০ দেড় ক্রোশ দক্ষিণে কানা গোঁসাই নামে যে একটি অন্ধ সাধু অবস্থিতি করেন, ১২২৬ সালে তাঁহার দ্বারা পুত্রেষ্টি বাগ করান। ১২২৭ সালে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়।''

দ্বিতীয় জীবনীকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস আবার এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। তিনি 'অক্ষয়-চরিত্র' গ্রন্থে লিখলেন:

''দয়াময়ী...পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। সেই যাগের চারু খাইবার পর উহার গর্ভ সঞ্চার হয়।... কানা গোসাঞি ইহাঁর নাম নৃসিংহপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন।''

বর্তমানে কেউ জীবনীগ্রন্থ লিখলে যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চারুভক্ষণ করে সন্তানের জন্মকথা বিবৃত করেন, তিনি বিদ্রুপের পাত্র হবেন। বহু কুসংস্কার সমাজে বেঁচে থাকলেও এমন কল্পিত কাহিনী অপসারিত হয়েছে বলেই মনে হয়। তার প্রমাণ

আমরা অক্ষয়কুমারের বেলাতেও দেখতে পাই। মহেন্দ্রনাথ ও নকুড়চন্দ্রের গ্রন্থ রচনার পাঁচ দশক পরে অক্ষয়কুমারের জীবনী লিখেছেন মন্মথনাথ ঘোষ। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত' শিরোনামে তিনি লেখেন :

''নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তরে চুপী নামক গ্রামে এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে কায়স্থকুলে সন ১২২৭ সালের ১ শ্রাবণ (ইং ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ) অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন।.. অক্ষয়কুমারের পিতা পীতাম্বর অতি সদাশয়, পরোপকারী ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সামান্য বাঙলা জানিতেন এবং খিদিরপুরের টালিগঙ্গা নালার কুতঘাটের কেশিয়ার ও দারোগা ছিলেন।... অক্ষয়কুমারের জননী দয়াময়ী কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী ইটলে গ্রামনিবাসী রায়দুলাল গুহের কন্যা। দয়াময়ী যথার্থই দয়াময়ী ছিলেন। তিনি হৃদয়ের নানা রমণীয় গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন।''

পাঠকবন্ধুরা খেয়াল করে দেখুন, এই বর্ণনায় কল্পিত কাহিনীর সামান্যতম স্পর্শ নেই।

পাঁচ বছর বয়সে অক্ষয়কুমারের 'হাতেখড়ি' হয়। বাড়িতে অন্যদের স্কুলে যেতে দেখলে তিনি ছোটবেলা থেকেই স্কুলে যাওয়ার বায়না ধরতেন। একটা মজার কথা লিখেছেন জনৈক জীবনীকার। এক দিন প্রচণ্ড গরমে মা তাঁকে স্কুলে যেতে বারণ করেন। ছোট্ট অক্ষয়কুমার তখন বলেন, ''সকলের মা বলে, লিখতে যা, লিখতে যা, আমার মা বলেন, লিখতে যাসনে, যাসনে, যাসনে।''

সাত বছর বয়সে গুরুচরণ সরকার নামে এক মাস্টারমশাইয়ের কাছে অক্ষয়কুমারের লেখাপড়া শুরু হয়। আমিউদ্দিন মুনসি-র কাছে তিনি ফারসি ও টোলের পণ্ডিত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত শেখেন।

এরপর অক্ষয়কুমার বাবার কাছে চলে এলেন কলকাতায়। ইংরেজি পড়ার ইচ্ছে হলো। দু-একজনের কাছে শিখলেন। মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেন। বাড়িতে ভয়, ছেলে যদি খ্রিস্টান হয়ে যায়! ছাড়িয়ে এনে তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি করা হলো। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য দেখলেন, ছেলেটির পড়াশোনায় আগ্রহ খুব। ডবল প্রমোশন পেয়ে অক্ষয়কুমার পঞ্চম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠলেন। পরের বছর দ্বিতীয় শ্রেণিতে। এদিকে বাবার শরীর ভালো নয়। ইচ্ছে না থাকলেও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁকে বিয়ে করতে হলো। তখন অক্ষয়কুমারের বয়স ষোলো বছর। আগরপাড়া নিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা নিমাইমণির (শ্যামামণি) সঙ্গে তাঁর নিয়ে হয়। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাবা মারা যান। বাড়িতে মা ও স্ত্রী রয়েছেন। স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। মহেন্দ্রনাথ রায় তাঁর জীবনকথায় লিখেছেন :

''পঞ্চম শ্রেণীতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৬ মাস, তৃতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে (এ কালের অষ্টম শ্রেণী) এক বৎসর, মোট ২।। আড়াই বৎসরের অধিক ইহার উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন চললো না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও মনস্তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইঁহার চরিত্র বৃত্তান্ত উত্তরোত্তর পাঠ করিলে, এরূপ মনে হয় যে, প্রবল জ্ঞান স্পৃহা, নিরতিশয় উৎসাহ ও অনিবায্য অধ্যবসায় ব্যতীত আর সমস্তই ইঁহার শিক্ষার বিরোধী।''

ছাত্রজীবনে অক্ষয়কুমারের লেখাপড়ার অদম্য আগ্রহ মিটিয়েছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক হার্ডম্যান জেফ্রয়। স্কুলের পাশেই থাকতেন জেফ্রয় সাহেব। তাঁর কাছে স্কুলের সময়ের বাইরেও যেতেন অক্ষয়কুমার। ভাবতে অবাক লাগে, ওইটুকু বয়সে তিনি জেফ্রয় সাহেবের কাছে গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা শিখেছিলেন। ওই সময় পিয়ার্সন সাহেবের লেখা ভূগোল বইয়ের অনুবাদ তাঁর নজরে পড়ে। সেখানে পিয়ার্সন বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ কেমন করে তৈরি হয় লিখেছেন। অক্ষয়কুমার বুঝতে পারেন, ছোটবেলায় শোনা অবাস্তব কাহিনীর কোনও ভিত্তি নেই। প্রকৃত বিজ্ঞানবোধ তখন থেকেই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে।

অক্ষয়কুমারের প্রথম বই 'ভূগোল'। তার ভূমিকাটি তাই আমাদের কাছে জরুরি। দেখে নিই আমরা, কী লিখেছেন অক্ষয়কুমার এই বইয়ের ভূমিকায়:

''ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদযোগে স্থান ২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাকে ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ সৃষ্ট হয়না যে তদ্দারা বালকদিগকে সুচারু রূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভাবে এই মানস করিয়া চন্দ্র সুধালোভী উদ্বাহু বাসনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্লেশে ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালাকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।''

এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল পঁচাত্তর। জীবনীকার রাজকুমার চক্রবর্তী লিখেছিলেন, ''অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথম বাঙ্গালি ভাষায় ভূগোলের পরিভাষা প্রণয়ন করেন।''

তাঁর দ্বিতীয় রচনাটি একটি আট পৃষ্ঠার পুস্তিকা। ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতা থেকে কয়েকটি পংক্তি আমরা এখানে যোগ করছি।

''...হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশ: উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুত্রের বিদ্যা উপার্জন নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে যাঁহারা সহস্য টাকা অনায়াসে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো বিদ্যালয়ের সাহায্যর জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন।... ঐক্য সংস্থাপনের সম্ভাবনা দেখিয়ে আনন্দিত হইতেছি। ধনিদরিদ্র, বিদ্বান অজ্ঞ, বৃদ্ধ বালক, ব্রাহ্ম পৌত্তুলিক সকল প্রকার ভিন্ন বর্ণস্থ, ভিন্ন মতস্থ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি এ বিষয়ে একত্র হইয়াছেন। ...দেশের রাজনিয়ম যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, অন্যায় কর স্থাপন খণ্ডিত হয়, শান্তি রক্ষার সুশৃঙ্খলা হয়, বিচার কার্য সুসম্পন্ন হয়, কৃষিকার্যের বৃদ্ধি হয়, শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হয়, বাণিজ্যের বিস্তার হয়... প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষস্থ লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করিবেক এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশের নানা প্রকার শিল্প কার্যের উন্নতি করিবেক।''

অক্ষয়কুমারের বয়স তখন পঁচিশ পার হয়নি।

স্বদেশবাসীদের জন্য তাঁর স্বপ্ন আমাদের বিস্মিত করে। এমনকী ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের সুফল বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ডেভিড হেয়ারের কথা বলতে গিয়ে অক্ষয়কুমার বলেছেন, ''পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মানুষ তাঁহার পরিবার। ...তিনি আমার দিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ– কোটি গুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।''

যে কটি বই রচনার জন্য অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যজগতে চিরজীবী হয়ে থাকবেন, তার অন্যতম বইটির শিরোনাম 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মোট তিরিশটি কিস্তিতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির কথায় যাওয়ার আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিষয়ে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষক হিসাবে অক্ষয়কুমার তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন এই পাঠশালা হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন অক্ষয়কুমারকে সেখানে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার রাজি হননি। ফলে স্বাভাবিক কারণেই তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। এদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত একটি মুখপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা করছিলেন। যথাযোগ্য সম্পাদক নির্বাচন করতে হবে। সম্পাদক পদে যোগদানে আগ্রহীদের 'বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাঠাতে বলা হলো। তিরিশ টাকা মাস মাইনেতে অক্ষয়কুমার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হলেন। অক্ষয়কুমারের বৈশিষ্ট্য শুরুতেই মহর্ষির নজর কেড়েছিল। 'আত্মজীবনী'তে লিখলেন দেবেন্দ্রনাথ:

''তাঁহার রচনাতে গুণ ও দোষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর' আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজূটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদিত করিতে পারিব।''

১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ওই বছর ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ সহ একুশ জন ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন অক্ষয়কুমার। মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা তীব্র বিষোদ্গার করতে লাগল। এমনকী মিশনারিদের স্কুলে ছেলেদের পাঠাতে বারণ করল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মিশনারিরাও চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁদের পত্রপত্রিকায় সমালোচনা চলতে থাকল। বেদ-এর অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততার কথা লিখতে বললেন দেবেন্দ্রনাথ। অক্ষয়কুমার রাজি হলেন না। এই ভাবনাকে তিনি বিজ্ঞানবিরোধী মনে করলেন। অক্ষয়কুমার বললেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহলে কুসংস্কার ঠাঁই পাবে। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার বিরোধ চূড়ান্ত রূপ পেল, যখন অক্ষয়কুমার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষগণ রাজনারায়ণ বসুর একটি লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করতে রাজি হলেন না। ক্ষুব্ধ দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ''কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহার দিগের এ পদ, হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'' বাংলা সাময়িকপত্র গবেষক ও অধ্যাপক স্বপন বসু যথার্থই লিখেছেন:

''ধর্ম-বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের মতভেদ আসলে দুটি মানুষের জীবন দৃষ্টির ভিন্নতার মধ্যে নিহিত। মানসিকতার দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার ছিলেন সম্পূর্ণ দুই আলাদা মেরুর অধিবাসী। একদিক ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ– ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে যাঁর অটুট আস্থা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার যুক্তির নিরিখে যাচাই না করে কোনো কিছু মেনে নিতে যিনি অনিচ্ছুক। একদিকে বেদের অপৌরুষেয়তায় অটুট আস্থাসম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, অলৌকিকতা ইত্যাদিতে ঘোরতর অবিশ্বাসী অক্ষয়কুমার।''

অথচ এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে 'বিষয়বৈচিত্র, ভাষার মাধুর্য, চিন্তার গভীরতা সবদিক দিয়েই তত্ত্ববোধিনী চিন্তাশীল মানুষের' মন জয় করেছিল। আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম রূপকার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তত্ত্ববোধিনী বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি আমরা নিচে যোগ করছি।

''উক্ত পত্রিকা জনসাধারণের এত মনোরঞ্জন করিয়াছিল যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইত এবং কলেজের যে সকল উচ্চশিক্ষিত যুবক বাঙালী পুস্তক পড়িতেন না, তাঁহারাও অক্ষয়কুমারের লেখা বাহির হইলে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ', 'ধর্ম্মনীতি', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্পদায়' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলি সর্বপ্রথমে ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁহার ঐ সকল রচনা পাঠ করিবার জন্য গ্রাহকরা ব্যগ্রভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য, আমার শিশুজীবনের গতি এই পত্রিকার অমূল্য উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধাবলী পাঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।'' (বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা, প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছিলেন, বীজগণিতের সূত্র প্রয়োগ করে প্রার্থনার অনাবশ্যকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন অক্ষয়কুমার। সূত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

পরিশ্রম = শস্য

প্রার্থনা+ পরিশ্রম = শস্য

অতএব প্রার্থনা = শূন্য (০)

যা-ই হোক, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বইটির কথায় ফিরে যাই। এটি মৌলিক গ্রন্থ ছিল না। জর্জ কুম্ব নামে এক স্কটিশ আইনবিদের লেখা 'The Constitution of Man considered in relation to external objects' নামে একটি বই ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কুম্ব এককালে ফ্রেনোলজিরও চর্চা করেছেন। ফ্রেনোলজিকে এক সময়ে বিজ্ঞান মনে করা হতো। আজকাল আর মনে করা হয় না। মনে পড়ছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময়ে ফ্রেনোলজি চর্চা করতেন। জর্জ কুম্ব যখন বইটি লেখেন, ধর্মান্ধরা তাঁকে আক্রমণ করেন। 'নাস্তিক' ও 'বস্তুবাদী' বলে তাঁকে গালমন্দ করা হয়। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে বইটি লেখেন কুম্ব। বিজ্ঞান ঐতিহাসিক বিল

জেনকিন্স ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রিটিশ জার্নাল ফর দি হিস্ট্রি অব সায়েন্স’-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখেছেন:

“...before the publication of Darwin’s Origin of Species, the Constitution was probably the single most important vehicle for the dissemination of naturalistic progressivism in the english speaking word.(phrenology, heredity and progress in George Combe’s constitution of man)”

সত্যি বলতে কী, ‘নাস্তিক’ ও ‘বস্তুবাদী’ জর্জ কুম্বের বইটি অক্ষয়কুমারের নজরে এসেছিল। তিনি এই বইটি বাংলায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন। কিস্তির লেখাগুলি যখন দু’ভাগে (প্রথম ভাগ, ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫২) বই হয়ে বের হয়, ভূমিকায় অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন:

“ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে।”

বইটি মৌলিক গ্রন্থ না হলেও মৌলিক গ্রন্থেরই আদল পেয়েছে। পশ্চিমের দেশে বইটি প্রকাশের পর যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, তা অক্ষয়কুমারের নিশ্চয়ই অগোচরে ছিল না। তাই তিনি বইয়ের শুরুতে আরও লিখেছিলেন:

“... বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যদি ইহাকে কোন স্বমত বিপরীত ও দেশাচার বিরুদ্ধ অভিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তবে একেবারে, অশ্রদ্ধা না করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। ... এতদ্দেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শুনিলেই তাহাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিরুদ্ধ বাক্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হইলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে। তাহা পরিত্যাগ না করিলে কোনক্রমেই আমাদের মঙ্গল নাই। পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালক পূর্ব্বক জ্যোতিষাদি কয়েকটা বিদ্যা সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরকম যবনাদি অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্ব স্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-বলে ঐ সকল বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত জ্যোতিষাদিকে অতি সামান্য বোধ হয়।”

অক্ষয়কুমারের পরের বই ‘চারুপাঠ’। তিন ভাগে এই বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে শিশুশিক্ষার ইতিহাসে পাঠ্যবই হিসাবে ‘চারুপাঠ’ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। তিন ভাগ মিলিয়ে এই বইয়ে মোট ৭২টি রচনা ছিল। একটি বাদে সবকটি লেখা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ৭২টি রচনার মধ্যে চল্লিশটি ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা। আগামী দিনের নাগরিক হয়ে উঠবে যারা, তাদের তিনি বিজ্ঞানমনস্ক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

১৮৫২-র জুলাইয়ে ‘চারুপাঠ’ প্রথম ভাগ, ১৮৫৪-র জুলাইয়ে ‘চারুপাঠ’ দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৮৫৯-র জুলাইয়ে ‘চারুপাঠ’ তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ‘ভোম্বল সর্দার’ খ্যাত বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ‘চারুপাঠ’-এর কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন:

“এমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্য শিশু-সাহিত্যে তখন ও পরবর্তীকালেও রচিত হয়নি। বলা বাহুল্য, রচনার বিষয়বস্তু ইংরেজি গ্রন্থ থেকে সম্বলিত কিন্তু রচনাশৈলী অক্ষয়কুমারের নিজস্ব। ... এমন সর্বজনীন রচনা অক্ষয়কুমারের পূর্বে ও পরে আর দেখা যায় না।”

‘চারুপাঠ’ প্রথম ভাগ প্রকাশের সময় অক্ষয়কুমার লিখলেন, “এ সময়ে বালকদিগের পাঠোপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায় চারুপাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

প্রথম ভাগের সমাদর দেখে অক্ষয়কুমার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশে আগ্রহী হন। এমন বই প্রণয়নে কী তাঁর উদ্দেশ্য, স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন।

“এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালোবাসেন; বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অনুরক্ত নহেন। ... মনঃকল্পিত গল্পপাঠে কিছুমাত্র উপকার নাই, অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ... ভাষা-শিক্ষা-সহকারে প্রাকৃত পদার্থ ও প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করা যে বালকগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এক্ষণে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।”

অনেক দিন থেকেই অক্ষয়কুমারের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার সময়ে এক দিন তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর থেকে লিখতে বসলে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেন। শিরোরোগে (সম্ভবত মৃগীরোগ) শারীরিক ও মানসিকভাবে তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন। এমন যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি লেখার কাজ চালিয়ে যেতেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সম্পর্ক ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে অক্ষয়কুমারের নাম সরকারের কাছে সুপারিশ করেন বিদ্যাসাগর। সেই সুপারিশ গ্রাহ্য হয়। কলকাতার নর্মাল স্কুলে সে সময়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। অক্ষয়কুমারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না। বিদ্যাসাগর তা গ্রাহ্য করেননি। প্রকৃত শিক্ষিত এক জনকে উপযুক্ত পদে সুপারিশ করেছিলেন। দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন তখন অক্ষয়কুমার। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সেই চাকরি তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে অক্ষয়কুমার স্কুল থেকে পদত্যাগ করেন।

প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যে ‘চারুপাঠ’ তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। শুরুতে অক্ষয়কুমার লিখলেন:

“নূতন গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, আমার পূর্বলিখিত প্রস্তাব সমুদায় সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবারও সামর্থ্য নাই। কোন কোন পরমাত্মীয় ভদ্র ব্যক্তি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক চারুপাঠের তৃতীয় ভাগখানি মুদ্রিত করিয়া তুলিলেন, তাহাতেই ইহা মুদ্রিত হইয়া উঠিল।”

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের অনেক পাঠ্য বই জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও মিশনারির কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ সে সব

বই তাঁদের স্কুলে পাঠ্য করতে চাইতেন না। সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন রেভারেন্ড জন মার্ডক। এই মিশনারি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'খ্রিস্টান বার্নাকুলার সোসাইটি'র প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে এসেছিলেন। তিনি 'চারুপাঠ' পাঠ্য করতে রাজি নন। সোসাইটি থেকে নতুন বই ছাপলেন। নতুন সেই বই মিশনারি স্কুলে পাঠ্য হলেও 'চারুপাঠ' পড়ানো হতো। সত্যিকারের মাস্টারমশাইরা এই বইয়ের উৎকর্ষ অবজ্ঞা করবেন কেমন করে?

অক্ষয়কুমারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বইয়ের শিরোনাম 'ধর্ম্মনীতি'। বইয়ের নাম থেকে তাঁর লেখার বিষয় অনুমান করা যায় না। এই বই তাঁর শিক্ষা চিন্তা ও সমাজ চিন্তার বই। এর বেশি বলতে গেলে বলতে হয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়:

''ইনি প্রকাশ্যরূপে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের অবৈধতা, বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয় লোকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।''

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইয়ে অক্ষয়কুমার এমন কতগুলি বৈপ্লবিক উক্তি করেছেনড যা সমকালে দুর্লভ ছিল। তিনি বললেন, বাল্যবিবাহ মহাপাপ। কৌলিন্য ও বহু বিবাহের নিন্দায় তিনি মুখর। তিনি লিখলেন, ''কুৎসিৎ কৌলিন্য প্রথা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এতদ্দেশীয় শাস্ত্রমূলকও নহে।'' বিধবা বিবাহ বিষয়ে বললেন, ''বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ জগদীশ্বরের নিয়মানুগত নহে।'' বিস্মিত হতে হয় ভেবে, অক্ষয়কুমার বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। যা এই কালেও অনেকে ভাবতে পারেন না, তেমনই ভেবেছেন অক্ষয়কুমার। বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়ের কথাই শুধু বলেননি, উভয়ের মধ্যে 'প্রণয় সঞ্চারের দুঃসাহসিক প্রস্তাব' (সূত্র: স্বপন বসু) রেখেছেন। স্বামী-স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ''তাঁহাদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে।''

এই বইয়ে খুব স্পষ্টভাবে তিনি নারী শিক্ষার সপক্ষে সওয়াল করেন। অক্ষয়কুমার লিখেছেন, ''তাহারা যে নানাপ্রকার প্রগাঢ়তর কঠিন বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যার্থী পুরুষদিগের ন্যায় মানসিক পরিশ্রমকে সুখের বিষয় বোধ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অনুরক্ত হইবে পারে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।'' সাক্ষর মায়ের সন্তান কখনও নিরক্ষর হতে পারে না। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনকে অক্ষয়কুমার নারী শিক্ষা মনে করতেন না। এই বইয়ে তিনি লিখেছেন, মায়েদের ''পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানা জাতীয় পুরাবৃত্ত ও স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিষয়ে অধ্যয়ন করা বিধেয়।'' 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থের লেখাগুলি আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অক্ষয়কুমারের লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের নাম 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। এই বইয়ের প্রথম ভাগ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ও দ্বিতীয় ভাগ তার বারো বছর পরে প্রকাশিত হয়। বইয়ে আখ্যাপত্রে ইংরেজিতে লেখা ছিল, 'The Religious Sects of the Hindus'। কেউ কেউ বলেন, বিশিষ্ট ভারত তত্ত্ববিদ ও ঋগ্বেদের ইংরেজি অনুবাদক এইচ এইচ উইলসনের 'Sketch of the religious sects of the Hindus' গ্রন্থের অনুবাদ অক্ষয়কুমারের উপরিউল্লিখিত গ্রন্থ। এর কোনও ভিত্তি নেই। উইলসন লিখেছেন ৪৫টি সম্প্রদায়ের কথা। অক্ষয়কুমার বইয়ের দুই ভাগ মিলিয়ে মোট ১৮২টি সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২৪। দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১৪। বই দুটিতে 'উপক্রমণিকা' রয়েছে ১০৬ পৃষ্ঠা ও ২৮২ পৃষ্ঠা।

অক্ষয়কুমারের 'পদার্থবিদ্যা' তার নিজস্ব গুণেই অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই বই হিন্দি ও অসমিয়া ভাষাতেও অনুবাদ হয়। এর জনপ্রিয়তা দেখেই হয়তো অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রিধারী এক শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'পদার্থবিদ্যা' শিরোনামে ছাত্রদের জন্য একটি বই লেখেন। সে সময়ের বিখ্যাত সাময়িকী 'বঙ্গদর্শন'-এ বইটির একটি সমালোচনা বের হয়, যা এখানে উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না।

''মহেন্দ্রবাবু বিস্তর পড়িয়া শুনিয়া তাঁহার পুস্তকখানি ভাল করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে নিউটনের আকর্ষণ বিষয়ক নিয়ম বুঝিতে পারেন নাই ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

মহেন্দ্রবাবু যদি কোনও ইংরেজি পুস্তক না পড়িয়া কেবলমাত্র বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত পদার্থবিদ্যাখানি ভাল করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে বোধহয় এরূপ মহাভ্রমে পতিত হইতেন না। ... আকর্ষণ বিষয়ে মহেন্দ্রবাবু যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভুল।'' (বঙ্গ বৈজ্ঞানিক, বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)

একটা দীর্ঘ সময় অক্ষয়কুমার ভয়াবহ অসুস্থতার শিকার হয়েছিলেন। তার উপর সংসার জীবনেও তিনি সুখী ছিলেন না। তিন পুত্র ও দুই কন্যার পিতা ছিলেন তিনি। এঁদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রকুমার, হেমচন্দ্র, রজনীনাথ, রাজমোহিনী ও বিরাজমোহিনী। প্রথম দুই পুত্রের অকালমৃত্যু হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া ছিল ক্ষীণ। হাওড়া জেলার বালিতে তিনি জায়গা কিনে বাড়ি করেন। সে বাড়ির নাম তিনি দিয়েছিলেন 'শোভনোদ্যান'। বাড়িতে প্রচুর গাছ লাগিয়েছিলেন। একটি মিউজিয়াম গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বসার ঘরে যে পাঁচজন মনীষীর ছবি ছিল, তাঁরা হলেন নিউটন, ডারউইন, হাক্সলি, জন স্টুয়ার্ট মিল ও রাজা রামমোহন রায়। 'শোভনোদ্যান' বাড়িতে তিনি একা থাকতেন। পরিবারের কেউ থাকতেন না। একমাত্র সঙ্গী ছিলেন রামচন্দ্র রায়, যাকে সবাই শ্রীরাম পণ্ডিত নামে চিনতেন। মজা করে বন্ধু বিদ্যাসাগর 'শোভনোদ্যান'-এর নাম দিয়েছিলেন 'চারুপাঠ (চতুর্থ ভাগ)'। রবীন্দ্রনাথ এই মানুষটিকে 'স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তনকারী' বলে চিহ্নিত করেছেন। জনমনোরঞ্জন সাহিত্য রচনা করেননি অক্ষয়কুমার। কল্পনার জাল বোনেননি। তবু তাঁর গদ্য আমাদের আকর্ষণ করে। ভাবী নাগরিকদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় সহজ ভাষায় লিখেছেন। কুসংস্কারমুক্ত সমাজ চেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। সেই চাওয়া থেকেই তাঁর হাত দিয়ে একের পর এক নিবন্ধ বেরিয়েছে। এক কথায় বলতে পারা যায়, বিজ্ঞান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে প্রতিটি মুহূর্ত যিনি ব্যয় করেছেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁরও দুশো বছর অতিক্রান্ত হলো। আমরা কি আজও তাঁদের 'অবহেলিত' রাখব? তাহলে একটা বড় ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের। সেই ক্ষতির হাত থেকে আমরা নিস্তার পাব না।

জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর

এক আধুনিক মানুষ

কামরুজ্জামান

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

তাঁর প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার তিনি পৈতৃক পদবীও ব্যবহার করতেন না। তাঁর প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রাদিতে তাঁর স্বাক্ষর বলে যে নামটি দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো ঈশ্বরচন্দ্র 'শর্মা'। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষায় সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শাস্ত্রীয় পাঠ্যসূচি কৃতিত্বের সঙ্গে সুসম্পন্ন করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সংস্কৃত দক্ষতার জন্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' (১৮৩৫, মতান্তরে ১৮৪১) বলতেন শিক্ষকরা। তাঁর 'পণ্ডিত' ও 'বিদ্যাসাগর' দু'টি অলঙ্কারই লৌকিক, কোনও প্রাতিষ্ঠানিক নয়।

আমাদের জাতীয় জীবনে বিদ্যাসাগর এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, উনিশ শতকের নবজাগরণের পটভূমিতে তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রয়াসে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি (প্রেরণা)। বাঙালি সমাজে বিজ্ঞান নির্ভর মননের উৎকর্ষ ঘটাতে, ধর্মীয় ও বিকৃত সংস্কার দূর করতে, সুস্থ জীবনবোধ প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিরলস সংগ্রাম আমাদের প্রাণিত করে। বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তির আন্দোলনে তাঁর সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্প রূপায়ণের প্রয়াস একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নেও আমাদের কাছে অনির্বাণ প্রেরণা। হতদরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা অনুকরণীয়।

দুই

যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে লোকহিতের কথাই বিদ্যাসাগরের প্রধান ধ্যান ও জ্ঞান ছিল– শিক্ষা সংস্কারই হোক, সমাজ সংস্কারই হোক, নারীশিক্ষা

কিংবা নারীমুক্তি হোক। লোকহিতৈষিতা তাঁকে পাঠ্যপুস্তক রচনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। তিনি তত্ত্বমূলক ও দার্শনিক কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। যা রচনা করেছেন, তা প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই। বহুবিস্তৃত কর্মজীবন তাঁর দিনের অধিকাংশ সময়ই কেড়ে নিত– নইলে রাত জেগে তাঁকে 'সীতার বনবাস' লিখতে হতো না। তবে প্রতিভা এমনই জিনিস রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত', বিদ্যাসাগরের কি সংকলিত, কি অনূদিত, কি সম্পাদিত বা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার ছায়াপাত ঘটেছে। ১৮৮৫ সালের ৩১ মে বিদ্যাসাগরের উইলে তাঁর লেখা বাংলা ১৩টি বইয়ের উল্লেখ আছে– ১. বর্ণপরিচয়, দুই ভাগ (১৮৫৫), ২. কথামালা (১৮৫৬), ৩. বোধোদয় (১৮৫১), ৪. চরিতাবলী (১৮৫৬), আখ্যানমঞ্জরী, দুই ভাগ (১৮৬৩), ৬. বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৮), ৭. জীবনচরিত (১৮৪৯), ৮. বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), ৯. শকুন্তলা (১৮৫৪), ১০. সীতার বনবাস (১৮৬০), ১১. ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), ১২. মহাভারত (১৮৬০), ১৩. সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)। বইগুলো পাঠ করলে জানা যাবে, সময়ের প্রেক্ষিতে কত অগ্রসর ও ঋজু ছিল তাঁর গদ্য।

বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্য ছিল, কিন্তু সে গদ্য সুকুমার সেনের কথায়, 'চল ছিল চাল ছিল না'। তিনি বাংলা গদ্যকে সর্বজনীন আবেদনগ্রাহ্য রূপ দিয়ে সচল করেছিলেন। তাঁর আগে যে বাংলা গদ্য লেখা হয়েছিল, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে কেবলই পূর্ণচ্ছেদ। ইংরেজি গদ্যে বহুকাল আগে থেকেই 'কমা', 'ঊর্ধ্বকমা', 'কোলন', 'সেমিকোলন', 'ছেদ' ইত্যাদি বিভিন্ন যতিচিহ্নের প্রয়োগ হয়ে আসছে। বাংলা গদ্যের বিদ্যাসাগরই প্রথম বিরামচিহ্নের সর্বাত্মক এবং সুচিন্তিত প্রয়োগ ঘটালেন। 'শকুন্তলা' থেকে ছোট একটি উদাহরণ– 'সে দিবায়, আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, রাজা, একাকী, একমৃগের অনুসরণক্রমে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যবশত; শকুন্তলা নাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষা করিয়াছেন'। পাঠক লক্ষ্য করবেন, একটি বাক্য– সাতটি কমা। আসলে কাজের গদ্যকে তিনি ভাবের গদ্যে উন্নীত করেছিলেন। এর জন্য অনেকেই বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলে থাকেন।

পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও যে বিরাট প্রতিভার প্রয়োজন, তা বোঝা যায় 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়লে। 'বর্ণপরিচয়' রচনার পেছনের একটি ঘটনা– বিদ্যাসাগরের সুহৃদ প্যারীচরণ সরকারের বাড়িতে এক মজলিসে স্থির হয় প্যারীচরণ ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক বই লিখবেন আর বিদ্যাসাগর বাংলা শিক্ষার প্রাথমিক বই লিখবেন। ১৮৫৪ সালে প্যারীচরণ সরকার 'First Book of Readings' এবং 'Second Book of Readings' রচনা করেন। আর বিদ্যাসাগরও বাংলা শিক্ষার বই লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। এক বছর পরেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ১৮৫৫ সালের ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত হলো 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ। ঠিক দু'মাস পরেই অর্থাৎ ১৪ জুন প্রকাশিত হলো 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ। 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ প্রথম সংস্করণ ২৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংস্করণও ২৪ পৃষ্ঠা। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় 'প্রথম ভাগ' ২৪ পৃষ্ঠা থেকে হয়েছে ৩৮ পৃষ্ঠা। ১৫২টি সংস্করণ হয়েছে। মোট মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার। আর 'দ্বিতীয় ভাগ' ২৪ পৃষ্ঠা থেকে হয়েছে ৪৩ পৃষ্ঠা। ১৪০টি সংস্করণ হয়েছে। মোট মুদ্রণ সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার। প্রতিটি সংস্করণ তিনি নিজেই পরিমার্জন করেছিলেন। 'বর্ণপরিচয়' তুল্য বই তাঁর সময়ে ছিলই না এবং এখনও নেই।

রবীন্দ্রনাথ নিজের বাল্যকালের কথা লিখতে গিয়ে 'বর্ণপরিচয়' বইয়ের প্রভাব তাঁর মনের উপর কীভাবে পড়েছিল, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তা লিখেছেন– ''কেবল মনে পড়ে, জল পড়ে, পাতা নড়ে। তখন কর, খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, জল পড়ে, পাতা নড়ে। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এতো প্রয়োজন কেন। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।'' বিদ্যাসাগরের রচনাতেই রয়েছে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ ও দর্শন। 'গোপাল' ও 'রাখালের দ্বন্দ্বে নীতি-অনীতির, সু-কু'র পরিচয়ে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে কেবলমাত্র শিশুমন– ''গোপাল বড় সুবোধ। ... গোপালকে যে দেখে সেই ভালোবাসে, সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।'' অন্যদিকে 'রাখাল'– ''রাখালকে কেহ ভালোবাসে না। কোনও বালকেরই, রাখালের মত হওয়া উচিত নয়।'' এভাবে বালকচিত্ত প্রেরণা ও নীতি শিক্ষার আলো পেয়ে নিজেকে গঠন করে নিতে পারে।

'আখ্যানমঞ্জরী' সম্পর্কে পৃথকভাবে কিছু বলার দরকার রয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রণীত পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে 'আখ্যানমঞ্জরী' উপেক্ষিত, অথচ এই গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল শ্রেণিচেতনা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩) তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডে ২৩টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৪টি, তৃতীয় খণ্ডে ২১টি– মোট ৬৮টি কাহিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইউরোপীয় উৎস থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন। বিদ্যাসাগর জানাচ্ছেন– ''এগুলি পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইংরেজি পুস্তকের অবলম্বন পূর্বক সঙ্কলিত হইল।'' গল্পগুলো কিন্তু নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয়নি। কাহিনীগুলোর মধ্যে মানবিক গুণের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীগুলো প্রধানত উপদেশাত্মক– পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পরোপকার, আতিথেয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, বদান্যতা প্রভৃতি বিষয় হলেও তারই মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল চেতনা ধরা পড়ে।

১৮৫১–৫৮, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। মূলত সংস্কৃত কলেজ থেকেই বিদ্যাসাগরের সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে তিনি জড়িয়ে গেলেন অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক কাজে– বেথুন স্কুল, বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহের আন্দোলন। ৩৮ বছর বয়সে সরকারি চাকরি ছাড়ার পরাক্রম দেখিয়ে শুধু বই লিখে সংসার চালিয়েছেন। চাকরি করেননি। অন্য কোনও ব্যবসা করেননি। পোশাক-আশাকে বিলাসিতা নেই।

তিন

মধুসূদন বলেছিলেন– ''তাঁর (বিদ্যাসাগরের) মধ্যে ছিল একাধারে প্রাচীন ঋষির মনীষা ও প্রজ্ঞা, ইংরেজের প্রাণশক্তি এবং বাঙালি মায়ের হৃদয়।'' তাই যত দিন না সমাজের শেষ কন্যাসন্তান স্কুলে যাচ্ছে ও স্কুল পাঠ শেষ করে বেরিয়ে আসছে, যত দিন না সমাজে নারীদের আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তত দিন তিনিই আমাদের প্রেরণা। নারী শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন। ডিরোজিও

ছিলেন উত্তরাধিকারী। কিন্তু বিদ্যাসাগরই নারীশিক্ষাকে বাস্তবের রূপ দিয়েছেন, গতি দিয়েছেন– আজকের নারীশিক্ষার স্থপতি বিদ্যাসাগরই।

বিদ্যাসাগরের জন্মের আগেই মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়েছিল বঙ্গভূমিতে। করেছিলেন মিশনারিরা। ১৮১৭-১৮ থেকে শুরু করে ১৮৩০ সালের মধ্যে দু'-তিনটি মিশনারি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০টি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু সেই স্কুলগুলো ১৮৩০ সালের মধ্যে অধিকাংশই উঠে যায়। তার কারণ ছিল বহুবিধ। প্রথমত, খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাঁদের মেয়েদের পাঠাতেন না। এই বর্ণভেদ ব্যাপারটা সাহেব-মেমদের কাছে খুব পরিষ্কার ছিল না বলে তাঁরাও তথাকথিত নিম্নবর্ণের এবং সব ধর্মের মেয়েদেরই স্কুলে প্রবেশাধিকার দিতেন। দ্বিতীয়ত, এইরকম এক পরিস্থিতিতে দরিদ্র পরিবারের মেয়েরাই মূলত মিশনারি স্কুলে যেত। প্রধান আকর্ষণ ছিল মিশনারিদের প্রদত্ত পোশাক এবং খাবার। তৃতীয়ত, স্কুলে যাওয়া ব্যাপারটির কোনও আলাদা গুরুত্ব ছিল না বলে তারা যখন-তখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিত। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় বালিকা মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত প্রায়শই। চতুর্থত, মিশনারিদের পক্ষে ধর্ম প্রচার করার যত প্রবল ইচ্ছা ছিল, পড়ানোর ব্যাপারে ততটা ছিল না।

১৮৪৯ সালের ৭ মে ডিঙ্ক ওয়াটার বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামে বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক সম্পাদকের পদে বিদ্যাসাগর যোগ দেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৮৫৭ সালের ৩০ মে বর্ধমান জেলার জৌ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যাসাগর। ৪-১১ বছর বয়সের ২৮ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু। বিদ্যাসাগর অমানুষিক পরিশ্রম করে ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫ মে সময়কালে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় special inspector of schools হিসাবে ৩৫টি (হুগলী জেলায় ২০, বর্ধমান জেলায় ১১, মেদিনীপুর জেলায় ৩, নদীয়া জেলায় ১) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর জন্য প্রতি মাসে ব্যয় হতো ৮৪৫ টাকা। ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০।

বিদ্যাসাগর যখন মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখলেন অন্য দিক থেকে। তিনি ছেলেদের এবং মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম চালু করতে উৎসাহিত হলেন না। খুবই ব্যতিক্রমী ভাবনা। কারণ, তখনকার বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন, ছেলেদের এবং মেয়েদের একই পাঠ্যসূচি থাকা অযৌক্তিক। মেয়েদের আলাদা করে শিখতে হবে সেলাই, রোগীর সেবা ইত্যাদি। তাদের অঙ্ক-বিজ্ঞান পড়ানোর কোনও দরকার নেই।

বিদ্যাসাগরের আরও একটি যুগ-ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পৃথকভাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত না করা। বিদ্যাসাগর যখন শিশুপাঠ্য 'বর্ণপরিচয়' লিখলেন, তখন সেখানেও 'ঈশ্বর প্রসঙ্গ' ছিল না। তা নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু বিদ্যাসাগর টলেননি। শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান শিক্ষা হলো ধর্মবাদী থেকে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা। শিক্ষা থেকে যে চেতনা জাগবে, সেখানে থাকা দরকার সকলের চিন্তাকে সম্মান করার বিবেচনা এবং সঠিক মাত্রাজ্ঞান। ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের বিরূপতা ছিল না, কিন্তু পক্ষপাতও ছিল না। শিক্ষা অর্জন করার জন্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই– এ ভাবনাকে সে যুগে বিপ্লবই বলা যায়।

চার

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগরের মৌলিক ও সমাজ-সমস্যামূলক অনন্য কীর্তি– ১) বাল্যবিবাহ, ২) বিধবা বিবাহ প্রচলন, ৩) বহু বিবাহ রোধ। সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সেই সময়ের সংবাদপত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার ১৮৫০ বঙ্গাব্দের (১৭২২ শকাব্দ) ভাদ্র (প্রথম) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'বাল্যবিবাহের দোষ'। লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু এটি যে বিদ্যাসাগরের রচনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। 'বাল্যবিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক লেখা। 'অপরিণত আধারে পরিণত শিশুর বিকাশ সম্ভব নয়'– এই গূঢ় সত্য নিয়মটিকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, এমনকী মাতৃ-স্বাস্থ্য বিষয়ক বর্তমান সময়ের ধ্যান-ধারণার অনেক আগেই বিদ্যাসাগর ভেবে নিতে পেরেছিলেন মাতৃ-স্বাস্থ্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাটি। ১৮৫৫ সালের ২৪ জানুয়ারি 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা– এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব' পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হওয়ার পরই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়। পরের সংখ্যাতেই সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বিধবাবিবাহের প্রস্তাব সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের ২৪ অক্টোবর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা– এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় আবার এক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয় বিধবাবিবাহের সমর্থনে।

১৮৫৫ সালের ৪ অক্টোবর বিধবা পুনর্বিবাহ আইন তৈরি করার জন্য ৯৮৬ জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়। তবে এই আইন প্রবর্তনের বিপক্ষে ছিলেন ৩৬৭৬৩ জন।

এদিকে বিধবা বিবাহ বিষয়ক দু'টি পুস্তক প্রকাশের পর সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাদ-প্রতিবাদে ভরে ওঠে সমস্ত দেশ। যুক্তি-তর্ক-সভা। সেই সঙ্গে কুৎসা। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিদ্যাভূষণ, ন্যায়রত্ন আর তর্কারত্নের দল। কিন্তু একটির পর একটি প্রসঙ্গ তুলে বিদ্যাসাগর প্রতিকূল যাবতীয় তর্ক-কুৎসা-সমালোচনার যথোপযুক্ত জবাব দিয়ে তাঁর অভিমত প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত, প্রতিবাদী যুক্তি অগ্রাহ্য করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, বৃহৎ পরাশর সংহিতা মতে বিধবা বিবাহের বিধি কল্পনা, প্রতারণা বা নিষেধাজ্ঞা মাত্র নয়। পরাশর সংহিতা কেবল কালধর্ম নির্ণায়ক, অন্য যুগের ধর্মনির্ণায়ক নয়। কারও মত ছিল, বিধবা বিবাহের চল হলে ধর্ম লোপ পাবে। প্রত্যুত্তরে অবজ্ঞা প্রকাশ করে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জানো।" এইভাবে শাস্ত্র, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান প্রয়োগ করে তিনি বিধবা বিবাহের ন্যায্যতা প্রমাণে তন্নিষ্ঠ ছিলেন। ক্ষোভের সঙ্গে দেশাচারের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছিলেন– "হায়, কি আক্ষেপের বিষয়, দেশাচার এ দেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ। ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা।"

এরপরই দেশের দুঃখিনী নারীদের সম্বোধন করে বিদ্যাসাগরের সেই মর্মান্তিক আবেদন, যা ধর্মশাস্ত্রের বচন অতিক্রম করে সমাজ-বিবেকের কাছে মুখর হয়ে উঠেছে সকরুণ মানবিক আর্তিতে– "হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ।... তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে

অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপু বশীভূত হইয়া ব্যাভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যায় সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহে।... হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নোই, সদ-সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজিত জন্মগ্রহণ না করে।''

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মালিক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেও পত্রিকার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবা বিবাহ প্রচারে বেশি আগ্রহ দেখানোয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মানুষজন বিরক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তীব্র মতান্তর দেখা দেয়। শুধু দেবেন্দ্রনাথ নয়, বঙ্কিমচন্দ্রও বিরোধিতায় ছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঈশ্বর গুপ্তও (যিনি বিধবা বিবাহের জন্য আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী) বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলনের দাবিপত্রের শুনানির দিন দু'পক্ষই হাজির। গ্রান্ট সাহেব বিরোধীপক্ষের বাদ-প্রতিবাদ নস্যাৎ করে বিদ্যাসাগর পক্ষীয়দের অনুকূলে শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু বিধবা বিবাহ' (Marriage of Hindu Widows) আইনসিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে গ্রান্ট সাহেবের অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর আইনসভায় প্রথম পঠিত হয় Marriage of Hindu Widows-এর পাণ্ডুলিপি। ১৮৫৬ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রেরিত পাণ্ডুলিপির রিপোর্ট দ্বিতীয়বার সিলেক্ট কমিটি দাখিল করে ৩১ মে। ১৯ জুলাই তৃতীয়বার আলোচিত হওয়ার পর ২৬ জুলাই গৃহীত হয়ে যায় 'বিধবা বিবাহ আইন'– ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন (Act XV of 1856)। এই আইন বলে স্বীকৃত হয়ে বিধবার পুনর্বিবাহ।

১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর দেশের প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয় কলকাতায়। পাত্র– প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র ও সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতিমান ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন; পাত্রী– পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছর (মতান্তরে বারো) বয়স্ক কন্যা কালীমতী দেবী। বিবাহ অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২, সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে। ৮০০ জন গণমান্য ব্যক্তি এবং সংস্কৃতের পণ্ডিতবর্গ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর এই একটি বিবাহের জন্য নিজের তহবিল থেকে সেই সময়ে প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন।

তিনি ১২৬৩ সনের ২৫ অগ্রহায়ণ ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি গ্রামনিবাসী কুলীন কায়স্থ কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতা ঠনঠনিয়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র মিত্রের বালবিধবা কন্যা থাকমণি দাসীর বিয়ে দেন। ওই বছরেরই ১১ ফাল্গুন ২৪ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রাম নিবাসী মধুসূদন বসুর পুত্র দুর্গানারায়ণ বসুর সঙ্গে ২৪ পরগনা জেলার ভবানীপুর নিবাসী রামসুন্দর ঘোষের বালবিধবা কন্যা গোবিন্দমণি দাসীর বিয়ে হয় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে। ২৬ ফাল্গুন ২৪ পরগনা জেলার বোড়াল নিবাসী কুলীন কায়স্থ রাজনারায়ণ বসুর মধ্যম সহোদর মদনমোহন বসুর সঙ্গে ২৪ পরগনা জেলার সুখচর নিবাসী হরিশচন্দ্র বিশ্বাসের বালবিধবা কন্যা নৃত্যকালী দাসীর বিয়ে দেন তিনি।

এই সময়ে কলকাতার অনতিদূরে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং সারা দেশে দাবানলের মতো সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কারণে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বিধবা বিবাহের সমর্থকরা প্রায় এক বছর তাঁদের এই কার্যকলাপ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন অনেকটা নিরুপায় হয়েই। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সামাজিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে আবার কয়েকটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১২৬৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে নদীয়া জেলার টগপুর নিবাসী, সংস্কৃত কলেজে পড়া, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং হুগলী জেলার চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী কেরাগেড়ে গ্রামের বিধবা কন্যা লক্ষ্মীমণি দেবীর বিয়ে সম্পন্ন হয়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাস' গ্রন্থের 'স্বাধীনাবস্থা' অধ্যায়ে আরও জানা যায়, কলকাতায় বিধবা বিবাহ কার্য সমাপনের পরই ১২৬৫ সনের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, ঘোলা, শ্রীনগর, কালিকাপুর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে ২৫জনেরও বেশি বিধবার বিয়ে সম্পন্ন করেন তিনি। এমনকী ১২৭০-৭৫ সালে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা

মহকুমার অন্তর্গত রায়ধী, বাছুয়া, লেদাগমা, কোশেডাল, রসকুণ্ডু, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে ৩০ জনেরও বেশি কায়স্থ বিধবার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সারা জীবনে বিদ্যাসাগর প্রায় ৬০ জন বিধবার বিয়ে দিতে ৮৭ হাজার টাকা নিজেই খরচ করেছিলেন। ৩৫০০০ টাকা তাঁকে ঋণও নিতে হয়েছিল এর জন্য, প্রতি বছর ৫০০০ টাকা সুদও শোধ করেছেন।

১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২১) এবং খানাকুল-কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী দেবীর (১৪) মধ্যে বিয়ে সম্পন্ন করান। সেই বিয়ে হয়েছিল মির্জাপুর নিবাসী ডেপুটি কালেক্টর কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে। এই বিয়ে নিয়েও পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরকে বিয়ের প্রসঙ্গে যে পত্র লিখলেন, তার প্রত্যুত্তর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত্র' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। সেই পত্র থেকে জানা যাচ্ছে, শম্ভুচন্দ্রই বিদ্যাসাগরকে পত্রে জানিয়েছিলেন, এই বিবাহদান ঘটলে কুটুম্ব বিচ্ছেদ ঘটবে। এই সংবাদে বিদ্যাসাগর ১২৭৭ সনের ৩১ শ্রাবণ সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে লেখেন– "আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরান্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।"

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ নামক কুপ্রথা নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রীয় বিধানের সহায়তা চেয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সেই সময়ে বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য স্বয়ং তিনি ভারত সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের আবেদন করেন। ১৮৫৫ সালে ২৭ ডিসেম্বর বর্ধমানরাজ মহাপ্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়, রাজা সত্যনারায়ণ রায় প্রমুখ ২৫ জন কৃতবিদ্যাব্যক্তি ও অন্যান্য লোকের স্বাক্ষর সহ আবেদনপত্র দাখিল করেন তিনি।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের বাড়িতে ১৮৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' নামে স্থাপিত সভার (সভার সভাপতি: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সম্পাদক: কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত) পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৫৫ সালের গোড়ায় বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য সর্বপ্রথম একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়। প্রধানত এই সভা থেকেই সরকারি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু চিরাচরিত নিয়মেই তথাকথিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেমন উঠেছিল, তেমনই সরকারের কাছে বেশ কিছু পালটা আবেদনও জমা পড়েছিল, মূলত রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে। বিদ্যাসাগর লিখছেন–"বর্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, নাটোর, দিঘাপতি প্রভৃতি স্থানের রাজারা ও দেশস্থ প্রায় যাবতীয় প্রধান লোকে, বহুবিবাহ-নিবারণ প্রার্থনায়, ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদনপত্র প্রদান করেন।" ইতিমধ্যে গোল বাধে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনায়। ফলে বাধ্য হয়েই ইংরেজ সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল।

১৮৫৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বহুবিবাহ প্রথা বাতিলের দাবিতে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়বার সরকারের কাছে আবেদন করেন। এবার বিদ্যাসাগরের সহযোগী কৃষ্ণনগরের মহারাজ সতীশচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের সত্যশরণ ঘোষাল, কাঁথির প্রতাপচরণ সিং। বর্ধমানের মহারাজ মহাপ্রতাপচাঁদও ২১ হাজার স্বাক্ষর সংবলিত আবেদন পাঠান বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে। বস্তুত এই সব আবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন বাংলার গভর্নর সিসিল বিডন বহুবিবাহ রদের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ বিষয়ে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বিল আনার নিমিত্তে ভারত সরকারের কাছে আবেদনও জানানো হয়। বলা বাহুল্য, সে অনুমতি না আসায় আন্দোলন আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর কিছু পরে উত্তরপাড়ায় এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিদ্যাসাগর বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকেন।

এই দীর্ঘ অবসর সময়ে বিদ্যাসাগর লিখলেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিবয়ক বিচার'। প্রথম পুস্তক, ৮ আগস্ট ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনা প্রকাশ পায় প্রথম লেখায়। বিদ্যাসাগরের কথায়– "কুলীন ভগিনী ও কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়।... প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্বর্তী দীর্ঘকাল উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্যনির্বাহ করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। তাঁহারা সর্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে বোধহয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।...উত্তর সাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেককানেক বয়স্ক কুলীন মহিলা ও কুলীন দুহিতা যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনা বৃত্তি অবলম্বন করেন। ফলত কুলীন মহিলা ও কুলীন তনয়াদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই।... তাঁহাদের যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং যেহেতু তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্য জাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মে।"

'বহুবিবাহ রচিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'-এর প্রথম খণ্ড পুস্তক প্রকাশের পরপরই ৫ জন (মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশালের রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, বারাণসীর সত্যব্রত সামশ্রয়ী, তারানাথ তর্কবাচস্পতি) সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মতের বিরোধিতা করে পাঁচটি পুস্তক লিখেছিলেন। বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়, শাস্ত্র অনুমোদিত– এই ছিল পাঁচটি পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্বভাবত এ হেন বিতর্ক ও সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশিত হয় ২ এপ্রিল, ১৮৭৩ সালে। এভাবেই সমাজ সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেলেও নিজের আধুনিক মননের ভাবনা ও তার প্রয়োগে সর্বদাই অনড় থেকেছেন বিদ্যাসাগর।

প্রশ্নের লোককথা

কুমার রাণা

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

গল্প বললে গল্প, সত্যি বললে সত্যি। এক গেরস্ত পৃথিবীর যত প্রশ্ন আছে সেগুলোকে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। প্রশ্ন বড় উতপেতে জিনিস, এটা কেন, ওটা কেন নয়, ওটা কীভাবে হবে, এটা কীভাবে না-হবে, এই সব সাত-সতেরো হ্যাঙ্গাম। এতে গেরস্তের খুব ঝামিলি। লোকে হুকুম না মেনে প্রশ্ন করে। তাতে তার সব কিছুতে ঘাটা, গোলায় ধান, বাথানে দুধ, পুকুরে মাছ, সব কমে যায়। গেরস্ত নানা পাঁয়তারা কষে দেখল, সব চেয়ে কাজের জিনিস হচ্ছে এইটে: মারধোর না, আটক করা না, পিছন পিছন কাজ কর কাজ কর বলে তাড়া দিয়ে বেড়ানো না, স্রেফ মাথা থেকে প্রশ্নগুলোকে নির্মূল করে দাও। ব্যস, কেল্লা ফতে। অতএব, প্রশ্নগুলোর বাইরে বেরোবার হুকুম নেই, এমনকি উঠোনে, দাওয়ায়, রান্নাঘরে, কলতলায়, কোত্থাও তাদের যাওয়ার হুকুম নেই। তাই তার ঘরে, সূর্য কেন ওঠে, কেন বা ডুবে যায়, চাঁদ কেন বড়-ছোট হয়, বৃষ্টি কেন হয়, রোদে কেন গরম লাগে, এমন সাধারণ প্রশ্নও কেউ করতে পারে না। এমন প্রশ্ন করতে দিলে লোকে যে আরো অনেক, আরো বড়, আর জটিল প্রশ্ন করবে। এমন প্রশ্ন যাতে নাকি সব বিলি-বন্দোবস্ত উল্টে যাবে। এক্কেবারে পাল্টে যাবে। যেমন, কেন তাদের জীবন অর্ধেক পথে এসে থেমে যায়? আর গেরস্ত কীভাবে তাদেরই খাটনির ওপর বসে ডবল জীবনের আশীর্বাদ লুট করে নেয়? প্রশ্নগুলো খিটকেল, গেরস্তের শরীর-স্বাস্থ্য-মালিকানার জন্য ভাল না। তাই প্রশ্ন নামক প্রজাতিটাকেই সে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। এমনকি সে ঘুমিয়ে থাকতেও প্রশ্নগুলোর বেরোবার সুবিধে ছিল না, ফাটকে দমদার পাহারা।

কিন্তু, না বেরোলে তাদের চলবে কেন? ঘরের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের দমবন্ধ হয়ে যাবে না? ঘুরে না বেড়ালে, এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে সেখান না গেলে পরে তাদের শরীর খারাপ হবে না? বাইরে না বেরোলে তাদের সঙ্গী জুটবে কীভাবে? সঙ্গী না জুটলে তাদের বংশবৃদ্ধি হবে কীভাবে? তাই তারা বেরিয়ে পড়ত। বেরোবার জন্য অপেক্ষা করতে হত, গেরস্তর ঘুমটা বেশ একটু পাকা হওয়া পর্যন্ত। সে ঘুমোলেও শান্তি নেই, দুয়ারে তার কুকুর জেগে– কারো বেরোবার, ঢুকবার, এমনকি আশেপাশে ঘোরাঘুরি করার আভাস পেলেই হাউ হাউ করে উঠত। বোঝাই যাচ্ছে, তাদের বেরোনো মানে বড় ঝকমারি। তার মধ্যেই তারা গেরস্তকে ফাঁকি দিয়ে, কুকুরকে ফাঁকি দিয়ে, পা টিপে টিপে বেরোত, বেরিয়ে দে দৌড়। দৌড়োতে দৌড়োতে হাজির হত এক্কেবারে ফাঁকা এক মাঠে। সেখানেই তাদের মেলা। একে অন্যের সঙ্গে কথা করা। একে অন্যের সঙ্গে বার্তা করা। তারপর, রাত্রি তিনপ্রহর হলে গেরস্তের ঘরে ফেরা। তা কেউ বলতেই পারে, ওরা না ফিরলেই তো পারত। এক্কেবারে পগার পার হয়ে গেলেই তো পারত। কী দরকার তাদের গেরস্তর ঘরে বাঁধা-মুনিশ হয়ে থাকার? কথাটা এই, আটক থাকাটা তাদের সাধের জিনিস তো ছিল না, কিন্তু না থাকাটাও তাদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। গেরস্তদের দেশে এমন সব নিয়ম, কোনো কোনো গেরস্ত যেমন তেমন করে সব হুকুমগুলোকে তার পোষা কুকুর বানিয়ে রাখে। গেরস্ত ইশারা করলে হাউ হাউ করে, কামড়ায়, আবার গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে।

তা, প্রশ্নকে কয়েদ করে রেখে গেরস্তর সংসার চলে, কিন্তু জগৎসংসার চলে না। তাই প্রশ্নদের বাইরে বেরোতে হয়, সবাই না, দুই-এক জন, কিম্বা দুই-চার জন। তা তারা যাত্রা দিত সেই মাঠ থেকে বাইরের জগৎ পানে। তাদের যে বংশবৃদ্ধি করতে হবে। নইলে গেরস্তের ঘরে কয়েদ থেকে থেকে তাদের প্রজাতিটাই যে

লোপ পেয়ে যাবে। আর প্রশ্ন লোপ পেলে মানুষের আর থাকলটা কী?

লোকে বলে, জাঁক থাকলে ফাঁকও থাকে। যত আটক দাও ফাটক দাও ফাঁক ঠিক বেরিয়ে যায়। গেরস্ত বাড়িতে সেই ফাঁক ছিল নিশুত রাত। তখন সব অচেত, গেরস্ত অচেত, তার কুকুর অচেত, তার দরজা, জানালা, তালা, হুড়কো, সব অচেত। সেই ফাঁকে প্রশ্নগুলো দেয় ছুট। ছুটতে ছুটতে রোববারের হাটের মাঠে, সেখানে তাদের দৈনিক কনফারেন্স। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, বাজার চড়া হোক কি পড়া হোক, তাদের আসা চাই। সম্মেলন হতেই হবে, সেখানে খবর লেনাদেনা হবে, তর্কাতর্কি হবে, যুক্তি-বাক্যি হবে, আবার নতুন করে প্রশ্ন হবে, তারপর আবার গেরস্ত বাড়িতে ফেরা। না ফিরলে মুস্কিল, গেরস্ত তাদের কাঁটার লতায় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। প্রশ্নরা স্বাধীনতার দূত, অথচ তাদের এই একটা অধীনতা ছিল। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম, যা থাকে তার উল্টোটাও থাকে। আর তাদের মধ্যে সমানে টানা চলে, পড়েন চলে। এমনিভাবেই পৃথিবী আর তার বাসিন্দা মানুষ এগোয়। এগোনোর নিয়ম, কানুন, কৌশল– সব ঠিক করে দেয় প্রশ্ন। প্রশ্ন যত ধারালো, এগোনোর গতি তত দ্রুত।

যাই হোক, রোজ নিশুত রাতের সাক্ষাতে তারা নানা কথা বলে। বলতে বলতে যেগুলো বেশ মোটা তাগড়া, চোখে পড়ে, মনে পোড়ে, সেই সেই ক'টা প্রশ্ন বাইরে থেকে যায়, বাকিরা আবার ঢুকে যায়। তা এক রাতে যখন সভা বসতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই তারা দেখতে পেল, মাঠ পেরিয়ে, মাঠের পর বিল পেরিয়ে, বিলের পর ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে বাজারের এক কোণায় একদল ছেলে, একদল মেয়ে, কয়েকজন বুড়ো, কয়েকজন বুড়ি, বাসন ধুচ্ছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে, কালকের জ্বালানি জোগাড় দিচ্ছে, পরিষ্কার করছে, তরি-তরকারি সাজিয়ে রাখছে, চালের বস্তা, ডালের বস্তা, তেলের টিন, বঁটি-খুন্তি-হাতা রাখছে হাতের কাছে। আর তারা কাজ করে চলেছে তো চলেইছে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

প্রশ্নরা বুঝল এটাই প্রশ্ন। না, নিশুত রাতে হেঁশেল গোছানো কেন, এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না, আসল জিনিস হচ্ছে, এই যারা এখানে আয়োজন করছে, এরাই এক একটা প্রশ্ন। চেহারা বলছে, এরা কোনোদিন গতরে খাটেনি, কোনোকালে মাথায় আলুর বস্তা, চালের-ডালের বস্তা বয়নি, মাটি কাটেনি, পাথর ভাঙেনি। এরা কোনোকালে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের আহার জোগাড় করেনি। তাহলে হঠাৎ কী ব্যত্যয় পড়ল যে, এই এরা, যাদের বলা হয় বাবু, যারা ইস্কুলে কলেজে পড়েছে, যারা লিখে, গেয়ে, নাট করে, পড়িয়ে, বসে থেকে, হুকুম নিয়ে, হুকুম দিয়ে তোফা থাকে, তাদের ঘরের ছেলেরা মেয়েরা গতর খেটে খাওয়া লোকেদের মতো গতরের কাজে লেগে গেল?

প্রশ্নেরা জানে, কোন প্রশ্ন থেকে বেরিয়ে আসে একশ'টা প্রশ্ন, আর কোন প্রশ্নের ভিতরে বীজ নেই। তা সেই মতো জেনে, সেই রাতে একটা প্রশ্ন থেকে গেল বাইরে, হাওয়ায় সওয়ার হয়ে চলল নিশুত রাতে গড়ে তোলা হেঁশেলঘরে। পৌঁছোনোমাত্র সে আর একা রইল না– হয়ে গেল অনেক প্রশ্ন। এক একটা উত্তর আসে, আর সেখান থেকে জন্মায় আরো একটা প্রশ্ন। সে মেলা কথা, অত বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে দিন শেষ হয়ে যাবে। মোট কথা এই, দেশে রোগ-অসুখ-বন্যা-দুর্বিপাকে হাজার হাজার গতরে খাটা মানুষের কাজ যায়, তাদের দিন-আনি-দিন-খাই হেঁশেলে আগুন জ্বলে না, আর তাই দেখে, তাদের ঘরে না-জ্বলা আগুনে পুড়ে এই ছেলেরা মেয়েরা তাদের জন্য খাবার জোগাড় করতে লেগেছে। নিজেরা বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে, দোরে দোরে চেয়ে চিন্তে জোগাড় করেছে রসদ। সরকার বড়লোকদের বাঁচাতে হিমশিম, খেটে খাওয়া লোকে মরল না বাঁচল তা দিয়ে তার কিছু আসে যায় না। দেশে এমনই নিয়ম, এমনই ইতিহাস চলে। যখনই দুর্ভিক্ষ আসে, মানুষ সর্বনাশের মুখে পড়ে, সরকার না, সরকারি বড় গেরস্ত না, পাশে এসে জোটে এমনই কিছু মানুষ, যাদের না জুটলেও চলে।

তারা কেন জোটে? মেলা লোক, তাই মেলা জবাব। মোটা কথায়, একদল জোটে, মানুষের দুর্দশা চোখে দেখতে না পেরে, তার দুর্গতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। আহারে, লোকগুলোর কী দুর্ভোগ, বেচারিরা খেতে পাচ্ছে না, এইসব দুঃখে তারা কিছুদিন মেতে থাকে, তারপর যে যার ঘরে ফিরে যায়। তারা সমাজের উপকারী প্রাণী, তাদের মূল্য কম নয়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাদের নিয়ে প্রশ্নের এগোবার অবকাশ খুব একটা নেই, কারণ উত্তরটা সহজ– যতটুকু পারি করব, কিন্তু, নিজের ভালটাও বুঝতে হবে, কারণ যারা মরছে তারা ওরা, আর ওরা আমরা নই। আবার তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকে যারা হয়তো সারা জীবন মানুষের সেবায় নিজেদের লাগিয়ে দেয়, তারা নিজের ভালও বুঝতে জানে না, বুঝতে শেখেনি, কিন্তু তাদের নিয়েও প্রশ্নের এগোবার সুযোগ তেমন নেই– তারা যা করছে, সেটা করতে গিয়ে তাদের কোনো টানা নেই, পড়েন নেই। তারা মনে করে, এ তো হবারই কথা। তাদের বিশ্বাস, এ-সব মানুষের ভাগ্য, পূর্বজন্মের কর্মফল। তারা যে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, সেটা একান্তই করুণার বশে।

প্রশ্নের কারবার তৃতীয় দলটাকে নিয়ে। এরা মানুষের দুর্দিনে খাবার দিয়ে, ওষুধ দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে পাশে তো দাঁড়ায়ই, সব থেকে বেশি করে দাঁড়ায়। মানুষের যে-কোনো দুর্বিপাকে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেয়, চরম কষ্ট স্বীকার করে, ত্যাগ স্বীকার করে, এই দলটাই। কিন্তু, তার সঙ্গে তারা আরো কিছু করে। সেই করাটাকে এদের কেউ বলে সংগঠন, কেউ বলে রাজনীতি। করুণা নয়, তাদের কাজের তাগিদ হচ্ছে তাদের মর্যাদাবোধ। মানুষ বলেই মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাদের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক।

সেজন্যই এদের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রশ্ন শুধু বাড়তে থাকে তাই নয়, সেগুলো একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে। কারণ এদের এই বোধটা আসে প্রশ্ন থেকে। এরা প্রশ্ন ভালবাসে, প্রশ্ন ছাড়া এদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই সব কিছু নিয়ে, পৃথিবীর যাবৎ ব্যাপারে, এরা প্রশ্ন করে, প্রশ্ন থেকে উত্তরে, আবার উত্তর থেকে প্রশ্নে পৌঁছোয়। অনেকেই এটা আয়ত্ত করতে পারে, আবার অনেকে পারে না। যারা পারে তারা সংগঠনও করে, মানুষের সেবাও করে। আর যারা পারে না তারা ফিরে যায়। এই যেমন এই হেঁশেলে যারা এসেছিল তাদের সবাই কি আছে? কেউ আছে, কেউ ফিরে গেছে। তাদের সবাই যে না পেরে ফিরে গেছে তা হয়তো নয়, কেউ কেউ প্রশ্নের জবাব না পেয়েও ফিরেছে। আবার কেউ ফিরেছে ওই প্রথম দলটার মতো। কিন্তু প্রশ্ন জাগতেই থাকে। যেমন এই হেঁশেলেই কত প্রশ্ন:– কদ্দিন চালানো হবে? কেন চালানো হবে? সরকার কেন ত্রাণ দেবে না? সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন সংগঠিত করা হবে না?

– নিশ্চয় করা হবে। করা দরকার। কিন্তু ত্রাণের কাজটাও কি সংগঠনের একটা রূপ নয়? ১৯৪৩ সালে কি ত্রাণের ভিতর দিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা হয়নি?

– ঠিক। কিন্তু, আবার ১৯৫৯'এ, ১৯৬৬'তে তো আলাদা ব্যাপার। তখন তো জোরদার আন্দোলন হল?

– তা ঠিক। কিন্তু, মানুষের এরকম দুর্গতির মুখে ত্রাণের ব্যবস্থা না করলে মানুষ মারা যাবে। আমরা কি সেটা হতে দিতে পারি?

– না পারি না। কিন্তু, ত্রাণসহ এবং ত্রাণ ব্যতিরেকে আন্দোলনের রূপ কী হবে? ১৯৪৩-এ যেভাবে হয়েছিল, বা ১৯৬৬-তে, আজ কি সেটা সম্ভব?

– না, তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। কিন্তু, নতুন করে ভাবতে গিয়ে আমরা কি পুরনো সব কিছু ভুলে যাব? আমরা কি ভুলে যাব যে আমরা যা করছি তার মধ্যে বৃহত্তর নৈতিকতা যেমন আছে তেমনি আছে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর পক্ষপাত? সেটাই কি আমাদের নৈতিকতা নয়? এবং আমরা যে সংগঠন গড়ে তুলছি সেটাও কি তাই নয়?

– তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু, তাহলে আমরা সংগঠন কীভাবে করব? আমরা কি শুধু শ্রমজীবীদের কাছেই সমর্থন চাইব? অন্যদের প্রতি আমাদের পক্ষপাত নেই বলে তাদের সমর্থন চাইব না?

– মোটেই তা না। আমরা শ্রমজীবীদের পক্ষে বলেই সব মানুষের পক্ষে। যারা শ্রমজীবীদের বিপক্ষে তারা সব মানুষের বিপক্ষে। এখন সমস্যা, কীভাবে আমরা এই ধাঁধাটা খোলসা করে বুঝব?

– আরো এক প্রশ্ন। ভোটের রাজনীতির। আমরা কি মানুষকে বলব যে, দুর্ভোগের সময় আমরা পাশে আছি, কিন্তু আমরা আপনাদের ভোট চাই না?

– মোটেই আমরা সে কথা বলতে পারি না। ত্রাণের কাজ যদি নাও করি, তার দরকার যদি নাও থাকে তাহলেও কি আমরা মানুষের কাছে তাঁদের ভোট চাইব না? কিন্তু সেটা তো এই জন্যই চাইব যে, আমরা শুধু মানুষের প্রতিনিধি নই, আমরাই সাধারণ মানুষ। আমাদের ভোট দেওয়া মানে নিজেদের ভোট দেওয়া, শাসক নির্বাচিত করা নয়। আর তা-ই যদি আমাদের বার্তা হয় তাহলে আমরা কি একথা বলতে পারি যে, আমরা আপনাদের ত্রাণ দিচ্ছি, আপনাদের বিপদে পাশে দাঁড়াচ্ছি, তাই আমাদের ভোট দিন?

– হ্যাঁ, ওটা তো নিজের কথা নিজে কাটা হবে। কিন্তু, সেখানে সমস্যা হল, কীভাবে আমরা একই সঙ্গে দুটো ভূমিকা পালন করব? মানে, একই সঙ্গে মানুষের আন্দোলন-সংগঠনে নেতার ভূমিকাও পালন করব, আবার সাধারণ মানুষ হয়েও থাকব? মানুষের নেতা মানে অগ্রবর্তী মানুষ, আর সাধারণ মানুষ মানে যার কোনো নেতৃত্বকে অনুসরণ করবার দরকার আছে– এরকম একটা জটিল সমস্যার সমাধান কি আদৌ আছে?

প্রশ্ন:– এইভাবে জটিল থেকে জটিলতর রূপ নিতে থাকে। এবারে এ দলের মধ্যেও এমন লোক থাকে যে কিনা মানুষের ভাল চায়, কিন্তু প্রশ্ন শুনতে চায় না। তার মধ্যে গেরস্ত লোকটার একটা অংশ বাসা বেঁধে থাকে। সে মনে করে সে যেহেতু মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করছে মানুষের উচিত বিনা বাক্যব্যয়ে তার কথা শুনে চলা।

– আমি তো নিজের স্বার্থ বাগাইনি। যা ছিল সব বিলিয়ে দিয়েছি। যা করছি সবই মানুষের ভালো-র জন্য।

– ঠিক কথা। বাচ্চাদের মা-বাপও তাই বলে থাকে। যা করছে তাদের ভালোর জন্য করছে। বাচ্চারা যেমন বাচ্চা নয়, তারাও মানুষ, তেমনি সাধারণ লোকেও একেবারে অযোগ্য অক্ষম নয়, নিজের পথ নিজে খোঁজার যোগ্যতা তারও আছে। তাদের কথা না শুনে কি আমরা এগোতে পারব?

– কিন্তু, তারা তো ভুল করবে, ভুল বলবে, তারা তো জানে না– কোনটা ভাল, আর কোনটা মন্দ?

– নিশ্চয় তারা ভুল করবে, ভুল বলবে, আমরাও কি নিশ্চয় করে বলতে পারি– আমরা ভুল করব না, ভুল বলব না?

– তাহলে ভুল শোধরানো হবে কীভাবে?

– তারা যদি ভুলও করে, ভুলও বলে, তাহলেও আমাদের তাদের কথা শুনতে হবে, আমাদের কথা বলতে হবে। আমরা যদি তাদের কথা না শুনি, তাহলে ওরা আমাদের

কথা শুনবে কেন? আর এই বলা-শোনা যদি জীবন্ত হয়ে না থাকে তাহলে কোনোদিনই কি হেঁয়ালিগুলোর সমাধান পাব?

আবার এক দল আছে, যারা এত প্রশ্নের ধার ধারে না। ''অত কথা বলে কী হবে? কাজ করে যাও, কাজটাই আসল। তর্ক করে সময় নষ্ট'', তারা বলে। ''কিন্তু, তর্ক না করে আমরা ঠিক পথটা পাব কীভাবে?'' অন্যেরা প্রশ্ন তোলে।

এইভাবে প্রশ্নের পথ ধরে নতুন প্রশ্ন হাজির হয়। প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্ন, উত্তর নিয়ে প্রশ্ন। এই করতে হেঁশেলে আগুন দেওয়ার সময় হয়। ছেলে-মেয়েগুলো কাজে লেগে পড়ে। বুড়ো-বুড়িগুলোও হাত লাগায়। প্রশ্ন থেকে জন্ম নেওয়া প্রশ্নগুলো হেঁশেলের আগুন হয়ে জ্বলে। আগুন থেকে ছেলেমেয়েগুলো নতুন প্রশ্ন তুলে আনে। আগুনের রং-এ রাঙা ঝকঝকে প্রশ্ন: কীভাবে আমরা ওরা হতে পারি, ওরা আমরা হতে পারে? অর্থাৎ, কীভাবে আজ যে লোক নিজেরই চামড়া বিক্রি করতে বাজারে দাঁড়িয়ে থাকে, যার কোনো প্রত্যাশাই অবশিষ্ট নেই, যা আছে সে কেবল সেই চামড়ার ডুগডুগি তৈরি হতে দেখা, সেই লোকই নিজের গতরের, নিজের ঘাম আর মনের মালিক হয়ে উঠতে পারবে? তার যখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে, আজ একটা কাজ, কাল অন্যটা। সে সকালে শিকার করবে, দুপুরে মাছ ধরবে, সন্ধ্যায় গরু চরাবে, আর রাতে খাবার পর সাহিত্য সমালোচনা করবে?

গেরস্তের ঘরে প্রশ্নগুলো ছটফট করছে। কেবল নিশুত রাতের স্বাধীনতায় তাদের চলবে কেন? তাদের চাই অখণ্ড, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা। গেরস্তের কয়েদ থেকে তাদের মুক্তির শর্ত হল, প্রতিটি দেহ আর প্রতিটি মাথা কীভাবে সমান তালে কাজ করবে, এই প্রশ্নটাকে বারংবার জ্বলন্ত আগুন থেকে তুলে আনা। আগুন থেকে কিছু তুলতে আনতে গেলে অনেক কিছুই সে আগুনে জ্বালিয়েও দিতে হয়। গেরস্তের ঘরও।

মহামারী, লকডাউন ও জামলোর মৃত্যু

জয়তী ঘোষ

বয়স তখন ওর মাত্র বারো। যে বয়সে স্কুলে যাওয়ার কথা, গত ফেব্রুয়ারিতে সেই বয়সে ছত্তিশগড়ের কিশোরী জামলো মাকদামকে পরিবারের দারিদ্রের সঙ্গে যুঝতে ঘর ছেড়ে তেলেঙ্গানায় চলে যেতে হয়েছিল লঙ্কা খেতে কাজ করে দু' পয়সা রোজগার করার জন্য। মজুরি ছিল দিনে দু'শো টাকার মতো। কিন্তু মার্চের ২৩ তারিখ সকালে আচমকাই সারা দেশের আরও আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে জামলোও জানতে পারে, তার এখন কাজ করার আর সুযোগ নেই। আগের সন্ধ্যাতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে গোটা দেশে ঘোষণা করে দিয়েছেন লকডাউন। থামিয়ে দিয়েছেন সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্ম, বন্ধ করে দিয়েছেন সমস্ত যানবাহন এবং এমনকী পায়ে হেঁটে চলাচলও। শুধু লকডাউন নয়, একে বলা উচিত দানবীয় লকডাউন। ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত কমবেশি ৪৫ কোটি মানুষের জীবিকাকে এক লহমায় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেই সন্ধ্যায়। তাঁদের না ছিল কোনও আইনি সুরক্ষা, না ছিল কোনও সামাজিক সুরক্ষা।

সেই সন্ধ্যার পর থেকে জামলো প্রথম কয়েক দিন হাতে থাকা সামান্য আয় দিয়ে খিদে সামলেছে। একটা সময়ে তাও শেষ। রাষ্ট্র বা সরকার না দিয়েছে খাবার, না দিয়েছে খাবার কেনার জন্য নগদ অর্থ। জামলো ও তার বন্ধুদের তখন একরকম অনাহারে দিন কাটছে বলা যায়। মরিয়া হয়ে জামলোরা ফিরতে চায় ঘরে, যানবাহন নেই বলে শুরু করে হাঁটতে। তিন দিনে পেরিয়ে যায় দেড়শো কিলোমিটারের বেশি রাস্তা। দিন হাঁটা, রাতে হাঁটা। পেটে নেই তেমন খাবার। জলও মেলেনি অনেক সময়ে। দেহ অবসন্ন। তবু জামলোরা হাঁটতে থাকে মাঠ-ময়দান, বন-জঙ্গল দিয়ে, বড় রাস্তা বা জাতীয় সড়ক এড়িয়ে। পাছে ওরা পুলিশের চোখে পড়ে যায় আর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে সফল করতে নিষ্ঠাবান পুলিশবাহিনী রাস্তায় বেরনোর 'অপরাধ'-এ তাদের ধরে ফেলে ও শাস্তি দেয়, পাছে ঘরে ফেরাই আর হয় না। সত্যিই শেষ পর্যন্ত এক মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়ে ঘরে ফেরা হয়নি জামলোর। এপ্রিলের ১৮ তারিখে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ায় ও পেটে খাবারের অভাবে রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়ে জামলো, থেমে যায় তার প্রাণস্পন্দন। তখন তার নিজের ঘর ছিল আর মাত্র কয়েক ঘন্টার রাস্তা।

জামলো একটি মাত্র নাম। আরও কত জামলোর কাহিনী চাপা পড়েছে লকডাউনের যাঁতাকলে। মার্চ মাসে ভারতে প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন করোনা মহামারী সামলাতে। কিন্তু এই মহামারী নয়,

এ দেশে সমাজের বিভিন্ন অংশের উপর সব থেকে বেশি ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের সরকারের ভূমিকার ধরন। মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে বিশ্বে কঠোরতম লকডাউন ঘোষণা করে এই সরকার দেশের অর্থনীতিকে একদিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আরেকদিকে কোটি কোটি দেশবাসীকে ঠেলে দিয়েছে দারিদ্র ও অনাহারের বৃত্তে। কিন্তু আটকাতে পারেনি করোনার সংক্রমণকে। তার উপর লকডাউনের পর্ব পেরিয়ে দেশে চালু করা হয়েছে আনলক পর্ব। এই নিবন্ধ যখন লিখছি, তখন সেপ্টেম্বরের শুরু। দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ লক্ষের কাছাকাছি, মৃত্যু আশি হাজার পেরিয়েছে, দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা লক্ষ ছুঁইছুঁই। বিমান পরিবহণ চালু রেখে ভারতে এই রোগকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। এ দেশে এই রোগ নিয়ে এসেছেন বিদেশ থেকে বিমানে আসা ব্যক্তিরা, যাঁরা মূলত বিত্তশালীদের পর্যায়ে পড়েন। কিন্তু এই রোগের প্রাদুর্ভাবে রুটি-রুজি হারিয়ে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষকে।

বাস্তবে এই মহামারী মোকাবিলায় কেন্দ্রের সরকারের পরপর পদক্ষেপ তাঁদের জীবনে নামিয়ে এনেছে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র কার্যত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আগস্টের শেষে সরকারি তথ্যই জানিয়েছে, এই বছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) কমেছে ২৩.৯ শতাংশ। এই হ্রাসের হার একই সময়ে বিশ্বে সব দেশের মধ্যে সর্বাধিক। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন, আরও কয়েক কোটির বেতন ছাঁটাই হয়েছে। অকৃষিকাজে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে কাজ বলে কিছু নেই। জীবনধারণে প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকরা। প্রশ্ন হলো, করোনার সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারা ও গভীর খাদে অর্থনীতির পতনকে আটকাতে না পারার এই যৌথ ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কী। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরকারের পাঁচটি নীতিগত ভূমিকাকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

প্রথমত, বিশ্বের অনেক দেশেই এই মহামারী প্রতিরোধে চীনের উহানের মতো কঠোর লকডাউন বলবৎ করা হয়েছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে এবং 'সামাজিক দূরত্ব'-র (আরও সঠিকভাবে বললে শারীরিক দূরত্ব) বিধি আরোপ করা হয়েছে। ভারতেও বর্তমান সরকার আরও কঠোর বিধিনিষেধ চাপিয়ে একই পথে হেঁটেছে, তাও মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, তা করার ক্ষেত্রে এই সরকার ভারতের নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং দেশের বেশিরভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণেই সরকারের এই কৌশল কার্যকরী তো হয়েইনি, উলটে ক্ষতিকারক হয়েছে। ভারতের প্রায় ৯৫ শতাংশ শ্রমজীবীই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। তাঁদের না আছে কোনও আইনি সুরক্ষা, না সামাজিক নিরাপত্তা। এঁদেরও প্রায় অর্ধেক আবার স্বনিযুক্ত। লকডাউনের আশু প্রতিক্রিয়ায় এমন সবাই মজুরি ও আয় হারিয়েছেন আচমকা, এঁদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারটিও না থাকার মতো। আসলে তাঁদের দিন আনি দিন খাই জীবনের যৎসামান্য আচ্ছাদনটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং গ্রামাঞ্চলের অন্তত এক-চতুর্থাংশ অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকায় বাস করেন। একটাই মাত্র ঘরে পাঁচ জন বা তারও বেশি মানুষ থাকেন মাথা গুঁজে। তাঁদের লকডাউনে ওই একচিলতে ঘরে থাকতে বলা অযৌক্তিক, অমানবিক, অর্থহীন। ঘিঞ্জি এলাকার জীবনে দীর্ঘ দিন ধরে দূরত্ব-বিধি মেনে চলা যায় না, যায়ওনি। জলের, তাও আবার পরিশ্রুত জলের জোগানই সীমিত। তাঁদের ঘন ঘন হাত ধুতে বলা হয়েছে, সেও আবার সাবান দিয়ে। সেই সাবানই বা আসবে কোথা থেকে, সরকারি স্তরে ভাবা হয়নি। আর গরিব মানুষ খিদে মেটানোর ব্যবস্থা করবেন, না সাবানের! ফলে একদিকে সংক্রমণ, আরেকদিকে অর্থনৈতিক ধাক্কা গরিব ও নিম্নবিত্তের জীবন-যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে বহু গুন।

দ্বিতীয়ত, এই মহামারীর সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়েছে দ্রুত গতিতে। ২০০৫ সালের বিপর্যয় মোকাবিলা আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সারা দেশে লকডাউন বলবৎ করা হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষকে দেশে চালু অন্য যে কোনও আইনকে মুলতুবি রাখার এবং যে কোনও কর্তৃপক্ষের জন্য বিভিন্ন নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে। আইন অনুযায়ী সবাই সেই সব নির্দেশ মানতেও বাধ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই অতিরিক্ত ক্ষমতাকে রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করেনি। বরং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা না করে অনেক সময়ে তাদের উপর নানা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে। তার সব থেকে বড় উদাহরণ তো গোটা দেশে লকডাউন। রাজ্যগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে কথাই বলা হয়নি। ফলে তারা লকডাউনের জন্য প্রস্তুতির কোনও সময়ই পায়নি। আন্তঃরাজ্য ট্রেন ও বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারগুলিকে আগাম কিছু না জানিয়ে, অথচ আটকে পড়া মানুষদের বা যাত্রীদের দায় নিতে হয়েছে রাজ্য সরকারগুলিকেই। আবার ৩১ মে জাতীয় পর্যায়ে লকডাউন শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই কেন্দ্রীয় সরকার নিজের সিদ্ধান্তে বিমান চলাচলের অনুমতি দিয়ে দেয়। তাতেও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বেশ কিছু রাজ্য সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় বিমান অবতরণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এর সঙ্গে কোষাগারীয় কেন্দ্রীভবন আরও খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ও অর্থনীতিতে লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতে রাজ্য সরকারগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায় নিতে হয়েছে, কিন্তু তাদের হাতে নগদ অর্থ ছিল না বললেই চলে। এমন নজিরবিহীন পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে বাড়তি সম্পদ বলে কিছুই কার্যত দেয়নি। উলটে তাদের ঋণ নেওয়ার সক্ষমতার উপরে নানা শর্ত আরোপ করা হয়েছে। পরিণতিতে তারা খরচ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। করোনা মহামারী ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় সামলানোর প্রশ্নে তাদের কার্যকারিতাও কমেছে।

তৃতীয়ত, ভারতে যখন খুবই নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় করোনার সংক্রমণ সীমাবদ্ধ ছিল এবং আক্রান্তের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ কম, সেই সময়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে সারা দেশে লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি জরুরি পরিষেবা বাদে সমস্ত পরিবহণ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমন মহামারীর মোকাবিলায় একেবারে চূড়ান্ত যে অস্ত্রটি প্রয়োগ করা যায়, সেটিকেই প্রথম ব্যবহার করা

হয়েছে। কিন্তু তারপরেও ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে কী কৌশল নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে কোনও ভাবনাচিন্তা করা হয়নি। পরিণতি কী হয়েছে? অর্থনীতি ও জীবিকার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবের কারণে এই আগ্রাসী লকডাউন যখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন করোনার প্রাদুর্ভাব এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকার বাধ্য হয়েছে একের পর এক বিধিনিষেধ তুলে নিতে। অথচ এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পদক্ষেপ সেই সময়ে আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আবার সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রশ্নে সরকারের টালবাহানা সমাজের দুর্বল অংশের মানুষ, বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকদের বড় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে। সরকার এই পরিযায়ীদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করেনি, বাধ্য করেছে কাজের জায়গায় থেকে যেতে। অথচ তাঁদের আয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লকডাউন চাপিয়ে দিয়ে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই এই পরিযায়ীরা সামান্য সঞ্চয়ের সমস্ত অর্থ খরচ করে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন, একটা সময়ে হয়ে পড়েছেন দিশাহারা। শেষে খিদের যন্ত্রণায় ঘরে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে তাঁরা কাতারে কাতারে সংখ্যায় সুদীর্ঘ পথ স্রেফ পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যেতে চেয়েছেন। লকডাউন ঘোষণার এক মাস পরে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, তাঁদের ৯৬ শতাংশই সরকারের কাছ থেকে রেশনের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী বা নগদ অর্থ কিছুই পাননি। আর প্রায় ৯০ শতাংশেরই লকডাউনের ওই এক মাসে মজুরি মেলেনি (এসডব্লিউএএন রিপোর্ট, ২০২০)। এক মাস পরে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃরাজ্য বাস চলাচলের অনুমতি দিয়েছে পরিযায়ীদের জন্য। তাঁদের ঘরে ফেরার জন্য ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করতে আরও সময় নিয়েছে কেন্দ্র। আবার সেই সবের ভাড়া গুনতে বলা হয়েছে পরিযায়ীদের, যাঁরা তত দিনে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছেন। আমরা কী দেখলাম? একদিকে অজস্র পরিযায়ী শ্রমিক মাথায়-কাঁধে মালপত্র চাপিয়ে হেঁটে চলেছেন শয়ে শয়ে কিলোমিটার। কেউ একা, কেউ পরিবার নিয়ে। আরেকদিকে বাসে বা ট্রেনে কোনওভাবে পা রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিড় করেছেন বাসস্ট্যান্ডে বা রেলস্টেশনে। এভাবে তাঁদের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের শিকার হওয়ার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, ভাইরাসকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা কখনই লকডাউনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। লকডাউনের মাধ্যমে মহামারীর ভাইরাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও হওয়া যায় না। এর আসল লক্ষ্য হলো হাতে সময়ের ব্যবস্থা করা। যেহেতু লকডাউন ভাইরাসের সংক্রমণের পথে বাধা তৈরি করে, তাই এই পর্বে সরকার কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পায়, যাতে লকডাউন তুলে নেওয়া হলে আরও কার্যকরীভাবে মহামারীর মোকাবিলা করা যায়। যেমন, জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্য বাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সেই বাহিনীর যথাযথ ব্যবহার, ভাইরাসের পরীক্ষার পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও সুযোগ বৃদ্ধি, সংক্রমিতদের চিহ্নিত করার ও কোয়ারান্টিনে রাখার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে শয্যা, আইসিইউ, ভেন্টিলেটর, অন্যান্য যন্ত্র ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই বা ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক সহ চিকিৎসার প্রধান সরঞ্জামগুলির সুনিশ্চয়তা। বাস্তবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ব্যবস্থা নিয়েছে। এমনকী কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির কাজকে কঠিন করে দিয়েছে কেন্দ্র। জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের জন্য অতি সীমিত পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে (সিবিজিএ, ২০২০ অনুযায়ী জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.০৪ শতাংশেরও কম)। তারও অর্ধেক রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সেও খেয়ালখুশি মতো। কেরালার মতো গুটি কয়েক রাজ্য বাদে বাকি কেউ সংক্রমণ কমাতে পরীক্ষার মাধ্যমে সংক্রমিতদের চিহ্নিত করা, তারপর রোগীদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা ও তাঁদের কোয়ারান্টিনে পাঠানোর জন্য লকডাউন পর্বকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করেনি। বিপুল জনসংখ্যা অনুসারে পরীক্ষার

হার বাড়ানো হয়নি। সেপ্টেম্বরের শুরুতেও প্রতি দশ লক্ষে দশ হাজার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুসংগঠিতভাবে পিপিই'র ব্যবস্থাও করা হয়নি স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য। হাসপাতালের শয্যা, ভেন্টিলেটরের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় কমই রয়েছে। পাশাপাশি সরকারের মাথায় করোনা বা কোভিড-১৯ ছাড়া কিছু না থাকায় স্বাস্থ্যে তার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব দেখা গিয়েছে, বিশেষত অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে। যেমন, বহু যক্ষ্মা রোগী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাননি। লকডাউনের জেরে বড় বিঘ্ন ঘটেছে শিশুদের টিকাকরণে। অবহেলিত হয়েছেন ক্যান্সারের রোগীরা। যাঁদের ডায়ালিসিস দরকার, তাঁরা করাতে পারেননি। বিশাল সংখ্যক রোগীর গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এও দেখা গিয়েছে যে, লকডাউন পর্বে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় বা চিকিৎসা কেন্দ্রে ৪০ শতাংশ কম শিশুর জন্ম হয়েছে।

পঞ্চমত, লকডাউনে মজুরিভিত্তিক আয় ব্যাপক হ্রাস পেলেও এবং স্বনিযুক্ত জীবনযাত্রার তীব্র অবনমন ঘটলেও সরকারি ত্রাণ মিলেছে যৎসামান্য। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চলতি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোতেই দ্রুত বেশ কিছু নীতিগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গাফিলতি দেখিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। লকডাউন ঘোষণার পরে প্রথম ত্রাণ প্রস্তাবে এমন বেশ কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়, যেগুলির জন্য আগেই সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছিল। সঙ্গে জিডিপি'র মাত্র ০.৫ শতাংশের মতো অতিরিক্ত খরচের কথা বলে কেন্দ্র। লকডাউনের ছ' সপ্তাহে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরেকটি প্যাকেজ বা প্রস্তাব ঘোষণা করেন, তাতে জিডিপি'র ১০ শতাংশের সমান অর্থ বরাদ্দের কথা বলেন। কিন্তু শেষে দেখা যায়, নতুন প্যাকেজের বেশিরভাগই ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প, যার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে অতিরিক্ত ব্যয়ের দরকারই পড়বে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগী ও ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার ব্যবস্থা করেছে ঋণ বন্টনের। কিন্তু তাঁদের ঋণ নেওয়ার মতো সক্ষমতা আছে কি না, তা ভেবেই দেখা হয়নি। যাঁদের ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সরকার আগেই তো অবিবেচকের মতো লকডাউন ঘোষণা করে তাঁদের আর্থিক ভিত্তিকে দুমড়ে দিয়েছে ও ঋণ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মতো মানসিক জোরের কোমর ভেঙে দিয়েছে। দরকার ছিল তাঁদের হাতে অনুদান তুলে দেওয়ার, কিন্তু নয়া-উদার অর্থনৈতিক নীতির আদর্শে বিশ্বাসী কেন্দ্রের সরকার কর্পোরেটের জন্য উদার হস্ত হতে পারলেও গরিব-নিম্নবিত্তের জন্য হাত কীভাবে উপুড় করে! সেই সঙ্গে রেশন বা গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ করে সমস্ত গরিব-নিম্নবিত্তের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতেও সরকার দেরি করেছে, যে দেরির কোনও ব্যাখ্যা নেই। অথচ লকডাউন ঘোষণার আগেই এফসিআই'র ভাণ্ডারে (তার মানে সরকারি ভাণ্ডারে) সাত কোটি সত্তর লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী মজুত ছিল, যা প্রয়োজনীয় মজুতের তিন গুনেরও বেশি। বাস্তবে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের আওতায়ও গরিব-নিম্নবিত্তের সবাই নেই। তাঁদের যে অংশ ওই আইনের আওতায় আছেন, তাঁরা এই পর্বে বিনামূল্যে বাড়তি কিছু খাদ্যসামগ্রী পেয়েছেন, তাও সীমিত পরিমাণে। লকডাউন ঘোষণার এক মাস পরে পৌঁছেও কেন্দ্রের সরকার ওই বিপুল পরিমাণ মজুত খাদ্যসামগ্রীর মাত্র ২২ লক্ষ টন রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশেরই কার্যত বিপর্যস্ত অবস্থা এই লকডাউন ও মহামারীর পরিণতিতে। এমন প্রতিটি পরিবারকে মাসে দশ কেজি খাদ্যসামগ্রী রেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে দেওয়ার দাবি উঠেছে বারবার। অনায়াসে তা দেওয়া সম্ভব হলেও কেন্দ্রের সরকার এই দাবিকে উপেক্ষাই করে যাচ্ছে।

এই নিবন্ধ লেখার সময়ে সর্বশেষ সরকারি তথ্য জানিয়েছে, দেশের জিডিপি সঙ্কুচিত হয়েছে ২৩.৯ শতাংশ। সর্বকালীন নজির তো বটেই, বিশ্বে সব দেশের মধ্যে সর্বাধিক অবনমন। দেশের অর্থনীতি যে ধসে পড়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্যই এই মহামারী মোকাবিলায় নীতিগত ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সরকারের অপরিকল্পিত ও দায়সারা ভূমিকা এর জন্য দায়ী। যে কোনও অর্থনীতির দু'টি মৌলিক হাতিয়ার হলো চাহিদা ও জোগান। সরকারের অবিমৃশ্যকারিতায় দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চাহিদা প্রকাশের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ, লকডাউন তাঁদের আয়ের উৎসগুলিকেই বন্ধ্যা জমিতে পরিণত করেছে। হাতে নগদ অর্থ তুলে দিয়ে ওই অংশের মানুষের মধ্যে চাহিদা প্রকাশের সক্ষমতা তৈরি করা আশু দরকার। তাহলে সেই চাহিদা প্রতিফলিত হবে বাজারে, যা পূরণ করার জন্য দরকার হবে জোগানের। সেই জোগান নিশ্চিত করতে উৎপাদনে গতি আসবে, তীব্র মন্দায় অবরুদ্ধ অর্থনীতির চাকায় ধাক্কা লাগবে সেই গতির। তবে এই সবের কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না কেন্দ্রের সরকারের পদক্ষেপে। গরিব-নিম্নবিত্ত প্রত্যেক মানুষকে মাসে অন্তত সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়ার দাবি উঠলেও সরকার এখনও তাতে কর্ণপাত করার দরকার আছে বলে মনে করেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বাড়াতেও সরকার আগ্রহী নয়। সম্ভবত সরকার ভাবছে, সরকারি ব্যয় বাড়ালে বাড়বে কোষাগারীয় ঘাটতি এবং তাতে সরকারের উপর 'বিনিয়োগকারীদের আস্থা' কমে যাবে। এ এক ভুল ধারণা। জিডিপি'র পতনে কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ কমতে বাধ্য। সুতরাং সরকারি ব্যয় এক রাখা হোক বা কমানো হোক, কোষাগারীয় ঘাটতি বাড়বেই। গত আর্থিক বছরই তার সাক্ষী। বরং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটায়, তাতে কর খাতে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ে। আবার শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারই অর্থনীতিকে এত মারাত্মক মন্দা থেকে বের করে আনার জন্য যথেষ্ট অর্থ খরচে গররাজি, তা নয়। রাজ্যগুলিকেও সেই কাজ করতে বাধা দিচ্ছে কেন্দ্র। বাধা দিচ্ছে ঘুরিয়ে। এই যেমন জিএসটি খাতে রাজ্যগুলির পাওনা মেটাচ্ছে না কেন্দ্র। কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রী সরাসরি বলেই দিয়েছেন, ওই পাওনা দেওয়া হবে না। তিনি রাজ্যগুলিকে খরচ সামলাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিতে বলেছেন। খুবই স্বাভাবিক যে, লকডাউন ও মহামারীতে রাজস্ব সংগ্রহ যখন কমেছে, তখন প্রায় সব রাজ্যই অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের জন্য নিজের কাঁধে ঋণের বোঝা বিশেষ বাড়াতে চাইবে না। কল্যাণমুখী পদক্ষেপ থেকে বঞ্চিত হবেন ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব-নিম্নবিত্তরা, এমনকী মধ্যবিত্তরাও। তবে এই বিপর্যয়ের মধ্যেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি দপ্তরে কর্মী সঙ্কোচন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ ও বেসরকারিকরণের মতো নয়া-উদার অর্থনৈতিক সংস্কার চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তার গতি আরও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই পথে ভারতীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে না, 'আত্মনির্ভর'ও হবে না। অবশ্য 'কর্পোরেট-নির্ভর' হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, মোদী সরকার তো আসলে তা-ই চায়।

সোশ্যাল মিডিয়া, মতাদর্শ ও অর্থনীতি

কোভিড ১৯'র শিক্ষা

রতন খাসনবিশ

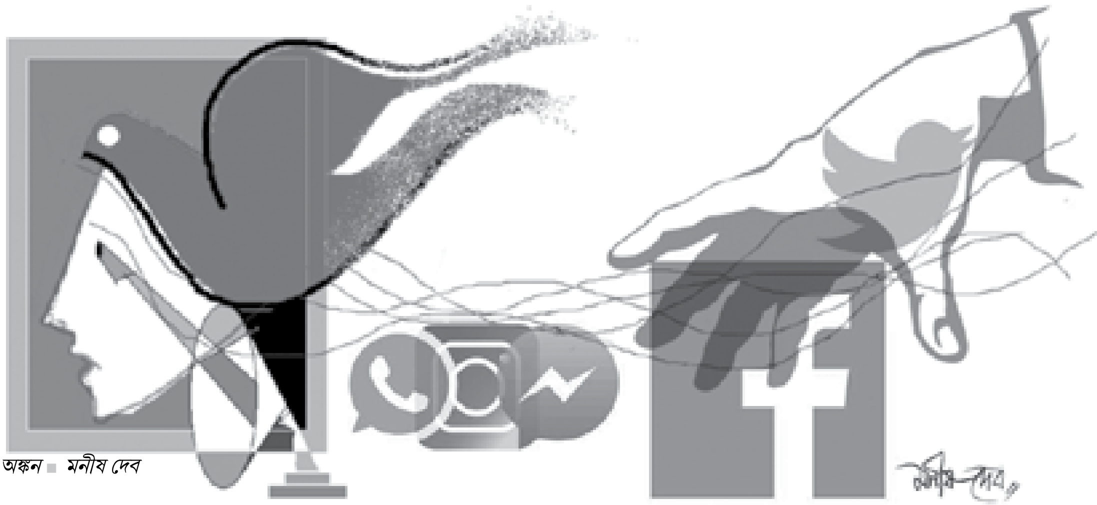

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়া

২০১৫ সালে এ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৩০.২৪ কোটি। সে সময়ে ফেসবুকে ছিল ১৩.৫৬ কোটি ভারতবাসীর অ্যাকাউন্ট। ২০২০ সালে এ দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৬৭ কোটিতে। ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৪.৬২ কোটি। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যার সঙ্গে প্রায় সমানুপাতে বাড়ছে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা। পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই প্রবণতাই বিদ্যমান থাকবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যখন বেড়ে হবে ৯৭.৪৮ কোটি, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এর সমানুপাতে বাড়বে কি না বলা যাচ্ছে না। কারণ, ইতিমধ্যে ফেসবুক জিও-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, জিও-র শেয়ার কিনেছে ফেসবুক। জিও-র অ্যাপ যত দ্রুত ছড়াতে থাকবে, ফেসবুকের নাগাল ততই বাড়তে থাকবে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যার কাছাকাছি যদি চলে আসে জিও অ্যাপ এবং ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সীমিত আছেন এ দেশের শহর এলাকায়, এই ধারণা ঠিক নয়। শহরে যত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আছেন, গ্রাম ভারতে এখন তার তুলনায় বেশি সংখ্যায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বিদ্যমান। মোদী সরকার যত বেশি করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া তৈরি করছে, গ্রাম ভারতে ডেস্কটপ না হলেও মুঠোফোন মারফত ইন্টারনেটের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে তত দ্রুত। জিও প্ল্যাটফর্ম যত শক্তিশালী হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে, তাতে গ্রাম এলাকায় ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং সেই সূত্রে ফেসবুকের প্রসার অতি দ্রুত ঘটবে। বহু ভারতবাসীর চিন্তা ধরা পড়বে ফেসবুকের দেওয়ালে, এতদিন যা অধরা ছিল।

ফেসবুকের বাড়তি গুরুত্ব আছে এই জন্য যে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হয় ফেসবুক মারফত। মাসে ১৬০ কোটি হলো ফেসবুক মারফত মতামত বা চিন্তাভাবনা আদান প্রদানের সংখ্যা। ইউটিউব (১১০ কোটি), কোরা (২১.৫ কোটি), ইনস্টাগ্রাম (১৯. ১ কোটি), টুইটার (১২.৫ কোটি), লিঙ্কড ইন (১.৯ কোটি)– এ সবেরও ব্যবহার আছে এ দেশে। তবে জনপ্রিয়তার নিরিখে সবগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ফেসবুক।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে সব সাইটই ফ্রি– বিনা পয়সায় এ সবে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। একটা প্রোফাইল দিতে হয়, সঙ্গে ছবি। ব্যস, তারপর সব ফ্রি। বিনে পয়সায় যত ইচ্ছে লেখা যায়, ছবি আপলোড করা যায়। ভিডিও, গান, বক্তৃতা সব কিছু আপলোড করা যায় এখানে। বিনি পয়সায় এত সব দেওয়া হয় কেন? স্বাভাবিক এই প্রশ্নটাই কিছুটা দেরিতে তোলা হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর এখন প্রায় সকলেরই জানা। ফেসবুকের দেওয়ালে যা সাঁটা হয়, সেগুলির বাজার

আছে। তথ্য হিসাবে এগুলো বিক্রি করা হয়। বিক্রির পর এগুলির কনটেন্ট বা সারবস্তু বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় বিনি পয়সায় যিনি ইচ্ছে মতো পোস্ট করেন, তাঁর চিন্তার প্রবণতা। এইরকম চিন্তার প্রবণতাগুলি তথ্য আকারে যায় ডেটা অ্যানালিস্টের হাতে। সে সব থেকে অঙ্ক কষে চিন্তার নানা মডেল বানানো হয়। সে সব মডেল যায় মেশিনে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এই চিন্তাগুলি কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার ব্যবস্থা করা থাকে। এক কথায় ফেসবুকের তথ্য বিক্রি হয়, আর সেই তথ্য দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ককে শাসনে আনার চেষ্টাও হয় ডেটা অ্যানালিস্টের বানানো মডেল কাজে লাগিয়ে।

যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা যায়, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ব্যক্তির চিন্তাকে বিশ্লেষণ করা অপরাধ কিছু নয়। মানুষের মনের বহু অজানা সত্য মানুষের ধারণার মধ্যে চলে আসতে পারে। সভ্যতার অগ্রগতি ঘটতে পারে এ সবের ফলে। সোশ্যাল মিডিয়া এই কাজটি যতটা ভালো করে করতে পারে, ইতিপূর্বে ততটা ভালো করে এই কাজটা করার উপায় মানুষের জানা ছিল না। নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতায় এই প্রযুক্তি একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে। বিশাল তথ্য ভাণ্ডার গড়া যায় বিগ ডেটা অ্যানালিটিকের মাধ্যমে, আর সেটা কাজে লাগানো যায় মানবমনের বহু অজানা দিক জানার জন্য, যাতে মানবসভ্যতা আরও সমৃদ্ধ হয়।

কিন্তু পুঁজিবাদ এই বিশাল তথ্যভাণ্ডার নিয়ে কী করতে চায়, ফেসবুকের মালিক মার্ক জুকেরবার্গ সেটি ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ফেসবুকে সঞ্চিত তথ্য বিক্রি করেন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী আলোকজান্ডার নিকসকে। এরপর নিকস এই তথ্যের কনটেন্ট অ্যানালিসিস করিয়ে বানালেন বিগ ডেটা। তাঁর কোম্পানি কেম্ব্রিজ অ্যানালিটিকা করল মানুষের স্বভাব ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। তারপর তা কাজ লাগানো হলো জনমত গঠনে। ব্রেক্সিট আর ট্রাম্পের নির্বাচন দুটোতেই কেম্ব্রিজ অ্যানালিটিকার ছিল বিশাল ভূমিকা। মার্ক জুকেরবার্গ বেকায়দায় পড়ে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ২০১৮ সালে। আলেকজান্ডার নিকসের ব্যবসাও এখন বন্ধ। কিন্তু তথ্যের বাজার বন্ধ হয়নি। সোশ্যাখল মিডিয়ার প্রতিটি তথ্য বাজারে বিক্রি হয়। সুযোগ-সুবিধা মতো তা কাজে লাগানোও হয়।

ভারতে এই সুযোগ প্রবলভাবে বিদ্যমান। কেননা এ দেশে তথ্য সংক্রান্ত আইন শিথিল, তথ্যের গোপনীয়তা নিয়েও মানুষের মাথাব্যথা কম। ইন্টারনেটের বিস্তার ঘটছে এবং তার হাত ধরে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারের তথ্য আহরণ ক্ষমতা বাড়ছে এ দেশে। এই তথ্য ইতিমধ্যেই কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটার বিস্তার ঘটবে। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত ভারতীয় জনতা পার্টি, এই সব তথ্য নিজেদের কবজায় আনছে আর তারপর সেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের প্রচার সংগঠিত করতে। ধর্ম নিয়ে যিনি উদার, তাঁর কাছে বারবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বিদ্বেষ উদ্রেককারী ধর্মচিন্তা। সামাজিক ন্যায় বা সমতামুখী চিন্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এমন ব্যক্তির সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে, যিনি এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী। 'হেট স্পিচ' ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে। কেননা বিজেপি'র সঙ্গে ফেসবুকের রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন প্রমাণিত। এই রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসও এই সোশ্যাল মিডিয়ার সুযোগ ব্যবহারে তৎপর হয়ে উঠেছে, একটা শক্তিশালী আইটি সেল তৈরি করেছে এই রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস। তথ্য জোটানোর কাজটা করছে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট। অর্থের বিনিময়ে তথ্যের কনটেন্ট অ্যানালিসিস করার ব্যবস্থাও আছে। মানুষের চিন্তার প্যাটার্নগুলি স্টাডি করে ঠিক কোন জায়গায় কোন ধরনের মিথ্যা তথ্য অথবা উসকানিমূলক বক্তব্য পৌঁছে দিতে হবে, সূক্ষ্ম কৌশলে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ সবই ঘটার কথা। কেননা সোশ্যাল মিডিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে, নিজেদের স্বার্থে তা কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও করছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই ধরনের ব্যবহার, যেটিকে বলা যায় অপব্যবহার, সে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। পুঁজিবাদের পণ্য অর্থনীতি এটির বাজার এবং সেই সূত্রে এর অপব্যবহারের রাস্তা খুলে দিয়েছে। কিন্তু সে কারণে সভ্যতার এই চমকপ্রদ আবিষ্কারকে এড়িয়ে যাওয়ার বা উপেক্ষা করার কোনও কারণ নেই। যাঁরা পুঁজিবাদের সমালোচনা করেন, যাঁরা বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার একটা সুস্থ বিকল্প খোঁজেন, এই নেটওয়ার্কিং তাঁরাও ব্যবহার করতে পারেন। এই প্রযুক্তি কোনওভাবেই এই কাজ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করতে পারে না। 'বিগ ডেটা'য় তাঁদের চিন্তাভাবনা ধরা পড়বে, তাঁদের চিন্তাগুলিকে বিশ্লেষণ করা হবে, এ নিয়ে অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। পুঁজি এটাকে নিজের মতো করে কাজে লাগাবে। পুঁজিবাদ-বিরোধীরাও চাইবেন এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সুযোগ গ্রহণ করতে। তাঁদের মতবাদ অবশ্যই তথ্য হিসাবে ধরা থাকবে। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে, 'কমিউনিস্টরা তাদের মতবাদ গোপন রাখতে ঘৃণা বোধ করেন'।

বিষয়টি অবশ্য এত সরল নয়। বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন যখন এই তথ্যের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁরা স্রেফ মতাদর্শের জোরে রাষ্ট্র নামক দমনযন্ত্রটি পরিচালনা করেন, আর সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় সেটা মেনে নেন, বিষয়টা অত সরল নয়। রাষ্ট্র যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁদের হাতে থাকে দমন যন্ত্র। প্রয়োজনে সেটা কাজে লাগানো হয় বিরুদ্ধ মত দমন করার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত আহৃত তথ্য এই কাজে অবশ্যই ব্যবহার করা যায়। বিগ ডেটায় যদি নজরদারি থাকে, আর কোন মতবাদ বিপজ্জনক, তা শনাক্ত করার ব্যবস্থা যদি মজবুত থাকে, তবে সেই বিপজ্জনক মতবাদ সমাজে প্রবল হয়ে উঠছে কি না, নেটওয়ার্কের প্ল্যাটফর্মগুলোকে কাজে লাগিয়ে তার উপর নজরদারি চালানো যায় সহজে। প্রয়োজনে সেই মতবাদের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ইউএপিএ ধরনের আইন এনে অর্থাৎ 'আইনসঙ্গত' উপায়েই। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বিরুদ্ধ মতের উপর নজরদারির সম্ভাবনা তাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়, ওই সব মতের প্রবক্তাদের শনাক্ত করাও সহজ হয়ে যায়। আধুনিক শ্রেণি রাষ্ট্র এই হাতিয়ারটি কাজে লাগায়, কাজে লাগাতে পারে তথ্যের উপর নজরদারিকে তীক্ষ্ণ করে তুলে। মতবাদ যাঁরা গোপন রাখতে ঘৃণা বোধ করেন, আধুনিক সমাজের এই বাস্তবতা তাঁদের মনে রাখতে হবে।

তথ্যকে আধিপত্যবাদী মতবাদ তার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার কাজে লাগাতে পারে, এই সম্ভাবনাটি প্রথমে নজরে আনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা। ২০০৯ সালেই অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার বাড়বাড়ন্তের আদি যুগেই এই রাষ্ট্রটি গুগল ও ফেসবুকের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নেয়। এই চুক্তি ঠিক আলেকজান্ডার

নিকসের সঙ্গে করা তথ্য বিক্রির চুক্তি নয়। রাষ্ট্রযন্ত্র তার অধিকার প্রয়োগ করে এই দু'টি মিডিয়ার যাবতীয় তথ্যে তার দখল কায়েম করে। চুক্তি অনুযায়ী এই দুই সোশ্যাল মিডিয়া আহরিত সব তথ্যই জমা পড়বে মার্কিন রাষ্ট্রে। তথ্য বিক্রি নয়, তথ্য ফাঁস করেই গুগল ও ফেসবুককে ব্যবসা করতে হবে, এই হলো চুক্তিটির নির্যাস। চুক্তিটি ফাঁস হয়ে যায় ২০১৩ সালে। এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উত্তর আমেরিকার উটা শহরে সিআইএ'র সার্ভারে গুগল বা ফেসবুক বাহিত যাবতীয় তথ্য মজুত করে রাখার ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজন মতো কাজে লাগানো হবে এই তথ্য পালটা মতাদর্শের চাপ কমানোর জন্য। মার্কিন রাষ্ট্র সোশ্যাল মিডিয়ার উপর এই নজরদারি রাখার কাজটা করে ব্যক্তি স্বাধীনতার মতাদর্শ নিয়ে ওই রাষ্ট্রের যে অহঙ্কার, সেটি বজায় রেখেই। এ নিয়ে কোনও হেলদোল আছে, কোথাও তার লক্ষ্মণ নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের নজরদারি করছে এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলির উপর, তাতে শুধু কমিউনিস্ট নয়, যে কোনও মার্কিন-বিরোধী মতবাদেরই কোনও সংরক্ষিত পরিসর খোলা থাকা সম্ভব নয়। গুগল বা ফেসবুকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চিন্তার পরিসর যতটা বাড়বে, ঠিক ততটা তথ্য যাবে সিআইএ'র হাতে। কোনও দেশ তার যে সার্বভৌম ক্ষমতা, এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সেটা জমা রাখতে বাধ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উটা শহরে। চীন এটা বুঝেছে। গুগল এবং ফেসবুককে ওই রাষ্ট্র তথ্য পাচারে বাধা দিয়েছে। পরিণামে গুগল তার ব্যবসা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে চীন থেকে। ফেসবুকেরও একই দশা। চীনের অবশ্য কোনও হেলদোল নেই। চীন এনেছে গুগলের চীনা সংস্করণ, যার ডেটা সিআইএ পায় না। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ইউটিউব– সোশ্যাল মিডিয়ার সব সংস্করণই চীনে আছে, কিন্তু এগুলির সবই আছে মার্কিন নজরদারির বাইরে।

আমাদের দেশে এই সব সোশ্যা ল মিডিয়ার সবকটি মার্কিন নিয়ন্ত্রিত। এর যে কোনওটি ব্যবহারের সময় জেনে নিতে হবে যে, এখানে দেওয়া তথ্যে কোনও গোপনীয়তাই নেই। দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার যত বাড়বে, আর জিও প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার যত বেশি ছড়িয়ে পড়বে, তথ্য তত বেশি ছড়িয়ে পড়বে। মুকেশ আম্বানির জিও প্ল্যাটফর্মে ফেসবুক আছে, গুগল আছে। আগামী দিনে যত জিও অ্যাপ বাজারে আসবে, তার সবগুলিতেই এদের দখল থাকবে। সংশ্লিষ্ট সব তথ্যই এই কারণে সংরক্ষিত থাকবে সিআইএ'র সার্ভারে। ২০২৫ সালে যদি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭.৪৮ কোটি, এদের অনেকটাই আসবে জিও অ্যাপের দখলে। আর সোশ্যাষল মিডিয়ায় দেওয়া তাদের যাবতীয় তথ্য যাবে রাষ্ট্রের জিম্মায়। এ দেশে যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করবেন, এ সব জেনেই তা তাঁদের করতে হবে। আধিপত্যবাদী মতাদর্শের বিপরীতে পালটা যা কিছু নির্মাণ, যা বিদ্যমান মতাদর্শের হেজিমনি ভাঙতে চায়, তার সবটাই থাকবে মার্কিন নজরদারিতে, মার্কিন মদতে ভারত রাষ্ট্র সেগুলিকে কাজে লাগাবে তাদের নজরদারি ব্যবস্থা মজবুত করতে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা একেবারেই ঠিক নয়। সব তথ্য রাষ্ট্রের হাতে থাকবে, সব তথ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাজে লাগাবে বিপরীত মতাদর্শের হেজিমনিকে কোণঠাসা করতে, এ সব জেনেই সোশ্যাল মিডিয়ার তৈরি করা প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগাতে হবে বিপরীত মতাদর্শের প্রভাববলয় খর্ব করতে। এ কাজটা প্রকাশ্য কাজ, মতবাদ প্রকাশ করার কাজ, যেটা লুকিয়ে রাখার কোনও কারণ নেই। সোশ্যাল মিডিয়া যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কোনও গোপনীয়তা থাকবে না জেনে নিয়েই সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। অনেকেই এইভাবে মতাদর্শ প্রচারে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন অকুতোভয়ে। সঠিক কাজই করছেন তাঁরা। এই রাষ্ট্র যাঁরা চান না, অন্যরকম রাষ্ট্র যাঁরা নির্মাণ করতে চান, তাঁরা তাঁদের সাংগঠনিক আধারকে অবশ্যই এই সোশ্যাল মিডিয়ার ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখবেন। কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে তাঁদের কথাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তাঁরা ছাড়বেন না। যুদ্ধটা মতাদর্শের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে গোপনীয়তার কোনও স্থান নেই। মতাদর্শ যদি মজবুত হয়, তার অভিঘাত সমাজে পড়তে বাধ্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় যত উলটো প্রচারই থাক না কেন, মজবুত মতাদর্শ

কীভাবে নয়া উদারবাদী মতাদর্শকে বিব্রত করতে পারে, নয়া উদারবাদের পিছনে আধিপত্যবাদী মতাদর্শের যাবতীয় সমর্থন সত্ত্বেও যে তা পারে, করোনাকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় মতাদর্শের যুদ্ধে সেটা প্রমাণিত হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ও মতাদর্শ

সোশ্যাল মিডিয়া এই সময়ে বিজ্ঞানসৃষ্ট একটা প্রকাশ মাধ্যম। কী প্রকাশ করা হবে, তা এই প্রকাশ মাধ্যম ঠিক করে দেয় না। যে সমাজ এই প্রকাশ মাধ্যমকে কাজে লাগায়, সেই সমাজে থাকে এর বিষয়বস্তুর বস্তুগত উপাদান। ব্যক্তির চিন্তা যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পায়, চিন্তার যা বস্তুগত ভিত্তি, মিডিয়ায় প্রকাশিত ভাবগুলি তার বাইরে থাকতে পারে না। কনটেন্ট অ্যানালিসিস করে যে বিগ ডেটা তৈরি হয়, সেটার নির্যাসেও সে সবই পাওয়া যাবে। অ্যানালিটিক যদি সেগুলির প্যাটার্ন বানায়, সেগুলোরও থাকবে বস্তুগত ভিত্তি। বস্তুগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা চিন্তাগুলি হেজিমনি গড়ার বা হেজিমনি ভাঙার জন্য কাজে লাগানো যায় কীভাবে? এইখানেই আছে চিন্তাগুলির মতাদর্শগত উপাদান বিশ্লেষণ করার ভূমিকা। মতাদর্শ বলতে কী বোঝায়, তা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। বস্তুগত উৎস থেকে যা চিন্তা আসে, সেই চিন্তায় বস্তুবাদ এবং ভাববাদ দু'টির উপাদানই থাকে।

জার্মান ইডিওলজিতে এটিকে উল্লেখ করে কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন– ‘ Real problems of humanity are not mistaken ideas but real social contradiction and former is a consequence of the latter.’ (The German Ideology, Vol. 1, Part one)। বস্তুগত উৎস থেকে যে সব চিন্তা আসে, তার অনেক চিন্তাই ভুল চিন্তা হতে পারে, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জিতিয়ে আনার চিন্তা যে রকম একটা ভুল চিন্তা। কিন্তু জার্মান ইডিওলজি অনুসারে এই চিন্তাতেই লুকিয়ে আছে একটা সত্যিকারের সামাজিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বটিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয় একটি ইডিওলজির মোড়ক পরিয়ে। ভুল চিন্তায় থাকে একটা সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ। সেই দ্বন্দ্বকে যাঁরা কাজে লাগান, তাঁরা বস্তুগত মিথ্যা চিন্তাকে সত্যি হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটাই মতাদর্শের নির্মাণ। বস্তুগত ভিত্তির উপর যা দাঁড়িয়ে থাকে, বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থায় উপস্থিত করা মতাদর্শগত উপলব্ধি-বিরোধী। এই মতাদর্শ অবশ্যই বাস্তবে এই দ্বন্দ্বগুলির সমাধান খুঁজে পায় না। আর সেজন্যই ‘they tend to project them in ideological forms of consciousness that is in purely mental or discursive solutions which effectively conceal or misrepresent the existence and character of these contradictions.’(A Dictionary of Marxist Thought, Ed. By Tom Bottomore, page 120). সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যেটা ডমিনেন্ট ডিসকোর্স, যেটা আধিপত্যবাদী মতবাদ, এটার দুর্বলতা আছে এখানেই। এটি একটি মতাদর্শের উপর দাঁড়ায়, যুক্তিসঙ্গত চিন্তার ভিত্তিতেই তথ্যকে সাজানো হয়, কিন্তু এর পিছনে থাকে বাস্তবে বিদ্যমান দ্বন্দ্বগুলির সমাধান অর্জনের অক্ষমতা। এই কারণেই এই মতবাদগুলির ভিত্তি থাকে দুর্বল, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বাস্তবতা যখন এই মতাদর্শের ভুলগুলিকে প্রায় চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেয়, তখনও অবিরত ভুল কথাগুলি প্রচার করতে হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া যাবতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু সমস্যা এই যে, বাস্তব সত্য ক্রমাগতভাবে মতাদর্শগত সত্যের বিপরীতে দাঁড়াতে থাকে। যত বেশি এটা ঘটতে থাকে, ততই মিথ্যা চেতনার উপর দাঁড়িয়ে থাকা মতাদর্শগত নির্মাণের দুর্বলতাটুকু মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুল মতাদর্শ, এমনকী সোশ্যা ল মিডিয়াতেও তার ন্যায্যতা হারাতে থাকে। করোনা মোকাবিলায় মার্কিন ব্যর্থতা স্বাস্থ্যবিমার নয়া উদারবাদী মডেলকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন করেছে বাজার অর্থনীতির যাবতীয় যুক্তি কুপোকাৎ করেই। নরেন্দ্র মোদীর ২১ দিনের করোনা যুদ্ধ কাঁসর-ঘণ্টা ও পুষ্পবৃষ্টি সত্ত্বেও জনমানসে যে ধরনের রেখাপাত করেছে, ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ডিসলাইক তা প্রকাশ্যে এনেছে। মিথ্যা চেতনার মতাদর্শ উহানে চীনাদের করোনা-বিরোধী যুদ্ধের সাফল্যকে ঢেকে রাখতে পারেনি। সারা পৃথিবীতে নয়া উদারবাদী স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি পড়েছে বিপুল সমালোচনার মুখে। অন্তত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাষ্ট্রের যে দায় আছে, পুরানো সোভিয়েত মডেল থেকে এই অংশটুকু তুলে এনে আজকের পুঁজিবাদ তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে।

ভুল মতাদর্শ সোশ্যাল মিডিয়ার যত অনুগ্রহই পাক না কেন, বাস্তবের কঠিন আঘাত তাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। করোনাকালে এইটি সম্ভবত সবচেয়ে বড় শিক্ষা। মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য কথা শুনতে চাইছেন। নজরদারি বাড়িয়ে তুলে সেটি আটকানো যাবে না।

মতাদর্শ ও করোনাকালের অর্থনীতি

আগেই বলেছি, একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ বস্তুজগৎকে তার ভাবধারায় সাজিয়ে নেয়। সাজিয়ে নিতে গিয়ে ওই মতাদর্শ বস্তুজগতের পুনর্নির্মাণ ঘটায়। এই পুনর্নির্মাণ বস্তুজগতের সত্যকে যেভাবে উপস্থাপিত করে, প্রকৃত সত্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার বিপরীতে। অর্থাৎ মতাদর্শ যে চেতনা নির্মাণ করে, তা ভুলও হতে পারে। কিন্তু মতাদর্শগত এই ভুল সহজেই শুধরে নেওয়া যাবে, বিষয়টা অত সরল নয়। এই ভুলের উৎসে থাকতে পারে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক দ্বন্দ্ব, যার নিরসন না ঘটা পর্যন্ত এই ভুলেরও সংশোধন হবে না। মতাদর্শ তার জোর খাটিয়ে এই ভুলটিকেই সঠিক চিন্তা হিসাবে উপস্থাপিত করতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়া মারফত সেটিকেই ঠিক হিসাবে প্রচার করতে পারে। সামাজিক স্বীকৃতিও মিলতে পারে এই মতাদর্শজাত মিথ্যা চেতনার। এই যুদ্ধটা মতাদর্শের হেজিমনি বা প্রভাববলয় সৃষ্টির যুদ্ধ। মতাদর্শের জগতে এখন যা আধিপত্যকারী চিন্তা, যার প্রভাববলয় বিপুল, সেটা এই জাতের চিন্তা। পুঁজি এবং শ্রম বিক্রেতার মধ্যে যে সামাজিক দ্বন্দ্ব আছে, যার নিরসন এই সমাজে সম্ভব নয়, এই চিন্তার উৎসে আছে সেই সামাজিক দ্বন্দ্বটি। পুঁজির দিক থেকে এই সামাজিক দ্বন্দ্বটি যেভাবে মোকাবিলা করা হয়, বর্তমান সময়ের আধিপত্যকারী মতাদর্শ বস্তু ও সমাজজীবনকে সাজিয়ে নেয় সেই দিশায়।

এই আধিপত্যকারী মতাদর্শের উপরে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। দুনিয়া জুড়ে গড়ে উঠেছিল পালটা এক মতাদর্শের প্রভাববলয়, পুঁজিবাদ যাকে সমীহ করে চলত। সোভিয়েতের পতন এই পালটা মতাদর্শের প্রভাববলয়কে দুর্বল করে। পুঁজির মতাদর্শ দিয়ে বস্তুজগত ও সমাজজীবনকে নির্মাণ করার মতাদর্শ প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। প্রায় অপ্রতিরোধ্য এই মতাদর্শের উপর ভর দিয়ে পুঁজি রূপান্তরিত হয় উদারবাদী পুঁজিতে। সোভিয়েতহীন পৃথিবীতে এই পুঁজি হিংস্র আক্রমণ নামায় শ্রমজীবীর উপর। এই আক্রমণের ন্যায্যতা নির্মাণ করা হয় মতাদর্শের জগতে। এমনকী জাতিরাষ্ট্র আরোপিত বাধাগুলিকেও ক্রমশ অবান্তর করে দেয় এই নয়া উদারবাদী পুঁজি।

করোনার আক্রমণ এই নয়া উদারবাদী পুঁজিবাহিত মতাদর্শকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে এনে ফেলেছে। আধুনিক পুঁজি অর্থনীতি সংক্রান্ত যে চেতনার নির্মাণ ঘটিয়েছে, সেই চেতনার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দুনিয়া জুড়ে। এটা দেখা যাচ্ছে যে, ভেঙে পড়া সোভিয়েতের মতাদর্শ যে রাষ্ট্রগুলিতে এখনও আধিপত্যকারী মতাদর্শ হিসাবে টিকে আছে, সেই কিউবা, ভিয়েতনাম, চীন এবং উত্তর কোরিয়া এই অতিমারীর আঘাত মোকাবিলা করেছে অনেক বেশি সফলভাবে। এর মূলে আছে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং যাদের শ্রমে সভ্যতা তৈরি হয়, তাদের সম্পর্কে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, বাজার অর্থনীতি যা মেপে উঠতে পারে না। কীভাবে লকডাউন করতে হবে এবং আনলকই বা কীভাবে নিয়ে আসতে হবে, করোনাকালীন চীনের উহান শহর সম্ভবত এ বিষয়ে মডেল হয়ে থাকবে। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজি শ্রমজীবীকে বাজার নির্ভর স্বাস্থ্য বিমার হাতে ছেড়ে দিয়ে কীভাবে সমাজজীবনকেই বিপন্ন করতে পারে, করোনা আক্রান্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রমাণ রাখছে। এ সবের অর্থনৈতিক আঘাত কত তীব্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটিও প্রমাণ করে ছেড়েছে। মতাদর্শ যা প্রচারই করুক না কেন, তথ্য এটাই যে, করোনাকালে মার্কিন অর্থনীতির প্রায় ১০ শতাংশ সঙ্কোচন ঘটেছে। আর একই সময়ে চীনের অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটেছে ৩.২ শতাংশ। আধিপত্যকারী মতাদর্শ তার সমর্থনের জমি ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে। আরও লক্ষণীয় যে, ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলি করোনার আক্রমণ মোকাবিলা করতে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের কুফল কী, সে সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। পুঁজির মতাদর্শগত প্রভাববলয় সঙ্কুচিত হচ্ছে তার ফলে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সে সব দেশে আরও বেশি করে রাষ্ট্রের কবজায় আনা হচ্ছে স্বাস্থ্যের বাজার-অর্থনীতির যাবতীয় সুসমাচার উপেক্ষা করে। করোনায় লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া অর্থনীতির পুনর্গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা যে জোরালো হতে হবে, পুঁজিবাদী মতাদর্শ অনুসরণ করে তাকে যে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, সর্বত্র তার স্বীকৃতি আসছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জিডিপি'র ২০ শতাংশ অর্থনীতি উদ্ধারে ব্যয় করার কর্মসূচি নিয়েছে। যে শ্রমজীবী কর্মহীন হয়ে পড়ছেন এই অতিমারী আক্রান্ত অর্থনীতির বিপর্যয়ের কারণে, সেই শ্রমজীবীদের যে পুঁজির হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না, প্রয়োজনে সর্বজনীন বুনিয়াদি আয় ব্যবস্থা চালু করে সমাজকে বাঁচাতে হবে, এই ধারণারও স্বীকৃতি মিলছে।

এই সমস্ত কিছুই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এখন যা আধিপত্যকারী মতাদর্শ, সেই পুঁজিবাদী মতাদর্শ নিয়েই। বস্তুজগতকে পুঁজি যেভাবে দেখতে চায়, তার মতাদর্শ যেভাবে সমাজজীবনের নির্মাণ ঘটায়, সেটা মিথ্যা কি না– এই সংশয় সর্বত্র দেখা দিচ্ছে। সোভিয়েতকেন্দ্রিক পালটা মতাদর্শের চ্যালেঞ্জ নেই, করোনাকালের পৃথিবীতে তবুও কিন্তু স্বস্তিতে নেই পুঁজিবাদ। তার যা মতাদর্শগত নির্মাণ, সর্বত্র তা সংশয়ের মুখে পড়েছে। এমনকী পুঁজিবাদী দেশগুলিও আধিপত্যবাদী মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংশয়ে জর্জরিত হচ্ছে এই করোনাকালীন পরিস্থিতিতে।

পুঁজি ও শ্রম বিক্রেতার মধ্যে যে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বের অবসান না হলে পুঁজি নির্মিত মতাদর্শগত চেতনার অবসান ঘটবে না। কিন্তু অতিমারীর আক্রমণে বিপর্যস্ত বিশ্বে যেভাবে পুঁজিবাদী মতাদর্শ লাঞ্ছিত হচ্ছে, তাতে এই সম্ভাবনা অবশ্যই দেখা দিচ্ছে যে, অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদকে শাসনে আনার দাবি জোরালো হয়ে উঠবে বিশ্ব জুড়ে। নয়া উদারবাদ পুঁজির কাছে সেটা একটা অস্বস্তির বিষয়। তার মতাদর্শগত আধিপত্য প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে এমনকী এই সোভিয়েতহীন বিশ্বেও। করোনা উত্তরকালেও নয়া উদারাবাদী মতাদর্শ এমনকী উন্নত বিশ্বে তার হারানো জমি কতটা ফেরত পাবে, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সে সব নিয়েও।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ সবের প্রতিফলন পড়ছে। মতাদর্শগত আধিপত্য যখন খর্ব হয়, ব্যক্তির চেতনায় তখন পুঁজিবাদের পুনর্নির্মাণ কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক এটাই ঘটছে করোনাকালে। নিজের ন্যায্যতা রক্ষার যুক্তি চাই। সেই যুক্তি মতাদর্শগত মিথ্যা চেতনা থেকে স্বতঃই নিঃসৃত হওয়ার কথা। করোনার বাস্তবতা সেই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। এটা অতিক্রম করার পথ কীভাবে পাওয়া যাবে, করোনাকালের পুঁজিবাদী মতাদর্শ পড়েছে এই সমস্যায়। ফেসবুক, টুইটারে ব্যক্তির যে চিন্তা ধরা পড়ছে, তাতে চীনবিদ্বেষ স্তিমিত হয়ে আসছে, উহানের কোভিড মোকাবিলার ইউটিউবে 'লাইক'-এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত। মতাদর্শগত মিথ্যা চেতনা দিয়ে এ সব আটকানো যাচ্ছে না।

সোশ্যাল মিডিয়ার জগৎ যদি এইভাবে পুঁজির বিপরীতে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সেই মিডিয়ার উপর মতাদর্শের আধিপত্য আনা অবান্তর হয়ে পড়ে। বরং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচার রুদ্ধ করার চেষ্টা করা আজকের পুঁজির কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। ইউটিউবে যদি কোভিডে মৃত কফিনবন্দি মার্কিন নাগরিকদের সারি ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে, আর অন্যদিকে উহানে ধারাস্নানে তৃপ্ত নাগরিকের ছবি আসতে থাকে একের পর এক, তবে পুঁজিবাদী মতাদর্শের পক্ষে এখন সুবিধা হবে ইউটিউব বন্ধ করে দেওয়া।

সেটা অবশ্য এখনই ঘটবে না। তবে মতাদর্শগত নির্মাণের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে পুঁজি যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, করোনা নিঃসন্দেহে সেটিকে কঠিন সমস্যায় ফেলেছে। পুঁজির অন্য আখ্যান নির্মাণের চেষ্টা অবশ্যই হবে। চেষ্টা করা হবে সেটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পুঁজিবাদ-বিরোধী মতাদর্শের কণ্ঠরোধ করার, সেগুলিকে কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা–এসবও অবশ্যই চলতে থাকবে একই সঙ্গে। চলতে থাকার কারণ, মিথ্যা মতাদর্শকে টিকিয়ে রাখতেই হবে করোনা ও করোনা উত্তরকাল, উভয় সময়েই। পুঁজির সঙ্গে শ্রমশক্তির মালিকের যে বিরোধ তার নিরসন নেই। কিন্তু সে যা-ই হোক, করোনা উত্তরকালে পুঁজির নতুন যে আখ্যান নির্মাণ করা হবে, সেই নির্মাণে নয়া উদারবাদের ভূমিকা অবশ্যই কিছুটা সঙ্কুচিত হবে।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা-অর্জিত উপলব্ধি, পুঁজি যে অর্থনৈতিক আখ্যান নির্মাণ করে, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে– আধিপত্যকারী মতাদর্শের ন্যায্যতা নির্মাণে সমস্যা দেখা দিচ্ছে এইখানে। পুঁজির অন্য আখ্যান নির্মাণের সম্ভাবনা প্রবল, একথা করোনা উত্তরকালে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। একই সঙ্গে অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও মনে রাখতে হবে। করোনাকালীন সঙ্কটে আধিপত্য অটুট রাখার জন্য পুঁজি সোশ্যাল মিডিয়া সহ তার যাবতীয় প্রচারমাধ্যমে অর্থনৈতিক বাস্তবতাকেই অবান্তর করে দেওয়ার চেষ্টায় নামতে পারে। দারিদ্রপীড়িত বিহার এখন প্লাবিত হচ্ছে বিহারের ভূমিপুত্র সুশান্ত সিং রাজপুতের আখ্যান নির্মাণে– যেখানে এক 'ডাইনি'র খপ্পরে পড়ে একটা ভাল ছেলে কীভাবে সর্বনাশের মুখে পড়ল সেই কাহিনীর বিপুল প্রচার ঘটছে। অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অবান্তর করে দিচ্ছে এই মধ্যযুগীয় আখ্যান নির্মাণ। সোশ্যাল মিডিয়া এই ক্ষেত্রে বিপুল ভূমিকা পালন করছে। করোনাকালে অযোধ্যার শিলান্যাস কিংবা মোদীর চীনবিরোধী জেহাদ এ সবও বিচার করা যায় করোনাকালীন অর্থনৈতিক বাস্তবতা, যা অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদকে কাঠগড়ায় তুলছে, সেটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার মতাদর্শগত তাগিদ দিয়ে।

আখ্যান নির্মাণে করোনাকালীন অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে আনতে হবে। এই দায়িত্ব নিতে হবে বামপন্থী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষকেই। সোশ্যাল মিডিয়া এই কাজে বিপুল ভূমিকা পালন করতে পারে। যাঁরা পুঁজির বিপরীতে পালটা একটা সমাজ গড়তে চান, তাঁরা করোনাকালে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করার সুযোগ কিছুতেই ছাড়বেন না। সব তথ্য বিক্রি হতে পারে, সব তথ্য রাষ্ট্রের তথ্যভাণ্ডারে জমা হতে পারে, এ সব জেনেও এ কাজ করতে হবে। মতাদর্শগত প্রভাববলয় নির্মাণে পুঁজিকে কোণঠাসা করার যে সুযোগ নিয়ে এসেছে করোনাকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়, তাকে কোনওভাবেই হাতছাড়া হতে দেওয়া সঙ্গত হবে না।

শুধু কি ‘ভগবানের হাত’?

সাত্যকি রায়

গত প্রায় ছয়-সাত মাস ধরে বিভিন্ন মাত্রার লকডাউনের কারণে দেশের অর্থনীতি এক বেহাল অবস্থার সম্মুখীন। অবশ্য এ কথা ঠিক, অতিমারীর প্রভাব পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশকে গভীর সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য হলো যে, বিশ্বের মোট জিডিপি’র ৬০ শতাংশ এবং মোট শিল্পোৎপাদনের ৬৫ শতাংশ আক্রান্ত দেশগুলির অধিকারে। ফলে এই সমস্ত দেশের আর্থিক অধোগতি বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। যে সমস্ত দেশ সেই অর্থে করোনার দ্বারা আক্রান্ত নয়, সেই দেশগুলিও যেহেতু অন্যের উপর উৎপাদনের প্রয়োজনে নির্ভরশীল, তারাও পরোক্ষভাবে অতিমারীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আইএমএফ যে সর্বশেষ আর্থিক প্রবণতার হিসাব দিয়েছে, তাতে অনুমান করা হচ্ছে যে, চলতি আর্থিক বছরের শেষে বিশ্বের জিডিপি’র সঙ্কোচনের মাত্রা ৪.৯ শতাংশ হতে পারে। এর প্রভাবে পৃথিবীর ৩৫টি দেশে ছোট-বড় নানা ধরনের দুর্ভিক্ষের পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, যার কারণে প্রায় সাড়ে তেরো কোটি মানুষকে সারা বিশ্বে গভীর খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অতিমারীর কারণে প্রায় ১১ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে।

অতএব এই অতিমারীর কারণে ভারতের অর্থনীতিও যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু এই প্রভাব কতটা গভীর হবে, তা অবশ্যই শুধু ‘ঈশ্বরের হাত’-এর উপর নির্ভর করে না। বরং নির্ভর করে অতিমারীর আগে দেশের আর্থিক হাল কীরকম ছিল এবং অতিমারীর সঙ্কটকালে এর মোকাবিলা করার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিল, মূলত তার উপরে। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, বিশ্বের অর্থনীতিতে যে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা চলছে, তার মধ্যে চীন ও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার সবচেয়ে উপরের দিকে ছিল এবং ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার সাড়ে সাত থেকে আট শতাংশের কাছাকাছি ছিল। অর্থাৎ সেভাবে দেখলে অর্থাৎ বৃদ্ধির নিরিখে ভারত ও চীনের অবস্থা গত আড়াই দশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সম্ভাবনাময় ছিল। অতএব অতিমারীর প্রভাবকে মোকাবিলা করার আর্থিক শক্তি এই দু’টি দেশের অন্যদের তুলনায় বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলো না। আর্থিক বৃদ্ধির সর্বশেষ যে ত্রৈমাসিক হিসাব (এপ্রিল-জুন, ২০২০) প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ভারতের আর্থিক সঙ্কোচনের মাত্রা ২৩.৯ শতাংশ, যা জি-২০’র সবকটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সঙ্কোচন। অথচ চীনের ক্ষেত্রে এই সময়েও ৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এর কারণ যদি খুঁজতে হয়, তবে সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি একটু খেয়াল করা প্রয়োজন। যদি বিগত বছরগুলির ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রবণতার হিসাব দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, ২০১৮-১৯’র প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ভারতে সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার দেখা গিয়েছিল, যা ৪.২ শতাংশ এবং তারপরে এই বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমতে থাকে। অতিমারীর ঠিক আগে ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার নেমে হয় ৩.২ শতাংশ, যা তৃতীয় ত্রৈমাসিকেও ৪.৭ শতাংশ ছিল। এরই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সর্বশেষ প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেশের মানুষের ভোগ ব্যয়ের (Consumption expenditure) পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়েছে ২৬.৭ শতাংশ এবং বিনিয়োগ গত বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে বিনিয়োগের হার ২০১৮-১৯ আর্থিক বছর থেকেই কমতে শুরু করেছে এবং ২০১৯-২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে যায় অর্থাৎ বিনিয়োগের সঙ্কোচন শুরু হয়ে যায়। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সর্বশেষ

তথ্যে এও প্রকাশিত হয়েছে যে, উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হতে শুরু করেছে গত বছরের এপ্রিল-জুন সময়কালেই। বাণিজ্যিক যানবাহন বিক্রির হার, বিমানে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ বৃদ্ধির হার, রেলে যাত্রী পরিবহণের হার– এই সব গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি ঋণাত্মক ছিল গত বছরেই। গত বছরেই সিমেন্ট বিক্রি মাত্র ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ইস্পাত বিক্রি ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, যা বর্তমান বছরে করোনার প্রভাবে যথাক্রমে প্রায় ৩৮ শতাংশ এবং ৫৭ শতাংশ হারে সঙ্কুচিত হয়েছে। দেশের শিল্পোৎপাদনের গতিপ্রকৃতি পরিমাপ করা হয় শিল্প উৎপাদনসূচক বা ইন্ডেক্স অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন-এর মাধ্যমে, যা ২৩টি শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনকে বিবেচনা করে থাকে। সরকার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই সূচকের বৃদ্ধির হার সবকটি শিল্পক্ষেত্রেই ঋণাত্মক ছিল– যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, লকডাউনের কারণে সব ক্ষেত্রেই উৎপাদন থমকে যায়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, লকডাউনের আগেই সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২৩টির মধ্যে ১০টি শিল্পক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে গিয়েছিল। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে, অতিমারীর আগেই আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় অধোগতির বাস্তবতা প্রকট ছিল– অতিমারী এই প্রবণতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে মাত্র।

মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে করোনা মোকাবিলায় লকডাউন চালু হয়েছিল যখন, দেশে তখন মোট সংক্রমণের সংখ্যা পাঁচশোর কাছাকাছি ছিল। প্রায় ছয়-সাত মাস ধরে বিভিন্ন মাত্রার লকডাউন চলার ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়ছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। দেশের কৃষিক্ষেত্রে সরকারি হিসাবে সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে ৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধির হার দেখা গিয়েছে। এর কারণ সহজেই বোধগম্য– করোনার প্রাথমিক প্রভাব পুরোটাই শহর কেন্দ্রিক ছিল। দ্বিতীয়ত, কৃষি উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই অব্যাহত ছিল। বিশেষত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনে সরকারি ছাড় ছিল। এ ছাড়া যে ফসল এপ্রিল-জুন মাসে উৎপাদিত হয়েছে, তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ স্বাভাবিকভাবে আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ সব কারণে কৃষি উৎপাদনে করোনার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, পরিবহণ স্বাভাবিক না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি, বহু কৃষকের ফসল জমিতেই পড়ে থেকেছে, আবার কেউ বা জলের দরে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। এর আবার দুই রকম প্রভাব দেখা যাচ্ছে– কৃষক ফসলের যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে কৃষিজাত পণ্যের জোগান কমে যাওয়ায় তার দাম ক্রমাগত বেড়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে অতিমারীর প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশি। দেশের বিপুল পরিমাণ মানুষের আয় কমে যাওয়ায় শিল্পপণ্যের বাজার তলানিতে এসে ঠেকেছে। মনে রাখা দরকার, একটি বড় অংশের কর্মরত মানুষ এই সময়ে কাজ হারিয়েছেন অথবা তাঁদের আয় কমে গিয়েছে। আমাদের দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৮৪ শতাংশই স্বনিযুক্ত ছোট দোকানদার, হকার, রিকশাচালক বা ভ্যানচালক ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছেন ছোট শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, যাঁদের একটি বড় অংশ পরিযায়ী শ্রমিক। এঁদের বেশিরভাগের আয় প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে যায়। পুরানো সঞ্চয় যতটুকু ছিল অথবা ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। লকডাউন উঠে গেলেই আপনা-আপনি আগের অবস্থা ফিরে আসবে এরকমটা নয়। যাঁদের আয় সুরক্ষিত, তাঁরাও অনিশ্চয়তার বাতাবরণে সতর্ক হয়ে জিনিসপত্র কিনবেন– এটাই স্বাভাবিক। কারণ শিল্পদ্রব্য কেনা পিছিয়ে দিলে বা পরে কিনলে জীবনে বড় কিছু ক্ষতি হয়ে যায় না। এই স্বাভাবিক সতর্কতা ও ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ শিল্পপণ্যের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ ছাড়াও কোনও একটি শিল্পদ্রব্য নানা স্তরে উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে গেলে অন্তর্বর্তীকালীন উৎপাদকদেরও গভীর ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। তারা কার্যত নতুন উৎপাদন বন্ধ রেখে পড়ে থাকা উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে চাইবে। অতএব উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে সঙ্কোচন কার্যত বাড়তে থাকে এবং তা বহুগুণিতকে অর্থনীতির উপরে সামগ্রিক নেতিবাচক প্রভাব হিসাবে দেখা যায়। তুলনামূলক বড় শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো দীর্ঘ সময়ের স্থায়ী খরচ মেটানো– এ ক্ষেত্রে অর্থের জোগান ও ক্রেডিটের ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। মোটের উপর শিল্পের চাহিদা এবং জোগান আপনা-আপনি কোভিড পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসবে না। দেশের পরিষেবা ক্ষেত্রে অতিমারীর প্রভাব সব জায়গায় একরকম নয়। পরিবহণ ও পর্যটন গভীর সঙ্কটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। দেশের ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা আর্থিক পরিষেবা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত। তার কারণ, এ ক্ষেত্রে কেনাবেচায় সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগাযোগের প্রয়োজন হয় না। একই কারণে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিষেবাও কম ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবসা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও যোগাযোগ আমাদের দেশে কৃষির পরে সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং এই সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা না ফিরলে কর্মসংস্থানের গভীর সঙ্কট দেখা দেবে।

সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি প্রতি মাসে কর্মসংস্থান ও বেকারির তথ্য প্রকাশ করে থাকে। এ বছরের মার্চ থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত গড় বেকারত্বের হার ছিল ১৩.৭ শতাংশ। পুরুষদের মধ্যে বেকারত্বের হারের গড় ছিল ১২.৯ শতাংশ, অথচ মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের গড় হার এই সময়ে ছিল ২০.৬ শতাংশ। ধীরে ধীরে লকডাউন প্রত্যাহারের পর্বে বেকারত্বের হার কম হয়েছে। আগস্ট মাসে এই হার কমে হয় ৮.৩৫ শতাংশ, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ছিল ৭.৩ শতাংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৬.৮ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, অতিমারীর ঋণাত্মক প্রভাব তুলনামূলকভাবে মহিলা ও অল্প বয়সীদের মধ্যে বেশি পড়েছে। এর প্রধান কারণ হলো, আমাদের মতো দেশে পিতৃতন্ত্রের প্রভাবে ছাঁটাইয়ের তালিকায় মহিলাদের নাম আগে থাকে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের নাম পরে আসে। ফলে যে কোনও সঙ্কটের বোঝা অসমভাবে মহিলাদের ঘাড়ে বেশি পড়ে। এবার আসা যাক অল্প বয়সীদের প্রসঙ্গে। শহর এবং গ্রামে ১৫-১৯ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা আগস্ট, ২০২০ এই সময়ে শ্রম বাজারে কাজের সন্ধানে উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ৬১ শতাংশ। ২০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের হার ছিল ৩৯.১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৮.৫ শতাংশ। এর অর্থ হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ চালু হওয়া শুরু হলেও নতুন কর্মসংস্থান খুবই কম হচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে প্রতি বছর এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ কর্মক্ষম বয়সী জনসংখ্যায় যুক্ত হন। ফলে কোনও বছরে কর্মসংস্থান অস্বাভাবিকভাবে ধাক্কা খেলে পরবর্তী বছরগুলিতে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায়, অথচ সেই অনুপাতে কাজের সুযোগ

না বাড়লে বেকারত্বের হার ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। তথ্য বলছে, ২০০০-২০১২ এই সময়ে প্রতি বছর গড়ে ৭৫ লক্ষ মানুষ অকৃষি ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, যা:দের বেশিরভাগই কাজ পেয়েছেন নির্মাণ শিল্পে ও খুচরো ব্যবসায়, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে ইত্যাদিতে। ২০১২-২০১৮ এই সময়ে অকৃষিতে কর্মসংস্থান কমে যেতে শুরু করে, যার প্রধান কারণ ছিল নির্মাণ শিল্পে বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া। কিন্তু তবুও এই সময়ে বছরে গড়ে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে ২৯ লক্ষ মানুষ কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। এই অতিমারীর প্রভাবে সবচেয়ে বেশি সঙ্কট দেখা গিয়েছে নির্মাণ শিল্প, খুচরো ব্যবসা এবং যোগাযোগ এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেশের কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানের প্রধান তিনটি ক্ষেত্রই লকডাউনের প্রভাবে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, লকডাউন ধীরে ধীরে উঠে গেলেই অর্থনীতি আবার পুরানো অবস্থায় ফিরে আসবে না। এর জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার অতিমারীর মোকাবিলা করার জন্য ২১ লক্ষ কোটি টাকার আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্পের আর্থিক মূল্য দেশের জিডিপি'র ১০ শতাংশের বেশি। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলেও আসলে এর মধ্যে বড় অংশই হলো কর ছাড় বা ঋণের অংশ। সরাসরি সরকারি কোষাগার থেকে যে ব্যয় ধরা হয়েছে, তা দেশের ২০১৯-২০ সালের জিডিপি'র ১.৩ শতাংশর মতো অর্থাৎ সঙ্কটের তুলনায় সরকারের ভূমিকা নগণ্য বললেই চলে। এ কথা ঠিক যে, বাজারে ঋণের জোগান বাড়ানোয় ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় শিল্পের চলতি পুঁজির প্রয়োজন মেটানোয় কিছু সুরাহা হবে। কিন্তু অর্থনীতির এই গভীর সঙ্কট থেকে উঠে আসার প্রথম আশু প্রয়োজন হলো, মানুষের ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা। বাজারে চাহিদা ফেরাতে পারলেই উৎপাদন পুরানো ছন্দে ফিরবে। সেই সঙ্গে মানুষ কাজ ফিরে পাবেন এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে। মুনাফার সম্ভাবনা স্বচ্ছ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনিয়োগও বাড়তে শুরু করবে। অতএব মানুষের পকেটে বা অ্যাকাউন্টে সরকারি টাকা পৌঁছানো দরকার। এ কথা শুধু বামপন্থীরা বলছে, তা নয়। বেশিরভাগ দেশই মূলত মানুষের চাহিদা ও আয়ের ন্যূনতম সুরক্ষা সুচিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। অনেকে বলবেন, কর আদায় কম হওয়ার কারণে সরকারের কোষাগারে এমনিই টানাটানি, সরকার সাধারণ মানুষকে টাকা দেবে কোথা থেকে? মনে রাখা দরকার, বাড়ির আয়-ব্যয় আর সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিপ্রকৃতি এক নয়। বাড়ির ক্ষেত্রে আয় করলে ব্যয় করা যায় এবং ব্যয় করলে ব্যবহৃত অর্থ বাড়ির পরিসর থেকে বেরিয়ে অন্যের হাতে চলে যায়। সরকারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। প্রথমত, যদি সরকারের আয় বাড়াতে হয়, তবে তা হয় করের মাধ্যমে আসতে হবে, না হয় কর-বহির্ভূত আয় অর্থাৎ সরকারি মালিকানা সংস্থার আয়ের থেকে আসতে হবে। মানুষ কর দেন আয়ের উপর, বিক্রির উপর বা উৎপাদনের উপর। এগুলি বাড়লেই সরকারের কর বাবদ আয় বাড়বে। আর এগুলি বাড়ানোর জন্য যদি ঘাটতি বাড়াতে হয় বা নোট ছাপতে হয়, তাতে কোনও বিশেষ ক্ষতি নেই। বরং অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়ায় যদি উৎপাদন, বিক্রি ও আয় বাড়তে থাকে, তবে তা থেকে সরকারের আয় বাস্তবে ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। মনে রাখা দরকার, এ ক্ষেত্রে কারও ব্যয় আসলে দেশের আর্থিক চৌহদ্দির মধ্যেই আরেক জনের আয়ের উৎস এবং মানুষের আয় বাড়লেই বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বাড়লেই সরকারের আয়ের উৎস প্রসারিত হবে। তা না হলে বাজারের সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজকর্ম যত স্তিমিত হয়ে আসবে, সরকারের কোষাগারে কর এবং অন্যান্য আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত ক্ষীণ হয়ে আসবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হলো, সরকারের আয় বাড়াতে গেলেও প্রথমত বাজারের চাহিদা বাড়ানো দরকার এবং সেই জন্য সরকারকে প্রাথমিকভাবে মানুষের পকেটে কিছু অর্থ পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের দেশের সরকার অবশ্য অন্য রাস্তা বেছে নিয়েছে এবং তা হলো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সম্পদ বিক্রি করা। সরকারের আয় বাড়ানোর এটাই হয়ে উঠেছে সহজ রাস্তা। এতে প্রথমত, বিপুল চাহিদার যে সঙ্কটে অর্থনীতি নিমজ্জিত, তার কোনও সুরাহা হবে না। দ্বিতীয়ত, মন্দার বাজারে যে কোনও সম্পদই বিক্রির জন্য ক্রেতা পাওয়া যায় না অথবা কম দামে তা বিক্রি করতে রাজি হতে হয়। ফলে যে বিপুল বিলগ্নিকরণের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে, তা আসলে দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের পরিপন্থী। দেশের স্বার্থ রক্ষা করা মানে শুধু দেশের ভৌগোলিক সীমানা সুরক্ষিত করা নয়– দেশের মানুষের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষা করা। ভারতবর্ষ মানে শুধু আদানি, আম্বানি ও গুটিকয়েক পুঁজিপতি নয়– দেশের আপামর জনগণ। তাঁদের গভীর সঙ্কটের সময়ে যথাযথ ভূমিকা পালন না করে দেশের সরকার শুধু 'ভগবানের হাত' বলে দায় এড়িয়ে যেতে চাইছে।

কাশ্মীরে মিডিয়াকে আক্রমণ হিসাব কষেই

অনুরাধা ভাসিন জামওয়াল

একটি সর্বগ্রাসী সরকারের মূল নিদর্শনই হলো সে তার নিজের জনগণকে নিয়ে আতঙ্কে ভোগে। সরকার জানে, মানুষের যুক্তি ও তর্কের ক্ষমতা তার কর্তৃত্বের পক্ষে চ্যালেঞ্জ, এটাই আতঙ্কের কারণ। তবে সচেতন নাগরিকরা আরও বড় চ্যালেঞ্জ। মতবিরোধ ও তথ্যের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা এবং নাগরিকদের উপর সম্পূর্ণ নজরদারি হলো সরকারের কর্তৃত্বের মাপকাঠি। উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান ভারত সরকার আপনাকে হতাশ করে না। আর কাশ্মীরে মুক্ত গণমাধ্যমের পরিসর ক্রমশই আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে, যদিও সর্বাপেক্ষা উদার ভারতীয় গণমাধ্যমগুলির বেশিরভাগই কাশ্মীরকে অতি-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখে এবং কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে রহস্যপূর্ণ নীরবতা বজায় রাখে অথবা অপরিণত সরকারি ভাষ্য প্রকাশ করে। কাশ্মীরের মধ্যে স্বাধীন মত প্রকাশ কেবল প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, তা নয়। মত প্রকাশকে অপরাধমূলক কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমকে দমন করা কিন্তু গত বছর ৫ আগস্ট শুরু হয়নি। সমস্যাগ্রস্ত এই অঞ্চল অতীতেও বিভিন্ন ধরনের সেন্সরশিপ বা বিধিনিষেধ ও ভয়ঙ্কর চাপের মুখে পড়েছিল। গত বছর যা শুরু হয়, তা ছিল আরেকটি পর্ব, যা সংবাদ মাধ্যমকে পুরোপুরি শীতঘুমে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের সময়ে অর্থাৎ আগস্টের ৫ তারিখে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। জম্মুর অর্ধেক অংশে ও লাদাখ অঞ্চলে আংশিক ইন্টারনেট পরিষেবা থাকলেও সম্পূর্ণ কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মু অঞ্চলের পাঁচটি মুসলিম নিবিড় জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন করা হয়। ৫ আগস্টের পরে ল্যান্ডলাইন ফোনগুলি তিন থেকে চার সপ্তাহ ধরে কাজ করছিল না। মোবাইল ফোন (পোস্ট পেইড) ১৩ অক্টোবর পুনরায় চালু করা হয়। ২০ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যাহত ছিল। তার ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা, কৃষি, হস্তশিল্প এবং বিশেষ করে মিডিয়ার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২০১০, ২০১৩, ২০১৬'র মতো আনুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও অত্যধিক লকডাউন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়ায় মিডিয়ার পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিছু সাংবাদিক এবং স্থানীয় সংবাদপত্র কিছু সাহসী প্রচেষ্টা চালালেও শ্রীনগর সিটি সেন্টারের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। শ্রীনগরের সাংবাদিকদের কাছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মিডিয়া সমাদর কেন্দ্রে (এমএফসি) ১০০-র বেশি সাংবাদিকের জন্য মাত্র ৫টি কম্পিউটার, শ্লথ গতির ইন্টারনেট এবং প্রত্যেকের জন্য মাত্র ১৫ মিনিট কাজ করার সুযোগ

ছাড়া বিকল্প কোনও উপায় ছিল না। ১৫ আগস্ট এই কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়। কাজের সুবিধা অপর্যাপ্ত ছিল। এটি সাংবাদিকদের পুরো কাজকে নজরদারির আওতায় নিয়ে এসেছিল, যা সাংবাদিকদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ৫ আগস্টের পর তৈরি হওয়া পরিস্থিতির কারণে তাঁরা আগে থেকেই একটা ভয়ের পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। বাইরে প্রায় শূন্য তাপমাত্রাতেও তাঁদের অফিসে এবং এমএফসি-তে যাতায়াত করতে হয়েছে প্রতিটি ছোটখাট তথ্য আপডেট করার জন্য। পুরো বিষয়টিই ছিল অতি অপমানজনক ও ক্রীতদাসতুল্য। এই শ্বাসরোধকর পরিস্থিতিতে কিছু সাংবাদিকদের মধ্য থেকে নীরব প্রতিবাদ ওঠে, যাঁরা এমএফসি'কে 'সাব-জেল' বলে অভিহিত করেন। কাশ্মীর প্রেস ক্লাব সহ কিছু পেশাদার সংগঠনও তাদের বিবৃতিতে এই পরিকাঠামোর সমালোচনা করে।

উপত্যকার অন্যান্য জেলার সাংবাদিকরা (অন্য কোনও এমএফসি না থাকায়) কিছুতেই কাজ করতে পারছিলেন না। কেউ কেউ লেখার জন্য মাঝেসাঝে শ্রীনগর যাচ্ছিলেন। জেলাগুলিতে কর্মরত সাংবাদিকদের অনেকেই নিয়মিত কর্মী ছিলেন না। ফলে তাঁরা কার্যত বেকার হয়ে পড়েন। স্থানীয় একটি সাপ্তাহিক 'কাশ্মীর লাইফ' পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাতারাতি বেকার হয়ে পড়ায় তাঁরা জীবিকার বিকল্প হিসাবে কেউ সেলসম্যান, কেউ বা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ বেছে নিয়েছেন। জম্মু অঞ্চলের পাঁচটি পার্বত্য জেলা রাজৌরি, পুঞ্চ, ডোডা, কিশতওয়ার ও রামবনে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত থাকায় অপারগ সাংবাদিকরা নিয়মিত লেখাও পাঠাতে পারেননি। তবে কেউ কেউ পুলিশ অফিসার ও প্রশাসনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্য পেতে সক্ষম হন।

জম্মু-কাশ্মীরের সমস্ত অংশের সাংবাদিক ও অন্যান্য মিডিয়া কর্মীরা যাতে তাঁদের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন, তার উপযুক্ত পরিবেশ সরকারকে তৈরি করতে হবে, এই নির্দেশ চেয়ে আমি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট আবেদন পেশ করি গত ১০ আগস্ট। আবেদনে বলা হয়, ইন্টারনেট এবং টেলিযোগাযোগ পরিষেবাগুলিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করার মাধ্যমে চাপানো নিষেধাজ্ঞা এবং সাংবাদিকদের চলাচলের উপর কঠোর প্রতিরোধগুলি অবিলম্বে শিথিল করা উচিত, যাতে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়। এর সঙ্গেই আবেদন বলা হয়েছিল যে, এই ধরনের বিধিনিষেধগুলির মাধ্যমে ভারতের সংবিধানের ১৪ ও ১৯ নম্বর ধারায় স্বীকৃত অধিকার এবং কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দাদের অবস্থা জানার যে অধিকার সাংবাদিকদের আছে, তাতেও বাধা দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ মাস দেরি করার পরে সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা করে। আদালত বলে, টেলিকম সাসপেনশন নিয়ম ২০১৭'র বিধি-২(২)'র জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত প্রতিটি আদেশকে যুক্তিসঙ্গত আদেশ হতে হবে। আদালত আরও বলে, কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে আদেশটি অনুমোদন করে থাকেন, তবে ওই অফিসারকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি 'অনিবার্য' পরিস্থিতিতে কেন তার আদেশ দেওয়া প্রয়োজন, তা জানাতে হবে। আদালত জানায় যে, মৌলিক অধিকারের যে কোনও কাটছাঁট আনুপাতিক হওয়া উচিত এবং সরকারের সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রণই করা উচিত। আদালত আরও নির্দেশ দেয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা অনুমতিযোগ্য নয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়ে বলে, পূর্ববর্তী পর্যালোচনার ৭ দিনের মধ্যে পর্যালোচনা কমিটির বৈঠক করতে হবে এবং টেলিগ্রাফ আইনের ধারা ৫(২)'র প্রয়োজনীয়তা ও আদেশের আনুপাতিকতা অনুসরণ করতে হবে।

এই রায় সম্পর্কে সরকারের প্রতিক্রিয়া অবশ্য যথেষ্ট নয়। পাক্ষিক পর্যালোচনাগুলির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এই বিধিনিষেধগুলি ধীরে ধীরে লাঘব করা হয়। প্রথমে শুধুমাত্র ১০০টি 'হোয়াইট লিস্টেড' সাইটগুলির সঙ্গে পরিষেবা শুরু হয়েছিল, যা পরে বাড়িয়ে ওয়ান এবং টুজি মোবাইল সংযোগে পরিণত করা হয়। ৪ মার্চ 'ফায়ারওয়াল'গুলি সরানো হয়। জম্মু অঞ্চলে প্রি-পেইড এবং পোস্ট পেইড উভয় মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রেই টুজি সংযোগ রয়েছে। কাশ্মীর অঞ্চলে কেবল পোস্ট পেইড মোবাইলগুলিতে টুজি সংযোগ রয়েছে। পরিষেবা সরবরাহকারীদের মতেও টুজি একটি পুরানো প্রযুক্তি। টুজি এতই ধীরে চলে যে, কাজ করা প্রায় অসম্ভব। এপ্রিলের পর থেকে তিন বার ইন্টারনেট সংযোগ এবং মোবাইল পরিষেবাগুলি আংশিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উগ্রপন্থার কয়েকটি ঘটনা ঘটার পরে, প্রতিবার প্রায় এক সপ্তাহের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনও কোনও জেলায় সপ্তাহে দু'বার এবং গোটা অঞ্চলে একবার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ধীর সংযোগের গতি তথ্যের প্রবাহকে বাধা দিচ্ছে। যদিও বেশিরভাগ স্থানীয় মিডিয়া অফিসগুলি ফিক্সড লাইন, ইন্টারনেট সংযোগের উপর নির্ভর করে, যা এখন চালু করা হলেও, প্রায়ই সংযোগে বিঘ্ন ঘটে থাকে। অপরদিকে মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ যা কার্যকর বিকল্প হয়ে উঠতে পারত, বাস্তবে তা খুবই অনির্ভরযোগ্য। এ ছাড়াও মাঠে-ময়দানে কাজ করা সাংবাদিকরা কার্যত যোগাযোগের বাইরে চলে গিয়েছেন। মিডিয়া অফিস এবং সাংবাদিকদের মধ্যে যোগাযোগের অবস্থা খুবই খারাপ। অনেক ফ্রিল্যান্সার, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে বেশিরভাগ মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগের উপর নির্ভর করেন, নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে তাঁদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে 'বাড়ি থেকে কাজ করা'-র সংস্কৃতিকে যখন বিশ্ব জুড়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, বহু কাশ্মীরি সাংবাদিক প্রায়শই তা করতে পারেন না।

কাশ্মীরের মিডিয়া তিন দশকের সংঘাতের সময়ে প্রবল চাপের মধ্যে কাজ করেছে। এর মধ্যে আছে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র বহির্ভূতদের দিক থেকে মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করার পদক্ষেপ, সেন্সরশিপ ও শারীরিক ভীতি প্রদর্শনের অভিনব পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জের সঙ্গে দরদস্তুর করা। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র এবং উগ্রপন্থী গোষ্ঠী উভয় পক্ষই সংবাদপত্রকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জেলে পোরা হয়েছে, শারীরিকভাবে আক্রমণ ও হত্যা করা হয়েছে।

বিবিধ বিজ্ঞাপনে নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতি এবং সীমিত বাজেট গত দশকে মিডিয়া হাউসগুলিকে খারাপভাবে প্রভাবিত করে, যা বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার শক্তি হ্রাস করে দিয়েছে। ৫ আগস্টের পরে বিপুল আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় বহু সংবাদপত্রই তাদের কর্মী ছাঁটাই করেছে। একটি পত্রিকা তো কর্মীদের বেতনও কমিয়ে দিয়েছে।

কাশ্মীরী সাংবাদিককে ক্রমাগত শারীরিক হুমকির সঙ্গেও যুঝতে হচ্ছে। কোনও শূন্যতায় তথ্য নীরব হয়ে যায় না বা কোনও শূন্যস্থানে তথ্যের নীরবতার উদ্ভব হয় না। স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ভীতি বা আতঙ্কের বিস্তৃত পরিধির সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত। এই আতঙ্কের মূলে রয়েছে সরকারের প্রবল পরাক্রমী ক্ষমতার দাপট। এই ক্ষমতার জোরে সরকার যে কাউকে কোনও অভিযোগ ছাড়াই আটক করতে পারে। এই ক্ষমতার জোরেই সরকার রাষ্ট্রের মদতহীন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে আটক করতে পারে, যারা পোস্টার লাগিয়ে হুমকি দেয় বা অসহায় সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে বন্দুক ব্যবহার করে। বাস্তবে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা অনেক বেশি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন, সহজ আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছেন এবং দিন দিন এই সমস্যা আরও গভীর হচ্ছে।

৫ আগস্টের আশপাশের সময়ে একটি ওয়েব পোর্টালের সম্পাদক কাজী সিবলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'গ্রেটার কাশ্মীর'-এর সঙ্গে যুক্ত আরেক সাংবাদিক ইরফানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বেশ কিছু দিন পর তাঁকে ছাড়া হয়। বহু সাংবাদিককে মারধর করা হয়েছে, ভিডিও ফুটেজ এবং ক্যামেরাম্যানদের ছবি মুছে ফেলা হয়েছে। দু'ডজনেরও বেশি সাংবাদিককে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে কার্যত ভয়াবহ মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে।

মহামারীর লকডাউন শুরুর কয়েক সপ্তাহ পর ২০ ও ২১ এপ্রিল বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও ভাষ্যকার গওহর গিলানি, চিত্রসাংবাদিক মাসারাত জহরা ও আশিক পীরজাদার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। গিলানি ও জহরার বিরুদ্ধে তাঁদের ফেসবুক পোস্টের জন্য সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ইউএপিএ'র ধারায় মামলা করা হয়, যদিও মামলায় বিশেষ কোনও পোস্টের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ২০ এপ্রিল, 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার শ্রীনগরের সংবাদদাতা পীরজাদা আশিকের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ করেছিল যে, তাঁর প্রতিবেদনে 'তথ্যগত ভুল' আছে, যা 'জনগণের মনে ভয় বা উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে'। এমন সংবাদ প্রচারের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। তবে কোন আইন লঙ্ঘনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল, তার কোনও উল্লেখ করা হয়নি।

এরপরে জুন ও জুলাই মাসে 'কাশ্মীরওয়ালা'র সম্পাদক ফাহাদ শাহকে দু'বার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ তলব করে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে। শ্রীনগরে একটি এনকাউন্টার চলাকালীন ১৫টি বাড়ি ধ্বংস করার বিষয়ে তাঁর প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে এই জিজ্ঞাসাবাদ।

এই সবকটি মামলাই একটি নতুন মিডিয়া নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেখানে সেন্সরশিপের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই ফুটে উঠেছিল সরকারের কাজে, যদিও নীতিটি দুই মাস পরে জুনে ঘোষণা করা হলো। সরকারি নীতিটি কার্যকর হওয়ার আগেই ইতিমধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যা মিডিয়ার উপর গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলে এবং মিডিয়াকে এক নিশ্চল অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

পঞ্চাশ পৃষ্ঠার এই 'অরওয়েলিয়ান' নীতিতে তিনটি প্রধান বিষয় রয়েছে। ১) সরকার খবরের বিষয়বস্তু পরীক্ষা করে দেখার অধিকার দিচ্ছে, যেগুলিকে 'ভুয়ো', 'চুরি করা', 'অনৈতিক' এবং 'দেশবিরোধী কার্যকলাপ' বলে ভাগ করা যাবে। সেই মোতাবেক যারা এই অপরাধ করবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। ২) সরকার সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মিডিয়া চ্যানেলে প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত বিষয়গুলির উপরে নজর রাখবে এবং তা রমধ্যে কোনটা 'ভুয়ো খবর', কোনটা 'অসামাজিক' বা 'দেশবিরোধী' রিপোর্টিং, তা স্থির করবে। 'ভুয়ো অনৈতিক ও দেশবিরোধী' প্রতিবেদনের সঙ্গে জড়িত সংবাদ সংস্থাগুলি যে কেবল আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হবে, তা নয়। তারা সরকারি বিজ্ঞাপনও পাবে না। ৩) সংবাদপত্রের প্রকাশক, সম্পাদক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের প্রেক্ষাপট বাধ্যতামূলকভাবে যাচাই করে তবেই সরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে। একজন সাংবাদিককে স্বীকৃতি দেওয়ার আগেও সুরক্ষা ছাড়পত্র ছাড়াও এইগুলি বিবেচনায় রাখা হবে।

কার্যত এর অর্থ হলো এই যে, লিখিত প্রতিটি শব্দ এবং কলামের সত্যতার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে। জম্মু এবং কাশ্মীর সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগের আমলারা বিচারক, জুরি ও নিষ্পত্তিকারী হয়ে উঠবেন কেবলমাত্র যোগ্য সংবাদ এবং সাংবাদিকদের পটভূমি যাচাইয়ের জন্যই নয়, তাঁদের ধারণায় যে সব সাংবাদিক বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার ক্ষমতাও এই আমলাদের থাকবে। যদি এই মিডিয়া নথিটি ভারতীয় সংবিধানের মর্মবস্তু এবং সংবিধানে স্বীকৃত মত প্রকাশের অধিকারকে লঙ্ঘন করে নিজেই আইনি বাইবেল হয়ে ওঠে, তবে মিডিয়া ব্যক্তিরা হয় আত্মসমর্পণ করে রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্রের সওয়ারিতে পরিণত হবেন, নতুবা নিপীড়িত হয়েও রাষ্ট্রযন্ত্রের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন– যাকে 'ভুয়ো খবর', 'চুরি করা' এবং 'দেশবিরোধী' বলে চিহ্নিত করা হতে পারে, যা কিছু এবং সব কিছু বলা হতে পারে।

এই মিডিয়া নীতিকে ন্যায্য বলে দাবি করতে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা আর সন্ত্রাসবাদের যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। তবে যা পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে এই নীতি, সেই নির্ধারিত লক্ষ্যের সঙ্গে এই নীতির বড়ই অমিল। দলিল অনুসারে, এর মতলবটাই হলো 'মিডিয়াতে সরকারের কাজকর্মের একটা ধারাবাহিক আখ্যান' তুলে ধরা এবং 'মিডিয়াতে সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ মানের' প্রচার এবং 'সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ মান' তুলে ধরা। এটা স্পষ্টতই সেই প্রতিটি সাংবাদিককে অবৈধ এবং এমনকী অপরাধী বানানোর ধারণা, যাঁরা সরকারের অস্তিত্ব রয়েছে এমন এবং অস্তিত্বহীন কৃতিত্বের 'তুলে ধরা আখ্যান'-এর পর্দা ফাঁস করার চেষ্টা চালাচ্ছেন শাসকের কাজকর্মের দোষত্রুটি বা ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে কুৎসিত সত্যটাকে তুলে ধরে।

বাস্তবে সরকার সাংবাদিকতাকে সরকারের জনসংযোগ বিভাগের একটি সম্প্রসারিত শাখায় পরিণত করতে চায় এবং তাকে 'সর্বোচ্চ মান' হিসাবে প্রমাণ করতে চায়। স্বাধীন গণমাধ্যমই সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে এবং ক্ষমতার সামনেও সত্য কথা বলে। সরকারকে জবাবদিহি করার জন্য কঠিন প্রশ্ন করে, যা গণতন্ত্রে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের মূল বৈশিষ্ট্য। এখন সহজেই তাকে একপাশে ফেলে দেওয়া যায় এবং কবরে পাঠানো যেতে পারে। কফিনের শেষ পেরেকটি হলো এই মিডিয়া নীতি।

(লেখিকা 'কাশ্মীর টাইমস'-এর এক্সিকিউটিভ এডিটর)

অনুবাদ: শুভজিৎ দাস

চেনা ঘরের পথে পথে

এজাজ আহমদ রাথর

প্রায় সাড়ে তিন বছর পর, গত আগস্টের ২০ তারিখে আমি এই মহামারীর মধ্যেই কাশ্মীর যাই। বিকেলের দিকে শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছে বাধ্যতামূলক কোভিড পরীক্ষা করাতে হয়। টেস্টের ফলাফল আসা পর্যন্ত এক দিন শ্রীনগরে কোয়ারান্টিনেই থাকতে হয়। কোভিড রিপোর্ট স্বাভাবিক আসায় আমি আরও একটা দিন শ্রীনগরেই থেকে যাই আর শহরটাকে একটু ঘুরে দেখি। এই মহামারীর সময়ে শহরটাকে দেখে পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। খুব কম লোকজন হাঁটাচলা করছেন, যানবাহনও চলাচল করছিল অনেক কম।

প্রায় তিন বছরের বেশি সময় পর যখন এই যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করছিলাম, তখন খুব কৌতূহলী ছিলাম এত কিছু যা ঘটেছে, তা নিজের চোখে দেখার জন্য। পরিবারের থেকে দীর্ঘ সময় আলাদা থাকার ফলে এবং কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার অবলুপ্তির পর কী কী ঘটছে, তা বিশ্লেষণ করতে পারব– এটা ভেবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। খোলসা করে বললে, আমি যখন শ্রীগরের রাস্তায় গেলাম, তখন খুব কম সংখ্যক মানুষকেই নিজেদের রোজকার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। বিকেলের দিকে আমি শ্রীগরের কয়েক জন বন্ধুকে ফোন করলাম, যাঁরা একসময়ে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিল।

ডাল লেকের ধারে হজরতবালের কাছে তকদির পার্ক বলে এক জায়গায় আমরা দেখা করব ঠিক করলাম। শুরুর দিকে এলোমেলো বিষয় নিয়েই কথা চলছিল। কিন্তু এরপর আলোচনা যত এগিয়েছে, আমরা ক্রমেই রাজনীতি এবং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে শুরু করি। তবে অধিকাংশ বন্ধুই এই বিষয়ে কোনও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতেই নিরুৎসাহী ছিল বা ওরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই বিষয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছিল।

যা-ই হোক, বন্ধুদের অধিকাংশেরই ৫ আগস্ট সম্পর্কে মূলত একটাই মতামত, ভারত রাষ্ট্র আমাদের পণ্যে পরিণত করেছে আর নিজেদের ক্ষমতাবলে আমাদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়েছে। এত কিছু বললেও আশপাশে কী ঘটছে, সেই সম্পর্কে ওদের যেন কোনও পরোয়া নেই। মোদ্দা কথা যা বলতে চাইল, যত দিন না কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হচ্ছে, তত দিন এখানে এই সংঘাতেরও শেষ হবে না।

পরের দিন সকালে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে আমার বাড়ির দিকে রওনা হই। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করি, কীভাবে হাইওয়েগুলিতে

আধাসামরিক বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সেনাদের যাওয়া-আসার সময়ে কোনও জায়গাতেই কোনওরকম তল্লাশি হচ্ছিল না, তবে সব সাধারণ গাড়িগুলিকে আটকে রাখা হয়েছিল।

বর্ষার এই সময়ে কাশ্মীরে মাঠ জুড়ে সবুজের সমারোহ। লক্ষ্য করলাম, সবুজ হয়ে উঠেছে ধানের খেত আর আপেলের বাগান। বৃষ্টি ছিল না একদমই। বছরের এই সময়টা খুব আকর্ষণীয় হয় কাশ্মীরে, তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রির উপরে ওঠে না বলে প্রচুর পর্যটক আসেন। কিন্তু কাশ্মীরে নানা মহামারীর কারণে এই বার কচ্চিৎ কোনও পর্যটক দেখতে পেলাম। এই সময়ে কাশ্মীরীরাও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতে, সময় কাটাতে পছন্দ করেন। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য প্রতিটি ট্যুরিস্ট স্পটই ফাঁকা ফাঁকা ছিল।

দীর্ঘ তিন বছর পরে বাড়িতে আসায় সব কিছুই কেমন আবেগঘন হয়ে পড়েছিল। আমার মা-বাবা চোখভরা জল নিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করলেন। আমি প্রায় এক সপ্তাহ বাড়িতেই কাটাই, এই সময়ে অনেক নিকটাত্মীয় আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। পরের সপ্তাহটা ছিলাম দক্ষিণ কাশ্মীরেই আমার দুই বোনের শ্বশুরবাড়িতে। এক জন রাজনৈতিক কর্মী হওয়ায় কাশ্মীরের এই অনিশ্চিত-অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর উপায় ছিল না আমার। কিন্তু হেলমেট পরে বাইকে করে কিছুটা ঘোরাঘুরি করতে পেরেছি, আবার কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে কথাও বলতে পেরেছি।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়ে একটা মূল বিষয় আমি যা খেয়াল করছিলাম, তা হলো তাঁদের রাগ এবং রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। যদিও তাঁরা সবাই রাজনৈতিক, কিন্তু রাজনীতিতে একজন মৃতের সমান এরকম আচরণ করছিলেন। একজন বয়স্ক মানুষ আমায় বললেন যে, ‘‘আমরা তোমায় চিনি, আর কাশ্মীরে এখন রাজনীতিতে কোনও ভবিষ্যৎ নেই।’’ মুখে হাসি ছড়িয়েই আমি বললাম, ‘‘আমি বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, নির্বাচনের জন্য আসিনি।’’ উনি পালটা হাসলেন এবং আমার সারা মাথায় হাত বোলালেন আর অনেক আশীর্বাদ করলেন।

আরও কিছু উচ্চশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন আরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতামত লক্ষ্য করলাম। এঁদের মধ্যে কিছু মানুষ সওয়াল করলেন, কাশ্মীরে রাজনৈতিক স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য দ্রুত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। যা-ই হোক, কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন, ৫ আগস্ট তাঁদের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা ক্ষমার অযোগ্য। তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলার সময়ে কাশ্মীরের ডিজিটাল বর্ণবাদ সম্পর্কে খোঁজ করতে গিয়ে তাদের ক্ষোভ বুঝতে পারলাম। ক্রুদ্ধভাবে এক তরুণ আমায় বলল, ‘‘আমাদের এই সেল ফোনগুলোর আর কোনও দরকারই পড়ে না। ভারত এগুলোও ফেরত নিয়ে নিক।’’

দক্ষিণ কাশ্মীরে আট বছর বয়সী ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে খেলার সময়ে সে আমায় আচমকাই একটা প্রশ্ন করল, ‘‘তুমি কাকে বেশি পছন্দ কর, সেনা না উগ্রপন্থী?’’ এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে গেলাম। বললাম, ‘‘আমি পড়তে বেশি ভালোবাসি।’’ ভীষণ কঠিন সময় এবং জটিল পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আমি ৬ আগস্ট কাশ্মীর ছেড়ে বেরিয়ে আসি এবং জম্মু যাই।

এই সফরে আমি যেটা লক্ষ্য করলাম, কাশ্মীর নিয়ে কতগুলি সাধারণ প্রশ্ন, বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তা। এরকম আন্তর্জাতিক মহামারীর সময়েও নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করা, সংবাদ মাধ্যমকে দমিয়ে রাখা এবং মানুষের গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক অধিকারকে দমন করার অন্ত নেই। আমি প্রত্যক্ষ করেছি অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা প্রান্তিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষরা সহ্য করছেন। দেখেছি শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে হতাশা। অনুভব করেছি, ফসল ভালো না হওয়ার জন্য ভালো দাম না পাওয়া কৃষক এবং আপেল উৎপাদকদরা ক্রমশ দুরবস্থার জালে জড়িয়ে গিয়েছেন। অধিকাংশ আপেল উৎপাদকেরই অভিযোগ, ‘‘গত কয়েক বছর ধরে আমরা উপত্যকায় নকল কীটনাশক আসতে

দেখছি'', যা খারাপ আপেল ফলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

কাশ্মীরের অর্থনীতি এবং জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ ছাড়াও স্কুলের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা সাধারণভাবে আরেকটি দুঃখজনক ট্র্যাজেডি। ৫ আগস্টের পর সাধারণভাবে কাশ্মীরের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। যদিও অনলাইন ক্লাসের চল ওখানেও আছে, কিন্তু টুজি ইন্টারনেট স্পিড কাশ্মীরে অনলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে একেবারে অযোগ্য। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের গরিমাকে রীতিমতো অপমান করার মতোই।

আরেকটি বিষয় যা আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী সবথেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছে, তা হলো জনস্বাস্থ্য। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে হাসপাতালগুলির অবস্থা দুর্বিষহ। প্রায় প্রতিটি হাসপাতালেই ডাক্তারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এইরকম দ্রুত সংক্রামক কোভিড রোগীদের পরিচর্যার জন্য এই সমগ্র উপত্যকায় মাত্র ৯৭টি ভেন্টিলেটর রয়েছে। কোভিড লকডাউনের সময়ে চিকিৎসাগত অবহেলার জন্য অনেক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। আমার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবরা এরকম অনেক ঘটনার কথা বলেছে, যেগুলি ভীষণ পীড়াদায়ক। আসলে গত বছরের ৫ আগস্ট রাষ্ট্র এরকম জবরদস্তি 'লকডাউন' কাশ্মীরে চাপিয়ে দেওয়ার পর এমন ঘটনা একাধিক মুদ্রণ মাধ্যমের নজর টেনেছে, এমনকী সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও।

গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে কাশ্মীরের অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মীকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পরে আমি কয়েক জন মুক্তি পাওয়া রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ওঁরা জেলে ছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার সময় বুঝতে পারি যে, ওঁরা স্থায়ী আঘাত পেয়েছেন এবং কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই চিন্তিত। ওঁরা তখনও বিস্মিত ওঁদের গ্রেপ্তারি নিয়ে। ভারতীয় রাষ্ট্র ওঁদের যে অপমান করেছে, ওঁরা তার কারণ খুঁজছেন।

নজিরবিহীনভাবে গুজবের মাধ্যমে কাশ্মীরের রাজনৈতিক উত্থানপতনও লক্ষ্য করি। সেখানে ভবিষ্যতে কী হবে, সে সম্পর্কে একজন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যেকে ভাবছেন, দেখছেন এবং খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য রাখছেন। আরও স্পষ্ট করে বললে, কাশ্মীরীরা রাজনৈতিক নেতাদের থেকেও অনেক বেশি বুদ্ধিমানের মতো আচরণ করছেন। যে কোনও রাজনৈতিক আলোচনায় প্রত্যেকেই কোনও রাজনৈতিক দলের পথে না গিয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করছেন। প্রত্যেকে ভীষণরকম রাজনৈতিক হয়েও অরাজনৈতিক আচরণ করছেন।

এই রাজ্যের উপর মোদীর মিলিটারি নীতি এবং হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের মানুষ কোনওরকম ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়েছে। ৩৭০ নম্বর ধারা বিলোপের ফলে কাশ্মীরের উন্নতি এবং সমৃদ্ধি হবে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, ওঁরা তারও বিরোধী। দেখলাম, এক সময়ের সমৃদ্ধ কাশ্মীর কীভাবে দারিদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এই তালাবন্ধ হয়ে থাকা উপত্যকায় স্থানীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগুলিও ভেঙে যাচ্ছে। মানুষ ভয়ে ভয়ে থাকছেন এবং কোনওরকম স্থানীয় ব্যবসায় নিয়োগ করা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখানে তাঁদের বিনিয়োগের কোনও নিরাপত্তা নেই। বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে, যা কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে উঠেও এসেছে।

কাশ্মীরে একটানা ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে রাখায় এবং দীর্ঘ সময় সাইবারকেন্দ্রিক অচলাবস্থা চলায় অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। ৩৭০ নম্বর ধারা রদ এবং জনচরিত্র পরিবর্তনের দিক থেকে দেখলে কাশ্মীরের সব কিছুকেই কেমন যেন ইতিহাসে পরিণত করা হয়েছে। এই দুঃস্বপ্নের কোনও অন্ত নেই বলেই মনে হয়। হিন্দুত্ব এবং গণতন্ত্রের উপর সংখ্যাগুরুবাদের আক্রমণের ফলে কাশ্মীর একবিংশ শতাব্দীর সবথেকে বড় মানব বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে।

অনুবাদ: প্রশান্ত দাস

নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ আসলে কী

সুরজিৎ মজুমদার

মহামারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অর্থনীতি টালমাটাল, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কয়েক মাস ধরে বন্ধ এবং দেশের সংসদ বসছে না। ঠিক এই অবস্থায়, এমন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যখন সরকারের মনোযোগে থাকার কথা তখনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি মনে করেছে। ২৯ জুলাই, ২০২০ সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রীসভা। গত কয়েকমাস ধরে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। একদিকে মোদী সরকার মহামারী মোকাবিলায় চরম ব্যর্থ। আরেকদিকে, মহামারীর সঙ্কটকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার জেদ ধরে রয়েছে এই সরকার। নয়া শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করার সিদ্ধান্ত এই প্রবণতার আরেকটি উদাহরণ।

নয়া শিক্ষানীতির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৮৬-তে শেষবার জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছিল। তারপর, বিশেষ করে, ১৯৯১-এ অর্থনৈতিক ‘সংস্কার’ নীতি নেওয়ার পর আয় এবং সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য সমানে বেড়ে চলেছে। এই নীতিতে সবচেয়ে সুবিধা পেয়েছে জনসংখ্যার ওপরতলার ১০ শতাংশ এবং কর্পোরেট ক্ষেত্র। মোটা বেতনের অতি অল্প কিছু চাকরি ছাড়া কাজের সুযোগ বেড়েছে সামান্যই। কৃষিতে গভীর সঙ্কট তৈরি হয়েছে। যার ফল হয়েছে ব্যাপক মাত্রায় বেকারি, সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ না পাওয়া এবং শ্রমের বিনিময়ে খুবই কম আয়। এই অবস্থার জন্যই আবার ওপরতলার আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে। বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়ের জন্য কর আদায়ের নীতি নিয়ে চলেনি কোনও সরকারই। ফলে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) এবং করের অনুপাত কমই থেকেছে, তিন দশক ধরে জিডিপি’র অংশ হিসাবে সরকারি ব্যয় থেমে রয়েছে এক জায়গায়।

বৃদ্ধির এই পথ শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের

সাফল্যের ফাঁদে আটকে পড়েছে। বৈষম্য বৃদ্ধির কারণে চাহিদার স্তর কমে গিয়েছে, ধারাবাহিক বৃদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন। প্রায় এক দশক ধরে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা তার একটি লক্ষণ। নোটবাতিল এবং পণ্য ও পরিষেবা করের কারণে গত কয়েক বছর বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক অধোগতি হয়ে চলেছে। মহামারী নিয়ন্ত্রণে অপদার্থতা এবং তার অর্থনৈতিক প্রভাব সঙ্কটকে আরও গভীর করেছে।

স্পষ্ট ধরা পড়েছে যে ভারতে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী গণতন্ত্রের আড়ালে দেশের সম্পদের ওপর মালিকদের মুঠি আরও পোক্ত হয়েছে। যেহেতু তাদের সঙ্কট বেড়েছে শক্তির ভারসাম্য নিজেদের পক্ষে আরও বেশি পরিবর্তনের দরকারও হয়ে পড়েছে। যাতে আরও বেশি মুনাফা নিশ্চিত করার মতো বিনিয়োগের ক্ষেত্র খোলা যায়, যাতে শ্রমজীবীর আরও নিবিড় শোষণ অবাধ হয় এবং যাতে করছাড়ের আরও বেশি সুবিধা আদায় করে সরকারি ব্যয়ের সম্ভাবনা আরও কমানো যায়। কর্তৃত্ববাদের আওতা সমানে বাড়িয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিসর শূন্যের দিকে ঠেলে দেওয়া, সেই সুযোগে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়িয়ে চলা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ সহজ করে দিচ্ছে। সেই কারণে মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি এখন ভারতের আর্থিক এবং সামাজিক প্রতিপত্তিবান অংশের মুখ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। কিন্তু এমন রাজনৈতিক সাফল্য যে ‘সমাধান’ এনেছে তার সরাসরি ফলাফল অর্থনৈতিক সঙ্কট।

ভারতে শিক্ষার পরিবর্তনশীল চিত্র

গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক পথ একটি দ্বৈত প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে যার ফলে ভারতে শিক্ষার রূপান্তরে নানা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। একদিকে শিক্ষার সামাজিক চাহিদা বাড়ছে, ছাত্র ভর্তির হার বাড়ছে সব স্তরে। ‘ভালো’ শিক্ষার জন্য খরচ করার প্রবণতা বেড়েছে, এমনকি তার জন্য অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ঋণ সরকার হলেও নিতে দেখা যাচ্ছে সমাজের সব অংশকে। মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশের কাছে শিক্ষার সঙ্গে উঁচু মাইনের চাকরির প্রলোভন যুক্ত রয়েছে। ঋণ পাওয়ার সুযোগও থাকছে। আর্থিক এবং সামাজিক বিচারে বঞ্চিত অংশের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির আশায়। শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি। বেসরকারি বিনিয়োগের কাছে শিক্ষা মুনাফার আকর্ষণীয় জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৪৫ শতাংশ বা তার বেশি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। কলেজের ক্ষেত্রে, সহায়তাপ্রাপ্ত নয় এমন বেসরকারি কলেজে ৪৫.২ শতাংশ এবং সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজে ২১.২ শতাংশ পড়ছে। পেশাদারি কোর্সে স্নাতক স্তরে ৭২.৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সহায়তাপ্রাপ্ত নয় এমন বেসরকারি কলেজে পড়ছে। স্নাতকোত্তরে এই হার ৬০.৬ শতাংশ। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির হার ৫৫ শতাংশ। পরের সবচেয়ে বড় অংশ, ৩৩ শতাংশ, ভর্তি হয়েছে কেন্দ্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে নয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের রমরমা, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানেও বেতনবৃদ্ধি এবং বেসরকারি টিউশন ও কোচিং শিল্পের ফুলেফেঁপে ওঠা– এ সবই বেসরকারিকরণের ফলাফল। শিক্ষার খাতে যে কারণে গড় খরচ বেড়েই চলেছে প্রতি পরিবারে। বৈষম্য বাড়ানোর পক্ষে যার ভূমিকা রয়েছে। সমাজের একেবারে সাধারণ অংশের পক্ষে স্বচ্ছলদের মতো একই মানের শিক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এমনকি বেসরকারি ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিভাজন বজায় রয়েছে। এর অন্য দিকটি হলো, যাদের পক্ষে শিক্ষার জন্য মোটা টাকা খরচ করা সম্ভব তেমন বাড়ির ছেলেমেয়েরাই ভালো আয়ের সীমিত চাকরির সুযোগ পাচ্ছে বেশি। বেসরকারিকরণ আসলে প্রতিক্রিয়াশীল কর ব্যবস্থা কায়েম করে রেখেছে, যার কম আয় তাকেই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রোজগারের অনুপাতে শিক্ষার পিছনে খরচ করতে হচ্ছে বেশি। এই দ্বন্দ্ব আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক বৃত্তে ছাত্র বিক্ষোভও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমন বিক্ষোভ বারবার রাষ্ট্রের রোষের মুখেও পড়ছে।

নয়া শিক্ষানীতি ২০২০: আসল মতলব

দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নয়া শিক্ষানীতিতে কয়েকটি বক্তব্য স্পষ্ট : ১. বিশ্বের ভবিষ্যৎ হলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। মানুষ নিযুক্ত এমন কায়িক শ্রমের বিপুল অংশের কাজ সারবে যন্ত্র। ২. ভারতের লক্ষ্য এই বিপ্লবে অংশ নিয়ে জ্ঞানের জগতে ‘বিশ্বগুরু’ হওয়া, অতীতে ভারতীয় সভ্যতা যা ছিল। ৩. ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই ‘সৃজনশীল’ শ্রমশক্তি তৈরি করতে হবে যা ভবিষ্যতে সীমিত কাজের সুযোগ পাবে (বাকিদের যদিও কোনওরকম ‘কর্মমুখী’ শিক্ষার জন্য তৈরি করা যেতে পারে)। ৪. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রেরণা থেকে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। সেই সময়ের বহুমুখী এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দর্শন আত্মস্থ করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জ্ঞানের সিন্দুক খুলে লালিত হবে ভারতীয় মূল্যবোধের ঐতিহ্য যা চিরায়ত সত্যের পথ দেখাবে। নয়া শিক্ষানীতি এই অবৈজ্ঞানিক, সংরক্ষণশীল, পুনরুজ্জীবনবাদী এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রয়োগের সেই কাঠামো গড়ে তুলবে। তার অংশ হবে জ্ঞান এবং দক্ষতাবৃদ্ধি সম্পর্কে অতি সঙ্কীর্ণ বোঝাপড়া। অতীত অনুসরণ করে বৌদ্ধিক বিকাশ খুবই অল্প একটি অংশের জন্য সংরক্ষণ করতে চাওয়া হচ্ছে। স্বৈরাচারী শাসনকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা সুনিশ্চিত করা হবে। অবশ্য এ সবই আনা হবে আধুনিকতার মোড়কে সাজিয়ে এবং তার ভিত্তি হবে সমসাময়িক ব্যক্তিগত মুনাফা নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

মুখে এই শিক্ষানীতি জিডিপি’র ৬ শতাংশ সরকারি ব্যয়ের কথা বলেছে। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। গত ৫০ বছর ধরে এই লক্ষ্যের ঘোষণা কেবল কাগজেই রয়ে গিয়েছে। প্রস্তাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে এমনভাবে যাতে মনে হয় যেন সরকার শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করছে অথচ সরকারি ব্যয়ের কোনও উল্লেখযোগ্য খরচের কথাই নেই। যেমন, স্কুলে হাজির হতে পারে না এমন শিশুদের জন্য মুক্ত বিদ্যালয়, স্কুলের সংখ্যা সঙ্গত স্তরে বেঁধে কমপ্লেক্স গড়া, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ওপর চাপ বাড়িয়ে শিশুর যত্ন প্রকল্প চালু, দূরবর্তী শিক্ষা এবং অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি বাড়ানো।

শিক্ষানীতির আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষার সব স্তরে বেসরকারি সংস্থাকে ডেকে আনার খোলাখুলি সওয়াল চালানো। শিক্ষায় বেসরকারি জনহিতকর উদ্যোগে উৎসাহের কথা বলা হয়েছে। ঠিক সে জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ন্যূনতম যোগ্যতাবিধি

সহজ করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ যুক্ত সব প্রতিষ্ঠান নিজেদের 'মুনাফার জন্য নয়' দেখিয়ে থাকে। লুকিয়ে ফেলা হয়েছে এই বাস্তবতা। এমন সব শর্ত দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে যাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে 'খরচ তোলার সঙ্গত' সুযোগ পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বশাসনের ধারণাটি এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মাইনের মতো আর্থিক গুরুত্বের সব বিষয়েই বিনিয়ন্ত্রণ করা যায়। উচ্চশিক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের প্রতিটি স্তরে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাজার থেকে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতিদান নিশ্চিত করার জন্য। প্রতিটি স্তরের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাপণ্য তৈরি হবে সেই বাজারে যেখানে ক্রেতাদের খরচ করার সামর্থ্যে ফারাকই হলো বৈশিষ্ট্য। অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্কের কথা বলা হয়েছে যেখানে কোর্সের একেকটি অংশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগত আয় জমা রাখা হবে। পরের অংশের যোগ্যতা অর্জনে জন্য খরচ জোটাতে হবে তাদের। ধাঁধা তৈরি করা হয়েছে যেন পড়ার মাঝে সরে যাওয়া 'ড্রপ আউট' নয়, তার শিক্ষায় কোনও প্রভাবই পড়বে না।

আরও বেসরকারিকরণের ওপর নির্ভরশীল শিক্ষাব্যবস্থা, বেসরকারি সংস্থার আরও অবাধ প্রবেশ, শিক্ষায় কেন্দ্রীকরণ আরও বাড়ানো এবং সরকারি-বেসরকারি সর্বত্র অধুনা ক্ষমতাসীনদের মতাদর্শের অনুগামী পাঠক্রম। সত্যিই তো, এমনকি শিক্ষায় বেসরকারি 'জনহিতকর' বিনিয়োগও কেবল তাদেরই মতাদর্শ অনুসরণ করবে যারা বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। উচ্চশিক্ষায় 'হালকা কিন্তু কড়া' নিয়ন্ত্রণবিধি একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারকে খরচের দায় থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো যেখানে কেবল প্রশাসকমণ্ডলীর 'স্বশাসন' থাকবে। যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অধিকার পুরোপুরি কেড়ে নেওয়া যায়। ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, প্রত্যেক অংশের যৌথ প্রতিরোধ দুর্বল করে দেওয়া যায়। এই নিয়ন্ত্রণের অভিমুখ কী পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শিক্ষানীতির বয়ান থেকেই। বলা হয়েছে ঐতিহ্যশালী মূল্যবোধ বা সেই চিন্তার বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হবে যা মনে করে ভারতের বৈচিত্র্যময় সব ভাষা এবং সংস্কৃতির ভিত্তি রয়েছে প্রাচীন অতীতে।

এই শিক্ষানীতি যে শাসনের ফসল তারা অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলায় আরও বেসরকারিকরণে দায়বদ্ধ। বাড়ানোর বদলে সরকারি ব্যয় সঙ্কোচনের প্রক্রিয়া আরও তীব্র করেছে এই সঙ্কট। ভারতীয় জনগণের স্বার্থ এবং অধিকার দৃঢ় করতে পারে এমন একটি জনশিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার এই শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক। তার বদলে এমন সব সম্ভাবনা দুর্বল করাই এই শাসনের সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রসারের পক্ষে সুবিধাজনক। এই শিক্ষানীতি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নীল নকশা, এমন ঘোষণা এই শাসনের লক্ষ্যের সঙ্গে পুরোপুরিই সাযুজ্যপূর্ণ। ভাষণে বিভ্রান্ত হতে পারেন যাঁরা, নিশ্চিত যে বিজেপি'র শাসনে শিক্ষার অবস্থা দেখলে তাঁরাও নয়া শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।

মহামারী কাহন

সুপর্ণা দেব

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ইতিহাস একটি জম্পেশ ব্যাপার। বিষয় না বলে ব্যাপার বললে মনের ভাবটি যেন ভালো করে বোঝানো যায়। কী নেই এতে! দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, রোগ-আধি-ব্যাধি। তাই ইতিহাসের পথে হাঁটলে যে কোনো বিষয় ভালো নজরে আসে। আমাদের লম্ফঝম্প কমে। আমরা সেই আবহমানতার আলোকে নিজেদের অবস্থান বুঝতে শিখি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের থেকে বড় শিক্ষক আর হয় না। করোনা ভাইরাস আতঙ্কে দিনাতিপাত করতে করতে একবার কাঁপা কাঁপা হাতে রোগ-ব্যাধির পাতা উলটাই চলুন।

দেশের সীমা ছাড়িয়ে গেলে মহামারী হয়ে যায় অতিমারী। যেমন এখন হচ্ছে। মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতো, তখন কি আর অসুখ হতো না? নিশ্চয়ই হতো। কিন্তু সম্ভবত ভ্রাম্যমাণ সদা চরিষ্ণু যাযাবর মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে থাকার জন্য হয়তো তার প্রকোপ মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারত না।

কিন্তু যত মানুষ থিতু হয়ে বসেছে, যত বেড়েছে তার যূথবদ্ধতা এবং মেলামেশা, ততই এসেছে রোগ-ব্যাধি। চাষবাস করে পশুকে বশ মানিয়ে মানুষের কৃষি জীবন শুরু হলো। সেই সঙ্গে বসন্ত, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ছোঁয়াচে জ্বর এসব বালাই-এর সূত্রপাত।

কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব কুষ্ঠ রোগী ছিলেন বলে কথিত। যিশু কুষ্ঠ রোগীদের স্পর্শ করেছিলেন। এমন ভুরিভুরি নজির ইতিহাসে ও লোকগাথায় আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছিলেন দেব চিকিৎসক। তাহলে খোদ 'ঈশ্বর'ও আধিব্যাধির হাত থেকে মুক্ত ছিলেন না!

মানুষ যত 'সভ্য' হয়েছে, নাগরিক হয়েছে, চলাফেরা বেড়েছে, যুদ্ধ করেছে, বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে মেলামেশা বাড়িয়েছে, ততই রোগ বেড়েছে। এ হলো 'এক্সপানশন' বা বিস্তারের সহজাত শত্রু বা 'নেসেসারি ইভিল'।

২

অতিমারীর আদি ইতিহাসে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিস। থাকবে না-ই বা কেন! ইতিহাস লিখতে তারা খুব ওস্তাদ। মেগাস্থিনিস হিন্দোস্তানে এসে দেখেছিলেন যুদ্ধ-সাজে রমরমিয়ে সেনাবাহিনী চলে যাচ্ছে, আর পাশের খেতে কাজ করা কৃষকের কোনো হেলদোল নেই! সে যাক গে! পেলোপনেশীয় যুদ্ধে ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বে আমরা অতিমারীর ছবি দেখছি। অ্যাথেন্স আর স্পারটার যুদ্ধের পটভূমি। অতিমারী কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছিল লিবিয়া, ইথিওপিয়া এবং মিশরে। প্লেগ, জ্বর, তেষ্টা, গলা চুলকানো, চামড়া লাল লাল। আর ক্ষত। এই অসুখে অ্যাথেন্সের সেনাদের হাল একেবারে বেহাল হয়ে যায়। অনুমান করা হয়, গ্রিসের বন্দর শহর পিরাইউস দিয়ে এই ব্যাধি ঢুকেছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক এবং সেনানায়ক থুকিডিডিসের লেখা থেকে পেলোপনেশীয় যুদ্ধকালীন এই অতিমারী সম্পর্কে জানা যায়। থুকিডিডিস লিখে গিয়েছিলেন, মানুষের নৈতিক বোধ তলানিতে ঠেকেছিল। এমনকী ধর্ম ভয় পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। জীবন যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন ঢালাও মোচ্ছব কর। অনেকে আবার আত্মীয়ের মৃত্যুতে তাঁদের সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠেন।

অ্যাথেন্সের নেতা পেরিক্লিস স্বয়ং প্লেগে মারা গিয়েছিলেন। অথচ এই মৃত্যুর আগে এক জ্বালাময়ী ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন অ্যাথেন্সের সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে। হতোদ্যম সেনাদের উজ্জীবিত করতে অ্যাথেন্সের যুদ্ধে মৃত সেনাদের বীরগাথা।

এই রোগ মারীর জন্য স্পারটার হাতে অ্যাথেন্সের পরাজয় ঘটে।

খ্রিষ্টের জন্মের পরে ১৬৫ সনে এল আন্তোনিয়ান প্লেগ। ছড়িয়ে পড়েছিল রোমান সাম্রাজ্যে। নথিবদ্ধকরণে গ্রিক রোমানদের বিশেষ করে গ্রিকদের তুলনা নেই। গ্রিক চিকিৎসক গালেন এই প্লেগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গলাব্যাথা, বমি, জ্বর, পেট খারাপ, সর্দি, কফ। ভেতরে হয়তো রক্তক্ষরণ হতো।

এই আন্তোনিয়ান প্লেগের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী ছিল বাণিজ্যপথ। সিল্ক রুট বা রেশম পথ। সিল্ক রুট জুড়ে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি, অসুখ-বিসুখও বিস্তর আমদানি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ছড়িয়ে ছিল বর্তমান জার্মানি এবং ফ্রান্সের অংশ বিশেষে। মাধ্যম ছিল রোমান সেনা। কিন্তু কীভাবে ছড়িয়ে ছিল এই অসুখ, তা নিয়ে গালগল্পের শেষ ছিল না। রোমানরা আদি খ্রিষ্টানদের দোষ দিত। ব্যাবিলনের অ্যাপোলোর মন্দিরে সোনার কবর খুঁড়ে ফেলেছিলেন কোনো এক সেনা। হ্যাঁ, সেই মহা অপরাধে না কি এই মহামারীর উদ্ভব! রোমান ঐতিহাসিক ডিও ক্যাসিয়াসের হিসাব অনুযায়ী, দিনে দুই হাজার মৃত্যু হতো তখন।

এই প্লেগের ফলে প্রচুর লোক মারা যাওয়ায় ভয়ানক রাজস্ব ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস, রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষে যা খুবই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষতি করেছিল রোমান বাণিজ্যেরও। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবনস এই মারীকে অত গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তী গবেষক ঐতিহাসিকরা মানবসম্পদের ভয়ানক ঘাটতির দিকে আঙুল তুলে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে এই মহামারীকেও স্থান দিয়েছেন।

২৫০ খ্রিষ্টাব্দে এল সাইপ্রিয়ান প্লেগ। এটিও রোমানদের। বলা হয়, দিনে পাঁচ হাজার লোকের মৃত্যু হতো। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই মড়ক ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এর মূল কারণ কী ছিল, পরিষ্কার জানা যায়নি। জনসংখ্যার ব্যাপক হ্রাস এর একটি মারাত্মক কুফল।

৫৪১ খ্রিস্টাব্দে এল জাস্টিনিয়ান প্লেগ। বলা হয়, জাস্টিনিয়ান প্লেগ না কি বিশ্বের প্রথম অতিমারী বা প্যান্ডেমিক। এই প্লেগের কারণ ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস ব্যাক্টেরিয়া। সমগ্র ভূমধ্যসাগর অববাহিকা, ইওরোপ ও এশিয়ার কিছু অংশ, মিশরকে গ্রাস করেছিল। ইরানের সাসানিদ এবং রাজধানী কনস্টান্টিনোপল সমেত রোমান সাম্রাজ্যকে এই প্লেগ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বাইজান্টাইনের ইতিহাসবিদ্ প্রকোপিয়াস লিখেছিলেন, মিশরের সুয়েজ খালের পাশে পেলিসিউয়াম বন্দর এই রোগের আঁতুড়ঘর। শস্যবোঝাই জাহাজে ইঁদুরের দল এই রোগের বীজ বহন করেছিল। প্রকোপিয়াস আরও লিখেছেন, এমনও হয়েছে যে, কনস্টান্টিনোপলে দিনে দশ হাজার লোকও মারা গিয়েছেন। সঠিক সংখ্যা জানা অবশ্য অত সহজ নয়।

কৃষকদের মৃত্যু হার বেড়ে যাওয়ার ফলে মারাত্মক ফসল ঘাটতি দেখা যায়। একদিকে খিদে, অন্যদিকে জার্মান ভ্যান্ডালদের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত রোমান সাম্রাজ্য। এদিকে সম্রাট জাস্টিনিয়ান সেই সময়ে হাগিয়া সোফিয়া চার্চ বানানোয় বিস্তর টাকা ঢেলেছেন।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে আরেক অভিশাপ হয়ে এসেছিল কুষ্ঠ। একাদশ শতাব্দীতে।

৩

মহামারী এবং অতিমারীর বিষণ্ণ ইতিহাসে প্রবলতম উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ব্ল্যাক ডেথ বা বিউবনিক প্লেগের। ইওরোপ ও এশিয়া কাঁপানো কালা মরণ। ১৩৪৭ সনে কৃষ্ণসাগর থেকে বারোটি জাহাজ এসে ভিড়ল সিসিলির বন্দর মেসিনায়।

বন্দরে উপস্থিত লোকজন অবাক হয়ে দেখলেন, জাহাজ থেকে নামছে সারি সারি মৃতদেহ। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা কোনোরকমে ধুঁকছেন। তাঁদের গায়ে কালো কালো ফোঁড়া, বেরিয়ে আসছে পুঁজ আর রক্ত। পাঁচ বছর ধরে ইওরোপের দু'কোটি লোক মারা গেলেন এই রোগে। চীন, পারস্য, ভারত, সিরিয়া, মিশরেও ছড়িয়ে গিয়েছিল এই অতিমারী। এই মারণ প্লেগ এশিয়া থেকে গিয়েছিল জাহাজে করে। সিল্ক রুট ধরে, চীন থেকে। খুব ছোঁয়াচে রোগ। সকালে যাঁকে সুস্থ দেখা যাচ্ছে, পরদিন সকালেই তাঁর মৃত্যুর খবর শোনা যেত। চিকিৎসাও ছিল না। চিকিৎসকরা হাতুড়ে বিদ্যাই চালাতেন এবং বলা বাহুল্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠত। এ ছাড়া ছিল টোটকার ব্যবহার। যেমন, গোলাপ জল বা ভিনিগারে স্নান, সুগন্ধি জরিবুটি জ্বালানো ইত্যাদি। শুধু মানুষ নয়। গোরু, ভেড়া, শুয়োর, ছাগল, মুরগি এদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এত ভেড়া মারা গিয়েছিল যে, ইওরোপে উলের বাজারে মন্দা নেমে এসেছিল। বিজ্ঞানচেতনার অভাবে সীমিত মনে এনে দেয় কুসংস্কার। তাই লোকে ভাবত, এ ভয়ানক মারী আসলে দেবতার ক্রোধ। মানুষের লোভ আর ব্যাভিচার এই নরককে ডেকে এনেছে। সুতরাং ঈশ্বরের করুণা আর ক্ষমাই এর একমাত্র নিদান। অনেকে আবার ভাবল, বিধর্মীদের নিধন করলেই দেবতা শান্ত হবেন। শুরু হলো ইহুদি হত্যা। অনেকেই পালিয়ে গেলেন পূর্ব ইওরোপের দেশগুলোতে। এর মধ্যে আবার জুটল আত্মনিগ্রহকারীর দল। তাঁরা মনে করতেন, নিজেদের কঠিন শাস্তি দিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন। শহর থেকে শহরে তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন। নিজেদের মারতেন চামড়ার চাবুক দিয়ে। দিনে তিন বার করে এই আত্মনিগ্রহের পালা চলত। এদিকে ধর্মযাজক পোপ দেখলেন, এ তো ভারী বিপদ! ধর্মকে মানুষ নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিজেদের মতো চলতে শুরু করেছে। এর ফলে উলটে পোপের প্রতিপত্তিই কমে যাবে।

এই মারী চলেছিল অনেক দিন। পরের বছর আবার ফিরে আসে। তখন ঠিক করা হয়, জাহাজ বন্দরে এলে তিরিশ দিন বা চল্লিশ দিন নাবিকরা আলাদা কোয়ারান্টিনে থাকবেন। কালা মরণ ফিরে ফিরে এসেছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রকোপ অনেক কমে গিয়েছিল।

এই মারী পৃথিবীর মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে গেল। এক; কোয়ারান্টিন, দুই; মাস্ক আর পিপিই (personal protective equipment)। যদিও এই মাস্ক শুধুমাত্র চিকিৎসকদের জন্যই ছিল এবং তাও বেশ ভজঘটো ধরনের। ডক্টর বিক। পাখির ঠোঁটের মতন গড়ন। মাস্কের বিশেষ গড়ন শুধু বাতাসে ভেসে বেড়ানো দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য। আর ছিল গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ওভারকোটের মতন একটা পোশাক। মাস্ক আর পিপিই বেশি চালু ছিল ফ্রান্স আর ইতালিতে।

৪

এরপরেই বিংশ শতাব্দীর স্প্যানিশ ফ্লু (১৯১৮-২০)। বলা যেতে পারে, কোভিডের আগে সবচেয়ে বড় প্যান্ডেমিক। এখানেই আমরা প্রথম পেলাম ফ্লু ভাইরাস H1N1। মৃত্যুর হার ছিল ভয়ানক বেশি। বাচ্চারাও এর প্রকোপ থেকে বাদ যায়নি। প্রকাশ্যে হাঁচা, কাশি সব বন্ধ। স্কুল, চার্চ, থিয়েটার বা যে কোনও জনসমাবেশ বন্ধ। একেবারে এখনকার মতোই অবস্থা। মনে করা হতো, এই ভাইরাস স্পেন থেকে এসেছে। তবে তালিকার মধ্যে চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেনের নামও ছিল। প্রথম ঘটনাটি ধরা পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসে এক সেনা ছাউনিতে।

স্প্যানিশ ফ্লু নাম হলো কেন? মনে রাখতে হবে, এই সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। স্পেনই একমাত্র দেশ, যে নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধের সময় অন্য কোনো দেশ থেকে ফ্লু-এর খবর বেতারে শোনানো যেত না। কারণ মানুষের মনোবল এতে ভেঙে যাবে। তাই স্পেন থেকে এই খবর সম্প্রচারিত হতো। সবাই স্পেন থেকেই খবর সংগ্রহ করত। তাই স্প্যানিশ ফ্লু!

৫

খুব সংক্ষেপে এই হলো বিশ্বের মহামারী ও অতিমারীর বিবরণ। সভ্যতার এই সঙ্কটের হাত থেকে মানুষের হয়তো মুক্তি নেই। আমরা দেখেছি, বারবার বিভিন্ন রূপে ফিরে এসেছে এই মারণ রোগগুলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন জিতে যায়। সভ্যতার সঙ্কটের মতো এও সভ্যতার এক বিস্ময়!

সুতরাং শান্তিবচনে শেষ হোক এই কাহন;

কালে বর্ষতু পর্জন্য
পৃথিবী শস্যশালিনী
দেশ যম ক্ষোভ রহিত
সজ্জন সন্ত নির্ভয়

বর্ষণ হোক পর্যাপ্ত। পৃথিবী শস্যে ভরে উঠুক। দেশ থেকে সমস্যা দূর হোক। সজ্জন মানুষ নির্ভয়ে থাকুক।

অতিমারী ও অপবিজ্ঞান

অরুণাভ মিশ্র

এক

২০২০'র গোড়া থেকে কোভিড ১৯ (Corona Virus Disease 2019 = COVID 19) ভাইরাস বা সার্স কোভ ২'র প্রভাবে বিশ্ব জুড়ে অতিমারী চেপে বসেছে। সেপ্টেম্বরের শুরুতে মৃত্যু সাড়ে ছয় লক্ষ পেরিয়েছে। আক্রান্ত আড়াই কোটি প্রায়! বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসের কাজ করার ধরন বুঝে তার প্রতিষেধক এবং প্রতিরোধক খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরা এখনও অবধি যে বার্তা দিয়েছেন, তার মূল কথা, করোনা ভাইরাস আর তার আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে এগতে হবে। বিজ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে আজ এই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ পেরিয়েছে। ক'দিন পরে হয়তো পঞ্চাশ লক্ষও পেরবে। আর পশ্চিমবাংলায় দ্রুত দুই লক্ষ পেরিয়ে আক্রান্ত সংখ্যা বয়ে চলেছে আড়াই লক্ষের দিকে। বিষয়টা চিন্তার সন্দেহ নেই!

শুরু হয়েছিল চীনের হুবেই প্রদেশের উহান থেকে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের প্রথম থেকে উহানে জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্টের বহু রোগী হাসপাতালে আসতে শুরু করেন। তাঁদের অনেককেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়। দেখা যায়, এঁদের অনেকের সঙ্গে উহানে যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর পাইকারি খাদ্য বাজারটি রয়েছে, সেটির সংযোগ আছে। উহানের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এ সব খবর পাঠায় চীনের কেন্দ্রীয় সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এ। তারা ৩০ ডিসেম্বরই ঘটনাটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (WHO) জানায়।

দুই

খবর পেয়ে প্রাথমিক পর্যালোচনার পর হু জানুয়ারির পাঁচ তারিখে সংবাদমাধ্যমে এই অজানা অসুখটির কথা জানায়। ইতিমধ্যে চীন বের করে যে, এই অসুখের কারণ হলো এক ধরনের নতুন করোনা ভাইরাস, যার নাম দেওয়া হয় সার্স কোভ ২। চীন তার জিনসজ্জাও বের করে ফেলে জানুয়ারির দশ তারিখে। সেই পূর্ণ জিনগত কাঠামো পাঠানো হয় হু'কে। ১২ জানুয়ারি হু এই জিনকাঠামো যেমন আন্তর্জাতিকভাবে জানিয়ে দেয়, তেমনই এই ভাইরাসটির সংক্রামক প্রকৃতি সম্পর্কেও বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে। তার অনেক পরে ৩০ জানুয়ারি আমাদের দেশের কেরালায় প্রথম কোভিড ১৯ রোগীর সন্ধান মেলে। ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে অতিমারী বা প্যান্ডেমিক বলে ঘোষণা করে। অথচ ২৫ মার্চ অবধি আমাদের দেশের সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে ফেলে রাখে। ওই দিনের জনতা কারফিউয়ের পর চার ঘন্টার নোটিশে প্রথম দফার লকডাউন ... যার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ প্রবল অসুবিধার মুখে পড়েন। শত শত মাইল পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে খিদে, পরিশ্রম, দুর্ঘটনা আর জলশূন্যতায় শতাধিক মানুষ মারা যান। অথচ এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দিয়েছেন—

ভাইরাসটির প্রকৃতি কেমন, কীভাবে তার সংক্রমণ ছড়ায়, কী করে প্রতিরোধ সম্ভব, চিকিৎসার কী ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী এক দায়িত্বশীল সরকারের উচিত ছিল দেশবাসীকে সাবানে হাত ধোওয়া, মাস্ক পরা আর দূরত্ববিধি মানার প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় তিনটি ব্যাপারে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তোলা। এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও সমাজসেবী সংগঠনগুলোকে দ্রুত যুক্ত করার দরকার ছিল। দরকার ছিল মাস্ক ও সাবান সব দেশবাসীর জন্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা! দরকার ছিল বিদেশি যোগাযোগ থাকা এবং উপসর্গবাহী সকলের দ্রুত পরীক্ষা ও পজিটিভদের পৃথক থাকার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। পরীক্ষার সংখ্যা দ্রুত ব্যাপকতম মাত্রায় বাড়ানো ছিল প্রয়োজনীয়। দরকার ছিল সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখা, বিশেষ করে অক্সিজেন যুক্ত শয্যা ও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা! দরকার ছিল মানুষের হাতে অন্ন ও অর্থ তুলে দেওয়া, যাতে লকডাউনের নিয়মবিধি তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে সংসার চালাতে পারেন। দরকার ছিল ধর্মস্থানগুলোতে জমায়েত দীর্ঘ দিন বন্ধ রাখা। ভ্রান্ত তথ্য যে ছেয়ে গেল গোটা দেশে, তা বন্ধ করতে উদ্যোগী হওয়ার দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল সরকারের পক্ষে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ মোকাবিলায় ব্যাপকতম জনউদ্যোগ তৈরি করা এবং নিবিড় জনসচেতনতা গড়ে তোলা। কিন্তু দেশবাসীর মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলল না সরকার। অসহায় হয়ে অতিমারীকে প্রথম দেখা মানুষ এ সবই চেয়েছিল। বৈজ্ঞানিক মনন এ সব ব্যবস্থাই দাবি করে। অথচ এ সবের কিছুই করা হলো না।

তিন

এইসব প্রচারে ধুনো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মননের দাবি উড়িয়ে দেশের সরকার নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে ২১ দিনের যুদ্ধ, থালা বাজাও, প্রদীপ জ্বালাও, ফুল ছড়াও প্রভৃতি প্রচার চালালো। প্রচার হলো গোমূত্র খাও, ভাবিজি পাঁপড় খাও, হনুমান চালিশা পড়ো, যজ্ঞ করো, করোনা মায়ের পুজো দাও প্রভৃতি! একটা যাচ্ছে একটা আসছে। মানুষ ভাবছে, এটাতে বুঝি পরিত্রাণ মিলবে! এখন প্রশ্ন হলো, এর আগে হাজার রকম অসুখের কোনটা সারিয়েছে গোমূত্র বা ভাবিজী পাঁপড় কিংবা হনুমান চালিশা বা যজ্ঞাদি? তবে আজ তাদের স্মরণ করা হচ্ছে কেন? তারা কি ওষুধ? অদ্ভুতভাবে অতিমারীর কারণ হিসেবে এক 'মহিলা করোনা মা' বা 'করোনা দেবী'-কে আনা হলো, কোনও পুরুষকে নয়। কলেরা বসন্তে যেমন শীতলা, সাপ কামড়ে যেমন মনসা! অর্থাৎ ভয়াল বা ভয়ঙ্কর কিছু মানেই তার পেছনে মেয়েরা! তাই তা থেকে বাঁচার জন্য 'করোনা দেবী'র আরাধনা! মনের মধ্যে নারীদের সম্পর্কে বিষময়তা আর লিঙ্গ বৈষম্যের মনোভাব সূক্ষ্মভাবে এরকম করেই চারিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিবাদ হলো না এইসব অবৈজ্ঞানিক ও অপবৈজ্ঞানিক ভাবনার বিরুদ্ধে। কোভিড প্রতিরোধে বৈজ্ঞানিক পথে চলার বার্তা দিল না সরকার। এই ভ্যাকসিন এল, ওই ওষুধ বেরলো রব তুলে সংবাদ মাধ্যমগুলোও প্রকৃত বিজ্ঞানটা না জানিয়ে মানুষকে চটকদারিত্বে মজিয়ে রাখল আশার ছলনে। কোভিড মোকাবিলায় মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হলো না। ফলে আক্রান্তরা সামাজিকভাবে বিপদে পড়লেন। অথচ তাঁদের পাশে থাকার প্রয়োজন অনেকটাই। সরকার তার করণীয় কাজ না করায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে আজ সে ভূমিকা নিতে হলো। এখন আবার আমদানি হয়েছে জাপানি কার্ড! ক্লোরিন ডাই অক্সাইড মাখা ওই কার্ডের রাসায়নিকটি জীবাণুনাশক সন্দেহ নেই। বিভিন্ন চিকিৎসাগত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার কাজে এই তীব্র জারক পদার্থটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা সার্স কোভ ২'কে মারতে পারে বলে পরীক্ষিত নয়। তা ছাড়া ওই কার্ড সামান্য সময় মুক্ত বাতাসে থাকলেই তার ক্লোরিন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে বাতাসে মিশে যাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই জাপানি কার্ড তার জীবাণুনাশী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। ফলে ওই কার্ড কোনও ভাইরাস থেকেই সুরক্ষা দিতে পারবে না।

সরকারের অতিমারীর আইন বলবৎ আছে এ সময়ে। সেই অতিমারী আইন বা এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্টে বলা আছে, ওই আইন না মানলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাজা হবে। বলা আছে, কোয়ারান্টিনের নিয়ম না মানলে ছ' মাস জেল বা অর্থদণ্ড (ধারা ২৭১) হবে। আর এমন কর্মসূচি যদি হয়, যা সংক্রমণ বাড়াতে পারে ও তার ফলে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে, তাহলেও ছ' মাস জেল বা অর্থদণ্ড (খারা ২৬৯) হবে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, নমস্তে ট্রাম্প, থালা বাজিয়ে মিছিল, তবলিগি জমায়েত, রথযাত্রা, রামমন্দিরের ভিতপুজো– এ সব কি সংক্রমণ বাড়ায়নি? তার ফলে কি জীবনের ঝুঁকি বাড়েনি? তাহলে যাঁরা এসব করলেন বা করালেন, তাঁদের প্যান্ডেমিক আইন মেনে শাস্তি হলো না কেন?

সেই সঙ্গে আর একটা দাবিও সার্বিকভাবে সামনে চলে আসছে। তা হলো, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক সরকারিকরণের প্রয়োজনীয়তা। স্বাস্থ্য আর শিক্ষায় সরকারের ভূমিকার সর্বাঙ্গীকরণ ছাড়া জাতীয় জীবন যে সুরক্ষা পেতে পেতে পারে না, তা অনেকে এবার নতুন করে অনুভব করছেন এই বিপন্ন সময়ে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ জোগানোর ফল যে মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারে না, তা পরীক্ষিত হয়ে গিয়েছে। শুধু সমাজবাদী দেশগুলোই নয়, সরকারিভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ হয় যেসব ধনবাদী দেশে, যেমন জার্মানি, স্পেন, ইংল্যান্ড– তারাও প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে! কিন্তু ভারতের অবস্থা এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

এই খারাপ পরিস্থিতি ঢাকতেই মানুষকে মিথ্যা মোহে ভাসিয়ে তাঁকে কাল্পনিক ইচ্ছা পূরণের ভাবনায় ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে অপবিজ্ঞান ছড়ানোর মধ্য দিয়ে। দিশাহারা মানুষ ভাবছেন, হাসপাতালে বেড কী দরকার! কিনে আনি মুশকিল আসান ভাবিজী পাঁপড় বা নতুন ব্র্যান্ডের গোমূত্র! পরিত্রাণ মিলে যাবে। এ ধরনের মিথ্যা আশা যত বেশি জাগিয়ে রাখা যাবে, ততই বেশি করে আসল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানো সম্ভব হবে। এই সত্যটুকু ভুললে চলবে না।

চার

করোনা আবহেই ঘোষিত হয়েছে নতুন শিক্ষানীতি। শিক্ষাবিদরা তার কেন্দ্রীকরণ আর বাণিজ্যিকীকরণের ঝোঁক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এর মুখ্য নীতির অংশে ভালো কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে বলা হয়েছে, "শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো এমন উন্নত মানুষ তৈরি করা, যারা যুক্তিমূলক চিন্তা করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সহমর্মী ও সমব্যথী, সাহসী আর স্থিতধী, বৈজ্ঞানিক মেজাজ আর সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তির অধিকারী এবং সেই সঙ্গে থাকবে পোক্ত নৈতিক বাঁধন আর মূল্যবোধ। এর আরও লক্ষ্য হলো, সমাজলগ্ন উৎপাদী মানুষ তৈরি করা, যা এক সমদর্শী, সব অংশের অংশগ্রহণমূলক বহুত্ববাদী সমাজ তৈরি করবে– ঠিক

যেমনটা আমাদের সংবিধানের মর্মবস্তুতে রয়েছে।'' এই লক্ষ্যে মানুষ তৈরি আর সমাজকে পরিচালনা করার কথা বলছেন কারা? যাঁরা ভারতবর্ষ জুড়ে অসহিষ্ণুতার চাষ করে চলেছেন, অপবিজ্ঞানের বার্তা বইয়ে দিচ্ছেন, বিরুদ্ধ মতের গলা টিপে ধরেছেন, ভিন্ন সংস্কৃতি চর্চাকে খুন হতে দেখেছেন চোখ বন্ধ করে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ক্ষেত্রকে যাঁরা অবিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান বানিয়ে ছেড়েছেন, তাঁরা বলছেন বৈজ্ঞানিক মেজাজের নেহরু বাণী। যাঁদের সমমনস্ক আদর্শের চর্চাকারীরা বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারকদের খুন করে, তাঁরা শোনাচ্ছেন বিজ্ঞান মনস্কতার বার্তা! দলিত আর সংখ্যালঘুদের নিপীড়নে দেশের সরকারের অনুরাগীরা যখন বিশ্বের নজর কেড়ে ফেলেছে, তখন শিক্ষায় আদিবাসী আর সংখ্যালঘুদের বিশেষ যত্নে উপরে তুলে আনার কথা যদি বলা হয়, তাহলে তা বক্তাদের হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই করে না। গণতন্ত্রহীনতার যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানী মননের মৌল গুণ অর্থাৎ প্রশ্ন করা, দ্বিমত হওয়া, বিচার করা, যাচাই করা, বিতর্ক করা, গ্রহণ করা, বর্জন করা– এ সব মানা হবে না। ফলে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান মানসিকতা কিছুই পুষ্ট হতে পারবে না আমাদের দেশে। করোনা আবহে যে বিজ্ঞানভিত্তিক মনন গড়ে তোলা আবশ্যিক ছিল, তা থেকে যাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের নাগালের বাইরে!

পরিবেশ আইনের ক্রমাগত অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে চলা শুধু নয়, কোন প্রযুক্তি পরিবেশে কী প্রভাব ফেলবে, তার প্রাক বিবেচনার আইনকে লঘু করে বড় ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিচ্ছে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার। এর ফলে পরিবেশে বড়সড় আঘাত আসবেই আগামী দিনে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশবাসী যাতে সরব হতে না পারেন, তার জন্য তড়িঘড়ি লকডাউন চলার মধ্যেই এই আইন বদলে নিতে চেয়েছিল সরকার। পারেনি বহু সংগঠন ও আদালতের আপত্তিতে। পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে করোনাকালেই বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পের কাজ পরিবেশ ছাড়পত্র না নিয়েই শুরু করে দিয়েছে তারা। যে সরকার শিক্ষানীতিতে বলছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তোলার কথা, পরিবেশ শিক্ষা, সংরক্ষণ, জীববৈচিত্রময়তা রক্ষা, বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ প্রভৃতির কথা, তারাই সম্প্রতি যে প্রকল্পগুলোকে অনুমোদন দিয়েছে, তার বেশ কয়েকটি হচ্ছে বনাঞ্চলে, বন ধ্বংস করে। কথায় আর কাজে এই স্ববিরোধিতাই দেশের এই সরকারের দস্তুর! লেকটাউনে নয়নজুলি ভরিয়ে ব্যবসা ক্ষেত্র এবং বন ও জীববৈচিত্র সাফ করে ডুয়ার্সে উন্নয়ননের কর্মসূচী চালানো রাজ্যের সরকারও এই পরিবেশগত দ্বিচারিতায় কিছু কম যায় না!

কিন্তু এরা কি জানে, যথেচ্ছ পরিবেশ ধ্বংস ও বনাঞ্চল লুপ্ত করার কি বিষময় ফল হতে পারে? কটা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার হয়েছে এ পর্যন্ত! হাজার লক্ষ কোটি রয়েছে অনাবিষ্কৃত। এরা আছে গহন বনাঞ্চলে, গভীর সমুদ্রে, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে, এক পরিবেশ প্রতিবেশ রচনা করে। বন ধ্বংস, গভীর সাগর থেকে মাছ ও অন্য প্রাণী যথেচ্ছ ধরা, পাহাড়ে বসতি স্থাপন এই সব ক্ষুদ্র জীবদের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে দিয়ে তাদের টেনে আনছে আমাদের প্রতিদিনের পরিবেশে। আবার বন ধ্বংস করে হাজার হাজার একর জায়গা নিয়ে এখন গড়ে তোলা হচ্ছে বহু ব্যবসায়িক প্রাণী খামার। বনের গভীরে থাকা ভাইরাস পরিবেশে এসে ওই খামারের প্রাণীদের মধ্যে ক্রমাগত নিজেকে পরিবর্তন করে মারক রূপ নিয়ে খামারেরই কোনও কর্মীর মাধ্যমে চলে আসছে লোকালয়ে। বড় বড় খামার বা ফার্ম এভাবে নতুন নতুন ফ্লু ভাইরাসকে পরিবেশে নিয়ে আসছে বলে অভিযোগ করেছিলেন রব ওয়ালেশ তাঁর 'বিগ ফার্মস মেক বিগ ফ্লু' বইতে। তাই কোভিডও তেমন করে এসেছে কি না কে বলতে পারে!

পাঁচ

বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার ভূমিকা বিরাট। অথচ শিক্ষানীতিতে মারাত্মক অবহেলিত এই দিকটি। বদলে অন্ধ জাতিগর্ব গড়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে, ''এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তরের মধ্যে এক ভারতীয় হিসাবে গর্ব প্রোথিত করা– শুধু চিন্তায় নয়, তেজ, বুদ্ধি, জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধে।'' এই অন্ধ জাতিগর্বের উন্মাদনায় লালিত হিটলারের জার্মানির কথা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। সেদিকে নজর রেখেই প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ও বেদোত্তর যুগের প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধিবিদ এবং শাস্ত্রাদির কথা এত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে নীতিতে। এখন যেমন সরকারি দলের নেতারা বেদকেই সব জ্ঞানের আকর বলে তুলে ধরেন, ভবিষ্যতের লক্ষ্যও কি তা-ই? তাহলে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা একটা একদেশদর্শী অন্ধগর্বী প্লাবনে দীর্ণ হবে। ভারতীয় দর্শন চর্চার যে কথা শিক্ষানীতিতে রয়েছে, তা করতে গিয়ে ভাববাদী দর্শনের নিগড়ে এই চর্চাকে বেঁধে ফেলা হবে। প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনের ধারাকে অগ্রাহ্য করা হবে। চরক সুশ্রুতের গুণকীর্তন রয়েছে শিক্ষানীতিতে। খুবই ভালো কথা। তবে সেই সঙ্গে মনুবাদ আর শঙ্করচিন্তাকে কীভাবে চরক ও সুশ্রুতের ভাবনাকে নস্যাৎ করতে কাজে লাগানো হয়েছিল, তাও পড়ানো হবে তো? হবে না। আজকে দেশের সরকারে থাকা রাজনীতির প্রবক্তারা তো মনুবাদ ও শঙ্কর দর্শনেরই ভক্ত। তাই চরক ও সুশ্রুতের বস্তুবাদী ভাবনা তাদের হাতে কল্কে পাবে না।

লোকহিতৈষী সংগঠনের নামে ধর্মের ধ্বজাধারীদের হাতে ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিদ্যালয় ও কলেজের ব্যবস্থা নয়া শিক্ষানীতিতে রাখা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার দায়িত্ব দিলে সে শিক্ষা মোহমুক্ততার দরজা খুলে দিতে পারে না। ফলে তা আগামী দিনে মোহান্ধ নাগরিক গড়ে বিজ্ঞান মনস্কতার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেবে। বিদ্যাভারতী স্কুল, মাদ্রাসা আর সরস্বতী শিশু মন্দিরের দরজার ভেতরে ধর্মশিক্ষা আর পরিকল্পিত পরধর্ম বিদ্বেষের আবহ থাকতে দিলে তা বিজ্ঞানমুখী মন তৈরিতে কখনও সাহায্য করবে না।

ছয়

বিজ্ঞানের এক অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তার গতিময়তা। কোনও কিছুই অজয় অমর অক্ষয় অব্যয় নয়। পরিবর্তনশীলতা জগতের নিয়ম, জীবনের নিয়ম। সেই নিয়মই শিখিয়েছে, এক দিন কোভিড ১৯'র পৃথিবী দাপানো রূপ কমে যাবে। আজ নয় কাল তা নিয়ন্ত্রিত হবে। জীবনের ছন্দ আবার ফিরে আসবে। আজ যারা কোভিডে প্যান্ডেমিক আইনের জুজু দেখিয়ে জনবিক্ষোভ এড়িয়ে নানা জনবিরোধী আইন করে পরিবেশ প্রকৃতি আর মানুষের বিনাশ ডেকে আনছে, কাল তাদেরও জনতার মুখোমুখি হতে হবে। অপবিজ্ঞানের ধোঁয়া দিয়ে মানুষ মারার রাস্তা সাজিয়েছে যারা, তারা জানে না, তারাও ক্ষণস্থায়ী। তাদের ক্ষমতার দম্ভও।

মানুষের পাশে থেকে তাদের ভালোবেসে বাঁচার লড়াইয়ে সাহায্য করে যাওয়াটাই তাই আজকের সময়ের দাবি। সে কাজে, চলুন, হাত লাগাই।

উত্তরবঙ্গের বৈচিত্রময় লোক-সংস্কৃতি

মাহবুব উল আলম

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে 'উত্তরবঙ্গ' বলে কোনও আলাদা ভূখণ্ড চিহ্নিত না থাকলেও 'উত্তরবঙ্গ' এই নামটির সঙ্গে বাংলা তথা দেশভাগকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিচিতি ঘটে। মৌখিকভাবে বা প্রচলিত অর্থে গঙ্গা নদী উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাজ্যের এই দু'ভাগের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট করেছে। গঙ্গা নদীর উত্তরপাড়ের আটটি জেলা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণপাড়ের অবশিষ্ট ১৫টি জেলা দক্ষিণবঙ্গ নামে পরিচিত। ঘন বন-জঙ্গল, নদী ও পাহাড় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ভরা উত্তরবঙ্গ নামী এই এলাকাটি। একথা অনস্বীকার্য যে, উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বৈচিত্রের সঙ্গে এখানকার সামাজিক বৈচিত্রের কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাসকারী বহু প্রাচীন নৃ-গোষ্ঠীর অতীত কথা ঐতিহ্যের ও ঘটনাবহুল। একদিকে গৌড়বাংলার ইতিহাস যেমন আমাদের পাল এবং সেন রাজত্বের সঙ্গে পরিচিতি ঘটায় এবং গর্বিত করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে এই ভূখণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ ও সর্বোপরি দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এবং তারও পরবর্তীকালে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের স্রোত কীভাবে এ অঞ্চলের জন-ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনের পট পরিবর্তন সূচিত করেছিল, সেটা দেখে আমরা বিস্ময় বোধ করি।

দার্জিলিঙ, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ— এই আটটি জেলাকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ। আটটি জেলা আবার ১৯টি মহকুমার সমষ্টি। উত্তরবঙ্গের মোট গ্রামের সংখ্যা ৭৫৭৫। তন্মধ্যে জনবসতিপূর্ণ গ্রাম ৭১৪৫টি। ২০১১ সালের জনগণনানুযায়ী, ১৭.২ কোটি মানুষের বাস উত্তরবঙ্গে, যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১৮.৪ শতাংশ।

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও সমকালীন ইতিহাস মূলত গড়ে উঠেছে আদিকাল থেকে এই অঞ্চলে ধারাবাহিক অভিবাসন এবং তার গতি, প্রকৃতি ও প্রভাবের উপর নির্ভর করে। নানা প্রয়োজনে এবং আহ্বানে কত মানুষের ধারা এখানে এসেছে, পুষ্ট করেছে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে তাদের ভাষা ও কৃষ্টি দিয়ে! এই ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ পূর্বাঞ্চল জুড়ে রাজবংশী সমাজের অতীতের কথা ঐতিহ্যবাহী ও ঘটনাবহুল। উত্তরবঙ্গে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। আবার দার্জিলিঙ এবং কালিম্পং

জেলা সহ তরাই-ডুয়ার্সে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নেপালি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি। বিশাল এই ভূখণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ রূপরেখা অত্যন্ত কঠিন। তাই বিস্তৃত এই ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জনগোষ্ঠী ও তাঁদের সংস্কৃতি, যা এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে, সে বিষয়ে আলোকপাত এবং করোনা মহামারী এই অঞ্চলের সামগ্রিক সংস্কৃতিতে যে সঙ্কট তৈরি করেছে, তার প্রতি সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে ক্ষুদ্র এই প্রয়াস।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি প্রধান জনগোষ্ঠী অর্থাৎ পাহাড়ে বসবাসকারী নেপালি জনজাতি জনগোষ্ঠী, পাহাড়ের সমতলাঞ্চলের তরাই ও ডুয়ার্সের আদিবাসী জনগোষ্ঠী, এই অঞ্চলের স্থানীয় কিছু জনজাতি গোষ্ঠী, উত্তরবঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশী জনগোষ্ঠী এবং অবশ্যই উত্তরবঙ্গের জনসমাজের এক বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের উত্তরে দার্জিলিঙ জেলার দার্জিলিঙ, কার্শিয়াঙ এবং মিরিক মহকুমা ও কালিম্পঙ জেলার নেপালি ভাষাভাষী জাতি ও জনজাতির বাস। এখানকার জীবন-জীবিকার সঙ্গে জুড়ে আছে ইংরেজি ‘T’ অক্ষরটি। পাঁচটি ‘T’ অর্থাৎ Tea, Timber, Tourism, Trade ও Transport নিয়ে গড়ে উঠেছে এখানকার জীবন ও জীবিকা। ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাজনের ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়েন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রাম-গঞ্জে। মূলত দেশভাগের সময়ে, ১৯৫০ এবং ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর্বে, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং ১৯৭৯-৮০ সালের আসামের ‘বিদেশি খেদাও’ আন্দোলনে বহু ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙালি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বসবাস গড়ে তোলেন। অন্যদিকে ১৯৫১ সালের ভারত-নেপাল চুক্তির ফলে নেপাল থেকে বহু সংখ্যক মানুষ পাহাড় এবং সমতলের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাস শুরু করে বিভিন্ন উপজীবিকায় নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক অজিত কুমার দণ্ড তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন– তফসিলি উপজাতিদের যে ৩৮-টি জন বা কৌম উত্তরবঙ্গে আছে, তাদের মধ্যে সাধারণ অর্থে যে নয়টিকে এই অঞ্চলের মূল অধিবাসী বা আদি বাসিন্দা বলে গণ্য করা হয়, তারা হলো ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজং, লেপচা, মগ, মেচ, ম্র ও রাভা। এদের মধ্যে ভুটিয়া এবং লেপচা মূলত পার্বত্য উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙ জেলার বাসিন্দা। সুতরাং প্রব্রজন ও বসবাসের দিক থেকে সমগ্র পার্বত্য উত্তরবঙ্গের জনজাতি গোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : (১) স্থানীয় জনজাতি এবং (২) অভিবাসী জনজাতি। মেচ, রাভা, গারো প্রভৃতি জনজাতি উত্তরবঙ্গের আদি বা স্থানীয় বাসিন্দা। আর চা চাষকে কেন্দ্র করে যেসব আদিবাসী– যেমন, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, কোরা প্রভৃতি জনজাতি গোষ্ঠীর যাঁরা চা শ্রমিক হিসাবে উত্তরবঙ্গের বাইরে থেকে এখানে এসে বসবাস করছেন, তাঁরা হলেন দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় বা আদি জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই একসময়ে তরাই এবং ডুয়ার্সের বনভূমি এলাকায় বসবাস করতেন। এইসব জনজাতি ও তাঁদের সমাজ আর সংস্কৃতির ধারা (কিছুটা ভিন্নরূপ নিয়ে) আজও এই অঞ্চলে প্রবাহিত এবং কালক্রমে সেটি একটি মিশ্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নীরেন চৌধুরি পাহাড়ে বসবাসকারী জনজাতির সাংস্কৃতিক জীবন বিশ্লেষণে ভুটিয়া, লেপচা এবং মেচ এই তিন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। তিনি জনগণনা রিপোর্টে উল্লেখ করে শেরপা, ডুকপা (দ্রক্‌পা), কাগাটিয়া (ইওলমো) এবং টোটো জনগোষ্ঠীকে ভুটিয়া জনগোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। কিন্তু মেচ ও টোটো এই দুই জনগোষ্ঠীর কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমরা এদের সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করব। ভুটিয়ারা সাধারণত তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে। এদের প্রধান উৎসব লোসর, শস্য কাটার পর নববর্ষ উৎসব। এই উপলক্ষে নাচ, গান, পান, আহার কয়েক দিন ধরে চলে। গুম্ফার পরিচালনায় ভুটিয়াদের মুখোশ নৃত্য বিশেষ আকর্ষণীয়।

ঐতিহাসিক মতে, দার্জিলিঙের পত্তনকালে বিচ্ছিন্ন কিছু লেপচা জনগোষ্ঠী দার্জিলিঙ পাহাড়ে বসবাস করত। তাই লেপচাদের এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী বলা হয়। পূর্বে লেপচারা স্থানান্তর কৃষিকাজ (Shifting cultivation) করত, পরবর্তীতে নেপালিদের কাছ থেকে শিখে পাহাড়ের খাঁজ সমান করে স্থায়ী চাষাবাদের পদ্ধতি গ্রহণ করে। কৃষি লেপচাদের প্রধান জীবিকা, তবে বর্তমানে শিক্ষিত লেপচারা সরকারি দপ্তরে বহাল আছেন। এমনকী অনেকে উঁচু পদেও অধিষ্ঠিত আছেন। লেপচাদের হস্তশিল্প, বিশেষত এক ধরনের বর্ণবহুল কাপড় প্রশংসার দাবি রাখে। নাচ-গানে সমৃদ্ধ উৎসব-প্রিয় এই জনজাতি পার্বত্য সংস্কৃতিতে এক স্বকীয় মাত্রা যোগ করেছে। লেপচারা বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এক সময় আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলেও বর্তমানে এই প্রথা বিশেষ মানা হয় না।

লেপচাদের বিশ্বাস, তাঁরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেবতার সন্তান। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা লেপচাদের কাছে অতি পবিত্র ও উপাস্য। লেপচারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কিছু খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে অনেকে ধর্মান্তরিত। তবে বৌদ্ধ ধর্মে লেপচারা বিশ্বাসী হলেও লেপচা জনজীবনে প্রকৃতিগত ধর্ম বা ‘মন’ ধর্ম নামে এরা মানে, তার প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং গভীর। এটি লেপচা সংস্কৃতির এক অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক নারী-পুরুষ ‘মন’ ধর্ম পুরোহিত থাকেন। এই পুরোহিতদের কাছ থেকে জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি নিবারণ, বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া হয়। আবার গুম্ফা থেকে আগত লামাদের পরামর্শও এরা নেয়। এই দুই ধর্মমতের মধ্যে লেপচা সমাজে কোনও বিরোধ নেই। লেপচাদের দৈনন্দিন জীবন, কাজকর্ম ইত্যাদি ‘মন’ ধর্ম পুরোহিত ও লামাদের পরামর্শে পরিচালিত হয়। বর্তমানে লেপচা সমাজে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটায় এবং আধুনিকতার আলোকে আলোকিত হওয়ার ফলে সাবেকি বিশ্বাসের ভিত অনেক আলগা হয়েছে।

রাজ্যের তথা উত্তরবঙ্গের মেচ জনসংখ্যার বেশিরভাগ আলিপুরদুয়ার জেলার পর্বত সংলগ্ন সমতলভূমিতে বসবাস করে। বিক্ষিপ্তভাবে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙ জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় স্বল্প সংখ্যক মেচ জনজাতির বাস। মেচরা কাছাড়ি জনজাতি থেকে উদ্ভূত এবং এরা বোরো-কাছাড়ি ভাষাভাষী। এককালে এরাও লেপচাদের মতো স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত, কিন্তু বর্তমানে এরা স্থায়ী গ্রাম স্থাপন করে বলদ-লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করে। মেচরা পাঁচটি, মতান্তরে সাতটি গোত্রে বিভক্ত। এগুলি হলো– সম্প্রসারি, নারজিনারি, বসুমাতারি, মৌশারি, হাজোয়ারি, চম্প্রমারি, ঈশ্বরারি প্রভৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেচ সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানা চাকরিতে যোগদান করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠী হিসাবে মেচরা এখনও অনুন্নত।

প্রকৃতির কোলে লালিতপালিত মেচ সংস্কৃতি

প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তিস্তা, তোর্ষা, সংকোশ নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জঙ্গলের দেবতা, মনসা, মহাকাল (শিব) এবং মৈনাও (লক্ষ্মী) এদের প্রধান উপাস্য দেবদেবী। কোনও দেবদেবীই মূর্তির আকার নেয় না, তবে মাটির ঢিপি বা সজ্জিত বাঁশের খণ্ড বিভিন্ন দেবদেবীরূপে পূজিত হয়। আজকাল দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজায়ও মেচরা অংশগ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ মূর্তি স্থাপন করে পুজাও করে। মেচ পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে প্রতি পুজো-পার্বনে পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। মেচ জনগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান উৎসবগুলির অন্যতম, বৈশাখ মাসে মহাকাল পূজা, আষাঢ় মাসে মনসা পূজা, পৌষ মাসে বন দেবতার পূজা এবং চৈত্র মাসে বাঁশের পূজা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সব নদী পূজাও মেচ সমাজের অন্যতম পার্বন। মেচদের মধ্যে মুখোশ নাচ সহ কয়েকটি নাচের প্রচলন আছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের ভুটান সীমান্তে অবস্থিত পাঁচটি পাড়ায় বিভক্ত ছোট একটি গ্রাম টোটোপাড়া। রাজ্যের সবচেয়ে কম সংখ্যার জনজাতি টোটো জনগোষ্ঠী। একসময় এই গ্রাম ছিল একক জনগোষ্ঠীর গ্রাম, কিন্তু পরবর্তীতে আরও অনেক জাতি ও জনজাতি এখানে বাইরে থেকে এসে বসবাস শুরু করে এবং বর্তমানে টোটোদের চেয়ে বহিরাগতদের সংখ্যা প্রায় সমান বা কিছু বেশি। এই বহিরাগতদের বেশিরভাগ মানুষই নেপালি, হয় নেপাল থেকে আগত বা অসম ও ভুটান থেকে বিতাড়িত।

টোটো সমাজ পরিচালনার জন্য পাঁচটি পদের উল্লেখ আছে। এরা হলো–কাইজী (প্রধান পরোহিত), গাপ্পু (মোড়ল), পঞ্চায়েত, পাও (ওঝা) এবং নানপম (লোক ডাকিয়ে)। টোটো সমাজে তেরোটি গোত্র আছে এবং এরা প্রকৃতির পূজারি। টোটো সমাজে ডাইনি প্রথা নেই। কারণ, এরা বিশ্বাস করে না, মানুষের মন্ত্রে মানুষের মৃত্যু হয়। জন্ম হলে মৃত্যু হবে– এই বিশ্বাসে এরা বিশ্বাসী। ধর্মাচারণে মন্দির-মসজিদ-গির্জায় যায় না। পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল ঘিরে যেহেতু এদের জীবন আবর্তিত, তাই এরা প্রকৃতিকে পূজা করে। টোটো সমাজে শিকার, গো-পালন, বাণিজ্যে গমন ইত্যাদি উপলক্ষে উৎসবে নাচ-গান হয়। টোটোদের প্রধান উৎসব তিনটি– অঞ্চু (বর্ষা উৎসব), ভয়ু (শীতকালীন উৎসব) এবং সরদে (বসন্ত উৎসব)। ইদানীং অল্প কিছু টোটো ছেলেমেয়ে শিক্ষায় অগ্রগতি করেছে। কেউ কেউ খুব অল্প সংখ্যায় সরকারি চাকরি করলেও টোটো সমাজ শিক্ষা ও আর্থিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ।

অন্যদিকে চা বাগানে ছোটনাগপুর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন জনজাতির মানুষরা একসঙ্গে বসবাসের ফলে এদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বহুলাংশে লুপ্ত হয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। নিজেদের ভাষা ভুলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম রূপে নতুন ভাষা 'সাদরি' ব্যবহার করছে। এ ছাড়াও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে হিসাবে প্রায় সকলেই বাংলা ও হিন্দি ভাষায় কথা বলে। চা বাগানের আদিবাসীরা স্থানীয় মানুষের কাছে 'মদেশীয়া' বলে পরিচিত।

ধর্মমতে চা বাগানের অধিকাংশ জনজাতি খ্রিস্টান বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। শারদোৎসবের সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মতো এরাও নতুন জামাকাপড় পরে। ইদানিংকালে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা অধ্যুষিত চা বাগানে কয়েকটি শাল গাছ দিয়ে বা তা না পেলে অন্য গাছ দিয়ে তাদের আদিপুরুষ ও আদিস্ত্রীরা বসবাস করে বিশ্বাসে 'জহুর যান' প্রতিষ্ঠা করে। সাঁওতাল প্রভৃতি কিছু আদিবাসী সমাজে নানা প্রকার 'বোঙ্গা'র (animistic spirit) উদ্দেশ্যেও পূজা করা হয়। কয়েকটি উৎসব যেমন– বৈশাখ মাসে সারুল/ সহরাই, মাঘে মাঘ পরব অল্প মাত্রায় হলেও পালিত হয়। ইদানিংকালে খুব ধুমধামের সঙ্গে 'করমপূজা' চা বাগানের আদিবাসী সমাজে পালিত হয়। ধর্মীয় আচরণে অ-খ্রিস্টান জনজাতির উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব এত বেশি যে, এদের আদি লৌকিক সংস্কৃতির রূপ খুঁজে পাওয়াও কঠিন।

চা বাগানের প্রত্যেক জনজাতি কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত। গোত্রগুলির মধ্যে অন্যতম, মিনজ, তিরকী, টোপনো, হেমবরম, কিসকু ইত্যাদি। চা বাগানের আদিবাসী জনজীবনে জীবিকার আমূল পরিবর্তন ও পরিবেশের প্রভাবে সামাজিক রীতিনীতিসমূহের বহুলাংশে পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময়ে বিবাহ একই গোত্রের মধ্যে নিষিদ্ধ ও একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানিং এই প্রথা সচরাচর মানা হয় না। কিছু শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বর্তমান সময়কালে চা বাগানের আদিবাসী জনগোষ্ঠী থেকে উঠে এলেও এখনও সার্বিক শিক্ষাদীক্ষায় তথা জীবনযাপনের মানোন্নয়নে এই সমাজ অন্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। উত্তরবঙ্গের আর একটি বৃহৎ দেশজ (Indegenous) জনগোষ্ঠী 'রাজবংশী'। এ অঞ্চলের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই জনজাতি গোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। উত্তরবঙ্গের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী এরাই এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী ও 'ভূমি সন্তান'। কারণ, বাঙালি ও আদিবাসীদের বেশিরভাগের মতো এরা অভিবাসী নয়। এই দেশজরা মুখ্যত স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান রাজবংশী সমাজ হিন্দুকরণ ও ইসলামিকরণের সমান্তরাল প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। গত শতকের শুরুতে গড়ে ওঠা রাজবংশী-ক্ষত্রিয় আন্দোলন মূলত ছিল এই সম্প্রদায়ের হিন্দুবর্ণ কাঠামোর উচ্চতম স্তরে উন্নীত, প্রতিষ্ঠিত বা মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্ঘবদ্ধ দাবি। তাই এই পদক্ষেপ জাতিগোষ্ঠীর সামগ্রিক সাধনের আন্দোলন বলে চিহ্নিত হলেও রাজবংশী-ক্ষত্রিয় আন্দোলন মূলত ছিল হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানমুখী।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মুখ্য দেবতা শিব। অনুমান করা হয়, এই অঞ্চলের শৈবধর্ম পরবর্তীকালে বাংলার অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি রাজবংশী সমাজ মূলত কৃষি-নির্ভর সমাজ। কৃষিকে কেন্দ্র করে এই সমাজের সমস্ত দেবদেবীর পরিকল্পনা, পূজা-পার্বণ, উৎসবকেন্দ্রিক সঙ্গীত প্রভৃতি। বিশুয়া, বৈশাখী, আষাঢ়ী, আমাতি, ধানের ফুল আনা, ক্ষেতি লক্ষ্মীর পূজা, পুষুনা, বুড়াবুড়ি, চড়ক, প্রভৃতি পুজা-পার্বনগুলি কৃষিকে কেন্দ্র করেই। এ ছাড়াও অনাবৃষ্টির জন্য কৃষির যে সমস্যা, তা নিরসনে যে হুকুমদেও ঠাকুরের পূজা, তিস্তাবুড়ির পূজা, মেচেনী গান এগুলি কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃক্ষোপসনা এই সমাজে সুপ্রচলিত। প্রত্যেক রাজবংশী গৃহে তুলসীমঞ্চ থাকে এবং যাবতীয় পূজা-আর্চা তুলসীতলায় সম্পন্ন হয়। খেতি বা ডাকলক্ষ্মী পূজাকে রাজবংশী সমাজের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্মীপূজা বলে মনে করা হয়। দীর্ঘ দিন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এই অঞ্চলে একসঙ্গে বসবাসের ফলে মুসলিম ধর্মের প্রভাব রাজবংশী সমাজে, এমনকী এখানকার বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সত্যপীর, পাগলাপীর, মাদারীপীর প্রভৃতি মুসলিম পীর-সুফিদের উরুস উৎসবে শিন্নিদান, বেড়াভাসান ইত্যাদিকে এতদঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ বলে গণ্য করা হয়।

রাজবংশী সমাজের অধিকাংশ পূজা-পার্বনের সঙ্গে সঙ্গীত সুনিবিড়ভাবে যুক্ত। তিস্তাবুড়ি, সোনারায়, মদনকাম, চড়ক প্রভৃতিতে সঙ্গীত মুখ্য ভূমিকা নেয়। এ

ছাড়াও বিবাহ বা মনসা পূজা, বিষহরি এবং সত্যপীরের পূজায় সঙ্গীতই মূল বিষয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাজবংশী সমাজের তথা উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির প্রধান উপকরণ ভাওয়াইয়া-চটকা গান।

রাজবংশী সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের আর এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নাম। 'রাভা' জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাভা জনজাতির ভাষা, সংস্কৃতি অন্যান্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। অত্যন্ত সহজ-সরল এদের জীবনযাপন, জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতেও নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা সামাজিক রীতিনীতি বজায় রেখেছে। শত দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্রকে উপেক্ষা করে মনের ক্লান্তি ও বিষণ্ণতাকে দূর করতে প্রকৃতির প্রেমে সাড়া দিয়ে রাভা যুবক-যুবতীরা যৌবনের উচ্ছ্বলতায় কোমর দোলায় মাদলের তালে তালে। রাভারা মঙ্গোলিয়ান বংশোদ্ভূত এবং ইন্দো-মঙ্গোলীয় ব্রহ্ম শাখার 'কোচ' গোষ্ঠীভুক্ত। অতীতে এরা 'কোচ' নামেই পরিচিত ছিল, পরবর্তীতে 'রাভা' নামটি অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া। রাজ্যের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলায় এই রাভা জনগোষ্ঠীর বাস। একবিংশ শতাব্দীতেও রাভা সমাজ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত।

অপরদিকে কোচ, পলিয়া, দেশী ও পশ্চাৎপদ রাজবংশী– এই চার জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সংখ্যক মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক অস্পৃশ্যতা ও অনুশাসন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গের এই ধর্মান্তরিত 'নস্য শেখ' নামী মুসলিম সমাজ যে বহুলাংশে তথাকথিত রাজবংশী সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত, তার সত্যতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই। 'নস্য' কথাটি খুব সম্ভব 'নষ্ট' কথার অপভ্রংশ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তরিত লোকরাই এই 'নস্য' বা 'নষ্ট' শেখ সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে চিহ্নিত। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও নস্য শেখ সমাজের লোকজন একই 'দেশীয়' ভাষায় কথা বলেন। রাজবংশীদের মতো এঁরাও পেশায় কৃষিজীবী। উভয় সমাজ নিজেদের 'দেশী' বা 'স্থানীয়' বলে। সে কারণেই রাজবংশীদের নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী বহু নস্য শেখের মধ্যে দেখা যায়। এই মেলবন্ধনের ফলে রাজবংশী ও নস্য শেখ সমাজের সম্প্রীতি ইতিহাসসিদ্ধ। তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ– আজও কোচবিহারের বিখ্যাত রাসমেলার শুভ উদ্বোধন হয় স্থানীয় মুসলিমদের একটি বিশেষ ছড়ি-ঘোরানো আনুষ্ঠানিক প্রথার মাধ্যমে। এ ছাড়াও মেলার মূল আকর্ষণ যে 'রাসচক্র', সেটি নির্মাণ করেন আলতাব মিঞা নামে এক শিল্পী। এই মুসলিম পরিবার বংশানুক্রমে কিছুটা 'তাজিয়া' ধরনের এই রাসচক্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মাণ করে আসছে।

উত্তরবঙ্গের দক্ষিণে 'শেরশা বাদিয়া' নামে আরও এক বহিরাগত শ্রেণির মুসলিম দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও এলাকায় এরা 'ভাটিয়া' বা শুধু 'বাদিয়া' নামে পরিচিত। কোরান শরিফের নির্দেশ বা ফরজকে এই সম্প্রদায় কঠোরভাবে মেনে চলে বলে অনেকে আবার এদের 'ফরাজী'ও বলে থাকেন। স্থানসমূহের নামানুসারে এরা ভাটিয়া, মুর্শিদাবাদী, মালদহী, আমদা বাদিয়া (বিহারী) ইত্যাদি নামেও পরিচিত। শেরশা বাদিয়াদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি স্থানীয় নস্য শেখ মুসলিম সমাজ থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গে আর যে সমস্ত ক্ষুদ্র মুসলিম জনজাতি বসবাস করে, তারা হলো ভাট, দাইল হাজাম, জোলা, আনসারি, কুলাইয়া এবং খোট্টা। এরা সকলেই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশি মুসলমান (নস্য শেখ) সমাজের মতোই পিছিয়ে থাকা ও অনুন্নত। উত্তরবঙ্গে যে মুসলিম সমাজ কয়েক পুরুষ পূর্বে রাজবংশী, কোচ, পলিয়া সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারা কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে আধুনিক যুগে উপস্থিত হলেও তাদের ঐতিহ্যগত পেশা, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সূক্ষ্ম ধারা আজও বহন করে চলেছে।

দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলিম আদিবাসীরা একত্রে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বসবাসের ফলে দেবদেবী ও পীর পূজা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। আদিবাসী সমাজের মহান্ত দেবতা বা বাসুলী দেবী কোনও কোনও মুসলিম গোষ্ঠীতে স্থানও করে নিয়েছে। নদী কিংবা জলাশয়ের ধারে অশ্বত্থ বা কুল বা শেওড়া গাছের তলায় মহন্ত দেবতার অবস্থান। অসুখ-বিসুখ, নদী ভাঙন, নৌকাডুবি, অকাল বা আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে উভয় সম্প্রদায় এই দেবতার পূজা করে। বাসুলী দেবীকে অত্যন্ত জাগ্রত দেবী রূপে গণ্য করা হয়। পাশাপাশি হিন্দুদের মতো মুসলিম সমাজেও অশুভ শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজে পীর-দরবেশ ভক্তি অত্যন্ত প্রবল। পীর-দরবেশের তিরোধান দিবসে সাধারণত তাদের মাজার বা দরগায় উরুস উপলক্ষে শিন্নি বিতরণ ও মেলার আয়োজন করা হয়। সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। পীর-দরবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বুড়াপীর, কাটাপীর, জঙ্গলপীর, ঘোড়াপীর, মুশকিল আসানপীর, একীনপীর, মাদারপীর, ঢেলপীর, ধকরপীর, ঠাকুরপীর, কান্দনিয়াপীর, মানিকপীর, সত্যপীর, তেঁতুলপীর প্রভৃতি। বিষহরি গানের মতো সত্যপীর ও মাদারপীরের গান বা পাঁচালি বিভিন্ন এলাকায় একটানা একই আসরে সাত দিন পর্যন্ত গাওয়া হয়।

খুব সংক্ষেপে উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির একটা রূপরেখা উপস্থিত করার চেষ্টা করলাম। বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসেত আক্রমণে যে মহামারী চলছে, তা থেকে উত্তরবঙ্গ মুক্ত নয়। করোনা মহামারীর ব্যাপক সংক্রমণে কাজ হারানো মানুষরা দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য হাহাকার শুরু করেছেন। অপ্রতুল সরকারি সহায়তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে চরম দুর্দশা ডেকে এনেছে। এর প্রভাব উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও ব্যাপকভাবে পড়েছে।

তথ্যসূত্র :

মধুপর্ণী ঊনবিংশ বর্ষ।। বিশেষ মালদহ জেলা সংখ্যা, ১ম ও ২য় যুগ্ম (শারদীয়া)।। ১৯৮৫

মধুপর্ণী একবিংশ বর্ষ।। বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা।। ডিসেম্বর, ১৯৮৭

মধুপর্ণী ত্রয়োবিংশ বর্ষ।। বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা।। আগস্ট, ১৯৯০

মধুপর্ণী পঞ্চবিংশ বর্ষ।। বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা।। (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যুগ্ম জেলা সংখ্যা)।। ১৩৯৯

মধুপর্ণী ত্রিংশ বর্ষ।। বিশেষ দার্জিলিঙ জেলা সংখ্যা।। নভেম্বর, ১৯৯৬

পশ্চিমবঙ্গ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা।। বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৪৮, ৪৯, ৫০।। ৮, ১৫, ২২ জুন, ২০০১

পশ্চিমবঙ্গ কোচবিহার জেলা সংখ্যা।। বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১২।। জুলাই, ২০০৬

Ahuja Ram. 2015. Indian Social system, New Delhi : Rawat Publications

Ahuja Ram, 2017. Society in India, New Delhi : Rawat Publications.

Shankar Rao, C.N, 2016. SociologyOf Indian Society , New Delhi : S, Chand & Company PvtLtd..

Oneline : Wikipedia, List of Districts of West Bwngal, accessed on 17.08.2020।

করোনার দিনগুলিতে বাংলা সাহিত্য

ঋতম মুখোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

শুধু ভয়
ছায়ার মতন পাশাপাশি হাঁটে –
শুধু ভয়
যেখানেই যাই, নাছোড় সঙ্গী হয়ে ঘোরে –
শুধু ভয়
আকাশে তাকালে তারার মতন জ্বলজ্বল করে –
শুধু ভয়
হাওয়ায় হাওয়ায় একটানা শিস দেয় –
শুধু ভয়
তর্জনী সংকেতে ডাকে বেলেঘাটা, মেডিক্যাল কলেজে –
শুধু ভয়
এই বেঁচে থাকা বলে বড় বিষময়! (ভয় / তরুণ মুখোপাধ্যায় : 'অন্য গানের ভোর' ই-ম্যাগাজিন, ২ আগস্ট ২০২০)

করোনার দিনগুলিতে আমাদের মর্মমূলে এমনই এক ভয় যেন তাড়া করে ফেরে। তেরোই মার্চ যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষবার ক্লাস নিতে গিয়েছিলাম, সেদিনও ভালো করে জানতাম না করোনা কী কিংবা লকডাউন কাকে বলে। এমনকি পনেরো দিনের জন্য শিক্ষালয় ছুটি ঘোষণার পরেও বাইরে বেরিয়েছি জরুরি দরকারে মাস্ক ছাড়াই। কিন্তু তারপর? তার আর পর নেই... ক্রমশ এক অজানা অসুখের ভয় আমাদের গ্রাস করেছে। মাস্ক, স্যানিটাইজার, কো-মর্বিডিটি, কোয়ারান্টিন, লকডাউন, আনলক– এইসব শব্দবন্ধের সঙ্গে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়েছি আমরা। মৃত্যুমিছিল, বেকারত্ব, অর্থসঙ্কট, খাদ্যাভাব, পরিযায়ী শ্রমিক এসবের সঙ্গে ঘর করতে করতেও আমরা দমে যাইনি। ভয়ের রাজত্বের মধ্যেও সৃষ্টিশীল মানুষেরা তাঁদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। ছবি, কবিতা, গান, প্রবন্ধ বা গল্প-উপন্যাসের কমতি পড়েনি কোথাও। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-ছোট পত্রিকা ইত্যাদির আয়োজনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মিছিলের মতো ভিড় করেছে ওয়েবিনার কিংবা ওয়েব লেকচার সিরিজ। আর সেসবের কেন্দ্রে প্রায়শ ফিরে এসেছে মহামারী আর অতিমারী প্রসঙ্গ। কখনো মধ্যযুগ বা আধুনিক বাংলা সাহিত্য কখনো বা বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে এইসব অসুখের চিহ্ন খুঁজে ফিরেছেন গবেষক-আলোচকের দল। কিন্তু মানুষ তো কেবল স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচে না; সমকালের অনিবার্য ছাপ পড়ে তার মননে, যাপনে। আর তাই করোনাকালীন নানা ঘটনার অভিঘাতে বাংলা সাহিত্য 'নিউ নর্মাল' হয়ে উঠতে থাকে। বাণিজ্যিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, সংবাদপত্র, ওয়েবজিন কিংবা ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপকে প্ল্যাটফর্ম করেই লেখা হয় 'করোনার দিনগুলিতে প্রেম', 'করোনাকালীন', 'লকডাউনের গল্প', 'করোনার গল্প', 'ভাইরাস', 'কোভিড-১৯', 'লকডাউনের দিনলিপি-র মতো অসংখ্য রচনা বা গ্রন্থ। সেগুলির সাহিত্যমূল্য কতখানি শাশ্বত কিংবা সেগুলি ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কিনা তা বিচারের সময় এখনও আসেনি। বরং এই করোনাকালীন সাহিত্যের দর্পণে আমরা নিজেদের মনোলোকের ছবি খুঁজে ফিরি – কখনো তা বেদনাবিধুর, কখনো কৌতুকমাখা, কখনো বা ক্ষীণ আশাবাদী।

২

সাহিত্যে মহামারীর ছায়া বিশ্বসাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে বারবার পড়েছে। প্লেগ-কলেরা-বসন্ত নানা প্রেক্ষিত রচনা করেছে। কাম্যুর ‘প্লেগ’ কিংবা মার্কেজের ‘লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা’ অথবা সারামাগোর ‘ব্লাইন্ডনেস’ বহুচর্চিত উপন্যাস। আর সেইসূত্র ধরেই যখন গুরুচণ্ডালি ওয়েবজিনে পড়তে শুরু করি অনুরাধা কুণ্ডার ‘করোনাকালীন’ ধারাবাহিক উপন্যাস; তার গতি, বাস্তবতা আর ভাষার বাঁধুনিতে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ছোট ছোট উপশিরোনামে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন অনুরাধা। একটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ত্রিদিব-মালবিকার পরিবার কাহিনির কেন্দ্রে, আর তারই পাশাপাশি চলে সমান্তরাল অসংখ্য আখ্যান। সেই আখ্যানে বস্তিবাসী পরিচারিকা শ্যামা-সুখনলাল, দক্ষিণ ভারতের অনিল টমাসও যুক্ত হয়ে থাকেন। কোভিড-১৯কে কেন্দ্র করে সামাজিক সঙ্কট, রাজনীতি, অনলাইন টিচিং, কোয়ারান্টিন সেন্টারের বিশ্বস্ত ছবি, পরিযায়ী শ্রমিকদের অনন্ত পথ হাঁটা এবং ক্রমশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার নির্মম বর্ণনা আবার লকডাউনের বদ্ধ পরিসরে পারিবারিক জীবনের নানা জটিলতা এই উপন্যাসে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। আর সেই অন্ধকারের মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে আছে অদিতি-দেবরূপের প্রেম। কখনো মালবিকার মেয়ে টুপুর টিকটিকি এবং মৃত ইরফান পাঠানের সঙ্গে কথা বলে, সেখানে ব্যক্তিজীবন থেকে করোনাকালীন নানা প্রসঙ্গে এসে যায়, ত্রিদিব কথা বলেন মৃতা ঠাকুমার সঙ্গে– আসলে এসবই অল্টার ইগো। ২১জুন ২০২০-তে পোস্ট হওয়া এই উপন্যাসের আরেকটি পর্বও হয়তো পরে লেখা হবে। তবে বস্তিবাসী স্বামী পরিত্যক্তা শ্যামার লড়াইয়ের আত্মবিশ্বাস দিয়ে কাহিনির প্রথম পর্ব শেষ হতে দেখি আমরা, সেখানেও আসন্ন সাইক্লোন আমফানেরও আভাস দেয় শ্যামার স্বাবলম্বী বন্ধু হরপ্রীত। আপাতত এই উপন্যাসের তিনটি অংশ পাঠকদের স্বার্থে উদ্ধার করা যায় :

ইরফানের দীর্ঘ স্লিম শরীর চেয়ারে শয়ান। মাথা হাতের পেছনে।

ইয়ে ভাইরাস মিউটেট করতা হ্যায়। তো আদমি ক্যা করে? বোলো?

ও হেসে ফেলেছে।

মিউটেট করে?

এগজ্যাক্টলি। আদমি কো ভি মিউটেট করনা পড়েগা। যো জিতা হ্যায় ওহি সিকান্দর। ভাইরাস কো বোলো, তুমভি চলো। হামভি চলো।

এরপর আকাশে দুন্দুভি বেজে ওঠে। পুষ্পবৃষ্টি হয় না। কিন্তু অশ্রুত গান বাজে।

কিছু না। কিছু না। কিছু নেই।

সব ফাঁকা। শূন্য। সব তো জানা ছিল না। দিনের পর দিন টিভিতে দেখেছেন। মৃতদেহ টেনে নিয়ে পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। একের পর এক কোভিডে মৃত। কোনও দেহ পরিবারের হাতে দেওয়া হবে না। তবু মালবিকা যেন ভাবতে পারছেন না। মায়ের মুখ আর দেখা যাবে না। মৃত জননীর হাত স্পর্শ করে উত্তাপ নেওয়ার বৃথা চেষ্টাও করা যাবে না। মালবিকা বারবার মেডিক্যাল পার্সোনেলদের বলেছেন। একবার। প্লিজ একবার। একবার। তাঁর বিশ্বাস ছিল ব্রতর বন্ধু যখন, তখন একবার দেখা যাবে। কোনও ফল হয়নি। কর্তৃপক্ষ নিয়ম মেনে চলেছেন। তাঁদের উপায় নেই।

না জুহি, না শ্যামা, না বাবলু, না তার নিজের মা। এক পা চলার ক্ষমতা, ইচ্ছা কিছুই নাই। বাড়িতে যাওয়ার কথাও মনে নাই এই বেহুঁশ বেদনায় । সুখন চিৎ হয়ে পড়ে রইল। এই চিৎ পড়ে থাকা জ্বর গায়ে। হাঁটা নাই। খাবার আছে। খাবার ক্ষমতা নেই। সুখনলাল মিস্ত্রি। ক্যাম্প নাম্বার ছয়। বেড নাম্বার বাইশ। নাগপুর কোভিড ক্যাম্প। এই মুহূর্তে এটাই তার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

অনুরাধা কুণ্ডার এই ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রথম পর্বের পাঠকরা সকলেই এর গতি ও বাস্তবতায় মুগ্ধ, কেউ বা বহুচরিত্রের সমাবেশে চরিত্রেরা গভীরভাবে ফুটে ওঠেনি, এমন মন্তব্যও করেছেন কমেন্ট বক্সে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই এই আখ্যান প্রতিবেদনসুলভ লক্ষণ নিয়েও করোনাকালের বিপন্নতাকে নিখুঁতভাবে তুলে এনেছে। টুপুরের বিদেশিনী গবেষিকা বন্ধু নিকোলের লেখা ‘ইকোফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচ টু এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড পলিউশন’ বই যেন কোভিডের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, তাকে ইমেলে সেই বই চেয়ে পাঠায় টুপুর। বন্ধুদের সহযোগিতায় ভয় কাটিয়ে ওঠে কোয়ারান্টিন সেন্টার ফেরত শ্যামা। মৃত্যু আর ভয়ের অন্ধকারের পরেও ভালো থাকার অলীক বাতাসে ভর করে অনিল, টুপুর, শ্যামারা নতুন করে জেগে ওঠে।

এই সময়েই লেখা হয়েছে রিনি গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস ‘করোনার দিনগুলি ও প্রেম’ (সপ্তর্ষি প্রকাশন)। বইয়ের ব্লার্বে লেখা হয় : ‘বাস্তবতার মাটি ছুঁয়ে এ এক নির্মোহ আখ্যান। যেখানে প্রতিটি চরিত্র প্রতিটির সঙ্গে সংযুক্ত এক অদৃশ্য বিনিসুতোর মালায়। দৈনন্দিন চারপাশের বেঁচে থাকা এই উপন্যাসের যেমন ভরকেন্দ্র ঠিক তেমনই সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যে অতিমারী মুহূর্তের মধ্যে অসহায় করে দিল মানবসভ্যতাকে তার দিনলিপিও এই ঘটনাপ্রবাহের পাতায় পাতায়’। প্রথমা, এলা, তিতলি, দিতি, পর্জন্যা– একই আবাসনের পাঁচটি মেয়ের জীবনযাপন কিভাবে এই করোনাক্রান্ত সময় ও লকডাউনের মধ্যে প্রেমের বিবিধ মাত্রা খুঁজে পায় তাকেই রিনি দেখিয়েছেন। কেউ সাংবাদিক, কেউ সেলস গার্ল, কেউ বা গৃহবধূ, কেউ বা অধ্যাপিকা – করোনা কারো নিকটজনকে কেড়ে নেয়, কেউ বা লকডাউনে আবিষ্কার করে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের অস্তিত্ব, আর কেউ চায় সুবিধাবাদী মানসিকতার লিভ-ইন পার্টনার বসের আপত্তি সত্ত্বেও সৎ সাংবাদিক (পর্জন্যা) হিসাবে করোনাকালীন সত্যকেই মানুষের সামনে তুলে আনতে। তারা নানাভাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক রক্তাক্ত হয়। যদিও কাহিনির শেষে ব্যক্তি প্রেম থেকে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয় তারা সকলেই। কেউ বা নিজের সঙ্গীত প্রতিভাকে আবিষ্কার করে ফেসবুকে আত্মপ্রকাশ করে। ‘করোনার দিনগুলি ও প্রেম’ এইভাবে মানবিক মূল্যবোধে উজ্জ্বল এক সমকালীন আখ্যান।

৩

ছোটগল্প এবং অণুগল্পের ভিতরে করোনার ছায়া বিস্তীর্ণভাবে পড়েছে। প্রথমেই মনে পড়ে ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর ছুটিতে প্রকাশিত ইন্দ্রনীল সান্যালের ‘লকডাউনের গল্প’ (২৩ অগাস্ট ২০২০)। এই সময়কে ইন্দ্রনীল অনুবাদ করেছেন তাঁর একাধিক কাহিনিতে। উল্লিখিত গল্পটি লঘুরসের গল্প, যেখানে একটি কোয়ারান্টিন সেন্টারে দু’জন বিবাহিত নারী ও পুরুষের আলাপ হয় বাংলা খিস্তিশেখার প্রসঙ্গে। এ-গল্পে স্কুলবাড়িতে কোয়ারান্টিন সেন্টার করার ফলে আইসোলেশনে থাকা নারী-পুরুষদের নানা সমস্যা, অসহিষ্ণুতা ফুটে ওঠে। একজন মহিলা এসি এবং অ্যাটাচড বাথরুম না পেয়ে অসন্তুষ্ট দেখি। গল্পের প্রধান

দুই চরিত্রের কথোপকথনে ধরা পড়ে তাদের বাড়ির ছবি – পরকীয়া করা স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি উভয়েই বিরক্ত, কিন্তু সন্তানের মুখ চেয়ে সংসার টিকিয়ে রাখে তারা। প্রতিশোধ নিতে মদের দোকানের মালিক সমীরণবাবু শান্তিনিকেতনে পড়া প্রার্থনাদেবীকে প্রেম করার প্রস্তাব দেন। যদিও প্রার্থনা রাজি হন না, তাঁর বক্তব্য : ‘‘বাংলা বা ইংরেজি কোনও ‘লাভ’ই নেই। ম্যারেড লাইফ একটা অভ্যেস। শুধু প্রেম দিয়ে সংসার চলে না। আমার আর দীপেশের মধ্যে সমস্যা রয়েছে বলে সুমেধা সাফার করবে কেন?, সমীরণও অনিন্দ্যসুন্দরের সঙ্গে প্রেম করা সুগৃহিণী লতা এবং কানাডাবাসী সন্তান নন্দনের কথা ভেবে প্রার্থনাকে বাংলা গালাগাল শেখানোর বিনিময়ে ইংরেজি গালাগাল শেখায় মন দেন। গল্পটি একটু আকস্মিক শেষ হয়েছে, হয়তো শব্দসীমা এক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেছে। কিন্তু এ-গল্পেও অতিমারী করোনার চিহ্ন অত্যন্ত নিবিড়। দেখা যায়, প্রার্থনা কোয়ারান্টিন সেন্টারে বসে ‘অতিমারীতে সংসার সামলানোর উপায়’ নামে বই লেখার কথা ভাবেন। যেখানে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে কী কী সঙ্গে নিতে হবে আর কী কী বাড়িতে রাখতে হবে তা বলা হবে। তাছাড়া তার কথায় ফুটে ওঠে করোনাকালীন হাসপাতাল-চিত্র, আইসোলেশন, করোনায় মৃত মানুষদের বস্তায় ভরে কেমিক্যাল মাখিয়ে অনাদরে-অবহেলায় দাহ করার ছবি; যা সমীরণকে আতঙ্কিত করেছে। দুজনেই স্ত্রী ও স্বামীর মৃত্যু চান তাঁদের পরকীয়ার জন্য। তবুও এই গল্পের সমাপ্তি জীবনমুখী।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর ‘দৈব’ (দেশ, ২ মে ২০২০) গল্পে এক মিষ্টি প্রেমের আখ্যান পাই, যা এই অদৃশ্য ভাইরাস সংক্রান্ত অস্থির সময়েই লেখা। যদিও লেখক সমকালের দুর্দৈবকে তুলে ধরতে চাননি, ফিরে গিয়েছেন অতীতের কাছে।

করোনার সময়ে অণুগল্পের একটা জোয়ার এসেছে নতুন করে। সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি ই-বইও বেরোচ্ছে কিছু কিছু পিডিএফ আকারে। আবার মুদ্রিত রূপও পাচ্ছে বেশ কিছু বই। এমনই একটি অণুগল্প-গ্রন্থপ্রদীপ ঘোষের ‘করোনার গল্প’ (পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনী)। এই গল্পগ্রন্থে প্রদীপ করোনাকালীন বাস্তবকে টুকরো ছবির কোলাজে নিখুঁতভাবে ধরেছেন। বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে এই লকডাউন ও করোনার প্রেক্ষিতে কিভাবে অর্থাভাব, অকালমৃত্যু, স্বার্থান্বেষণ, পারবারিক সঙ্কট, জ্যোতিষের বুজরুকি কিংবা নিছক মজাগল্পের উপাদান হতে পারে, তা তিনি নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। ‘পেশা’ গল্পে সাংবাদিকতার পেশায় সততা কিভাবে মৃত্যু ডেকে আনে তার বাস্তবচিহ্ন বর্তমান। সেখানে সাংবাদিক অনির্বাণ রুদ্র টাকা বা রাজনৈতিক চাপ কোনো কিছুকেই পরোয়া না করে করোনায় মৃত্যুর সঠিক হিসাব দিতে গিয়ে সরকারি রোষে পড়ে, যার পরিণাম মিথ্যা অভিযোগে হাজতবাস ও রহস্যময় মৃত্যু। ‘মর্মান্তিক’ গল্পে এই কঠিন সময়ে নিয়ম মেনে বিয়ে সেরেও নববধূ শ্রেয়ার মাস্কসহ সাবধানতা না মেনে সবাইকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণামে শ্রদ্ধা বিফলে যায়, সে করোনায় মারা যায়; আবার ‘ইতিহাস’ গল্পে পুত্রের স্মৃতিকথায় উপযুক্ত নিরাপত্তা ছাড়াই চিকিৎসা করতে গিয়ে আদর্শবাদী সরকারি চিকিৎসক বাবার মৃত্যু আমাদের বেদনার্ত করে। হাসির উপাদান এনে দিয়েছে ‘দ্বিতীয় শ্বশুর’ গল্পে রং নম্বরের ফোনে বিয়ের বাজেট কম করে নতুন জামাইকে গাড়ি উপহার দেওয়ার প্রস্তাব কিংবা ‘দশভুজা’ গল্পে বাইরে বেরনো বন্ধ করতে বাড়ির বৌমার নাপিত হয়ে সকলের চুল ছেঁটে দেওয়ার কাহিনি। ‘ন্যায্য দাবি’ গল্পটি বেসরকারি স্কুলের করোনা ও লকডাউনের মধ্যেও অকারণ ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে অভিভাবকদের রাস্তা অবরোধের বাস্তব সঙ্কটকে স্বল্প পরিসরে তুলে আনে, পুলিশও এ-দাবিকে ন্যায্য বলে মেনে নেয়।

আবার সরোজ কর্মকারের একটি অণুগল্প ‘জানি না’ : করোনার লকডাউনে বাবা-মেয়ের জেনারেল নলেজ নিয়ে খেলা চলে, যদিও শেষে বাবা নীরব হয়ে যান এই প্রশ্নের উত্তরে ‘আমি আবার কবে বাইরে খেলতে যেতে পারব?’ – করোনার এই বিধিনিষেধের বাজারে বন্দি-শৈশবের কাছে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কেউ আজ নেই। আবার ’করোনা’ নাম দিয়েই তরুণ মুখোপাধ্যায় লেখেন আরেক ব্রাহ্মণ পূজারীর অন্ধ বিশ্বাসের গল্প, ধ্যানেশ্বরবাবুর বিশ্বাস গোমূত্র, গোময় আর গঙ্গাজল ও দুধের মিশ্রণ খেলেই করোনামুক্তি ঘটে, যদিও নিজেই করোনাক্রান্ত হয়ে তিনি ইহজগতের মায়া কাটান। একশ্রেণির মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, যা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনেই রচিত। আবার করোনার এই ভয়ংকর সময়েও একজন মাস-মাইনের ড্রাইভার কীভাবে আগাম পুজোর বোনাসের জন্য কাতর হয়ে ওঠে ভূত-ভবিষ্যৎ না ভেবেই, তা ‘বোনাস’ নামের ব্যঙ্গ অণুগল্পের বিষয় করেছেন তিনি। মালদানিবাসী জয়দেব লাহিড়ীর ‘মেহমান’ অণুগল্পে লক্ষ করা যায় কিভাবে ব্যবসায় ক্ষতি এই লকডাউনে এক সুস্থ ব্যবসায়ী নীলেন্দুকে পাগল বানিয়ে দেয়। অনির্বাণ চক্রবর্তীর ফেসবুকে পোস্ট করা গল্প ‘প্রেগন্যান্ট’ তুলে এনেছে বিরাট কোহলি পত্নী অনুষ্কার এই করোনার অবকাশে সন্তানসম্ভবা হওয়ার খবরে কিভাবে কোহলি-অনুরাগিণীরা মা হওয়ার আনন্দ পাচ্ছেন, সেই মজার গল্প। প্রত্যেক স্ত্রী, বান্ধবী বা সহকর্মিণী মা হতে চলেছেন শুনে পুরুষেরা প্রথমে চমকালেও পরে সত্যটা তারা বোঝে। অনুজা শেঠ সোম লেখেন অণুগল্প ‘বুজি’ সেখানে প্রেমের উষ্ণতায় বাঙালি প্রেমিকের আদর্শকে বরণ করে নেয় অ্যাফ্রো-আমেরিকান প্রেমিকা ক্যারোলিনা, গল্পের প্রেক্ষাপটে করোনা এবং আমেরিকায় কালো মানুষ জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদ।

৪

লকডাউন হোক কিংবা আনলকডাউন – এখন করোনা-সাহিত্যের জন্মভূমি ফেসবুক এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া। গত কয়েকমাসে নিজের ফেসবুকের দেওয়ালে প্রাসঙ্গিক বহু লিমেরিকের লেখক শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, যেমন :

১) করোনা, তুমি কি গর্বিত আছো, নিজের হত্যালীলায় মুগ্ধ?
চিতা ও কবরে ছেয়ে গেল ভূমি, আতঙ্কে কাঁপে বিশ্বসুদ্ধ।
তবে এ খবর দাও তুমি রেখে –
মানুষ নিজেই মেরেছে নিজেকে
বহু বহু বেশি, নানান ছুতোয় বাধিয়ে নানান মাপের যুদ্ধ। (করোনাকে প্রশ্ন)

২) করোনা হলো, তো ক্রিমিন্যাল তুমি, অচ্ছুত, অধঃপতিত;
কিছুই তোমার সপক্ষে নেই – ভবিষ্যৎ বা অতীতও।
কোনোখানে ঠাঁই পাবে না তো আর,
এইখান থেকে ওখানে ‘রেফার’ –
ঠাঁই হবে শেষে শ্মশানে, চিতায়? আর কোনও নেই গতি তো। (কোথায় যাবে?)

৩) মদ নেই তাতে সমস্যা কী গো! পেটে ঢালো

স্যানিটাইজার।
কেন মিছে ভাবো – ঈশ্বর আছে, আর কোনও গতি নেই যার।
মৃত্যু-মিছিল এই দেশ দ্যাখে,
মন্দির গড়ে ওঠে একে-একে,
প্রশ্ন করে না, কবে সুচেতনা will get us wiser। (বিকল্প)
৪) পূর্বে ছিল ভান, অভিনয় – প্রতারকের নিখুঁত চিহ্ন;
এখন মুখোশ মান পেয়েছে, আর সে এখন নয়কো ঘৃণ্য।
ঘৃণ্য যে, সে ধন্য হলো,
মহানন্দে সেল্‌ফি তোলো।
মানুষের সে পরিত্রাতা – ধরাধামে অবতীর্ণ। (মুখোশ)

এসব লিমেরিকে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, সমাজ ও রাজনীতি মনস্কতার স্পষ্ট পরিচয় মেলে, কখনো বা ব্যঙ্গবিদ্ধ হয় সরকারি ব্যবস্থাও। ফেসবুকে- হোয়াটস্যাপ গ্রুপে- ইউটিউবে কবিতায় করোনা নিয়ে অনেকে সরব হয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইরকম :

১) প্রাণে গান নেই, মাস্কে আটক নব-বসুধা
কোভিডের ক্লেশে ক্লাসে নেই দ্যাখো অমল ও সুধা।
ক্যালেন্ডারে বা আকাশে তবুও শ্রাবণ আসে
প্রেমে-প্রত্যয়ে, অতিমারী-ত্রাসে, সর্বনাশে। (বাইশে শ্রাবণ ২০২০ / হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)

২) তবুও আশায় আছি –
আবার আসবে ছন্দ
স্থবির এ জীবনে। (তবুও আশায় আছি / অশোক মুখোপাধ্যায়)

ফেসবুক পোস্টে একাধিক প্রবীণ কবির বিভিন্ন কবিতা চোখে পড়ে যেখানে করোনাকালের স্পষ্ট ছায়া পড়েছে। এমন তিনজন কবি হলেন ঊর্মিলা চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি মজুমদার এবং জগন্ময় মজুমদার। ঊর্মিলা চক্রবর্তী (জন্ম- ১৯৪৬) মেধাবী কবি, আটের দশক থেকে তাঁর লেখালেখি শুরু। তাঁর এই পর্বে লেখা কবিতার মধ্যে রয়েছে 'মহামারী', 'কোভিড-১৯', 'পরাজয়' 'ত্রাণ', 'গ্রহের ফের'। প্রথম দুটি কবিতায় নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুর ছায়া আর পরের দুটিতে আমফান ঝড়, ত্রাণকে কেন্দ্র করে সমাজমনস্কতার পরিচয় মেলে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মন ছুঁয়ে যায় : 'চারটে দেয়াল আচমকাই জাপটে ধরল। ড্রয়িংরুমের পচাকাঠে / শিকড়বাঁধা অর্কিডের মতো ছটফট করে উঠল জীবন'; 'ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে হাত নেড়ে চলে যায়, চেনামুখ আজ নয় একটুও চেনা'; 'ওদের প্রসন্ন প্রত্যাখ্যানে / ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এল আমাদের ঠুনকো সহানুভূতি'। কবি প্রশ্ন করেন এই কষে গিঁট বাঁধা চার দেওয়ালের মাঝে, একা দমবন্ধ নিরাপত্তার কানাগলিতেই কি মেলতে হবে 'মনের ডানা'? আবার কোথাও বা তিনি ঈষৎ আশাবাদী 'লক্ষকোটি একা মানুষ ভিড় করেছে এ কোন গ্রহের ফের / মুখোশ খুলে প্রেমিক মানুষ শ্বাস নিতে চায় খোলা হাওয়ায় ফের।' (গ্রহের ফের) সত্যিই করোনা-উত্তর জীবনযাত্রা আমাদের এখনও যে দারুণ অজানা। অন্য দুই কবিরও একাধিক প্রাসঙ্গিক কবিতার সন্ধান মেলে, এখানে দু-টুকরো উদ্ধার করা হলো :

১) প্রণামের আলো মুছে যাচ্ছে উঠোনে
চরাচর রুদ্ধ। বিদ্ধ চাওয়া –
মন্ত্রোচ্চারণের কণ্ঠ
রুদ্ধ করোনায়। (কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে / শ্যামলকান্তি মজুমদার)

২) মাকালতলার পুকুরে মাছের মুখে মাস্ক
রক্ত গড়ায়
প্রাতর্ভ্রমণের পায়ে চটি নেই
সব দিন রোববার। (করোনা-কাল / জগন্ময় মজুমদার)

এই সময়েই প্রকাশ পাচ্ছে তরুণ মুখোপাধ্যায়ের এক ফর্মার কাব্যপুস্তিকা 'ভাইরাস' (প্রজ্ঞা বিকাশ)। এ-গ্রন্থেও ছড়া, কবিতা ও প্যারোডিতে করোনাকালীন সময়কে ধরা হয়েছে এবং সেগুলি বিষাদ ও কৌতুকের যুগলবেণী রচনা করেছে। চারটি নমুনা :

১) কাঁটা ভরা অঙ্গ
আরে, একি রঙ্গ!
বলে, দেখি ধরোনা –
আমি ভূত করোনা! (করোনা ভূত)

২) ব্যাধিক্লান্ত এ-পৃথিবী জীবাণু-জর্জর,
'অন্ন চাই, প্রাণ চাই', চাই মনোবল –
শোনাও শোনাও কবি আশ্বাসের গান। (বৈশাখী সনেট)

৩) ঘরবন্দি, বাঘবন্দি খেলছি একা একা –
স্বজন-সুজন যাকেই ডাকি, পাই না কারো দেখা।
হাত বাড়ালেও বন্ধু নয়,
আঙুল ছুঁতেও সন্দ হয়;
খাতার পাতায় দিনরাত্রি খেলছি লেখা-লেখা। (লিমেরিক)

৪) কোন্ উহানের দেশে এলে হেথা ভেসে
কোন্ মারণের সুরে বাজাও মরণবীণা?
হে করোনা।। ('হে নবীনা' রবীন্দ্রগানের প্যারোডি)

৫

করোনার দিনগুলিতে প্রতি মুহূর্তে সাহিত্যচর্চা হয়ে চলেছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। মৌলিক সাহিত্যরচনার পাশাপাশি চিত্রকলা, কবিতার অনুবাদ (লকডাউনে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ সাহা দীপ্তি নাভালের 'লম্‌হা লম্‌হা'নামক হিন্দি কাব্যগ্রন্থ ফেসবুকে নিয়মিত প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছেন), ব্যক্তিগত গদ্য, জার্নাল কিংবা মহামারী নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংবাদপত্র, মুদ্রিত ও ই-ম্যাগাজিন বা ই-বুকের পাতায় খুঁজে পাচ্ছি প্রতিনিয়ত। 'এখন শান্তিনিকেতন'এর ব্লগ কিংবা 'মহুল'এর করোনা ডায়েরিতেও পড়েছে এই করোনাকালের গাঢ় ছায়া। করোনাকালীন সাহিত্যের গায়ে বাস্তবের প্রতিটি খুঁটিনাটি চিহ্ন যেন উজ্জ্বল হয়ে লেগে আছে। অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লকডাউনের ডায়েরি জানায় 'সব তারিখ মিলেমিশে যেন প্রকাণ্ড মণ্ড পাকিয়ে গেছে! জাদুবাস্তব সেই ক্যালেন্ডারের ভবিষ্যতের চৌকো ঘরগুলোই শুধু ধূসর, অস্পষ্ট'। এক উদাসীন দার্শনিকতাও ভর করে যেন আমাদের। তবু মৃত্যুভয় আর অনিশ্চয়ের দোলা বুকে নিয়ে আমরা ব্রেশ্‌টের মতো অন্ধকার দিনের গান গাই। জীবনানন্দের মতো ভাবতে চাই 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'। করোনার দিনগুলিতে বাংলা সাহিত্য আমার কাছে তাই অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত সুচেতনা; যদিও সে-চেতনা ঈষৎ আশাবাদী হয়েও অনেকাংশেই নিরাশাকরোজ্জ্বল।

কলকাতার ক্লাব 'কালচার' এক অজানা ইতিহাসের সন্ধানে

সৌমিতা মজুমদার

অঙ্কন ■ দেবনাথ নন্দী

বর্তমানে কলকাতার অলিতে-গলিতে, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা ক্লাবগুলোর একটা প্রাত্যহিক উপস্থিতি আছে শহরবাসীর জীবনে। তাদের ঘিরে তৈরি হয়েছে আমাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তা সে ফি বছর শারদোৎসবে সাবেকিয়ানার সাথে 'থিম' পুজোর শৈল্পিক লড়াই বা বন্যাত্রাণ সংগ্রহ করাই হোক না কেন। এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগসূত্রের কাজ করে তারা, হয়ে ওঠে নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের জনসংযোগের মাধ্যম। আর এভাবেই জীবনের নানান ক্ষেত্রে, এই পাড়ার সঙ্গে ওই পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক সেতুবন্ধনের কাজ করে দলগুলি। আবার অনেক সময়েই দেখা যায় বিভিন্ন কারণবশত বহু অধিবাসীই তাঁদের পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে দূরত্ব বজায়ে রেখে চলেন। তখন ক্লাব ঘর হয়ে ওঠে 'বখাটে' আর 'বেকার' ছেলেদের আড্ডা, ক্যারাম আর তাস খেলার জায়গা। অতএব ভালো-মন্দ দুই মিশেই পাড়ার ক্লাবগুলি হয়ে ওঠে বাঙালির সমষ্টিগত বেঁচে থাকার প্রমাণপত্র।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই সব কথাই আমাদের কমবেশি জানা। দৈনন্দিন পর্যায়ে এই কাজকর্মগুলির সঙ্গে অনেক মানুষই পরিচিত। কলকাতা শহরে যে নানা রূপ, রঙ, বর্ণ, গন্ধের ছোট-বড় ক্লাবগুলি রয়েছে, তাদের অনেকের বয়স একশো বছরের কাছাকাছি বা তার বেশি। কিছু আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালের গর্ভে হারিয়েও গিয়েছে। যা রয়ে গিয়েছে, তা হলো এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে পথ চলা এই শহরের পরতে পরতে এমন অনেক বিষয় বা অধ্যায় লুকিয়ে আছে, যার সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এখনও অধরা। আমাদের সুপরিচিত এই ক্লাবগুলির পরিণতি খানিকটা সে রকমই হয়েছে। তাদের বর্তমানের জলুসের ভারে তলিয়ে গিয়েছে অতীতের স্মৃতি। অথচ বিংশ শতকের ঔপনিবেশিক কলকাতার সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে বা লিখতে গেলে ক্লাব 'কালচার'-এর অবদান অস্বীকার করা অসম্ভব। তারা একটা বিগত সময়ের দলিল, স্বাধীনতার লড়াইয়ের সাক্ষী। শহুরে রাজনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরোধিতা গড়ে তোলার কাজে, গভীরভাবে সহযোগী ছিল এই পাড়াভিত্তিক সংগঠনগুলি। তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেক ব্যক্তিত্ব, যাঁরা স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে বিস্মৃত হয়েছেন। কলকাতার বহু আলোচিত ইতিহাসের এই আপাত অব্যক্ত অধ্যায়ের উপর আলকপাত করা এই লেখাটির উদ্দেশ্য। সর্বোপরি বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যখন 'দেশপ্রেম' এবং 'জাতীয়তাবাদ' খুবই স্পর্শকাতর এবং বিতর্কিত বিষয়, স্বাধীনতার সংগ্রামকে বোঝানো হয় কয়েকটি বড় ব্রিটিশ-

বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ও সাম্প্রদায়িকতার নিরিখে– তখন এইসব আঞ্চলিক প্রতিরোধের ইতিহাসকে ফিরে দেখা আব্যশিক হয়ে ওঠে।

কলকাতায় ক্লাব ‘কালচার’-এর সূত্রপাত প্রায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে। ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থাপিত ইউরোপীয় ঘরানার ধারক ও বাহক, অভিজাত ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলির বিপরীত মেরুতে অবস্থান তাদের। যাত্রা-থিয়েটার, সাহিত্য চর্চা থেকে গান-বাজনা, কীর্তন বা ফুটবল খেলা– ক্লাবগুলোর পরিধি ছিল অবাধ এবং বিস্তারিত। নানা রকমের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা পল্লিবাসীর মধ্যে সামাজিক সেতুবন্ধনের চেষ্টা করত। ব্রিটিশ সরকারের নথি ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখতে পাওয়া যাবে, ১৯২০ সাল নাগাদ কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৫০-এরও বেশি ক্লাব ছিল। যত দিন গিয়েছে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। এদের মধ্যে শরীরচর্চার ক্লাব বা ‘আখড়া’ তাদের রাজনৈতিক চরিত্রের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসে।

শুরুর সময় থেকেই কলকাতার ক্লাবগুলির মধ্যে ব্যায়াম, কুস্তি, জিমন্যাসস্টিক ইত্যাদি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। আসলে বাঙালির ক্লাব উদ্যোগ আর শরীরচর্চার ইতিহাস– এই দু'টি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির পর্যালোচনা করা অসম্ভব এবং অসম্পূর্ণ একটি প্রয়াস। এর মূল জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ব্রিটিশদের নজরে বাঙালি পুরুষরা বরাবরই ছিল ভীরু, কাপুরুষ, অলস প্রকৃতির, দুর্বল এবং পেশি শক্তিহীন। তাঁদের আপাত নরম শারীরিক গঠনের জন্য তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপীয়ানদের ঠাট্টা-তামাশার পাত্র এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে শুরু হয় বাঙালি পুরুষের শরীর গঠনের যাত্রা। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্রের ‘হিন্দু মেলা’, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তী সময়ে অরবিন্দ ঘোষ তার সঙ্গে চরমপন্থী রাজনীতিকে মিলিয়ে দেন। বাগবাজার, শ্যামবাজার, বউবাজার, আহিরীটোলা সহ উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরি হতে থাকে ছোট ছোট আখড়া। এই পদক্ষেপে অনেক ক্ষেত্রেই অভিজাত এবং ভদ্রলোক শ্রেণির মানুষদের উদ্যম এবং সক্রিয় সাহায্য ছিল। যেমন, বিডন স্ট্রিটের বিখ্যাত ছাতু বাবু-লাটুবাবু জুটি বা দর্জিপাড়ার অম্বু গুহ-ক্ষেতু গুহ প্রমুখ। বিভিন্ন ব্যায়ামবিদ এবং জিমন্যাসস্টিক শিক্ষকের তদারকিতে, এলাকার কিশোর-যুবকদের নিয়ে চলতে থাকে লাঠি খেলার কসরত এবং কুস্তির মারপ্যাঁচ। গৌরমোহন মুখার্জি এবং তাঁর ছাত্র প্রিয়নাথ বোসের (যিনি পরবর্তীকালে বাংলার প্রথম সার্কাস শুরু করেন) কথা এখানে বিশেষভাবে উঠে আসে। বলা হয়, পেশায় অ্যাটর্নি গৌরমোহন না কি এত প্রভাবশালী ছিলেন যে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মাতাল ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পাড়ার সীমানা ছাড়া করতেন। নিজে বেনিয়াটোলার বটকৃষ্ণ দত্তের আখড়াতে জিমন্যাসস্টিক শিখে তিনি ছাত্র প্রিয়নাথের সঙ্গে শহরে বেশ কয়েকটি আখড়া শুরু করেন। তার মধ্যে বিখ্যাত হলো শিমলে পাড়ারটি, যেখানে শৈশবকালে প্রায়ই আসতেন বিবেকানন্দ। কথিত আছে, প্রবল জনপ্রিয়তার কারণে প্রিয়নাথ তাঁর যৌবনে প্রায় পঞ্চাশটি আখড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পাড়া আর ক্লাবের এই সহজাত সম্পর্ক এবং শরীরচর্চার জনপ্রিয়তাকে কেন্দ্র করে অনুশীলন সমিতির মতো বিপ্লবী দল স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশি বয়কট আন্দোলনের সময়ে নিজেদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র বিস্তার করে। আর এমনিভাবেই ক্লাবগুলির মধ্যে রাজনীতি আর সামাজিকতার মেলবন্ধন ঘটে। সমিতির সাহায্যে পটলডাঙা, গ্রে স্ট্রিট (পরবর্তীকালে অরবিন্দ সরণি নামে পরিচিত), জোড়াসাঁকো পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশটি আখড়া খোলা হয়। তাদের সামনে রেখে অনুশীলন দল পিছন থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করতে থাকে। একদিকে যেরকম সভ্যদের সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত করা হতো, তেমনই অন্যদিকে গোপনে চলতে থাকত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রগুপ্তির দীক্ষা। সেই সময়ে তাবড় বিপ্লবীদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন এলাকার ক্লাবের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা। যেমন, যাদুগোপাল মুখার্জি সামলাতেন আহিরিটোলা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি। এরকম মনে করা হয় যে, তাঁর জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শরৎচন্দ্র ‘পথের দাবী’ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। আবার জোড়াসাঁকোর একটি আখড়াতে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি বা ‘বাঘাযতীন’ বক্সিং আর লাঠি খেলা শেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ না কি তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে সেইখানেই পাঠাতেন শরীর চর্চার পাঠ নিতে। প্রচলিত কুস্তি, ব্যায়াম আর লাঠি খেলাতেই এই আখড়াগুলি সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঞ্জা লড়া, জুজুৎসু, রোয়িং, ঘোড়সওয়ারি প্রভৃতি খেলায়ও সভ্যদের নিযুক্ত করা হতো। শোনা যায় যে, অরবিন্দ ঘোষের নিকট সহযোগী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপার সার্কুলার রোডে একটি ‘রাইডিং ক্লাব’ খোলেন। তিনি না কি পাড়ার ছেলেদের উৎসাহ দিতে প্রায়ই সামরিক পোশাকে, ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন।

কলকাতার ক্লাবগুলোর রাজনীতিকরণ কখনই শুধুমাত্র শরীর চর্চা বা সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচারে আটকে থাকেনি। ১৯২০-র দশকে যখন সারা দেশ গান্ধীজীর অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনে উত্তাল, তারা এগিয়ে আসে নিজেদের সাধ্যমতো অবদান রাখতে। বিভিন্ন ক্লাবের যুবক সদস্যরা অহিংসা আর স্বরাজের সৈনিক হতে চেয়ে, কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবক দলগুলিতে যোগদান করেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯২১ সালে অসহযোগের শিখরে, কলকাতায় প্রায় দশটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ছিল, যাদের মধ্যে ন'টিই ছিল কংগ্রেস দ্বারা চালিত। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০৭২। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ অফিসারদের মতে, তাঁদের সিংহভাগ এসেছিলেন পাড়ার স্পোর্টিং ক্লাবগুলি থেকে।

এই সময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টির উত্থানের পেছনে এই পাড়াভিত্তিক রাজনীতির বিশেষ অবদান আছে বলে মনে করা হয়। দাশ ছিলেন একাধারে কলকাতার প্রথম ভারতীয় মেয়র, বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধ্যক্ষ এবং স্বরাজ্য পার্টির সর্বময় নেতা। তাঁর মাধ্যমে বঙ্গীয় স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের মতো বড় স্বেচ্ছাসেবক দলগুলি শহরের নানা এলাকার ছোট ছোট ক্লাবের সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করত। তিনি নিজেও দায়িত্ব নিয়ে খিদিরপুর, চেতলা, ভবানীপুর অঞ্চলের অনেক ক্লাবের সাথে আলোচনা করতেন, তাদেরকে নির্দেশ দিতেন নানান আন্দোলনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করার ব্যাপারে। আদতে দাশ শহরের অনেক ছোট-বড় সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যেমন ধরা যাক, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯১৬ সালে স্থাপিত এই গোষ্ঠীটি, ভবানীপুর অঞ্চলে বসবাসকারী ‘বাঙাল’দের মধ্যে মেলামেশা বাড়ানোর কথা ভেবে তৈরি হয়েছিল। আঞ্চলিক সংগঠন বা ক্লাবগুলির উপর চিত্তরঞ্জনের যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে কর্পোরেশন ভোট জিততে তাঁকে এই পরিচিতি সাহায্য করেছিল। মেয়র হওয়ার পর

বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন, দাতব্য চিকিৎসালয় বা কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুল তৈরিতে তাঁর পাড়াভিত্তিক জনসংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশের মতো তাঁর রাজনৈতিক অনুগামী সুভাষচন্দ্র বোস, কলকাতার ক্লাব কালচারের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সামরিক শিক্ষার প্রতি ঝোঁক, চারিত্রিক নির্মাণের জন্য খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহ তাঁকে নবীনদের মধ্যে এক স্থায়ী জায়গা প্রদান করে। নিজের যৌবনে যেরকম কালীঘাট অঞ্চলের কাছে দক্ষিণ কলকাতা সেবক সমিতি নামে একটি ক্লাব স্থাপন করেছিলেন, তেমনই আজাদ হিন্দ ফৌজকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তাঁকে অনুসরণ করে কলকাতায় গড়ে ওঠে বেশ কিছু ক্লাব। হিন্দুস্তান যুবক সঙ্ঘ নামে একটি দল ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম।

বালিগঞ্জের অধিবাসী রঞ্জিৎ রায়ের নেতৃত্বে এই দলটি সুইন হো স্ট্রিট থেকে পরিচালিত হতো। এলাকার ছেলেরা ছাড়াও দক্ষিণ শহরতলির বেহালা, ঢাকুরিয়া, সেলিমপুর, কসবা অঞ্চলের বেশ কিছু যুবক নিজেদের বন্ধুদের সূত্রে এই দলের সদস্যপদ লাভ করেন। ক্লাবটির উদ্দেশ্যই ছিল সুভাস বোসের দেখানো পথে চলে, তাঁকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করা। তাঁদের প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন প্রাক্তন সেনাকর্মী। নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদে এবং নতুন সম্ভাব্য সদস্যদের আকৃষ্ট করার জন্য ছেলেরা দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে প্রতিদিন 'ড্রিল' করতেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে অকস্মাৎ বেআইনি অস্ত্র রাখির অভিযোগে এই দলটি পুলিশের নজরে আসে এবং তারপর তাঁদের কর্মকাণ্ড স্থগিত হয়ে যায়।

অনুশীলন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ, অন্যদিকে গান্ধী থেকে ভগৎ সিংহ– কলকাতার ক্লাবগুলি ভিন্ন এবং বিপরীত ধারার রাজনৈতিক আদর্শকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছিল। শরীরচর্চা বা সামাজিকতাকে কেন্দ্রে রেখে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে তাদের গতিবিধি ডালপালা মেলেছিল। কিন্তু এর পথ কোনোভাবেই মসৃণ ছিলও না। ব্যায়াম-কুস্তির আখড়াগুলিতে চলত ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত গোয়েন্দাদের নিরন্তর নজরদারি। তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্লাবগুলির 'সেনসাস' তৈরি করত। আর এভাবেই শুধু দল নয়, তাদের সদস্যরা, পাড়ার বাসিন্দারা সকলেই হয়ে উঠতেন সরকার বাহাদুরের অগ্নিপরীক্ষার পরীক্ষার্থী অথবা সম্ভাব্য 'দেশদ্রোহী'। একটা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কীভাবে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বিভিন্ন আখড়ার সদস্যদের নাম উঠে আসে। ১৯০৮ সালে সরকার উদ্যোগী হয়ে অপরাধ মূলক আইনের সংশধোনী পাস করে, যার জেরে সন্দেহভাজন ক্লাব, সভা, সমিতির উপর তারা আরও দমন-নিপীড়ন চালানোর অধিকার পায়। গত শতাব্দীর দুইয়ের দশকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভেতর নরমপন্থী ও পূর্বতন চরমপন্থী নেতাদের মিলন হওয়ার পরে এই পাড়ার দলগুলিকে নিয়ে সরকারের চিন্তার আরও বৃদ্ধি পায়ে। তার সহজ কারণ, পুলিনবিহারী দাসের মতো ব্যক্তিত্ব– ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন বিপ্লবী উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগান, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, মানিকতলা এলাকার কিছু আখড়ায় লাঠিখেলা শেখাতেন। শিমলা ব্যায়াম সমিতির ইতিহাসও এই চারিত্রিক বিশেষত্ব বহন করে। প্রতিষ্ঠাতা অতীন বোস স্বদেশি আমলে, অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে কাজ করতেন। নিজের নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের পাড়া থেকে তিনি আহিরিটোলা, নারকেলডাঙা, বউবাজার ইত্যাদি এলাকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এইরকম সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, ছেলে অমর বোসের সঙ্গে তিনি ১৯২৬-২৭ সালে শিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির সদস্যদের শারীরিক শিক্ষায় একাগ্রতা, লাঠি খেলা বা ব্যায়ামে দক্ষতা এবং সঙ্গে অন্যান্য খেলাধূলায় সমান পারদর্শিতা তদানীন্তন কলকাতায় চর্চার বিষয় ছিল। এর উপর কংগ্রেস নেতা-সমর্থকদের আনাগোনা, সমিতির প্রতিষ্ঠা জয়ন্তীতে 'স্বদেশী মেলার' আয়োজন– ক্লাবটির আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল বাংলা সরকারকে। তারা কি কেবলই শারীরিক কসরত, খেলাধুলায় মগ্ন? নাকি লোকচক্ষুর আড়ালে চলছে সরকার বিরোধী কাজের প্রস্তুতি– এই প্রশ্ন ধন্দে রেখেছিল ব্রিটিশ প্রশাসনকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে, গত শতাব্দীর তিন ও চারের দশকে এই সব ক্লাব নিয়ে ইংরেজ সরকারের শঙ্কা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর উপর তারা তীব্র নজরদারি চালাতে থাকে 'বলশেভিক' কার্যকলাপের সন্ধানে। তাদের শঙ্কা ছিল– পাছে বলশেভিক মত প্রচারের জন্য কমিউনিস্ট কর্মীরা পাড়ার ক্লাবগুলোকে ব্যবহার করেন। এই উদ্বেগ বারবার প্রকাশিত হয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন নথিপত্রে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট, যে কলকাতার পাড়ার ক্লাবগুলো তাদের সূচনালগ্ন থেকেই সাবলীলভাবে সামাজিকতা আর রাজনীতির প্রাঙ্গণে যাতায়াত করেছে। তাদের সামনে ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্য– সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তা সে বাঙালি জাতির প্রতি বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদে হোক বা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই হোক। সেই কারণেই কিছু মানুষের এবং এলাকার প্রতিনিধিত্ব করা এই ছোট-বড় সমষ্টিগুলি হয়ে উঠেছিল প্রতিস্পর্ধার প্রতীক।

অনাহারের মৃত্যু উদ্‌যাপন

কামরিন কাজী

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্মীলাভের আশায় বহু শ্রমিক পাড়ি দেন প্রবাসী রাজ্যে। তাঁদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে তৈরি হয় কলকারখানা, ইমারত আরও অনেক কিছু, বলা যেতে পারে দেশ গড়ে ওঠে তাঁদেরই রক্ত ও ঘামে।

পরিযায়ী শ্রমিক- করোনা ভাইরাস পরবর্তী ভারতে সবথেকে হয়তো এটাই আলোচিত প্রসঙ্গ হওয়ার কথা ছিল রোগে আক্রান্ত ও চিকিৎসার অব্যবস্থার পাশাপাশি। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, আমাদের সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে উচ্চবাচ্যই করেনি। যেন, এইরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি দেশে। সব 'চাঙ্গাসি'...। লোকসভার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই শ্রম প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার বলেছেন, কতজন পরিযায়ী শ্রমিক মারা গেছেন তার কোনো তথ্য সরকারের কাছে নেই! আর পরিযায়ী শ্রমিকদের যে সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল তা উপলব্ধি করতে সরকার ভুল করেছিল কি না, প্রশ্নের জবাবে সব দায় নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে রাজ্য সরকার এবং এনজিও-গুলির ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন মোদীর মন্ত্রী।

২৪ মার্চ মাঝরাতে অপরিকল্পিত লকডাউনের সূচনা মুহূর্তে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন জীবিকাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। দিশেহারা শ্রমিকরা অনাহারে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় জীবন কাটানো শুরু করেন। ২০১৭ সালের 'দ্য ইকনমিক সার্ভে'র পরিচ্ছেদ " India on the move and churning : New Evidence" অনুযায়ী তৎকালীন আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি। যদিও এই বিষয়ে সরকারের কাছে এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। গ্রামীণ শ্রমিক বা কৃষকদের জন্য যেমন সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে (যদিও চাহিদার তুলনায় তা খুবই সামান্য) পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য, কোনো সরকারই সেইরকম কোনো পরিষেবা এখনও অবধি চালু করতে পারেনি। চালু করার সদিচ্ছাও যে আছে তা বলা যাচ্ছে না।

কর্মসূত্রে পুনেতে প্রায় ৮ বছর আছি। পুনে শিল্প শহর, ভারতের অন্যতম আইটি হাব। পরিযায়ী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ এই শহরে আসেন কাজের আশায়। শহরবাসী হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এই লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলে অবস্থা বুঝতে সুবিধে হবে-

ঘটনা ১

পিন্টু বিশ্বাস, বয়স ২৯, পেশায় রাজমিস্ত্রি। মুর্শিদাবাদ থেকে পুনে এসেছেন নতুন কাজের খোঁজে, লকডাউন ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে পুরানো প্রাপ্য টাকাও ঠিকাদার

রাতারাতি দিতে অস্বীকার করে। কিছুদিনের মধ্যেই কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েন পিন্টু। পুনের যে জায়গায় তিনি থাকেন, সেই এলাকাও তীব্র সংক্রমণের কারণে সম্পূর্ণ বন্ধ। ফলে দৈনন্দিন খাদ্যসামগ্রী কেনার দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। অসহায় অবস্থায় পুলিশের কাছে যায় যান পিন্টু। "মাটি খেয়ে পেট ভরাও" পরামর্শ দেয় পুলিশ!

ঘটনা ২

সমীর শেখ, বয়স সাতাশের আশপাশে, পেশায় এয়ার কন্ডিশনার রিপেয়ারিং মিস্ত্রি। নদিয়া থেকে কাজের খোঁজে আরও কিছু বন্ধুর সাথে পুনেতে পাড়ি দেন ২০১৮ সালে। লকডাউনের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রবাসে রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়েন তাঁরা। এদিকে আগের মাসের মাইনে পাওনা রয়ে যায়। মালিক জানান, কোম্পানির কাজ শুরু হলে তবেই প্রাপ্য বকেয়া মেটানো হবে। ফলে সমীর ও তাঁর বন্ধুরা প্রচন্ড বিপদে পড়েন।

ঘটনা ৩

আজাদ সিং, বয়স ২৩, বিহার থেকে আসা সদ্য পিতৃহারা এক যুবক। ফেব্রুয়ারি মাসে বোনের বিয়ের জন্য খরচা হওয়া লাখ খানেক টাকার দেনা শোধ করার লক্ষ্যে পুনে আসেন নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ নিয়ে। আচমকা লকডাউনে ট্রেনিং বন্ধ হয়ে যায়। পরিযায়ী হয়ে উপার্জনের লক্ষ্য অধরাই থেকে যায়। কাজ নেই, হাতে টাকাকড়িও বিশেষ নেই, প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। অগত্যা কিছুদিন পর ট্রেন চলাচল শুরু হতেই তাঁকে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিতে হয়। বাড়িভাড়া মিটিয়ে, প্রস্তুত হয়ে তিনি যখন থানায় আসেন, জানতে পারে সেদিনের ট্রেন বাতিল হয়েছে। অসহায় আজাদের আর মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকে না, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্টেশনের ফুটপাথই হয় তাঁর নতুন ঠিকানা।

সরকার উদাসীন থাকলেও এইসময়ে অনেকেই ব্যক্তিগত, সমষ্টি বা সংগঠনগত ভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান। আমার পরিবারও সেই কাজে অংশগ্রহণ করে। সেই আলোচনা এই পরিসরে করছি না। মাস-দুই মাস পরে পুনেতে আটকে থাকা দিনাজপুরের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের খবর পাই। যখন যোগাযোগ করা সম্ভব হয়, ততক্ষণে তাঁরা মহারাষ্ট্রের সীমান্তে। মাথাপিছু ৬ হাজার টাকা দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাকে চেপে তাঁরা অবশেষে ঘরে ফেরার পথে। ওই কথা শুনে ভয় মিশ্রিত অদ্ভুত অনুভতি হয়। তার কয়েকদিন আগেই ঔরঙ্গাবাদে ঘরের পথে চলা শ্রমিকদের রেললাইনে মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা মনে রয়ে গিয়েছিল।

একদিকে শ্রমিকদের দুর্দশা, অন্যদিকে সরকারের অদ্ভুত ভাবলেশহীনতা। কোনো সভ্যদেশে এসব হতে পারে, তা ভাবাই যায় না। ছোটোবেলায় কোনো এক বইয়ে পড়েছিলাম, দেশ শুধু একটুকরো ভূখন্ড না, দেশ তৈরি হয় মানুষ দিয়ে। অদ্ভুতভাবে দেখলাম, আমাদের দেশের মানুষ, যাদের বৃহৎ অংশ গরিব এই মহামারির গুরুতর সঙ্কটের সময়ে সরকার তাঁদের সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করলো।

এই শ্রমিকদের ফেরানো এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের পরিবারের পাশে থাকার বদলে সরকার মানুষকে উৎসাহ দিলো থালা বাসন বাজাতে। আমাদের দেশের তথাকথিত সেলিব্রিটি, ধনী-নির্ধন, মধ্যবিত্ত– সবাই মিলে সব ভুলে থালা বাসন বাজাতে নেমে পড়ল। মাঝেমধ্যে মনে হয় এরা অদ্ভুত একটা ইউটোপিয়ায় আছে। যেখানে কষ্ট পাওয়াকেই তাঁরা স্বাভাবিক মনে করেন।

কোনো কোনো খবরের কাগজ, কিছু চ্যানেল পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলো, কেউ কেউ পুরোপুরি এড়িয়ে গেল। এখনও চোখে ভাসে, পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফিরছেন দুধের গাড়িতে, কেউ খড় বোঝাই লরিতে, কেউ বা হেঁটে।

এই সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কাজ করতে গিয়ে বেশকিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাঁরা আমাকে জানান কিভাবে মহাজনের কাছে, পরিচিতদের থেকে ধার করে বাড়ি ফিরছেন। তাঁরা গ্রামে ফিরলেই সব সমস্যা মিটে যাবে এমনটা না। তাঁদের হাত শূণ্য, অসুখের ভয়। সব মিলিয়ে ঘরে ফেরার আকুতি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় মনে হয়েছে, হয়ত নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেই ভাল থাকবেন ওঁরা। বাস্তবে দেখা গেল, ব্যাপারটা একদমই তা নয়। কপর্দকশূণ্য হয়ে ঘরে ফেরার পর তাঁদের আবার নতুন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হল। পেটের লড়াই, ভাতের লড়াই। তাদের কাছে টাকা পয়সা কিচ্ছু নেই। দুমুঠো খাবারের জন্য বহু মানুষ হাহাকার করছে। তারপর আমফানের তাণ্ডব।

তুমুল সমালোচনার মধ্যেও কেন্দ্রের সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কোনো দায়িত্ব নেয়নি। একশো দিনের প্রকল্পে যুক্ত করার কথা বলে দায় সেরেছে। একশো দিনের প্রকল্পে কাজ থাকলে বা সেই সামান্য মজুরিতে সংসার চললে তাঁদের তো ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতেই হত না। ঘরে ফেরা কিছু শ্রমিক ১০০দিনের কাজ পেয়েছেন, যদিও সংখ্যাটা খুবই সামান্য। বেশিরভাগই ঘরে বসে বড় অঙ্কের সুদে টাকা ধার নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। অপেক্ষায় আছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভিন রাজ্যে আবার পাড়ি দিয়ে দুটো পয়সার মুখ দেখার জন্য। অনেকেই জুলাই মাস থেকেই সাহস করে ফিরতে শুরুও করেন দেন। সেই যেভাবে ঘরের পথে এসেছিলেন, আবার সেইভাবেই ধার-দেনা করে ফিরছেন কাজের জায়গায়। যদি কিছু উপার্জনের উপায় হয়।

৪ই আগস্ট, ২০২০। দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫১২৮২। দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৯,০৬, ৬১৩জন। ৫ই আগস্ট, ২০২০– ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংবিধান, গণতন্ত্রকে ধুলোয় মিশিয়ে ভূমিপুজোয় নতজানু দেশের প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসী আনন্দে আত্মহারা, এমন পরিবেশ তৈরি করা হল। যিনি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে কাজের খোঁজে গিয়েছিলেন, যাঁর পেটে দুটো ভাত জুটছে না, তিনিও দেখি রামরাজ্যের আশায় আশান্বিত। এই লকডাউনের তার দুর্দশাটা আজ সেদিন এক লহমায় মিটে গেল। এভাবেই আমরা বছরটা কাটিয়ে ফেলবো। হয়তো করোনামুক্ত হয়েও যাবো কিংবা এটাই হয়তো 'নিউ নর্মাল'। এই দুঃখ কষ্টের ঘটনাগুলো আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে খালি পেটে রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করেছিল একটি গণতান্ত্রিক দেশের সরকার, রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে মৃত্যু উদযাপন করেছিল একটি রাষ্ট্র। সেই বোধটাই এক সময়ে ফিকে হয়ে যাবে।

অথচ ধর্মডনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশের ভূমিকা একটু অন্যরকম হলে দেশটার এই দুর্দশা হত না। অবশ্য লড়াইটা এখানেই শেষ না। সামনের দিনগুলো আরো ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। জিডিপি নিম্নগামী, চাকরি নেই, কাজ নেই। সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে। দেশে বেকার, গরিব মানুষেরা এখনো ক্ষোভে ফেটে পড়েনি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেমে পড়েনি, এটাতে খানিকটা আশ্চর্য লাগে।

ওয়েব চ্যানেলের আপন ছক

শান্তনু চক্রবর্তী

তিনি মস্ত সাইক্রিয়াটিস্ট। বিশাল পশার। কর্পোরেটে অফিসের মতো ঝাঁ-চকচকে মস্ত ক্লিনিক। মগজ মানে মনস্তত্ত্ব খাটিয়ে দিল্লি পুলিশকে অবধি জটিল-প্যাঁচালো সব কেস থেকে উদ্ধার করেন! পুলিশ প্রশাসনের বড়কর্তাদের তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই! কিন্তু তাঁর যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জানত? বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী—তিনিও আবার পাঁচতারা হোটেলের চিফ শেফ! তাদের ৬ বছরের একমাত্র মেয়েটির আবার ডায়াবেটিস—রোজ ইন্সুলিন ইনজেকশন দিতে হয়! অভি আর আভা, বাবা আর মা দু'জনে মিলে মায়া-মমতায় আগলে রাখেন তাদের আদরের সিয়াকে।

সেই মেয়ে আচমকা কিডন্যাপড! ৮-৯ মাস কোনও খোঁজ-খবর নেই। শেষ অবধি খবর যখন এল, দেখা গেল রহস্যের গর্তেও আরও রহস্যের গোপন ঘর। মনের ডাক্তার নিজেই মনের অসুখে জেরবার। তিনি এমপিডি মানে 'মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার'-এ ভুগছেন। লোক একটাই—শরীরও এক—কিন্তু মন-মাঝারে আরও দু-চারটে মানুষ ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করছে! এই করোনা কালেও কোথাও 'সামাজিক দূরত্বে'র কোনও বালাই নেই! বেশ ক'বছর আগে শঙ্কর পরিচালিত 'অপরিচিত' নামে একটি তামিল ছবিতে আমরা এরকমই এক চরিত্র দেখেছিলাম। তামিল সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা বিক্রম অভিনীত এই চরিত্রটা নিয়ে তখন বেশ বিতর্কও হয়েছিল। পর্দায় বিক্রমের 'স্পিলট পার্সোনালিটি'র ছলে শঙ্কর এখানে কোনও সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মেসেজ দিতে চেয়েছেন কিনা—তামিলনাড়ুর মূল ধারার দ্রাবিড় রাজনীতির বিরুদ্ধে এছবির কাহিনিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী 'ব্যাকল্যাস' বলা যায় কিনা—এসব তাত্ত্বিক প্রশ্নও উঠেছিল।

'ব্রিদ ইনটু দ্য শ্যাডোজ'-এর অভিকে নিয়ে এসব রাজনৈতিক বখেরার কোনও বালাই নেই। এই ওয়েব-সিরিজের যারা প্রযোজক সেই আমাজন প্রাইম ভিডিও-ও একটা সিদে-সাধা থ্রিলারই বানাতে চেয়েছিল। অভির যেহেতু মগজের ভেতরের ঝামেলা, সিরিজের গায়ে বা আগায় তাই 'মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার'-এর একটা লেবেলও সেঁটে দেওয়া যায়। তার লেবেল-বোতল-ট্রেডমার্ক যতই এধার-ওধার হোক না কেন, ভেতরের মাল তো সেই ১৩৪ বছর ধরে একই আছে। অভিদের মতো দ্বি-ধা, ত্রি-ধা বিভক্ত সব 'ব্যক্তিত্বই' অন্তরে বা অন্দরে এক—ঘুমিয়ে আছেন 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড' সব 'এমপিডি' রোগীর ডিএনএ-য়! অন্তত গপ্পে বা পর্দায় আমরা যাঁদের দেখে থাকি। তারা কমবেশি সবাই আর এল স্টিভেনসনের সেই ১৮৮৩ সালে লেখা উপন্যাসেই প্রাণিত। সময়ের হিসেবে শুধু অপরাধের 'মোটিভ' আর 'মোডাস অপারেন্ডি'-গুলো একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। অভির অল্টার ইগো 'জে' এখানে তাঁর (বা তাঁদের) বালক-বেলা, টিনএজ বেলা, কলেজ বেলায় অভির সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন 'অন্যায়'-এর শোধ তোলে। আর মনস্তাত্ত্বিক লজিক-এর কি মহিমা—যে অভিকে 'জামিল দুনিয়া'র সব ঝড়-ঝাপটা থেকে 'রক্ষা' করতেই 'জে'-র মানস-জন্ম, সেই অভির মেয়েকে কিডন্যাপ করে। সেই ভিডিও দেখিয়ে তাকে 'ব্ল্যাকমেল' করেই জে তাকে এই সিরিয়াল খুনের মামলায় জড়িয়ে দেয়!

তবে এ থ্রিলারে খুনি যেমন সাইকো বুনো ওল, তেমনি তার জারিজুরি ফাঁস করার জন্য দিল্লি ক্রাইম ব্র্যাঞ্চের এক গোয়েন্দা বাঘা তেঁতুলও হাজির ছিল। ইনি মুম্বাই পুলিশ থেকে বদলি হয়ে দিল্লি এসেছেন (এমন হয় নাকি?)! সঙ্গে ব্যাগেজ হিসেবে এনেছেন একটা অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার ট্র্যাজিক স্মৃতি আর অপরাধবোধ এবং পুরানো গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা। কিন্তু সেসব সামলেও তিনি ঠিক প্রমাণ করে দিলেন, খুনগুলোর সঙ্গে কোথাও একটা নৈনিতালের যোগাযোগ আছে। কারণ বাস দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ অভি ওখানকার বোর্ডিং স্কুলেই পড়তেন। তাই যতকাণ্ড নৈনিতালে! আজ তাকে ঘিরেই সিরিজ ভরে টিন-এজ যৌনতা, সমকাম, নানারকম শয্যাদৃশ্য আর ভায়োলেন্সের অবাধ আয়োজন। কারণ এগুলোই এই মুহূর্তে এদেশি ওয়েব-সিরিজ কিংবা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের তথাকথিত ওরিজিন্যালসগুলোর ইউএসপি। যুগধর্মও বলা যায়! 'ব্রিজ-টু'র মতো একেবারেই একটা মাঝারি মানের, দেখা শেষ হলেই ভুলে যাওয়ার মতো সিরিজ নিয়ে এতো ব্যাখ্যানের কারণও ওই যুগধর্মের একটা প্যাটার্ন বা নকশা বোঝার চেষ্টা।

গত আড়াই-তিন বছর ধরেই শোনা যাচ্ছিল ওয়েব-বিনোদনই ক্রমশ মাকড়শার জালের মতো একটু একটু করে গোটা পৃথিবীর দৃশ্য শ্রাব্য শিল্প-মাধ্যমটিকে ছেয়ে ফেলবে। 'ওভার দ্য টপ! বা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম-ই হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের সিনেমার ঘর। এমনকি একদা ঘরের শান-শোভা-ইজ্জৎ বর্ধক, দেওয়ালজোড়া হাই ডেফিনেশন পর্দাওয়ালা টিভি-সেটও কদিন পরে অবহেলায় এক কোণে পড়ে থাকবে। লোকে কম্পিউটারের মনিটরকেও উপেক্ষা করে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে মগ্ন হবেন! বড় পর্দার সিনেমার মায়া-ম্যাজিকের জন্য স্টিভেন স্পিলবার্গের মতো কয়েকজন প্রায় অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ ছাড়া কপাল চাপড়ানোর কেউ থাকবে না। এমনকি অস্কারের আসরেও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স-এর প্রযোজনা সেরা ছবির পুরস্কার বাগিয়ে নিচ্ছে। মার্টিন স্করসিসে হলিউডের প্রবাদপ্রতিম পরিচালক যাঁর ছবি আড়ে-বহরে বড় পর্দার চেনা সিনেমার মাপকেও প্রায়ই ছাড়িয়ে যায়, তিনিও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মোহে মজেছেন।

মুঠো ভরা বিনোদন-প্যাকেজ এখন ভারতের বাজারও ভাসিয়ে নিতে তৈরি। ২০১৯-এর একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে ভারতে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বাণিজ্যে মোট লগ্নির পরিমাণ ০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২০ সালের মধ্যে সেটা ৫ বিলিয়ান ডলারে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা। সমীক্ষায় আরও জানা যাচ্ছে, শুধু মেট্রো নগরীগুলোই নয় দেশের ছোট, মাঝারি শহর এবং কি গাঁ-গঞ্জেও এইসব স্ট্রিমিং চ্যানেল ক্রমশই ভাসমান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ইন্টারনেট-এর পরিধি বাড়ছে, হাতে-হাতে স্মার্টফোন ঘুরছে—সুতরাং নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম, ডিজনি-হটস্টার, জি-ফাইভের গ্রাহকের সংখ্যাও পাল্লা দিয়েই বাড়ছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি শুদ্ধ দেশি ওয়েব-চ্যানেলগুলের সঙ্গে স্বদেশি দর্শকদের রোমান্স চলছে।

তাও তো এসব হিসেব-নিকেশ কোভিড-অতিমারীর আগেকার। তখনও মাল্টিপ্লেক্স সহ সিনেমা হল সব খোলা। সিনেমাঘরে ফি শুক্রবার নতুন ছবি রিলিজ করছে। পাইপ-লাইনেও আরও কত ছবি মুক্তির প্রতীক্ষায়! রিলিজের দিন নিয়ে প্রযোজক-পরিবেশক-হল মাকিলদের দর-কষাকষি চলছে। ঘরের ভেতরে বোকা-বাক্সেও চেনা সিরিয়ালের নতুন নতুন এপিসোডেও অচেনা বাক। অতি-চেনা কুট-কচালির নিত্য-ভোজেও নতুন নতুন চক্রান্তের মশলা ফোড়ন! সব মিলিয়ে দেশবাসীর জন্য বিনোদন-আয়োজনে কোথাও কোনও খামতি ছিল না কিন্তু করোনা-অতিমারী, তার জেরে লম্বা লকডাউন এবং সেইসঙ্গে বিশ্ব ও স্বদেশি স্বাস্থ্য-সংস্থার গাইডলাইন মাফিক সতর্কতা-সচেতনা-সামাজিক দূরত্বের বিধি-নিষেধের ধাক্কায় সিনেমা হল থেকে শুরু করে সিনেমা-সিরিয়ালের শ্যুটিং, সবেতেই বিধিসম্মত তালা পড়ে গেল। নতুন সিনেমা মুক্তি রাস্তা বন্ধ—টিভি সিরিয়ালে ঘুরেফিরে সবই পুরানো এপিসোডের 'রিপিট' দেখতে দেখতে পাবলিক হা-ক্লান্ত-হাই তোলার এনার্জিও ফুরুৎ! সেই অবস্থায় বিনোদন-বুভুক্ষু এইসব "মূঢ় ম্লান মুখে" কে জোগাবে 'কনটেন্ট'—ওয়েব চ্যানেল ছাড়া?

ফলত! এই কয়েক মাসে ওয়েব চ্যানেলের গ্রাহক বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। ঘর-আটকা মানুষ ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, স্মার্টফোনে নজর ঝুঁকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঁদ হয়ে দেখেছে স্ট্রিমিং মাধ্যমের নতুন পুরানো ওয়েব সিরিজ 'ওরিজিন্যালস'! এমন কি ওয়েব নিয়ে নাক-সিটকানো বলিউডের কোনও কোনও প্রযোজকও কিন্তু কিন্তু করতে করতেও শেষ অবধি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে তাঁদের ছবি রিলিজ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যাঁরা বড় বাজেট, বড় ব্যানার, গ্লোবাল বড়-বাজারের 'ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি—দেড়-দুই আড়াই হাজার স্ক্রিনে ছবি দেখান, তাঁরা এখনও এই প্ল্যাটফর্মে ভেড়েননি। তবে যারা মনে কী দ্বিধা রেখেও কী যে করব কিছু ভেবে উঠতে পারছি না পরিস্থিতিতে কয়েক পিস ছবি রিলিজ করে দিয়েছেন, তাদের তেমন আক্ষেপ করার কিছু নেই।

যেমন ধরুন আমাজন প্রাইস ভিডিও-য় মুক্তি পাওয়া সুজিত সরকারই প্রযোজনা-পরিচলানার ছবি 'গুলাবো সিতারো'।

বুন্দেলখণ্ডের একটা বিশেষ ধরনের পুতুল-নাটকের ঐতিহ্য মেনে তৈরি ও ছবির কাহিনি-চিত্রনাট্যে আমাদের জীবন ও যাপন নিয়ে এক রকমের খটখটে শুকনো, নিষ্করুণ কৌতুক আছে। যাকে বলা যায় 'ড্রাই হিউমার'। আমাদের স্বদেশি পরিপাকতন্ত্র এইসব কালো, কষটা বা তিতকুটে ব্যাপার-স্যাপার ঠিক হজম করতে পারে না। তাই সুজিতদের ছবি এমনি বক্স অফিসে মুক্তি পেলেও দর্শক কতটা সাড়া দিতেন, সেই সংশয় আছেই। অমিতাভ বচ্চনের দুর্ধর্ষ পর্দা উপস্থিতি ছবির কপাল কতটা ফেরাতে পারত, সন্দেহ থেকেই যায়। দু'জন হদ্দ হেরো বুড়ো আর যুবকের কিসসা বড় পর্দায় কজন দেখত? ওমন কি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও ছবিটা তেমন সফল নয়। সেটাই স্বাভাবিক। যে ছবির চলনে পুরানো লখনওটি গয়ংগচ্ছ চাল—যে কাহিনিতে নাটক, অ্যাকশান, রোমান্স, সাসপেন্স কিচ্ছু নেই—এমন কি ছবির ক্লাইম্যাক্সে একটু মন ভালো করা ইচ্ছেপূরণও নেই—এ জিনিস লোকে স্ট্রিমিং চ্যানেলেও এড়িয়ে যাবেন!

বরং ওজনদার তারকা, প্রচারের হাঁকডাক ছাড়াই, স্রেফ 'ফিলগুড ফ্যাক্টর'-এর জোরেই নেটফ্লিক্স-এর ট্রেনিং-এ প্রায় টানা দু'সপ্তাহ এক নম্বরে ছিল নিকোলাস খারকোনেগরের ছবি 'আখুনি'। নাগাল্যান্ডের ভুমিপুত্র নিকোলাসের এই ছবির ৮০ শতাংশের বেশি অভিনেতাই উত্তর-পূর্ব ভারতের। বলিউডের চেনা মুখ যে কজন, তাঁরা সবাই ক্যামিও চরিত্রে। ২০১৯-এ তৈরি এছবিব এমনি সময়ে মুক্তি পেলে মাল্টিপ্লেক্স-এ রাত ১০টায় তার কাছে একটা শো পেত কি পেত না সন্দেহ। কিন্তু ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেশ ও দেশের বাইরে প্রচুর মানুষ ছবিটা দেখার সুযোগ পেলেন। যাঁরা দেখলেন, তাঁরা বুঝলেন, নিকোলস কিভাবে একটা 'ফুড ফিল্ম' বা 'রেসিপি-সিনেমা বানানোর ছলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, তার 'মিলি-সুর-মেরা-তুমহারা' মার্কা জাতীয় সংহতির ফোঁপড়া চেহারাটা হাট করে খুলে দিলেন। কোনও তর্ক, তত্ত্ব, চেঁচামেচি—বক্তিমেবাজি ছাড়াই আমাদের গালভরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের স্লোগানের

ফক্কিবাজিটা এখানে ধরা পরে যায়। উত্তর দিল্লির একটি মধ্যবিত্ত হিন্দু পাড়ায় বাসা ভাড়া করে থাকা উত্তর-পূর্ব ভারতীয় কিছু যুবক-যুবতীর একটা গোটা দিনের দিননামচা প্রমাণ করে দেয়, 'ভারতবর্ষ' নামের ধারণাটা শেষঅবধি আসলে উত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ববাদ আর হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তানের একটা জগাখিচুড়ি। সেইরকম একটা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিবেশের ভেতর বন্ধুর বিয়েতে নিজেদের পছন্দসই আঞ্চলিক একটা রান্না চাপানোটাও প্রায় গেরিলা-যুদ্ধের শামিল হয়ে ওঠে।

তবে এই ছবিগুলো ঘটনাচক্রে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ওটিটি-র মূল আকর্ষণের জায়গা তো ওয়েব-সিরিজ বা ওয়েব-ওরিজিন্যালগুলো—যেগুলো বিষয়ে, ট্রিটমেন্ট-এ, মেকিং-এ চোখা-বুদ্ধিদীপ্ত-সিনেম্যাটিক সপ্রতিভতায় বলিউডের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে বলে জোর খবর। কিসের জোরে ওটিটি-র এই 'পণ্য-সামগ্রী' বলিউডকে চ্যালেঞ্জ ঠুকছে? 'দ্য ডার্টি পিকচার-এর' নায়িকা সিল্ক-এর বলা কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা যায় 'ট্রিটমেন্ট', 'ট্রিটমেন্ট', এবং 'ট্রিটমেন্ট'—আর সেই সঙ্গে সাহস! ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সেন্সর সার্টিফিকেটের ধার ধারে না। তাই বড় পর্দায় যেসব বিষয় বা দৃশ্য সেন্সরের কাঁচিতে ছাঁটা পড়বেই পড়বে—কলার ধরে যে সব সংলাপের মুখ বন্ধ বা 'মিউট' করে দেওয়া হবে—ওয়েব চ্যানেলে বুক ঠুকে সেইসব 'বেপরোয়াপনা' চালিয়ে দেওয়া যাবে। বলিউডে প্রায় অচ্ছুৎ অনেক বিতর্কিত রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, পর্দায় মোটের ওপর এড়িয়ে যাওয়া হয়—যৌনতার সেইসব ধূসর এলাকা—সেইসঙ্গে 'যৌনগন্ধী, সেইসব রাজনৈতিকভাবে বেশ 'বেঠিক' রসিকতা আর গালাগালির অঝোর অবাধ স্রোত—ওয়েব সিরিজ আর চ্যানেলের জন্যই বানানো সিনেমাগুলোয় নিয়ম করে এইসব 'বিপ্লব' ঘটে চলেছে। আর তার বহরেই নাকি ভারতবর্ষ এই প্রথম একটা সার্বিক ''প্রাপ্তবয়স্ক'' তথা প্রাপ্তমনস্কদের বিনোদনের দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে! কনটেন্ট-এর মুক্তি ঘটেছে! সৃষ্টিশীল মগজ নির্বিঘ্নে প্রতিভার চাষ করতে পারছে। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে নিত্য-নতুন নিরীক্ষার দর্শদিগন্ত খুলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ১৯৯০-এ দশকের পর ভারতীয় বিনোদন শিল্পের ক্ষেত্রে আবার একটা মেক্-ওভার। তবে এবারেরটা অনেক বেশি বিশ্বায়িত, পরিণত, উন্নততর, আন্তর্জাতিক মানের কিনা এক্মএনি বলা না গেলেও, অন্তত ততোটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন।

নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিক উদারিকরণের প্রথম ইনিংসে বলিউডকে 'গ্লোবাল' করেছিল ছবির এন আর আই নায়কেরা। সনাতনী (হিন্দু) 'ভারতীয়' জীবন আদর্শ আর মূল্যবোধে টইটম্বুর এইসব 'ইংলিশ বাবু'রা তাদের ইপ্সিত 'দেশি মেম'দের স্বদেশি অভিভাবকতন্ত্রের বেড়ি-জঞ্জির থেকে মুক্ত করে উড়িয়ে নিয়ে যায়—কিন্তু সাবেক পিতৃতন্ত্রের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেয় না! কারণ উদার অর্থনীতির সঙ্গে তথাকথিত 'ভারতীয়ত্ব'-র যে 'কম্বো অফার' ওইসব সিনেমায় ফেরি করা হচ্ছিল, ব্রাহ্মণ্য বা মনুবাদী পিতৃতন্ত্রই তার প্রকৃত রক্ষক। তাই তাকে যথেষ্ট 'শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্বক' বিশ্বায়িত 'আধুনিক' জীবনযাপনের সঙ্গে সইয়ে সইয়ে মানিয়ে নেওয়াই 'প্রকৃত ভারতসন্তানে'র কর্তব্য। 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে'-র শাহরুখ খানকে আমরা অমনই একজন বিয়ার-প্রেমী বখাটে 'দেশভক্ত'-এর ভূমিকায় দেখেছি।

তারপর গঙ্গা-গোদাবরী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। দেশে এখন ভক্ত-রাজই বিরাজমান! মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় কবে থেকে অনির্দিষ্টকালীন 'লকডাউন' চলছে। অনেক কথাই বলা যায় না। লেখাও যায় না। সিমেনায় দেখানোর তো প্রশ্নই নেই। একটা অঘোষিত সেন্সর-রাজ চলছে। সেখানে শিল্পীদের অনলাইন পোস্ট কিংবা

স্বশরীর 'অফলাইন' হাজিরা দিয়ে শাসকের প্রতি আনুগত্য নিয়মিত 'রিনিউ' করাতে হয়। এইরকম একটা নিঃশব্দ জরুরি অবস্থার দিনগুলোয় সেন্সর বোর্ডের শাসনহীন, সিনেমাহলে (শাসকের মদতধারী) স্বঘোষিত দেশপ্রেমিক-বাহিনীর যখন-তখন হামলা-হুমকির আশঙ্কাহীন একটা বিনোদন মাধ্যমে চাইলে অনেক কিছুই করা যেত, যেটা শাসকের পক্ষে স্বস্তিকর হতো না। কিন্তু গত দু-তিন বছরে এবং এই লকডাউন-পর্বেও আমরা ওয়েব-চ্যানেলের যে 'স্বাধীন', 'দুঃসাহসীপনা' দেখলাম, তার মধ্যেও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ছক বা 'প্যাটার্ন' পাওয়া যায়। এটাকে ছক ভাঙার ছক বলতে পারেন। সেই পুরানো বিজ্ঞাপনী জিঙ্গল-এর 'দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি'-র মতোই 'দ্যাখো ছক ভাঙছি ড্যাডি' গোছের একটা আস্ফালন বা 'দ্যাখানেপনা'!

গত কয়েক মাসের ঘরবন্দি ওয়েব-দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রথা ভাঙার একটা সূত্রায়ণ করা যায়। যেমন, (এক) : অধিকাংশ ওয়েব-সিরিজ বা সিনেমাকে বেশ ছমছমে-টানটান থ্রিলার-গন্ধী হতেই হবে। সেই থ্রিলারের গায়েও আবার 'ডার্ক' বা কৃষ্ণ-ধূসরের ট্যাগ ঝোলাতে হবে—যাকে বলে 'ডার্ক কনটেন্ট'। বিষয় 'ডার্ক' হলে সিরিজ বা সিমেনা-ভর অবিরত রক্ত এবং হিংসা-পাত! অগুন্তি লাশ ফেলে দেওয়া যাবে—হাসতে হাসতে, খেতে-খেতে, এমনকি সঙ্গম করতে করতেও গুলি চালিয়ে দেওয়া যাবে—ঠাঁই-ঠাঁই, ঠাঁই! ওই মৃতদেহের রেকর্ড গড়ার নমুনা হিসেবে আমাজন প্রাইম-এর সিরিজ 'মীর্জাপুর' আর নেটফ্লিক্স ওরিজিন্যাল 'গুরগাঁও'-এর কথা বলা যায়। ঘটনাচক্রে দুটোরই প্রধান চরিত্রে আছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী। তবে এই থ্রিলারের চক্করেই দেখা যাচ্ছে, যে ওয়েব-সিরিজগুলো পরের সিজনে যাচ্ছে, সেখানে অনেক সময়ই প্রথম সিজনের সেই চমক আর টানটা ধরে রাখা যাচ্ছে না।

(২)

এই সিরিজ বা সিনেমাগুলোয় বেশ কিছু সাম্প্রতিক কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বেশ স্পর্শকাতর এবং অবশ্যই বিতর্কিত ঘটনা বা প্রসঙ্গগুলোকে গুঁজে দেওয়া হয়। মূল ন্যারেটিভ-এর সঙ্গে এই ঘটনাগুলোর সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। এমন কি কাহিনির বাঁক ফেরা, মোড় নেওয়ার ক্ষেত্রেও এইসব ঘটনার আলাদা কোনও ভূমিকা বা তাৎপর্য নেই। সিরিজ-নির্মাতারা বলতে পারেন, সময়ের একটা ছবি বা পটভূমির একটা অনুপুঙ্খ তুলে ধরতেই এইসব প্রসঙ্গ আসছে। যেমন গোরক্ষক বাহিনীর বাড়াবাড়ি, সাম্প্রদায়িক গণপিটুনি, দলিতদের ওপর উচ্চবর্ণের ঠ্যাঙারে বাহিনীর হামলা। খবরের কাগজে হেডলাইনগুলোকেই স্থান-কাল-পাত্র বদলে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এদেশে প্রথম হইচই ফেলা ওয়েব-সিরিজ 'সেক্রেড গেমস'-এ তো রীতিমতো টেলিভিশন ফুটেজ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর শেষকৃত্য, টয়োটা বাসকেই রথ বানিয়ে আদবানির রামযাত্রা, বাবরি মসজিদের গম্বুজের চুড়োয় গাঁইতি-শাবল হাতে করসেবকদের তাণ্ডব—সবেরই ফুটেজ এসেছে। সিরিজের ঘটনাকাল যেহেতু আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে এখনকার সময় অবধি ছড়ানো—সুতরাং নির্মাতারা সময়ের একটা প্রামাণ্য ডকুমেন্টেশন হাজির করছেন, এমন একটা দাবি বা যুক্তি চালিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু সেখানে এই প্রশ্নটা করা যেতেই পারে—১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে মুম্বাইয়ে মূলত শহরের শাসক শিবসেনা ও তার একচ্ছত্র সুপ্রিমো বাল থ্যাকারের নেতৃত্ব ও উদ্যমে যে মুসলিম নিধন-যজ্ঞ হয়েছিল, সিরিজে সেই প্রসঙ্গটা বাদ গেল কী করে? 'সেক্রেন্ড গেমস'-এর অন্যতম চরিত্রে মাফিয়া ডন গাইকোন্ডের আত্মকথনে ১৯৮০'র দশকের শেষের দিক থেকে মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ড বা অপরাধ দুনিয়ার আড়াআড়ি সাম্প্রদায়িক 'বিভাজনে'র কথা বলা হচ্ছে, '৯৩-র মুম্বাই গণহত্যা ছিল তার শীর্ষবিন্দু। আঁধার লোকের এই স্বঘোষিত ইতিহাসকার কিন্তু ২০০২-এর গুজরাট গণহত্যা এবং তার অন্যতম রূপকারের প্রসঙ্গটাও এড়িয়ে যায়। আসলে 'সেক্রেন্ড গেমস'-এর দুটো সিজন-ই বলুন অথবা অনুষ্কা শর্মার প্রযোজনায় এই জ'র বা গোত্রের এমন অবধি সবচেয়ে সুনির্মিত সিরিজ 'পাতাললোক'ই বলুন আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার অন্দরমহলে কোনও কাহিনিই খুব একটা ঢোকে না। ওপর ওপর কিছু বিতর্কিত প্রসঙ্গ আমদানি করা হয়। তাতে নির্মাতাদের 'লিবেরাল' বিবেক হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা পায়। কিন্তু শাসক কিংবা তার 'হোয়াটস অ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত পারিষদবর্গের বিশেষ যায় আসে না। 'সেক্রেন্ড গেমস'-ও তো তাই অনেক রাজনীতি টিভি ছেনে, অনেক সাসপেন্স-ফাসপেন্স বুঝে শেষ অবধি রজনীশ-মার্কা এক গুরুঠাকুর বা বাবাজীর আধ্যাত্মিক বদখেয়ালের গাঁজাখুরি গপ্পে ঘুরে যায়। কিংবা 'গুরগাঁও'-এর সিনেমা, যেটা হরিয়ানভি সমাজের অন্ধ-নির্মম পিতৃতন্ত্র আর কন্যা-হত্যা প্রসঙ্গে একটা তীব্র কমেন্টারি হতে পারত, সেটা অকারণ খুনোখুনির আতিশয্যে ঘেঁটে যায়।

ওয়েব-মাধ্যমের তিন নম্বর ছকটা হলো, সব থ্রিলারই কমবেশি 'কপ স্টোরি' বা পুলিশ বাহিনী। বলিউডের সিনেমায় আমরা যেমন দেখে থাকি, এই পুলিশরা কেউ তেমন 'সুপার কপ' নয়, যে কপাকপ দুর্বৃত্তদের সাবড়ে দেবেন। এই পুলিশরা নেহাত ছাপোষা গেরস্ত টাইপ—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কোনও রকমে দিন কাটান। ঘরে-বাইরে তাদের ওপর ভয়ানক চাপ। একই সঙ্গে দায়িত্ববান 'ফ্যামিলিম্যান' এবং কর্তব্যপরায়ণ 'পুলিশম্যান' হয়ে ওঠার ডবল প্রক্রিয়ায় এই পুলিশ অফিসাররা প্রায়ই ভেতরে ভেতরে ভেঙেচুরে খানখান হয়ে যান। তবে বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবন ও তটস্থ চাকরি-জীবনের যাবতীয় টেনশন-উদ্বেগ-সঙ্কট-অপমান-আবেগ-অভিমান ভাগ করে নেওয়ার জন্য এঁরা সবাই অন্তত একজন করে বিশ্বস্ত অধস্তন-কাম-বন্ধু পেয়ে যান! এঁরা তাঁদের 'স্যার' বা 'সাহাব'-কে আগলে রাখেন, ভরসা জোগান— এমন কি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর প্রাণও বাঁচান।

সব মিলিয়ে 'সিংহম', 'সিম্বা', 'রাউডি রাঠোর' জাতীয় 'লার্জার দ্যান লাইফ' পুলিশ-অব তারদের অলৌকিক পরাক্রমের উলটোপিঠে 'পাতাললোক', 'ফ্যামিলিম্যান', 'রাত অকেলি হ্যায়'-এর মতো সিরিজ বা সিনেমাগুলো, একদল নশ্বর, বিপন্ন প্রজাতির পুলিশদের হাজির করে—যাদের পা মাটিতে আছে—তাদের জীবনে অনেক দুর্বল মুহূর্ত, ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা আছে—মানে পুলিশ হলেও একটা রক্ত-মাংসের মানবিক অস্তিত্ব আছে।

তবে সিরিজ-সিনেমাগুলোয় পরপর একই ধরনের 'মানবিক' পুলিশ, তার 'মানবিক' সহচর এবং প্রায় একইরকম 'মানবিক' সমস্যা ও তার সমাধান বা সমাধানের অভাবে 'মানবিক' হতাশা দেখতে দেখতে দর্শকের গুলিয়ে যেতে পারে, কোন্ ব্যাপারটা কোন্ সিরিজ বা সিনেমায় দেখেছে! বরং 'নির্ভয়া' ধর্ষণ ও হত্যা মামলা নিয়ে 'দিল্লি ক্রাইমস'-এর প্রথম সিজন-এ পুলিশের পেশাদারি জগতের একটা 'ইনসাইড স্টোরি' দেখতে পাই। ক্রীড়া-সাংবাদিকতার ভাষায় যাকে বলা যায় ড্রেসিংরুমের অন্দরমহলের গল্প! কোনও কিছুই বাড়তি নাটকীয় নয়। ঘটনা কী ঘটবে সেটাও সবার জানা। দিল্লি পুলিশের দক্ষতা ও আন্তরিকতাকে মহান করে দেখানোরও চেষ্টা নেই। তবু এপিসোডগুলো একটানে দেখে ফেলা যায়। আর এখান থেকেই আমাদের সূত্রায়ণের ফর্মুলা নম্বর চার-এর কথাটা বলে ফেলা যায়। সেটা হলো ওয়েব চ্যানেলগুলোর ক্রমশ গালাগালির অভয়ারণ্য হয়ে ওঠা। এই সিরিজ বা

সিনেমা দেখলে মনে হবে চার অক্ষরের কয়েকটি বিশেষ শব্দই বুঝি আমাদের জীবনশৈলীর ‘রেটোরিক’—গলির গুন্ডা থেকে দিল্লি পুলিশের মহিলা আইপিএস অফিসার সব্বাই রুটিন করে, একবারও হোঁচট না খেয়ে, একটুও দ্বিধায় ঢোক না গিলে মন্ত্রের মতো ঝরঝর করে সেগুলো উগরে দেন।

নির্মাতারা বলতে পারেন, সমাজে বাস্তবে যা চলছে, তাঁরা সেটাই তুলে ধরছেন। আপনার পরিশীলিত কানে শুনতে খারাপ লাগলেও তাঁরা নিরুপায়। পুলিশ-মাফিয়া-যৌনকর্মীদের কথা বলার ধরতাই তো তারা পালটে দিতে পারবেন না! ঠিকই কথা। কিন্তু সব্বাই ঘুরেফিরে কয়েকটা বাছাই গাল পাড়লে মনে হয়, পুরোটাই বোধহয় ‘লকড আপ’-এর মতো বিদেশি সিরিজ দেখার ‘ওভারডোজ’! ওখানে বেসরকারি জেনানা-ফটকের নানা কিসিমের বন্দিনীরা দিনরাত উঠতে-বসতে যেভাবে মুখ-খিস্তি করে, সেটা সেখানার সমাজ-বাস্তব। ওয়েব-সিরিজের ‘ভারতীয় নারী’ শুধু খিস্তির ঝাঁকুনিতে প্রথা ভাঙবেন, এটা হজম করা একটু মুশকিল।

এই সূত্রেই আমরা ওটিটি-কনটেন্টের পাঁচ নম্বর ছকবাজিতে ঢুকতে পারি। সেটা হলো ‘নারীমুক্তি’ বা মুক্ত নারীর রূপকথা। কস্টিউম যতই দুঃসাহসী হোক, বড় পর্দায় নায়িকাদের যথার্থ ভারতীয় নারী হয়ে ওঠার অনেক বেশি দায় থাকে। সেখানে ওয়েব-চ্যানেলে শরীর-যৌনতা নিয়ে ভান-ভনিতা-পিছুটানহীন সার্থক, আধুনিক গ্লোবাল নারীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে এক ধরনের ‘মিথ’ চালু আছে। কিন্তু ওটা মিথই। গুজব বললেও খারাপ হয় না। কারণ ওয়েব-এ নারী মুক্তি-টুক্তি কিছু ঘটেনি। ‘ফোর মোর শট্‌স প্লিজ’ গোছের সিরিজে আমরা যে তথাকথিত ইনহিবিশন-মুক্ত ‘অল গার্লস গ্যাঙ’ বা নারী বাহিনীকে দেখি, তারা হিন্দি বা হিংলিশ-এ কথা বললেও, আসলে তারা আমেরিকান সুপারহিট সিরিজ ‘সেক্স ইন দ্য সিটি’-র মেয়েদেরই স্বদেশি সংস্করণ। ভারতের সমাজ-বাস্তবতায় তাদের কোনও শিকড়-বাকড় নেই। এই সিরিজগুলোতেও এক ধরনের দেখানোপনাই থাকে। দ্যাখো বড়পর্দার নায়িকারা যেসব বলতে সাহস পায় না, আমরা সেটাই করে দেখাচ্ছি। কিন্তু সেটাকেও কোথাও একটা ভারতীয় দর্শকের সাংস্কৃতিক হজমশক্তির সীমারেখার মধ্যে রাখা হয়। মানে বাড়াবাড়ি একটু হোক—দুঃখসাহসের ভড়ংটুকু থাকুক— কিন্তু মাত্রাছাড়া হয়ে প্রতিষ্ঠানকেই যেন চ্যালেঞ্জ করে না বসে। সাম্প্রতিক একটি ওয়েব-সিরিজ ‘মাসাবা মাসাবা’-য় আমরা এরকমই একটা সুশোধিত, নিয়ন্ত্রিত, নিরাপদ নিশ্চিত ‘বিপজ্জনক’ জীবনযাপন বা বিপজ্জনক যাপনের ভান দেখতে পাই।

এই সিরিজে নীনা গুপ্তা ও তাঁর ফ্যাশন-ডিজাইনার কন্যা মাসাবা, যে যার নিজের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এখানে ‘বধাই হো’ সাফল্যের আগে অবধি নীনা গুপ্তের ‘স্ট্রাগল’-এর প্রসঙ্গ আছে। মাসাবার জীবন আর কেরিয়ারের ওঠাপড়া আছে। কিন্তু কাস্টিং-এর এই চমকের চেয়েও তো ৮০-৯০-এর দশকে একলা মা হিসেবে নীনার মাসাবাকে বড় করে তোলার লড়াই অনেক দুঃসাহসিক ও ‘বিপজ্জনক’ ছিল। সিরিজ-এ তার আভাসটুকুও প্রায় নেই। একইভাবে ছোট শহরের (এই ছোট শহর ব্যাপারটাও ওয়েব চ্যানেলের আরেকটা ছক—সেকথা নয়, অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে) ভীতু পুরুষের যৌন-ফ্যান্টাসি নিয়ে ‘রসভরী’-ও লক্ষ্মণরেখা পেরোতে চাইল না। রসভরী যে আসলে কোনও মানবী নয়—পুরুষের আপন মর্দাঙ্গি নিয়ে আস্ফালন আর হীনমন্যতার একটা দ্বান্দ্বিক কল্প, সিরিজের ন্যারেটিভ সেইসব জটিলতায় গেল না। বরং পেত্নীর উপদ্রব আর ‘পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার’-এর মাঝামাঝি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে কোথাওই পৌঁছাল না।

আসলে এটাই হচ্ছে। অনেক কিছু করার সুযোগ ও সম্ভাবনা সত্ত্বেও ওয়েব চ্যানেলগুলো এখনও তেমন কোথাও পৌঁছাচ্ছে না। এমন কি প্যানডেমিক নিয়ে একটা সিরিজ করার কথা ভাবা হচ্ছে, সেটাও হবে থ্রিলার! স্রেফ নিজের ঘরে ফিরবেন বলে যে পরিযায়ী শ্রমিকেরা সাতশো-আটশো-হাজার কিলোমিটার পথ হাঁটতে হাঁটতে জীবনটাই ফুরিয়ে ফেললেন, তাঁদের বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার মধ্যে তো মাফিয়া ডন গাইকোন্ডের কীর্তিগাথার মতো থ্রিল বা সাসপেন্স নেই! ফলে তাঁরা বোধহয় এ যাত্রা সিরিজের বিষয় হচ্ছেন না। তবে ওয়েব চ্যানেলের ছক ভেঙে নতুন কিছু করার মতো কেউ হয়তো ভবিষ্যতে আসবেন। অপেক্ষায় রইলাম।

ইনকিলাবের কবি

সঞ্চারী সেন

অথবা বিপ্লবের কবি।

সেভাবে দেখতে গেলে বিপ্লবীরা সকলেই কবি। নতুন জীবনের কবিতা লেখেন তাঁরা, নিজের শোণিত বিন্দু দিয়ে। কাগজের ওপরে নয়, গুপ্ত ঘাতক কিংবা শাসকের রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়ে রাজপথের বুকে। প্রতিবিপ্লবীদের অস্ত্রে জখম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। কিংবা মালিকের পাঠানো গুন্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কারখানার গেটে। আর সবুজ শস্যখেতের আলের ধারে জমিদার, জোতদারের পাঠানো লেঠেলের লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে, মাটির ওপরে রুধির রেখায়। এবং হয়তো সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত বাহিনীর ফতোয়ার সামনে শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়িয়ে থেকে। আর এঁদের স্বপ্নের কথা যাঁরা লেখেন, তাঁরা বিপ্লবী কবি। কিন্তু এই সব স্বপ্নদ্রষ্টা যোদ্ধা, কবিদের সামনে বিপ্লবের স্লোগান তুলে ধরেন যিনি, বলেন, ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’, বলেন, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, যা মুহূর্তে শিহরণ তোলে রক্তে, মজ্জায়, সমগ্র অস্তিত্বের অণুপরমাণুতে। সেই কবি হলেন ইনকিলাবের কবি, বিপ্লবের কবি। সর্বপ্রথম যিনি উচ্চারণ করেছিলেন এই অমোঘ বাণী, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, তাঁর নাম মৌলানা হসরত মোহানী।

ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য দেশ। যুগ যুগ ধরে অগণিত চিন্তাস্রোত এসে মিলেছে এর দর্শনভূমিতে। কখনো সংস্কার ধর্মশাস্ত্রের চেহারা নিয়ে প্রভাবিত করেছে সমাজকে, যেমন একালে বহু আলোচিত মনুসংহিতায় নারীকে ‘মিথ্যার মতই অপবিত্র’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সে সংস্কার এসেছে আরও আগে লেখা ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’ থেকে, যেখানে অনায়াসে নারী, শূদ্র, কুকুর এবং কালো রঙের পাখি অর্থাৎ কাককে একাসনে বসিয়ে সকলকেই ‘অনৃত’ বা মিথ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘৃণার এ সংস্কার অত্যন্ত যত্নে লালিত, কারণ এভাবেই সমাজে শোষক ও শোষিতের শ্রেণিভেদ সহজ হয়ে ওঠে।

কখনো আবার এই শ্রেণিভেদকে আরও জোরদার করবার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে শাস্ত্র, যেখানে বলা হয়েছে আগে রাজাকে দেয় কর (শস্যের দশম ভাগ বা অষ্টমভাগ বা ষড়ভাগ– হারীত এবং পরাশরের মতে ষষ্ঠ ভাগ)...ছাড়াও আরও নানারকম ‘বলি’ বা কর দিতে হবে এবং নানাবিধ কারণে (প্রকৃতপক্ষে অজুহাত) কখনো জমি বাজেয়াপ্তও করা যাবে। সেকালে এভাবেই তৈরি হয়েছিল অকৃষক ভূস্বামী শ্রেণি এবং ভূমিহীন কৃষক শ্রেণি। এবং অবশ্যই অবশেষে মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামী গোষ্ঠী।

ইসলামি আমলে সে ধর্মের বিধান অনুযায়ী কর্ষিত ভূমি বহুলাংশে কৃষকের দখলে থাকলেও জমির ওপর কৃষকের মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হয়নি। সে অধিকার ছিল শাসকের। এই উপমহাদেশে ধর্ম সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সামাজিক নিয়মনীতি নির্ধারণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শোষণের হাতিয়ার হলেও, কখনও কখনও খুব সামান্য হলেও আবার জনসাধারণের পক্ষে স্বস্তিদায়ক আশীর্বাণীও উচ্চারণ করেছে। আর এমন প্রেক্ষাপটে জন্মালেন যে ইনকিলাবের কবি, তিনি যদি ধর্মপরায়ণ হন, মনের দিক থেকে একজন ফকির হন, হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম, দুই সমাজদর্শনকেই শিরোধার্য করেন, তাহলে

আশ্চর্যের কিছু নেই।

আর সেজন্যেই একালে, দূরদর্শনের জন্য তৈরি এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত বামপন্থী কবি আলি সর্দার জাফরি, মৌলানা হসরত মোহানী সম্পর্কে মুখবন্ধে বলছেন, 'দারিদ্র' ছিল তাঁর দৌলত এবং সত্য তাঁর সম্পদ। 'তিনি ন্যাশনালিস্ট ছিলেন, ছিলেন কমিউনিস্ট এবং সাচ্চা মুসলমান।' সর্দার জাফরি এ প্রসঙ্গে হসরতের শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা সেই শেরটির উল্লেখ করেছেন–

মথুরা কে নগর হ্যায় আশিকী কা
দম ভরতী হ্যায় আরজু উসীকা
পয়গাম এ হায়াত জাওয়িদাঁ থা
হর নগ্‌মা কৃষ্ণ বাঁসুরী কা–

মথুরা প্রেমের নগরী
তারি জন্যে উন্মুখ এ প্রাণ
অবিরাম জীবনের গান গায়
কৃষ্ণের বাঁশরীর তান–

#

সুতরাং এর পরের দৃশ্য উন্মোচিত হবে এক কারাকক্ষে, যেখানে যুবক হসরত বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন। একা অন্ধকারে। ব্রিটিশ সরকারের বিচারে দণ্ডিত তিনি, সিডিশন বা রাজদ্রোহের অপরাধে। কবি হসরত একটি সাহিত্য পত্রিকা চালান। সে পত্রিকায় ইংরেজ সরকার বিরোধী একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ছদ্মনামে। হসরত নিজে এটি লেখেননি, কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রভূত ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও লেখকের নাম প্রকাশ করতে সম্মতও হননি। তাই পাঁচশো টাকা জরিমানা এবং সশ্রম কারাদণ্ড। জেলের চাকি ঘোরাতে ঘোরাতেই নতুন নতুন কবিতার উৎসার, সহবন্দিদের চমৎকৃত করে দিয়ে। ঘরে ফেলে এসেছেন বর্ষীয়সী পিসিমা, তরুণী ভার্যা এবং শিশুকন্যাকে। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তাঁর সেই ছোট্ট মেয়েটার শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। তবু হার মানছেন না হসরত, কারণ প্রিয়তমা স্ত্রী তাঁকে চিঠিতে লিখেছেন– 'খবরদার, কিসী কিসম কী কমজোরি কা ইজহার না হো', সাবধান, কখনো কোনোরকম দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায়।' বেগম নিশাতুন্নেসা দরিদ্র কবিগৃহিণী, হসরতের আগুনের ইন্ধন তিনি। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই কাব্যে লিখেছেন হসরত, 'তোমার বিভায় আলোকিত চতুর্দিক', 'রওশন জমাল এ ইয়ার সে আঞ্জুমান তামাম'–

এবং একই সঙ্গে লিখেছেন শ্রমের কবিতা, কারাবাসের পদ্য 'যো চাহে সজা দে লো, তুম অওর ভি খুল খেলো, পর হমসে কসম লেলো, কী হো যো শিকায়ত ভি'– যেমন ইচ্ছে শাস্তি দাও আরও খোলাখুলি, কিন্তু অভিযোগ জানিয়েছ যখন, তখন পূর্ণ করো প্রতিজ্ঞাও।

বিদ্রোহ অবশ্য এই তরুণ কবির জীবনে নতুন নয়। উত্তর প্রদেশের এক ছোট্ট শহর মোহানে (তাই মোহানী) জন্মানো এই তরুণ আলিগড় কলেজে বিএ পড়বার সময়ই তাঁর রাজনৈতিক আবেগের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। ঘটনাটি ছিল এইরকম, হসরত তাঁর কলেজে এক দারুণ মুশায়রা বা কবিসম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন যাতে সেকালের বেশ কিছু বিখ্যাত উর্দু কবিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কর্তৃপক্ষের মতে সে অনুষ্ঠানে কিছু আপত্তিকর কবিতা পাঠ করা হয় এবং সেকারণেই ছাত্র হসরতের ওপর নেমে আসে বহিষ্কারের চরম দণ্ড। অদম্য হসরত যদিও শেষপর্যন্ত প্রাইভেটে বিএ পাশ করে তাঁর প্রতিভার যথাযথ স্বাক্ষর রাখেন, কিন্তু সম্ভবত সেই সময় থেকেই আলিগড়ের ছাত্রদের মধ্যে রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি বীজ উপ্ত হয়ে যায়। যাকে একালেও কখনও কখনও প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যায়।

হসরত মোহানীর আসল নাম ছিল সৈয়দ ফজলুল হাসান। হসরত ছদ্মনাম বা তখল্লুস। ১৮৭৮ সালে জন্ম যে মোহান শহরে (উন্নাও জেলায়) সেটি তখন বিদ্যা এবং জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। হসরত শব্দের অর্থ অপ্রাপ্যের জন্য বিষণ্নতা বা দুঃখ। সেই নামেই জনপ্রিয় হলেন তিনি। পরে মজা করে লিখেছেন–

ইশ্‌ক নে যবসে কহা হসরত মুঝে
কোই ভি কহতা নহী ফজলুল হাসান–
প্রেম যবে থেকে আমায় দুঃখী বানালো,
কেউ আর ফজলুল হাসান বলে ডাকেই না!

উর্দু, আরবি ও ফারসির মেধাবী ছাত্র হসরত স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। তারও আগে প্রকাশ করলেন একটি পত্রিকা, নাম 'উর্দু এ মুয়াল্লা' (অর্থ পরিশুদ্ধ উর্দু), যেখানে নিবন্ধ লেখা হতে লাগল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাহিত্য বিষয়ে। সেরকমই একটি তথাকথিত রাজদ্রোহমূলক রচনার কারণে তাঁর কারাবাসও হলো। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিপজ্জনক কয়েদি হিসাবেই গণ্য করেছিল, তাই রাতারাতি তাঁকে আলিগড় সেন্ট্রাল জেল থেকে নৈনী সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। তার আগে অবশ্য তার দরিদ্র আবাসটি ভাঙচুর করে আর তাঁর লেখাপত্র ছিন্নভিন্ন করে ব্রিটিশের উর্দিধারী গুন্ডারা কী পেয়েছিল জানা নেই। জেলের বদলির দিন ছিল বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করবার দিনও। নিশাতুন্নেসা একাকীই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, রাজরোষের ভয়ে কেউই তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না। তিনি ফিরে এলেন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, কারা প্রাচীরের গায়ে মাথা কুটে। তবে একদিন কারাবাস শেষে ঘরে ফিরে এলেন হসরত। কিন্তু রাজ আদেশে পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হলো। তখন সংসার চালানোর জন্য খুললেন একটি স্বদেশি ভাণ্ডার। স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এক তরুণকে কে আর কাজ দেবে! হলেই বা সে মেধাবী, সুশিক্ষিত! তাঁর বিপণি দেখে সেকালের এক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মৌলানা শিবলি পরিহাসছলে বলেছিলেন, 'তুমি একজন মানুষ না ঐশ্বরিক শিশু! প্রথমে তুমি কবি ছিলে, তারপর স্বাধীনতা সংগ্রামী হলে, এখন আবার দোকান খুলে বসেছো!'

কংগ্রেসে তিনি ছিলেন চরমপন্থীদের দলে। তাঁর চিন্তা ছিল উদার। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন মতাদর্শের দিক থেকে তাঁর কাছাকাছি। ১৯০৪ সালের মে মাসে বম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। হসরত সেই অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর বালগঙ্গাধর তিলক পার্টি ছেড়ে দেন। হসরত সে সময়েই অসহযোগ সংক্রান্ত আবেদন পেশ করেছিলেন। সে সময় সেটি নামঞ্জুর হলেও অনেক পরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই একই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৮ সালে সেই

কারাবাসের ঘটনা। আপত্তিকর সেই প্রবন্ধটির বিষয় ছিল ব্রিটিশের 'ইজিপ্ট পলিসি'।

কমিউনিজমের প্রতি মৌলানার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ১৯২৫-এর কানপুর কনফারেন্সে হসরত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সেখানে বক্তৃতায় তিনি যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে এইরকম–

কমিউনিস্ট আন্দোলন মূলত কৃষক এবং শ্রমিকের আন্দোলন। ভারতের মানুষেরা সাধারণভাবেই এর মূল তত্ত্বে বিশ্বাসী, এর বিরুদ্ধে ভুল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়। ফলে কিছু লোক মনে করতে থাকে খুন জখম, দাঙ্গা হাঙ্গামার নামই কমিউনিজম।

মৌলানা ধর্ম সম্পর্কে ভারতবর্ষের তৎকালীন কমিউনিস্টদের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কমিউনিস্টরা ধর্মীয় ঐক্যে বিশ্বাস করেন। সেসময়ের কিছু মুসলমান নেতৃত্ব কমিউনিজমের সঙ্গে ইসলামের বিরোধিতা খুঁজে পেলেও মৌলানা বলেন, বাস্তবে, পুঁজির ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান কমিউনিজমের চেয়েও কড়া।

সেসময়কার পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, এই অধিবেশনে পাঁচশোর মতো মানুষ যোগদান করেছিলেন, যার অধিকাংশই ছিলেন শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সেসময়ই স্বাস্থ্যের কারণে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি সরাসরি আলমোড়া থেকে সেই অধিবেশনে শরিক হন।

ইতিহাস বলছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কানপুর দপ্তরের উদ্বোধন করে লাল পাতাকা উড়িয়েছিলেন হসরত মোহানীই। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্যও ছিলেন তিনি।

তারও আগে ১৯২১ সালে আমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি রামপ্রসাদ বিসমিল ও অন্যান্য তরুণদের সঙ্গে মিলে পূর্ণ স্বরাজ বা 'আজাদী এ কামিল'এর প্রস্তাবকে পাশ করান। ওই বছরেই একটি মতানুসারে মুসলিম লিগের একটি সভায় তিনি প্রথম 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বা 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', এই স্লোগান দেন, যা পরে জনপ্রিয় করেন ভগৎ সিং তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখা এবং বক্তৃতায়।

হসরত মোহানী ছিলেন পরম আবেগপ্রবণ এক মানুষ। কবি ছিলেন, ছিলেন সর্বত্যাগী মানব। যেকোনও ক্ষেত্রে মানুষের মঙ্গল হবে এমনটা মনে হলেই তিনি সেই মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। মুসলিম লিগে তাঁর যোগদানও ছিল সেই কারণেই। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশভাগের প্রস্তাব এলে তিনি নির্দ্বিধায় সে মঞ্চ ত্যাগ করেন।

হসরতকে অনেকে পরস্পর বিরোধী, অস্থিরচিত্ততার শিকার বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের এক প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য আলোচক, অনুবাদক এবং সে দেশের প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভাপতি রাজা নয়ীম এক অসাধারণ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনায় তিনি লিখেছেন, 'হসরতের আচরণকে কিছু মানুষ স্ববিরোধী মনে করেন, কিন্তু এ সমস্তই তিনি করেছিলেন একজন মুসলমান, একজন কমিউনিস্ট, একজন ভারতীয় এবং একজন মানুষ হিসাবে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী।' নয়ীম হসরতের 'উর্দু মুয়াল্লা' পত্রিকায় সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত তাঁর কয়েকটি নিবন্ধের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো, 'সমাজতন্ত্র কী চায়,' 'রাশিয়ার নতুন প্রজন্ম', 'সমাজতন্ত্র ও ইসলাম' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে নয়ীম হসরতের একটি কবিতার অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। সে কাব্যে যাওয়ার আগে হসরতের জীবনের আর একটি অধ্যায় সম্পর্কে বলে নেওয়া ভালো।

১৯৪৭-এর পরে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। তিনি এদেশের সাংসদও হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি বাসভবনে কখনো থাকেননি। সংসদে যেতেন টাঙা ভাড়া করে। চড়তেন রেলের থার্ডক্লাসে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে সহাস্যে বলতেন, 'রেলে ফোর্থ ক্লাস থাকলে তাতেই চড়তাম।'

১৯৫১ সালে লক্ষ্ণৌয়ে প্রয়াণের আগে পর্যন্ত তিনি একাধিকবার হজে গিয়েছেন। ছিলেন মানবিক, ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

'পুঁজির অন্ধশক্তির ভয়, অন্ধ, কারণ সাধারণ মানুষের ততটা দূরদৃষ্টি নেই যে তাকে দেখতে পাবে... এই শক্তি তার উপর এক আকস্মিক ধ্বংস নামিয়ে আনে, সে ধ্বংস নিঃস্বতার, সে ধ্বংস বেশ্যাবৃত্তির অসম্মানের এবং অনাহারে মৃত্যুরও– এটিই আধুনিক ধর্মের শিকড়...' বলেছিলেন কমরেড লেনিন।

আজকের এ সময় অতীব সঙ্কটের। পুঁজি এবং ধর্মকে একত্রে খেলানো হচ্ছে। তাই লড়াই কঠিন। তবু শেষ করবার আগে হসরতের লেখা সেই কালজয়ী কবিতা বা গজলের কথা মনে করব, কারণ যাঁকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি লেখা, সেই নিশাতুন্নেসা ছিলেন হসরতের আগুনের অন্যতম উৎসও। প্রথম জীবনে তাঁর প্রেমই তাঁকে লড়াইয়ের শক্তি জুগিয়েছিল।

সে গান হলো 'চুপকে চুপকে রাত দিন আঁসু বহানা ইয়াদ হ্যায়, হমকো অবতক আশিকী কা উয়ো জমানা ইয়াদ হ্যায়'–সবার অগোচরে রাত্রিদিন অশ্রুবর্ষণের কথা মনে আছে। মনে আছে আজও আমার প্রেমের সেই দিনগুলির কথা।

ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য উর্দু কবিদের অন্যতম ছিলেন হসরত।

এবং পরিশেষে রাজা নয়ীমের উল্লিখিত হসরতের লেখা সেই দু'ছত্র, যা তাঁকে চিরকাল মনে করাবে। মনে করাবে ইনকিলাবের কবি হিসাবে–এদেশ, ওদেশ, সবদেশের বিপ্লবী মানুষ সেলাম করবে তাঁকে, ওই একটি স্লোগানের জন্যেও।

দরবেশী ও ইনকিলাব মসলক হ্যায় মেরা
সুফী মোমিন হুঁ, ইশতিরাকী মুসলিম।
ফকিরী ও বিপ্লব হলো জাত আমার,
আমি সুফীতত্ত্বে বিশ্বাসী, আমি কমিউনিস্ট মুসলমান।

সহায়ক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ–

The Attitude of the Worker's Party Towords Religion –V.I.Lenin (প্রবন্ধ)

মার্ক্সীয় অর্থনীতি– তারাপদ লাহিড়ী (গ্রন্থ)

Protecting the Memory of Maulana Hasrat Mohani, Muslim and Communist-Raza Naeem (Write up)

কুল্লিয়াত এ হসরত মোহানী (হসরত মোহানী কাব্যসমগ্র) (গ্রন্থ)

Masterpieces of Urdu Ghazal- K C Kanda

কহ্‌কশাঁ–হসরত মোহানী–দূরদর্শন ধারাবাহিক– পরি : জালাল আগা। রচনা-আলি সর্দার জাফরি।

সোনার হাতে সোনার কাঁকন: লিরিকেরই গান, গানেরই লিরিক

পুষ্পজিৎ রায়

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ওঁকে দেখেছি বছরের পর বছর। কখনও দূরে, কখনও কাছে, কখনও আবার মুখোমুখি। একদম একাকী। আসলে মানুষটা একটা অখণ্ড আর্টিস্ট। কখন কোন কথায় কোন ঘটনায় ঘটবে আত্মকথনের উন্মোচন, কে বলবে?

নাম বিশুয়া, বিশু পণ্ডিত, বিশ্বনাথ পণ্ডিত। এককালের কিংবদন্তী গম্ভীরা শিল্পী। কথা হচ্ছিল ইংরেজবাজারের হাটখোলায়। তাঁর নিজের বাড়ির বাইরের ছোট ঘরে। স্মৃতির পুরাতন বৃক্ষ থেকে এক একটা পাতা ঝরে পড়ছিল হাল্কা হাওয়ায়। বলছিলেন বোধহয় ১৯৫১- ৫২ সালের কথা। গম্ভীরা দল নিয়ে গিয়েছেন কলকাতায়। পুরানো কথা বলতে বলতে খালি গলায় শুরু করলেন গান। দরাজ সুরেলা লম্বা তার রেঞ্জ। গাইলেন:

...(তাই) হয়ে মোরা বাদী
জানাই খবর আদি
এ আজাদি
সারাজ ঝুটা হ্যায়
(আরে) ঝুটা হ্যায় এ রাজ ফুটা হ্যায়
হয়ে মোরা বাদী।।

এ স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা নয়, ভুয়া। পোড়া বার্তাকু। এ 'সারাজ' (স্বরাজ) সারাজ নয়, ঝুটা।

মিথ্যা। শুধু কি ঝুটা? ফুটাও বটে। ঝুটার সঙ্গে ফুটা শব্দটা লাগিয়ে ঝুটাকে একেবারে কাপড় পরিয়ে ছেড়েছেন গীতিকার। সরল প্রাঞ্জল অথচ মানুষের অন্তর্জ্বালার অকপট বিস্ফোরণ। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন আক্রোশের গনগনে অঙ্গার। তাতেও ক্ষান্ত নন, বলছেন:

এ নকলি শাসানরাজকো তোড়না হ্যায়।
তোড়না হ্যায় এ ফির জোড়না হ্যায়।
হয়ে মোরা বাদী.....

সদ্য স্বাধীন দেশ। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান। নকল শাসকদের উৎখাত করতে হবে। ভেঙে চুরমার করতে হবে। কিন্তু চুরমার করাটাই মূল লক্ষ্য নয়, গড়তে হবে। গড়াটাই আসল। তোড়নার সঙ্গে জোড়না শব্দের লাগসই প্রয়োগ সেই গঠনমূলকতার দায় ঘোষণা করছে।

****

এ কীরকম লিরিক? মালদৈয়া কথ্য বাংলা আর মান্য বাংলার পাশে খোট্টা বিভাষার তরল মিশ্রণ? হিন্দি ভোজপুরি দেশওয়ালির ভুনি খিচুড়ি?

আসলে আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজবাজারের বাজার রমরমা। ফ্রম আলিবর্দি টু হেঞ্চম্যানের বিবর্তনে রংরেজবাজার উন্নীত হলো ইংরেজবাজারে। প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপে অজস্র মানুষের বসবাস শুরু হলো। বিহার, উত্তর প্রদেশ তো লাগোয়া, বহু দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এল। এই বিশু পণ্ডিতেরাই এসেছিলেন পাটনা, দানাপুর থেকে। এখন থেকে (২০২০) প্রায় দশ পুরুষ আগে। এখানে অনেক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মিশেলে তৈরি হলো মজার এক খোট্টাবুলি। শ্রুতিমধুর ফোনেটিক প্যাটার্ন। এখনও আছে এর জের। গ্রিয়ার্সন সাহেবের তো সার্ভে করতে এসে মাথায় হাত। বললেন, Malda as the meeting place of several languages, would form an interesting study to the comparative philologist.

বিশু পণ্ডিতের জন্ম এখানেই, এই হাটখোলায়। ১৯২০ সাল নাগাদ। আমি যখন তাঁর কাছে বসে কথা বলার এবং গান শোনার সুযোগ পাই, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। তার অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছেন আসরে গান গাওয়া। মূলত মৃৎ শিল্পী, চিত্রশিল্প সহ চারুকারুশিল্পেও দক্ষ। আর গান তো আছেই। গল্পে গল্পে অনেক গানই শোনাতেন। প্রায়ই শোনাতেন ছোট্ট একটা গান। গানটি যিনি বানিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন নিরক্ষর। নাম ভুলে গিয়েছেন। তারপর শোনালেন সেই গল্প।

বুঝলেন, লোকটা এক দিন কাজ করছিলেন তুঁতের জমিতে। তার মধ্যেই গুনগুন গুনগুন। মাথায় সুর খেলা করছে। এই করতে করতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এসে গেল একটা গান। সে তখন তুঁতের জমি থেকে উঠে দৌড়ে চলে গেল পাড়ার ভেতর। তাড়াতাড়ি লেখাপড়া জানা এক ছাত্রকে ডেকে নিয়ে বললেন, এই গানটা একটু তাড়াতাড়ি লিখে দে তো!। ছেলেটি লিখে দিল। পর দিন গানটি নিয়ে লোকটা এসে হাজির আমার কাছে। আমি পড়ে দেখে তো অবাক! লোকটা ছিল নিরক্ষর। গম্ভীরা গানের এক সাধারণ শিল্পী। এবার গানটা শুনুন:

ও ঠাকুর কীসে গেল ছোঁয়া'
বলি হে ঠাকুর, বলো তো একবার শুনি
তোমার কীসে গেল ছোঁয়া?
কাচ্চা চামড়া কাটি হামরা নাম তাই মুচি
আর সেই জুতা পইর্যাহ
চেয়ারে বইস্যা খাও সন্দেশ লুচি
ঠাকুর হে শুচি হয়ে, তোদের কেমনে হয় রুচি
হয়ে তোরা মহাজ্ঞানী
হে ঠাকুর কেমনে ছোঁয়া গেল পানি...।

বিশুবাবু বললেন, সেই প্রথম দিন শোনার পর থেকে বহু বছর বাদে আজও গানটা আমার মনে আছে। গানটা তো অস্পৃশ্যতাবিরোধী গান! বহু আসরে গাওয়া হয়েছে। আমিও গেয়েছি, গীতিকার নিজেও গেয়েছে। দ্যাখেন, ল্যাখ্যাপড়া কিছু জানে না, কিন্তু কেমন যুক্তিবুদ্ধির ধার!

এই যে সাধারণ একজন গায়কের মাথায় একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পুরা একটা গানের মুদ্দা পাওয়া গেল, এ কি সহজ কথা? মুদ্দা কী জানেন তো? মুদ্দা হচ্ছে বিষয়বস্তু। যে বিষয় নিয়ে গান তৈরি হয়, সেই বিষয়কে গানটার মুদ্দা বলা হয়। গম্ভীরা গানের গীতিকার পালাকাররা বছর বছর নতুন নতুন গানের মুদ্দা স্থির করেন, সেই মুদ্দা ধরে তৈরি হয় লিরিক।

এইখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, গম্ভীরা গানের বিষয়ের তো সীমা পরিসীমা নাই, পঞ্চায়েত টু পার্লামেন্ট, লোকাল থেকে গ্লোবাল। হোয়াট নট? খরা, বন্যা, আয়লা, আমফান, ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি সব। আর তা ছাড়াও তার মধ্যে আর একটা গভীর ব্যাপার আছে– তা হচ্ছে আত্মপাপকর্মের প্রকাশ্য উচ্চারণ।

কীরকম?

সমাজে যে সব অনৈতিক কাজকর্ম ঘটে যায়, যা নিন্দনীয়, সেগুলি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করা। বলা যায়, অপরাধমূলক কাজকর্মের বিবরণ দেওয়া গম্ভীরা গানের প্রাচীন একটি ধারা। বিশেষ করে চারটি মূল পর্যায়ের মধ্যে রিপোর্ট পর্যায়ে আগের বছরের ঘটনা প্রকাশ করা হয়। The ceremony consisted originally in the annual review of the acts of the year and penance for mis-deeds...(G.E. Lambourne.)

এ হচ্ছে পরম্পরায় বেঁচে থাকার মূল্যবোধগুলির একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সার্বিক সামাজিক আত্মপাপকর্মের উচ্চারণ পুনরুচ্চারণের ট্রাডিশনাল রিচুয়ালধর্মী ব্যাপারটি গম্ভীরা গানের মুদ্দা নির্ধারণে আলাদা সম্ভ্রম পায়। এই ব্যাপারটির বাস্তব কারণ নিহিত আছে অতীতের বৌদ্ধ উৎসবের আনুষ্ঠানিকতায়। বৌদ্ধ আদর্শের নীতিমূলকগ্রন্থ 'প্রাতিমোক্ষ'র নির্দেশ অনুসারে ওই উচ্চারণ পুনরুচ্চারণের ধারা অনুসৃত হয়। মনে করা হয়, অনৈতিক কাজগুলি প্রকাশ্যে স্বীকার করা হলে পাপের লাঘব ঘটবে এবং নির্বাণ লাভের পথ মসৃণ হবে। অবশ্য এই মনোভাব নিয়ে ইদানিংকালে গানের মুদ্দা আর নির্ধারণ করা হয় বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রাচীন আনুষ্ঠানিকতার জের হিসাবে এই রীতিটি আজও চলছে।

****

তবে "গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি/ আমায় চমকে দাও চমকে দাও'– এর মতো লিরিক এঁরা

লেখেন না। মুদ্দা তাঁদের সাতসমুদ্র দশদিগন্ত। তার উপর মাথায় থাকে আইডিয়ালিটি। '...Their subjects composed an ideality in their approach"... (Oscar Thomson..) সুতরাং গান শুধু গান নয়। সময় সমাজ এবং চারপাশের জীবন। সেই জীবনে আছে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বান-বন্যা, আছে আরও কত ওঠাপড়া। যেমন এই গানটার কথাই ধরুনঃ

বলব কি গান ওহে শিব , বাগানে নাই আম
গাছে গাছে বেড়িয়া ঘুরে দেখছি নূতন পাতা সব সমান।।
মনে মনে ভাবছি বস্যা কাজের কোন পাইনা দিশা... ... ...
আর এক শুনো নূতন কাহিনি
ঠিক দু'পহরের শিল আর পানি
মাঠে হয় কিসান পেরশানি মারিলে গহম।।(গম)

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের এক দুপুরে ঘটেছিল প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি। সহজ সরল বর্ণনা। সবই বোঝা যাচ্ছে। আসলে আমের ফলনের সঙ্গে সমস্ত জেলাবাসীর আর্থিক ভালোমন্দের সম্পর্ক তো নিবিড়। কেনাবেচা তো আছেই, আমকেন্দ্রিক আরও কত রকমারি অর্থকরী কাজ যে আছে! বাগান পাহারা, গাছ থেকে আমপাড়া, ঝুড়ি তৈরি করা, ঝুড়ি প্যাক করা, পরিবহণের ব্যবস্থা। তার সঙ্গে আছে আমসত্ত্ব, আমচুর, আচার, কাসুন্দি বানানো, আরও কত কী। আর ঠিক দুপুরবেলার ঝড়জল-বৃষ্টিতে মাঠে কৃষকের হয়রানি, নষ্ট হলো গম। সব মিলিয়ে বড় একটা আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত।

গীতিকার কি এত সব ভেবে বানিয়েছিলেন গানটার বাণী? না কি আমরা যারা মালদহের মানুষ গানটা শুনলাম, তারাই বানালাম? মনে হয় লোকসংস্কৃতির একেবারে নিজস্ব একটা জিয়োগ্রাফিক্যাল-কালচারাল হিন্টারল্যান্ড থাকে। জাতি, জনগোষ্ঠী মিলিয়ে এক একটা এলাকার জীবনচর্যার এক একটা প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নের ভেতর থেকে গড়ে ওঠে জীবনাভিজ্ঞতা। এই জীবনাভিজ্ঞতাই এই সব গানের বাণীর রস সৃজন ও আস্বাদনের উপযোগী নুন-ঝাল-টক-মিষ্টি সাপ্লাই করে। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এই জন্যই বলতে চেয়েছিলেন, লোকসংস্কৃতিকে লোকায়ত পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে উপলব্ধি করতে চাইলে তার রস পাওয়া যায় না। সেই জায়গার আকাশ-বাতাস, জল-মাটি-গাছপালা, ধুলোবালি সহ সমস্ত পরিবেশটা মিলিয়ে অখণ্ডভাবে দেখতে হয়। তবেই তার রসটা পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব।

কিন্তু আমাদের গম্ভীরা গানের লিরিসিস্টরা একেবারেই সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষ। বিশু পণ্ডিত, সুফি মাস্টার কি আর ব্যাকরণ ও ভাষা সাহিত্য পড়েছেন? সৃষ্টির কাজে সময়ই বা দিতে পারতেন কতটুকু? আগে তো পেটভাতের জোগাড়? তারপরে গান। কিন্তু এই শিল্পীদের মস্তিষ্ক ছিল সজীব, সৃষ্টিশীল। গান জীবিকা নয়,অথচ গানই ধ্যানজ্ঞান।

বন্দনা পর্যায়ের একটা গানের কথা মনে পড়ছে। গানটি বেঁধেছেন ষষ্ঠীলাল। তাঁর অ্যাপ্রোচ আক্রমণাত্মক বটে, কিন্তু তার মধ্যে আছে মজা । শিবকে বলছেন:

বুড়াটার নাই কাণ্ডজ্ঞান সারাদিনমান
গাঁজাতে দম মারছে জোরে।
ঐ দ্যাখনা, নিশায় মজগুল, চোখ ঢুলাঢুল
ষাঁড়ের পিঠে বেড়াই(বেড়ায়) চড়ে।।

বুড়ো মানে এখানে বৃদ্ধ নয়, আদর করে বলা হচ্ছে বুড়ো।

গম্ভীরায় শিবকে স্মরণ করে দু'চার কথা বলতেই হয়। এখানে দেখছি, গীতিকারের সঙ্গে শিবঠাকুরের বেশ ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্ক। না ভক্তিভাবনা, না সম্ভ্রম। আসলে ঠাকুরদা-নাতি সম্পর্ক। তাই তো গম্ভীরায় শিবকে নানা হে বলে ডাকাডাকি। আবার এরই পাশাপাশি কত সিরিয়াস প্রসঙ্গ:

ক) হিন্দু মুসলমানে দা কুমড়া সম্বন্ধ।
সর্বত্রই লেগে আছে উভয়েতে দ্বন্দ্ব
এই গৃহবিবাদ, শিবো, না করিলে বন্ধ
(হবে) দুইজাতিরই অবসান।।

খ) যুদ্ধ বেধে গেছে দুই বছর হলো প্রায়
হয় না কোন দিকের জয় বা পরাজয়।।
জার্মানির ধ্বংস শীঘ্র সুনিশ্চয়
(সগর্বে) ব্রিটিশ ওড়াবে নিশান...

গীতিকার গোবিন্দলাল শেঠ। ছন্দের বাঁধন, শব্দের চয়ন বেশ সাবলীল। মধ্য চল্লিশের সামাজিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা উঠে এসেছে। গীতিকার জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন যে, এ জিনিস অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। পরের স্তবকে এসেছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জার্মানির পতন অবশ্যম্ভাবী, সেই বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে বাণীতে। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৪১/৪২-এ লেখা। তখনকার পরিস্থিতিতে প্রাত্যহিক, কিন্তু প্রত্যহের অতীত। এই সরব স্পষ্টতা গম্ভীরা শিল্পীদের এক অর্জিত সম্পদ। বিচারবোধ বিশ্বাসবোধের দায় থেকে প্রাপ্ত। যা মনে আসে, তা-ই বলে ফেলেন। ভাবের ঘরে চুরি নেই। এই দ্বিধাহীন চিত্ততার ভিত্তি অনেক গভীরে। সেখান থেকেই উঠে আসে গানের মুদ্দা। মুদ্দায় কখনও সখনও অবশ্য বিশেষ পালাকার-গীতিকারের মানসিক গঠনের উপর বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব ঘটে যেতেও পারে।

****

লিরিক তো আকাশ থেকে পড়ে না। দীর্ঘ মানসিক প্রস্তুতির ফসল। যদ্দুর জেনেছি, এই গীতিকাররা খুব মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়তেন। যাঁরা পড়তে জানেন না, তাঁরা অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে নিতেন, শুনতেন। নিয়মিত রেডিয়োতে খবরও শুনতেন। আড্ডায়, আখড়ায় যেতেন। গল্পগুজব, তর্কবিতর্ক করতেন। ফলে চারপাশের হালচাল আর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বেশ ভালোই ধারণা তৈরি হতো। শুধু তা নয়। সব সময়েই সতর্ক ও সচেতন থাকতেন।

কখনও কখনও আসরে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেও কিছু গান বানাতে হতো। এরকম একটা ঘটনা বলি। মালদহে একবার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আসার কথা। কাজের শেষে তিনি সন্ধ্যায় গম্ভীরা গান শুনবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানা গেল, তিনি আসতে পারছেন না। আসরের ঠিক আগে এই খবর জানতে পারলেন গীতিকার সুফি মাস্টার। তখন তিনি চট করে দুই-তিন জন অভিনেতার সঙ্গে কয়েকটা কথা বিনিময় করে নিলেন। যথারীতি আসর শুরু হলো। দেখা গেল বন্দনা পর্যায়ের তিন শিল্পী 'আশুতোষ', 'আশুতোষ' বলে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। ডাক শুনে এসে হাজির বাঘছাল পরা জটাজুটধারী শিব। হাতে ত্রিশূল,

কমণ্ডলু। প্রবেশ করে বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা আমায় এমন ডাকাডাকি করছ কেন? তখনই এলেন উচিত বক্তা বা মূল গায়েন। উচ্চস্বরে গান ধরলেন:

কারে ডাকতে কেডা এল ভাইরে
ইনি কি স্যার আশুতোষ?
হাইকোর্টের জজ?
তবে কেন গায়ে মাখা ছাই রে?...

তাৎক্ষণিক এই নাট্যদৃশ্যটি খুব উপভোগ্য হয়েছিল। এমনকী এরপর থেকে গম্ভীরার বন্দনা পর্বে একটা বিশেষ চরিত্র হিসেবে চালু হয়ে গেল শিবের প্রবেশ। তার আগে মণ্ডপে মণ্ডপে থাকত শিবের মূর্তি। পারফরম্যান্সের বিবর্তনে মূর্তি হলো সচল একটা চরিত্র।

লিরিকের কথায় আসি। সমাজে নিরন্তর নতুন নতুন ঘটনা। নতুন সমস্যা, নতুন সংঘাত। আলোড়ন, আন্দোলন। এই আন্দোলনের আবর্ত থেকে গীতিকার জোগাড় করেন তাঁর গানের উপকরণ। উপলব্ধি করেন বাস্তব পরিস্থিতি। এই উপলব্ধির প্রসঙ্গে মনে পড়ছে নিবারণ পণ্ডিতের কথা। মানুষের মধ্যে থাকতেন সব সময়, মানুষের সঙ্গে কাজ করতেন, জড়িয়ে থাকতেন আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে। বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতেন তো বটেই, বাস্তবতার নতুন নতুন রূপান্তরিত পরিস্থিতি চিহ্নিত করে ফেলতেন। সেই মতো পুরানো আঙ্গিকের গানে নতুনতর রূপ দিতেন। অতি পুরাতন পাঁচালিগানও তাঁর পারফরম্যান্সের গুণে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত। aesthetic talent থাকার ফলে তাঁর পাঁচালিগানগুলি নাগরিক মানুষজনের কাছেও উপভোগ্য হয়ে উঠত। (whose panchalis entrance even towns people...)। পিপলস ওয়ার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ১৯৪৪।

গীতিসংলাপ আর গদ্যসংলাপ যা-ই হোক না কেন, তার সরলতা সবাই পছন্দ করে। একটা টান থাকে। এই টানের ম্যাজিকটা কী? গীতিসংলাপের লিরিকে কি সুরের সমধর্মিতা থাকে? লুকিয়ে থাকে শিল্পের কলাকুশলতা? উত্তর বাংলার শিল্পীরা বলেন, গান তো যেইঠে সেইঠে দিয়ে আসে না। আসে 'জিউ'-এর ভিতর থাকিয়া। হৃৎকমলের ভিতর থাকিয়া। হৃৎপিণ্ড তোলপাড় করে বেরিয়ে আসে গান। মনের ভাবগতিক যখন উথলায়, তখনই ঘটে অন্তর্লোকের উৎসার। আসলে বাণী বাইরের কোনও ব্যাপার না, ভিতরের ব্যাপার। একেবারেই ইন্টারনাল। সুলভ নয়, দুর্লভ। লিরিকের বাকভঙ্গিমার একটা আলাদা ঝিলিক থাকে। এই ঝিলিকের মধ্যে খবর থাকে টানের। বিষয় বুঝতে এবং বোঝাতে বাকভঙ্গিমার ঝিলিক দর্শক-শ্রোতার কাছে একটা নৈকট্য তৈরি করে ।

হ্যাঁ, নিবারণ পণ্ডিতের কথা যা বলছিলাম। সরাসরি বলেছিলেন, আমি অবসরভোগীদের জন্য গান বাঁধি না। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং সংগ্রাম আমাকে প্রেরণা দেয়।... জনসাধারণের কাজ করছি বলে তাঁদের মতো করেই ভাবি, গানে সেই ভাবনাই প্রকাশ করি। (পিপলস ওয়ার, ১৯৪৩, ১৯ সেপ্টেম্বর)।

মানে কী? অবকাশ বা আনন্দবিনোদন কিছুই নয়? ভাবতে হচ্ছে। তবে সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটা স্পষ্ট। মাঝে মাঝে মনে হয়, এঁদের গানে বা পালায় কাহিনীগত অভিঘাতের আগ্রহ তেমন নেই বললেই চলে। নাটকীয় উৎকর্ষ এঁদের মনোযোগের বিষয়ই নয়। প্রতিপাদ্যের দিকেই প্রধানত নজর। এমনকী চমকপ্রদ বাণীবিন্যাসের জন্যও সব সময়ে মাথা ঘামান না। লক্ষ্যপূরণে অবিচল। তাই সহজ, সরল, সাবলীল শব্দ দিয়ে অনায়াসলব্ধ বাকভঙ্গিমায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সদাসচেষ্ট। এমনকী প্রত্যাশিত প্রকাশকুশলতা বা প্রকাশমাধুর্য সৃষ্টি করতে না পারলেও প্রধান লক্ষ্যটি আঁকড়ে ধরে থাকেন। সেটাই চ্যালেঞ্জ। প্রতিপাদ্য তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বিন্দুমাত্রও ফাঁকফোকর থাকা চলবে না। যতটুকুই বুঝুন, নিজের মতো করে ভালোভাবে বুঝে তবেই সেটা তুলে ধরা। সত্যিই বিষয় অনুসারী বাণীবিন্যাসকারী। প্রশ্নটা মনোরঞ্জনের না। বিষয় উপস্থাপনের।

লিরিকের এই স্পষ্টতা, সরলতা এবং প্রত্যক্ষতা পরম্পরার একটা প্রবহমান ধারা। বৌদ্ধ আদর্শপ্রচারের জন্য অশোকের লোকায়ত প্রাকৃত সরল ভাষার রীতি কি? লোকপ্রিয় প্রণালী?

চর্যাপদ, প্রাকৃত, প্রকীর্ণ অবহট্টের রাস্তা ধরে শাক্ত কবিদের ধারায় এসে পৌঁছে যাওয়া। উমাকে ঘরে আনার জন্য বাঙালি মায়ের সে কী 'আনচান' 'আনচান'। মায়ের মনের ভেতরের বেদনাটা কেমন করে বুঝেছিলেন কবিরা? কবিদের চিন্তায় ছিল চাপ। সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক চাপ। তার থেকে সঙ্কট, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা টেনশন। এইসব ঘুরপাক খেতে খেতে একসময় বেরিয়ে এল প্রবল উত্তাপ। কে আনতে গেল গৌরীকে? বিলম্ব কেন? যাও যাও গিরি নিয়ে এসো।

সেই সতেরো শতক থেকে লাঞ্ছনা, অবমাননা। ১৭৭০-এর মন্বন্তর। বর্গী, পর্তুগিজ, ঠগ, মগ, জলদস্যু, লুটেরা। ভূমি ব্যবস্থায় মোগলদের স্বেচ্ছাচার, কৃষক উচ্ছেদ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জালজোচ্চুরি, নৈরাশ্য, হতাশা, শ্রেণিভেদ, বর্ণভেদ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তরা দাঁড়াবেন কোথায়? বল মা তারা দাঁড়াই কোথা? সুতরাং দরকার হয়ে পড়ল মা-কে। অভিমান অনুযোগ সব মা-র কাছে। ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পানতি, তাকে তুই জমিদারি দিলি মা? আমাকে বানালি ফকির? মায়ের দিক থেকে কোনও রিস্ক নেই বলাই যায়। শক্তিরূপিণী থেকে কল্যাণী। মা হিসাবে, আবার মেয়ে হিসাবে। ভয়টা কোথায়? কারো পাতে শাকে বালি, ধানে ভরা খই। কারো গায়ে শাল দোশালা কেউ পায় না ছেঁড়া ত্যানা। দিনরাত ভূতের বেগার খাটছি আর আমারই উপর দুখের ডিক্রি জারি? প্যায়দা পাঠাও ! কথ্য বচনের অনর্গল ধারায় চান করছে লিরিক।

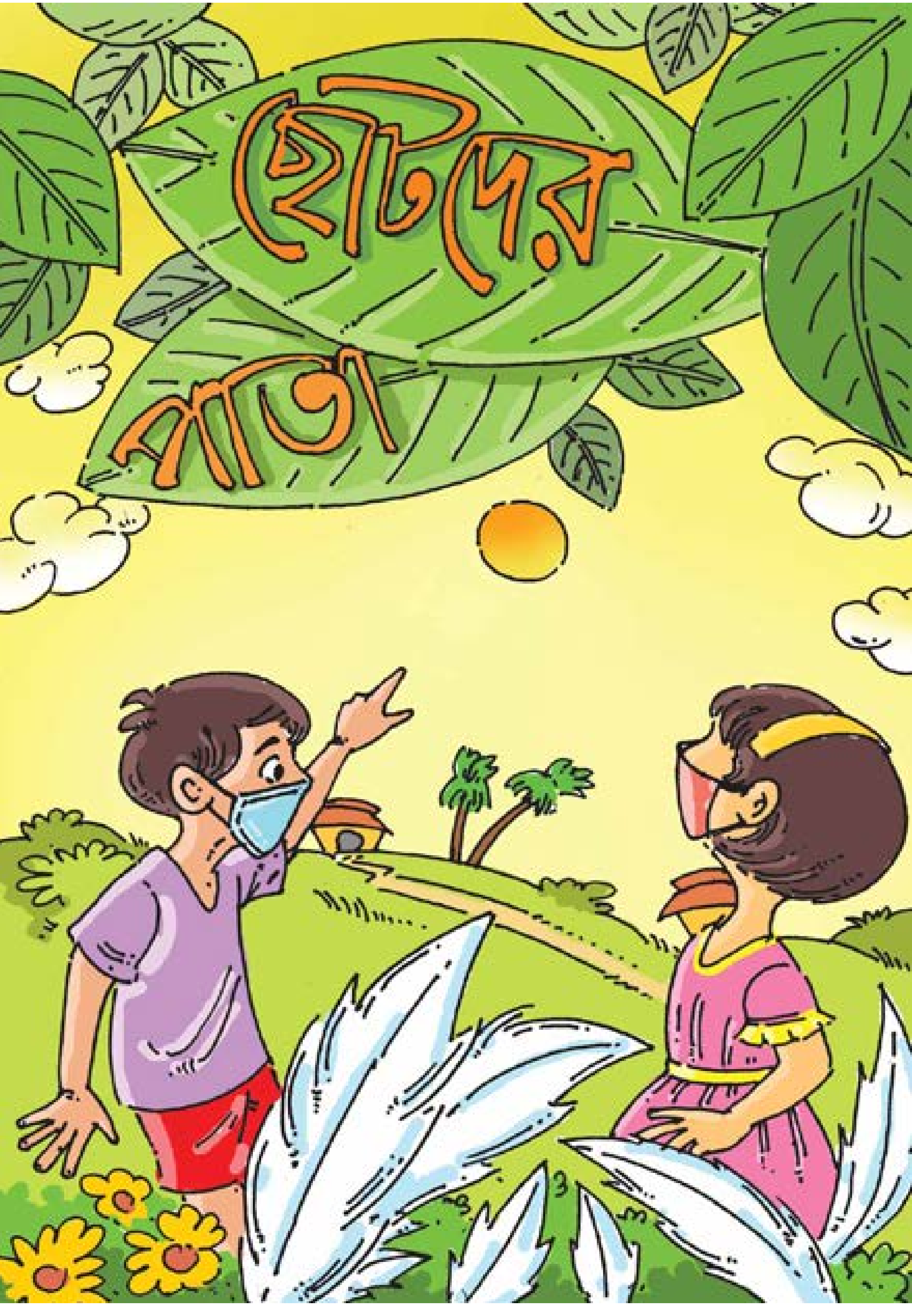
ছোটদের
পাতা

বড় গল্প

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

সেদিন টিচার্স রুমের আবহাওয়াটা বেশ গরম। জোর তর্কাতর্কি চলছে। যে বিষয়ে আলোচনা চলছে তার পক্ষে বিপক্ষে নানারকম মতামত। কেউই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন না। এদিকে পরের ক্লাসে যাওয়ার ঘণ্টা পড়ল বলে। কী হবে শেষ অবধি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে ক্লাস ফেলে তো আর বিতর্ক চালানো সম্ভব নয়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সব দিদিমনিরা বইখাতা জড়ো করে যে যার ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন।

তর্ক যাকে নিয়ে সে হলো স্কুলের সবচেয়ে বিতর্কিত ছাত্রী– ক্লাস এইটের ঊর্মি। ঊর্মি সম্পর্কে এককথায় কিছু বলা খুব মুশকিল। মজা এই যে তাকে সকলেই খুব পছন্দ করেন– এমনকি ভালোওবাসেন। সে কখনও বকুনি খায় না, হোমওয়ার্কে ফাঁকি দেয় না, বছরে একদিনও কামাই করে না, অঙ্কে একশোয় একশো, বুদ্ধি যথেষ্ট, সাধারণ জ্ঞান অসাধারণ, ব্যবহার অত্যন্ত সভ্য, ভদ্র, টিচারদের সঙ্গে সমীহ করে কথা বলে, বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে না– সব মিলিয়ে যাকে বলে একেবারে আদর্শ ছাত্রী। অথচ তাঁকে নিয়ে সমস্যা লেগেই আছে। তার কারণ ঊর্মি একেবারে অন্যরকম, তাকে কোনোরকম চেনা ছাঁচে ফেলা চলে না।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যেমন ইতিহাসের সাপ্তাহিক টেস্টে একটা প্রশ্ন ছিল, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কী? খুবই সাধারণ প্রশ্ন– এর মধ্যে মারপ্যাঁচের কোনও অবকাশই নেই। সেই প্রশ্নের উত্তরে উর্মি যা লিখেছিল তা নিয়েও টিচার্স রুমে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। উর্মি কিছু ভুল লেখেনি ইতিহাস বইয়ে যা যা কারণ দেওয়া থাকে তার কোনোটাই সে বাদ দেয়নি, কিন্তু সব শেষে সে যা যোগ করেছিল তা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। সে লিখেছিল আওরঙ্গজেব সম্রাট না হয়ে যদি দারা শিকো সিংহাসনে বসতেন তাহলে কিন্তু ইতিহাসের গতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারত। নিতে পারত নয় নিশ্চয়ই নিত। প্রথম কথা হলো বড় ছেলে হিসাবে দারা শিকোরই সিংহাসনে বসার কথা। দ্বিতীয় কথা হলো রাজা হয়ে তিনি নিশ্চয়ই অন্য ভাইদের মুণ্ডু কেটে ফেলার নির্দেশ দিতেন না, তাদের জেলখানাতেও পুরতেন না বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ কোথাও না কোথাও তাদের কোনও না কোনও সুবার শাসনভার দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। সবচেয়ে বড় কথা দারা শিকো ছিলেন একজন বিদ্বান এবং ধর্ম সম্পর্কে উদার হৃদয় ব্যক্তি। তিনি প্রথমেই জিজিয়া কর তুলে দিয়ে হিন্দু প্রজাদের খুশি করতেন। তাতে অতি অবশ্যই মোগল সাম্রাজ্যের পতনকাল অনেকটা পিছিয়ে যেত। এছাড়া আরও অনেক কথা জুড়ে দিয়েছিল যা কোনও ইতিহাস বইতে পাওয়া যাবে না– সবই তার নিজস্ব মতামত।

সমস্যা এইখানে। উর্মিকে কোনোমতেই পাঠ্যবইয়ের পাতার মধ্যে আটকে রাখা যায় না। উত্তর লেখার সময় নিজের মতামত যোগ করা যুক্তিসম্মত কিনা সেই নিয়ে টিচারদের মধ্যে মতভেদ। কেউ কেউ বলেন ঠিক উত্তরটা তো ও লিখেইছে। তার সঙ্গে বাড়তি কিছু যোগ করলে বরং ওর বেশি মার্কস পাওয়া উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ দিদিমণিদের মতে এটাতে উৎসাহ দেওয়া ঠিক নয়। যা ঘটে গেছে সেটা হলো ইতিহাস আর কি হলে কি হতে পারত সেটা তো অনুমান। তাহলে তো সেটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে চলে গেল। কল্পনা শক্তি প্রকাশ করার যত বাসনা সব বলে ফেললে কোনও বাধা নেই কিন্তু তার ক্ষেত্র অন্যত্র। ইতিহাস পরীক্ষার উত্তরপত্র অবশ্যই নয়।

আজকের উর্মির যে উত্তরপত্র নিয়ে টিচারদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল সেটার প্রসার আরও একটু বিস্তৃত। প্রশ্নটা ছিল ছোট। শর্ট নোট লিখতে বলা হয়েছিল কয়েকটি বিষয়ে– তার মধ্যে একটা ছিল পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। উর্মি বেশ বড়সড় উত্তর দিয়েছিল। তার বয়ানটা এরকম :

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কার সঙ্গে কার হয়েছিল এখন আমি ঠিক মনে করতে পারছি না তবে এটা ঠিক যে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর নয় কেননা তাঁরা লড়েছিলেন পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে। এটাও ঠিক যে পরের বার অর্থাৎ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল হিমু এবং আকবরের পক্ষ থেকে বৈরাম খাঁয়ের সঙ্গে। প্রথম যুদ্ধে এদেশে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন হলো, দ্বিতীয়টিতে তার ভিত্তি বেশ মজবুত হলো। তৃতীয় যুদ্ধে কারা ছিলেন আমার এখন মনে না পড়লেও নিশ্চয় সেটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ লড়াই ছিল কারণ প্রত্যেকবারই পাণিপথ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। মোগলদের পরে অনেক উত্থান পতনের পর এখানে ঘাঁটি গাড়ল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু তারা এসেছিল জলপথে, জাহাজে করে। তাদের পক্ষে পাণিপথ ছিল অনেক দূরের যুদ্ধক্ষেত্র। তারা তো ঐ পথে এদেশে ঢোকেইনি, মানে ঘোড়ায় চড়ে, খাইবার পাস দিয়ে নয়। সুতরাং পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, হায়দার আলি, টিপু সুলতান এদের যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এই অবধি শোনার পর টিচারদের মধ্যে কারও কারও একটু ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ভূগোলের মিস প্রমীলাদি বললেন, এটা কি ধরনের রসিকতা হচ্ছে?

অঙ্কের মিস রচনাদি– উর্মিকে খুবই স্নেহের চোখে দেখেন। তিনি বললেন, কেন ও তো উলটোপালটা কিছু লেখেনি।

– তা লেখেনি বটে তবে যা জানতে চাওয়া হয়েছিল তাও তো লেখেনি, বললেন প্রমীলাদি।

– সে ব্যাপারে ওর যে কিছু মনে পড়ছে না সেটা তো ও প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছে।

– না মনে পড়াটা কি কোনও একস্‌কিউজ হলো?

– মনে হয়তো পড়তই, হয়তো একটু পরে। সত্যি কথা স্বীকার করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

দেখুন রচনাদি, আপনি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেয়েছেন। ইতিহাস তো অঙ্ক নয়। দরকার মতো মনে না পড়াটা অবশ্যই অপরাধ।

–তবে এটা বলতেই হবে, মেয়েটির লেখার মধ্যে বেশ একটা বাঁধুনি আছে, বললেন অসীমাদি যিনি পড়ান বাংলা।

ইতিহাসের মিস বললেন, সে সব না হয় বুঝলাম। উর্মির অঙ্কের মাথা, কল্পনা শক্তিও দুর্দান্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো ওকে আমি দশের মধ্যে কত দেব– এই উত্তরে?

এঁদের মধ্যে যাঁর চুলে পাক ধরেছে সেই অমিয়াদি বললেন, একটাই সমাধান– গার্জেন কল করো।

সর্বসম্মতিক্রমে সেটাই ঠিক হলো। বাড়িতে খবর পাঠানো হোক। দেখা যাক তাঁদের এ বিষয়ে কি বলার আছে।

টিচারদের জানার কথা নয় যে উর্মির বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে তারই মতো– আর সবার চেয়ে অন্যরকম। তাঁরা কারও স্বাধীন চিন্তায় হস্তক্ষেপ করেন না, ছোটদের বকাঝকা বা মারধর করেন না। উর্মি সর্বদাই উলটোপালটা কথা বলে, সেটা তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। যেমন উর্মি তার মাকে প্রায়ই বলে, মা তোমার যদি লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো চারটে হাত হতো তাহলে কি সুবিধে হতো বলো। শুনে দাদা বলে, কেন বেশি হাতই যদি চাই তাহলে দুর্গা ঠাকুর হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

উর্মির জবাবও প্রস্তুত। সে বলে দরকারের চেয়ে বেশি চাই না। যেমন চারটে হাত হলে এক হাতে ময়দা মাখা, আরেক হাতে লুচি বেলা, আর এক হাতে লুচি ভাজা আর বাকি হাতে পরিবেশন।

দিদি বলে উঠল– হবে না, হবে না। একহাতে লুচি বেলা যায় না।

উর্মি বলল– বা রে ময়দা মাখা হাতটা তো ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে।

এরপরে দিদি একদম চুপ।

একদিন উর্মি ঘোষণা করল তোমরা আমার নাম উর্মি দিলে কেন?

কেন, দিয়ে কি কিছু ক্ষতি হয়েছে? জানতে চাইল দাদা।

তার বদলে কী নাম পছন্দ তোর? জানতে চাইল দিদি। আমরা না হয় বদলে দেব। এরকম তো কত লোক করে। খবরের কাগজে দেখিস না– আমি শ্রী রাধানাথ মণ্ডল আজ হইতে শ্রী রাধানাথ সমাদ্দার

হইলাম। তোরও নামটা না হয় সেরকম বদলে হিড়িম্বা কিংবা শূর্পণখা করে দেওয়া যেত। আজকাল তো বড় বড় আর শক্ত শক্ত নামের খুব ফ্যাশন চলছে।

না, ওসব নাম নয়। আমার নাম যদি হতো লক্ষ্মীবাঈ তাহলে কি দারুণ হতো ভাবো একবার। বলল উর্মি।

আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। বলল দিদি।

না, মানে নামটার মধ্যে কিরকম একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভাব আছে না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– এক হাতে খোলা তরোয়াল, অন্য হাতে লাগাম, মাঠের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছি আর মুখে বলছি মেরী ঝাঁসি দুঙ্গি নঁহী। উহু কি দারুণ ব্যাপার। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

খুব লড়ী মর্দানি থী, উয়ো তো ঝাঁসিবালি রানী থী। যোগ করল দিদি।

বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন দিদির দিকে।

সুভদ্রাকুমারী চৌহান, বলল দিদি।

বাবা আবার কাগজে চোখ ফেরালেন।

লম্বা কবিতা– দিদি ব্যাখ্যা করল। আমার শুধু দুটো লাইনই মনে আছে।

উর্মির মাথায় সব সময়েই সম্ভব অসম্ভব নানারকম সব চিন্তার আনাগোনা। তা নিয়ে বাড়ির লোকেদের কোনও মাথাব্যথা নেই, শুধু মুশকিল হয় স্কুলের টিচারদের, তাঁদের কারবার শুধু পড়ার বইয়ের সঙ্গে। তার বাইরে গেলেই তাঁরা কী করে নম্বর দেবেন ভেবে হিমশিম খান। অগত্যা ডেকে পাঠাতে হয় বাড়ির লোকদের। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্নটার ব্যাপারে উর্মির মাকে তলব করা হয়। তিনি সব শুনে বেশ খুশিই হলেন বলে মনে হলো।

ইতিহাস মিস অবাক হয়ে বললেন, এ কি, আপনি হাসছেন?

উর্মির মা বললেন, গল্পটা বানিয়েছে ভালো, যদিও গল্প না বলে একে সত্যি ঘটনা বলাই সঙ্গত।

আপনি এই কথা বলছেন? ইতিহাস মিস তো থ।

কেন, এর মধ্যে আমি তো কোনও ভুল দেখতে পাচ্ছি না। বোঝাই যাচ্ছে ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে ওর মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কোথায় তার জন্য আপনারা ওকে বাহবা দেবেন, তা না আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

– আপনি যদি এই কথা বলেন তাহলে তো আমাদের আর কিছু করার নেই।

– আপনি আমাকে কি করতে বলেন? সত্যি বলতে কি আমাকে এতটা সময় নষ্ট করে এখানে কেন আসতে বাধ্য করা হলো সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না।

– বুঝতে পারছেন না? দাঁড়ান তাহলে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে ওদের পাঠ্য বইয়ে একটা প্যারাগ্রাফ আছে। উত্তরে কেবল সেইটুকু লিখলেই ফুল মার্কস– তার বেশিও না, কমও না।

– তার মানে আপনি বলছেন ওটা মুখস্থ করে ঠিকঠাক লেখা উচিত ছিল ওর।

– ঠিক তাই। সবাই তো তাই করে।

– তার মানে তারা সবাই মুখস্থ করে?

– নিশ্চয় করে।

– দেখুন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। আমি মনে করি মুখস্থ করা একদম উচিত না। এতে ওদের চিন্তা করার ক্ষমতাকে ছেঁটে ফেলা হয়।

এই আলোচনা অনেকক্ষণ চলেছিল কারণ দু'জনেই যে যার সিদ্ধান্তে অনড়। একজন মনে করেন বই মুখস্থ করা উচিত, অন্যজন মনে করেন তাতে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব চিন্তা করার শক্তি নষ্ট হয়। মিটিং শেষে যখন একজন বাড়ি ফিরলেন, অন্যজন স্টাফ রুমে তখন দু'জনেরই মুখ থমথমে। এরপরে ঘটনার গতি কোন দিকে মোড় নিত বলা যায় না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইতিহাসের মিস অন্য স্কুলে বদলি হয়ে গেলেন।

তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি সম্পূর্ণরূপে উর্মির মায়ের দলের লোক। প্রথমেই সেটা বোঝা না গেলেও আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে লাগল এবং বলাইবাহুল্য এতে ক্লাসের আবহাওয়াটা অনেক বদলে গেল। নতুন মিসের নাম চিত্রা মুখার্জি, দেখতে ভারী হাসিখুশি। এক একজনকে যেমন দেখলেই মনে হয় ইনি অত্যন্ত খিটখিটে স্বভাবের, বকতে পেলে আর কিছু চান না– চিত্রা মিস একদম তার উলটো। হয়ত একা একাই বারান্দা দিয়ে হাঁটছেন, ওদিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসছে কোনও ছাত্রী– চিত্রা মিস হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলবেন, করছ কি, ট্রেন ফেল হয়ে যাচ্ছে নাকি? দ্যাখো তো, এর মধ্যেই জুতোর স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে।

এরকম একজন মিসকে পেয়ে শুধু ক্লাস এইটের কেন, পুরো স্কুলের মেয়েরাই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল পড়ানোর ব্যাপারেও এঁর পদ্ধতি কিছু আলাদা। অন্য মিসরা ক্লাসে ঢুকেই ঘোষণা করেন– মেয়েরা কথা বন্ধ করে তৃতীয় অধ্যায়ে ঊনতিরিশের পাতা খোলো। চিত্রা মিস ক্লাস এইটে ঢুকেই এমনভাবে সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন যেন এবারে একটা মজার কিছু হতে চলেছে। বই খুলতে বললেন না তাতেই মেয়েরা মহাখুশি। তারা নড়ে চড়ে বসল। দেখা যাক এবারে উনি কি করতে বলেন।

মিস বললেন, আজ তোমাদের কিসের যেন ক্লাস?

পুরো ক্লাস সমস্বরে বলে উঠল– ইতিহাস।

মিস বললেন, তাই তো। একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি। ভাগ্যিস ইতিহাস, তা না হয়ে ভূগোল হলেই হয়েছিল আর কি। আমি তো আবার ভূগোলে বড্ড বেশি কাঁচা।

শুনে মেয়েরা সবাই এ ওর দিকে তাকালো।

মিস বললেন, খুব ভালো। ইতিহাস আমার খুব পছন্দের বিষয়। কেননা যেদিকে তাকাবে সব জায়গায় ইতিহাস ছড়ানো আছে।

মেয়েরা কেউই এই কথাটার মানে বুঝতে পারল না।

তাদের মুখ দেখে সেকথা সম্ভবত অনুমান করলেন চিত্রা মিস। উনি বললেন,

– তোমাদের সবার ডেস্কে একটা বই আছে দেখছি। নিশ্চয়ই ইতিহাস বই?

হ্যাঁ মিস, সমস্বরে জবাব হলো। আগের মিস যা কড়া ছিলেন, বই না আনলে কোণে গিয়ে দাঁড়াতে হতো। তাই ইতিহাস বই আনতে পারতপক্ষে কারও ভুল হয় না।

তোমাদের ধারণা ঐ বইয়ের মধ্যে যা আছে– শুধু সেটাই ইতিহাস, তার বাইরে কিছু নেই?

উর্মি সাহসী মেয়ে। সে উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ মিস আছে। অনেক গল্পের বইতেও ইতিহাসের কথা থাকে। ইতিহাসের ঘটনা নিয়েও তো কত গল্প উপন্যাস লেখা হয়।

– যেমন?

– কেন আনন্দমঠ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে লেখা, উর্মির জবাব তৈরিই ছিল।

মিস একটু অবাক হলেন।

– একদম ঠিক। তবে শুধু গল্প-উপন্যাস কেন আরও কত জায়গায় ইতিহাসের টুকরো টাকরা ছড়ানো। ছেলে ভুলোনো ছড়াই ধর। একটা তো খুবই চেনা, তোমরা সবাই জানো। ঘুম-পাড়ানী ছড়া। কেউ বলতে পারবে?

একসঙ্গে অনেকগুলো হাত উঠল।

এক এক করে জিজ্ঞেস না করে মিস বললেন, আমি জানি তোমরা কোনটা বলবে। বেশ তো সবাই একসঙ্গেই বলো।

– খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে, উত্তর হলো সমস্বরে।

– তারপর?

– বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

ভেরি গুড, এরপরে কিন্তু আরও আছে।

এবারে শুধু একটি মেয়ে দাঁড়ালো।

– ধান ফুরোলো গান ফুরোলো খাজনার উপায় কি। আর কটা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।

চমৎকার। এবারে বলো দেখি এর মধ্যে ইতিহাসটা কোনখানে আসছে?

আর একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল।

– তখন বর্গীদের আক্রমণ হতো। তারা সব ফসল লুটপাট করে নিয়ে যেত।

– তাহলেই দেখছ। বললেন মিস। এর জন্য কি আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের ইতিহাস বই পড়তে হয়েছে? এটা তো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

আমি আর একটা জানি। লাস্ট বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল একটি মেয়ে যে পড়াশোনায় তেমন ভালো নয় বলে একেবারে পিছনে বসে। কিন্তু আজ চিত্রা মিস ওর ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছেন তা না হলে সে নিজে থেকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পায় না।

– বেশ তো, কি জানো শোনাও আমাদের, বললেন মিস।

– হাথি পর হাওদা, ঘোড়ে পর জিন জলদি যাও, জলদি যাও ওয়ারেন হেস্টিং– বলেই মেয়েটি মুখ লাল করে বসে পড়ল। বাকি ক্লাসশুদ্ধ মেয়ে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে।

খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে ফেললেন চিত্রা মিস।

– বাঃ চমৎকার বলেছ, তুমি যার নাম করলে সে কে জানো তো?

– ওয়ারেন হেস্টিংস?

– হ্যাঁ, কে ছিলেন তিনি?

– একজন সাহেব।

– আরে, সাহেব তো বটেই, তা নইলে ওরকম নাম হয়? এমনকি বিখ্যাত লোক ছিলেন তিনি যে তাঁর নাম ছড়ার মধ্যে ঢুকে গেল?

মেয়েরা সবাই এবারে উর্মির দিকে তাকালো এই আশায় যে উর্মি

যদি এ ব্যাপারে কিছু বলে তাহলে সকলের মান রক্ষা হয়। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে চিত্রা মিসও ওর দিকে তাকালেন।

– মনে হচ্ছে এ বিষয়ে উর্মি কিছু আলোকপাত করতে পারে।

উর্মি উঠে দাঁড়ালো।

ওয়ারেন হেস্টিং ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন বড় অফিসার, খুব সম্ভবত গর্ভনর জেনারেল অব ইন্ডিয়া।

– একদম ঠিক, বললেন মিস তুমি কি হেস্টিংস সম্বন্ধে আর কিছু জানো?

– বেশি কিছু জানি না, তবে দেশে ফেরার পর ওঁর বিচার হয়েছিল এদেশে থাকার সময় অনেক অন্যায় অত্যাচার করার জন্য। উনিই তো একটা শিল্প নির্ভর দেশকে কৃষি নির্ভর করে ছেড়েছিলেন। একটা আস্ত কমলালেবুকে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়েছিলেন।

মিস কিছু একটা লিখবেন বলে বোর্ডের দিকে যাচ্ছিলেন, উর্মির কথায় উনি এত অবাক হলেন যে ওঁর হাত থেকে চক মাটিতে পড়ে দু'টুকরো হয়ে গেল।

– একটা শিল্পনির্ভর দেশকে কৃষিনির্ভর? একটা কমলালেবুকে ছিবড়ে? এসব তোমার কথা উর্মি?

– না মিস, আমার নয়। এগুলো বলেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

– তোমার জেনারেল নলেজের কথা আমি টিচারদের কাছে শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া পড়েছ বলতে চাও?

– না, মিস, আমি পড়িনি। দাদা পড়েছে। ওদের পড়তে হয়।

– কোন ক্লাস তোমার দাদার?

– দাদা কলেজে পড়ে। ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে।

– ও তাই বলো। এতক্ষণে চিত্রা মিস ধাতস্থ হলেন। মাটি থেকে চকের টুকরো দুটো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন,

– ভালোই হলো। তুমি দাদাকে জিজ্ঞেস করো তো ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলের দুর্ভিক্ষ আর মহামারী নিয়ে কি লিখেছেন আরসি দত্ত। না, না, দাঁড়াও, তুমি একা কেন? ক্লাসের তো অনেকেরই দাদা, দিদি আছে, আছে না?

অনেকেই উত্তরে বলল, হ্যাঁ।

– বেশ তো তোমাদের সকলকে তাহলে আমি এই হোমওয়ার্কটা দিলাম। জিজ্ঞেস করবে। অন্য বড়দেরও জিজ্ঞেস করতে পারো। কিংবা রেফারেন্স বই, কি অভিধান, কি ভারতকোষ যেখান থেকে হয় নিজেরাও খুঁজে বার করতে পারো।

(মনে রাখতে হবে এই গল্পে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন গুগ্‌ল বা ইন্টারনেট চালু হয়নি।)

আমি বোর্ডে কতকগুলো সাল লিখে দিচ্ছি। এগুলো টুকে নাও। ধরে নাও এটাও হোম ওয়ার্কের অংশ। সালগুলোর গুরুত্ব কিসের জন্য– যে কটা পারো জেনে আসবে।

এই বলে মিস বোর্ডে লিখলেন :

১১৭৬ (১৭৬৯), ১৩৫০ (১৯৪৩), ১৩৪৬ (১৯১৮-২০) বললেন, প্রথম দুটো বাংলা সাল, পাশে ইংরেজি।

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল,

– উত্তরগুলো কি লিখে আনতে হবে না শুধু জেনে এলেই হবে?

শুনে মিস একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন– ভালো জিজ্ঞেস করেছ। আমি বলি কি প্রথমে জেনে নাও তারপর লিখবে কি না লিখবে সেটা তোমাদের ইচ্ছে। লেখার সুবিধে এই যে তাহলে অনেকদিন মনে থাকে। লিখে না রাখলে ভুলে যেতে কতক্ষণ?

ক্লাস এইটের মেয়েদের কাছে এরকম স্বাধীনতা অকল্পনীয়। লিখবে কি লিখবে না সেটা তোমাদের ইচ্ছে! এমন কথা আজ অবধি কোনও মিস তাদের বলেননি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় পরের ইতিহাস ক্লাসে দেখা গেল রমেশচন্দ্র দত্ত এদের কারোই কোনও কাজে আসেননি, মেয়েদের মধ্যে যাদের দাদা দিদি আছে তাদের অনেকেই এখনও কলেজ অবধি পৌঁছায়নি, আর যারাও পৌঁছেছে তাদের কেউই ইকনমিক্স পড়ে না। পাঠ্য না থাকলে শখ করে কেউ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া পড়বে এটা আশা করাও ভুল। আর সবচেয়ে বড় লোকসান উর্মির দাদা এখন এখানে নেই। সে কলেজ টিমের সঙ্গে কোথায় যেন ক্রিকেট খেলতে গেছে। উর্মির মা অবশ্য একটা তথ্য দিয়েছেন কিন্তু তার সঙ্গে ওদের হোমটাস্কের খুব একটা সম্পর্ক নেই। উর্মি বলল,

– মা বলেছেন উনি একটা বই পড়েছেন তার নাম মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত। মা জানতে চেয়েছেন ইনি কি সেই রমেশচন্দ্র দত্ত না অন্য কেউ?

মিস বললেন,

– তুমি শুনলে অবাক হবে এই দু'জন একই লোক। তুমি মাকে বোলো উনি আরও কয়েকটা উপন্যাস লিখেছেন– তার মধ্যে একটার নাম রাজপুত্র জীবনসন্ধ্যা।

– সবই ঐতিহাসিক উপন্যাস?

– ঠিক তাই।

– তার মানে উনি উপন্যাস লিখতে হলে লিখতেন বাংলায় আর ইতিহাস লিখতে হলে ইংরেজিতে।

– তোমার আন্দাজ একদম ঠিক। কিন্তু দাঁড়াও – ঐ যে থার্ড বেঞ্চ, তুমি কি কিছু বলতে চাও?

সেই মেয়েটির দিদি তাকে একটা তথ্য দিয়েছে যার সঙ্গে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর সম্পর্ক আছে। একটা কবিতার লাইন: মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি। লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মিস বললেন পুরো কবিতাটা যদি না জানা থাকে, নিশ্চয় পড়বে। কবিতাটার নাম আমরা। প্রথম দুটো লাইন

মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।

তোমার দিদি যে কোটেশন দিয়েছে তার মধ্যে দিয়েই অনেক, কিছু বলা হয়ে গেল। মন্বন্তর মানে দুর্ভিক্ষ আর মারি মানে মহামারী অর্থাৎ মড়ক, এপিডেমিক। ইংরেজ আমলে এ দুটো লেগেই থাকত। কেন লেগে থাকত বোঝাতে গেলে এখন অনেক কথা বলতে হয়। এখন থাক। এবারে এসো দেখি আমার অন্য টাস্কটা ক'জন জেনে এসেছ। সবগুলো যারা পেরেছ তারা হাত তোলো।

একটা হাতও উঠল না।

– আচ্ছা তাহলে যারা তিনটে পেরেছ। এবারে উঠল একটা হাত।

– বেশ বলে যাও তুমি।

– এগারোশো ছিয়াত্তরে হয়েছিল যার নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তেরোশো পঞ্চাশে পঞ্চাশের মন্বন্তর। আর উনিশশো আঠারো থেকে

কুড়ি হয়েছিল স্প্যানিশ ফ্লু।

বাঃ ভেরি গুড। তুমি এবারে বোসো আমি বাকিটা বলি। ইংরেজ আমলে দুর্ভিক্ষ আর মড়ক লেগেই থাকত তবে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে এই দুটো সালের নাম লোকে মনে রেখেছে– ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আর পঞ্চাশের মন্বন্তর। কিন্তু আমরা যদি বাকি পৃথিবীর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে ইতিহাসের আদিকাল থেকে সেখানেও মড়ক কম হয়নি। সবগুলো লিখতে গেলে বোর্ড ভরে যাবে তাই শুধু দুটো লিখলাম। যেটা কেউই পারোনি সেটা হলো ইংরেজি সাল তেরোশো ছেচল্লিশের ব্ল্যাক ডেথ। ইউরোপের লোকসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের সবচেয়ে কাছের সময়ে হয়েছে স্প্যানিশ ফ্লু, যার জের ভারতেও এসে পৌঁছেছিল। ভালো করে নজর করলে দেখা যাবে প্রতি শতাব্দীতেই একটা করে ভয়ঙ্কর এপিডেমিক হচ্ছে।

এই পর্যন্ত বলে মিস ঝোলা থেকে একটা মুখোশ বার করলেন, যেটা দেখতে অনেকটা ডাক্তারদের মাস্কের মতো।

– এটা কি দেখতে পাচ্ছ? স্প্যানিশ ফ্লুয়ের সময়ে এটার চলন শুরু হয়। দেখে নাও জিনিসটা কি। আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে এরকম একটা বানিয়ে আনো। কাগজের হতে পারে, তবে কাপড়ের হলেই ভালো।

একটা কথা অনেকক্ষণ থেকেই উর্মির মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কথাটা এতই জরুরি যে এখনই সকলকে জানিয়ে না দিলেই নয়। যা ভাবা সেই কাজ। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো সে।

– উর্মি তুমি কি কিছু বলবে? জিজ্ঞেস করলেন মিস।

– এটা ভয়ঙ্কর জরুরি কথা মিস, আমি না বলে পারছি না– সকলের এটা জানা খুব দরকার।

– তুমি এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? যা বলতে চাও বলে ফেল। নির্ভয়ে।

– আপনি বললেন প্রত্যেক একশো বছর অন্তর একটা বড় মহামারী হচ্ছে। তা হলে স্প্যানিশ ফ্লু হওয়ার একশো বছর বাদে আর একটা এপিডেমিক হবার সম্ভাবনা আছে, আছে কি?

– হ্যাঁ, হতেই পারে। তবে তার মানে ২০২০। এখনো একটু দেরি আছে, যদিও খুব বেশি দেরি বলা যাবে না।

– কিন্তু মিস, তার জন্যে আমাদের তো এখন থেকে তৈরি থাকতে হবে– তাই না?

– তৈরি তো থাকাই উচিত।

– এ বিষয়ে কেউ তেমন কিছু ভাবছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

– বেশ তো। এসো আমরা এখন থেকেই একটা পরিকল্পনা করতে শুরু করি। তোমরা কি বলো?

বাকি ক্লাস সমস্বরে বলল, হ্যাঁ মিস। এই ব্যাপারে সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা গেল। সকলেরই কিছু কিছু বলার আছে। তাতে বেশ একটা গোলমালের সৃষ্টি হতেই মিস হাত তুলে বাধা দিলেন।

– এরকম করে হবে না। তোমরা এক এক করে বলবে। তার আগে আমি বরং মোটামুটি প্ল্যানটা বলে দিই।

– হ্যাঁ, মিস, পুরো ক্লাস বলে উঠল।

– বেশ। তাহলে প্রথমে দেখতে হবে আমাদের প্ল্যানটা কিংবা প্ল্যানগুলো কি নিয়ে। ব্যাপারটা যখন মহামারী বা এপিডেমিক তাহলে দেখতে হবে অসুখটা ছড়াচ্ছে কি উপায়ে। মোটামুটি দু'রকমভাবে। এক ছোঁয়া লেগে আর দুই হাওয়ায় ভেসে থাকা জীবাণু কিংবা ভাইরাস থেকে। এই দু'টোকে আটকাতে পারলেই আমরা মোটামুটিভাবে সফল। কথায় আছে না– ইচ্ছায় না হয় কর্ম উদ্যম বিহনে। তাহলে চেষ্টা করা দরকার। চেষ্টা করলে যত শক্ত ভাইরাসই হোক তাকে খতম করা কোনও ব্যাপারই নয়।

এই সময় একজন মেয়ে হাত তুলল।

– মিস এই ব্যাপারে আমি কি কিছু বলতে পারি?

– হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কোন ব্যাপারে?

– ঐ ছোঁয়াচ বাঁচানোর ব্যাপারে।

– বেশ তো শুনি কি তোমার প্রস্তাব।

– দেখুন মিস, সবচেয়ে বেশি ছোঁয়া লাগে ভিড়ের বাসে। ভিড় কমানোর সহজ উপায় হলো যদি বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

– বেশ, এটা হলো এক নম্বর প্রস্তাব আর কোনও উপায় আছে বলে মনে হয় কি?

– হ্যাঁ মিস। আর একজন উঠে দাঁড়াল, লোকে যদি বাসে ওঠা ছেড়ে দিয়ে সাইকেল ব্যবহার করে। সাইকেল চালানো স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো আর এতে কোনও পেট্রোল খরচ নেই। পরিবেশ দূষণও কম হবে।

– কম বলছ কেন? সবাই যদি সাইকেল ব্যবহার করে তাহলে তো পরিবেশ দূষণ হবেই না। বিদেশে অনেক জায়গায় শুনেছি সাইকেলের ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। এমন কি বার্লিন বা সানফ্রানসিস্কোর মতো শহরে সাইকেল রিকশাও চালু আছে।

– কিন্তু মিস, আর একজন আপত্তি জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালো। যদি অনেক দূরের রাস্তা যেতে হয় তাহলে সাইকেল দিয়ে কি করে হবে?

– কেন হবে না? বললেন মিস। সাইকেলে চড়ে লোকে বিশ্ব পর্যটনও করে। ইচ্ছে থাকলে সবই সম্ভব। বর্গীরা কি করে মহারাষ্ট্র থেকে এতদূর আসত? তাদের অবশ্য সাইকেল ছিল না কিন্তু ঘোড়া ছিল।

– ঘোড়া! সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

– যখন মোটরগাড়ি আবিষ্কার হয়নি তখন লোকে এদেশ থেকে ওদেশে যাতায়াত করত কি করে? আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন কি ভাবে? ঘোড়াগাড়ি, তখন ঘোড়াই ছিল যানবাহনের একমাত্র উপায়।

– তাহলে মিস, একজন মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমরা ঘোড়ার কথাটা ভুলে যাচ্ছি কেন? ঘোড়সওয়ারদের ছোঁয়াচের ভয় নেই, এমন কি ঘোড়ায় টানা গাড়িতেও গাদাগাদি হওয়ার কোনও চান্স নেই।

– ঠিক কথা। বলে উঠল আর একটি মেয়ে। যেসব বয়স্ক লোকেরা সাইকেল চালাতে পারবেন না তাঁদের জন্যে ঘোড়ার গাড়ি। আগে যেমন থাকত।

ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দেখা গেল সকলে এক মত হচ্ছে না। একটা প্রধান অসুবিধে হলো একই রাস্তা দিয়ে যদি বাস, মোটরগাড়ি এবং ঘোড়ার গাড়ি চলে তাহলে ঘোড়ারা ভয় পেতে পারে। অ্যাকসিডেন্টের ভয়ও থাকছে। কয়েকজনের মত এ জন্যে আলাদা আলাদা রাস্তা কিংবা ট্র্যাক থাকা দরকার তাহলে কোনোও অসুবিধে হবে না। যে যার মতো স্পিডে চলতে পারবে। আলাদা ট্র্যাক হলে সাইকেলের জন্যেও আলাদা ট্র্যাক হোক এখনই অনেক শহরে যেরকম আছে। এই সব আলোচনার মধ্যে একজন মেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তুলল। সেটা হলো হাঁটা। গ্রামের লোকেরা তো হেঁটেই এখান থেকে ওখানে যায়। এখন অবশ্য সাইকেল হয়েছে। কিন্তু তাহলেও মাইলের পর মাইল লোকে অনায়াসে হেঁটে পার করে শহরের লোকেরাই শুধু এক-দু'কিলোমিটার যেতে হলেও বাসে চড়ে।

যানবাহন নিয়ে মোটামুটি কয়েকরকম প্রস্তাব আসার পর প্রশ্ন উঠল যে সব জায়গায় ভিড় জমে সেসব নিয়ে কি করা হবে। প্রথমেই মেয়েদের মনে এল স্কুলের কথা।

– প্রত্যেকটা ক্লাসকে দু'টো সেকশনে ভাগ করে দিলেই তো ঘরগুলো অনেক ফাঁকা হয়ে যাবে– বলল একজন।

– আরও ভাল হয় আমরা যদি শান্তিনিকেতনের মতো মাঠে গাছতলায় বসে ক্লাস করি। বলল আর একজন।

এই প্রস্তাবটা অনেকেরই পছন্দ হলো। একজন বলল শান্তিনিকেতনে শুনেছি সবাই যে যার আসন সঙ্গে নিয়ে যায়। আমরাও তাই করব। একজন বলল শুধু মিসদের জন্য একটা চেয়ার রাখা হোক। কিন্তু তাতেও সমস্যা দেখা দিল। সব স্কুলের তো মাঠ নেই– অনেক স্কুল আছে যাদের বড় ছোট কোনোরকম মাঠই নেই। তাহলে তারা কি করবে?

উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যে ঘণ্টা বেজে গেল। ঠিক হলো পরের ক্লাসে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলবে। এত জরুরি বিষয় তো ফেলে রাখা যায় না। যাওয়ার আগে চিত্রা মিস বলে গেলেন পরের ক্লাসে সকলে যেন মনে করে মুখোশগুলো নিয়ে আসে। একটা দারুণ মজা হবে।

* **

মিস যখন বলেছেন তখন কিছু না কিছু একটা অবশ্যই হবে। পরের ক্লাসে সকলেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। মিস আসতেই সমস্বরে ঘোষণা হলো, মুখোশ এনেছি মিস।

আস্তে, আস্তে বললেন মিস। এত চেঁচামেচি করলে তো মজা মাটি। সারপ্রাইজ দিতে গেলে হঠাৎ দিতে হয়। যখন সময় হবে আমি তোমাদের একটা ইশারা করব। না, দাঁড়াও, তার চেয়ে বরং ভালো হবে সঙ্কেত বাক্য। আমার সঙ্কেত বাক্য হবে– এক, দুই, তিন। বলার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা চট করে ব্যাগ থেকে বার করে মুখোশটা মুখে এঁটে নেবে। দেরি করা চলবে না একদম, বুঝতে পেরেছ তো?

– হ্যাঁ মিস, সমস্বরে জবাব হলো।

– বেশ এবারে তাহলে এসো আমরা আগের টপিকে ফিরে যাই। কি নিয়ে যেন কথা হচ্ছিল গতবার? এক সঙ্গে অনেকগুলো উত্তর এল।

– গাছের তলায় ক্লাস

– সাইকেল চালানো

– ঘোড়ার গাড়ি

– ভিড়ের বাসে না ওঠা

মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। হাত তুলে সকলকে থামালেন মিস। কথাটা ছিল ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি না করে ছোঁয়াচ বাঁচানো।

– আমরা তো কেবল স্কুলের কথা বলছিলাম, বলল একজন। কিন্তু মিস ভিড় তো আরও অনেক জায়গায় হয়। যেমন নেমন্তন্ন বাড়ি, যেমন সিনেমা হল– তাকে থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর একটি মেয়ে।

– দেখুন মিস, বন্ধ ঘরের মধ্যে ছোঁয়াচ অনেক বেশি ছড়ায়। সে জন্যে আমার মনে হয় সিনেমা হলগুলো বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক হবে।

– না, না, তাহলে কি করে হবে? সিনেমা কি তাহলে উঠে যাবে?

যে মেয়েটি সিনেমা হল বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল তার কাছে এর সমাধানও তৈরি ছিল।

– কেন, মাঠের মধ্যে পর্দা খাটিয়ে। যেরকম করে যাত্রা হয়।

– তাহলে বৃষ্টি হলে কি হবে?

– ততক্ষণ সিনেমা বন্ধ থাকবে।

– আর বর্ষাকালে?

– তার জন্যে ত্রিপল খাটানো হবে।

– পাশ থেকে জলের ছাট আসবে।

– লোকে রেনকোট পরে আসবে।

– অত কষ্ট করার দরকার কি?

বললেন মিস। তার চেয়ে বাড়িতে বসে টিভিতেও তো সিনেমা দেখা যায়। স্ক্রিনটা অবশ্য একটু– বলতে বলতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন মিস।

– একি করছেন, একি করছেন অমিয়াদি বলতে বলতে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন মিস।

– এতো হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছেন? পড়ে যাবেন যে?

দরজার বাইরে কাঁচাপাকা চুল অমিয়াদি সত্যিই দৌড়তে দৌড়তে যাচ্ছিলেন। চিত্রা মিসের কথায় থমকে গেলেন।

– আর বলো কেন। বাস মিস করে এমনিতেই দেরি করে ফেলেছি। তারপরে আবার হেড মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে কিছু কথা ছিল। এখন আবার দেখছি চশমাটা স্টাফ রুমে ফেলে এসেছি।

– এই কথা! একজন মেয়েকে পাঠালেই তো হয়, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? এই বলে চিত্রা মিস দরজার সবচেয়ে কাছে যে বসে সেই মেয়েটিকে বললেন, যাও তো সুজাতা, স্টাফ রুম থেকে ওঁর চশমাটা নিয়ে এসো। অমিয়াদি ওকে একটু বলে দিন ওটা কোথায় পাওয়া যাবে।

এক মিনিটের মধ্যেই চশমা নিয়ে ফেরত এল সুজাতা। সেটা ব্যাগের মধ্যে পুরবেন বলে ব্যাগ খুলেছেন অমিয়াদি এমন সময় চিত্রা মিস ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েরা এক দুই তিন।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো বদলে গেল ক্লাসের চেহারা। প্রত্যেকের মুখে মুখোশ– তাও আবার কত রঙ-বেরঙের, কত চিত্র-বিচিত্র করা। কেউ কেউ গোঁফ দাড়িও এঁকে দিয়েছে।

অমিয়াদি তো হতভম্ব।

– এ কি চিত্রা, এই একঘর ডাকাত নিয়ে তুমি কি করছ?

– ডাকাত কোথায় অমিয়াদি, এরা তো মুখোশ পরেছে, যাকে বলে মাস্ক।

– কিন্তু কেন?

– আমরা তো রিহার্সাল দিচ্ছি।

– কিসের রিহার্সাল?

– এপিডেমিকের, যদি ভাইরাস এসে অ্যাটাক করে তাহলে লড়াই করতে হবে না?

– ভাইরাস? হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ভাইরাস আসছে কোথা থেকে?

– এখনো পর্যন্ত আসেনি; কিন্তু আসতে কতক্ষণ? ইতিহাসে দেখা গেছে মাঝে মাঝেই, মানে প্রত্যেক শতাব্দীতেই মারাত্মক এপিডেমিক দেখা দেয়। সময় থাকতে তৈরি থাকাই তো বুদ্ধির কাজ, তাই না?

অমিয়াদি খানিক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, বিংশ শতাব্দী তো শেষ হতে চলল। কোথায় এপিডেমিক, কোথায় কি? তোমরা খামোখা মাথা গরম করছ কেন?

– সে কি অমিয়াদি, আমাদের কোটা তো শেষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল না?

– তাহলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা।

– একদম না, একবিংশ শতাব্দী তো এল বলে। প্রস্তুতি তো তারই জন্যে।

অমিয়াদি ভাবলেন এই বুদ্ধি নিশ্চয় উর্মির মাথা থেকে বেরিয়েছে। কোথায় সে? উর্মিদিকে তাকাতে গিয়ে আর একটা ধাক্কা খেলেন। কোথায় উর্মি, এতো হরেক রকম নকশা করা মুখোশ। কাউকে চেনার উপায় নেই।

আর কিছু বলার খুঁজে পেলেন না অমিয়াদি। চশমাটা ব্যাগে ঢোকাতে গিয়ে ভুল করে নাকে এঁটে ফেললেন। তারপর মিসের দিকে তাকিয়ে তুমি, পারোও বটে চিত্রা। বলে অ্যাবাউট টার্ন করে নিজের ক্লাসের দিকে হাঁটা দিলেন।

দুষ্টুমি

গৌতম হাজরা

বলতে পারো, তোমরা আমার সঠিক পরিচয়?
দেখছ যারা এই আমাকে সেটা আসল নয়।
আসল তবে বলছি শোনো, যেটাই সঠিক
আমি হলাম গল্পে লেখা রবীন্দ্রের ফটিক।
যে ওড়াত মস্ত ঘুড়ি, হাওয়ায় অবহেলে
ডানপিটেদের মধ্যমণি, আমিই সেই ছেলে।
ফটিক হয়ে নদীর জলে আমি দিতাম ঝাঁপ
তুমি বলতে, ওরে দস্যি, থামতো দিকি বাপ।
তোমার কথায় শান্ত হয়ে হৈ-হুল্লোড় ছেড়ে
এক পায়ে দাঁড়িয়ে যেতাম ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে।
অমনি তুমি চোখ পাকিয়ে রাগের ভঙ্গি করে
দস্যি বলে চুলটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে জোরে।
দস্যি বলো, দামাল বলো, যাই বলো না তুমি
মাগো, তুমি ঠিকই জানো, এসবই দুষ্টুমি।

সে এক মজার দিন

স্বপ্না রায়

কয়েকটা দিন ঘরেই বদ্ধ আছি
কয়েকটা দিন আকাশ মেঘে ঢাকা
কয়েকটা দিন সন্তর্পণে শুধু
বন্ধু স্বজন সবই দূরে রাখা...

কয়েকটা দিন ঝড় বৃষ্টি বাদল
কয়েকটা দিন কষ্টেতে কালযাপন
কয়েকটা দিন ভাবনা এলোমেলো
কোথায় আছো আমার যত আপন?

কয়েকটা দিন রোদের নেই জলুস
কয়েকটা দিন ফ্যালফেলিয়ে চাওয়া
কয়েকটা দিন কুলুপ এঁটে মুখে
আগমনীর গান মনেতে গাওয়া...

তারপরেতে কী যে মজার দিন...
বসছে রোজই জমাট আড্ডা আসর
পাড়াপড়শি সবার ছুটোছুটি
দিকদিগন্তে ঢাক ঢোল বোল কাঁসর...

দক্ষ মেয়ে দশভুজার হাতে
মরেছে যে রাক্ষুসে সেই অসুর।।

ঘুমিয়ে আছে মা

শ্যামল সেন

প্লাটফর্মে ঘুমিয়ে আছে আমার মা
আমার মা জাগবে না আর
জাগবে না?

মা –
এই তো দেখো জেগেই আছি আমি,
তোমার গায়ের চাদরখানা টেনে টেনে
লুকোচুরি খেলছি আমি।
তুমি কেন দেখছ না মা
আমার সাথে খেলছ না
আমি তোমার কেউ কিছু না মা

আমার জন্য রাগ করেছে?
এই তো আমি ভালো ছেলে দেখো–
দুষ্টুমি আর করব না।

ওঠো-চলো তাড়াতাড়ি
ওই রেলগাড়িতে চড়েই আমরা
পৌঁছে যাব বাড়ি

তারপর একদিন
বাড়ি এসে দেখি–
মা দিয়েছে আমায় ফাঁকি,
আমার মা, কোথাও নেই
সবার মধ্যে হারিয়ে গেছি
একলা-একা আমি।
চোখে ভাসছে ছবি–
প্লাটফর্মে ঘুমিয়ে আছে মা আমার
আমার মা জাগবে না আর
জাগবে না।

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ধুধুগাওয়ার পুনুয়া

বুদ্ধদেব গুহ

অঙ্কন ■ দেবনাথ নন্দী

সবে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। শ্রাবণ-শেষের পিলাবিবির বনে, বনপ্রান্তের ঘন সবুজ মাঠে, বৃষ্টির গন্ধ তখনও মাখামাখি হয়ে আছে। বনের গভীরে জংলী গোঁড়লেবুর ঝাড়ে ঝাড়ে লেবু ফুল ফুটেছে। তারই গন্ধ নিয়ে খরগোশের মতো ছোটাছুটি করছে বৃষ্টি-শেষের হাওয়া। বৃষ্টির জলের তোড় ঘাসের মধ্যে মধ্যে যেখান দিয়েই নিজের পথ কেটে বয়ে গেছে, সেই সবখানেই মরা ঘাস, কুটো, ঝরাফুল পথ চিহ্ন হয়ে, রয়ে গেছে।

ফড়িং উড়ছে মাঠের উপরে ফনফনিয়ে। আর ফড়িং ধরার জন্যে পাশের পুনুয়া গাঙ থেকে গাঙশালিকেরা এসে ওড়াওড়ি করা ফড়িংদের কপাকপ করে গিলে খাচ্ছে। শ্রাবণের প্রবল বর্ষণে দানুয়ার নয়া-গাঙের মরা-সোঁতাতে প্রাণ এসেছে। নানা পাখি ডাকছে বনের ভিতর থেকে ডানার জল ঝেড়ে ফেলে শুকনো হয়ে উঠে। চাকচিক্য লেগেছে তাদের গলার চিকন স্বরে।

কিছু পাখির ডাক পুনুয়া চেনে। কিছু অচেনা।

চারিদিকের গাঢ়-সবুজ আর কচি কলকাপাতা-রঙা প্রকৃতির অণু-পরমাণু এক আশ্চর্য সুন্দর জলজ বনজ গন্ধে ভরে গেছে। নির্জন পৃথিবী বৃষ্টিতে চান করে উঠে নবীকৃত হয়েছে। বুনো নিম গাছেদের ডাল থেকে বৃষ্টির আগেই যে হাওয়া উঠেছিল মেঘলা আকাশের চাঁদোয়ার নিচে নিচে, চাঁদোয়াতে ঢেউ তুলে; সেই ঝুরুঝুরু হাওয়াতে নিমফুল উড়ে উড়ে ভেসে গেছে দূর থেকে সুদূরে, যেমন করে দোলের সময় শিমূলের বীজ ফেটে শিমূল তুলো উড়ে যায় আলতো পায়ে, বাতাসের গায়ে ভর করে। দু'টি পাহাড়ী

দাঁড়কাক একটি কেঁদ গাছে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে কুটিল চোখে সেই নিমফুলের ভেসে যাওয়া দেখেছে। নীরবে।

একটা মস্ত বড় শিমূল গাছ গতবছর এই সময়ে বাজ পড়ে জ্বলে গিয়েছিল। তার একটি ডাল ভেঙে পড়েছিল নিচে। সেই মস্ত, কিন্তু ভূতশায়ী ডালটির উপরে বসে ছিল পুনুয়া, উদাস চোখে উদ্দেশ্যহীনভাবে মাঠের দিকে, বনের দিকে চেয়ে। পুনুয়ার বয়স দশ। তার বাস এই বনের কাছেই ধুধুগাওয়া গ্রামে। ওর বাড়িতে মা ও এক বোন আছে। জমি-জমা বলতে কিছুই নেই। জঙ্গলের মূল খুঁড়ে, ফল কুড়িয়ে, শুয়োর আর হরিণ আর ভাল্লুকদের সঙ্গে লড়াই করে যা আনতে পারে, তাই খায়। পুনুয়ার মা জাদুকরী রাঁধুনি। শুধু জঙ্গলের ঘাস সেদ্ধ করেই তাতে নুন-ঝাল স্বাদ তুলে এমন করে খেতে দেয় যে, পুনুয়ার মনে হয় যে অমৃত খাচ্ছে।

শীতকালে যখন ধুধুগাওয়া গ্রামের খেতে খেতে ফসল লাগে নানারকম বাজরা, কুলথী, অড়হড়, কিতারি, তখন নানা জানোয়ারে এসে সেইসব ফসল নষ্ট করে দেয়। শীতের মুখে যখন ধান পাকে, তখন হরিণ, শম্বরে এসে ধান নষ্ট করে। বহু কষ্টে করা চিনাবাদাম খেয়ে যায় ধাড়ি ধাড়ি পাটকিলে খরগোশ। ভাগ্যিস ওদের এদিকে হাতি নেই। হাতি থাকলে তো ধান চাষ করাই যেত না। সারা বছরের পরিশ্রম একদিনেই সাবড়ে দিয়ে যেত।

শীতকালে পুনুয়া কিছু পয়সা রোজগার করে নেয়। তখন অবস্থাপন্ন মানুষেরা, যাদের জোতজিমি আছে, তারা ওকে খেত পাহারা দেওয়ার জন্যে বহাল করে। আর দিনের বেলা খেত থেকে পাখি তাড়ায়। মানুষ-কাকতাড়ুয়া হয়ে যায় পুনুয়া। অবশ্য ছেঁড়া জামা-কাপড়, বাঁশের কঞ্চি, শুকনো কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়েও সকলে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে রাখে যার যার খেতে। কিন্তু ধুধুগাওয়ার চারপাশের জঙ্গলে যেসব পাখ-পাখালি আছে, তারা বড় সেয়ানা। তারা কাকতাড়ুয়াদের চিনে নেয়—ভ্রুক্ষেপ না করেই খেতে নামে। তখন পুনুয়া ফাটা বাঁশের মধ্যে দড়ি দিয়ে বাঁধা অন্য বাঁশের টুকরোকে খিলের মতো ব্যবহার করে ফটাস-ফটাস করে শব্দ করে পাখিদের ভয় দেখায়। পাখিরা কিচিরমিচির করে হাওয়া-লাগা রঙিন শাড়ির মতো উড়ে যায় ঘন বনের দিকে, নীলাকাশের চাঁদোয়ার নিচে নিচে।

সবচেয়ে হয়রান করে টিয়াপাখিরা। টিয়াকে ওরা বলে সুগা। অনেক পাখি থাকে একেকটি দলে। মকাই-এর খেতে নেমে ঠোঁটে করে মকাই ছিঁড়ে নিয়ে যায়— অর্ধেক খায়, অর্ধেক ফেলে নষ্ট করে। পেয়ারা যখন ফলে, তখনও ওরকমই করে। যত না খায়, ঠুকরে নিচে ফেলে নষ্ট করে তার চেয়ে ঢের বেশি। তবে খুবই পেয়ারা হয় এই অঞ্চলে। সারাবছরই পেয়ারা হয়। তখন গরিব মানুষ তো খায়ই, টিয়া, শেয়াল, গোরু-বাছুরও পেয়ারা খেয়ে নেয় মনের সুখে। বসন্তের শেষে মহুয়া ফলতে শুরু করে। মহুয়ার গন্ধ 'ম' 'ম' করে, তখন অলস মৃদুগতি হাওয়া, করৌঞ্জ আর অন্যান্য বাসন্তী ফুলের গন্ধের সঙ্গে।

বসন্তে পুনুয়ার মন ভারী খারাপ হয়ে যায়। এই মন খারাপ কিসের জন্যে, কোন অভাবের জন্যে, তা ও বোঝে না। অভাব তো ওদের অনেকরকম—সারাবছর অভাব তো থাকেই, আছেই জন্মাবধি, কিন্তু বসন্তের হাওয়াতে যে মন কেমন করা, তার সঙ্গে সেই খাওয়া বা পরার অভাবের যেন কোনোই সম্পর্ক নেই। জানে না, কেন অমন হয়। কোকিলগুলো তখন বনে বনে পাগলের মতো ডাকাডাকি করে। ওদেরও কি মন খারাপ করে? কে জানে! আর পিউ-কাঁহারা! তারাও সারারাত জ্যোৎস্নাতে সাঁতার দিতে দিতে ডেকে বেড়ায়, পিউ-কাঁহা? পিউ-কাঁহা? কাঁহা-কাঁহা-কাঁহা করে।

পুনুয়ার মা পুনুয়াকে প্রায় বকেন। বলেন, দিনকে দিন বয়স বাড়ছে, টাকা রোজগারের কোনও ধান্দা নেই, চিন্তা নেই, বাপ মরে গেছে সেই কবে! আমি আওরাৎ হয়ে কি সারাজীবন তোমাকে খাওয়াব? তুমি কি চিরদিনই খোকাবাবু হয়েই থাকবে? বনে-পাহাড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে সারাটা দিন?

এই 'উদভ্রান্ত' শব্দটা বেশ ভালে লাগে পুনুয়ার। শব্দটির মানে যে ঠিক কি, তা ও জানে না। কিন্তু নিজেকে বেশ রাশভারী লাগে এই গালাগালিতে। অন্যায় করলেও, বেশ সম্ভ্রান্ত কিছু অন্যায় যে করেছে, এমন মনে হয় পুনুয়ার।

পুনুয়ার কোনও বন্ধু নেই। ওকে ওর সমবয়সীরা কেউই বোঝে না। অসমবয়সীরাও বোঝে না। ও বোঝাবার চেষ্টাও করে না কারোকে। ও আপনিতে আপনি সম্পূর্ণ। এই বন, পাহাড়, পাখি, এই হাওয়া এই আকাশ, বাতাস, বনের নানা জন্তু-জানোয়ার, দানুয়ার গাঙের সোঁতা, বর্ষাতে প্রাণ-পাওয়া কত সব নালা ও প্রপাত, এই নিয়েই ওর বেশ কেটে যায় দিন। গভীর শান্তিতে।

মানুষ বড় কথা বলে, সবসময়েই বড় খাই খাই করে, কখনও সুখী নয় মানুষেরা। যারা ধুধুগাওয়ার গ্রামের বড়লোক, মহাজন, মাহাতো, শেঠ—তারাও নয়। আসলে পুনুয়া তার বুকের গভীরে এই বনজ শান্তিকে যেমন করে জেনেছে, তেমন সুন্দর স্নিগ্ধ শান্তির কথা সম্ভবত ওরা ভাবতেই পারে না।

পুনুয়ারে মা প্রায়ই বকেন। বলেন, তোর কি কোনও ঋণ নেই? তোর চলে যাওয়া বাবার কাছে? আমার কাছে? এই ঋণশোধের কথা কি তোর একবারও মনে হয় না? তোর বয়স হলো তেরো। তোর ছোট বোন আছে। তাকে বিয়ে দিতে হবে। তুই কেমন দাদা?

পুনুয়া চুপ করে থাকে। মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে বনে পালায়। আজ যেমন ভরা শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন দুপুরে বৃষ্টির পরে আহ্লাদী ফড়িংদের এলোমেলো ওড়া দেখতে দেখতে ও বাবা-মায়ের ঋণের কথা ভাবে, অন্যদিনও ভাবে। ভাবে সবসময়ই।

বাবা-মায়ের কাছের ঋণ ছাড়াও অন্য অনেক ঋণও ওর অবশ্যই আছে। সে ঋণ বড় গভীর ঋণ। পারিবারিক ঋণের চেয়ে অনেক গভীরতর সেইসব ঋণ। যে ঋণ জমা হয়েছে, জমা হয়ে হয়ে প্রতি মুহূর্তে ভারী হচ্ছে, সেই ঋণ, যে ঋণ প্রত্যেক মানুষেরই জন্মাবধি এই আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে, এই বিচিত্ররঙা, বিচিত্রগন্ধী, বিচিত্র শব্দময় প্রকৃতির অণু-পরমাণুর কাছে। অরণ্যর কাছে যেমন, তেমন প্রত্যেকটি গাছেরও কাছে, পাখির কাছে, প্রজাপতির কাছে, ফুলের কাছে, ফলের কাছে; যেমন কুঁচফলের কাছেও। এইসব ঋণও কি পুনুয়া শোধ করতে পারবে কোনোদিন?

পুনুয়া জানে যে, পারবে না। বাবা-মায়ের ঋণেরই মতো প্রত্যেক মানুষের জীবনে অনেকই ঋণ থাকে, অনেক অনেক; যার কণামাত্রও শোধ করা যায় না। সেইসব ঋণ শোধ করার স্পর্ধাও সে কোনোদিন করবে না। তবে স্বীকার করবে আজীবন, স্বীকার করে

ধন্য করবে, পুণ্য করবে নিজেকে।

হঠাৎ একঝাঁক কচি-কলাপাতারঙা টিয়া, ডানা শনশনিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে ওর মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ওর এই দুপুরবেলার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে। এবারে উঠতে হবে পুনুয়াকে। মাহাতোদের ঘরে যেতে হবে একটু শুকনো মকাই ধার চাইবার জন্যে। মাহাতোর ভাণ্ডার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। সবসময়েই তা পূর্ণ থাকে। তার ভাণ্ডার যাতে খালি না হয়, তার মজুত-করা খাদ্যশস্য যাতে কমে না যায়, সেদিকে সবসময়েই তার সজাগ দৃষ্টি। এই ভাণ্ডারই তার টাকা, তার লাঠি, তার ক্ষমতা, তার মান-মর্যাদা সব। হয়তো দেবে একমুঠো, কিন্তু দেওয়ার সময়ে মুখটা বিকৃত করে বলবে, 'ধার' চাইবার বড়লোকী কেন রে ভিখারীর বাচ্চা? বল, 'ভিক্ষে' চাইছিস, 'ভিক্ষে'।

পুনুয়া ওর ছেঁড়া জামাটাই পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে মাহাতোর গর্বিত চোখের সামনে। বিড়বিড় করে মনে মনে বলবে, এ ঋণ তোমার কাছে নয় মাহাতো, এ ভিক্ষাও তোমার দেওয়া নয়। যিনি আকাশ দিয়েছেন, বাতাস, যিনি জল দিয়েছেন, ফুল দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতাবোধ দিয়েছেন আমাদের, এসব আসলে তাঁরই দান। তোমার চোখের দৃষ্টি বড়ই কম দূর অবধি যায় মাহাতো। দূর অবধি গেলে তুমি বুঝতে পেতে যে, তুমি কেউই নও। আমাকে দিয়ে তুমি আমাকে ধন্য করছ না, আমাকে যে তুমি দিতে পারছ, এই কারণেই ধন্য করছ নিজেকেই।

পুনুয়া না বলে মাহাতোকে বলবে, মাহাতো, আকাশ যেন তোমাকে ক্ষমা করে, মাহাতো ক্ষমা করে যেন বাতাস, যেন পাহাড় ক্ষমা করে, ফল, পাখি, প্রজাপতি—সকলেই যেন ক্ষমা করে তোমাকে।

(*পুনর্মুদ্রিত*)

সঙ্কটকাল

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ দেবনাথ নন্দী

ঘরবন্দি থেকে-থেকে মন মেজাজ একদম তিরিক্ষি হয়ে থাকে রমিতার। সকাল-সন্ধ্যাটা তবু বইটই নিয়ে কেটে যায়, দুপুরটা কাটানোই সবচেয়ে ঝক্কির। বাড়ির আর সবাই তখন টেনে ঘুম দেয়, তার আবার দুপুরে ঘুমোতে ইচ্ছা করে না। কী করবে ভাবছে, ঠিক সেই সময় মোবাইলের রিংটোন, স্ক্রিনের উপর অনন্যার নাম দেখে লাফিয়ে ওঠে অন করে বলল, কী রে, মনে পড়ল আমাকে?

—মনে পড়বে না কেন! ঘরের মধ্যে ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। সারাক্ষণ মনে হয় এই বুঝি করোনাভূত এসে জাপটে ধরল!

—করোনাভূত!

—হ্যাঁ, তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সারাক্ষণ আশপাশে ঘুরছে। কাকে কখন ধরবে, কে জানে!

—ধুস, রমিতা হাসল খুকখুক করে, এত ভয় পেলে চলবে!

—ভয় পাব না! আমাদের গলিতে একজনের হয়েছে, তারপর কী যে ধুন্ধুমার চলছে পাড়ায়! তার বাড়ির সামনে কী একটা কাগজ লটকে দিয়েছে, পাড়ার কেউ আর সেই বাড়ির ধারেকাছে ঘেঁসছে না।

–ব্যাড, ব্যাড, খুব খারাপ। যার করোনা হয়েছে, তার কী দোষ!

অনন্যা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, এই তোদের পাড়ায় কারও করোনা হয়েছে?

রমিতা রাগমাগ করে বলল, হয়নি এখনও। হতেই পারে যে কোনও সময়। তাতে কী হবে?

–হয়নি! খুব বেঁচে গেছিস। আমরা এখন ভয়ে মরছি।

–দ্যাখ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হলে হবে। কতজনের তো হচ্ছে। সবাই কি মরে যাচ্ছে! ভয় পেলেই মুশকিল।

–কী জানি, আমাদের পাড়ার সবাই তো ওই হলদে রঙের বাড়িটাকে এড়িয়ে থাকছে।

–দ্যাখ, অনন্যা, মরার আগে মরে গিয়ে লাভ নেই। যখন হবে, তখন দেখা যাবে। তুই নিশ্চয়ই খুব টিভি দেখছিস! টিভিতে যত মরার খবর দেখবি, তত হাত-পা সেঁধিয়ে যাবে পেটের ভিতর। আমি বাবা খবরটবর দেখি না। বিন্দাস থাকি, পড়ার বই যতক্ষণ পড়লাম, বাকি সময় গল্পের বই নিয়ে ডুবে থাকি।

অনন্যা গলা শুকিয়ে বলল, আমি তো বইয়ে মন বসাতেই পারছি না। সারাক্ষণ বাড়িতেও ওই একই আলোচনা। তোর সঙ্গে কথা বলে তবু একটু সাহস হচ্ছে।

–অনন্যা, আমার কাকার এক বন্ধুর হয়েছিল, ক'দিন ঘরবন্দি থেকে এখন আবার দিব্যি সুস্থ। তুই এ নিয়ে বেশি ভাবিস না। পারিস যদি যাদের বাড়িতে করোনা হয়েছে, কোনওভাবে সাহায্য করতে পারিস।

অনন্যা ছিটকে উঠে বলল, মাথা খারাপ! পাড়ার কেউ যাচ্ছে না– এখন রাখি রে, রমিতা।

অনন্যা ফোন রাখতেই কিছুক্ষণ মুখ ব্যাজার করে বসে রইল রমিতা। তার খুব রাগ হচ্ছিল অনন্যার উপর।

দিন দুয়েক পরে সত্যিই রমিতাদের গলিতে একজনের করোনা ধরা পড়ল। তারপর অনন্যা ঠিক যা যা বলেছিল, তাদের গলিতেও সেই একই ছবি। তার মা সবিতা বলল, রমি, একদম ঘর থেকে বেরোবি না। শুনছিস তো কী অবস্থা! ওদের বাড়ির সামনে পোস্টার মেরে দিয়ে গেছে কর্পোরেশন থেকে। কেউ ওদের বাড়ির ধার দিয়ে যাতায়াত করছে না।

রমিতা কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, করোনা হলে তো ওদের কোনও দোষ নেই! পাড়ার সবাই যদি ওদের এড়িয়ে থাকে, তো বেচারিরা কী করবে বলো! বরং দেখা উচিত, ওদের খাবার-দাবার ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা।

সবিতা রেগে উঠে বলল, কে দেখবে! তুই?

রমিতা মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল রাগত ভঙ্গিতে, বলল, তা ওদের বাড়িতে যদি কোনও কেউ না থাকে তবে আমাদেরই দেখতে হবে।

–আমাদের দেখতে হবে মানে? যে ওদের কিছু করতে যাবে তাকেই করোনা এসে ধরবে। বিস্ফারিত চোখে বলল, কে বলল তাকে ধরবে। চারদিকে এত প্রচার চলছে, তা দেখতে পাও না! ভালো করে মাস্ক পরে গেলে কিচ্ছু হবে না!

–তোকে বলেছে কিছু হবে না!

–হবে না-ই তো। করোনার তো হাত-পা নেই যে, হামাগুড়ি দিয়ে গায়ে এসে উঠবে। বরং পাড়ার লোকদের উচিত, ওদের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া। কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞাসা করা।

সবিতা আরও রেগে বলল, তুই যা, ওদের খোঁজখবর নিয়ে আয়।

রাগ দেখিয়ে সবিতা রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়ার পর রমিতা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। যে বাড়িতে করোনা হয়েছে, তারা পাড়ায় বেশ চেনা পরিবার। অমলেশকাকু ছবি আঁকে। ওঁদের বাড়ির ঘরগুলোর সব দেওয়ালেই দুর্দান্ত সব ছবি টাঙানো। সব ওঁর আঁকা। মাঝে মধ্যে কলকাতার কোনও গ্যালারিতে ছবির প্রদর্শনী করে। তাছাড়া সকাল-সন্ধ্যায় আঁকার ক্লাস চালায়। প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশটি কিশোর-কিশোরী আঁকা শিখতে আসে। লকডাউনের মধ্যে তাদের আঁকাও বন্ধ।

বাড়িতে অমলেশকাকু ও তাঁর স্ত্রী থাকে। তাঁদের ছেলে টুকাই হায়দরাবাদে গেছে পড়তে। এখন তাঁদের পাশে কাউকে না কাউকে তো দাঁড়াতেই হবে।

কী করবে রমিতা এখন!

সে যদি অমলেশকাকুর বাড়িতে যায়, মা নির্ঘাত তুলকালাম করবে।

তাহলে কি বাবার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবে! বাবা নির্বিবাদী মানুষ, মা যখন বারণ করেছে, বাবা নিশ্চয়ই হ্যাঁ করবেন না।

তবু পায়ে পায়ে বাবার শরণাপন্ন হলো। পাশের ঘরে বাবা তখন বইয়ে মুখ গুঁজে আছে, সেখানে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, বাবা শুনেছ, অমলেশকাকুর করোনা হয়েছে।

বাবা বই থেকে মুখ তুলে বলল, হ্যাঁ, জানি তো।

রমিতা একটু ভেবে বলল, ওদের কী মুশকিল বলো তো! বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুজন। কী করে সামলাবে বলো!

বাবা চিন্তিত স্বরে বলল, হ্যাঁ, কোভিড হলে তো সবারই মুশকিল। উনি তো মাঝে মধ্যে বাজারে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যান না! কী করে বাঁধালেন, কে জানে!

রমিতা বলল, নিশ্চয় অসতর্ক ছিলেন। আমার তো মনে হয় সতর্ক থাকলে করোনা ঘেঁসতে পারবে না। এখন কে ওদের দেখভাল করবে! টুকাই তো এখন ইচ্ছে করলেই হায়দরাবাদ থেকে চলে আসতে পারবে না!

বাবা অনেক ভেবে বললেন, শুনলাম কাউন্সিলর লোক পাঠিয়েছিলেন।

রমিতা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলল, পাড়ায় পাড়ায় করোনা হচ্ছে। উনি কতজনকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন! একদিন-দু'দিন খোঁজ নেবেন, তারপর–

–তা তুই এতসব খবর নিয়ে কী করবি?

রমিতা ইতস্তত করে বলল, ভাবছি আমাদের এত চেনাজানা, একবার খোঁজ নেওয়া উচিত।

বাবা অবাক হয়ে বলল, কে খোঁজ নেবে, তুই?

রমিতা চুপ করে থাকে, কুণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে।

বাবা ঘাড় নেড়ে বলল, আসলে কী জানিস, রোগটা এতটাই ছোঁয়াচে, কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

রমিতা বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, অসাবধান হলেই ছোঁয়াচে। না হলে এত এত ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, সাফাইকর্মীরা রাতদিন কাজ করছেন, তাদের সবার কি হচ্ছে। কেউ অসাবধান হলে তবেই হচ্ছে।

সেদিন একজন ভাইরোলজিস্ট বলছিলেন, তিনি কুড়ি বছর ভাইরাস নিয়ে কাজ করছেন, কোনও দিন সংক্রমিত হননি।

বাবা ঘাড় নেড়ে বলল, তা হয়তো হননি। কিন্তু এখানকার ডাক্তাররাও তো সংক্রমিত হচ্ছেন। নিশ্চয়ই প্রোটেকশন নিচ্ছেন। তা সত্ত্বেও—

—বাবা, তাঁরা রাতদিন পেশেন্ট নিয়ে আছে। কখনও না কখনও অসতর্ক হচ্ছেন বলেই সংক্রমিত হচ্ছেন। কিন্তু আমরা অমলেশকাকুদের প্রতিবেশী। আমরা যদি তাঁদের এড়িয়ে থাকি, সেটা শোভন হবে! ক'দিন পরেই যখন ভালো হয়ে মেনস্ট্রিমে ফিরবেন, তিনি নিশ্চয় ভুলে যাবেন না, প্রতিবেশীরা তাঁর অসময়ে কী ব্যবহার করেছিল।

—রমু, আমার মনে হয় কেউ না কেউ নিশ্চয় যাবেন ওঁদের খোঁজখবর নিতে।

রমিতা বুঝে ফেলল বাবার মনোভাব। সে খুব অনুগত, বাবা-মায়ের কথা অমান্য করে না। কিন্তু আবার আত্মবিশ্বাসী। আবার কোনও কথা একেবারে অপছন্দ হলে সময় বিশেষে বিদ্রোহীও।

দুপুরের সময়টা বাবা-মা দুজনেই টেনে ঘুমোয়। এরকম একটা ফুরসত খুঁজে নিয়ে রমিতা মাস্কটা পরে নিল নাকে-মুখে, নিজের মোবাইল নম্বরটা লিখল একটা টুকরো কাগজে, টুক করে দরজা খুলে চলে গেল কয়েকটা বাড়ি পরে, কলিং বেলে আঙুল দিল না, বরং দরজায় টুক টুক করে টোকা দিল কয়েকবার, প্রায় অনুচ্চারিত শব্দে ডাকল, কাকিমা, কাকিমা।

তার কণ্ঠস্বর পৌঁছে গেল ভিতরে, একটুপরেই দরজা নয়, পাশের জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন অমলেশকাকুই, চমকে উঠে বললেন, আরে, রমিতা, তুই?

—কাকু, আপনাদের খবর নিতে এলাম।

—কেন রে! কেউ আসছে না, শুধু তুই হঠাৎ?

—কাকু, সবাই এল না বলে আমিও আসব না!

—তুই হঠাৎ কী মনে করে!

—কাকু, আপনাদের তো হোম কোয়ারান্টিন করে দিয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না, আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়, তাই এলাম!

—দূর পাগলি, তুই আবার কী করবি?

—আপনাদের তো অনেক দরকার হতে পারে। সবজি, ফলটল লাগতে পারে। কিংবা হঠাৎ কোনও ওষুধ লাগতে পারে। আমার মোবাইল নম্বরটা আপনি রাখুন। এটাই আমার হোয়াটস অ্যাপ নম্বর। আপনি ফোন করে বা এই হোয়াটস নম্বরে লিখলেই আমি চলে আসব।

অমলেশবাবু হাসলেন, ঠিক আছে। মনে হয় তার দরকার হবে না। আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনি যোগাযোগ রাখছেন। যা যা দরকার, সব তিনি দেবেন বলেছেন। তোর টেলিফোন নম্বরটা রেখে দিলাম। যদি দরকার হয়, নিশ্চয় বলব। তুই যে মনে করে এসেছিস, এটাই বড়। এখন বাড়ি যা। সাবধানে থাকবি। বেশি বেরোবি না।

রমিতা একটু হাসল, বলল, আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।

কিছুটা স্বস্তি, অনেকটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে রমিতা ফিরে চলল বাড়ির দিকে।

করোনার পরাজয়

অনন্যা দাশ

অঙ্কন ■ শুভ্রশীল ঘোষ

কদিন থেকেই হিয়ার খুব মন খারাপ। কয়েকদিন পরই ওর জন্মদিন কিন্তু মা-বাবার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। হিয়া কিছু জিগ্যেস করলেও কিছুই বলছেন না। গতবার এই সময়তে কত হইচই। সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে। সবাই মানে সবাই। দাদু-দিদা, দাদুন-ঠাম্মা, কাকাই-কাকিমা, মাসি- মেসোরা, পাড়ারবন্ধুরা, স্কুলের বন্ধুরা সবাই। ওদের আবাসনের কমিউনিটি হলটাকে বুক করে রেখেছিলেন বাবা বেশ কয়েকমাস আগে। ক্যাটারারও বুক করা হয়েছিল খাবারদাবারের জন্যে। হিয়ার পাঁচ বছরের জন্মদিন তো আর মুখের কথা নয়! তিনদিন আগের থেকে অনুমতি নিয়ে মা- বাবা, তিন্নি দিদি আর কাকাই মিলে হলঘরটাকে কী সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলেছিলেন। মিকি, মিনি, ডোনাল্ড ডাক, গুফি, প্লুটো সবাই ছিল। কত বেলুন আর আলো সবকিছু দিয়ে হলঘরটাকে একবারে অন্যরকম লাগছিল। একটা ঝিলমিলে গোলাপি রঙের পোশাক পরেছিল হিয়া, মাথায় রাজকন্যাদের মতন মুকুট আর পায়ে জামার সঙ্গে রং মিলিয়ে গোলাপি জুতো। কত আনন্দ, গান, হাসি, গল্প, খেলা। তিন্নিদিদি কতরকম খেলা তৈরি করেছিল, মিউজিকাল চেয়ার, চোখ বন্ধ করে হাতির লেজ লাগানো, বেলুন রেস, লাঠি দিয়ে চকোলেট ভর্তি পুতুল ভাঙা। হিয়ার বন্ধুরা সবাই খেলেছিল মজা করে। যারা জিতেছিল তারা প্রাইজ পেয়েছিল বলে তাদের সেকি ফুর্তি। খুব মজা হয়েছিল। মিউজিকাল চেয়ারটাতে তো হিয়া নিজেই জিতেছিল। সবাই কত সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়েছিল হিয়াকে। কেকটাও কী সুন্দর দেখতে ছিল, মিনি মাউস দেওয়া আর খেতেও খুব দারুণ, সবাই খেয়ে খুব ভালো বলেছিল। সেই সব মনে করে করে হিয়ার দুঃখটা আরও বেড়ে যায়। সেদিন স্কুলেও সবাইকে টফি দিয়েছিল হিয়া। ক্লাসের সবাই 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' গান গেয়েছিল ওর জন্যে। এবারে জন্মদিনে কী হবে জিগ্যেস করতে মা বাবা বলে দিয়েছেন, "সরি হিয়া। এবারে কিছু করা যাবে না তোমার জন্মদিনে। দেখছো না এখন পৃথিবীর কী অবস্থা? কেউ ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেই না আর তার মধ্যে আবার জন্মদিন! তোমার দাদু-দিদা, দাদুন-ঠাম্মার বয়স হয়েছে তাঁদের তো ডাকাই যাবে না। পাশের পাড়াতেই ভাইরাস ধরা পড়েছে সেই খবর পেয়েছি আমরা। সেই অবস্থায় কাউকে ডাকাটাও খুব বিপজ্জনক তাই একদম জন্মদিনের কথা বলবে না।"

সেই সব শুনে হিয়ার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমনিতেই তো কতদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি সে। বাবাও বাড়ি থেকে কাজ করছেন কিন্তু সপ্তায় অন্তত দুয়েকদিন বাজারে তো যান। মুখে মাস্ক পরে টরে, কিন্তু বাইরে তো যাওয়া হয়। হিয়াকে কম্পিউটারে স্কুল করতে হচ্ছে সকালে কয়েক ঘন্টা ব্যস তারপর সারাদিন ছুটি। নাচার ক্লাস, গানের ক্লাস,

আঁকার ক্লাস সবই বন্ধ এই বিশ্রী ভাইরাসটার জন্যে। হিয়া এখন নিজের মনেই আঁকে, গুনগুন করে গান গায়, নিজের মতন নাচে। কিছু হোমওয়ার্ক থাকলে করে। কী বাজে লাগে ওর। স্কুলে, গানের ক্লাসে, নাচের ক্লাসে, আঁকার ক্লাসে কত বন্ধুদের সঙ্গে দেখে হতো, কত গল্প হতো। সেই সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে শুধু হিয়া, মা আর বাবা, সেটা কয়েকদিন ঠিক ছিল। সব সময় ভালো লাগে নাকি? মন্দের মধ্যে যেটা ভালো সেটা হলো ওদের পাশের বাড়ির সোনাই আর বাবাইয়ের সঙ্গে বিকেলে দু'ঘণ্টা খেলে। সোনাই আর বাবাই, যমজ। হিয়ার চেয়ে এক বছরের ছোট কিন্তু নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভালো। ওরাই আসে হিয়াদের বাড়িতে। মাঝে মাঝে একতলার বনিদিদিও আসে। বনিদিদি আবার ওদের চেয়ে বড়ো। সারাদিনে ওই সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে হিয়া। টিভি দেখতেও যেন আর ভালো লাগে না। কতক্ষণ আর কার্টুন দেখবে? যখন সময় কম ছিল তখন ওই সব দেখতে খুব ইচ্ছে করত এখন তো হিয়ার হাতে দেদার সময়। হিয়ার স্কুলটা অনেকটাই দূর তাই বাসে করে যেতে আসতেই অনেকটা সময় লেগে যেত। এখন সেই সময়টা বেঁচে গেছে আর ক্লাসও বেশিক্ষণ হয় না তাই অফুরন্ত সময়। হিয়া শুধু ওদের অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটার ছাদে যেতে পারে তাও অন্য কেউ থাকলে মা ওকে থাকতে দেন না টেনে বাড়িতে নিয়ে চলে আসেন। ছুটির দিনে মা-বাবা ওকে নিয়ে কিছু খেলতে বসেন বা মা-মেয়ে মিলে কিছু হাতের কাজের জিনিস বানায়, তখন ভালো লাগে হিয়ার। কিন্তু এমনি দিনে তো মাকেও কাজ করতে হয়। এদিকে শান্তামাসি আসতে পারে না ট্রেন বাস ঠিকমত চলছে না বলে, তাই মার কাজ বেড়েছে। বাসন মাজা, কুটনো কাটা, ঘর ঝাড়ুমোছা সব কিছু মাকেই করতে হয়, আর রান্নাবান্না তো আছেই। মাঝে মাঝে তাই বিরক্ত হয়ে যান মা।

জন্মদিনের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হিয়া দেখল আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে। ঠিক যেন ওর মনের মতন। মা-বাবা দু'জনেই আদর করে হ্যাপি বার্থডে, শুভ জন্মদিন বললেন। হিয়া লুচি আর সাদা আলুর তরকারি খেতে ভালোবাসে বলে মা ওর জন্যে জলখাবারে সেটাই রান্না করে দিলেন। কিন্তু আর কেউ কিছু করল না। হিয়া মনে করল দাদু-দিদা, দাদুন-ঠাম্মা আর বাকিরা সবাই ওর জন্মদিনের কথা ভুলেই গেছে। সেটা ভেবে ওর একটু কষ্ট হলো, কিন্তু কী আর করা যাবে। সেদিনটা রবিবার তাই স্কুলটুলও ছিল না। বাবা অবশ্য বাজার থেকে চিকেন নিয়ে এলেন হিয়া ভালোবাসে বলে। দুপুরে মাংস ভাত আর পায়েস খেতে দিলেন মা। বললেন, "এই লকডাউনের বাজারে আর পাঁচ রকম ভাজা করা গেল না।"

দুপুরে হিয়া একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা ওকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "এই নাও এবার এই জামাটা পরে নাও। নতুন জামা তো কেনা যায়নি বাইরে গিয়ে। আর অনলাইনে জামা কিনতে ঠিক সুবিধা হয় না। কয়েকবার কিনে খুব জোর ঠকেছি। কখনও খুব বড়, কখনও খুব ছোট। রং তো যে রকম দেখায় সেই রকম কখনই হয় না। তাই আমি আমার একটা শাড়ি কেটে তোমার জন্যে বানালাম। দেখ পরে কী রকম হয়েছে!"

হিয়া মনের আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরল। একটা হাল্কা সবুজ রঙের চুমকি বসানো শাড়ি কেটে জামা তৈরি করেছেন মা। দারুণ হয়েছে জামাটা। হিয়া তো জামাটা পরেই একবার বাড়িময় নেচে নিল! মা বললেন, "না, না, এখন আর ওসব করার সময় নেই। চলো টিভিতে একটা জিনিস দেখতে হবে তোমাকে!"

বলে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে টিভির সামনে বসানো হলো। বাবা তৈরিই ছিলেন। হিয়া বসতেই ভিডিওটা শুরু করে দিলেন। ওমা সবাই ওকে

ভিডিও বানিয়ে বানিয়ে শুভ জন্মদিন আর হ্যাপি বার্থডে করেছে! দাদু-দিদা, দাদুন-ঠাম্মা, কাকাই-কাকিমা, তিন্নিদিদি, মাসি-মেসোরা এমনকি ওর স্কুলের টিচার আর বেশ কয়েকজন বন্ধুও ভিডিও বানিয়ে পাঠিয়েছে! বাবা সেগুলোকে সব জড়ো করে একটা ভিডিও বানিয়েছেন। সবার কাছে অত সুন্দর সুন্দর কথা শুনে আনন্দে চোখে জল এসে গেল হিয়ার! সে মিছিমিছিই ভয় পাচ্ছিল! কেউ তো ভোলেনি।

একটু পরেই সোনাই-বাবাই আর বনিদিদি ওর জন্যে উপহার হাতে হাজির হলো। ওমা মা রান্নাঘর থেকে একটা কেক বার করে নিয়ে এলেন, বললেন, "তোমার পছন্দের চকোলেট কেক। ইউ টিউব থেকে দেখে বানিয়েছি। খেতে কী রকম হবে জানি না!"

ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে ছুরি দিয়ে কেক কাটল হিয়া। সোনাই-বাবাই আর বনিদিদি 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ' গান গাইল ওর জন্যে। মা সবাইকে কেক কেটে কেটে দিলেন, সঙ্গে আরো বেশ কিছু রকমারি খাবার জিনিস। বাহ, কেকটা কী ভাল খেতে হয়েছে! দোকানে কেনা কেকের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়! ওরা সবাই মিলে খুব মজা করল, অনেক ছবি তোলা হলো। বাবা ওদের সবাইকে বেশ কয়েকটা ম্যাজিক দেখালেন, দারুণ লাগল ওদের সবার। সোনাই-বাবাই আর বনিদিদি খেয়ে দেয়ে চলে যাওয়ার পর মা বললেন, "এখনও বাকি আছে একটা জিনিস! সবাই তোমার জন্মদিনে অনলাইনে কিনে কিনে উপহার পাঠিয়েছে। এতদিন সেগুলোকে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখছিলাম আমরা। এবার তুমি খুলে দেখতে পারো! এমনিতেও বাইরে থেকে আসা জিনিসে ছোটোদের ২৪ ঘণ্টা হাত দিতে নেই।"

কত কী সুন্দর উপহার পেয়েছে হিয়া দেখল– কার্ড, বই, স্কেচপেন, জল রং আর রং করার বই, পুতুল, টেডি বেয়ার, চকোলেট। আনন্দে আত্মহারা হয়ে হিয়া বলল, "আমিও একটা ভিডিও তৈরি করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিই, তাই না? তোমরা সবাইকে পাঠিয়ে দেবে তো?"

আমি হিয়াকে একটা গল্পের বই পাঠিয়েছিলাম তাই হিয়ার করা ভিডিওটা আমিও পেয়েছি। সেটাতে হিয়া বলেছে, "আমি ভেবেছিলাম করোনার জন্যে আমার এবারের জন্মদিনটা একেবারেই মাটি হয়ে যাবে কিন্তু তা হয়নি। আমি খুব মজা করেছি। তোমরা কেউ যে আমার জন্মদিনটা ভোলোনি দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। মাসিমণি তোমার দেওয়া গল্পের বইটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি একটু একটু করে পড়ছি।" এর পর অন্যরা যে যা দিয়েছে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছে আর সব শেষে হিয়া বলেছে, "করোনা আমাদের হারাতে পারবে না। আমরা করোনাকে হারিয়ে দেব। সবাই যদি নিয়ম মানে, মাস্ক পরে আর হাত ধোয় তাহলেই দুষ্টু করোনা হেরে যাবে তখন আমরা সবাই আবার আগের মতন মজা করব, তাই না?"

বললে হবে, খরচা আছে!

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

জুটছে কারো কোপ্তা-কাবাব, কারো ভাতের ফ্যান সার
লুটছে বা কেউ টিভি-র মজা, কারো টি.বি-ক্যান্সার!
গাছতলাতে মামদো নাচে, পাঁচতলাতে ড্যান্সার
কিন্তু কেন ঘটছে এমন, কে দেবে তার অ্যানসার?
কেউ থাকে রোজ অনাহারে, কেউ থাকে বেশ দুধে-মাছে
"বললে হবে, খরচা আছে! বললে হবে, খরচা আছে!"

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে অনেক দালাই বাড়ি কেনে
নিত্যনতুন হালফ্যাশনের রঙবেরঙের গাড়ি কেনে!
ছেলে-মেয়ে-বউয়ের তরে জামা-কাপড়-শাড়ি কেনে
আমরা তো সেই অন্ধকারেই, তেল জোটে না হারিকেনে!
আমাদের রোজ বানিয়ে বোকা, মই কেড়ে নেয় তুলেই গাছে
"বললে হবে, খরচা আছে! বললে হবে, খরচা আছে!"

ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাংটি তুলেই পা দুলিয়েই চেয়ারে
দেশদরদী দাদা আমার কলপ লাগান হেয়ারে!
অথচ এই দাদাই নাকি ব্যস্ত জাতির কেয়ারে
লক্ষ-কোটি টাকা দাদার খাটছে সবাই শেয়ারে!
দিন কাটে তার রেসের মাঠে, রাত কাটে রোজ বাইজি-নাচে
"বললে হবে, খরচা আছে! বললে হবে, খরচা আছে!"

ব্যাঘ্র মারিং, হস্তী মারিং, মারিং রাজা-উজির
দেশদরদী দাদারা সব হালুয়া খান সুজির!
দাদাদের তো চিন্তাই নেই রোজগার আর রুজির
কুঁজো হয়েই পুজো করেন পুঁজিপতির পুঁজির!
মন্ত্রী-নেতার ছত্রছায়ায়, দাদারা বেশ সুখেই বাঁচে
"বললে হবে, খরচা আছে! বললে হবে, খরচা আছে!"
"বললে হবে, খরচা আছে! বললে হবে, খরচা আছে!"

দিনকাল

উদয়ন ভট্টাচার্য

ছিন্নমূল হয়েছি, তবু বার বার
বৃক্ষের কথা মনে পড়ে।
বস্তুত দলদাস হওয়া থেকে
প্রতিষ্ঠান, সব কিছুর বিরোধ করেও, তাকিয়ে
থাকি সিংহ দুয়ারের দিকে।
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর,
দিন আর মধ্যাহ্নের দিকেযেতে চায় না।
সাদা কাগজের সামনে বসি চুপচাপ, আয়না
কবিতার অক্ষরের ওপর অশ্রু ফোঁটাগুলি
রক্ত বিন্দু হয়ে যায়।
যার স্থিতাবস্থা নেই তার হাত ধরি না
মুক্ত বাতাসের মধ্যে তাকে টেনে এনে
ঢেউ এর দিকে ঠেলে দিয়ে হেসে উঠি

আমিতো নিজেই ধ্বংস করেছি
সব সম্পর্ক, মেধা, বিশ্বাস, অন্বেষণ
অথচ আমি চাই বট বৃক্ষের ছায়া, কুঠার।

বড় গল্প

আঁধারে আতঙ্ক

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ডোং শ্রেণির দিকে পার্বত্য অঞ্চলকে ঘিরে যে ভয়ঙ্কর বনভূমি, হঠাৎ করে একদিন সেখানকারই একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম আমি। রেলের চাকরিটা স্বেচ্ছায় ছেড়েছি কিছুদিন আগে। তবু মন পড়েছিল ঘুমাবনি, আমকপালের বন ও ধারাগিরি ঝরনার দিকে। আমার সহকর্মী নাদা জুলধর মেট ও লক্ষণ মেট ধারাগিরিতেই থাকত। বিদায়কালে বলেছিল, 'এই যে তুমি যাচ্ছো আর কি কখনও আসবে এদিকে? যদি আসো দু'একটা দিন থেকে যেও আমাদের ধারাগিরিতে। একেবারে ভুলে যেও না যেন। আমরা কিন্তু ভুলব না তোমাকে।'

সেজন্য একদিন একটা চিঠি দিয়ে হঠাৎ করেই এসে পড়লাম এখানে। ঘাটশিলা থেকে ধারাগিরিতে আসা তখনও খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। খুব সকালে টিম্বার মার্চেন্ট মুকুলবাবুর ট্রাক বাহনে পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে বিশেষ এক জায়গায় নেমে হেঁটে যেতে হতো। সে ভাবেই গেলাম আমি।

যদিও আগে থেকে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম তবুও ভাগ্য জোর যে ওই সময় ওদের রেলের গ্যাং বসে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। তাই কারও কোনও অসুবিধেই হলো না।

আমি যেতেই হই হই করে উঠল সবাই। ওদের বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত।

গুণদা বলল, 'আমাদের মনে রেখেছ তাহলে?'

'রাখবো না মানে? সুবর্ণরেখা নদী ও ধারাগিরি হলো আমার প্রাণ। সেই সঙ্গে তোমরাও।'

লক্ষ্মণদা বলল, 'তুমি আসছ শুনে আর একজনও এসেছে।'

'আর একজন? কে?'

'ও-ই দেখো।'

বলতে বলতেই উদয় হলো সে। মাণ্ডি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে। আমারই গ্যাং-এ লেবারের কাজ করত। প্রায় সমবয়সি আমরা। এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'আর কখনও তোমাকে পাবো কিনা জানি না তবে এবারে কিন্তু আমাদের গ্রামে না নিয়ে গিয়ে ছাড়ছি না। কোনও অজুহাত শুনব না এবার।'

'সে তো অনেক দূরের পথ। ঝাড়গ্রাম না বেলপাহাড়ি কোথায় যেন?'

'কুঁড়োল পাহাড়ির দিকে। শিয়ারবেদার বনভূমি ডাইনে রেখে যেতে হয়। সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আজ এখানে হয়তো, কাল সকালেই তোমায় নিয়ে রওনা দেবে আমাদের গ্রামের দিকে। তবে কিনা দূরের পথ কিন্তু। তোমার হয়তো একটু কষ্ট হবে যেতে। তবে জঙ্গল যা দেখবে তাতে মন ভরে যাবে তোমার।'

আমি বললাম, 'হোক কষ্ট। তবু বনভ্রমণ তো হবে। তুই যখন সঙ্গে থাকবি তখন আর আমার ভয় কী? তোর তির ধনুকের কাছে বনের বাঘও ভয় পেয়ে পালাবে।'

'ব্যাস। এই কথা রইল তাহলে।'

এরপর মাণ্ডির ঘরেই আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হলো। ওর ঘরে আমার ব্যাগ ইত্যাদি রেখে পোশাক পরিবর্তন করে ঝরনার জলে মুখ হাত ধুয়ে খোলা জায়গায় চট পেতে বসলাম। গুণদার বউ আমাদের জন্য মুড়ি পেঁয়াজি নিয়ে এল। লক্ষ্মণদার বউ নিয়ে এল ভেলিগুড়ের চা। এখানকার অনবদ্য পরিবেশে জলযোগ পর্ব দারুণভাবে সমাধা করলাম সকলে।

এরপর মাণ্ডিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ধারাগিরির আশপাশের বনাঞ্চলে।

অনেক পরে বেলার দিকে ধারাগিরির প্রপাতে স্নান করলাম দীর্ঘক্ষণ ধরে। তারপর বেলায় গরম গরম মুরগির মাংস আর ভাত। বড় দেশি মুরগি এখানে আট আনা থেকে বারো আনা পিস। গুণোদাদের অবশ্য মুরগি কিনতে হয় না। শুধু ওরা নয়। এখানে সবার ঘরেই মুরগির চাষ। তাই ওদের পোষা মুরগি দিয়েই রান্না হলো। কী স্বাদ তার।

খাওয়া দাওয়ার পর মাণ্ডি ওর ঘরে গিয়ে তেড়ে ঘুম দিল। আমি ঝরনার আশপাশে একটু উঁচু জায়গা দেখে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। এখন ফেব্রুয়ারির শেষ। তাই আবহাওয়াও খুব সুন্দর। আমার তো দিবানিদ্রা হয় না। কখনও শুয়ে কখনও বসে রঙিন প্রজাপতিদের খেলা দেখে সময় কাটাতে লাগলাম।

বেলা গড়াতেই লক্ষ্মণদার ডাকে উন্মুক্ত জায়গা থেকে গৃহস্থের ঘেরাটোপে চলে এলাম। আর এখানে থাকা যাবে না। এবার এখানকার সমস্ত জায়গাটা জন্তু-জানোয়ারদের দখলে চলে যাবে। অতএব সাবধানতার খুবই প্রয়োজন।

ওদের গ্রামটা বেশ একটু উচ্চস্থানে। তার ওপর এমনভাবে ঘেরা যে খুবই নিরাপদ। বাঁশ কাঠ তক্তা দিয়ে তৈরি ঘর। টিনের শেডও আছে। তবে দারুণ মজবুত।

সন্ধের আগেই আর একবার চা-পর্ব সেরে নিলাম আমরা।

তারপর অনেক রাত পর্যন্ত সবাই আমরা গল্পে মাতলাম। গুণোদা ও লক্ষ্মণদার ছেলেমেয়েরা সবাই ঘাটশিলা হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। তাই ওদের কাউকে দেখা গেল না। রাতে ডাল রুটি খেয়ে তক্তোপোষের বিছানায় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। মাণ্ডি একই ঘরে একটি খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়ল। কেন না একা ঘরে আমি থাকতে চাইলাম না। হাজার হলেও আরণ্যক পরিবেশ তো। চারদিক থেকে বন্য জন্তুদের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙলেও বাইরে বেরোলাম না। একটু বেলায় ভালোভাবে রোদ উঠলে মাণ্ডি দরজা খুলে বলল, 'এবার বেরোতে পারো।'

ততক্ষণে গৃহস্থও জেগে উঠেছে।

আমরা বাইরে এসে একটা বড় পাথরের ওপর বসলাম কিছুক্ষণ। তারপর চোখে মুখে জল দিয়ে চারদিকের প্রকৃতি দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই তেলেভাজা মুড়ি চা এসে গেল সবার জন্য।

গুণোদা লক্ষ্মণদাও এল।

গুণোদা বলল, 'ভাবলাম দু'-একদিন থাকবে, তা আর হলো না। মাণ্ডি এসে যেভাবে ধরল তাতে আর না বলি কী করে?'

আমি বললাম, 'ওর আবদার রাখতে আমিও এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। কেন না ঘাটশিলায় আমি যখন তখনই আসতে পারব। কিন্তু ওর ওখানে কেউ না নিয়ে গেলে যেতে পারব না। অতএব ওকে এ যাত্রায় ছাড়া নয়। তাছাড়া অনেকদিনের আবদার ওর।'

লক্ষ্মণদা বলল, 'যাই হোক, সময় পেলেই এসো। তুমি এলে খুব ভাল লাগবে আমাদের।'

এরপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সময় পেলেই আসব বলে রওনা দিলাম। ধারাগিরির ঝরনা পর্যন্ত গুণোদা ও লক্ষ্মণদা এগিয়ে দিল আমাদের। মাণ্ডি আমার হাত ধরে ঝরনার পাশ দিয়ে পাহাড়ের বাধা টপকে উচ্চস্থানে ওঠালো। তারপর পাথরের বোল্ডারগুলোয় পা রেখে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম।

এতদিন ঘাটশিলায় থেকেও এই প্রথম এপথে আসা। কেনই বা আসব? কেউ-ই আসে না। বিশেষ প্রয়োজনে স্থানীয় পাহাড়িরা ছাড়া। মাণ্ডির কারণে সে পথের সন্ধানও পেয়ে গেলাম এবার। যদিও এ পথ সবার জন্য নয়।

ধারাগিরির পিছন দিকে যে মহাঅরণ্য সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না এতদিন। মাণ্ডি আমাকে অনেক ভালবেসে সে পথেই যাত্রা করল। ছোট বড় কত যে পাহাড় ও বন্যগ্রাম রয়েছে তাও উপলব্ধ হলো।

এক জায়গায় একটি পাহাড়ি বন্য গ্রামে মাণ্ডির পরিচিত একজনদের দাওয়ায় বসে বিশ্রাম নিলাম। সেখানে মুড়ি পিঁয়াজি বেসনের লাড্ডু ও চা জুটল। তারপর আবার পথ চলা।

এইভাবে এক সময় দুপুর গড়িয়ে এল প্রায়।

মাণ্ডি বলল, 'ওই ওদিকে মাঝকাঁদনা। এদিকে পাহাড় খুব বেশি। আর সামনেই নদীপারে হলো লাবণী। একটু খাড়াই পাহাড়। নানারকম ফুল ফোটে ওই পাহাড়ে। এর নিচেই ফুনবাসিয়া। ওখানেই আমাদের গ্রাম।

আমি মুগ্ধ হয়ে বললাম, 'চমৎকার। এত সুন্দর তোমাদের গ্রাম! এ যেন ছবির মতো সুন্দর।'

'তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, একবার অন্তত আমাদের গ্রামে চলো। ওখানে গেলে মন ভরে যাবে তোমার। কাল সকালে তোমাকে লাবণীতে নিয়ে যাব। নদী পার হয়ে যেতে হবে অবশ্য। তবে ঝরনার মতো নদী তো, পার হতে অসুবিধে হবে না।'

গ্রামে ঢুকতেই মাণ্ডিকে দেখে হই হই করে উঠল সকলে। ওর বোন মালতী এল সবার আগে। বলল, 'দাদা, তুমি এ পথে এলে যে? ইনি কে?'

মাণ্ডি বলল, 'ইনি আমার মেট। তোকে তো বলেছি এঁর কথা। ওঁকে দেখানোর জন্যই এ পথে এলাম। নাহলে ঘাটশিলা দিয়েই পাঠিয়ে দিতাম। আমার এখন পনেরো দিনের ছুটি। তারপর অর্ডার এলে আবার জয়েন করব।'

'সেই অর্ডার তোমাকে দিতে আসবে কে?'

'আমিই নিয়ে আসব। দশদিন ছুটি খেয়ে কর্মস্থলে গেলেই জানতে পারব। চাকরি থাকবে কি না। আসলে ক্যাজুয়াল লেবার তো।'

'ওই চাকরির দরকার কি তোমার? অন্য কোনও কাজ দেখো। তাতেই ভালো হবে।'

'শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে হয়তো। তবু আশায় আছি যদি এই কাজটা করতে করতে সিপিসি স্কেলটা পেয়ে যাই তো পার্মানেন্ট হয়ে যাব। তখন মাইনে বাড়বে। রেলের পাস পাবো। তা যাক, আগে এই দাদাটার ব্যবস্থা কর। সকাল থেকে পা হাঁটছে বেচারি।'

মালতী তখনই হাসিতে গাল ভরিয়ে বলল, 'এসো দাদাভাই, আমাদের গরিবখানায় এবার পায়ের ধুলো দাও।'

মাণ্ডি ও মালতী আমাকে ওদের ঘরে নিয়ে গেল।

মাটির ঘর। খড়ের চালা। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কোনও বন্যজন্তু যাতে চট করে চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে না পড়ে তেমনই ব্যবস্থা করা। তবে বুনো হরিণের কিন্তু অবাধ গতি এখানে। কতগুলো হরিণ তো মালতীকে দেখে ছুটে এসে ওর গায়েই উঠে পড়তে গেল প্রায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এগুলো তোমাদের পোষা নাকি?'

মাণ্ডি বলল, 'না না। এরা সব বনের হরিণ। নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় এরা। আমরা কেউ হরিণ মারি না এখানে। তবে হাঁস মুরগি খাই।'

এই অরণ্যভূমে মাণ্ডিদের সাজানো গোছানো ঘরে আশ্রয় পেয়ে কী আনন্দ যে পেলাম তা আমিই জানি। ওর মা বাবা বা আশপাশের প্রতিবেশী সবাই আমার আগমনে দারুণ উল্লসিত দেখে আমারও ভালো লাগল খুব।

এমন সাজানো গোছানো আদিবাসী গেরস্থ বাড়ি খুব কম দেখেছি আমি।

আমি ঘরে ব্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে দাওয়ায় আসতেই মালতী আমার বসার জন্য মাদুর বিছিয়ে দিল। মাণ্ডি, মালতী আমি ছাড়া দু'জন প্রতিবেশীও এসে জুটে গেল আমাদের দলে। তাই গোল হয়ে বসলাম আমরা। এই বনভূমিও যে সন্ধের পর নিরাপদ নয় তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো আমাকে। বুঝিয়ে দেওয়া হলো এখানকার পাহাড় জঙ্গলে দিনমানেও একা কখনও না বেরোই। বিশেষ করে নদীর ওপারে যেন না যাই।

একটু পরেই গরম লুচি আলুভাজা ও হালুয়া এল আমাদের জন্য। মাণ্ডির মা এসে দিয়ে গেল। ইশারায় মালতীকে ডেকে তাকে দিয়েও আনালো কয়েকটা প্লেট। তারপর চা।

সারাদিনের পর এমন তৃপ্তির খাওয়া পেয়ে বর্তে গেলাম আমি।

হ্যারিকেন, চিমনি, হ্যাজাক কোনও কিছুরই অভাব নেই এ বাড়িতে। তাই আলোর অভাব হলো না।

অনেক রাত পর্যন্ত জমিয়ে গল্প করলাম আমরা। তারপর গরম ভাত ও মুরগির মাংস আশ মিটিয়ে খেয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করলাম। মাণ্ডি ও মালতী দু'জনে মিলে আমার মশারি টাঙিয়ে দিল। যাতে রাতে ঘুমের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে।

সে রাতটা যে কী সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে কাটালাম তা আমিই জানি। পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই মাণ্ডি বলল, 'জানি তুমি বেশি বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে পারো না, তাই সজাগ থেকে তোমারই ওঠার অপেক্ষা করছিলাম। মালতীও উঠেছে। তুমি চোখে মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি ওকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি?'

'অবশ্যই। সাতসকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চায়ের বিকল্প আর কিছু কি আছে?'

একটু পরেই মালতীও এল। এক মুখ হাসি নিয়ে কাছে এসে বলল, 'গরিবের পর্ণকুটিরে কাল রাতে ঘুম ভালো হয়েছিল তো? চারদিকে যা সব বন্যজন্তুর ডাক।'

'আমি কিন্তু কিছুমাত্র টের পাইনি। তবে ধারাগিরিতে পেয়েছিলাম।

মালতী চলে গেল। মা বোধ হয় আরও আগে উঠেছেন। তাই মা মেয়ে দু'জনেই হাত মিলিয়ে কাঠের জ্বালে চা তৈরি করে লেড়ো বিস্কুট সহ নিয়ে এল আমাদের কাছে। মালতীই নিয়ে এল। ভেলিগুড়ের চা। তা হোক, গাঢ় দুধের প্রভাবে দারুণ উপাদেয়।

মাণ্ডি মালতীকে বলল, 'এখন কি খেতে দিবি?'

'আলু পরোটা আর হালুয়া। পরে বেলায় অন্য কিছু। এছাড়া এই জঙ্গলে কী-ই বা পাব বলো?'

আমি বললাম, 'এ-ই বা করতে গেলে কেন?' স্রেফ মুড়ি আর পিঁয়াজি হলেই চলে যেত।'

'বেলায় ক্ষীর খাওয়াবো। ঘরের তৈরি ক্ষীর।'

আমাদের চা-পর্ব নানা কথপোকথনের মধ্য দিয়েই শেষ হলো।

মাণ্ডি বলল, 'এবার চলো, নদী পার হয়ে আমাদের জঙ্গলমহলের টিলা পাহাড়গুলো তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। কত হরিণ দেখতে পাবে তুমি।'

মালতী বলল, 'লাবণীতে নিয়ে যাবে না?'

'ও যেতে চাইলে নিয়ে যাব। তবে খাড়াই পাহাড় তো। অনেক বেলা হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। তোমরা এখন ঘুরে এসো। পরে বেলায় বরং আমি নিয়ে যাব।'

'একদম না। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।'

'সময় থাকতে থাকতেই নেমে আসব। বেশি দেরি করব কেন?'

মাণ্ডি এবার আমার হাত ধরে টান দিল।

আমিও ওকে অনুসরণ করলাম।

এমন সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশে এসে কী আনন্দ যে পেলাম তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সব অনুভূতির প্রকাশ সব সময় ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। উঁচু নিচু পার্বত্য পথ বেয়ে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়িয়া সেই নদীটির কাছে গিয়ে যখন পৌঁছালাম তখন মন যেন ভরে গেল।

আমরা কোনোরকমে পায়ের পাতা ডুবিয়ে পাথরের বোল্ডারে পা রেখে ওপারে গেলাম। আমাদের চোখের সামনেই লাবণী পাহাড়। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ভরা। তার কোলে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি গুহাও চোখে পড়ল।

মাণ্ডি বলল, 'এর ভেতরে কত যে বন্য জন্তু বাসা বেঁধে আছে তা কে জানে? তাই দুপুর দুটোর পর নদী পার হয়ে এদিকে আসা খুবই বিপজ্জনক।'

আমি বললাম, 'মালতী যে বলল বেলায় আমাকে এদিকে নিয়ে আসবে।'

'ও বললে কী হবে? আমি আসতে দিলে তো?'

অতএব আমরা লাবণীকে এড়িয়েই এদিক সেদিক ঘুরে আবার নদী পার হলাম।

মালতী তখন কয়েকটি বুনো মেয়ের সঙ্গে নদীর জল তোলপাড় করে খেলায় মেতেছে। আমাদের দেখেই ছুটে এল মালতী। বলল, 'এই সবে সকাল ন'টা। আমার বান্ধবীরাও লাবণীতে যেতে চাইছে। এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। বলে মাণ্ডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ঘরে যাও। আমি দাদাভাইকে নিয়ে লাবণী থেকে ঘুরে আসি।'

মাণ্ডি বলল, হ্যাঁ, এখনই গেলে যেতে পারিস। তবে দুটোর আগে ফিরে পড়বি কিন্তু। না হলে ভাবনা চিন্তা করব।'

মাণ্ডি চলে গেলে আমরা নদী পার হয়ে লাবণীর দিকে চললাম। শুধু মালতী নয়, ওর বান্ধবীরাও দেখলাম বেশ সহজ সরল অত্যন্ত মিশুকে মেয়ে। কথাবার্তাতেও দারুণ সাবলীল। আমি যেন ওদের কত আপনজন এমনভাবেই কথা বলতে লাগল আমার সঙ্গে। কখনও নিজেদের মধ্যেই আলাপচারিতায় হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। অথচ সবাই এরা বন্য আদিবাসী। কিন্তু দারুণ স্মার্ট। এতেই বোঝা গেল শহর বা শহরতলির সঙ্গে ওদের নিত্য যোগাযোগ আছে। ভেতরে ভেতরে লেখাপড়াও করে নিশ্চয়ই।

মাঝে মাঝে দুরূহ কঠিন পথ যেখানে, ওরা সেখানে আমার হাত ধরে টেনে ওপরে তুলতে লাগল।

এইভাবে অনেক উচ্চস্থানে যেখানে উঠে এলাম সেখানে আসতেই চমকিত হয়ে গেলাম। এ যে স্বর্গের নন্দনকানন। ফুলে ফুলে ভরে আছে চারদিক। বনে জঙ্গলে ঝোপে ঝাড়ে সর্বত্র ফুল। আর শত শত হরিণের মেলা। মালতী ও সঙ্গিনী মেয়েরা সবাই সেই হরিণদের নিয়ে খেলা শুরু করল। ঘরের পোষা হরিণের মতো ওরাও আদর খেতে লাগলো ওদের। দু'একটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। কিছু বলল না ওরা।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে কী একটা পাখি ডেকে উঠতেই প্রাণভয়ে ছোটা শুরু করল হরিণের দল।

মালতী ছুটে এসে আমার হাত ধরল।

ওর বান্ধবীরাও দূর থেকে হাত নেড়ে পালিয়ে যেতে বলল আমাদের। তারপর তারাও যে যেখানে পারল গা ঢাকা দিল।

কী যে হলো কিছু বুঝতে না পারলেও ঘোর একটা বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে তা বেশ বুঝতে পারলাম। মালতী আমার হাত ধরে বলল, 'ভয় পেও না। আমার সঙ্গে এসো। আমি ঠিক নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে।'

ভয়ে তখন হাত-পা কাঁপছে আমার।

আমাদের সামনেই আরও উচ্চস্থানে যাবার যে সর্পিল পথটা জঙ্গল ভেদ করে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে ও আমাকে সেই পথেই নিয়ে চলল।

একটু পরেই ভালুকের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে আতঙ্কিত হয়ে উঠল চারদিক। আর তখনই যা হলো তা দারুণ বিস্ময়কর। কোথা থেকে যেন বিদ্যুৎবর্ণা দুই বন্য কিশোরী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মালতীর হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে সঙ্কীর্ণ একটা গুহার মধ্যে টেনে আনল। গুহার ভেতরটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। সেখানে বিশেষ একটি জায়গায়

শুকনো ঘাস পাতা বিছানো। তার মানে এরা এখানে আসা যাওয়া করে। কিন্তু আমাকে এভাবে এখানে নিয়ে আমার কারণটা কী? আর এরাই বা কারা?

ওদেরই একজন হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে গুহামুখ বন্ধ করে দিল।

আমি নিথর হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললাম, 'আমার সঙ্গের সেই মেয়েটি কোথায়?'

ওদের একজন বলল, 'কার কথা বলছ, মালতীর?'

'হ্যাঁ।'

'সে আছে। তোমার কি ভয় করছে?'

'ভয় করবারই তো কথা।'

'ভয় নেই। খুব জোর প্রাণে বেঁচেছ তুমি। ঠিক সময়ে আমরা এখানে এসে না পড়লেও তোমরা দু'জনেই বুনো ভালুকের খপ্পরে পড়ে যেতে। তোমাদের আর সব মেয়েরা এখানকার হাওয়া বোঝে। তারা বুনো মেয়ে। যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে। মালতী আমাদেরই দলের মেয়েদের কাছে আছে। সময় হলেই আসবে ও।'

আমি অনেক কষ্টে ওদের মুখগুলো বোঝবার চেষ্টা করলাম।

দু'জনের একজন বলল, 'মুখ দেখবে আমাদের? এই দেখো।' বলেই গুহার এক প্রান্ত থেকে একটা ছোট টর্চ এনে গুহার ছাদে ফেলল।' তাতেই স্পষ্ট দেখলাম দু'জনকে। দেখেই চমকে উঠলাম। বন্য মেয়ের এত রূপ! আর কী অপূর্ব মুখশ্রী। তার চেয়েও বিস্ময়কর যা, তা হলো দু'জনেই একইরকম।

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'তোমরা কি যমজ?'

'হ্যাঁ। তবে আমরা কিন্তু দু'জন নই। আমরা পাঁচজন। আমাদের পাঁচজনকেই একইরকম দেখতে।'

'তারা এখন কোথায়?'

'আশপাশেই আছে তারা। মালতী ওদের কাছেই আছে।'

বাইরে তখন ভালুকের দল প্রচণ্ড দাপাদাপি করছে। আমার সর্বাঙ্গে শিহরিত হলো। শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত হিম হয়ে গেল যেন।

এইভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেল তা কে জানে। একটু পরেই ভয়ঙ্কর বাঘের ডাকে আবার নতুন করে কেঁপে উঠল বনভূমি। তারপর দাপাদাপি করতেই মেনে এল শ্মশানের নীরবতা।

অনেক পরে গুহার মুখে একটা বাঁশি বেজে উঠতেই ওরা পাথর সরিয়ে বাইরে নিয়ে এল আমাকে।

সেখানে এদের আরও তিন বোনের সঙ্গে মালতীও ছিল।

মিষ্টি মেয়ে মালতী এক গাল হেসে বলল, 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তো?'

আমি স্বাভাবিক হয়ে বললাম, 'তা একটু পেয়েছিলাম বৈকি। এসবে তো অভ্যস্ত নই।'

ততক্ষণে পঞ্চকন্যার মা'-ও এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। মধ্যবয়সি রমণী। কিন্তু মেয়েদের মতো রূপে-লাবণ্যে যেন ঝলমল করছেন। অত্যন্ত স্নেহশীলা। বললেন, 'কেমন দেখলে আমাদের লাবণী?'

'দারুণ। তবে আপনার পঞ্চকন্যাই কিন্তু আমার কাছে সেরা চমক। এখানকার পাহাড় ও বনভূমি আলো করা মেয়ে সব।'

জননী বললেন, 'এসো, আমাদের ঘরে এসো। একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও।'

মালতী বলল, 'না না। আজ থাক। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাড়িতে চিন্তা করবে। আর একদিন বরং আসা যাবে। দাদাভাই তো দু'একদিন থাকবে এখানে।'

'তাহলে কাল এসো। কাল পূর্ণিমা। সারাদিন থেকে রাতে নাচগান দেখে গুহায় রাত কাটাবে। খুব ভালো লাগবে কিন্তু। বাড়িতে বলে এসো। শহরের ছেলে তো বুনোদের অনুষ্ঠান। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই আসব। এমন সুযোগ আমি ছাড়ি কখনও?' বলে জননী এবং তাঁর পঞ্চকন্যাদের মুখের সৌন্দর্য দেখে অবতরণ শুরু করলাম। মালতীর সঙ্গিনীরা সবাই আশপাশে ছিল। ওরাও আমাদের সঙ্গ নিল।

একসময় যখন আমরা নিচে নামলাম তখন মাণ্ডি ও গ্রামের কয়েকজন আমাদের জন্য নদীর ধারে অপেক্ষা করছিল। যদিও আমার সঙ্গে মেয়েরা ছিল বলে উৎকণ্ঠিত হয়নি কেউ। মাণ্ডি তবু বলল, 'এত দেরি করলে কেন?'

মালতী বলল, 'ভাবে বিভোর হয়ে গেলে দেরি তো হবেই।'

যাই হোক, আমরা ঘরে এলে ঈষৎ গরম জলে ঘরেই স্নানের পর্বটা সেরে নিলাম। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে পূর্ণ বিশ্রাম।

বিকালে মাণ্ডির সঙ্গে নদীর ধারে গিয়ে বসলাম কিছুক্ষণ। পাহাড়িয়া ছোট্ট নদী। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে কুলকুল করে বইছে।

মাণ্ডি বলল, 'কেমন লাগল লাবণীকে?'

'দারুণ। তার চেয়েও ভালো লাগল ওই পঞ্চকন্যাদের। এমন জলহাওয়ায় অত রূপ সৌন্দর্য নিয়ে ওরা কারা?'

'জানি না। ঈশ্বরের সৃষ্ট এক অন্য প্রজাতির মানুষ ওরা। হাসি খুশি দারুণ মিশুকে। শুধু তাই নয়। বরাবরই গুহাবাসী। বছর দুই আগে মেয়েগুলোর বাবা মারা গেছেন। মা নিজেও শান্তশীলা এবং ধর্মপ্রাণা। কখনও কারও সঙ্গে কোনও সংঘর্ষে জড়ায়নি ওরা।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ওদের চলে কী করে?'

'জঙ্গলের কাঠ, কেন্দুপাতা, হাঁস মুরগি বিক্রি করে।

আসলে, ননীর শরীর হলেও প্রচুর পরিশ্রমী ওরা। তবুও বলি, ওরা কিন্তু অন্যদের থেকে একটু ব্যতিক্রমী। ঠিক সেই অর্থে স্বাভাবিক নয়। এখনও ওরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মতো গুহবাসী।'

আমি তখন আজ সকালের বিপর্যয়ের কথাটা শোনালাম মাণ্ডিকে। ওদের পুরো গ্রামটা যে ঘুরে দেখার সময় পাইনি তাও বললাম। এও বললাম ওদের ওখানে আমার কিছুক্ষণের গুহাবাসের অভিজ্ঞতার কথা। ওদের জননীর আহ্বানে কাল সারাদিন ও রাতের অতিথি হবো এমন কথাও দিয়ে এসেছি। অবশ্যই মালতী ও মেয়েদের সঙ্গ নিয়ে।'

মাণ্ডি বলল, 'রাতে ওখানে থাকাটা কি ঠিক হবে? শুনেছি রাতে নাকি ওরা একটু অন্যরকম হয়ে যায়।'

'হোক না। অভিজ্ঞতা তো হবে। তাছাড়া মালতী যা মেয়ে ও কাছে থাকলে ভয়কে আমি অনায়াসে জয় করতে পারি।'

'মালতীর ভরসাতেই তো আমি গ্রাম ছেড়ে অতদূরে গিয়ে নিশ্চিন্তে চাকরি করতে সাহস পাচ্ছি।'

এরপর গ্রামের আশপাশে একটু ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধের আগেই ঘরে ফিরলাম।

আশাপাশের বাড়ি থেকে আজও আরও কয়েকজন এলে জমে

উঠল চায়ের আসর। তারপর অনেক গল্পগাথার শেষে লুচি, বেগুন ভাজা ও ক্ষীর খেয়ে গত রাতের মতোই শান্তিতে নিদ্রা গেলাম।

পরদিন সকাল হতেই মালতী এসে ডেকে তুলল আমাকে। বলল, ‘দাদাভাই, কাল রাতে খুব ঘুমিয়েছ তো তুমি? অনেক বেলা হয়ে গেছে। সকাল আটটা। ওরা তোমাকে নিতে এসেছে।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘ওরা মানে কারা?’

‘তোমার ওই পঞ্চকন্যারা।’

‘সে কী! এত সকালে? তাছাড়া ওরা নিতে এলেই বা আমি যাব কেন? আমি তো যাব তোমার সঙ্গে।’

‘আমি তো যাবই। আমার বান্ধবীরাও যাবে। আসলে কাল যা হয়ে গেল, সে জন্যই এসেছে ওরা।’

অতএব আর দেরি না করে আমি চোখে মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম।

পঞ্চকন্যারা বাইরেই ছিল। আমাকে অভ্যর্থনা করে বলল, ‘তাড়াহুড়ো করতে হবে না। আমরা বাইরে আছি আরও কে কে যেতে চায় দেখি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব আমরা।’ তারপর মাণ্ডিকে বলল, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। দারুণ জমবে তাহলে। আপনাকে তো পাই-ই না আমরা।’

মাণ্ডি বলল, ‘না গো। আমার এখন যাওয়া হবে না। বিশেষ করে দিনরাতের ব্যাপার। তোমাদের নতুন অতিথির সঙ্গে আমার বোন যাচ্ছে, এই যথেষ্ট। ও খুব ভালো। কত প্রশংসা করছিল তোমাদের।’

‘বেশ ঠিক আছে। এখন না হলে পরে কখনও সময় পেলে যাবেন।’

পঞ্চকন্যারা তখনকার মতো বিদায় নিল।

আমিও জলযোগ পর্ব শেষ করে যাবার প্রস্তুতি নিলাম। মালতীও তৈরি হয়ে নিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওরা আসতেই হইহই করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। মালতীর সেই বান্ধবীরা ছাড়াও আরও দু’একজন এসেছে।

আমরা দলবদ্ধ হয়ে নদী পার হলাম। তারপর কতকগুলো টিলা পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে ঘন জঙ্গল অতিক্রম করে দুর্ভেদ্য লাবণীতে ওঠা শুরু করলাম। অনেক উচ্চতায় ওঠার পর সবাই আমরা সেই নন্দনকাননের মতো স্থানে এসে পুষ্পোদ্যানে বসলাম। আজ আর কোথাও কোনও আতঙ্ক নেই।

এখানে এই স্বর্গোদ্যানে বসে বারে বারে নানাভাবে পঞ্চকন্যাদের দেখতে লাগলাম আমি। মনও চঞ্চল হতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। এদের একজনও যদি আমার –। মনকে সংযত করলাম।

ওরা হাসিতে মুখ ভরিয়ে ডাক দিল আমাদের।

মালতী বলল, ‘চলো।’

আবার সেই সর্পিল পথ ধরে আরও উচ্চস্থানের দিকে এগিয়ে চললাম। সেই গুহাগুলোর পাশ দিয়ে উঠে গেলাম একেবারে শীর্ষদেশে। এখানে মস্ত একটি গুহার জঠরে বাস করে ওরা। গুহার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা উঠোনের মতো। সেখানটাও বনোময়। তবু হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়।

পঞ্চকন্যার জননী খুব খুশি হলেন আমাকে দেখে। ঘাসের গালিচায় চাটাই পেতে বসতে দিলেন। বললেন, ‘এখানেই আমাদের সুখের সংসার। এই পাহাড়ের পিছন দিকের ঢালে আমাদের স্বজাতিরাও আছে। তবে আমরা বিশেষ কারণে এই দিকটা বেছে নিয়েছি। খুব শান্তিতে আছি।’

জননীর সঙ্গে আরও দু’জন মহিলাকে দেখলাম। তাঁরা রন্ধনকর্মে ব্যস্ত বলে মনে হলো।

পঞ্চকন্যারা আমাদের সবাইকে বসিয়ে ছাতু ও গুড় খেতে দিল। তারপর আনন্দে অভিভূত হয়ে একের পর এক গুহা দেখাতে লাগল। পর পর চার-পাঁচটি গুহাকে ওরা অতি সুন্দরভাবে বসবাসের উপযোগী করে নিয়েছে। এবং সেগুলি এমনভাবে ঘেরা যাতে এখানে কোনও বন্যজন্তুই উপদ্রব করতে না পারে।

জলযোগ পর্ব শেষ হলে আমরা লাবণীর পিছন দিকের মহাঅরণ্যও দু'চোখ ভরে দেখে নিলাম। সত্যি বলতে কি অনেক ভালোবাসায় ভরে উঠে ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম।

দুপুরে হাঁসের মাংস আর ভাত। সেই সঙ্গে টমেটোর চাটনি। কী দারুণ উপাদেয়।

মালতী বলল, 'এছাড়া এই পাহাড় জঙ্গলে আর কী-ই বা পাবে বলো? তৃপ্তি করে এই খেয়ে নাও।'

আমি বললাম, 'দারুণ তৃপ্ত আমি। সত্যি বলতে কি মন আমার ভরে গেছে।'

খাওয়া দাওয়ার পর একটু তো বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই গুহার সামনেই এক জায়গায় একটি বড় পাথরের ওপর বসে রইলাম উদাসভাবে।

মালতী ওর বান্ধবীদের দলে ভিড়ে গেল।

একটু পরেই দেখলাম নানা জাতের আদিবাসী মেয়েরা এক এক করে জড়ো হতে লাগল সেখানে। ধামসা মাদলও আসতে লাগল।

পঞ্চকন্যাদের যে দু'জন কাল আমাকে অন্য গুহায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরই একজন মায়াভরা চোখে জাদুকরীর মতো এসে আমার হাত ধরে অন্য একটা গুহায় নিয়ে গেল। বলল, 'এখন তুমি এখানে একটু বিশ্রাম নাও। সময়ে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'কেন, বাইরে তো আমি বেশ ছিলাম।'

'তবু তুমি এখানে থাকো। একটু বিশ্রাম নাও। আমি না ডাকলে এসো না।' বলে কেমন যেন এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, 'আমাদের ব্যাপারে মালতী কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'কই না তো। শুধু বলেছে খুব ভালো তোমরা। আমাদের মতো নয়।'

কন্যা বলল, 'সে তো মালতী বলেছে। তুমি কী বলো?'

'আমারও ওই একই মত। আমার জীবনে তোমার বা তোমাদের মতো কাউকে এর আগে আমি কখনও দেখিনি।'

ওর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। বলল, 'আমারও ক্ষণিকের দেখায় কী ভালো যে লেগেছে তোমায় তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার যদি উপায় থাকত তাহলে তোমার সঙ্গে চুটিয়ে বন্ধুত্ব করে তোমাকে আরও আপন করে নিতাম।

আমি স্নেহভরে জানতে চাইলাম, 'কী নাম তোমার?'

'আমার নাম কোয়েলিয়া। আমাকে দেখে যেমন তোমার চোখের পাতা পড়ছে না আমার গান শুনলেও তেমনি মুগ্ধ হয়ে যাবে। মায়া পড়বে। তার কারণ একটা দৈব শক্তির ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে আছি আমরা।'

'মায়া তো পড়েই গেছে। তোমাদের সবাই যদি রাজি থাকে তাহলে এই মায়া কাটিয়েই আমি –।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে তর্জনি রেখে কোয়েলিয়া বলল, 'ব্যস। আর এগিয়ো না। এখানেই থেমে যাও। ও জীবন আমার বা আমার বোনেদের জন্য নয়। দারুণ, একটা অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমরা। আর সেজন্যই গুহাবাসী। একটু পরেই আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যাব। তখন কিন্তু আমাদের দেখে ভয় পেও না।' বলেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ও।

অনেক পরে নানারকম বাদ্যের সুরে গমগমিয়ে উঠল চারদিক।

মালতী ওর দু'জন বান্ধবীকে নিয়ে গুহায় এসে ডাক দিল আমাকে। বলল, 'এবার এসো দাদাভাই।'

আমি বাইরে এসে দেখলাম চারদিক তখন মশালের আলোয় আলোকিত। বড় গুহার সামনে যে বিশাল চত্বরটা সেখানে তখন অনেক আদিবাসী মেয়ে পুরুষের সমাগম। একটু পরেই নাচ গানের আসর বসল ওদের। মালতী ও আমার জন্য একটু উচ্চস্থানে পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা হলো।

আমরা উচ্চস্থানে বসে ওদের নাচ গান দেখতে লাগলাম। দলে দলে হরিণ ও হরিণীর দল তখন সর্বত্র বিচরণ করছে। তাদের চোখের আলোয় আরও আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। কিন্তু যাদের জন্য আসা সেই পঞ্চকন্যারা কোথায়?

হঠাৎই বিভিন্ন বাদ্যের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল প্রাঙ্গণের সর্বত্র। মাথায় সর্পমুকুট পরে দুলে দুলে নেচে মঞ্চে এল পঞ্চকন্যারা। সাপুড়ে বাঁশি বাজিয়ে সে কী উদ্দাম নৃত্য। তার চেয়েও যা বিস্ময়কর তা হলো ওই মৃগনয়না পঞ্চকন্যাদের চোখও হরিণের চোখের মতো জ্বলছে। তারা যেদিকে তাকাচ্ছে সেদিকেই আলোর দ্যুতি।

আমি নিজেই এবার শক্ত করে মালতীর হাত ধরলাম। বললাম, 'এ কী দেখছি? এরা কি জাদুকরী?'

মালতী বলল, 'না। এরা এমনই। তোমাকে চমক দেবে বলেই বলিনি। সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এরা এমনই হয়ে যায়। দিনমানে এরা আবার যা কে তাই। আর সেজন্যই এরা গুহাবাসী। অথচ ওদের মা কিন্তু স্বাভাবিক।'

বিস্ময়ে আমার চোখে তখন পাতা পড়ছে না। রাতের অন্ধকারে চোখ জ্বলে চতুষ্পদ জন্তুদের চোখে ফসফরাসের প্রভাবে। কিন্তু মানুষের?

এক সময় সর্পনৃত্য শেষ হলে ওরা যোগিনীর বেশ ধরে গানে মাতল। গান তো নয়, যেন অপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটে গেল একটা। সুরের জাদুতে মন প্রাণ ভরে গেল।

মালতী বলল, 'এদের মতো এই রূপ, এমন সুরেলা কণ্ঠর কণামাত্রও যদি পেতাম।'

'আমিও তো তাই ভাবছি। এরা যদি রাতমোহিনী না হতো তাহলে –।'

'আমিই এদের একজনকে মালার মতো গেঁথে দিতাম তোমার গলায়।'

আমি হেসে বললাম, 'যা হবার নয় তা নিয়ে অন্য চিন্তা ভাবনা করে লাভ কি? ভোরের আলো ফুটে উঠলেই এদের মায়া ত্যাগ করে নেমে পড়ি চলো। তবে এখানে এসে অভিজ্ঞতা যা হলো তা কিন্তু কখনও ভুলব না।'

প্রায় সারা রাত ধরেই চলতে লাগল ওদের অনুষ্ঠান। ভোর হতেই একে একে সবাই ফিরে চলল যে যার কুলায়। সে রাতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও আমরা কিছু খাইনি।

ভোরে বিদায় নেবার মুহূর্তে পঞ্চকন্যার জননী আমাদের দু'জনের জন্য বেশ কিছু নাড়ু হাতে ধরিয়ে দিলেন। মালতীর সঙ্গিনীরা এবং আরও কয়েকজন সশস্ত্র আদিবাসী সঙ্গ নিল আমাদের। কেন না রোদ না ওঠা পর্যন্ত পাহাড় ও বনভূমি কোনও সময়েই নিরাপদ নয়।

আমাদের অবতরণকালে বেশ কিছুটা পথ জননী এগিয়ে এলেন তাঁর কন্যাদের নিয়ে। ওরা সবাই হাত নেড়ে বিদায় জানালো আমাদের। তাদের মধ্যে একজনই শুধু ছিল না। সে হলো কোয়েলিয়া।

বিশেষ রচনা

অ্যানিমেশন ও ওয়াল্ট ডিজনি

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে চলে গিয়েছে সান্টা ফে যাওয়ার রেলপথ। রেলপথ পেরনো আরও দূরের ধু-ধু প্রান্তর, আমেরিকার কান্ট্রি সাইডের অন্যান্য জায়গার মতোই যেন প্রকৃতির হাতে আঁকা রং-ছবি। সময়টা ১৯০৯। বালক বয়স, তখন হাতে গোনা আট মিকি মাউস কার্টুন চরিত্রের কিংবদন্তি স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিজনির। চারিদিকের রংবেরং-এর রং লেগেছিল বালক ডিজনির মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ক্যানভাসে। মনের তাগিদেই ছবি আঁকতে কখন যেন শিখে গিয়েছিলেন তিনি। জলরং, ক্যানভাসে তেলরং আর অবশ্যই, খবরের কাগজে বা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কার্টুন ছবিগুলো বেশ হুবহু আঁকতে পারতেন তিনি। পরের বেড়ে ওঠার বয়সের সাথে সাথে এই কার্টুন বা অ্যানিমেশনের দুনিয়ায় তিনি নিজের ইতিহাস নিজেই লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

এখন তো বিভিন্ন চ্যানেলে হাজারও কার্টুনচিত্রের চরিত্রকে বর্ণিত করে কত না কত অ্যানিমেশন ছবি দেখানো হয়। সময়ের সাথে আজকের দিনে এই অ্যানিমেশন ছবিগুলোর অনেক প্রযুক্তিগত বিবর্তন ঘটেছে, আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে সায়েন্স ফিকশন, সীমাহীন নানা অলৌকিক কল্পনা নির্ভর ছবি বা ব্যাটম্যান, সুপারম্যানদের মতো বলশালী ও দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালন সংক্রান্ত নানা কার্টুন চরিত্র ও অ্যানিমেশন ছবিগুলো খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে। খুব স্বাভিকভাবেই কল্পনার দরজা অনন্ত অসীম দৃশ্যাবলিকে চলমান রংচঙে ছায়াচিত্রের অকল্পনীয় রূপদান নিঃসন্দেহে দর্শকদের চোখ টেনে নেয়। স্থিরচিত্রের থেকে চলমান বস্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাড়াতাড়ি। ছোট থেকে বুড়ো সবারই পছন্দ অ্যানিমেশনের সিনেমা। এগুলো তো প্রাথমিকভাবে মুভিং ইমেজ। তাই, বিশেষ ধরনের কণ্ঠস্বর ব্যবহার, শব্দবৈচিত্রের ক্ষেত্রে সিনেমার যাবতীয় শর্তাবলি পালন করে আজ অ্যানিমেশন ছবিও দৃশ্যজগতের আকর্ষণীয় এক ধারায় নিজেকে উপস্থাপিত করতে পেরেছে।

বাস্তবিক অর্থে অ্যানিমেশন বলতে বোঝায় এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও আকৃতি, গড়ন বা চরিত্রকে নিজের মতো সাজিয়ে তার মধ্যে গতি আনা। এখন অধিকাংশ অ্যানিমেশন ছবি তৈরি হয় কম্পিউটার নির্ধারিত রূপকল্পের মাধ্যমে, যাকে আমরা বলি Computer Generated Imagery বা CGI। এখন ছবি আঁকা অ্যানিমেটেড ছবিগুলো বিভিন্ন ডাইমেনশানেও চরিত্রায়ন করা যায়। ডিজনি যে সময়ে তাঁর অ্যানিমেশন ছবি

তৈরিতে বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন, তখন তো কম্পিটারের কোনও প্রক্রিয়া ছিল না! ধৈর্য, পরিশ্রম, সময়, অর্থ আর সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছিল ওয়াল্ট ডিজনি-কৃত ক্ল্যাসিক অ্যানিমেশন ছবিগুলো। স্বচ্ছ সেলুলয়েড স্ট্রিপের ওপর প্রতি ফ্রেমের ছবি আঁকতে হতো। এক সেকেন্ডের সময়ের নিরিখে তাতে চলমান গতি আনতে হতো শুটিংয়ের সময়ে। যদিও, ছবিতে শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি ছিল আর সব সাধারণ সিনেমার প্রায়োগিক কৌশলের মতোই। ১৯২০ সাল থেকে তাঁর যে সৃজনী ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখে এসেছি, ১৯৬৬ সাল অবধি আমৃত্যু তিনি তাঁর অ্যানিমশান শিল্পকে উৎকর্ষতার দিক থেকে এমন উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, আজ এত বছর বাদেও, এত কাজ পরেও অ্যানিমেশনের ছবির সাথে ওয়াল্ট ডিজনির নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। যেন একে অপরের পরিপূরক। অথচ পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত।

মানুষের মনের খুব ভেতরে নিশ্চয়ই এমন কোনও জায়গা আছে, যেখানে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৃশ্যকল্পের উৎপত্তি হয়, আর নানাভাবে সেগুলোর প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে তারা। এগুলো মানুষের আদি অকৃত্রিম মনোজগৎ থেকে উৎসারিত শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশই বলা যেতে পারে। আধুনিক অ্যানিমেশনের বয়স নয় নয় করেও শতবর্ষের আগে পরে। কিন্তু সামনে দেখা কোনও চলমান বস্তুকে কিভাবে শুধুমাত্র কিছু পারস্পরিক পর্যায়ক্রমিক ফ্রেমের মাধ্যমে সেই বস্তুটির গতিশীলতাকে চিত্রবদ্ধ করে রাখা যায়, তার প্রকাশ হাজারও শতাব্দীর আগেই ঘটেছিল। ঘটিয়েছিল ইরান দেশের দক্ষিণপ্রান্তে সিস্তান আর বালুচিস্তান প্রদেশের মাঝে হেলমন্দ নদীতীরে খুঁজে পাওয়া এক লুপ্ত সভ্যতার মানুষজন। এক প্রাচীন সভ্যতা, ইতিহাস যাকে চেনে শহর-এ সুখতে বা Burnt City Civilization হিসাবে। কে জানে কোনও এক অজানা শিল্পীর মনমাঝে ঠাঁই পেয়েছিল গাছ থেকে হরিণের পাতা খাওয়ার গতিকে বোধহয় টুকরো ফ্রেমে পরপর সাজালে বোঝানো যায় যে হরিণটি চলমান আর এভাবেই ওরা গাছ থেকে পাতা খায়। অ্যানিমেটেড ফ্রেমের এটাই বুঝি প্রথম প্রামাণ্য নিদর্শন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সে সভ্যতা আজ আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে শিল্পীর আঁকা সুচারু নিদর্শনটি।

চার হাজার বছর আগে নীল নদীতীরে মিশরীয় সভ্যতাতেও দেখা যায় ম্যুরাল চিত্রে অঙ্কিত মানুষের মল্লযুদ্ধের পারস্পরিক দৃশ্য সম্বলিত ধারাবাহিক ছবি-ধারা। ইতিহাসবিদেরা বলে থাকেন, এ ধরনের সুপ্রাচীন চিত্রকলা আসলে মানুষের কল্পনার প্রযুক্তির এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, ইংরেজিতে যাকে বলে imagine technology। আর এই ইতিহাসই পথ দেখায় অনাগত ভবিষ্যৎকে, সেটাই আধুনিক মনন গঠনের রূপরেখা তৈরি করে দিয়ে যায়।

নবজাগরণ হয়। ফ্লোরেন্সিয় জাগরণ। ইতালিয় নব জাগরণ। সেরা শিল্পী লিওনার্দো। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। যাঁর আঁকা মোনালিসা আজও মানুষকে প্রশান্তির আনন্দ দিয়ে যায়। কত রাত অন্ধকারের মাঝে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করে পেশি নিয়ে গবেষণা করে ছবি এঁকেছেন তিনি– কেমনতর গঠন তবে মনুষ্য শরীরের? তাঁর একটি আঁকায় দেখা যায় সেই পেশির সঞ্চালনের পারস্পরিক ধারাবাহিক ভঙ্গিমা। হাত, কাঁধ আর গলার গতিপ্রবাহ। আধুনিক অ্যানিমেশনের বোধহয় এটাই প্রথম চিন্তা। এরপর প্রযুক্তি

এগিয়েছে। তালে তাল মিলিয়ে বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে আধুনিকতার নিরিখে। ১৮৩২ সালে যোসেফ প্লেটু ফেনাকিস্টোস্কোপ বলে একটি ঘূর্ণায়মান চাকা তৈরি করেন। চাকাটির মধ্যে বেশ কয়েকটি ফ্রেম তির্যক করে আলাদা ভাগে বিভাজিত করেন। বিষয় হিসাবে ছোট্ট একটা থিম বেছে নেন– লাল জামা পরা এক লোক একট টিউবওয়েল পাম্প করছে। প্রতিটি তির্যক ফ্রেমে লোকটির টিউবওয়েল পাম্পের ছবিটি পরপর ঘটে যাওয়া গতির action-এর হিসাবে একটু একটু করে পারস্পরিক চলমানতার ছবি এঁকে গোল চাকাটি ঘুরিয়ে দিলেন। চোখের সামনে যেন এক মায়াবি ইমেজের রূপকল্প ভেসে উঠল। যত চাকা বনবন করে ঘোরে, ততই মনে হয় যেন গোলাকার ঐ বৃত্তের ভিতর অঙ্কিত লাল জামা পরা মানুষটিও যেন ঘনঘন টিউবওয়েলের হাতল টিপছে। ইতিহাসবিদেরা মনে করেন এই ফেনাকিস্টোস্কোপই হলো আধুনিক অ্যানিমেশনের প্রথম পূর্বসূরি। ১৮৩৩ সালের স্ট্রোবোস্কোপ, ১৮৬৮-তে কানাওগ্রাফ আর তারও বছর দশেক পরে প্র্যাক্সোনোস্কোপ এধরনের মজার ছবি-ধারা যেন অনাগত ভবিষ্যৎকে ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দিয়ে যায়– "ওহে, তৈরি থাকো, ল্যুমিয়ের ভাইদের মুভি বায়োস্কোপ মানুষের জীবনপ্রবাহে শীঘ্রই চলে এল বলে। দেখো! তারই হাত ধরে একদিন ঠিক চলে আসবে অ্যানিমেশন সিনেমাও। কার্টুন চিত্ররীতিতে ধারাবাহিক বিন্যাসে কালের নিয়মে চলেই আসবে অ্যানিমেশন।"

প্রথম দিকের অ্যানিমেশন ছবিগুলো অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি হতো, তাই তাতে চমক থাকলেও গুণগত উৎকর্ষতার খুব একটা শ্রীবৃদ্ধি ঘটত না। এই প্রক্রিয়া 'থিয়েটার অপটিক'বলে পরিচিত ছিল। সেটা ১৮৮৮ সাল। এমিলে রিনাউড এই থিয়েটার অপটিকের স্রষ্টা। তাঁর নির্মিত অ্যানিমেশনগুলোর দৈর্ঘ্য হতো ১০ থেকে ১৫ মিনিটের, অঙ্কিত চিত্রের সর্বমোট ফ্রেম থাকত ৩০০ থেকে ৭০০টি। মুভি ক্যামেরায় সেলুলয়েডের বর্ণিত বায়োস্কোপের সচল জীবনের হদিশ পাওয়ার বেশ কয়েক বছর বাদে, ১৯১৪ সালে শুরু হলো অ্যানিমেশন

সিনেমার নতুন এক প্রথা। ‘সেল’ তৈরি হতো সেলুলোজ নাইট্রেট আর ক্যাম্ফারের সংমিশ্রণে। ‘সেল’ এর ফিতের স্বচ্ছ প্লেটে একই রকমের পশ্চাৎপট অঙ্কন করে গতিশীলতার স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার জন্য ফ্রেমের অনুপাত কমিয়ে ‘সেল ফিতে’-র ওপর আঁকা হতো চরিত্রের ছবি। এই প্রক্রিয়ায় নির্মিত ‘কর্ণেল হীজা লায়ার’ প্রথম অ্যানিমেশন কার্টুন ছবি। ওই বছরেই উইনসর ম্যাককে তৈরি করেন ‘গার্তি - দ্য ডাইনোসোর’ অ্যানিমেশন ছবিটিও।

অ্যানিমেশনের কার্টুন চিত্ররীতি ক্রমাগত জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল। সাধারণ গল্পভিত্তিক সিনেমা মানুষকে মোহিত করেছিল। অ্যানিমেশন ছবিগুলো মানুষকে নিয়ে গেল সেই কল্পলোকের জায়গায়, যেখানে সাধারণ সিনেমার দৃশ্যায়ন কখনই পৌঁছাতে পারবে না। এ তো গেল অ্যানিমেশন ছায়াছবির বিবর্তনের গোড়ার কথা। ১৯১১ সালের কথা বলি, যখন ওয়াল্ট ডিজনির বয়স সাকুল্যে দশ। আমেরিকার মিসৌরি প্রদেশের কানসাস সিটিতে বেনটন গ্রামার স্কুলে সহপাঠি বন্ধু ছিল ফেইফার। আর সব ওই বয়সের কনিষ্ঠদের মতো তাদের পৃথিবীটাও রঙে আঁকা রামধনুর মতোই ছিল। বেশ মজা হতো যখন দুই বন্ধুতে মিলে ফরাসী দেশের ভ্রাম্যমাণ রঙ্গমঞ্চ ‘ভদেভিল’-এর মনরঞ্জিত প্রদর্শন দেখতে যেত। ‘ভদেভিল’ রঙ্গমঞ্চ ভাগ করে নিত নানা চিত্তাকর্ষক চরিত্র যাঁদের কেউ দেখাতেন ম্যাজিক, কেউ পশু প্রদর্শনী, কেউ বা শোনাতেন হুল্লোড়ে গান। রোজ দুজনের রুটিনে থাকত ভোরে উঠে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাইমস কাগজের হকারগিরি। ওই শহরেরই একটি আর্ট স্কুলে থাকত শনিবারের আঁকা শেখার ক্লাস। বাবা এলিয়াস ১৯১৭ সালে শিকাগো চলে গেলে ওয়াল্টরাও সপরিবারে ওখানেই চলে গেলেন। আঁকার ভারি নেশা তখন কুরে খাচ্ছে ওয়াল্ট ডিজনিকে। ‘শিকাগো অ্যাকাডেমি অব ফাইম আর্টস’-এ তিনি ভর্তি হলেন চিত্রাঙ্কনের আরও নতুন প্রয়োগগত কৌশল শেখাবার তাগিদে। উৎসাহ ছিল আরও অনেক ব্যাপারেই। তখন তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ! দেশের হয়ে যুদ্ধ করার জন্যও মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলো বয়স। কম থাকায় হলো না, তবু অ্যাম্বুলেন্সের চালক হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছিলেন ডিজনি। মোড়কে ঢাকা ডিজনির কল্পলোকের মনক্যামেরা অনাবৃত হলো। কার্টুন চিত্রকলা তখন তাঁর রক্তে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছে। সমকালীন ‘সেল’ কার্টুনের জোয়ার তখন পৃথিবীময়। ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউডেও সে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। নতুনত্বের সন্ধানী তিনি, তখন তাঁর কার্টুন অন্তপ্রাণ। চলতি হাওয়ার বিপরীত গতিরূপ। নতুন ভাবনা, নতুন সৃজনশীল মনন তখন তৈরি ডিজনির। তিনি জানতেন তিনি পারবেন। সেই অদম্য ইচ্ছেশক্তি আর সাহস বুকে নিয়ে তিনি তার ভাই রয়-এর সাথে ১৯২১ সালে তৈরি করলেন অ্যানিমেশন স্টুডিও ‘লাফ ও গ্রামস’। সহসঙ্গী আরেক মেধাবী ছিলেন বটে, কার্টুনিস্ট ইওয়েরর্কস। পরে তাঁরও অ্যানিমেশন জগতে বেশ নামডাক হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত ‘লাফ ও গ্রামস’ স্টুডিওটি অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগে বন্ধ হয়ে গেল বছর দু’য়েকের মধ্যেই। হতাশ ডিজনি পাততাড়ি গুটিয়ে হলিউডে পাড়ি জমানোর প্রস্তুতি নিলেন।

অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রি তখন রমরমিয়ে চলছে নিউইয়র্কে। কিন্তু ডিজনি গেলেন হলিউডে। এক নতুন চরিত্র তখন তাঁর ভাবনার ক্যানভাসে এসে গিয়েছে। তিনি বানাবেন অ্যালিসকে - ঐশ্বরিক রূপসুন্দরী চরিত্রটির ‘‘আশ্চর্যভূমি’তে ভ্রমণ– রূপকথার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড’। বাস্তবের পটভূমি সাধারণ সিনেমায় বানালেও সেই রূপকথাটির চিত্রলেখা খুবই বেমানান হতো। যদি সেই কল্পলোকের সাজানো অক্ষরগুলো চিত্রায়িত করা আদৌ সম্ভব হতো, সেই অসাধ্য সাধন করতে পারত একমাত্র রঙের রেখার অ্যানিমেশনেই। সেটা বুঝেছিলেন তিনি। তাই রূপকথার সেই গল্পগাঁথা নিয়েই বারবার কার্টুন ছবি বানিয়ে গিয়েছেন ওয়াল্ট ডিজনি। ডিজনির কাজের একটা বিশেষত্ব ছিল। তিনি এই ধরনের রূপকথার গল্প অ্যানিমেশন করার আগে সঠিক নায়ক বা নায়িকাকে মন থেকে কল্পনায় না এঁকে চরিত্র অনুযায়ী গড়ন খুঁজে তাকে cast করতেন, তার আদলেই তৈরি হতো অ্যানিমেটেড চরিত্রটির মুখাবয়ব। অ্যালিসের চরিত্রের আদল খুঁজে পেয়েছিলেন ডিজনি শিশুশিল্পী ভারজিনিয়া ডেভিসের সাথে। ডাবিং শিল্পী হিসাবেও অ্যালিসের ভূমিকায় অভিনয় করল ডেভিস। ১৯২৭-এ শেষ হলো ডিজনির প্রথম ঐতিহাসিক কার্টুন এই ছবিটি। সময়ের পরিসরে মাত্র তা সাড়ে বারো মিনিট হলেও বিদগ্ধমহল এই ছবিটির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলে ডিজনির জাগ্রত সত্তাকে, যিনি তাঁর মেধা, দক্ষতা আর সৃজনশীলতাকে সঙ্গী করে অ্যানিমেশন ছবির জগতে এক প্রবাদপুরুষ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক শিল্পী। অ্যানিমেশন মানেই যেন ওয়াল্ট ডিজনি– এমনই একটা মিথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর তামাম দর্শকদের কাছে। কারণ, এর ঠিক পরে পরেই তিনি তাঁর স্বপ্নের ডানার ওপর ভর করে তৈরি করেছিলেন সেই যুগান্তকারী ছোট্ট ইঁদুরের চরিত্র –‘মিকি মাউস’ –যা আজও সমানভাবে জনপ্রিয় আর সমাদৃত শিশু থেকে আপামর বৃদ্ধদের মাঝে।

''আমি কেবল আশা করি যে আমরা কখনই একটি জিনিসের থেকে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারি না – তাই এটি একটি ইঁদুর দিয়েই শুরু হয়েছিল'' –ওয়াল্ট ডিজনি বলেছিলেন তাঁর মিকি মাউসের সৃষ্টি নিয়ে।

মিকি মাউসের সূত্রপাত ডিজনিরই সৃষ্ট কার্টুন চরিত্র– সৌভাগ্যবান খরগোশ 'অসওয়াল্ড'-এর থেকে। ইওয়ের্কস প্রাথমিক রূপটি দিয়েছিলেন মিকির। ডিজনিরই অনুরোধে। অনেক প্রাণী তালিকায় ছিল। কুকুর, বিড়াল, খরগোশ– এমন সব কল্পিত চিত্রচরিত্র। শেষমেশ ইঁদুরের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল। মিকি হয়ে উঠল 'মিকি মাউস'। হাবে ভাবে, চালে চলনে মানুষটি বটে– লাল টুকটুকে শর্টস পায়ের মাপের চেয়ে বড় হলুদরঙা জুতো আর হাতে সাদা দস্তানা। ১৯২৮ সালে নির্মিত 'স্টিমবোট উইলি' ছবিটিতে দর্শকদের সাথে ডিজনি প্রথম আলাপ করালেন মিকি মাউসকে। যদিও মিকির প্রথম দুটি টেস্ট-রান ছবি কারুর মনঃপূত হয়নি। প্রথমে নাম দেওয়া হয়েছিল মর্টিমার মাউস। ডিজনির স্ত্রী লিলিয়ান নাম রাখলেন মিকি। মিকি প্রাণোচ্ছল। মিকি রসিক। মিকি ছটফটে মজাদার। স্টিমবোট উইলি. ছবিটিতে মিকির তৃতীয় আবির্ভাবে হইচই পড়ে গেল পৃথিবীজুড়ে। ছোটো থেকে রসিক বুড়ো মিকির প্রতি তাদের ভালোবাসা উজাড় করে দিল।

ছবি করেছেন ডিজনি পরে তো অনেক। অনেক জনপ্রিয় রূপকথা অ্যানিমেশনে চিত্রায়িত করে গিয়েছেন 'স্নো হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফস', 'পিনোচিও' 'বাম্বি' 'সিন্ডারেলা'– এমন কত কি! টেকনিকালার পদ্ধতি অ্যানিমেশন ছবিতে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ওয়াল্ট ডিজনি। টেকনিকালার প্রক্রিয়াটি হলো রঙিন মুদ্রণ তৈরি করতে ডাই-ট্রান্সফার কৌশল ব্যবহার করার এক চিত্র-প্রক্রিয়া। এভাবেই তাঁর সৃজনশীল সত্তাকে বিকশিত করে গিয়েছেন ডিজনি। অনেক মানুষের জীবন ছোট। কর্মজীবন কিন্তু অনেক বড় থাকে কয়েকজনের। ডিজনি তাঁদের মধ্যে একজন। সেই কোন ছোটকালে ফেলে আসা নদী-পাড়, মাঠ-প্রান্তর পেরনো ছবির মতো সুদৃশ্য অনন্তে চলে যাওয়া রেলগাড়ি, এমন সব যেন অ্যালিসের মতোই একটা স্বপ্নের ওয়ান্ডারল্যান্ড তৈরি করেছিল ডিজনির মনে। শিশু মন না থাকলে কোনও শিশুকেই বা তিনি তাঁর অ্যানিমেশন চিত্রের মাধ্যমে নিয়ে যেতে পারতেন রূপকথার নানা দেশে? কেমন করেই বা প্রজন্মান্তরের শিশু কিশোরদের সাথে আলাপ করিয়ে দিতে পারতেন? ১৯৬৬ সালে ৬৫ বছরের জীবনের প্রভাতকাল শেষ হয়ে যায় তাঁর। কিন্তু 'মিকি' ম্যাসকট হিসাবে ঘুরে ফিরে আসে খেলাধুলার আঙিনায়। 'মিকি মাউস ক্লাব' তৈরি হয়েছে। রূপকথার মতোই শিশু কিশোরদের প্রমোদভূমি 'ডিজনিল্যান্ড' তৈরি করে গিয়েছেন। এখন সারা পৃথিবীর অনেক দেশেই ডিজনিল্যান্ডের বিস্তার প্রমাণ করে, ডিজনির দেখানো স্বপ্নতটে প্রমোদতরী ভাসাতে সবাই চায় – কারণ আনন্দের স্বপ্নসফরের রূপক সবার কাছেই এক। যা তিনি চেয়েছিলেন বোঝাতে নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে। তাঁর ছেড়ে যাওয়া অ্যানিমেশনের আনন্দবাণী এখনও বহন করে চলেছে ডিজনি সাহেবের উত্তরসূরিরা।

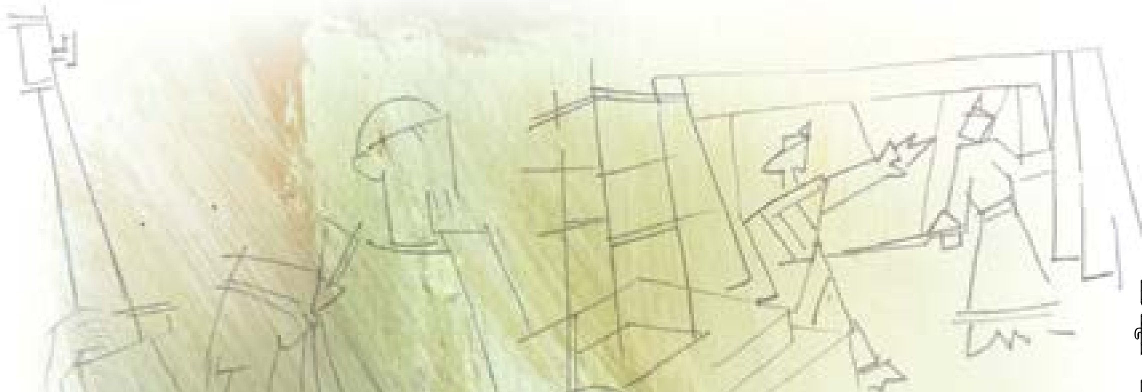

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

অনেক-সে দূরে গ্রামটি আমার

র মে শ পু র কা য় স্থ

একবার শুধু হেঁটে যাব সেই আলপথ ধরে
যেখানে চাঁদের রুপালি জোছনা
নিবিড়তা বোনে কিশোরী ধানের পাতায় পাতায়
গহন সবুজ।

ডানার পালকে মুখ গুঁজে হাঁস একা একা ভেজে
বৃষ্টির জলে, একবার শুধু
দেখে নেব চুপি অশথতলায় অশরীরী ভয়
ছমছম করে।

একবার শুধু চালতা বাগানে বড় পুকুরের
শীতল জলটি জ্যৈষ্ঠ-দুপুরে
তোলপাড় করে সাথিদের সাথে সাঁতার কাটব
উথাল-পাথাল।

একবার শুধু সালামের বাড়ি মৃদু স্বাদ নেব
ভাঙা সানকিতে পান্তা ভাতের।
তাঁতিপাড়া দিয়ে দোলতলা ছুঁয়ে পুতুল নাচের
সাজঘরে যাব।

বিসর্জনের জলদর্পণে সরস্বতীর
মুখখানি দেখে বিষণ্ণ হব
ইসকুল মাঠে বন্ধুরা সব শিমুল তলায়;
শিমুল তলায়

কত না গল্প! নাগরিক মন হারিয়ে এসেছে
অনেক-সে-দূরে গ্রামটি আমার
একবার শুধু দেখে নেব শেষ পউষালি রোদ
পাকা ধানশিষে।

বেনেখড়ি

জ য় না ল   আ বে দি ন

আসবে নাকি আমার গাঁয়ে
নেইকো কড়াকড়ি
ঝাঁকড়া মাথায় বিছিয়ে শরীর
দাঁড়িয়ে বেনেখড়ি।
উত্তরে বিল দক্ষিণে মাঠ
পাহারা দেয় গাছে
হাত ইশারায় ডাকবে তোমায়
পুকুর ভরা মাছে।
আজান সুরে জাগবে যে ভোর
উঠবে পাখি গেয়ে
কাশফুলেরা খুশি হবেই
তোমায় কাছে পেয়ে।
ভরদুপুরে দিঘির পাড়ে
রবিবারের হাট
ধানের সে শিষ মাথায় নিয়ে
খুশির এ তল্লাট।
বারো মাসে তেরো পার্বণ
হয় যে উদ্‌যাপন
রাখালিয়া বাঁশির সুরে
উদাস হবেই মন।
সাঁঝ নামতেই আসবে ভেসে
বাউল ভাইয়ের গান
এ সব দেখে হাসবে তুমি
নাচবে তোমার প্রাণ।

লালঘোড়া

প ল্ল ব কা ন্তি   রা জ গু রু

তোমার জন্য এনেছি ঘোড়া
রঙটি তার গাঢ় লাল
বাজার থেকে এলো ছুটে
এই খানে গতকাল

তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাবে
তেপান্তরের মাঠে
তেষ্টা পেলে যাবে সে
উশ্রী নদীর ঘাটে

এই ঘোড়াটা ভীষণ তেজী
এবং তেমনই গুণী
গানও গায় তোমার জন্য
অবাক হয়ে শুনি

সেই ঘোড়াটা ছোটে যখন
কেঁপে ওঠে গাছ মাটি
ঘোড়ার পিঠে দুলতে দুলতে ভাবো,
এই নাগরদোলাটাই খাঁটি।

ননী ফনী ও গঙ্গারাম

অমর মিত্র

অঙ্কন ■ সঞ্জয় কাঞ্জিলাল

গঙ্গারামকে চেন নাকি ? সেই যে গঙ্গাপুরের গঙ্গারাম ঘোষ। গ ঘ। গ ঘ নামে তাকে গঙ্গাপুর থেকে ইছাইগঞ্জ, কে না চেনে ? কেন চেনে ? তার ভীষণ ভূতের ভয়। শুধু ভূত নয়, ডাকাতের ভয়। শুধু ভূত আর ডাকাত নয়, চোরের ভয়। আসল কথা হলো, ভূত ডাকাত এবং চোর, তিনকেই তার একরকম মনে হয়। ডাকাত আসে রণপায়ে ভর দিয়ে তাল গাছের মতো সিড়িঙ্গে হয়ে, মুখে তার মুখোশ, হুমহুম করে হাঁক মারে গঙ্গারাম দরজা খোল। সিসম খুল। আলিবাবার গুহার দরজার মতো মন্ত্র বললেই ভয়ে গঙ্গারাম দরজা খুলে দিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে কাঁটালতলায় বসে থাকে। আর চোর! সেই চোরের মুখে গামছা বাঁধা, গায়ে সর্ষের তেল চুপচুপ, ধরতে গেলে পিছলে যায়। বলে চুরি করতে দে, তারপর কথা বলিস, নইলে চিরকালের মতো মুখ বন্ধ করে দিয়ে যাব, কথা কইতে পারবিনি। এ বাদ দিয়ে ভূত আর ভূতুম তো আছেই– রাম রামরাম। গা সিরসির, দাঁত কনকন, চোখ ছলছল হলেই ধরা যাবে ভূত এল কিংবা ডাকাত এল। আর গলা ধরে গেলে চোর।

গঙ্গাপুরের গঙ্গারাম ভীতু মানুষ। এবং কিপটে মানুষ। কেমন কিপটে, না জলে বাতাসার ছায়া ফেলে সেই জল শরবৎ জ্ঞানে খায়, বাতাসা তুলে রাখে বোয়েমে। কিন্তু বোয়েমে বাতাসা নিজে নিজেই ভাঙতে থাকে। গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায়। তখন সেই গুঁড়ো দিয়ে ভাত মেখে খায় গঙ্গারাম। এক বাতাসা কত কাজে লাগল। সে ভাত খায় বিকালে। দু'বেলার খাওয়া একবেলায়। মাঝে মধ্যে ঘটি ঘটি জল খেয়ে পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়ে আর হিসাব করে ব্যাঙ্কে কত আছে আর সিন্দুকে কত আছে। খামারে কত ধান আছে আর আলু আছে। এহেন হাড়-কেপ্পন গঙ্গারামের বউ গঙ্গামণি তার কিপ্টেমির ঠেলায় বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। তার বাবা, মানে গঙ্গারামের শ্বশুর নদীরাম ঠিক উলটো, তার ঘরে রোজ বিশ-পঞ্চাশ লোকের পাত পড়ে। কাতলা মাছ, পারসে মাছ, খাসির মাংস, হাঁসের ডিমের কালিয়া, দই সন্দেশ অঢেল। খাও আর ঘুমোও। নদীরামের অনেক ভুঁই, মানে জমি। অনেক ফসল হয়। সে নিজেও খাটাখাটনি করে চাষিদের সঙ্গে। নদীরামের বউ মানে গঙ্গারামের শাশুড়ি আবার এসব পছন্দ করেন না। তাঁর নাম গম্ভীরাময়ী। তিনি বলেন, এমন ভাবে খরচাপাতি করলে থাকবে নাকি কিছু ? এপাড়া সেপাড়ার লোক এসে খেয়ে যায়, চোরে খেয়ে যায়, ডাকাতে খেয়ে যায়, ভূতে খেয়ে যায়। গম্ভীরাময়ী বলেন,

থামো, জামাইকে দেখে শেখ, জামাই এক কেজি চাল এক মাস খায় নাকি। কিন্তু নদীরাম তাঁর বউকে পাত্তাই দেন না। পাশে পেয়েছেন মেয়ে গঙ্গামণিকে। গঙ্গামণি খুব খেতে ভালোবাসে, খাওয়াতে ভালোবাসে। যতদিন ছিল শ্বশুরঘরে, চুরি ডাকাতি কিছুই হয়নি। চোরেরা পাত পেড়ে খেয়ে যেত দুপুরে, কই গো ঠাইরেন, দিন, কী দেবেন দিন।

গঙ্গামণির এই দানসত্র খোলা সহ্য করতে পারত না গঙ্গারাম। যে দুই চোর ননী আর ফনী, বিয়ের আগে তার ঘরে সিঁদ কেটেছে অনেকবার, ধমকে চোখ আর গোঁফ পাকিয়ে তার লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে গুনতি করে সব পয়সা নিয়ে গেছে, বোয়েম খুলে মড়মড় করে সব বাতাসা খেয়ে গেছে, তেতুল আর ভেলিগুড় নিয়ে গেছে, সেই চোর কি না, ঘি দিয়ে ভাত খেতে বসেছে বারান্দায়। হায় হায়, তার গোয়ালের গোরু, সেই গোরুর দুধ, সেই দুধের ঘি। এতদিন সে দুধ বেচে দিত, বিয়ের পর গঙ্গামণি তা দিয়ে দই পাতে, ঘি তৈরি করে। হবে কী ওসব? খেতে বুক ভেঙে যায় না গঙ্গারামের। শেষে সে গোরু বেচে দিল, গোলার ধান বেচে দিল, এক পো মানে আড়াইশো গ্রামের একটু কম চাল প্রত্যেক দিন কিনে আনতে শুরু করায়, গঙ্গামণি তাকে ছেড়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল। অমন লোকের সঙ্গে থাকে নাকি ?

মেয়ের ফিরে আসা একদম সহ্য হয়নি তার মায়ের। জামাই কত ভালো। এক পোয়া চাল দু'জনে দু'দিন খেলে কত টাকা বাঁচে। টাকা তো রাখতে হবে।

গঙ্গামণি বলে, কেন রাখতে হবে ?

ব্যাঙ্কের খাতায় বাড়বে।

বেড়ে কী হবে ?

লোকে খাতির করবে।

খাতিরে কী হবে মা।

সমাজে একটা স্থান হবে।

গঙ্গামণি তার মাকে বলেছিল, কেউ খাতির করে না মা, তোমার জামাই পথে বেরলে, ছেলেরা ছড়া কাটে।

কী ছড়া ?

শুনলে তোমার চোখে জল আসবে মা।

আসুক জল, তুই গেলাস ধরিস, বল কাদের ঘাড়ে ক'টা মাথা, জামাই নিয়ে আ আর কুকথা।

গঙ্গামণি বলে, আমার নিজেরই যে পেস্টিজে লাগে মা, আমি হলাম নদীরামবাবুর মেয়ে, আমার স্বামীরে নিয়ে ছড়া কাটবে।

বল না দেখি, কেমন ছড়া।

গঙ্গামণি ছড়া কাটল,

এক কোয়াতে কয়টা রসুন, বল দেখি তুই কিপন।
এক পেঁয়াজের কয়টা খোসা, আপন বাপন, চাপন।
এক পোয়াতে কয়টি চাল, আর কতটা খুদ?
না খাওয়াতে আরাম বেশি, ষোল আনাই সুদ।

শুনতে শুনতে গম্ভীরাময়ী কী খুশি, বাহ, বাহ, কার এত ভাগ্যি যে রবি ঠাকুরের মতো কবিতা লিখে শুনায়।

ইস মা, তুমি কি রবি ঠাকুর জানো ?

জানব না কেন ? গম্ভীরাময়ী জোড়হাত কপালে ঠেকায়,

আশ্বিনের পুন্নিমে নিশি, মহা জাগরণ।
দেবলোকে বসি আছেন লক্ষ্মী নারায়ণ।।

গঙ্গামণি হা হা করে উঠল, ও মা মা, কী বলো, ও তো লক্ষ্মীর পাঁচালি।

হ্যাঁ, তাই তো, লক্ষ্মী ঠাকুর।

তবে যে বললে রবি ঠাকুর।

ঠাকুর তো, দুনিয়ার সব ঠাকুরই এক ঠাকুর, এমন জামাই আমার, সোনার চাঁদ, ছেড়ে এলি।

পেট ভরে না, না খেয়ে মরব নাকি। গঙ্গামণি মুখ ঝামটা দিল।

তোর আবার তোর বাবার স্বভাব, এত গুষ্টিকে খাইয়ে হবে কি ?

আহা তুমি তো ননী ফনীকে দেখনি মা, কিছুই খেতে পায় না।

খেতে পায় না তবে চুরি করে কী করে ?

গঙ্গামণি বলল, চুরি করতে পারলে তবে খেতে পায় মা।

অমন খাওয়ার দরকার কী ? বলল গম্ভীরময়ী, চুরি করে খাওয়া একদম ঠিক না।

তা তো জানি মা, কিন্তু উপায় কী, এক রাত্তিরে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ খড়খড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে, বুঝেছি ঘরে লোক ঢুকেছে যে কোনও উপায়ে...।

হ্যাঁ, গঙ্গামণির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আচমকা। গঙ্গারাম তো ঘুমোয় আর নড়চড় নেই। চোর ঢুকেছে ঘরে। গঙ্গাপুরে খুব চোরের উপদ্রব তা সে শুনেছে গঙ্গারামের কাছ থেকে। তার বিয়ের সব গয়না বড় পেতলের কলসিতে ভরে তাদের ঘরের মেঝেয় পুঁতে রেখেছে গঙ্গারাম। সেই মেঝের উপরে পালঙ্ক পাতা রয়েছে। পালঙ্কের নিচে যত হাড়িকুড়ি, ভাঙা বাক্স ইত্যাদি। লোকের মানে চোরের, মানে ডাকাতের কিংবা ভূতেরও জানার উপায় নেই কোথায় আছে গয়নাগাঁটি। গঙ্গারামের ব্যাঙ্কে বিশ্বাস নেই। ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয় প্রায়ই। কখনো কলকাতায়, কখনো মেদিনীপুরে, এদিকে সেই ডাকাত দলের আসতে কতক্ষণ। রণ পায়ে তারা তো বাতাসের বেগে ছোটে। সুতরাং মেদিনীপুরে ডাকাতি আর নদীয়ায় ডাকাতি একই কথা। গঙ্গামণি টর্চ হাতে পালঙ্ক থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়েছে। সপসপ শব্দ হচ্ছে। তালা গেলাস ঘটি বাটি কলসির আওয়াজ হলো যেন। সব গেল। চুরি হয়ে গেল। কাঁসার বাসন কোসন বাপের বাড়ি থেকে আনা। গঙ্গারাম বলেছিল সেগুলোও মাটির তলায় চালান করে দেবে। কিন্তু গঙ্গামণি তা করতে দেয়নি। সবই যদি মাটির তলায় থাকবে তাহলে আর বাপের বাড়ি থেকে আহ্লাদ করে আনা কেন? সে এনামেলের কানা উঁচু থালায় ভাত খেতে পারবে না। এনামেলের ঘটিতে জল খেতে পারবে না। গঙ্গারাম রাম, রাম রাম– এত কিপটে হয় মানুষ! কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে চোরে নিয়ে যাবে সব। হাতে একটা লাঠি নীল গঙ্গামণি। লাঠিটা চোর ডাকাত ভূত তাড়ানোর জন্য ঘরে রেখেছে গঙ্গারাম, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে চোরের গায়ে কিংবা ডাকাতের গায়ে লাঠির ঘা পড়েনি কোনোদিন। বরং তারাই গঙ্গারামকে লাঠি পেটা করে হারে-রে রে-রে করতে করতে কালিপটকা, দোদোমা ফাটিয়ে চলে গেছে। আজ লাঠি গঙ্গামণির হাতে। তার বেজায় সাহস। সেই সাহসেই আপত্তি গঙ্গারামের। ডাকাতের মার খেয়ে সে বুঝেছে সাহস মোটেই ভালো না। সাহস দেখালেই লাঠি পড়বে গায়ে পিঠে। বরং ডাকাত এক ঘা মেরে চলে গেলে অল্পের উপর দিয়ে যাবে। গঙ্গামণির খুব সাহস। ভূত ডাকাত চোর তার কাছে নস্যি। নাকে নিয়ে হ্যাঁচ্চো। একবার নাকি এক বেলগাছে বাস করা বেম্মদত্যি তাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিল। বেলগাছটি কোথায় তা বলবে না গঙ্গামণি। তো সেই

বেহ্মদত্যি ভূতকে সে এমন চোখ পাকিয়েছিল, বলেছিল, ত্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করলে বাবাকে বলে গাছের সব বেল পেড়ে নেব, তখন তুমি কী খাবে? ভূত ঠাকুর বেহ্মদত্যি হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে গাছে গিয়ে বসেছিল। কোথায় সে বেলগাছ? গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করলে গঙ্গামণি বলেছিল, বলা বারণ, তিনি আমাকে বারণ করেছেন, বেহ্মদত্যি তো বটে, তাঁর একটা পেস্টিজ আছে।

কিন্তু ভূত তো, মানুষ তো না।

গঙ্গামণি বলেছিল, সন্ন্যিসী ভূত, বেল খায় শুধু।

পাকা না কাঁচা ?

গঙ্গামণি বলেছিল, কাঁচা পাকা দুইই।

কাঁচা খেয়ে মুখ জুড়ে যায় না বেলের আঠায়? গঙ্গারাম জিজ্ঞেস করেছিল সরল মনে।

যায়, আমি বলেছি তখন গাছের গায়ে মুখ ঘষে নিতে।

বেলগাছের গায়ে?

তবে কোন গাছের গায়ে?

হায় হায় করে উঠেছিল গঙ্গারাম, গাছের গা ভর্তি কাঁটা, সেই গাছে মুখ ঘষবে!

কাঁটায় কিছু হয় না, কাঁটা তো তিনি লাগিয়েছেন, কেউ যাতে তাঁর ঘুম না ভাঙায়। বলে গঙ্গামণি শান্ত করেছিল গঙ্গারামকে। সেই গঙ্গামণি সাত ব্যাটারির লম্বা টর্চ এক হাতে অন্য হাতে লাঠি নিয়ে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দ্যাখে?

কী দ্যাখে?

কুপি জ্বলছে মেঝেয়। দুটি রোগা টিঙটিঙে লোক দুই থালা ভাত, ডাল, তরকারি, কাতলা মাছের কালিয়া নিয়ে বসে সপাসপ ভাত খাচ্ছে। গঙ্গামণি সব সময় বেশি রান্না করে। পথ চলতি লোকজনকে ডেকে খাওয়ায়। বাপের বাড়ির অভ্যেস। সে টর্চ মারল লাঠি হাতে, এই তোরা কারা ?

দুইজন হতচকিত হয়ে বলল, আমরা চোর, ননী আর ফনী, থালা-বাসন চুরি করতে ঢুকে দেখি এত ভাত তরকারি, তুমি মা জননী।

আর কী ? গঙ্গামণি চাপা গলায় বলল, চুপ করে খেয়ে নে, জেগে উঠলে হাঁউমাউ শুরু করে দেবে।

কাঁচা লঙ্কা আর প্যাঁজ কোথায় জননী ? ননী জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গামণিকে আর পায় কে ? হেরিকেন জ্বালিয়ে দুই রোগা লোককে তরিবৎ করে খাওয়ালো। শেষ পাতে দই মিষ্টিও দিল। পান সুপুরিও দিল। দুই চোরকে বলল, দিনে আসিস, খেয়ে যাস, না খেয়ে খেয়ে কী অবস্থা হয়েছে তোদের, লজ্জা করে না।

পরের দিন স্নান করে গাছের কলাপাতা কেটে লোকদুটি বারান্দায় উঠে বসে পড়ল, কই গো মা জননী, দাও, ভাত দাও।

গঙ্গারামের চোখ ছানার বড়ার মতো গোল্লাগোল্লা হয়ে গেল। কাদের খাওয়াচ্ছে তার বউ ? দুই চোর ননী ফনী। ঘি ঢেলে দিচ্ছে গরম ভাতে। তার গোরুর দুধ, সেই দুধের ঘি...।

মা শুনতে শুনতে বলল, সেই চোর কি এখেনে এসে পাত পেড়ে বসছে ?

গঙ্গামণি বলল, কী করবে, গঙ্গাপুরে ভাত নেই মা, সে লোক আবার এক পো চালে দু'দিন ভাত রাঁধতে আরম্ভ করেছে আর কাঁসার বাসন মাটির তলায় পুতে দিয়েছে।

গম্ভীরাময়ী চুপ। মেয়ের কথা শুনে তার মন গলেছে। বলল, তুই জামাইকে চিঠি লেখ খুকি, আসতে বল। মিষ্টি মিঠাই, আম জাম মাছ মাংস না খেলে হবে, অল্প হলেও খেতে হবে তো, গন্ধ শুঁকেও কাজ হয় খুকি!

'আসবে না বাড়ি ছেড়ে।' বলল, গঙ্গামণি, তার অর্থ হলো, গঙ্গারাম সেই গয়না আর কাঁসার বাসন মাটির নিচে পুঁতে রেখে বাড়ি ছাড়তে চায় না। পাহারা দেয় বাড়ি। চোর-ডাকাত এলে বলছে, সব নাকি গঙ্গামণি নিয়ে গেছে বাপের বাড়ি। ননী ফনী এসে সেই কথা বলে গেছে তাকে।

কিন্তু কী হলো হাড় কেপ্পন গঙ্গারামকে একদিন দুই চোর ননী-ফনী রাতের বেলায় কাঁধে নিয়ে তার গঙ্গামণির বাপের বাড়ি ইছাইগঞ্জে চলে এল। তিন ক্রোশ পথ, আসতে আর কত সময়? দুই চোর ননী-ফনী এখন খেয়েদেয়ে শক্ত সমর্থ হয়েছে। গায়ে জোর হয়েছে। চুরি ছেড়ে ডাকাতিই করবে ভাবে মাঝে মধ্যে, কিন্তু মা জননী গঙ্গামণির ভয়ে করে না। খাওয়া বন্ধ করে দেবে। গঙ্গাপুরে বাবু গঙ্গারাম না খেয়ে খেয়ে পাখির পালকের মতো হয়ে গেছে। দেখলে কষ্ট হয়। দুঃখ হয়। যক্ষের মতো বাড়ি পাহারা দেয় আর এক গরাস ভাত খায়। ননী-ফনী তাকেই ডাকাতি করে নিয়ে চলে এল, এই নেন মা জননী, না খেয়ে খেয়ে মরে যাবে বাবু গঙ্গারাম, দেখি আর বেদনা পাই, ওরে ঘি দিয়ে ভাত খাওয়ান দেখি, আমরা গিয়ে বাড়ি পাহারা দিই, কাঁসার বাসন, সোনার গয়না সব ঠিক থাকবে, বাবুরে ভালো করে মাছ মাংস দুধ ঘি, দেন দেখি।

এখন গঙ্গারাম পেটপুরে খাওয়া অভ্যেস করছে শ্বশুরবাড়িতে আর ননী-ফনী লাঠি হাতে তার বাড়ি পাহারায় থাকে। ননী খেতে এলে ফনী থাকে, ফনী খেতে এলে ননী থাকে। ননী ঘুমালে ফনী জাগে। ফনী ঘুমালে ননী জাগে।

পাচার

আশিস সান্যাল

অঙ্কন ■ শুভ্রনীল ঘোষ

আমার নাম আমিনা খাতুন। ডালটনগঞ্জ থেকে একটু দূরে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে ছিল আমাদের বাড়ি। বাড়ি মানে একটা খুপড়ি। দিনে সূর্য আর রাতে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ত ঘরের মধ্যে। বৃষ্টির দিনে কোনও মতে রক্ষা করতাম নিজেদের। শরীর গরম করতাম তুষের আগুনে।

সকাল হতে না হতেই বেরিয়ে যেতেন মা। শহরের কয়েকটি বাড়িতে বাসন মাজা, কাপড় কাচার কাজ করতেন। মাইনে পেতেন অতি সামান্য কিন্তু দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পেতেন। বাবা ফসল কাটার সময় ফসল কেটে কিছু পেতেন। তাছাড়া কিছু যব বা গম পেতেন। তার অতি সামান্য বাড়ি আসত। বাবার নাকি আর একটি সংসার ছিল। এই নিয়ে মা-বাবার মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে মাকে মারধরও করতেন। আমরা ছিলাম তিন ভাই আর দুই বোন। আমি ছিলাম সকলের ছোট। ভাইরা একটু বড় হতেই চলে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। শুনেছি, বড় দুই ভাই নাকি কয়লাখনিতে কাজ করে। উখড়ার কুলিবস্তিতে থাকে। বিয়ে করে বড় ভাই সংসার করছে। মেজভাই নাকি দুই মদেশীয় মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু কোনও বিয়েই টেকেনি। ছোট ভাই বাড়িতেই ছিল। বাড়ির কাজকর্ম দেখভাল করত। কিছু বাড়তি উপার্জনও ছিল তার।

একবার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এল একটি যুবক। নাম ফরিদ। দেখতে শুনতে বেশ ভালো। কথাবার্তায় বেশ তুখোড়। বেশ কয়েকদিন সে থেকে গেল আমাদের খুপড়িতে। প্রতিদিন বিকালে আমরা দুই বোন ও ছোট ভাই রাস্তায় হাঁটতে যেতাম। আবার কোনও কোনোদিন কোয়েল নদীর চড়ায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করতাম। গল্পগুজবে অধিকাংশ জায়গাজুড়ে থাকত বলিউডের তারকারা। একদিন ফরিদ বলল, 'জানিস আমিনা, রাখী তোদের মতই গরিব ছিল, কিন্তু এখন তার কত টাকা'।

'তাই নাকি?'

'তুই হবি রাখির মতো।'

'আমি? আমার দ্বারা হবে?'

'হবে না মানে? আলবৎ হবে। কেবল একটু কসরৎ করতে হবে।'

'কিরকম কসরৎ'?

‘একটু হিন্দি জানতে হবে। একটু নাচগান শিখতে হবে।’

‘কে শিখিয়ে দেবে? সে কি আর হবে আমার?’

‘নিশ্চয়ই হবে আমি ব্যবস্থা করে দেব।’

সেদিন বিকালে ফরিদ আমাকে নিয়ে গেল এক জায়গায়। কড়া নাড়তেই একজন বেরিয়ে এল। ফরিদকে দেখে বলে উঠল—

‘ভালো চিড়িয়া পাকড়াও করেছিস তো?’

‘তোমার মেহেরবানি।’ এবার সব করতে হবে তোমাকে।’

‘কত দিতে হবে?’

‘পাঁচ হাজার।’

‘পাঁচ হাজার! একটু কমিয়ে নে’।

কত টাকায় রফা হলো বলতে পারব না। কেবল দেখলাম। সেই লোকটি ফরিদের হাতে কিছু টাকা তুলে দিল। ফরিদ সেই টাকা পকেটে পুরে হাসতে হাসতে চলে গেল। সেই লোকটি আমাকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি বুঝতে পারলাম পাচার হয়ে গিয়েছি। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল আমার সামনে। দু’চোখ বেয়ে কেবল জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। একসময় ক্লান্তির মধ্যে গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দরজা খোলার শব্দে। চেয়ে দেখি, একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। হাতে একটা বেত। আমার পিঠে বেত দিয়ে ঘা মেরে বলল—

‘যা, মুখ দিয়ে স্নান করে আয়, নাহলে কপালে অনেক দুঃখ আছে।’

শুরু হলো আমার নতুন জীবন। সেখানে আমার মতো আরও কয়েকটি মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত—

‘এখানে আসা যায়, কিন্তু বের হওয়া যায় না।’

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক বছর। সেই মহিলা, যাকে আমি অন্যদের মতো মাসি বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম, সে এসে মাঝে মাঝে আমাকে দেখে যেত। প্রতিটি বিকালেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত কোয়েলের বালির চড়া। রংবেরঙের পাখির কিচির মিচির শব্দ। সন্ধ্যায় সুনীল আকাশে একটি দু’টি করে তারা ফুটত। মৃদু বাতাসে নদীর দু’পাড়ে দোদুল্যমান গাছগুলি আমার চোখের সামনে খেলা করত। তাদের পাতার ঝমঝম শব্দে আমার সমস্ত শরীরে একটা আহ্লাদ টগবগ করে উঠত। আর আমি এই নরক থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়াতাম।

অবশেষে একটা উপায় এসে গেল। সেটা ছিল গণেশ পুজোর বিসর্জনের দিন।

চারদিকে হইচই, আনন্দ উল্লাস। সেই উল্লাসের তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল এই নরকেও। নেশা করে সবাই ঝিমিয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে লাগলাম। কোথায় যাচ্ছি, কোনদিকে যাচ্ছি— তার কিছুই আমার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে তুলে রাস্তার পাশে বসিয়ে দিলেন। জানতে চাইলেন—

‘কি হয়েছে তোমার? একা এভাবে দৌড়চ্ছ কেন’?

ভদ্রলোককে আমার খুব ভালো মনে হলো। আমি তাঁকে সংক্ষেপে সব বললাম। শুনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্নেহমিশ্রিত স্বরে বললেন—

‘এখন কি করবে তুমি?’

‘জানি না।

‘বাড়ি, ফিরে যাবে?’

‘না।’

মনে মনে ভাবলাম, আবার বিক্রি হবার জন্য ফিরে যাব? আমাকে ইতস্তত করতে দেখে ভদ্রলোক বললেন— ‘আমাদের সঙ্গে যাবে? আমি থাকি ডুয়ার্সের একটি চা বাগানে। সেখানেই কাজ করি। এখানে এসেছিলাম একটি শ্রমিক সমাবেশে যোগ দিতে। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন এসেছে। তোমার বসার জায়গা হয়ে যাবে।’ ভাসমান সমুদ্রে একটি তৃণখণ্ড দেখলে মানুষ যেমন আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে আমিও তেমনি তাঁকে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম। আমি তাদের সঙ্গী হয়ে গেলাম।

দিন দুই বাদে এসে নামলাম ডিমা নদীর পাড়ে রাজাভাতখাওয়া অরণ্যের মাঝে একটি ছোট স্টেশনে। এর মধ্যে জেনে গিয়েছিলাম ভদ্রলোকের নাম পরিমল হেমব্রম। চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে একটি প্রিয় নাম। আমি তাঁকে পরিমলদা বলেই ডাকতাম। তিনিও আমাকে নিজের বোনের মতো দেখতেন।

কী সুন্দর এই জায়গাটি। চারপাশে ছড়ানো সবুজের মেলা। সারাদিন ধরে অজস্র পাখির কিচিরমিচির। বাগানের চারপাশে বুনো ফুলের সমারোহ। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাসে ভেসে আসবে সেই সব ফুলের সুবাস।

পরিমলদার এই সব উপভোগ করার মতো অবসর ছিল না। বাগানের কাজের পর শ্রমিকদের কাজ। এখন তিনি মালিক পক্ষের শত্রু। বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে দু’চারজন ছিল মালিকপক্ষের লোক যারা সবসময় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করত। বৌদি সব সময় ভয়ে ভয়ে কাটাতেন।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল চারদিক। একদল হাতি শব্দ করতে করতে চলে গেল ডিমা নদীর দিকে। আগে হাতির ডাক শুনলে ভয় পেতাম, এখন আর ভয় করে না। অনেক রাত পর্যন্ত আমি বাইরে বসেছিলাম। একসময় কয়েকজন লোক এসে পরিমলদাকে ডাকল।

‘পরিমলদা, আমার সর্বনাশ হয়েছে।’

‘কি হয়েছে রে?’

‘আমার মেয়েটাকে একজন লোক গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে।’

‘এমা?’

‘কোথায় যাবে?’

‘থানায়। দারোগা বাবুকে সব বলতে হবে।’

তুমি চল আমাদের সঙ্গে। তোমার সঙ্গে তো দারোগাবাবুর পরিচয় আছে।’

সেখান থেকে থানা তিন কিলোমিটার দূরে। সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তারা থানার দিকে গেল। যখন তারা থানায় পৌঁছল, তখন প্রায় সকাল। ডাকাডাকিতে দারোগাবাবু উঠে এলেন। পরিমলদাকে দেখে বললেন—

‘আবার কি ঝামেলা নিয়ে এলি?’

‘একটা মেয়েকে বস্তি থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে’।

‘কখন?’

‘সন্ধ্যার একটু পরে’।

‘এখন বলতে এলি? এতক্ষণে মেয়েটিকে নিয়ে ওরা রাজাভাতখাওয়া পেরিয়ে গেছে। তবু একটা ডায়েরি করে যা’।

পাচার হয়ে গেল মেয়েটি। প্রতিবছর শতশত মেয়ে এভাবেই পাচার হয়ে যায়। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একদল লোকের ব্যবসা চলে। পরিমলদাকে বলে আমি এর প্রতিরোধে আন্দোলনে শামিল হলাম।

অলঙ্করণ : মনীষ দেব

গরমভাতের গন্ধ

অপূর্বকুমার কুণ্ডু

দুয়ার ধরে মা দাঁড়িয়ে, করুণ দুচোখ মেলে,
আজ দুটো দিন উপোস গেছে, ভাত খায়নি ছেলে।
ঘুমোয় না সে জেগেই আছে খিদের জ্বালায় কাঁপে,
আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে মা কান্না শুধু চাপে।
'ওমা শোনো, এখন আমার ইচ্ছা তো একটাই...
আর কিছু নয়, একটু গরম ভাতের গন্ধ চাই।'

জল খেয়ে তো পেট ভরে না, খোকার দিকে চেয়ে,
মা-র দুচোখের জলের ধারা পড়ছে দুগাল বেয়ে।
কোথায় পাবে দু'মুঠো চাল, মা যে দিশাহারা,
'এই খোকা শোন', সেই ডাকে মা, খোকার তো নেই সাড়া।
হঠাৎ খোকা বলল ডেকে চোখ দুটো তার মেলে...
'এখন গরম ভাতের গন্ধ চায় যে তোমার ছেলে।'

কোন সে শকুন করছে চুরি তাদের মুখের গ্রাস,
ক্ষুধার জ্বালা মায়ের চোখে জাগায় বিষম ত্রাস।
'ঘুমো খোকা ঘুমো, আমি তোর পাশে তো আছি,
তুই আর আমি আজ দুজনে জলটা খেয়ে বাঁচি।'
'আর কত জল খাবো মাগো, জল খাবো না আর...
গরম ভাতের গন্ধটা মা আনবি একটিবার?

ভালোবাসা ও দুষ্টু পাখি

চিত্রা লাহিড়ী

ভোরের বেলায় আলোর খেলায়
বারান্দাটি জাগেরে
গ্রিলে বসে দুইটি চড়ুই
কি জানি কি মাগেরে
টুকরো রুটি বিস্কুট আর
দানা যে চায় বুঝতে পারি
না দিলে তো ঝগড়া করে
রানুর সঙ্গে করবে আড়ি
খাবার পেলে ভাব করে নেয়
দুষ্টু দুটো কথার পাখি
না বুঝলেও পাখির ভাষা
ভালোবাসা ছড়িয়ে রাখি।

সাজাহানের সিংহাসন

অভীক বসু

আমার মামা মস্ত উকিল
দিল্লির এক কোর্টে,
আমায় নিয়ে ঘুরতে গেল
সেদিন রেড ফোর্টে,
এদিক সেদিক ঘুরে দেখি
সাজাহানের গড়া,
যতই দেখি পড়ছে মনে
ইতিহাসের পড়া ,
অস্ত্রাগারে ঢুকেই আমার
চক্ষুচড়ক গাছ
হরেক রকম ঢাল তলোয়ার
রাখতো মুঘল রাজা,
দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস
শ্বেতপাথরে মোড়া,
হাতিশালে থাকতো হাতি
ঘোড়াশালে ঘোড়া
ঘুরতে ঘুরতে কাহিল মামা
পা করে টনটন,
খালি পেয়ে পরল বসে
রাজার সিংহাসন,
'সাজাহানের সিংহাসন'
ছিল লেখা গায়,
কি করা যায় বলতে হলো
চরম ব্যথা পায়,
রক্ষী দেখে ছুটে এলো
হাতটি ধরে টানে
উঠুন উঠুন আছেন বসে
রাজার সিংহাসনে,
মামা বল্ল সবুর কর
জ্বলছ কেন রাগে,
সিংহাসনটি করছি খালি
আসুন উনি আগে
জোরাজুরি করলে পরে
করব ফাইল কেস
তোমাদের এই ব্যবহারে
ডুবেছে গেছে দেশ।

দুঃসময়ের ডায়েরি

তরুণ মজুমদার

অনেকদিন থেকেই উনি বলছিলেন, আসুন না একবারটি আমাদের ওদিকে। রায়দিঘিতে আমার ছোট্ট একটা বাড়ি। পাশেই মণি নদী। তার ওপারেই জঙ্গল, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। ব্যস, সুন্দরবন শুরু হয়ে গেল।

আমন্ত্রণকর্তার নামটা ইচ্ছে করেই বলছি না। তবে এটুকু বলা যায় যে অসম্ভব উদ্যমী মানুষ। কোথাও কারও বিপদ হয়েছে শুনলেই ঝাঁপিয়ে পড়াই ওঁর স্বভাব।

বাড়ি-ঘরদোর ছেড়ে যাওয়া হয়ে ওঠে না। এবার ঠিক করলাম, নাঃ, যে করেই হোক যেতে হবে সেই মণি নদীর পারে। সঙ্গে আরও তিনজন। বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে উঠে পড়লাম গাড়িতে।

পথের বর্ণনা আর দেবো না। ইট আর ইস্পাতের জঙ্গল পেরিয়ে খোলা সবুজের মধ্যে দিয়ে কী হয় এ তো সবারই জানা। ধানের মাঠ, মাঝে মাঝে দু-একটা ছোটখাটো সেতু। এদিক-ওদিক খোড়ো চালের বাড়ি। অনেকটা বাদ দিয়ে দিয়ে এক-একটা বাজার মোড়ে। অল্পক্ষণের বাজারের কাছে নামি। কিছু ভিড়। দু-একটা বাস দাঁড়িয়ে। কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, 'কুলতলি কুলতলি... মোল্লারপুর... চলে আসুন চলে আসুন' — আরও সব কী কী জায়গার নাম। আমরা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলি।

বেশি সময় লাগে না রায়দিঘি যেতে। বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাই। রায়দিঘির বাজারের আশপাশ একটু ঘিঞ্জি বটে, তবে বাঁয়ের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই আবার সব ফাঁকা। অনেকগুলো টিনের চালার ক'টা খোড়ো ঘর, ছাড়া ছাড়া গাছপালা, বন বিভাগের একটা অফিস, তার একটু পরেই বাঁদিকের একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির সামনে ঘ্যাঁচ-চ করে গাড়িটা থামিয়ে ডাক্তারদা বলে ওঠেন , 'ব্যস, এসে গেছি।'

এই ফাঁকে ভাস্করদা কে একটু বলে রাখি। অচেনা জায়গায় যাওয়ার পথে যদি রাস্তা গুলিয়ে ফেলি তাই চেনা ড্রাইভার দিয়ে নিজের বাহনটাকেই পাঠিয়েছিলেন গৃহস্বামী। কথা ছিল একদিন পরে উনিও এসে পৌঁছবেন। ভাস্করদা হলেন সেই মানুষটা যার হাতে আমাদের গাড়ির স্টিয়ারিং। অসম্ভব ভদ্র, মুখে কথা কম, কিন্তু কাজের বেলায় যাকে বলে হাজার-হাত। গেট খুলিয়ে, বাউন্ডারি ওয়ালের ভেতর গাড়ি ঢুকিয়ে লোকজনদের ডেকে বলেন, 'এনাদের জন্যে ওপরে যে ঘরগুলো রাখা আছে, সব দেখিয়ে দে। মালপত্র কোনটা কোন ঘরে ঢুকবে জেনে নিবি।'

ঘরে ঢুকে মন ভালো হয়ে যায়। ওই তো, জানালার ওপাশে মণি নদী। পার হলেই জঙ্গল। মার্চ মাসের কুড়ি তারিখ হলেও হাওয়া দিচ্ছে খুব। পরিষ্কার ঘরদোর, পরিপাটি বিছানা, আর কী চাই?

আতিথেয়তা নিয়ে বেশি কথা বলব না, তোমাদের আন্দাজের ওপর ছেড়ে দিলাম। বাড়ির সামনের চত্বরটায় বড়সড় একটা বাগান– তাতে সবজি আর ফুল মিলেমিশে হয়। বাগানের ওপাশে মস্ত পুকুর। উঃ, কী মজাটাই যে হবে সামনের কটা দিন!

বেলা ঢলছে ক্রমশ। জানালা দিয়েই সূর্যাস্ত দেখা গেল। অন্ধকার নেমে আসতেই ভাস্করদা ঘরে ঢুকে বললেন, 'সিধে চলে যান ছাদে! চা-জলখাবার যাচ্ছে ক'মিনিট বাদে।'

ছাদে উঠে প্রথমেই মনে হলো, 'আ-হ্! আকাশে এত তারা? একটা ত্রিপল পাতা ছিল। চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়া মাত্র যেন এক অন্য জগৎ। তারায় তারায় ঝিলমিল করছে অন্ধকার।

এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল! চা-টাও এল সময়মতো। একটু পরেই ভাস্করদা এসে একটা খবর দেন। 'করোনা না কী একটা রোগ হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুড়ে বসছে দুনিয়াময়। কোনও ওষুধ নেই নাকি এই রোগের। এ আবার কেমন অসুখ রে বাবা?'

কলকাতায় থাকতেই খবর পাচ্ছিলাম। চীনের য়ুহান না কোন একটা শহরে প্রথম ধরা পড়ে এই রোগ। রোগ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্যে য়ুহানকে ব্যারিকেডের মধ্যে রাখা হয়েছে। তবু নিস্তার নেই। দেশ-বিদেশের প্রচুর ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করার জন্যে য়ুহানে যায়। আতঙ্কে যে যার ঘরে ফেরার বেলায় বোঝেওনি যে নিজেদের অজান্তে এই সাংঘাতিক ভাইরাসের বীজ বহন করে নিয়ে এসেছে ওরা।

গোড়ায় বিশেষ গা করিনি কথাটায়। কোথায় য়ুহান আর কোথায় আমাদের দেশ। আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স এসব দেশ থেকেও খবর আসছে বটে। তবে ওরা হলো 'প্রথম বিশ্ব।' কত আধুনিক ল্যাবরেটরি ওদের ওখানে, কত সেরা সেরা বিজ্ঞানী– করোনা হোক আর যাই হোক, ওরা কি আর ছেড়ে কথা বলবে? ফট্ করে এসব ওষুধ বের করে ফেলবে যে আমাদেরই তাক লেগে যাবে।

দোতলার ঘরে কে যেন টেলিভিশন চালিয়ে দিয়েছে! রোজ এইসময়ে একটা মজার অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রায় প্রত্যেকটা চ্যানেলে। অনেকটা আগেকার দিনের গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের স্টাইলে। 'চণ্ডীমণ্ডপ' কথাটা যদি না বোঝ তাহলে শরৎচন্দ্র কিংবা বিভূতিভূষণ পড়ে নিও। গাঁয়ের সমাজপতিরা কড়ি-বাঁধা হুঁকো টানতে টানতে নানারকম বিধান দেন, এর-ওর নামে কুৎসা ছড়ান, সাজা পর্যন্ত দিতে ছাড়েন না! এখনকার সমাজপতিরা শুধু গলা সাধার জন্যে টেলিভিশনের পর্দায় জড়ো হন। এঁদের কথার ভঙ্গিতে স্বয়ং দানীবাবু আর অঙ্গভঙ্গিতে উদয়শঙ্কর মশাইয়েরও অনেক কিছু শেখবার আছে। তবে আগেকার আর এখনকার মজলিশগুলির মধ্যে তফাৎ আছে। তখন ওগুলো ছিল ভয়ের জায়গা, এই বুঝি মুন্ডু কাটা পড়ে। এখন আর সেই হিম্মত নেই কারও। শুধুই গলাবাজি। বিনোদনের উপাদানে ঠাসা। এসব প্রোগ্রামের ওপর এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স বসিয়ে গভর্নমেন্ট বেশ দু'পয়সা কামাই করতে পারেন।

যাই হোক, দেখা গেল আজকের প্রোগ্রাম একটু আলাদা গোছের। কারও কারও মুখে 'করোনা' নামটা শোনা গেল। যদিও বস্তুটা ঠিক কী তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বাঁচার টেকনিক নিয়েও।

ক্রমে এক-আধজন ডাক্তারবাবুর মুখ দেখা গেল পর্দায়। তাঁরা একটু দিশা দেখাবার চেষ্টা করলেন বটে, তবে সঞ্চালক মশাইদের মনে হলো টিআরপি বাড়ানোর জন্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা অথবা নেত্রীদের সুচিন্তিত মন্তব্য না দেখালেই নয়। ফলে ব্যাপারটা না-ঘরকা না-ঘাটকা গোছের চেহারা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হলো।

ওদিকে গৃহস্বামীমশাই থেকে থেকেই ফোনে খবর নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা ঠিকঠাক আছি তো? কোনোদিক থেকে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? ওঁর মুখেও শোনা গেল করোনার কথা। আগে ঠিক ছিল আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই উনি এসে যোগ দেবেন। এখন জানলাম ওঁর পৌঁছতে আরও দু'দিন দেরি হবে। এই ফাঁকে আমরা যেদিকে মন চায় ঘুরে বেড়াতে পারি।

বেশ মজায় আছি। এখানে ঘুরছি, ওখানে ঘুরছি। গোটা সুন্দরবন জুড়ে নদী আর খাঁড়ির জাল বিছানো। ফলে অসংখ্য টুকরো টুকরো দ্বীপ। একটা থেকে আরেকটায় পৌঁছানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঝড় উঠলেই নৌকোডুবি। দুর্যোগ আরও বড় হলে বাঁধে ফাটল আর তার ফলে চাষির সর্বনাশ। এসবের মোকাবিলার জন্যে বাম সরকারের আমলে তিরিশটারও ওপরে পাকা সেতু তৈরি হয়েছিল। এখন অবশ্য নীল-সাদা রঙে ভূষিত হয়ে মা-মাটি-মানুষের জয়গান গাইছে।

যাই হোক, আরও দু'দিন আনন্দে কাটিয়ে যখন আমাদের স্বভাব আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছে, হঠাৎ ওদিক থেকে ফোন। গৃহস্বামী আসছেন কলকাতা থেকে। কিন্তু আমরা যেন ওঁর অপেক্ষায় বসে না থেকে অবিলম্বে কলকাতামুখো হই। কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেই রওনা হয়ে পড়ি। স্পিডোমিটারের কাঁটা ক্রমশ চড়ছে। মাঝপথে উলটোদিকের গাড়িতে রায়দিঘির সেই গৃহকর্তা। আমাদের থামিয়ে তাড়া দিয়ে বলেন, 'শিগগিরি কলকাতায় পৌঁছে যে-যার ঘরে ঢুকে যান। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন বিকেল পাঁচটা থেকে সারা দেশে 'কমপ্লিট লকডাউন।'

কারখানার মালিকরা মাঝে মাঝে বেআইনিভাবে কারখানা বন্ধ করে দেন। তাকে বলে 'লক-আউট।' থানায় থানায় আছে 'লক-আপ'। কিন্তু লকডাউনটা কী রে বাবা? আগের দিন আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি নাকি 'জনতা কারফিউ' ঘোষণা করেছিলেন। দূর থেকে আমরা টের পাইনি।

এরপর দ্রুতগতিতে যা ঘটতে থাকে তার হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। কোনটা আগে আর কোনটা পরে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। লোকজন বাজারে ছোটে, থোকে জিনিসপত্র কিনে ঘরে তোলার জন্যে, চালাক ব্যবসায়ীরা হোর্ডিংয়ে মন দেন।

ড্রপলেট ঠেকাবার জন্যে নাকমুখ ঢাকা উচিত। এমনকী গামছা জাতীয় কিছু হলেও চলবে– রাষ্ট্রীয় নেতারা এমনটাই শেখান দেশবাসীকে। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন রুমাল কিংবা ন্যাকড়া হলেও চলবে। জনস্বাস্থ্যের কথা ভেবে ওঁর রাতের ঘুম উড়ে যায়। সোজা রাস্তায় নেমে ইটের টুকরো দিয়ে গোল্লা কাটতে থাকেন– অবশ্যই প্রচুর টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে।

ওঁর অনুরাগীরা ঘোষণা করে দেন রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দর পরে ওঁর নামই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মহারাষ্ট্রের অবস্থা ভয়াবহ। গুজরাট, দিল্লি, তামিলনাড়ুও পিছিয়ে নেই। কিন্তু এর নাম পশ্চিমবঙ্গ। রোগের সাধ্য কী এ তল্লাটে এসে দাঁত ফোটায়? খুবই নগণ্য, একেবারেই তুচ্ছ সংখ্যায় দু'-একটা ছুটকো-ছাটকা ঘটনা ঘটছে– ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টিম পাঠাতেই সর্বনাশ! ঝুলির ভেতর থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে। এতটা ছড়িয়েছে রোগ?

আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজি দুটো প্রেসক্রিপশন ঘোষণা করেন। যে সমস্ত ডাক্তারবাবু, সিস্টার আর স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবন তুচ্ছ করে দিনরাত মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন তাঁদের চাঙ্গা রাখার জন্যে দেশবাসী যেন হাততালি দিতে দিতে কাঁসরঘণ্টা বাজায় আর দেওয়ালি রাতের মতো মোমবাতি জ্বালায়।

এরই মধ্যে আরেক কাণ্ড। 'আমফান' নামে এক ভয়ঙ্কর সাইক্লোন এসে কলকাতা থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একেবারে তছনছ করে দিল। হাজার হাজার গাছ পড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ, বিদ্যুৎ নেই, কিন্তু বক্তৃতা আছে প্রচুর। সুন্দরবনের দিক থেকে খবর পাচ্ছি, গৃহস্থদের মাথার চালা উড়ে গেছে, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পুরো পরিবার খোলা আকাশের নিচে ভাঙা বাঁধ আর থইথই জলরাশির সামনে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে। পেটে খাবার নেই। প্রশাসন অদৃশ্য। সম্ভবত আরও জরুরি কাজে ব্যস্ত।

না, ভুল বললাম। অন্তত দু'জনকে দেখা গেল কুড়ি-বাইশ হাজার ফুট ওপর থেকে খানিকটা চক্কর মেরে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে। রিলিফের জন্যে সামান্য হলেও কেন্দ্র কিছু টাকা পাঠালো। জায়গামতো না পৌঁছে তার অনেকটাই উবে গেল মাঝপথে।

হাসপাতালগুলিতে বেডের সংখ্যা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হলো। ডাক্তারবাবুরা আসল তথ্য ফাঁস করে দিলেন। রোগীরা হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরেও জায়গা পাচ্ছে না। চার কিলোমিটার দূরে পেশেন্টকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স ছিনতাই করে নিচ্ছে সাড়ে ন' হাজার টাকা। বেশ কিছু প্রাইভেট নার্সিংহোম ছুরি শানাবার মওকা পেয়ে গেল। এক হাসপাতাল কম্পাউন্ডে এক অসহায় স্ত্রী তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে একা হাতে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন তাঁকে সাহায্য করার জন্যে কেউ এগিয়ে এল না। অ্যাম্বুলেন্সের চালক পিপিই পরে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রইলো। হাসপাতালে ঢুকে যে কাউকে একজন খবর দেবেন, এটুকু কষ্টও স্বীকার করলেন না। আর যাঁরা কাছেপিঠে ছিলেন, এগিয়ে এসে সাহায্য করার বদলে দূর থেকে মোবাইলে ছবি তোলাটাকেই অগ্রাধিকার দিলেন।

প্রশাসনকে তারিফ না করে উপায় নেই। রোগ হলে কী কী করতে হবে, কোথায় কোথায় যেতে হবে, কাকে জানাতে হবে– থানা না হাসপাতাল না স্বাস্থ্যভবন না হেল্পলাইন নম্বর– এসব ব্যাপারে এমন একটা পদ্ধতি বাতলে দিলেন যে সুস্থ মানুষেরও ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। দিন গড়াচ্ছে, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে, ধাপার মাঠে বানানো আলাদা চুল্লিগুলো দম নেওয়ার ফুরসত পাচ্ছে না। এরই মধ্যে আরও একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। 'বাংলার গর্ব' লেখাটা বুকে নিয়ে যে অসংখ্য হোর্ডিং রাস্তার মোড়ে মোড়ে, পথে-বিপথে শোভা পাচ্ছিল– শুধুমাত্র আমাদের চোখকে আরাম দেওয়ার জন্যে– পাজি 'আমফান' এসে এক ঝটকায় সব ছিঁড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল।

এদিকে আবার আরেক মজা। দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা যখন হিমশিম খাচ্ছেন তখন আমাদের দেশের কিছু সুসন্তান এ রোগের প্রতিষেধক বের করে ফেললেন। একটা নয়। একেবারে তিন-তিনটে। গোমূত্র পান, ভাবিজী পাঁপড় খাওয়া আর রাম নাম জপ করা। ফলাফল আমরা সবাই জানি। এঁদের অনেককেই দেখা গেল হাসপাতালের বেডে, রোগীর আসন অলঙ্কৃত করে শুয়ে আছেন। দেশবিখ্যাত এক 'বাবা' তাঁর নিজের ব্র্যান্ডের ওষুধ বাজারে বেচতে গিয়ে বেগতিক বুঝে পিছিয়ে গেছেন।

একদিকে করোনা অন্যদিকে আমফানের সাঁড়াশি চাপে আমরা যখন বিধ্বস্ত তখন নীরবে একদল বীর যোদ্ধা এগিয়ে এলেন আসল লড়াইটা লড়তে। নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে। ডাক্তারবাবু, নার্স-দিদিরা আর স্বাস্থ্যকর্মীরা। দিনরাত এক করে এঁরা সেবা দিতে লাগলেন দুর্গতদের। এই করতে গিয়ে নিজেরাও আক্রান্ত হলেন কিছু কিছু, মারাও গেলেন কেউ কেউ, তবু টললেন না নিজেদের কর্তব্য থেকে। পুলিশের এক অংশ ভালো কাজ করেছেন। এঁরা নাম চাননি, পাবলিসিটি চাননি কিন্তু এঁরাই হলেন 'রিয়েল হিরো'। এঁরা মনুষ্যত্বের ওপর আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এঁদের কুর্নিশ।

আর কুর্নিশ জানাবো সেই সমস্ত অক্লান্ত কর্মীদের যাঁরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে ক্ষুধার্ত গৃহহীন মানুষের জন্যে বিনা-পয়সার ক্যান্টিন খুলেছেন, মানুষকে খাইয়েছেন, ওষুধ দিয়েছেন, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। এদের মধ্যে বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা আছেন, রেড ভলান্টিয়ার বাহিনী আছে, বামপন্থীরা তো আছেনই। পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষরা তো আছেনই যাঁরা সাধ্যমতো চাঁদা দিয়ে এঁদের উৎসাহিত করেছেন, নইলে টাকা এরা পাবে কোথায়? এদের হাতে তো আর সেই দানছত্র নেই যা দিয়ে খেলা-মেলা-পিঠেপুলি উৎসব করা যায়।

এঁরা ছিলেন তাই মানুষ আজও বেঁচে আছে।

ভবিষ্যতেও থাকবে। চিরকাল।

অন্যরকম জন্মদিন

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ দেবনাথ নন্দী

অনলাইনে ক্লাস করতে বসে তিথির মেজাজ একেবারেই বিগড়ে গেল। একটু আগেও ছিলেন, এখন আর নেই। মালতী মিস মিলিয়ে গেলেন। এই তো ছিলেন স্ক্রিন জুড়ে! মিসের ঝলমলে সাজগোজ দেখে তিথির বারবারই মনে হচ্ছিল, বাড়িতেও এত সেজেগুজে থাকেন, স্কুলের মতো!

হঠাৎই মিসের হাত-নাড়া বন্ধ হয়ে গেল। ছবি স্থির, নট নড়নচড়ন, প্রথমে যেটুকু কথা শোনা যাচ্ছিল, পরমুহূর্তে তাও স্তব্ধ হয়ে গেল। এটা প্রথম নয়, এই নিয়ে আজ তিন বার।

এইভাবেই বারোতলায় নেট আসে যায়। বার বার এমন হলে মেজাজ তো বিগড়োবেই, তিথিও খুব বিরক্ত হলো! উঠে গিয়ে দাঁড়ালো ব্যালকনিতে। ব্যালকনি থেকে দেখা যায় পিচরাস্তা। আজ গাড়িটাড়ি বেশ কম। লোকজনও কম। ফাঁকা-ফাঁকা। ক'দিন ধরে এমন ছবি দেখতেই চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এই আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির সামনেই একরাশ টালির বাড়ি। সবাই কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, 'বস্তি'। ওখানে গরিব মানুষজনের বসবাস। মেপেজুপে তারা কথা বলতে পারে না। চেষ্টাও করে না কখনো। সারাক্ষণই কারও না কারও গলা শোনা যায়! পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে কথা বললে আগে ঝগড়া বেঁধেছে ভেবে তিথি ভুল

করত। ব্যালকনিতে দৌড়ে এলে অবশ্য সে-ভুল ভাঙতো! কোথায় ঝগড়া, সবাই একসঙ্গে মনের আনন্দে গল্পগাছা করছে। আজও তাদের কোলাহল কানে এল। তিথি অন্য রকমভাবে ভাবল। মনে হলো, কোলাহল নয়, নদীর কলকলানি।

এই বারোতলা থেকে সব বাড়িই, এমনকি চার-পাঁচতলার ফ্ল্যাটবাড়িও বেশ ছোটো দেখায়। চারদিকে যে এত গাছ আছে, নিচ থেকে সেভাবে বোঝা যায় না। উঁচু থেকে বেশ সবুজ দেখায়। গতকাল সন্ধের দিকে ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছিল। বৃষ্টিজলে ভিজে গাছগুলোকে অন্য দিনের থেকে আজ বেশি সবুজ দেখাচ্ছে। রোদ পড়ে ঝলমলাচ্ছে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে দেখছিল, হঠাৎই কার যেন কথা বলা কানে আসে। আরে, মালতী মিসের গলা, পড়াচ্ছেন তিনি। কখন যে 'নেট' ফিরে এসেছে, খেয়ালই করেনি! তিথি প্রায় দৌড়ে গিয়ে বসে পড়ে পড়ার ঘরের চেয়ারে। সামনের টেবিলে বইখাতা ছড়ানো। দাঁড় করানো ট্যাব। ট্যাব আগে ছিল না, অনলাইন ক্লাস করার জন্য বাবা কিনে দিয়েছেন।

সব কিছুই কেমন যেন বদলে গেল। স্কুল নেই। কোচিং নেই। গান-শেখা নেই। কিচ্ছু নেই, আবার সবই আছে। সব এখন অনলাইনে। কখনো ট্যাবে, কখনো বাবার ল্যাপটপে। স্কুলের কথা মনে পড়লেই তিথির এখন মন খারাপ হয়ে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই। ছোটোখাটো কত কারণেই না তুমুল ঝগড়া হতো! একটু পরেই ভাবসাব, আবার গলাগলি। বন্ধুদের মধ্যে দু'চারজন, বিশেষ করে মণীষা আর শ্রাবস্তী প্রথমদিকে খুব ফোন করত। এখন আর আগের মতো করে না। করলেও বলে, 'কিচ্ছু ভাল্লাগছে না । এভাবে বাড়িতে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকা যায় ?'

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে তিথি! তারও তো ভাল্লাগছে না! তারও তো সেই একই প্রশ্ন! মনে সারাক্ষণই একরাশ বিরক্তি। অল্পতেই এখন রেগে যায়! খিটখিটে মেজাজ।

গেল রোববার অয়ন্তিকা ফোন করেছিল। একই ক্লাসে পড়লেও ঠিক কাছের বন্ধু নয়। আগে ফোনটোনও করেনি তেমন। হঠাৎই তার ফোন। অন্য কোনও কথা নেই। ভয়ার্ত কণ্ঠ! শুরুই করল এভাবে, 'তিথি, আমার খুব ভয় করছে!'

ফোন করেছিল সকালের দিকে। তখনও ঘুম ভাঙেনি তিথির। অন্য সময় হলে কখন উঠে পড়তো! শুরু হয়ে যেতো স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি। এখন সবই কেমন এলোমেলো, রুটিন-ছাড়া। মা ঠেলা দিয়ে 'তোর ফোন' বলা মাত্র তিথি ধড়ফড়িয়ে উঠে অয়ন্তিকার ফোন দেখে প্রথমে হকচকিয়েই গিয়েছিল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে 'হ্যালো' বলা মাত্র, ও প্রান্ত থেকে শোনা যায়, সেই ভয় জড়ানো কণ্ঠস্বর!

কী হলো অয়ন্তিকার, কীসের ভয়? মা'র ফোনে অয়ন্তিকার নম্বর 'সেভ' করে রাখলেও তিথির সঙ্গে শেষ কবে কথা হয়েছিল, তা তার নিজেরই মনে পড়ল না। অয়ন্তিকার ভয় তিথির মনেও ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ আতঙ্কিত হয়েই প্রশ্ন করে, 'কী হয়েছে? বাড়িতে কোনও বিপদ-আপদ, না অন্য কিছু ?'

মোবাইলে অন্য প্রান্তে স্তব্ধতা, কথা নেই অয়ন্তিকার মুখে। কয়েক মুহূর্ত এভাবেই কাটে, শেষে স্তব্ধতা ভাঙে অয়ন্তিকা। বলে, 'আমাদের ফ্ল্যাটে সে এসেছে। থার্ড ফ্লোরে, আমরা থাকি ফিফথে।'

এইটুকু বলেই আবার স্পিকটি নট, চুপচাপ। 'কী হলো, স্পষ্ট করে বললি না তো, কে এসেছে, কীসের ভয়?' প্রত্যুত্তর সঙ্গে সঙ্গে মেলেনি। মিলেছে একটু পরে। অয়ন্তিকার গলায় তখনও তেমনই ভয় লেগে আছে। ভয়ার্ত গলাতেই বলে, 'করোনা হয়েছে। থার্ড ফ্লোরে। যার হয়েছে, সে আমার থেকেও ছোটো। তুই ওকে দেখলে চিনবি। আমাদের স্কুলেই পড়ে। আমরা সেভেনে, আঁখি পড়ে ফাইভে।'

এক ঝটকায় অয়ন্তিকা এই কথাগুলো বলে একটু থামে। কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করে। ফোনের এ-প্রান্তে থাকা তিথি স্পষ্ট বুঝতে পারে, অয়ন্তিকার গলা জড়িয়ে আসছে, ফোঁপাচ্ছে। তিথির চোখের সামনে অয়ন্তিকার মুখ ভেসে ওঠে। যে মেয়েটি ক্লাসে সব থেকে বিচ্ছু, দস্যিপনায় যার জুড়ি নেই, প্রায়শই মিসদের কাছে বকুনি খায়, দু'একবার গার্জেন-কলও হয়েছে, সেই অয়ন্তিকা এভাবে কাঁদছে, ফোঁপাচ্ছে, তিথিরও খুব মন খারাপ হয়ে যায়। চোখের কোণ হঠাৎই ছলছলিয়ে ওঠে । সেই ভেজা চোখ মুছতে গিয়ে মা'র নজরেও পড়ে যায়। কিছু একটা নিতে এ ঘরে এসেছিলেন মা।

তিথির চোখে জল, কাঁদছে, দেখে স্বভাবতই মা বিচলিত। জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হলো ? কোনও খারাপ খবর?' তিথি মুখে কিছু বলে না। ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ। 'হ্যাঁ' শুনে মা উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যান, 'কী হয়েছে? করোনা? কার? কোনও মিসের, না ক্লাসমেটের?'

আতঙ্কে মুহূর্তে মা'র মুখও শুকিয়ে গেল। সব কিছু নিয়ে একটু বেশিই টেনশন করেন। করোনা-করোনা করে ক'রাত ঘুমোতেও পারেননি মা। এর মধ্যে শরীর খারাপ হলেও ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার উপায় নেই। কেউ চেম্বার করছেন না। বাবার এক বন্ধু হোমিওপ্যাথির চর্চা করেন। ফোন করে তার থেকে বাবা ওষুধ জেনেছেন, মোড়ের মাথার 'সুষমা হোমিও হল' থেকে নিয়েও এসেছেন। তাই মা'র টেনশন আর বাড়াতে চাইলো না তিথি। বলেই ফেলল সব। মা আঁখিকে চেনেন না। সব শুনে 'ছোট্ট মেয়েটাকে এমন রাক্ষুসে রোগ ধরলো' বলে তিথির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। চোখের কোণ শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আঁখি ঠিক ভালো হয়ে যাবে।' একথা বলার, আশ্বস্ত করার পরই তিথির থেকে জানতে পারলেন, শুধু আঁখির নয়, আঁখির মায়েরও হয়েছে। দু'জনেই হাসপাতালে।

এসব শুনে মা'র মুখ যে আরও কালো হয়ে গেল, তা তিথির চোখ এড়িয়ে গেল না। ডাইনিং-য়ে টিভি চলছিল। পর্দা জুড়ে চার-পাঁচজন মহাকাশচারীর পোশাকে। এ পোশাকের নাম এখন তিথিও জানে, পিপিই। খুব ছোট তখন তিথি। আধো উচ্চারণে 'পিসি' তার মুখে হয়ে যেতো 'পিপি'। না, তিথির মনে নেই। সে-কথা ক'দিন আগে মা'র থেকেই জেনেছে। মা বলতে বলতে হাসছিলেন। সেই হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে! পিপিই পরা ক'জন লোক স্টেচারে করে কাকে যেন অ্যাম্বুলেন্সে তুলছে। টিভির দিকে চোখ পড়া মাত্র মা'র মাথায় আগুন চড়ে যায়। 'যত্তসব ! সারাক্ষণ করোনা করোনা করছে, আর ভয় দেখাচ্ছে 'বলতে বলতে বাবার দিকে রাগী-রাগী চোখে তাকিয়ে ঝট করে বন্ধ করে দিলেন টিভি।

কলেজে যেতে হয় না। বাবা এখন বাড়িতেই থাকেন। কখনো বইটই পড়েন। দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে মোবাইলে চলে বকরবকর। খবরের কাগজ এখন আর ঢোকে না বাড়িতে। দিনের অনেকখানি সময় ওই টিভির সামনেই বসে থাকেন। কাগজেও নাকি করোনা

আছে, কোথা থেকে জেনে এসে মা ফোন করে পেপারকাকুকে কাগজ দিতে সেই কবেই 'না' করে দিয়েছেন!

বাবা ব্যাজার মুখে শুধু বলেছিলেন, 'অনিমেষ বাড়ি বাড়ি কাগজ দিয়ে সংসার চালায়, ওর কীভাবে চলবে, ভেবে দেখেছো?'

মা রেগে টিভি বন্ধ করে দেওয়ার পরও বাবা কিছু বললেন না। বাবার চোখে মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। আঁখির ব্যাপারে, মা'র সঙ্গে পাশের ঘরে যে কথা হচ্ছিল, তা বোধহয় শুনেছেন। অন্তত তিথির তাই মনে হলো ।

গত রোববার আঁখির খবর জানার পর থেকেই তিথি মুষড়ে পড়েছিল। ভয় মনের কোণে কোণে, আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্য বন্ধুদের কত বার ফোন করেছে! তাদের দু'চারজন আঁখির বাড়ির কাছাকাছি থাকে। তাদের কাছ থেকে পেয়েছে দৈনন্দিন খবর। আজ সকালেই ফোন করেছিল রিমি। রিমি ওদের দু'তিন বাড়ি পরে থাকে। রিমির থেকেই জানা গেল, আঁখি আর তার মা দু'জনেই এখন ভালো আছে। গতকালের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আরও দু'চার কথা হয়।

ফোন রেখে দিয়ে তিথি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। 'নেগেটিভ' শব্দটা কানে লেগে থাকে। চিৎকার করে মা-বাবাকে জানায় এই আনন্দ-সংবাদ। দু'জনের মুখেই আষাঢ়-শ্রাবণের মেঘ। এখুনি বুঝি ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে ! মেঘময় আকাশে ঝড়-বৃষ্টির প্রস্তুতির আগে বিদ্যুৎ চমকায়। শুনে দু'জনের মুখেই যেন আলোর চমক খেলে যায়। সে-আলোর স্থায়িত্ব বড়ো কম। সহসা হারিয়েও গেল। টিভি বন্ধ। বাবা মোবাইলে এফএম শুনছিলেন। দেবব্রত বিশ্বাসের গান শেষ হতে না হতেই নিউজের আপডেট। খবরে করোনায় আক্রান্ত-মৃত্যুর পরিসংখ্যান। অন্য দেশে কত, ভারতে কত, পশ্চিমবঙ্গেই বা কত– পরিসংখ্যানের এই কচকচানি শুনলে কার মুখে আর হাসি থাকে, খুশি থাকে, তখন বৃষ্টিদিনের আকাশের মতোই হয়ে যায়, যেমন হয়েছে বাবা-মা'র!

ক'টা পায়রা প্রতিদিন এই সময় আসে। তিথি তাদের চাল খাওয়ায়, গম খাওয়ায়! গলা ফুলিয়ে আনন্দে তারা বকবকম করে। আজও এসেছে। পায়রা দল বেঁধে রোজের মতো এসেছে দেখে তিথির মন ক্ষণিকের জন্য হলেও ভালো-লাগায় ভরে ওঠে। একটুকরো রোদ এসে পড়েছে ব্যালকনিতে, কার্নিশে। রোদ-আলো ডানায়, রামধনু-রঙের গলায় মেখে পায়রাদের কী ফুর্তি! এসব দেখে কার আর মন খারাপ থাকে! তিথির মন খারাপও কোথায় মিলিয়ে যায়! কখন বাবা ও মা দু'জনেই এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল করেনি তিথি। তাঁদের কালো মুখেও সে আলোর ঝিলিক স্পষ্ট দেখতে পেলো!

এখন সব কিছুই কেমন বদলে গেছে। আগের দিন হলে সকালে উঠেই মা রান্নাঘরে ছুটতেন। চা তৈরি হতে না হতেই এসে পড়ত কাজের মাসি। খানিক পরেই রান্নার মাসি। বাবার কলেজ, মা'র স্কুল, তিথির স্কুল– সে এক দক্ষযজ্ঞ! ঘুম ভাঙে এখন অনেক দেরিতে। আলিস্যি করে উঠতে আরও দেরি। কাজের মাসি নেই, রান্নার মাসি নেই। দু'জনেরই ছুটি। ছুটি হলেও মাইনে পাবে। বাবা-মা দু'জনেই সে-কথা বলে দিয়েছেন। বাবা অ্যাকাউন্ট নম্বরও চেয়েছিলেন। রান্নার মাসি দিতে পারলেও কাজের মাসি দিতে পারেনি। সত্যিই তো, মাইনে বন্ধ হয়ে গেলে ওরাই বা খাবে কী! তিথিরও মনে হয়েছিল।

মা'র ওপর এখন বেজায় চাপ। বাবা আর তিথি একটুআধটু সাহায্য করলেও ঘর ঝাড়পোঁছ থেকে রান্নাবান্না তাঁকেই করতে হয়। ফলে অনেক সময়ই মেজাজ ধরে রাখতে পারেন না। অল্পতেই রেগে যান। এই তো, সকালে উঠেই শুরু হয় ইমিউনিটি বাড়ানোর চেষ্টা! লেবু-জলে হলুদ-গোলমরিচ মিশিয়ে কী 'যেন একটা দেন বাবাকে আর তিথিকে! কোনও রকমে বাবা খেয়ে ফেললেও তিথির ওয়াক ওঠে। শেষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপায় হয়েই গলাধঃকরণ করতে হয়। মা নিজে খান না। শুধু কি ওই বিচ্ছিরি জিনিস খাওয়া, হাল্কা উষ্ণ জলে গার্গলও করতে হয় দু'বেলা! না, মা গার্গল করেন না। তিথি মনে করিয়ে দিলে হাসেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'তোরা ভালো থাকলেই আমার ভালো থাকা।' কখনো আবার বলেন, 'আমার কিচ্ছু হবে না।'

সত্যিই কি মনের এতো জোর, তাহলে মাঝে মধ্যেই মুখ কালো করে বসে থাকেন কেন! দেখে তো মনে হয় হাজার হাবিজাবি ভাবছেন! এসব মনে হলেও তিথি মুখে কিছু বলে না। মা'র দিকে তাকিয়ে শুধু মুচকি হাসে।

লকডাউনে জীবনটাই কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। এই গৃহবন্দি জীবনে কবে কী বার, কত তারিখ কিছুই মনে থাকে না। পরশু যে তিথির জন্মদিন, তা না বাবা-মা'র, না তিথির, কারও মনে ছিল না। অন্যবার কত আগে থেকে চলে দিন-গোনা, শুরু হয় যায় প্রস্তুতি। কত প্ল্যান-পরিকল্পনা! ফ্ল্যাটের সমবয়েসিদের নিয়ে কী আনন্দই না হয়! ছবির পর ছবি, চোখের সামনে গত বছরের জন্মদিন ফিরে আসে। মাথায় টুপি, মুখে মুখোশ পরে খুব নেচেছিল। নাচানাচির বহর দেখে মা তো হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়েছিলেন। বাবা হেসেছিলেন মিটিমিটি। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, 'গু-গা-বা-বা'-নৃত্য'।

জন্মদিনের কথা মনে পড়ে যাওয়া মাত্র বাবা হতাশ গলায় বললেন, 'সত্যিই তো, এবার তিথির জন্মদিন হবে কী করে? ফ্ল্যাটের বাচ্চাদের নেমন্তন্ন করলেও তো কেউ আসবে না!' মাও একই কথা বললেন। তিথি কোনও ভাবনা-চিন্তা না করেই বলে বসে অন্য কথা। বেশ ভারিক্কি চালে, গম্ভীর কণ্ঠে জানাব, 'এবার আমার জন্মদিন হবে না। কিছু করা যাবে না।' এইটুকু সবে বলেছে, মাঝ পথে তাকে থামিয়ে রাগ দেখিয়ে বাবা বললেন, 'একি বলছিস তুই? জন্মদিন হবে না। মানে? কী ভেবেছিস, তোর কথায় আমরা চলব?' মা চেষ্টা করলেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার, উত্তেজনা প্রশমনের। হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'জন্মদিনে তো আর লকডাউন নেই! কেন হবে না? হবে।'

তিথি কোনও কথারই উত্তর দিল না। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়, অনেকক্ষণ। খেয়েদেয়ে পায়রারা উড়ে গেল অন্য কার্নিশে। তিথি রাস্তার দিকে বা দূরের গাছপালার দিকে উদাসভাবে দেখছিল, তা নয়। সে একটু ঝুঁকে দেখছিল এই আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির পাশেই যে গরিবগুর্বো মানুষজন থাকে, তাদের। মানুষ কত কষ্টে ওইসব ঘুপসি ঘরগুলোতে থাকে! বাবার মুখে সে শুনেছে, করোনা-করোনা করে অনেকেরই কাজ গেছে। ছাঁটাই হয়েছে, কাজ হারিয়েছে। সবাই তো আর মাসমাইনের চাকরি করে না। এটা-সেটা বিক্রি করে, ছোটখাট ব্যবসা করে, দোকানপাট আছে, তাদের অবস্থা খুব খারাপ। মা যেদিন পেপারের অনিমেষকাকুকে ছাড়িয়ে দিলেন, সেদিনই বাবা এসব বলেছিলেন। মাকে লক্ষ্য করে বললেও তিথি সব শুনেছিল। বাবার বলা সেসব কথা মনে পড়ামাত্র তিথিরও মনে হয়, ওই

বস্তির মানুষগুলো সত্যিই এখন কষ্টের মধ্যে আছে! অনেকেই কাজ হারিয়েছে। কাজ থাকলেও হয়তো মাইনে পাচ্ছে না ।

এসব মনে হওয়ামাত্র তিথি ঠিক করে ফেলে বাবার কাছে তার জন্মদিনকে ঘিরে একটা অন্যরকম প্রস্তাব দেবে। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। কানে কানে নিচু গলায় তার ভাবনার কথা বলেও ফেলে। মা কান পেতে শোনার চেষ্টা করে নিরাশ হন।

নানাভাবে চেষ্টা করেও মা শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি। জানতে পারলেন জন্মদিনের সকালে। তিথি মস্ত এক ভাঁড়ে দশ টাকার কয়েন জমাতো। সাতসকালে উঠে নিজেই সে-ভাঁড় ভেঙে ফেলল। ছড়িয়ে পড়ল অনেক অনেক কয়েন। এরপর শুরু হলো বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গণনা-পর্ব। বাবা তিথিকে একটু বকুনিই দিলেন। বললেন, 'মিছিমিছি কেন ভাঁড় ভাঙলি! আমি সব টাকা দিয়ে দিতাম। গুণতে গুণতে বাবা তো থ! তিন হাজার চারশো টাকা ।

মা'র কৌতূহলের শেষ নেই। কিছুই বুঝতে পারছেন না। ফলে কৌতূহল ক্রমেই তীব্র হয়। শেষে বাবাই খোলসা করে সব বললেন। জন্মদিনে কেকটেক না কেটে পাশের বস্তিতে গিয়ে চাল-ডাল-আলু দিতে চায় তিথি, সব জেনে মা আবেগে উচ্ছ্বাসে খুব আদর করলেন তাকে।

বাবা আগেভাগেই ফোনে ফোনে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। দু'বস্তা চাল, দু'বস্তা আলু আর এক বস্তা ডাল চলে এল। যে দু'জন ঘামতে ঘামতে এসব নিয়ে এসেছে, বাবা তাদের চা খাওয়ার টাকা দিয়ে বললেন, 'কত টাকা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই তোমাদের বলে দেয়নি। দু'জনেই একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বোঝাতে চাইল, না, তাদের জানা নেই। বাবা আশ্বস্ত করলেন, 'কত হয়েছে, বিলটা রেডি করে রাখতে বলো। বেলার দিকে আমি দোকানে গিয়ে দিয়ে আসবো।'

এক বান্ডিল পলিব্যাগেরও অর্ডার দিয়েছিলেন বাবা। একটু পরেই শুরু হয়ে যায় প্যাকেট তৈরির কাজ। থরে থরে সাজানো প্যাকেট বিগ সপারে পুরে নামানো হয় নিচে। এ কাজে বাড়ির এক সিকিউরিটি বাবার ডাকে এসে সাহায্য করে। এরপর পাশের বস্তিতে গিয়ে চলে বিলিবন্টন। প্রবল উৎসাহে সঙ্গে যায় তিথিও।

এতদিন বারোতলা থেকে বস্তির মানুষজনকে কতটুকুই বা দেখেছে, জেনেছে ! কী কষ্টেই না দিন কাটায় তারা, মুখোমুখি হয়ে বারবারই সে কথা মনে হয় তিথির! ব্যালকনি থেকে শুধু তাদের কোলাহল শুনেছে, ঝগড়া-বিবাদ শুনেছে! তার বেশি কিছু নয়। তাদের এঁদো-ঘুপসি ঘরে আলো ঢোকে না। মানুষ কত দুঃখে আছে, দুঃসহ সে-জীবনের হদিশ এতদিন পায়নি তিথি। আলো-আঁধারিতে নজরে পড়ে ঘরের ভেতরে পলিথিন টাঙানো, টালির ফাঁক গলে বৃষ্টির জল পড়ে বিছানাটিছানা হয়তো ভিজে একশা হয়। খাট-পালঙ্ক কারও ঘরেই নেই, চৌকি, কয়েকটিতে খাটিয়া। ঘরের বাইরে যে একফালি জায়গা, সেখানেই চলে রান্নাবান্না। গ্যাসওভেন নয়, বেশিরভাগই মাটির উনুনে, দু'চারজন স্টোভে। ঘরে ঘরে উনুনে আঁচ পড়েছে, স্টোভ জ্বলছে, রান্না হচ্ছে, তা নয়।

মাটির উনুন আগে কখনো দেখেনি, দেখে আনন্দই হয়। এত বেলাতেও উনুনে আঁচ পড়েনি, তা দেখে তিথির মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি রান্নাবান্না হবে না? কিছু জোটাতে পারেনি?

এক এক করে সবার হাতে চাল-ডাল-আলুর প্যাকেট তুলে দেয় তিথি। কী আনন্দ তাদের! চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাবা জনে জনে বলেন, আজ তিথির জন্মদিন, দিতে এসেছে জন্মদিনের উপহার। সে-কথা শুনে তাদের আনন্দ আর ধরে না। তিথির বয়েসি একটি মেয়ে এক গোছা ফুল এনে তার হাতে দিয়ে বলে, 'তোমায় দিলাম'।

বিশেষ রচনা

মহামারী ও ঠাকুরবাড়ি

সৌম্যকান্তি দত্ত

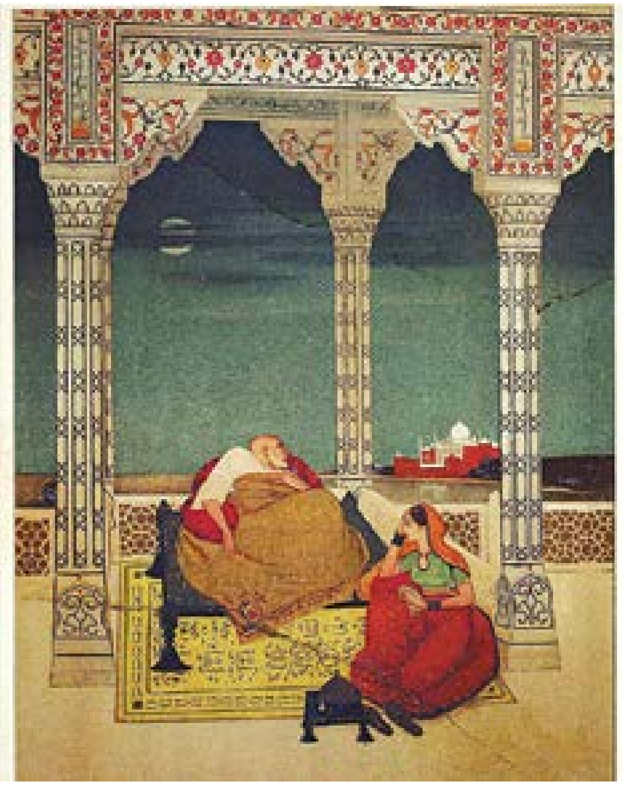

কী সুন্দর সময় সেটা। গান-বাজনা, নাটক ইত্যাদি লেগেই রয়েছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সারাটা দিন বাড়িতে হই হই হয়, কত লোকজন আসেন। রবীন্দ্রনাথের তখন আর কতই-বা বয়স, এই তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে। ইতিমধ্যে তিনি গান, কবিতা, গপ্পো লিখে চারিদিকে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছেন। থেকে থেকেই তাঁর লেখা 'চিত্রাঙ্গদা', 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনীত হচ্ছে ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়। তখন ও-বাড়িতে কারোর বিয়ে হোক কী অন্য কোনও অনুষ্ঠান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ডাক দিতেন, 'রবির গান হয়ে যাক।' আর শুধুই কী গান, ওই যে বললাম নাটকের কথা। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ছেলেরা নাটক করে আর ওদিকে রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো দাদা গুণেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে অবনীন্দ্রনাথ– অতি স্নেহের ভাইপো অবন মহা উৎসাহে স্টেজ সাজায়। কী তাঁর উদ্দীপনা, রাত-দিন এক করে চলে কাজকর্ম। তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের উদ্যোগে ড্রামাটিক ক্লাবের জন্ম থেকে শ্রাদ্ধ সবই হয়েছে, 'খামখেয়ালী সভা'ও হয়েছে। কিন্তু এই বার সবার মাথায় নতুন ভূত চাপল। অবিশ্যি সেটা ভালো ভূত, দুষ্টু ভূত মোটেই নয়।

জোড়াসাঁকো থেকে কিছুটা দূরে থাকতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেদার বন্ধুত্ব। তিনি একদিন এসে বললেন, 'আচ্ছা, ছোটদের জন্য কিছু করলে কেমন হয়? এই ধরুন রবিবাবু, ছোটদের উপযোগী কিছু বই-টই লেখা।' রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবটা শুনেই বললেন, 'এ তো দারুণ প্রস্তাব। তাহলে

অবনকেও ডেকে নিই।'

অবনকে ডাকা হলো, গোটা ব্যাপারটি শুনে তিনি খুব খুশি হলেন ঠিকই, কিন্তু যখন তাঁর রবিকা বললেন, 'তোমাকেও লিখতে হবে,' তখন আর খুশির পাল্লাটা ভারী থাকল না। মুখ ব্যাজার করে অবন বললেন, 'আমি লিখব? ক্ষেপেছ! আমার দ্বারা ওসব হবে না।' রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনে অবনকে আশ্বাস দিলেন, 'চিন্তা না করে লেখো। মুখে মুখে যেমন গপ্পো বলো, তেমনটাই খাতায় লিখে ফেলো। ভাষার কিছু ভুল হয় তো আমিই আছি।' রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে মনে বল পেলেন অবনীন্দ্রনাথ। তরতর করে খাতার পৃষ্ঠা ভরে লিখে ফেললেন, 'শকুন্তলা', অবনীন্দ্রনাথের প্রথম লেখা ছোটদের বই। রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদের বাল্যগ্রন্থাবলী সিরিজের প্রথম বই 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয় আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে ১৮৯৫ সালে। এর কিছুদিন বাদে এই সিরিজের দ্বিতীয় বই কি প্রকাশিত হলো জানো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বই 'নদী'। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে উপেন্দ্রকিশোর পনেরোটি ছবি এঁকেছিলেন এই বইয়ের জন্য। পরে অবনীন্দ্রনাথও ছবি আঁকেন এই বইতে।

কাজেই বুঝতে পারছ, তখন একটা জমজমাট সময় ঠাকুরবাড়িতে। রোজ রোজ কত নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে। আজ অমুক কাল তমুক এসে নতুন বুদ্ধি বাতলাচ্ছেন। ঠিক এমনই সময় ঝলমলে আকাশটা কোথা থেকে কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল। কী না, মহামারী লেগেছে।

চারদিক থেকে খবর আসছে যে, এক অদ্ভুত রোগ এসে নিষ্পাপ লোকগুলোর নাকি প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে! এ কি মগের মুলুক, দিনের পর দিন এ ব্যাপারটা চলতে পারে না। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা কেউ

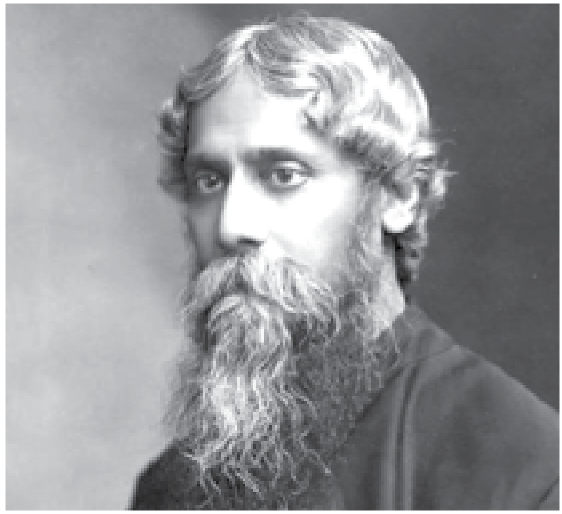

কেউ অবিশ্যি বললেন, 'রোগটা নতুন কিছু নয়। বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছিলুম বটে। কিন্তু নিজেদেরকেই সেই রোগের সঙ্গে লড়তে হবে – এমনটা ভাবিনি!'

রোগটার নাম প্লেগ। প্রথম এর দাপট শুরু হয় সম্ভবত ৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সে। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় 'ব্ল্যাক ডেথ' বা 'কালো মৃত্যু' নামে এর দাপট। তারপর বছরের পর বছর ধরে এই রোগের বিভিন্ন রূপ দেখা দিয়েছিল। তবে তৃতীয়বার, ১৮৫০-'৬০ সালে চিনের ইউহান নামের একটি গ্রাম থেকে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে। সেখানে তখন খনিজ শ্রমিকদের বেজায় ভিড়, কাজেই রোগটা ছড়িয়ে পড়তে একেবারেই সময় নেয়নি।

দীর্ঘদিনের গবেষণার পর ১৮৯০ সালে ইংরেজ ডাক্তার স্যার ওয়ালডেমার হফকিন 'কলেরা' রোগের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁর এই আবিষ্কারকে কেউই খুব একটা গুরুত্ব দেননি। সবার মাথায় একটাই ভাবনা, লোকটা না জানি কী টিকা আবিষ্কার করেছেন, শরীরে প্রয়োগ করলে হিতের বিপরীত না হয়! কিন্তু 'প্লেগ' যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখন ইংরেজ সরকার আর কাল বিলম্ব না করে ডাক্তার হাফকিনকে নির্দেশ দিলেন বাইকুল্লার মেডিক্যাল কলেজে টিকা আবিষ্কার করার জন্য। হফকিন উঠে পড়ে লাগলেন, শেষমেশ ১৮৯৬ সালে টিকা আবিষ্কার করে প্রথমে নিজের শরীরেই প্রয়োগ করলেন। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই বাইকুল্লার জেলের আসামীদের ওপর টিকার প্রয়োগ করলেন হফকিন।

এদিকে সে বছরেই হংকং থেকে প্লেগের সংক্রামণ ছড়ালো ভারতবর্ষে; ব্যাপারটা শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি। আসলে তখন বাইরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যাপারটাতে ইংরেজ সরকার এমনই জোড় দিয়েছে, তারা কোনোমতেই মানতে নারাজ যে জাহাজে ইঁদুরের মধ্যে দিয়ে মানবশরীরেও এই রোগ সংক্রমিত হয়। তাঁরা কোনোমতেই বাইরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক কিছুদিনের জন্য হলেও বন্ধ করতে রাজি নন।

তখন বোম্বাই বন্দরই জলপথে বিদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের প্রধান বন্দর। সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ল প্লেগ রোগ গোটা ভারতে। প্রতিদিনই শ'য়ে শ'য়ে মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। প্লেগ

তো সংক্রামক রোগ – সবার মনে এই একটা আতঙ্কই বাসা বেঁধেছে। কেউ কারোর গা ঘেঁষতে পারছেন না। মানুষে মানুষে বিশ্বাসই হারিয়ে যেতে বসেছে। চারিদিকে কেবল মৃত্যুর আবহাওয়া। গোটা ভারতবর্ষ যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। রোগের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরতেই লোকের ভয় করছে, অথচ বাড়িতে বসে থাকলে ভাত-ডাল জুটবে কেমন করে? অর্থাভাব ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে দেশের লোকদের। চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে – সে এক পরিস্থিতি বটে! সরকার তো, সন্দেহজনক ব্যক্তি দেখলেই 'কোয়ারান্টিন সেন্টারে' পাঠাচ্ছেন। অথচ সেখানেও কী গোলমালের শেষ আছে? হিন্দু-মুসলিমরা এক ছাদের তলায় থাকবে না, কী কাণ্ড! কলকাতার অলিতে-গলিতে নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে প্লেগ রোগ। ফুটপাতের বাসিন্দা থেকে শুরু করে জমিদার বাড়ির সদস্য – কারোর ছাড় নেই। অন্যান্যদের মতোই ঠাকুরবাড়ির লোকেরাও কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। দু-একজন বলছেন, কলকাতা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির তো আর একজন-দু'জন সদস্য নয়, এতগুলো লোক সবাই কোথায় গিয়ে আস্তানা গাড়বেন?

এদিকে তো পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রানি ভিক্টোরিয়া সরকারকে নির্দেশ দিলেন এই মহামারী রুখতে আইন বলবৎ করার। কাজেই ১৮৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি 'এপিডেমিক ডিজিজেস অ্যাক্ট' বা মহামারী আইন পাশ হলো খোদ কলকাতায়। বলা হয়েছে, মুখ না ঢেকে যদি কেউ রাস্তায় বেরোয়, তাহলেই কপালে জুটবে পুলিশের মার! মানুষের মুখে-মুখে একটাই কথা – 'কী শাস্তি, এমন দুর্বিষহ জীবন আর সহ্য হচ্ছে না!'

জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির পাঁচ নম্বর আর ছ'নম্বর ঠাকুরবাড়িতে তখন ঘনঘন মিটিং বসছে। সিস্টার নিবেদিতা আসছেন। রাতদিন এক করে সবাই সমাজের কাজে নিজেদের ঢেলে দিচ্ছেন। অসহায় মানুষগুলোর কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের রাতের ঘুম হয় না। মাঝেমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ পাড়ায় পাড়ায় ইন্সপেকশনে বেরুচ্ছেন সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে। চুন বিলি করা হচ্ছে। আর কী কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে – তাই নিয়ে দেদার আলোচনা চলছে।

সেদিন প্রস্তাব হলো, সবাই মিলে চাঁদা তুলে একটা হাসপাতাল গড়লে কেমন হয়? কথাটা উঠতেই প্রত্যেকে এককথায় সায় দিলেন। কাজেই আর বিলম্ব কেন, যেমন ভাবা তেমন কাজ। হাসপাতাল গড়ে তোলা হলো প্লেগ রোগীদের চিকিৎসার জন্য।

শুধু তো সমাজসেবামূলক কাজ নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাতেও মহামারীর প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এক জায়গায় লিখলেন – ''পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না।''

ওই যে আগেই বলছিলাম, নিজের বাড়ি ছেড়ে তখন লোকে এদিক-ওদিক পালাবার পরিকল্পনা করছেন। ঠিক তেমনই হলো আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ক্ষেত্রেও তাঁর বাড়ির কাজের লোকটি প্লেগ রোগ নিয়ে ফিরলেন। একদিন পেরতে না পেরতেই লোকটি চোখ বুজলেন। বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্র বসু। কাজেই আর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বসে না থেকে, তিনি নতুন বাসা বাঁধলেন ১৩৯ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের একটি বাড়িতে।

পরিস্থিতি বাইরে যেমনই হোক না কেন, ঠাকুরবাড়ির অন্দরে অ্যাদ্দিন প্লেগ রোগের চিহ্ন পড়েনি। যদিও অনেকেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন অন্য জায়গায়। কিন্তু এইবার এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। অবনীন্দ্রনাথের একরত্তি মেয়ে শোভার প্লেগ হলো। সময়ও দিল না, নিমেষেই তাঁর প্রাণটা চলে গেল! এই ঘটনায় খুব স্বাভাবিকভাবেই অবনীন্দ্রনাথ আর ওঁর স্ত্রী সুহাসিনী অসম্ভব ভেঙে পড়লেন। যদিও অবনীন্দ্রনাথ শক্ত মনের মানুষ। তাই কান্নাকাটি করলেন না, কেবল চুপ করে রইলেন। এদিকে ওঁর স্ত্রী সুহাসিনীকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। শেষমেশ ডাক্তারের পরামর্শে পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী এবং বাকি সন্তানদের নিয়ে চললেন চৌরঙ্গীর কাছের একটি ভাড়া বাড়িতে।

সেখানে গিয়ে প্রচুর পাখি কিনে পুষতে আরম্ভ করলেন। স্ত্রী সুহাসিনীও পাখিদের সঙ্গে কিছুটা সময় কেটে যায়।

এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে শুরু করলেন এক নতুন ছবি। আঁকার কাজ শেষ করে ছবিটির ক্যাপশন দিলেন – 'শাজাহানের মৃত্যু প্রতীক্ষা।' ছবিটা দেখে সবাই মুগ্ধ। অবনীন্দ্রনাথকে ছবির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'ছবিটা কি এমনি এমনি এত ভালো হয়েছে? মেয়ের মৃত্যুর যত শোক বুকে ছিল, সব উজাড় করে ছবিখানি আঁকলুম।'

আজ এত বছর পর যখন করোনা ভাইরাসের দাপটে আমাদের সব্বার জীবন নাজেহাল, তখন এই ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়ে যায় বইকি। জীবন যখন আছে, তখন খারাপ ভালো মিলিয়ে মিশিয়েই সবটা চলবে। এটা মেনে নেওয়া ছাড়া তো কোনও উপায় দেখছি না। কাজেই সে নিয়ে চিন্তা, দুঃখ না করে, ইতিহাসগুলো জানলে কিছুটা সময় তো অন্যভাবে কাটে। তাই তো তোমাদের এই গপ্পো শুনিয়ে গেলাম।

অনুবাদ গল্প

এক হাজার বছর পরে

সুনির্মল চক্রবর্তী

অঙ্কন ■ শুভনীল ঘোষ

আজ থেকে হাজার বছর পরেও এই পৃথিবী থাকবে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। মানুষ ঘরের বাইরে এসে পৃথিবীকে জানার কৌতূহলে চারদিকে ঘুরে বেড়াবে। সে তখন নিজের বদ্ধ ঘরে থাকতে চাইবে না। সে ছেলে হোক, মেয়ে হোক, বুড়ো হোক, বুড়ি হোক তারা যেন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে তাদের ইচ্ছে ডানা। সেই ডানায় ভর করে কল্পনায় সে কত যে দেশ-মহাদেশ চষে বেড়াবে তা আমি এখনই বুঝতে পারছি।

তখন মানুষ তৈরি করে ফেলবে অনেক অনেক বাষ্পচালিত যান। ওই বাষ্পচালিত যান তাদের কত কাজে আসবে। তারা মহাসাগরের উপর দিয়ে ওই বাষ্পচালিত ডানার সাহায্যে কোথায় কোথায় যেন উড়ে যাবে। সত্যিই কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?

আমেরিকার অধিবাসীরা যারা অনেকেই এতদিন আমেরিকাতেই একপ্রকার বন্দি অবস্থায় ছিল, তারা এই বাষ্পচালিত যানে চেপে ইউরোপ বেড়াতে যাবে। পর্যটকরা শুধুমাত্র রানির প্রাসাদ, লন্ডন আই, বিগ বেন, কভেন্ট গার্ডেন, লন্ডন হিল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি দেখবে না। এসে দেখবে যত পুরানো স্মৃতিসৌধ। বিশাল সব শহরগুলি আর তেমন দেখা যাবে না, কারণ তখন শহরগুলো ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াবে। কী আর করা যাবে!

আজ থেকে হাজার বছর বাদেও মানুষ থাকবে। তবে মানুষ অনেক বদলে যাবে। তার স্বভাবচরিত্রও বদলে যাবে। নদী যত তখনও আগের মতোই বয়ে যাবে। তবে কেউ কেউ একটু ছোট হয়ে যাবে। কেউ আবার পাড় ভেঙে ভেঙে তার গভীরতা বৃদ্ধি করবে। টেমস, ড্যানিউব, রাইন ইত্যাদি নদীর নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। ওরা চিরদিনই ওদের কাজ করে যাবে। দেশকে শস্যশ্যামলা করবে। মৎস্যচাষ প্রভৃতিতে জেলেদের সাহায্য করবে। কৃষিক্ষেত্রে জল পৌঁছাবে। জলবিদ্যুতে সহযোগিতা করবে, পর্যটকদের কাছে

দৃষ্টিনন্দন হয়ে চিরদিন থাকবে। উত্তরের দেশগুলিতে এখনকার মতো তখনও মেরুজ্যোতি দেখা যাবে। তবে পরিবেশ তো দূষণ হচ্ছেই। চারদিকে ধুলো জমছে। মানুষের কীর্তিকাহিনি ধুলোয় ঢেকে যাবে। আজ যারা সমাদৃত, তাদের নাম সেদিন সবাই ভুলে যাবে। সমাধিস্থলে কত মানুষকে আমরা রেখে এসেছি। কতদিন তাদের কবরে গিয়ে ফুল দিয়েছি। চোখের জল ফেলেছি, তাদের কীর্তিকাহিনিও একদিন ধুলোয় মিশে যাবে। তাদের নাম আমরা মনেও করতে পারব না। ওই জায়গাটা তখন হয়তো একজন বড়োলোক ব্যবসায়ীর শস্যক্ষেত্র হয়ে যাবে। সে সেখানে তার বেঞ্চি পেতে তার শস্যখেতের দিকে চেয়ে থাকবেন আর শস্যের হিসাব রাখবেন।

আমেরিকাবাসীরা তখন অস্থির হয়ে উঠবে, বিশেষ করে নতুন অধিবাসীরা। তারা তখন ইউরোপ যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। একে ওকে ডেকে বলবে, ইউরোপ চলো, কিন্তু ইউরোপ যাওয়া কি অতই সহজ? হতে পারে ওটা তাদের পিতৃভূমি, অনেক স্মৃতি জড়িত। রোমাঞ্চ-রহস্যের দেশ। পাসপোর্ট-ভিসা থাকলেই কি হবে? তখন হয়তো আরও কড়াকড়ি হবে। তখনকার দেশ প্রধানরা ভাববেন। তাদের মাথায় যে কী খেলা করবে তা তো সময়ই বলবে, আজ থেকে এক হাজার বছর পরে।

তখন আকাশযানে আকাশ ছেয়ে যাবে। ছোট বড় নানা ধরনের নানা রকমের আকাশযান। সবসময় যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকবে। এয়ারপোর্টে গেলে দেখা যাবে যাত্রীরা উঠছে আর নামছে। ছোট বড় শহরে রেলগাড়িতে যেমন ভিড় থাকে অনেকটা ওইরকম ভিড় দেখা যাবে। পেট্রোল জ্বালানি হিসাবে থাকবে না কারণ তখন মাটির গর্ভে পেট্রোল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিকল্প কোনও জ্বালানি তখন বাজারে চলে আসবে। খরচও বোধহয় অনেক কমে আসবে। জাহাজে চলাফেরার চেয়ে মানুষ আকাশযানকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে বেছে নেবে।

আমেরিকার পর্যটক অথবা নব্য অধিবাসীদের কাছে ইউরোপ তখনও যেন রূপকথার দেশ। রোমাঞ্চ বা রহস্যে মোড়া একটা গোটা দেশ। দিনের শেষে আকাশযান আয়ারল্যান্ডের উপর দিয়ে যখন যাবে তখন যাত্রীরা সবাই ঘুমে মগ্ন থাকবে। চিরকাল তো তাই হয়ে এসেছে। তবে ইংল্যান্ড পৌঁছাবার আগে তাদের সবাইকে ডেকে দেওয়া হবে। এটাই যেন নিয়ম হয়ে এসেছে। এই দেশটাকে কেউ কেউ বলেছেন ‘শেকসপিয়রের দেশ।’ কেউ কেউ আবার ব্যঙ্গ করে বলেছেন আসলে ইউরোপ হলো ‘রাজনীতির আড্ডাখানা।’ তবে কাজের কথা হলো, এ দেশকে অনেকেই বলেছেন ‘যন্ত্রপাতির রাজ্য’।

এই দেশটা ঘুরে দেখতে একটা গোটাদিন লেগে যাবে। তাতে অবশ্য সবকিছু দেখা হবে না। সেটাই স্বাভাবিক। ইউরোপের জগদ্বিখ্যাত দৃশ্যগুলো দেখবার মতো। একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। দৃশ্যগুলি দেখবার জন্য রীতিমতো হইচই পড়ে যাবে। এমন সব বিজ্ঞানী এদেশে জন্মেছিলেন যাদের কথা না বললেই নয়। রজার বেকন, নিকোলাস কোপারনিকাস, পোল্যান্ডের ছোট্ট শহর টুয়ানে জন্মেছিলেন কোপারনিকাস। তারপর এলেন টাইকো ব্রাহে, গ্যালিলিও গ্যালিলেই। তাঁকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। এছাড়াও উইলিয়াম হার্ভি, রবার্ট বয়েল, আইজাক নিউটন প্রমুখ। নিউটন একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। ক্যালকুলাসের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। বোস্টনে জন্মেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য, শিল্প, মুদ্রণ এমন কী রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তড়িৎ নিয়েও অনেক কাজ করেছিলেন তিনি। এছাড়াও যারা মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তারা হলেন হেনরি ক্যাভেনডিশ, মাসেফ ক্রিস্টলি, এডওয়ার্ড জেনার প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছেন চার্লস ডারউইন।

এইসব সমাদৃত, পরম প্রতাপশালী মানুষের নামও সবাই ভুলে যাবে। ঠিক যেমন সমাধিস্তূপের তলায় যারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের নাম স্মরণ করতে আমরা ভুলে গেছি।

নব্য অধিবাসীরা আকাশযানে চেপে এবারে এসে পৌঁছাবে ফ্রান্সে– যা কিনা নেপোলিয়নের দেশ বলে পরিচিত। ফ্রান্সের একটি ছোট্ট শহর ডোলে। ১৮২২ সালে এই শহরের এক গলিতে জন্মেছিলেন লুই পাস্তুর। ১৮৫৩ সালে ফ্রান্স সরকারের ‘লিজিয়ন অব অনার’ উপাধি লাভ করেন পাস্তুর। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হলো জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার।

ফ্রান্স বরাবরই শিল্প সংস্কৃতির দেশ। প্যারিস শহরের নাম এ ব্যাপারে শিল্প রসিকদের মুখে মুখে ফেরে। এখানে অনেক বড় বড় কবি সাহিত্যিকরাও জন্মেছিলেন। তাঁদের নামও আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে আজ থেকে এক হাজার বছর পরে।

ওদিকে বাষ্পচালিত আকাশযানটি, যে তার যাত্রা শুরু করেছিল, তা তখনও থেমে যায়নি। কলম্বাসের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ? যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। স্পেন দেশ থেকে কলম্বাসের জাহাজ রওনা হয়েছিল, সেই দেশের ওপর দিয়ে এখন ওই বাষ্পচালিত আকাশযানটি উড়ে চলেছে। লাল সাদা কত রঙিন ফুলে ঢাকা উপত্যকা সে পেরিয়ে গিয়েছে তা তার খেয়াল নেই। সেখানে কোনও চাষবাস হয় কিনা জানা নেই। কিন্তু অনেক ফুল সেখানে ফুটে থাকে। তাদের সকলেই যে খুব সুগন্ধী ফুল তাও নয়। কিন্তু তারা সেই উপত্যকার শোভা বৃদ্ধি করে। ফুল থাকলে স্বভাব কবিদের জন্ম হতেই পারে। সঙ্গীত শিল্পীরাও জন্ম নিতে পারে। এইসব নব্য কবিদের কথা, নতুন শিল্পীদের নাম তখন জনমানসের মধ্যে পরিচিত হবে– আজ থেকে এক হাজার বছর পরে।

বাষ্পযান এরপর এসে পৌঁছাবে ইতালি। ‘রোম নগরী’ দেখার কৌতূহল সব পর্যটকেরই থাকে। বিশেষ করে আমেরিকার যারা নব্য অধিবাসী, তারা তা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু সেই রোম নগরীতে এখন আছেটা কি? এখন যে সেখানে কোনও চিহ্নই নেই। সেন্টপলের গির্জার কথাই ভাবো না, সেখানে গেলে একটা ভাঙা দেয়াল ছাড়া আর কি পাব? সেটাও যে সত্যিকারের সেন্ট পলের গির্জার অংশ তাও কে বলতে পারে? এখানে কয়েক ঘণ্টা কাটাবার পর ওদের আর ভালো লাগবে না। ওরা উড়ে যাবে গ্রিসের দিকে। ওখানেই ওলিম্পাস পর্বত। পর্বতের চুড়োয় রয়েছে কত শৌখিন হোটেল। সেখানে একটা রাত থেকে গেলে মন্দ হয় না। ওরা তাই করল। অবশ্য এর পেছনে একটা কারণও ছিল। যাতে দেশে ফিরে প্রতিবেশীদের, বন্ধুদের বলতে পারে ওলিম্পাস দেখে এসেছি। এখানে থেকে সময় কাটিয়ে ওরা এল বসফরাস শহরে। এটাই নাকি একসময় বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। এখন সেখানে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার সময়। গ্রিসের শিরদাঁড়া যেন ভেঙে পড়েছে। আর্থিক অনটন তাদের যেন গ্রাস করেছে। এই

দেশটাকে ঠিক কী ভাবে কতটুকু পাওয়া যাবে, তা ভাবলে মন শিউরে ওঠে। অথচ গ্রিসের কথা বলতে গেলে কত বিজ্ঞানীদের নাম উঠে আসে। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী কে? প্রশ্ন করলে একটিই নাম উঠে আসে তিনি থ্যালিজ। গ্রিক বিজ্ঞানী। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৫ থেকে ৫০০ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। গ্রিক সভ্যতার অন্যতম কারিগর ছিলেন পিথাগোরাস। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন। এছাড়াও বলা যায় ডেমোক্রিটাস, হিপোক্রেটিস, অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ), ইউক্লিড, আর্কিমিডিস, হিপার্কাস, প্লিনি, টলেমি বা গ্যালেনের নাম। এইসব পরম প্রতাপশালী নামও ধুলোয় মিশে যাবে, তাঁদের কথা সবাই ভুলে যাবে– আজ থেকে এক হাজার বছর পরে।

এরপরই বাষ্পচালিত যানটি উড়ে চলল। সামনেই ড্যানিউব নদীর তীর। তার পাশেই এক মস্ত শহর। শহর এতদিনে ধূলিসাৎ হয়েছে। ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে কিছু দেখার নেই। উড়ন্ত যান ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে উড়ে চলল। তারপর কিছুদূর গিয়ে নেমে এল। এমন সব জায়গায়, যেগুলি এখনও ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাই নেই, যাদের তেমন কোনও পরিচয় নেই, আগামীতে হয়তো নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা সমৃদ্ধ হবে। পর্যটকদের এখানে কিছুই দেখার নেই। আকাশযান আবার উড়েই চলল।

এবার দেখার মধ্যে একটি বড় জায়গা হলো জার্মানি। একসময় রেলপথ আর খালপথ নির্মাণে এদেশের বেশ নাম ছিল। এখানকার মস্ত কবি ছিলেন গ্যেটে। তিনি অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর অনেক খ্যাতি ছিল। এখানকার বিখ্যাত সঙ্গীত সাধককে কে না জানে? তাঁর নাম মোজার্ট। বলা যায় তিনি ছিলেন সুরের সম্রাট। জার্মানির বন্দর শহর কিয়েলে জন্ম হয় বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। তিনি আলো নিয়ে নতুন কথা বলেছেন। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ দক্ষিণ জার্মানির উলস শহরে আইনস্টাইনের জন্ম হয়। আকাশের একটা নতুন ধারণা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতে আকাশের উপরিতল সমতল নয়, বাঁকানো। কতভাবে কত লোক এই দেশকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের আলোয় আলোকিত হয়েছিল এদেশ বলা যায়। এখন তাঁরা নেই, তাদের নামও কালে কালে সবাই ভুলে যাবে।

জার্মানি একদিনে দেখা হলো। সকলের ইচ্ছে সুইডেনটা দেখলে হয় না? সুইডেনের নাম বললেই আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেলের নাম মনে পড়ে। ১৮৩৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি হয়তো সমাদৃত বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারকে অভিনন্দিত করবার, সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করে গিয়েছেন তিনি। ঘুরে ফিরে সুইডেন দেশটাকে বেশ ভালোই মনে হলো।

অনেকেই উষ্ণ প্রস্রবণের কথা বলছিল। ফিরবার পথে আইসল্যান্ডে যাওয়া হলো। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ আর টগবগ করে ফোটে না। হেকলা আগ্নেয়গিরি নিয়ে আগে অনেক দুর্ভাবনা ছিল। সেই আগ্নেয়গিরি এখন নিভে গেছে। তবে সেখানে সেই বিশাল পাথুরে দ্বীপ আজও বিদ্যমান। চারদিকে বিশাল সাগর। অফুরন্ত ঢেউ আছড়ে পড়ছে সেখানে।

আমেরিকার অল্পবয়সি অধিবাসী বা নব্য অধিবাসীরা এবার ঠিক করল দেশে ফিরে যাবে। তাই হলো, আকাশযান এবার আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ওরা দেশে গিয়ে বলল, যাই বল ইউরোপ একটা ছোট্ট দেশ নয়। অনেক দেখবার জিনিস আছে সেখানে। অনেক জ্ঞানীগুণী, অনেক বিজ্ঞানী সেখানে তাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশটাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছেন।

(হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসনের In a thousand years গল্প অবলম্বনে)

মতিমুকুন্দ হাই স্কুল ও নীহার

রতনতনু ঘাটী

অঙ্কন ▪ দেবনাথ নন্দী

অনিরুদ্ধস্যার মতিমুকুন্দ হাই স্কুলে বাংলা পড়ান। স্কুলের এরকম নামকরণের কারণ, মতিকান্ত মাইতি আর মুকুন্দগোপাল সামন্ত, গ্রামের এই দু'জনের দান করা জমিতে স্কুল তৈরি হয়েছে। তাই ছোট করে দু'জনের নাম রেখে স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে মতিমুকুন্দ হাই স্কুল। ক্লাসে ঢুকেই অনিরুদ্ধস্যারের চোখ চলে যায় ফার্স্ট বেঞ্চের ডান দিকের প্রথম সিটে। ওই সিটে বসে অমল প্রতিহার। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। তারপর তাঁর চোখ ঘোরে লাস্ট বেঞ্চে। ওখানে বসে নীহার দলপতি। এর পর স্যার ক্লাসে রোল কল শুরু করেন।

ক্লাসে ঢুকেই অমলকে স্যার খোঁজেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ছাত্ররা অবাকও হয় না। সব স্যারই ভাল স্টুডেন্টকে বেশি পাত্তা দেবেন, এ আর নতুন কথা কী? কিন্তু লাস্ট বেঞ্চের নীহারকে খোঁজেন কেন?

নীহার ক্লাসে পড়া করে আসে না। পড়া ওর মাথায়ই ঢোকে না। বুদ্ধিতেও বেশ খাটো নীহার। এটা ছাত্রদের সিদ্ধান্ত নয়। স্বয়ং অঙ্কের নলিনস্যারের ঘোষণা! বাদুলে মেঘ যেমন করে নিমেষে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলে, নীহার সম্পর্কে নলিনস্যারের সিদ্ধান্তও এখন শুধু ক্লাস এইটেই আটকে নেই, গোটা স্কুলে চাউর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাকি বলা ভালো উড়ে বেড়াচ্ছে।

এ কথা নীহারের কানেও যে পৌঁছেনি, তা নয়। তবে সে এসব কথায় গুরুত্বই দেয় না। তার ধ্যানজ্ঞান হলো খেলা। খেলা মানে ফুটবল। নীহার গোলকিপার খেলে। খুবই ভাল গোল সেভ করে। বিপক্ষ দলের পেনাল্টিও বেশ কয়েকবার আটকেছে। সব স্যারের কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হলে কী হবে নীহারকে কিন্তু হেডস্যার

সন্ন্যাসীচরণ বসাক পাত্তা দেন। আন্তঃ অঞ্চল স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের তিন-তিনটে বিজয়ীর শিল্ড স্কুলে হেডস্যারের চেম্বারের আলমারিতে সাজানো হয়ে আছে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন, এ নীহারের কৃতিত্বের ফসল।

পড়াশুনোয় কাঁচা হলে কী হবে, নীহার সরস্বতী পুজোর দিন সকলবেলা কোত্থেকে যে তিন-চারটে পদ্মফুল তুলে আনে কে জানে! শীতকাল তো পদ্মফুল ফোটার সময় নয়। তবু নীহার পদ্মফুল তুলে আনে দূরের কোনও একটা গাছ মরে আসা পদ্মঝিল থেকে। তারপর পুরুতঠাকুরকে অনুরোধ করে একটা আস্ত পদ্মফুল সরস্বতী প্রতিমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয় নীহার। ক্লাস এইটে পড়লে কী হবে, সরস্বতী পুজোর প্রীতিভোজে প্রধান ভূমিকা নেয় সে।

নীহার অঙ্কস্যারকে ভীষণ ভয় করে। অঙ্ক না পারাটাই নীহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা। অঙ্ক পারতও না নীহার। তখন নলিনস্যার হনহন করে অফিসঘরের দিকে হেঁটে যান। ওখানে তিন-চার রকমের বেত ঝোলানো থাকে। এই বেত একমাত্র ব্যবহার করেন অঙ্কস্যারই। সরু বেতটা এনে নীহারকে হাত পাততে বলেন। তারপর গুনে-গুনে দশবার বেত মারেন। এই ঘটনা প্রায় নিয়মিত ঘটতে থাকে বলে ছাত্রদের আলাদা করে সমবেদনা বা দুঃখ কিছুই মনে হয় না।

এবার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পর ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষক-ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ। দিন পনেরো পরে মানে মার্চের গোড়ায় ম্যাচটা হওয়ার কথা ছিল।

একদিন হেডস্যার স্কুলের প্রেয়ারের পর বললেন, 'কাল টিভির সংবাদে দেখিয়েছে, চীনদেশ থেকে কোভিড-নাইনটিন নামে একটা বিপজ্জনক ভাইরাস পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। তার পশ্চিমবাংলায় আসতে আর কতক্ষণ লাগবে? তার আগে আমাদের স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র ফুটবল ম্যাচ আর পরীক্ষার রেজাল্টের ব্যাপারটা সেরে নিতে হবে।' তারপর স্পোর্টসস্যার বনদেববাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বনদেব, তুমি দিন তিনেকের মধ্যে ম্যাচটা অ্যারেঞ্জ করে ফ্যালো।'

বনদেবস্যার বললেন, 'ঠিক আছে। তা হলে পরশুই ম্যাচটা হোক!'

সহপ্রধানশিক্ষক মলয়বিকাশবাবুর দিকে তাকিয়ে হেডস্যার বললেন, 'মলয়, অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্টটা দিন দশেকের মধ্যে রেডি করে ফ্যালো। ওসব ভাইরাসটাস এসে গেলে রেজাল্ট বের করতে পারা যাবে না হয়তো। তখন কী কাণ্ডটাই না হবে!'

বনদেবস্যার ঘোষণা করে দিলেন, 'শুক্রবার বিকেলে ফুটবল ম্যাচ হবে।'

শিক্ষকদের চেয়ে ছাত্রদের দিকে উৎসাহের পাল্লা অনেক বেশি। যে নীহার লেখাপড়ায় সব সময় এত পিছিয়ে থাকে, সে হেডস্যারের মুখ থেকে কথাটা শোনামাত্রই টগবগ করে ফুটতে শুরু করে দিল। সব ম্যাচের মতো নীহার এবারও ছাত্রদের টিমের গোলরক্ষক। শিক্ষকদের টিমের গোলরক্ষক বাংলার অনিরুদ্ধস্যার। শিক্ষকদের টিমে যিনি ফরোয়ার্ডে খেলতেন, তাঁর বাড়িতে কার যেন অসুখ। তিনি দেশের বাড়িতে চলে যাবেন। এবার ম্যাচে খেলতে পারবেন না শোনা যাচ্ছিল। আর এও শোনা যাচ্ছিল, এবার অঙ্কের নলিনস্যার নাকি সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলবেন।

কথাটা কানে আসার পর থেকে নীহারকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। অমল প্রতিহার বলল, 'কী রে নীহার, নলিনস্যারকে অঙ্কের ক্লাসে তো ভয় পাস জানি। কিন্তু স্যার ফরোয়ার্ডে খেলবেন শুনে ভয় পাচ্ছিস নাকি? স্যার কিন্তু অনেককে কাটিয়ে গোলের জালে বল জড়িয়ে দিতে পারেন, মনে রাখিস কিন্তু! ওই যে, মারাদোনার সেই বিখ্যাত গোলটার কথা মনে নেই?'

স্কুল ছুটির পর নীহার বাড়ি ফেরে দেরি করে। স্পোর্টসের বনদেবস্যার খেলার মাঠে ঘাসের উপর বসে কত না গল্প শোনান। অমলের কথার উত্তরে নীহার বলল, 'আরে রাখ! আমি বনদেবস্যারের কাছ থেকে পৃথিবীর সেরা গোলকিপার লেভ ইয়াসিনের গল্প শুনেছি। তোরা শুনলে অবাক হয়ে যাবি, ইয়াসিন বারো বছর বয়সে অস্ত্র কারখানায় কাজ করতেন। তিনি রাইফেলের গুলি তৈরি করতেন। একশো একান্নটা পেনাল্টি শট আটকেছেন জীবনে। তাঁকে সকলে 'ব্ল্যাক প্যান্থার' বলে ডাকত। আর আমি নলিনস্যারের শট আটকাতে পারব না? কী যে বলিস!'

খেলা শুরুর আগে হেডস্যার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখতে গিয়ে বললেন, 'আমাদের সারা দেশে আজ রাত থেকে করোনা ভাইরাসকে আটকানোর জন্যে প্রধানমন্ত্রী লকডাউন ঘোষণা করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এর পর থেকে এরকম সম্মিলিতভাবে ফুটবল খেলা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। সকলকে সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনে চলতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে আমাদের আজকের ম্যাচটা উল্লেখযোগ্য। সকলে ভালো ফুটবল খেলো!'

স্কুলের সেক্রেটারি দীনেশবাবু রেফারি। ঠিক তিনটেয় খেলা শুরুর বাঁশি বাজালেন। খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রবল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে গোলশূন্যভাবে খেলার ফার্স্টহাফ পেরিয়ে গেল। স্যারের দল একটা পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু নীহার অসাধারণ দক্ষতায় বলটা ঘুসি মেরে গোল পোস্টের উপর দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হেডস্যার এসে নীহারের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে গেলেন।

শুরু হয়ে গেল শেষ হাফের খেলা। স্যারেরা মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে লাগলেন ঘনঘন। বল এবার নীহারের গোলপোস্টের সামনেই ঘোরাঘুরি করছে। মাঠের বাইরে থেকে ছাত্রদের চিৎকার উঠছে, 'নী-হার! নী-হার!'

খেলা যখন শেষের দিকে, ফলাফল গোলশূন্য। রেফারি ঘনঘন খেলা শেষের সময় দেখছিলেন। এমন সময় ছাত্রদের টিম সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে গেল স্যারদের সীমানায়। গোল হয়-হয়, এমন সময় স্যারদের সব খেলোয়াড়ই পিছিয়ে গিয়ে রক্ষণাত্মক খেলছেন।

এমন সময় নলিনস্যার একা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ঝড়ের বেগে বল নিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন ছাত্রদের রক্ষণভাগের দিকে। তখন নীহারকে কিছুটা দিশাহারা লাগছিল। ওদের খেলোয়াড়রা নিজেদের রক্ষণভাগে তখনও ফিরতে পারেনি। অমন সময় নলিনস্যার বল পায়ে ছুটে আসছেন গোলের দিকে। নিরুপায় হয়ে নীহার এগিয়ে গেল গোলপোস্ট ছেড়ে নলিনস্যারকে আটকাতে। তীব্রগতিতে দু'জনের মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগল। স্যার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। নীহার তখন স্যারের পা থেকে বল কেড়ে নিয়েছে। রেফারি খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। তখনও মাঠে পড়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছেন নলিনস্যার।

খুব ভয় পেয়ে গেছে নীহার। নীহারের বুটের কাঁটা এসে লেগেছে নলিনস্যারের হাঁটুর নিচটায়। রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। কী করবে

ভেবে ঠিক করতে পারছে না নীহার। একবার স্যারের হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল নীহার পারল না। হেডস্যার সহ সকলে দৌড়ে এসে নলিনস্যারকে মাঠে শুইয়ে দিয়ে বরফ দিচ্ছেন।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল নীহার। ক্লাসে অঙ্ক না পারলে স্যার যে ভঙ্গিতে বেত মারতেন, সেই মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। ছুটতে শুরু করল নীহার। বাড়ি পৌঁছে পুকুরঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগল নীহার। স্যার যদি ভাবেন, নীহার অঙ্ক না পারায় স্যারের মারের বদলা নিয়েছে? মনে-মনে বলতে লাগল, 'স্যার, আমি ইচ্ছে করে আপনাকে আঘাত করিনি, বিশ্বাস করুন স্যার।'

দূরের মহকুমা শহরে নলিনস্যারের বাড়ি। স্কুল থেকে অনেকটা দূরে বাসাভাড়া নিয়ে একা থাকেন। দেশে লকডাউন হওয়ার ফলে বাড়ি ফিরতে পারবেন না।

অমলের সঙ্গে পরদিন দেখা হতে সে বলল, 'জানিস তো, কাল নলিনস্যার আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনও রকমে বাসায় ফিরেছেন। হেডস্যারও সঙ্গে ছিলেন। নলিনস্যারের হাঁটু ফুলে ঢোল। লকডাউনের জন্যে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কী হবে কে জানে?'

একটু বেলা বাড়তে নীহার মাকে সব কথা বলল। আর বলল, 'মা, তুমি চটপট ভাত রেঁধে দাও। আমি নলিনস্যারকে পৌঁছে দিয়ে আসি। উনি খোঁড়া পায়ে দাঁড়াতেই পারছেন না। রান্না করবেন কী করে?'

নলিনস্যারের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। নীহার দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'স্যার, আসব?'

ভিতর থেকে উত্তর এল, 'কে? এসো, ভিতরে এসো!'

টিফিন ক্যারিয়ারের ব্যাগটা এক ধারে রেখে মুখ নিচু করে নীহার দাঁড়াল স্যারের বিছানার পাশে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'ওতে কী আছে?'

লজ্জিত মুখে নীহার বলল, 'মা রান্না করে দিয়েছেন। এতে আপনার দু'বেলা কুলিয়ে যাবে। আমি কালও আবার আপনার জন্যে খাবার নিয়ে আসব!'

'তুই আবার অত কষ্ট করতে যাবি কেন?' তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই খেলার সময় যেভাবে কাল অন্যায়ভাবে আমার পায়ে মেরেছিস, সেটা তো ভুলিনি। তোর আনা খাবার খাব না! তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা।'

নলিনস্যারের আঘাত পাওয়া পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে নীহার বলল, 'স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি বলটা আটকাতে গিয়েছিলাম। আপনাকে আহত করতে চাইনি স্যার! আপনি বিশ্বাস করুন!' নীহারের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল হু হু করে।

নলিনস্যারেরও চোখের পাতা ভিজে উঠল। বললেন, 'এখন সারা দেশে লকডাউন শুরু হয়ে গেছে। আমি তো বাড়ি ফিরতে পারব না রে। যতদিন পা না সারছে, ততদিন তোর আনা খাবার আমি খেতে পারি, তবে একটা কন্ডিশান মানতে হবে তোকে। কী, রাজি?'

'আপনি আমাকে যা শাস্তি দেবেন, আমি মেনে নেব স্যার।'

এমন সময় বাইরে সাইকেল স্ট্যান্ড করে রাখার শব্দ হলো। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকলেন হেডস্যার। নলিনস্যারের পায়ের কাছে নীহারকে বসে থাকতে দেখে হেডস্যার হেসে বললেন, 'কী হয়েছে নলিন? নীহার কি কালকের অপরাধের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে?'

নলিনস্যার মুখে একটা কপট হাসি চেপে রেখে বললেন, 'না স্যার! আমি খোঁড়া পা নিয়ে রান্না করতে পারব না বলে নীহার মাকে দিয়ে আমার জন্যে রান্না করে এনেছে। আমি ওকে বলেছি, ওর খাবার আমি খেতে পারি, তবে একটা কন্ডিশান আছে।'

হেডস্যার কৌতূহলি মুখে তাকালেন নলিনস্যারের দিকে। নলিনস্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'ও আমার জন্যে খাবার আনার সময় সঙ্গে করে ওরও খাবার আনবে। সেই সঙ্গে আনবে ক্লাস এইটের অঙ্কবই আর খাতা। আমরা দু'জনে একসঙ্গে ভাত খেয়ে অঙ্ক করতে বসব।' তারপর নীহারের দিকে তাকিয়ে নলিনস্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নীহার, তুই রাজি তো?'

হেডস্যার হা হা করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি একটা জম্পেশ কন্ডিশন ভেবে বের করেছ তো নলিন। বাঃ, ভারী সুন্দর!' বলে হেডস্যার নলিনস্যারকে বললেন, 'তুমি তো লকডাউনে বাড়ি যেতে পারবে না। আটকে গেলে। আমি এসে তোমাকে দেখে যাব। তুমি সাবধানে থেকো!'

তখন নীহারের চোখের সামনে থেকে সরসর করে জলছবির মতো মুছে যাচ্ছে, ক্লাসে অঙ্ক না পারার জন্যে নলিনস্যারের হাতে বেত খাওয়ার সব যন্ত্রণাময় স্মৃতি। পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করার পর তার মলিন মুখচ্ছবি।

নীহার চট করে ঘাড় নেড়ে রাজি হয়ে বলল, 'কাল থেকে অঙ্কের বই আনব স্যার!'

তারপরই ঘটল সেই অবাক-করা ঘটনা! কিছুদিন পরে করোনা ভাইরাস পৃথিবী থেকে মুছে যেতে ফের স্কুল খুলল। ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় নীহার যে সেবার অঙ্কে ছেষট্টি নম্বর পেয়েছিল, সে খবর মতিমুকুন্দ হাই স্কুলের সকলেই জানে!

পাঁচিলের ওপারে

রাহুল চট্টোপাধ্যায়

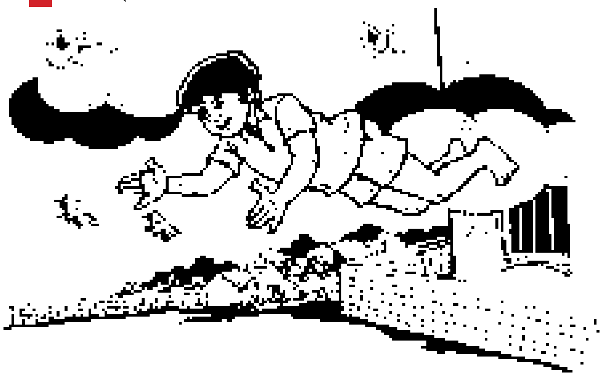

অঙ্কন ■ প্রদীপ গোস্বামী

বাড়ির পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে থাকে মাদল। চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে পাঁচিলটা। কোনোদিন সে এমনভাবে দেখেনি। আজ এই ঘেরা পাঁচিলের দিকে জানলার একটা ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে অবাক হয়ে যায় মাদল। কত বড় বাড়ি তাদের আর কত বড় পাঁচিল। এই বাড়িটার ঘরগুলোতে কত লোক থাকে। এখন কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না সে, পাঁচিলে যেন আটকে গিয়েছে সবাই, যাদের সঙ্গে বিকালে সে খেলত তারাও যেন হারিয়ে গিয়েছে কোথাও।

পাঁচিলটা পেরিয়েই বড় রাস্তা। রাস্তার বাঁদিকে সরু গলি পেরলেই মাদলদের ইসকুল। মনে পড়ে ইসকুলের কথা। ইসকুলটাকে ঘিরেও এমন পাঁচিল আছে। তার মধ্যে মাঠ, তারা খেলত সেখানে, আবার যখন ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়ত ফিরে যেত ক্লাসে। তখন ইসকুলের কথা ক্লাসের কথা ভাবলে ভয় করত। এখন কেমন মনখারাপ লাগে তার। কতদিন সে যায়নি ইসকুলে, বেরোতেই পারেনি বাড়ি থেকে। মন খারাপের মধ্যেও মনে পড়ে ইসকুলের রাস্তাটার কথা।

ক্লাস থ্রিতে পড়ে মাদল। মায়ের সঙ্গে ইসকুল যেত সে। মা অফিস যাওয়ার পথে পৌঁছে দিত তাকে। আর ফিরত সে একাই, ফেরার সময় কি আনন্দ! প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় বেড়ে ওঠা গাছ আর ফুলগুলোতে হাত দিয়ে দেখত সে। কোনোদিন বৃষ্টির পর এইসব গাছের পাতায় আটকে থাকা জলের কণায় হাত দিয়ে খুব ভালো লাগত তার। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে সে দেখত পাখি, প্রজাপতি আর পোকামাকড়দের আনাগোনা, পোকামাকড় দেখে ভয় করত তার, তবু সে দেখত আর হেঁটে চলত একটু একটু করে।

ইসকুলের রাস্তাটা যে কেন এত সুন্দর তা সে ভেবেই পেত না। এই রাস্তাটা পেরিয়ে যখন সে সকালে ইসকুলে ঢুকত তখন মন খারাপ হতো, আবার বাড়িতে এলেও মন কেমন করত, মনে হতো সে কেন প্রজাপতিদের মতো সারাদিন ওই গাছে গাছে বাগানে বাগানে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে না! তাদের ক্লাসরুমটা কেন এমন ফাঁকা রাস্তায় তৈরি হয়নি। ওই পথেই সে ছড়া মুখস্থ করত, অঙ্ক শিখত! ভাবতে ভাবতে বৃষ্টির মতো একটুকরো জল পড়ে হাতে। তাকিয়ে দেখে আকাশে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। খুব আনন্দ হয় তার। মনে পড়ে ইসকুলের কথা – ক্লাস ঘরের জানালাটার কথা, ওই জানালা দিয়ে সে বৃষ্টি দেখত। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে চেষ্টা করত। জানালার বাইরে বাদাম গাছটায় চুপটি করে বসে থাকা পাখিগুলোকে দেখে সে ভারী মজা পেত। এসব ভাবতে ভাবতে নিজে নিজেই ছড়া বলতে থাকে মাদল।

ছড়া বলতে বলতেই ঘরের দিকে তাকায় সে। মা, বাবা দু'জনেই ব্যস্ত। কেউ তার ছড়া শুনছে না। ওরা যে সারাদিন ল্যাপটপ নিয়ে কি করে ভেবেই পায় না সে। এখন বাবা-মা অফিস যেতে পারে না – তবু একটুও খেলে না তার সঙ্গে! মনটা খারাপ হয়ে যায় তার। ছড়া থামিয়ে দেয় মাদল।

সামনে পড়ার টেবিল। সেখানেই গিয়ে বসে। পাখার হাওয়ায় উড়ছে তার খোলা বইয়ের পাতা– ভালো লাগে না ঐসব বই, আঁকার খাতা, পেন সব কিছু। চারিদিকে তাকিয়ে সে কেবল দেখে দেওয়াল। দেখতে দেখতে ক্লান্ত লাগে মাদলের। ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে। কারা যেন কথা বলে– মাদল শুনতে পায়, উত্তর দিতে পারে না। তার স্বপ্নে তখন উড়ন্ত রঙিন প্রজাপতি। ওরা উড়ে চলেছে– দূরে– মাদলও ছুটছে ওদের পেছনে পেছনে– পেরিয়ে চলেছে বন্ধ ঘরের দেওয়াল আর একটার পর একটা পাঁচিল– চারিদিক থেকে পাখিরাও উড়তে থাকে নতুন এক আকাশের বুকে।

ইচ্ছা করে

জিয়াদ আলী

পাহাড় ছুঁলে ঠিক পাহাড়ের মতো
বড় হওয়ার ইচ্ছা জাগে মনে,
ঝরনা তখন গান শোনাতে থাকে
ঘুম ভেঙে হয় পাখিও চনমনে।

তিস্তার জলে খলবলিয়ে ছোটে
নামতে থাকে সবুজ সমতলে,
ইচ্ছা করে পা ডুবিয়ে থাকি
পাহাড়ি সেই নদীর শীতল জলে।

সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধরে
বইছে নদী, থামতে যেন মানা
একলা চলার দুঃখে সে কি কাঁদে?
নদীর দুঃখ হয়নি আমার জানা।

পাহাড় ভাবে আমার বুকে এসো
অঢেল শুদ্ধ বাতাস তোমার চাই,
ঝরনা বলে শুনবে নতুন সুর
বৃক্ষ জানায় দেবো মিষ্টি ঠাঁই।

ইচ্ছা করে নোংরা শহর ছেড়ে
নীল পাহাড়ের দেশে চলে যাই।

জাগছে হৃদয়পুর

কালিদাস ভদ্র

লকডাউনে একলা খোকা
রং তুলি নিয়ে ঘরে,
উড়ুং পাখি ফুড়ুং পাখি
ডাকছে ছাদের পরে।

শিশির ভেজা ভোরের ঘাসে
শিউলি ধরে তান,
করোনা ভয়ে মৌমাছিরা
ভুলেছে যে গান।

কাশের বনে উঠল তবু
আগমনীর সুর,
মহামারী মাড়িয়ে পায়ে
জাগছে হৃদয়পুর।

বন্ধ ঘরে খোকার খাতা
স্বপ্নে যে তাই মাখা,
রামধনুর সাতটি রঙে
করোনা যোদ্ধা আঁকা।

করোনার কলরব

কৃষ্ণ ধর

চারদিকে একই কলরব
কোরোনা কোরোনা কোরোনা
মা বলছেন ছেলেকে, কোরোনা
মেয়েকে ধমক দেন, কোরোনা
দস্যি মেয়ে নিন্দে করবে লোকে
মেয়ে বলে, তাহলে কী করবো
সে কথা তো কেউ বলে না
শুধু বলে কোরোনা কোরোনা কোরোনা
থাকো তালাবন্দি হয়ে
সকাল সন্ধে শোনো একই কলরব
কোরোনা কোরোনা কোরোনা।

নাটক

পাক

সৌরভ পালোধী

(প্রথমে দেখতে পাই একটা ১৪ বছরের ছেলে, নাম অরিত্র জেলে বসে আছে, সেখানে বসে সে খাতায় লেখালেখি করছে। আবার খানিক পর দেখতে পাই, সেই ছেলেটাই হাতে প্রচুর খাতা বই নিয়ে, কয়েদিদের পোশাক পরে, কোনও একটা নিউজ চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। স্টেজের একটা অংশে দেখতে পাই কিছু রাগে ফেটে পড়া জনতা হাতে পোস্টার নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে। এই তিনটে দৃশ্য পরপর মন্তাজের মতো করে ফিরে ফিরে আসে। আর স্লোগানের ভিড় বাড়তে থাকে, তার মাঝেই অরিত্রর মায়ের গলা শুনতে পাই, ওকে ঘুম থেকে ডাকছে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। আগের মন্তাজটা পুরোটাই অরিত্রর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখানো হবে। আস্তে আস্তে স্লোগানগুলো হারিয়ে যায়, আর মায়ের ডাকটাই প্রাধান্য পায়। অরিত্রকে দেখতে পাই, ঘুম থেকে ওঠে এবং বেশ বিরক্ত মায়ের ওপর তার স্বপ্নটা পুরো দেখতে না দেওয়ার জন্য। কোনোমতে চোখটা খুলে দরজাটা খুলে দেয়।)

মা - দুবার চা বানানো হলো, দুবারই ঠান্ডা হয়ে গেল, বেলা ১১টা বাজে, রবিবার বলে মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি। একটা বছর পর মাধ্যমিক, বাবা কিন্তু বাজার থেকে ফিরে চরম রাগ করবে আমি বলে দিলাম। নে এবার মুখ হাত পা ধুয়ে একটু বই নিয়ে বস। তোর বাবা ঢুকলো বলে, রোজ রোজ এই অশান্তি আর ভালো লাগে না আমার।

(অরিত্র মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে)

মা - যা পারিস কর, বিশাল লায়েক হয়ে গেছিস, মায়ের কথা কানে ঢুকবে কেন, আমি জল বসিয়ে দিচ্ছি, একেবারে চান করে বেরোবি।

(অরিত্র মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে)

অরিত্র - মানুষ চাইলে, ভারত জমিন, হয়ে উঠবে পাক

তোর ছেলেটা সাড়া না দিলে, ওকে সাফল্যর বলে ডাক।

(মা কিছু বুঝতে না পেরে থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, অরিত্র আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়,

দর্শক দেখতে পায় অরিত্র একটা গিটার নিয়ে এই গানটা সুর দেওয়ার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে স্টেজের আলো নিভে গিয়ে, অন্য প্রান্তে আলো জ্বলে। সেখানে দেখতে পাই অরিত্র আর ওর বাবা মা দুপুরে খেতে বসেছে, ভাতের থালার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসে আছে।)

বাবা – কুড়ি মিনিট আগে একটা প্রশ্ন করেছি, উত্তর পাইনি।

(আবার কোনও সাড়া শব্দ নেই)

মা – ভাত কটা খেয়ে নে না বাবা।

বাবা – তুই কি চাইছিস, পরিষ্কার করে বল। অনেক স্বপ্ন তোকে ঘিরে, তোকে এস্টাব্লিশড দেখতে চাই। আমার প্রশ্নের উত্তরটা দে, আমি কথা দিচ্ছি আমার যতই কষ্ট হোক, আমি তোকে পালটা কোনও প্রশ্ন করবো না।

মা – উচ্ছে ভাজাটা দিয়ে একটু মাখ না বাবা।

বাবা - আজ শুধু আমি ...

অরিত্র – রাগের সাথে হিংসাতে মিলে কাটাকাটি হয়ে যাক
তোর ছেলেটা সাড়া না দিলে, ওকে সাফদার বলে ডাক।

(খাবার টেবিল আবার স্তব্ধ হয়ে যায়, থালায় হাল্কা আওয়াজ করে এই লাইনটার সুর করার চেষ্টা করে অরিত্র। এই বিকট সাইলেন্সটা ভাঙে অরিত্রর মা।)

মা – তোর জন্য মাংসটা করলাম, একটু খা বাবা।

বাবা – তুই খা, না খা, তুই মর বা বেঁচে থাক, আমার কিছু এসে যাবে না, শুধু বল তুই চাইছিস টা কী?

অরিত্র – আমি সাফদার হতে চাই।

(আবার খাবারের টেবিল জুড়ে নৈঃশব্দ)

(বাবার চোখ বা মুখ দেখে খুব ধরা গেল না তাঁর অভিব্যক্তি)

অরিত্র - মানুষ চাইলে, ভারত জমিন, হয়ে উঠবে পাক
তোর ছেলেটা সাড়া না দিলে, ওকে সাফদার বলে ডাক।

(বাবা তখনও নির্বিকার)

মা – এসব ছাইপাশ কোথা থেকে শিখে আসছিস বল তো।

অরিত্র – (বাবার দিকে তাকিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে হাতে একটা বই নিয়ে বলে) আদিত্য গুইন তোমার নাম তো?

(বাবা তখনও নির্বিকার)

অরিত্র – (বইটা বাবাকে দেয়) থ্যাঙ্ক ইউ। (মায়ের দিকে তাকায়) ছাইপাশ বাড়ি থেকেই শিখছি।

(অরিত্র বলে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। আস্তে আস্তে স্টেজের এই জোনের আলোটা নিভে যায়)

(একটা ছোটো ক্লাব ঘর, সেখানে কিছু মাঝবয়সি ছেলে মেয়ে পথ নাটকের রিহার্সাল করছে। সেখানে স্কুল থেকে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে অরিত্র।)

অরিত্র – গানটা পুরোটা লেখা হয়ে গেছে।

১ – কাল রাতেও তো বললি হয়নি, লিখলি কখন?

অরিত্র – স্কুলে আটটা পিরিয়ড, কম সময় নাকি।

২ – কি ভালো লিখেছিস গোটা নাটকটা।

অরিত্র – অ্যারেস্ট করবে বলছো?

১ – তুই একটা চরিত্র পাঠ করবি না?

অরিত্র – আরেকটু শিখেনি, তোমাদের মত বড়ো হয়ে করবো।

২ – (গিটারটা ছুঁড়ে দেয়) গানটা গাইবি তো?

অরিত্র – মইটার ওপর দাঁড়িয়ে, খোলা আকাশের তলায় মাথা উঁচু করে গাইবো।

১ – গোটা গানটা শোনার জন্য মুখিয়ে আছি।

২ – কোথায় লেখা, দেখা না।

অরিত্র – (ব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করে, দিতে গিয়েও দেয় না) কাগজ আমি দেখাব না।

(সবাই হো হো করে হেসে ওঠে, হাসির মাঝখান থেকেই অরিত্র গানটা ধরে)

অরিত্র – চাইলে কাগজ, দিল্লিতে গিয়ে কাগজ চিবিয়ে খাই
রক্তে আগুন জ্বলছে, আমরা সাফদার হতে চাই।

(আরও আগের লাইনগুলো রিপিট হতে পারে)

(আস্তে আস্তে আলো নিভে যায়, ঘরে রাতের খাবারে টেবিলে আলো জ্বলে, বাবা, মা, অরিত্র বসে)

অরিত্র – সবাই বলেছে জানো, আমার লেখাটা নাকি খুব ভালো হয়েছে, নাকি খুব হার্ড হিটিং।

মা – তোদের কিছু হবে না তো?

অরিত্র – নিশ্চয়ই হবে দেখো। সবাই কত পরিশ্রম করছে, আর এটা তো শুধু নাটক নয়, শাসককে সরাসরি প্রশ্ন করা। তোমার ঠাকুরকে ডেকো, দেখো কিছু একটা হবেই।

মা – কি যে বলিস, তোর কথা কিছু বুঝি না বাপু। কি জানি, সব ভালো হলেই ভালো। নে খাবার কটা খেয়ে নে।

অরিত্র – তোমরা পারলে কাল রিহার্সাল দেখে যাও, রাস্তায় খুব ভিড়

হবে, সব স্কুল কলেজের জমায়েত। বাবা একবার নাটকটা পড়ে দেখতে পারতে। মা আরেকটা মাছ দেবে?

মা - তোর পরীক্ষা কবে?

অরিত্র – পরের মাসে, চিন্তা করো না, যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট হবে। রাজনীতি চর্চা পড়াশোনার ক্ষতি করে না, বরং খানিক উপকার করে।

মা – তবু ছাত্র-ছাত্রীদের এসবের রাজনীতির মধ্যে থাকার কি খুব দরকার?

বাবা – “যখন রাজনীতি তোমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে, তখন তুমিও রাজনীতির ভবিষ্যৎ ঠিক করবে”।

মা – আমার এসবের মাঝে কথা বলাই উচিত না।

(এটা বলে মা অন্য ঘরে চলে যায়)

অরিত্র – থ্যাঙ্ক ইউ নাটকটা পড়ার জন্য।

(বাবা মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে যায়)

অরিত্র - হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়, মানুষ বলে ডেকো
বাড়ির দেওয়ালে ধর্ম নয়, সাফদার তুমি থেকো।

(আস্তে আস্তে স্টেজের আলোটা নিভে যায় এবং একটা ট্রিটমেন্ট আলো তৈরি হয়। এই গান এবং মিউজিক্যাল ট্রিটমেন্টে পরের দিনের রিহার্সালটা দেখানো হয়, সেখানে দেখতে পাই সবাই অরিত্রকে নিয়ে খুব মাতামাতি করছে। অরিত্র বিশাল দাপট নিয়ে মইতে উঠে গান গাইছে আর বাকিরা কোরিওগ্রাফ করছে, সে এক অদ্ভুত লালচে আগামীর দৃশ্য গড়ে উঠছে। সব থেকে তৃপ্তির যে দৃশ্য তা হলো, দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে অরিত্রর বাবা ও মা। ওই দৃশ্য ওখান থেকে মার্জ করে অরিত্রর ঘুমোনোর ঘরে আসে, যেখানে অরিত্র একা বসে গিটার নিয়ে গানটা গুন গুন করে চলেছে। কিছুক্ষণেই বাবা এসে একটা টোকা দিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। গিটার থেমে যায়।)

অরিত্র – হ্যাঁ বাবা, কিছু বলবে?

বাবা - কাল গলা ছেড়ে গাস।

অরিত্র – সবাই মিলে গাইবো, ওদের কান অবধি পৌঁছবেই

বাবা – তোর তৈরি সাদা ক্যানভাস, লালচে তুলি পাক
কোনও সন্তান সাড়া না দিলে, তাকে সাফদার বলে ডাক।

(বাবা খুব গর্বিত হয়ে তাঁর মুষ্ঠিবদ্ধ আকাশে ছুঁড়ে দেয়, ছেলে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।)

(এখানে আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়, একটা ইউনিয়ন রুম তৈরি হয়, যেখানে ওরা পথে নামার আগে শেষ রিহার্সালটা করে নিচ্ছে। সবাই গোল করে হার্ডল করার মতো করে দাঁড়িয়ে, ডিরেক্টর মাইমে সবাইকে কিছু বোঝাচ্ছে, মিউজিক্যাল ট্রিটমেন্টে দেখতে পাচ্ছি। শেষ এক লাইন সবাই একসাথে বলে ওঠে।)

কোরাস - মানুষ চাইলে, ভারত জমিন, হয়ে উঠবে পাক
তোর ছেলেটা সাড়া না দিলে, ওকে সাফদার বলে ডাক।

(এটা বলার সাথে সাথে শার্প কাটে লাইট অফ হয় এবং ওদের ঘরের আলো জ্বলে ওঠে, সেখানে ওর বাবা পায়চারি করছে আর মা হাতে একটা হাফ বোনা সোয়েটার নিয়ে বসে। বাবাকে প্রথমবার এত স্বতঃস্ফূর্ত এবং কথা বলতে দেখতে পাই।)

বাবা – মাধবী তুমি যতই অরিত্রর ওপর রাগ করো না কেন, কোনও ক্লাস ৯-এর ছেলের হাত দিয়ে এই লেখা

বেরোতে পারে বলো তো?

মা – তা ঠিক, তাও পড়াশোনাটা ক্ষতি হয়ে যাবে না তো?

বাবা – কি অদ্ভুত, এটাও তো পড়াশোনা। স্কুল কলেজের প্রতিটা সাবজেক্ট তোমাকে উত্তর দিতে শেখাবে, কিন্তু একটা সঠিক রাজনীতি তোমাকে প্রশ্ন করতে শেখাবে।

মা – মাধ্যমিকটা পাশ করে যাবে তো গো?

বাবা – হ্যাঁ এখন সবাই পাশ করে যায়।

(বাবা খানিক থেমে থেকে ছেলের স্ক্রিপ্টের খাতাটা তুলে নেয়)

বাবা – আহা !! কি লিখেছে, মানুষ চাইলে, ভারত জমিন, হয়ে উঠবে পাক,
তোর ছেলেটা সাড়া না দিলে, ওকে সাফদার বলে ডাক।

(আবার খানিক নৈঃশব্দ)

বাবা – ‘পাক’ মানে জানো মাধবী?

মা – পাকিস্তান?

বাবা – পবিত্র

(কয়েকটা গুলির শব্দে, আলোগুলো নিভে যায়)

(একটা মিউজিক্যাল ট্রানজিশনে দৃশ্য পরিবর্তিত হতে থাকে, মিউজিকের সাথে কান্নার আওয়াজ আর স্লোগান মার্জ হতে থাকে। দৃশ্যে দেখতে পাই একটা সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ, কিছু ছেলে মেয়ে পতাকা প্ল্যাকার্ড হাতে ভিড় জমিয়েছে, কিছু নিউজ রিপোর্টার, একটা ভিড় অরিত্রর লেখা গানটা গাইছে, পুলিশ দাঁড়িয়ে আর ডাউন স্টেজে গোটা চারেক সাদা চাদরে মোড়ানো লাশ। ভিড় থেকে বেরিয়ে আসে অরিত্রর বাবা ও মা। মা বড্ড কাঁদছে, বাবা পাথর। পাশে দুই পুলিশকর্মীর কথাবার্তা ভেসে এল।)

এক পুলিশ – এই সময় দাঁড়িয়ে, পাক টাক নিয়ে কেও গান লেখে।

(বাবা আর মা একে ওপরের দিকে তাকায়, মায়ের কান্না বৃদ্ধি পায়, বাবার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। পুলিশ হাতে একটা খাতা নিয়ে পর পর চাদর উঠিয়ে শনাক্ত করার জন্য দেখায়। তিন নম্বর চাদর তুলতেই মা-এর কান্না আকাশ ছুঁতে চায়, বাবা ঘাড় নেড়ে জানায় যে এটাই অরিত্র।)

পুলিশ – নাম বলে আইডেন্টিফাই করুন।

বাবা – (খানিক থেমে) সাফদার। (মা ঘুরে বাবার দিকে তাকায়, বাবা চোয়াল শক্ত রেখে কাঁধ থেকে খসে পড়া চাদরটা আবার কাঁধে তুলে নেয়। ছেলের লেখা গানটা ট্র্যাকে বাজতে শুরু করে, সিচুয়েশন বিল্ট আপ হলে কার্টেন পড়ে যায়।)

এক যে ছিল থপথপ

কিন্নর রায়

অঙ্কন ■ কৌশিক ঘোষ

যেটুকু শব্দটব্দ থাকে ঘন আর গভীর জঙ্গলে, সেটুকুই আছে এখন, এই পাতা ছমছম, গাছ ঝুমঝুম, সবুজ সবুজ আলোছায়া আর কালচে, কিন্তু ফিকে অন্ধকারের ভেতর।

থপথপ তার থামথাম চারটে পা আর বুড়ো অজগরের থেকেও অনেক অনেক মোটাসোটা শুঁড় সামান্য নাড়তে নাড়তে চারপাশটা দেখে নিতে চাইল। তার ইয়া মোটকা চার চারটে পা, মাটি থেকে অনেকখানি উঁচু, বড়সড় পিঠের ওপর কয়েকটা জঙ্গুলে রক্তচোষা পোকা, ডাঁশ, যেমন থাকে, তেমনই আছে।

থপথপের সামান্য লালচে। অত্ত বড় বড় পা, শুঁড়ের তুলনায় অনেক অনেক, অনেকটাই ছোট্ট দুচোখের কোণে যে সাদা সাদা ঠিক সাদা সাদা নয়, সাদাটে হলুদ থকথকে আঠা আঠা জিনিসটুকু, তাকে ঘিরেও কালো কালো দু-চারটে পোকা। সেই সব কুটকুটে ঝামেলাদের কিছুতেই ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, অনেক চেষ্টা করেও।

থপথপের দু'ডানা মেলে ওড়া এক বন্ধু আছে এই আলো গেলা সবুজের ভেতর। তার নাম, তার নাম?

তার নাম টু-উ-কি-ই।

সেই টু-উ-কি-ই, মাঝে মাঝে তার থপথপের দু'চোখের কোণ থেকে সামান্য হলদেটে সাদা সাদা ময়লা আর কালো কালো কুটকুটেদের বার করে আনে টেনে টেনে, পরিষ্কার করে দেয়। তখন খুব আরাম হয় থপথপের।

সাফ-সুতরো হয়ে যায় দু'চোখ। আরামে দু'চোখ আসতে চায় বুজে। আর তখন টু-উ-কি-ই তাকে বকে। কিচকিচ করে। পাখি চোখ পাকায়।

এখন গরম কাল।

উফ, কি তাপ রে বাবা সুজ্জির! খানিকক্ষণ গায়ে লাগালেই একেবারে যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে ওঠে। মনে হয় এই বুঝি লালচে, রসগোল্লা রসগোল্লা ফোসকা পড়ে যাবে।

তখন এই ঝমঝম– বড় বড় গাছওয়ালা বনের ভেতর চড়া রোদের তাপে জল প্রায় শুকিয়ে যাওয়া দই-কাদার ভেতর নেমে যায় থপথপ, তার দলের দশ-বারোজনকে নিয়ে। তারপর তো জলে-কাদায় মাখামাখি, অনেক অনেকটা সময়। খানিকক্ষণ কাদা ঘোলানি খেলার পর বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল কুল।

থপথপ আর তার দলবল চাঁদ ছুমছুম রাতে, যখন আকাশের চাঁদকে কে যেন একটা বড় আঁকশি দিয়ে পেড়ে এনে সটান ডুবিয়ে দেয় সেই দই-কাদা জলের ভেতর, তখন তো চাঁদকে ঠিক যেন একটা বড়সড় পাকা কয়েতবেল মনে হতে থাকে থপথপের।

পেকে ওঠা কয়েতবেল শুঁড় দিয়ে ধরে সটান পেটে পুরে দিতে পারলেই ভারী মজা। খিদের মুখে খুব আরাম পায় পেট। সেই সঙ্গে এটাও বলতে থাকে, আরও খাব। আরও খাব। আমার পেট পরিষ্কারের সময় খোসা সমেত আস্ত কয়েতবেলটা নেমে আসে মাটিতে।

এই জল আর নরম, ভিজে ভিজে মাটির ভেতর নামতে নামতে থপথপ, থপথপেরা জঙ্গলের মাথার ওপর ঝুলে থাকা পুন্নিমের ভর-ভরন্ত গোল চাঁদকে খোসা উঠে যাওয়া, বড়, গোল পাকা তাল ভেবে নিতে থাকে। চাঁদ ততক্ষণে আকাশের গা থেকে নেমে এসেছে লাফ দিয়ে, সেই দধি-কর্দমের ভেতর।

এখন বেশ সকাল। এই সবুজ সবুজ ছায়াময় সংসারে আলো বড় তাড়াতাড়ি ফুটে ওঠে। আবার তেমনই সন্ধে বাইরে যে পথঘাট, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, সেখানে অন্ধকার নেমে আসার অনেক আগেই গাছপালায়, লতায় ঘাসে ছায়া ছায়া জ্বর। তারপর তো রাতই। ঘন, কালো রাত্তির। সেই ভূত ভূত, কালি গোলা বন-টনের ভেতর তখন জোনাকির টিপ, টুপ। টিপ, টুপ।

থপথপ তার দলবল নিয়ে যে ঘুলিয়ে থাকা পাঁক পাঁক, নরম নরম দধি–কর্দমে নামে, তখন চাঁদের আলো একটা বড়সড় গলানো রুপো রঙের কাঠবেড়ালি হয়ে লাফ দিয়ে নেমে আসে তার নৌকোর ছইয়ের চওড়া, মাটি রঙ পিঠের ওপর।

এই বাঘ বনে থাকা ঘোঁতঘোঁতানিরা তাদের ঘাড়ে জেগে থাকা শক্ত শক্ত, খাড়াখাড়া কালো কালো লোম নিয়ে নামতে থাকে জল-মাটি ঘোলানো আরামে। এইসব গোঁদারদের যে সর্দার, তার আছে বেশ বড়সড় দু'খানা দাঁত, যেন বিন্দু ছাড়া চন্দ্রবিন্দুটি। সেই দাঁতের রঙে একটু ময়লাটে সাদা নিজের কায়দায় মিশে আছে ঝিম হয়ে।

ঘোঁতঘোঁতানি সদ্দারের দন্তটি সব চেয়ে পোক্ত আর ধারালো। এই বাঘ বনে কবে কবে, সে হবে বহু বছর আগে, ছিল বাঘ। এখন, বহুদিন হলো হলুদ-কালো ডোরাদার কোনও ল্যাজও চোখে পড়ে না।

থপথপ আর দলবল নিয়ে সেই ঠান্ডা জল কাদার শীতল ভূমিতে নামার খানিক আগেই আরামে থাকা গোঁদার সদ্দার তার চারপেয়েদের নিয়ে হালকা ঘোঁত ঘোঁত শব্দ তুলে সবাইকে উঠে আসতে বলে পাঁকমাটি থেকে।

দই-কাদাঅলা জল একটু বৃষ্টি পেলেই, আকাশের ঝিপঝিপ ধারা মুখে মেখে নিয়ে হয়ে যায় বড়সড় এক আয়না। সেই আয়নায় মুখ দেখে চাঁদ আর চাঁদের ভেতর একশো, হাজার, লক্ষ বছর ধরে বসে বসে চরকা কেটে যাওয়া বুড়িমানুষ, চরকা-বুড়িই তো আসলে চাঁদের মা বুড়ি।

কুণ্ডীখানা অল্প অল্প আকাশজল পেলেই পারাখসা নয়, দিব্যি ঝকঝকে বেলজিয়াম, নয়তো ইতালি থেকে আনানো ছবি ধরা কাচ। আর নিজের হাজার পুরানো সেই শণ-নুড়ি চুল কাঠের কাঁকইয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে তারপর একখানা মেমখোঁপা বেঁধে কি হাসি চাঁদের বুড়ির!

কাঠের কাঁকই এল কেমন করে চাঁদের দেশে?

ওমা, সে কি, তাও জানা নেই? কি বিপদ বলত! রূপকুমারী মেয়ে– রূপমালার চুল আঁচড়ানোর সোনার কাঁকই ঐ দূ-উ-র পৃথিবী থেকে উড়তে উড়তে চাঁদে। অ্যাত্তটা রাস্তা আসতে আসতে সোনা যে কী করে যেন কাঠ হয়ে যায়।

যায় তো যায়।

কেন যায়, তা এই গল্প বলিয়েকে যেন আবার জিজ্ঞেস করতে যেও না।

থপথপ আর তার 'কুলো কান মূলো দাঁতের' বন্ধুরা নজর করে দেখেছে, কয়েকদিন ধরে চারপাশে শব্দ, ধড়াম ধড়াম আওয়াজ, বাস-লরি-ট্রাক-প্রাইভেট গাড়ির হুড়ুম দুড়ুম, সবই অনেক, অনেক কমে গিয়ে চারপাশ বেশ হালকা হয়ে গেছে।

বাঘ বনের বুক, পেট চিরে যে রাস্তা তাকে কেটেকুটে দিয়ে, একদম এফোঁড় ওফোঁড় করে, তার কালো রঙ, পিচে কুচো পাথরে যেমন কালো কুচকুচে থাকার কথা, তেমন তো থাকে না কখনওই। জল-কাদা, গাড়ি থেকে চোঁয়ানো পোড়া মবিল। ডিজেল, সব মিলিয়ে এক থকথকে থই থই।

কয়েকদিন হলো গাড়ি আর চলছে না। ট্রাক, লরি– সব বন্ধ। সত্যি বলতে কি, এখন যে বাতাসটুকু থপথপরা পাচ্ছে, আর তা যেন কত হালকা আর ছিমছাম, সবুজ।

গাছেরা– এই বাঘ বনের লম্বা লম্বা, মোটা মোটা পুরানো গাছেরা, তুলনায় অনেক ছোট ছোট তরু ভাইয়েরাও ঘাসেদের সঙ্গে দিব্যি ফিসফিসে কথা জমিয়ে বলতে বলতে জানিয়ে দেয় নিজেদের খুশির কথা।

জানাতে থাকে শ্বাস টানাটানিতে বুক হালকা হওয়ার খবরও।

বাঘ বনের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া চওড়া কালো রাস্তায় কোনও গাড়িরই যাওয়া আসা নেই আর।

ফলে চাপা পড়ে, রাস্তায় থেঁতো, বাটা বাটা হয়ে একেবারে মিশে যাওয়ার আতঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে থপথপে আর তার অন্য অন্য হাতিজনেরা। দশ বারোজনের একটা দল। তারা এখন দিব্যি একবার ওপার একবার এপার করতে পারছে। ধাক্কাধুক্কির কোনও ভয়ই নেই।

শুধু তো থপথপ আর তার হাতিজনেরাই নয়, দিব্যি এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক আসা-যাওয়া করছে শেয়াল, হরিণ, বড় কাঠবেড়ালি আর বেজি, সেই সঙ্গে মোটাসোটা, ওজনদার সাপেরাও।

ঘোরিঘুরি, পায়চারি করতে করতে থপথপের প্রায়ই মনে হয়, আর! এখন– মানে এই কদিনে আকাশ যেন অনেক অনেক বেশি নীল, মেঘেরা হালকা হয়ে গেছে যেন আরও রোদ্দুরে আর মিশছে না পোড়া ডিজেল-পেট্রোল আর মবিলের বিষ।

রাতে যখন চাঁদ আকাশের গায়ে একটা বড়সড় কাঁচা গাব হয়ে ঝুলে থাকে, সেই সময়টাতেই জোনাকিরা উড়তে উড়তে আলোর কুচি হয়ে নেমে আসে কাদা জলে নামা হাতি বাহাদুরের গায়ে, কুলো কান যাদের কারও কারও ছিঁড়ে গেছে বয়সের ভারে, মুলো মুলো দাঁতও আর বেরোয় না তেমন করে। ফলে অনেক বড়সড় গজরাজও গজদন্তহীন, মাকনা।

এরকম দাঁত মাকুন্দ, দন্ত ফোকলা হয়ে যাচ্ছি আমরা কেন, মাঝে মাঝেই সেই চাঁদ ছোপানো জল-কাদাকে জিজ্ঞেস করে থপথপ। তার সঙ্গে সঙ্গে থাকা ছোটরা ডিম ডিম আর পাতা থরথর, একেবারে কচি কচি, কুট্টি কুট্টি, একটু কমজোরিও, তাকে সবাই ল্যাগবেগিয়া বলে ডেকে থাকে হাতিজনেরা।

ডিম ডিম একটু গোলু পোলু, গোলগাল, তাই তার এই নাম। পাতা খরখর, বেশ রোগা, খুবই শীর্ণ বলা যেতে পারে তাকে, আর ল্যাগবেগিয়ার চার পায়ে, শুঁড়ে কোথায় তেমন জোর?

রাতে চাঁদের আলো জ্যোৎস্না হয়ে যাওয়ার পর বটের আঠার থেকেও থকথকে, – ঘন হয়ে গেলে, তখন থপথপের চৌখাম্বা পিঠে সেই চাঁদ ঝুমঝুম সাদাটুকু পিটুলি গোলা হয়ে ছড়িয়ে গেলে আলো টিপটিপ জোনাকিরাও লালচে-হলুদ আলোর ফুল হয়ে একটা, দুটো, একটা দুটো করে নিজেদের বিছিয়ে দিতে থাকে ঝিমকি জ্যোৎস্না জড়ানো কালচে-সবুজ হাতি পিঠে।

চাঁদের আলো দই কাদা হয়ে পুরোপুরি ঘুলিয়ে যাচ্ছেতাই হয়ে যাওয়ার আগে বেলজিয়ান বা ইতালিয়ান কাচ যেন সুস্থির জলে, নিজের ছায়া, চাঁদের ছায়ার কাছে থপথপ জানতে চায়, আমাদের গজদাঁত আর কেন সে ভাবে গজাচ্ছে না?

জল চুপ। এই প্রশ্নের কোনও উত্তরই দেয় না।

চাঁদ শুধু খিলখিল করে একবার হেসে নিয়ে চাঁদের মা বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, দ্যাখো কাণ্ড! থপথপে কী না কী যেন বলতে চাইছে!

চাঁদের মা বুড়ি তার হাজার পুরানো জট পাকার চুল সোনার জয়, রূপমালার সেনার চিরুনি কখন যেন হয়ে গেছে কাঠের, সেই কেঠো কাঁকইতেই আঁচড়াতে আঁচড়াতে মুখ মচকে বলল, ধ্রুস।

জোনাকিরা – টিপ টিপ আলোবাহার – জ্বলা-নেভার আনন্দ নিয়ে চাঁদ দুল-কান আলোয় নিজেদের রঙ বদলাতে বদলাতে হাতি পিঠ থেকে দূর কোনও গাছে, বড়সড় মহাবৃক্ষের ডালে-পাতায়, গুঁড়ির কাছাকাছি উড়ে যেতে যেতে চাঁদ ছোপানো অন্ধকারেই গান গেয়ে উঠল।

থপথপ কিছুতেই তার এই জানতে চাওয়ার কোনও জবাবই পেল না।

আমাদের দাঁত– গজদন্ত– সাদাভাবে, সোজা করে কেউ কেউ গজ দাঁত, হাতির দাঁত– এসব বলে থাকেন, তো সেই বাহারি, লড়াই করারও শক্ত, লম্বাটে, ঠিক লম্বাটে নয়, একটু যেন বাঁকানো সামান্য ময়লাটে সাদা রঙের জিনিসটি আস্তে আস্তে কোথাও কি লুকিয়ে পড়ছে? লুকিয়ে পড়ল।

ডিম ডিম ল্যাগবেগিয়া আর পাতা থরথরের বাবা হিসাবে থপথপ মাঝে মাঝেই চাঁদ থইথই কাদাটে জলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে নিজেকে– আমি, এরকম মাকুন্দ ফোকলা হলাম কীভাবে! কেন হলাম।

ডিম ডিম ল্যাগবেগিয়া আর পাতা থরথরের মা সবুজ অবুঝের অবশ্য এ নিয়ে, মানে থপথপের কেন গজদাঁত নেই, তা নিয়ে অ্যাত্তটুকুন মাথা ঘামানি নেই। বরং তার অনেক বেশি চিন্তা পাতা থরথর, ল্যাগবেগিয়া আর ডিমডিমকে আগলে রাখা নিয়ে। সেই সঙ্গে কোথায় আছে কলাগাছ, মহুয়ার ফল, পাকা গাব, কাঁচা গাব, কয়েতবেল, জমিতে বোনা ধান, সেই সব বিষয়ে।

সবুজ অবুঝের খুব খিদে, পেট ভরা থাকলে শান্তি। ভরা পেটে দুধ বেশি হয়। ছোট ছোট ছানা তিনটে এখনও যে দুগ্ধপোষ্য –মায়ের দুধেই বাঁচে।

জ্যোৎস্না জমানো সেই কাদা থরথর জলে নিজের বে দাঁত মুখ দেখতে দেখতে থপথপ ভাবে আমার কেন গজদাঁত গজালো না?

কোনও ছায়া ছুপছুপ রাতে, যখন আকাশের চাঁদ অনেকটাই যেন ফিউজ হয়ে যাওয়া ব্যাটারি লাগানো আলো, সেই চন্দ্রময় অন্ধকারের ভেতরে সাদা সাদা জোড়া দাঁত সমেত কোনও এক ছায়া হস্তী দর্শন হয় থপথপের।

সেই ভারী, ছুঁচল, জোড়া দাঁতে জোনাকিরা সাজিয়ে নিতে থাকে নিজেদের বৈঠকখানা। আর সেখানে আলোর শাহনাই বেজে ওঠার আগেই কোথায় যেন ফুস হয়ে যায় সেই মায়া হাতি।

থপথপের চিন্তা বাড়ে। তাহলে কি অন্য কোনও বড়সড় বিপদের ছবি ভেসে উঠল এই বাঘবনে. দলছুট কোনও দাঁতাল কি কেড়ে নিয়ে আসছে থপথপের সব কিছু? সর্বস্ব? গোটা হাতি দলটার দখল নেবে সে? এসব নিয়ে দুর্ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় খানিকটা যেন বদমেজাজি আর খিটখিটে হয়ে যেতে থাকে থপথপ। ক্ষমতা, দলের সদ্দার – রাজা হওয়ার ইজ্জত, সবই যদি চলে যায়, তাহলে মান সম্মানের আর রইল কী!

চাঁদ মাখা, চাঁদ ডোবা রাতে কাদা খেলা থপথপ মাঝে মাঝেই তাকায় ডিম ডিম, ল্যাগবেগিয়া আর পাতা থরথরের মায়ের দিকে। ওদের মা – সবুজ অবুঝও তো চলে যাবে বেয়াড়া দাঁতালটার সঙ্গে, যদি সে ঢুকে পড়ে এই বাঘ বনে আর থপথপকে হারিয়ে দেয় দাঁত বা জিতে।

###

সেই ভোরে হালকা হালকা কুয়াশা ছিল। কুয়াশা না বলে তাকে পাতা কান্না, গাছ ক্রন্দন বলাই ভালো।

রাত ফরসা হলেই বাঘ বন পুরোপুরি জেগে গেলে, কখনও কখনও জাগার আগেই টুপটাপ টুপ পাতা খসা সেই সব জলবিন্দুরা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে মাটির ওপর। এক ফোঁটা, দুফোঁটা, তিন ফোঁটা। চার ফোঁটাও। আগের রাতে বৃষ্টি হলে ঠিক এমনটাই হয়।

কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে তুমুল। সকাল সকাল সারা আকাশ মাথার ওপর একটা মেঘলা রঙের তাঁবু ফেলে রেখেছে। সেই ফুটোদার কানাত থেকে মাঝে মাঝেই টুপ টাপ জল নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে।

বৃষ্টি বৃষ্টি।

কালও জল-কাদা-খেলার সময় সেই গজদেঁতোটাকে দেখেছে থপথপ, ঠিক তার ফিঠের পাশে। সবুজ অবুঝের গায়ে সামান্য আড়াল নিয়ে একটু যেন গোপনেই নিজের শক্তপোক্ত শুঁড় বুলিয়ে দিচ্ছে সেই হট্টাকাট্টা দাঁতাল। আর কি আশ্চর্য, এসব কিছু মেনে নিচ্ছে সবুজঅবুঝ।

দেব না একটা ঘুরিয়ে একটা শুঁড়ের বাড়ি নিজের মনে মনেই বলতে বলতে যেই না পাশ ফিরতে চেয়েছে থপপথ, ফিরেছেও, তারপর দেখে কোথায় সেই নবীন গজদেঁতো আর কোথায় কী? সব-সব ফক্কা-ভুউস। একদম ভোঁ-ভাঁ যাকে বলে। সব ভোঁ-ভাঁ হলো কী করে অ্যাত তাড়াতাড়ি? ভাবতে ভাবতে নিজের একটু বুড়ো হয়ে আসা বুদ্ধিশুদ্ধিকে ঝাঁকিয়ে নিতে চাইল থপথপ।

তার চোখে পড়ল ছড়ানো জ্যোৎস্নায় ডিম ডিম, ল্যাগবেগিয়া, পাতা থরথর আর তাদের মা–সবুজঅবুজ পাতানো ঘন জ্যোৎস্নায় কী খেলাই না খেলছে। এ ওর গায়ে কাদা মাখছে, কাদামাখা জল দিচ্ছে।

এসব দেখতে দেখতে থপথপের মনে হলো আরে, আমি কি সত্যি সত্যি বৃদ্ধ হস্তী হয়ে গেলাম? তারপর বলে উঠল নিজের মনেই, না, না, তা কেন! তা কেন, আমি এখনও দিব্যি জওয়ান, মস্ত রাম।

এমন নানান ওঠাপড়ার ভেতর থপথপ যেটা দেখতে পেল না, তা হলো হঠাৎ মেঘলা এসে ঘিরে ধরা চাঁদ তাকে এক চোখ টিপে জিভ ভ্যাঙাচ্ছে।

তো সে যাই হোক, বৃষ্টি বৃষ্টি জল ঝাঁপানো কুয়াশা কুয়াশার ভেতর সেই অতিকায় কোনও বাঁকান, খুব বড় দাঁতঅলা, এক আবছা আবছা কাউকে দেখতে পেল থপথপ।

সেই প্রায় আকাশছোঁয়া পিঠের চার পা একটু একটু করেই যেন ফুটে উঠতে থাকল চোখের সামনে। যেমন ফুটে ওঠে ছবি।

থপথপ সবে এক বন থেকে বেরিয়ে চওড়া, কালো রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে যাবে ভাবছে, এখন আর মোটা, কালচে পাইথন যেন, এমন রাস্তা পেরিয়ে যেতে গেলে দু'পাশ আর দেখতে হয় না। হুসহাস হুসহাস করে দৌড়ে যাওয়া কোনও গাড়িই তো নেই। সব বন্ধ। কি স্বস্তি! কি আনন্দ!

রাস্তার ওপারের বাঘ জঙ্গল থেকে সেই অতিকায়-মহাকায় যেন বেরিয়ে এল।

তার চেহারা, আয়তন থপথপের থেকে প্রায় দেড়গুণ। আবজে রাখা মেঘ টুপটুপের ভেতর সবটা ভালো করে নজরেও পড়ছে না থপথপের।

আপনি– থপথপ ভয় মেশানো জড়ানো গলায় জানতে চাইল।

আমি-আ-আ-মি-ই নিজের অতি বৃহৎ দাঁত দুটি যা প্রায় ছুঁয়ে আছে আকাশের মেঘময় জমি, সারা গা মোড়া বৃষ্টিভেজা কালচে লোম, বড়বড় ঝুলঝুলে, তার ওপর মেঘাল অন্ধকার এসে বসে আছে চুপটি করে। এই সব ছবি দেখতে দেখতেই থপথপ শুনতে পেল, আ-আ-মি-ই ম্যামথ!

ম্যামথ! সে তো ছিল তুষার যুগে বলতে থাকল বাঘ বনের বাতাস।

হ্যাঁ বরফ যুগ। বরফ যুগ। বলতে বলতে ঘাড় সামান্য কি নাড়ালো ম্যামথ! নিজের বহু যুগ আগের, প্রায় চার লক্ষ বছর হবে তা, সেই বি-ই-শা-লের কাছে মাথা নুইয়ে, হাঁটু গেড়ে, চার পা ছড়িয়ে, মুড়ে বসল থপথপ। বসে পড়ার সময় তার মনেও পড়ল না সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে ডিম ডিম, পাতা থরথর, ল্যাগবেগিয়া, সবুজ অবুঝ, আরও কেউ কেউ। হঠাৎ হঠাৎ রাত বিরেতে চলে আসা সেই দেঁতো বজ্জাতটাও আছে নাকি?

বাঘ বনের বাতাস চুপি চুপি প্লাইস্টোসিন যুগ, সেন্টপল দ্বীপ, ভ্রাং গেল দ্বীপ, এসব বলে যাচ্ছে আপন মনে।

আমাদের-হাতি জন্মের অনেকেরই দাঁত চলে যাচ্ছে। গজদাঁত গজাচ্ছে না তাদের। বড়সড় গজদন্ত ছাড়া বড়সড়, ছেলে হাতির বাহার থাকে?

গজ দাঁতের ব্যবহার নেই। যুদ্ধ নেই, রাজায় রাজায়। না থেকে অবশ্য একরকম ভালোই হয়েছে, খাদ্য জোগাড়ের জন্য অন্য অন্যদের সঙ্গে দাঁতবাজি, সব কমে গেছে, তাহলে নিজের ছায়াময় বি-ই-শা-ল দাঁত দিয়ে মেঘপাতাল–আকাশ খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, সেই অতিকায়, আপাতত দন্তবাহার নিয়ে অত ভেবো না। ওটা তোমাদের ভাবনাতেই থাক।

এই যে বনজঙ্গল, পৃথিবীটার কি হবে, তাই ভাব। আমরা তো বিদায় নিয়েছি বহু বছর আগে, আমাদের গা-হাত-পা, হাড়গোড়-কঙ্কাল-সব বেরিয়েছে, বরফ ভূমির গভীর থেকে। সে সব সাজিয়ে সাজিয়ে রাখাও আছে জাদুঘরে।

কিন্তু এখন তো গাড়িঘোড়া সব বন্ধ।

হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পেলে আমায়, বাঘজঙ্গলের ছায়া নিশানিতে।

তাই? জানতে চাইলন থপথপ।

হ্যাঁ। এখন সব বন্ধ কি এক অসুখের ভয়ে। খুবই বেকায়দায় পড়ে গেছে ওরা–মানে দুপেয়েরা। গজদাঁত নিয়ে কম ভাব। তোমরা ভালো থেকো সবাই। বলতে বলতে সেই মহাকায় ঠাকুরদার ঠাকুরদার ঠাকুরদার আরও কত কত ঠাকুরদার ঠাকুরদা যেন মিলিয়ে গেল বাতাসে। মিশে গেল।

থপথপের কেন জানিনা মনে হলো প্রায় সব সময় তার পায়ে পায়ে থাকা সেই পাজি দেঁতোটা আর নেই।

যাক বাবা, এটুকু মনে করে একেবারে যাকে বলে হাঁফ ছাড়লো থপথপ।

শতবর্ষে সত্যজিৎ

ভুলতে পারি না দিনগুলি

অ শো ক বে রা

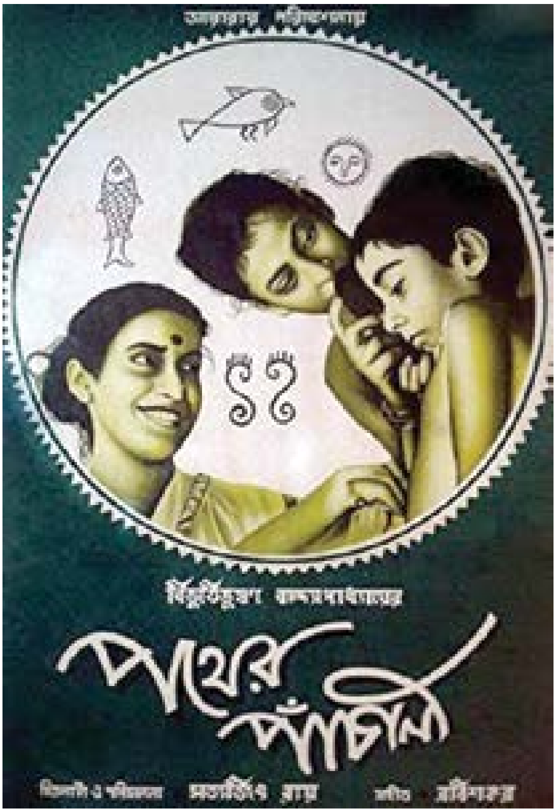

২৪ এপ্রিল, ১৯৯২ বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে দশটা। আমরা অর্থাৎ একদল সন্দেশী পৌঁছালাম নন্দনে। আমাদের গাড়িটা গেটের সামনে দাঁড়াতেই দু'-তিনজন পুলিশ হাজির। 'সন্দেশ' থেকে এসেছি জেনে তারা আমাদের ভিআইপি গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পুলিশ বেষ্টিত একটা ঘরে। যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত দীর্ঘদেহী ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়। চমকে উঠলাম, এ কি চেহারা? গত দশ বছরে যাঁকে দিনের পর দিন দেখেছি, কখনও লিখছেন বা লেখা দেখছেন, কখনও ছবি আঁকছেন বা বই পড়ছেন– এমনকি তিন মাস আগেরও দেখা সেই মানুষটির সঙ্গে। কেউ থাকতে পারলাম না বেশিক্ষণ। পায়ের কাছে সাদা ফুলের মালাটা রেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম একে একে। বাইরে জনারণ্য– কাঠফাটা রোদে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একে একে লাইন দিয়ে চলেছেন তাদের প্রিয় মানুষটিকে শেষ দেখা দেখতে ও শ্রদ্ধা জানাতে। এত মানুষ কিন্তু কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। বিষণ্ণ মনে গাড়িতে একে একে সবাই উঠে বসলাম, কারও মুখে কোনও কথা নেই।

গাড়িতে বসে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, দিদিমণি অর্থাৎ নলিনী দাশের কাছ থেকে শোনা ছোট্ট মানিক সহ ওঁদের ছোটবেলার কথা। ওঁর কথায়– 'বাবার ছিল বিহার-ওড়িশার বদলির চাকরি। ছোটবেলার বেশিরভাগটা আমাদের হাজারিবাগে কেটেছে। তখন ছুটি থাকলেই মামিমা ছোট্ট মানিককে নিয়ে হাজারিবাগ চলে যেতেন ছুটি কাটাতে।

মানিক আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট। আমি, দিদি ছাড়াও আমার দুই খুড়তুতো বোন ও খুড়তুতো দাদা কল্যাণদা থাকতাম। মানিক এলে হতো ছ'জন । সবাই মিলে তখন একটা একটা মজার খেলা তৈরি করতাম– যেমন একটা খেলা ছবি আঁকা। এক-একজন খানিকটা করে এঁকে একটা ছবি সম্পূর্ণ করা হলো, আরেকজন সেটার একটা নামকরণ করল। একবার সেরকম সবাই মিলে আঁকা হলো একটা ছবি– একটা ছাগলকে একজন কাতুকুতু দিচ্ছে! মজা করে মানিক সেই ছবির নাম দিল 'রায় চক্রবর্তী ফাইট'। দেখে আমরা তো খুব হাসছি আর কল্যাণদা রেগে লাল! কারণ আমরা চক্রবর্তী আর মানিক হলো রায়! লেখা-আঁকার খেলায় মানিক কিন্তু আমাদের টেক্কা দিত সবসময়।

'আরেকবার হলো কি, আমরা বাড়ির সবাই পিকনিক করতে বেরোবে, বৃষ্টি এল আর থামে না। বেরোতে চাইছেন না, আমার জেদাজেদিতে বাবা মাকে বললেন, ঠিক আছে চলো কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়া যাক! মানিক সে কথা শুনে আমার এক তুতোবোনকে বলে, শোনো, পিসেমশাই বলছেন, কপাল ঠুকে বেরোলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। চলো, আমরা দেওয়ালে কপাল ঠুকি –' বলে মানিক আস্তে করে দেওয়ালে কপাল ঠুকল, কিন্তু আমার তুতোবোন এমন জোরে কপাল ঠুকতে লাগল আলুর মতো ফুলে গিয়েছে, তবু থামে না। শেষে আমি গিয়ে আটকাই। ছোটবেলা থেকেই মানিক এভাবে নানান কাণ্ড করে বসত।

'কল্যাণদা আর মানিক দু'জনেই এ ওকে টেক্কা দিয়ে ভালো ভালো ছবি তুলত। মাঝে মাঝে ওরা দু'জন ক্যামেরা নিয়ে ফোটো তুলতে বেরিয়ে পড়ত।

'একবার আমরা সবাই কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছি। ডাল লেকে গিয়ে সবাই ছবি তুলছে, সবার বেশ ভালো লেগেছে। মানিকের কিন্তু পছন্দ নয়, কারণ সেখানে কোনও সিনেমা হল নেই বলে। বলে, কলকাতায় এত সিনেমা হল, সুতরাং কলকাতার মতন এত ভালো জায়গা আর কোথাও নেই– এই হলো ছোট মানিক।'

'দিদিমণির খুড়তুতো দাদা কল্যাণবাবুকে আমরা ডাকতাম 'ঝামেলাবাবু' বলে। শেষ বয়সে তিনি থাকতেন চেতলায়, সন্দেশের গ্রাহক ছিলেন। মাঝে মাঝেই আসতেন সন্দেশে। 'ঝামেলা' নামটা দিদিমণিই দিয়েছিলেন এবং ওই নামেই ডাকতেন। কেন তিনি ঝামেলা তা অবশ্য জেনেছিলাম পরে। যাই হোক তাতে কল্যাণবাবু কিছু মনেও করতেন না। যখনই আসতেন প্যান্টের পকেটে কিছু লজেন্স এনে আমাদেরকে বিলোতেন। ওঁর জীবনের নানান ঘটনার গল্পও করতেন। ওঁর কাছেই শুনেছি, ছোট থেকে মানিকবাবুর ঝোঁক ছিল ফটো তোলার দিকে। ওঁর কথায়– 'মানিক ছোটবেলায় যখনই হাজারিবাগে যেত ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে যেত। আমরা দু'জনে বেরোতাম ফোটো তুলতে। কে ক'টা ভালো ছবি তুলতে পারি তার প্রতিযোগিতা হতো। কখনও এমন হয়েছে, আমি কোনও ভালো সিনের ছবি তুলছি, মানিকেরও সেটা পছন্দ হয়েছে, অমনি আমার ঘাড়ের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে ও ওর ক্যামেরায় ছবি তুলতে লাগল। ও আমার চেয়ে লম্বা বলে ওর সুবিধে হতো। একবার এক পাহাড়ের ওপর থেকে আমায় একটা 'ওয়াটার ফল'-এর ছবি তুলতে দেখে মানিকও আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে ছবি তুলতে গিয়ে দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়তে পড়তে কোনোরকম বেঁচে গিয়েছিলাম। যাইহোক তখন থেকেই মানিক বলত, বড় হয়ে সিনেমাটোগ্রাফার হবে।

'তারপর তো বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হলো ক্লাস ফাইভে।

প্রতিবারই পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হলেও বলত– ওই মোটামুটি হয়েছে। কখনও ভালো হয়েছে বলত না। তারপর প্রেসিডেন্সি থেকে বিএ পাশ করে গেল শান্তিনিকেতনে, ভর্তি হলো কলাভবনে। তার কয়েকদিন পর শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখল– কল্যাণদা, আমার এখানে ভালো লাগছে না, এখানে কোনও সিনেমা হল নেই, তবে লাইব্রেরি থেকে দু'-চারটে সিনেমা সংক্রান্ত বই পেয়েছি। খানিকটা সময় কাটছে। তারপর হঠাৎ হাজির কলকাতায়। একদিন থেকে দু'-একটা সিনেমা দেখে আবার ফিরে গেল। এইভাবে প্রায়ই প্রতি সপ্তাহে একবার করে কলকাতায় এসে সিনেমা দেখে যেত। দু'-আড়াই বছর কাটিয়ে পাকাপাকি চলে এল শান্তিনিকেতন থেকে, আর গেল না সেখানে। এই হলো মানিক।'

সেই ঝামেলাবাবুর কথার রেশ ধরে বলি– মানিকবাবু কলকাতায় ফিরে এলেন ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে। পরের বছর এপ্রিলে বিজ্ঞাপন সংস্থা 'ডি জে কিমার'-এ চাকরিতে যোগ দিলেন জুনিয়র আর্টিস্ট হিসাবে ৮০ টাকা মাইনেতে। একথা জেনেছিলাম দিদিমণির কাছ থেকে। কিছুদিনের মধ্যে সিগনেট প্রেসে কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্ত কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ-অলঙ্করণের দায়িত্ব দেন। তার মধ্যে ছিল 'পথের পাঁচালী'-র কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'। বইটির কাজ করতে গিয়ে সেটি সিনেমার পর্দায় তুলে ধরার কথা মাথায় আসে তাঁর। তারপর পথের পাঁচালী বইটি এনে পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে সেটির একটা খসড়া চিত্রনাট্য তৈরিও করেন। এরপর প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করলেন ছবি তৈরির কাজ।

তখন তো চাকরিও করছেন– তাই ছুটির দিনে শুটিংয়ের কাজ করতেন। শুটিং স্পট কলকাতার কাছে বোড়াল গ্রামে। অর্থাভাবে ছবির কাজ মাঝে মাঝেই বন্ধ হতো। নিজেদের জমানো অর্থ সব শেষ হলো, কিন্তু ছবি তৈরির কাজ শেষ হলো না। শেষে মায়ের এক পরিচিতার সুপারিশে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক দায়িত্ব নেওয়ায় ছবিটি শেষ হয়। তারপর তো ইতিহাস। তারপর পরের অংশের ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ওই বিজ্ঞাপন সংস্থার চাকরি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে সিনেমা তৈরিতে মন দিলেন।

এরপর ১৯৬১-তে বাপ-ঠাকুরদার প্রিয় পত্রিকা 'সন্দেশ' পুনরায় প্রকাশ করা শুরু করলেন। তাতে সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে আরও একটা জগৎ তৈরি হলো। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি– সাহিত্যিক শিশিরকুমার মজুমদার মাঝে মাঝেই সকালের দিকে মানিকবাবুর বাড়িতে যেতেন। নানান বিষয়ে আলোচনা হতো দু'জনের মধ্যে। যেহেতু সকালের দিকে আমিও সন্দেশের লেখাপত্র দেখানো বা কোনও কাজে ও বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে দেখতাম শিশিরবাবুকে। কাজের ফাঁকে শিশিরবাবু ও মানিকবাবুর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হতো। একদিন মানিকবাবুর লেখক হওয়ার প্রসঙ্গে বলছেন, 'জানো, ছোট থেকে আমি কোনোদিন ভাবিনি লেখক হব। সিনেমা তৈরির ঝোঁকটা ছোট থেকেই ছিল। অথচ দ্যাখো, সম্পাদক হয়ে 'সন্দেশ' বার করতে গিয়ে লেখা শুরু করলাম, দেখতে দেখতে সন্দেশের সঙ্গে লেখার একটা নতুন জগৎ তৈরি হলো। আর লেখা থেকেই আমার রোজগারের জায়গা তৈরি হলো।'

সিনেমা তৈরি থেকে ওঁর একটা শিল্পের জগৎ তৈরি হয়েছে। সিনেমা থেকে বহু পুরস্কার পেয়েছেন, বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন। তেমনই 'সন্দেশ' থেকে সত্যজিৎ রায় আঁকা এবং লেখায়ও কম বিখ্যাত হননি। এইভাবেই তিনি খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছেন।

১৯৮৪-তে আমেরিকায় গিয়ে বাইপাস সার্জারির পর সত্যজিতের

কাজের কিছুটা ভাটা পড়ল। বছর চারেক ছবি তৈরি বন্ধ রাখতে হলো। তবে সন্দেশের কাজ, নিজের লেখা-আঁকা ইত্যাদি কিন্তু চালিয়ে গিয়েছেন। ওঁর শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর কাজ শুরু করলেন '৯১-এর গোড়ায়। ছবির বেশিরভাগটাই ইন্ডোরে হলেও কিছুটা করতে হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। একদিন সন্দেশের বাড়িতেও শুটিং তুলতে আসতে হয়েছিল। যাই হোক শান্তিনিকেতনে শুটিং করতে গিয়ে ডাক্তার বক্সির সঙ্গে দেখা। তিনি মানিকবাবুকে দেখেই বুঝেছিলেন ওঁর হার্টের অবস্থা ভালো নয়। তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে ওঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেন। উনিও ছবির কাজ শেষ করে ফিরে এলেন। কলকাতায় এসেও থেমে থাকেননি। 'আমার তো কিছু হয়নি' এই মনোভাব নিয়ে ছবির কাজ শেষ করলেন। এদিকে ডাঃ বক্সী প্রাথমিক চেকআপ থেকে বুঝলেন হার্টের অবস্থা ভালো নয়, সুতরাং ভর্তি করলেন বেলভিউতে। '৯২-র ২৭ জানুয়ারি বাড়ি থেকে গেলেন হাসপাতালে। মাস তিনেকের মধ্যে ২৩ এপ্রিল ফিরলেন মৃত অবস্থায়। ওই বছর জানুয়ারির মাঝামাঝি এক সকালে আমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সেদিন ওঁর কাছে সন্দেশের যা কিছু লেখাপত্র ছিল সবই আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো সব নিনিদিকে দেখে নিতে বোলো, আমার কাছে আর কিছু নেই' এটাই যে ওঁর শেষ দেখা সেদিনও ভাবিনি!

ভাবতে ভাবতে কখন যে পৌঁছে গিয়েছি বুঝতেই পারিনি। 'সন্দেশ'-এর বাড়ির গেট খোলা শব্দে চমক ভাঙল। ভারাক্রান্ত মনে একে একে সবাই গাড়ি থেকে নামলাম!

২৬টা বছর পার হলো। সেই শেষ দিনটির কথা মনের মধ্যে অম্লান। এই ২০২০ সাল, তাঁর জন্মের শতবর্ষ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সন্দেশ

বাঘের কোভিড পজিটিভ

সাধন চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ শুভ্রনীল ঘোষ

আজও নিয়মিত আড্ডায়, ডাইনিং টেবিলে দিনের প্রথম চায়ের কাপটি নিয়ে সুকুমার দত্ত একটু গলা চড়িয়ে শোনালেন, বুঝলে বৌমা, বাঘেরও ইদানীং করোনা হচ্ছে! বড্ড চিন্তার কথা! সুকল্যাণী আচমকা ধরতে পারে না।

চিন্তা হতে যাবে কেন বাবা? ...আমাদের কি বিপদ?

আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলতেই বৌমা হাসল। গলা চড়িয়ে সমর্থন জানালো, বিপদ তো অবশ্যই! সুকুমার দত্ত পাশের রুমের জন্য শ্রুতিমুখর করে তুলতে বলেন, কথায় বলে রয়্যাল বেঙ্গল। ...সমস্যা তো সেখানে কাগজে পরশু দেকছিলুম...!

দাদাই-এর মুখে 'কাগজে দেকছিলুম' কথাটি লব্জ। উদ্ভট ও মজার কিছু টেনে আনলে শুনিয়ে দেবে মিথ্যে নয়! কাগজে দেকছিলুম!

বাড়িতে নিয়মিত একজোড়া সংবাদপত্র ঢোকে। বাংলা আর ইংরেজি। যার যার পড়বার সময় নির্ঘণ্ট আছে। ইংরেজি খানায় বাপি সকাল সকাল চোখ বুলিয়ে বাথরুম ইত্যাদি সেরে, বাইকখানা নিয়ে বাজারে। ফিরে এসেই চান ও অফিস প্রস্তুতি। সরকারি কিংবা বেসরকারি অফিস তো নয়, দু'পুরুষের মস্ত ওষুধের ব্যবসা। হাজরার মোড়ের কাছে। এখন লকডাউন পর্বে টালিগঞ্জ থেকে বাইকেই যায়, অভ্যেস মতো মেট্রো ধরবার সুযোগ নেই।

বাপি বাজারে চলে গেলে, ফের একদফা চা হয়। দাদু বসেন, আড্ডা চলে, সুকল্যাণীকে সঙ্গ দিতে হয়। চার বছর আগে আচমকা শাশুড়ি চলে যাওয়ার পর, শ্বশুর-ছেলের বউয়ের এটাই তাল-ছন্দ। নাতি-নাতনি দুটি দেখে আসছে এবং তেমন কৌতূহল টের পেলে এসে যোগদান করে। নইলে, আলিয়া ও বুল্টনের কাছে

সুকল্যাণীর হাত ধরে সব কিছু পৌঁছে যায়।

বাপির সংবাদপত্রে চোখ বুলনোর পর, সুকল্যাণী বাংলা কাগজটা মন দিয়ে পড়ে আর দুপুরে ইংরেজিটায় একটু চোখ বোলায়। বাপির পড়বার পর বুল্টন আর আলিয়ার ঝোঁক থাকে ইংরেজি কাগজটিতে। ওরা শহরের সিবিএসসি কোর্সের বিখ্যাত স্কুলটির নাইনের ছাত্র-ছাত্রী। তবে একই সেকশনে নয়। ওরা যমজ ভাইবোন। এব্যাপারে ওদের মধ্যে কোনও কুণ্ঠা নেই, ঝাড়া-ঝাপটা। কারও চোখমুখে বিস্ময়বোধ টের পেলেই হেসে বলে দেবে, হ্যাঁ, আঙ্কল! আমরা টোয়াইন।

তো, বুল্টন ও আলিয়া বাংলা কাগজে দ্রুত চোখ বুলিয়ে, সিনেমা ও খেলার পেজটা খুঁটিয়ে দেখে। এরপর তো তথ্যের জন্য নেট আছেই।

দাদাই-এর বাংলা কাগজটা পড়বার সময় খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা। যাতে না ঘুমিয়ে পড়েন, একটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকেন, মনে রাখেন সব কিছু– বুল্টন-আলিয়া অবধি বিস্মিত। মজাটা এখানেই আর, দাদুর খবরগুলো ওরা চটপট খুঁজে পায় না। দাদু এমন এমন পুরানো খবরের প্রসঙ্গ তুলবেন মা-কে সাথি মেনে, বুল্টন-আলিয়াকে রিঅ্যাক্ট করতেই হয়।

কী ফালতু বকছ দাদাই?

হ্যাঁরে, হ্যাঁ!

কোথায় পেলে এখবর? চ্যালেঞ্জ!

কাগজে দেকলুম দাদুভাইরা।

আমরা বুঝি আর রোজ কাগজ পড়ি না? কবেকার কাগজ বলো? শেষে হই হই করে বুল্টন-আলিয়া দাদুর রুমে ঢুকে ঘাটাঘাটি করে টের পায় অদ্ভুত!

দাদু ঠিক খুঁজে খুঁজে পৃষ্ঠার ঘুপচি থেকে খবরটি দেখিয়ে দেয়। তখন দু'জনের মুখে যেন একগাল মাছি।

মা আড়চোখে মুচকি হাসে। করোনার দীর্ঘ লকডাউনের দিনগুলোয় এগুলোই এখন সংসারে একটু বৈচিত্র্য। নইলে চারপাশে সংক্রমণের খবর আর সংসারের একঘেয়েমি।

রান্না ও ঘরের অন্যান্য কাজের লোকজন ছাড়ানো হয়েছে। আপাত ছুটি তাদের। এমন কি, চার চাকাটা পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় না।

সুকল্যাণী এব্যাপারে তথাগতর পরামর্শ মানেনি।

পারবে? এত ঝক্কি সামাল দিতে?

তা বলে, বাইরের কারও আপাতত ঢোকা চলবে না। ... পড়শির কোনও বাড়িতে অ্যালাউ করছে?

এ যুক্তি 'খন্ডানোর মতো নয়। সুকল্যাণীর শখের একটি বিজনেস আছে– উপহারের শৌখিন বস্তুর দোকান। সে এবং দিদির মেয়ে তিতির– ফাইন আর্টস নিয়ে যে পড়াশোনা করেছে– পার্টনার, করোনাতে আপাত তা-ও বন্ধ।

সুকল্যাণী শুনিয়ে শুনিয়ে ফের বলে, বাবা! বাঘের শরীরে ভাইরাস গেল কি করে? কে ক্যারিয়ার? হঠাৎ ও রুম থেকে আলিয়া হাজির।

কি ব্যাপার? কি হয়েছে? বাঘের গল্প শুনছি দাদাই?

সুকল্যাণই ভেতরে মজা পায়। তির টার্গেটে লেগেছে।

ইদানীং সুকুমার দত্ত একটু বৃদ্ধগোছের হলেও সুপুরুষ চেহারাটির টিপ টপ বজায় রেখেছেন। চকচকে মসৃন টাক, লতানে রূপালি কিছু চুল পেছনে নেমে গেছে। স্ত্রী আচমকা চলে যাওয়ার পর, চেহারা একটু ভেঙেছে যদিও চোখের কোল বসেছে, সারা জীবনের রসেবসে থাকার অভ্যাস বদল করেননি। ঘরের মধ্যেও ধবধবে সুতির পায়জামা-পাঞ্জাবি। গালে বটের ঝুড়ির মতো ফর্সা দাড়ি। আভিজাত্য আছে।

আলিয়ার পরে পরেই রুম ছেড়ে বুল্টন এসে বলে তুই কেন? তোর তো লায়নে ইন্টারেস্ট বাঘের আলোচনায় কেন? কেটে পড়ো!

আলিয়া গম্ভীর সে, শোন বুদ্ধু, আমার ফ্লোরা-ফনা, সব কিছুতেই ইন্টারেস্ট, বুঝলি? তুই একটা লাফিং বুদ্ধু! বুঝলি?

মামণি যমজ ভাইবোনের খুনসুটি বিতর্ক থামাতে একবার শুধু কপালে ভাঁজ ফেলে তাকিয়ে রইল। বিশেষ চাউনিতেই ভাইবোন সংযত। পরিবারের এ ওইতিহ্য সুকল্যাণীর শিক্ষার। সংসারে দাদাইকে ঘিরে এমন আড্ডা প্রায়ই জমে ওঠে। তখনই যদি ভাইবোনের মধ্যে খুনসুটি দানা বাঁধে, মামণির গম্ভীরতায় চটপট সামলে যায়। বেশিক্ষণ খেই হারানো থাকে না। মামণি ও দাদাই-এর মধ্যে এমনই বোঝাপড়া।

বুল্টন বলল, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে কী সমস্যা, দাদাই?

সমস্যা তোমার কাণ্ডজ্ঞান শুনে! সুকুমার দত্ত বললেন।

কেন দাদাই।

ওটা স্পিসিস্টার নাম। ... বর্মার জঙ্গলে হলেও রয়্যাল বেঙ্গল। ... ভূগোলে এখন বেঙ্গল নামটা নেই বলে কি, বে অব বেঙ্গল নামটা বদলে যাবে?

আলিয়া সুযোগ নেয়।

এ জন্যই বুদ্ধু বলা হয় তোকে!

বুল্টন হাসে। দাদাই এবার সিরিয়াস ভঙ্গিতে শুরু করলেন, সমস্যা গুরুতর! ... কাগজে দেকলুম! পুরানো খবর! ... বাঘের করোনা ... নিউইয়র্ক জু-তে হয়েছিল। বুল্টন সবজান্তা সেজে বলে যেতেই, সুকুমার দত্ত গম্ভীর হয়ে শোনালেন, অরিত্রবাবু, এ খবর কাগজে ছবি সহ ছাপা হয়েছিল, সব্বাই জানে!

তো?

আলিয়া ভাইয়ের মাতব্বরিতে উপদেশ ঝাড়ল, তো, তুই এখন মুখ সেলাই করবি ... দাদাই বলবে! মামণি তখন ফের একবার কিচেনে গেছে।

একটু প্রস্তুতি নিয়ে দাদাই বলেন আলিয়াকে, সমস্যাটা কেবল আমাদের নয়। গোটা পৃথিবীর। হই চই পড়ে যাবে। যেমন করোনায় এখন হচ্ছে। ... অবশ্য কাগজে যা দেকলুম। দাঁড়াও! কত তারিখের কাগজ? বুল্টন আঙুল তোলে।

দাদাই এবার নাতনির চোখে চোখ রেখে বল্লেন, সুন্দরবনের সবক'টা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারেরই করোনা পজিটিভ। এই আমফানটার পর!

বুঝল কি করে? ওদের খিদে মরে গেছে? নাকে কোনও 'স্মেল পাচ্ছে না আমফানের পর? আলিয়া প্রশ্ন করল। দাদাই এবার বুল্টনের প্রশ্নের জবাব দিলেন, পরশুর ... সাত তারিখের কাগজে দেকলাম!

বুল্টন ছুটে গিয়ে দ্রুত দাদাইয়ের রুমে ঢুকল। বাংলা কাগজ

পুরানো অবস্থায় ওখানে থরে থরে জমা থাকে। বিক্কিরি হয় না। ইংরেজিটা নমাসে ছমাসে চালান গেলেও, সুকুমার দত্তর হুকুমে বাংলাটা তারিখ অনুসারে সাজানো। এমন কি, যে রাতে আচমকা হৃদরোগে স্ত্রী চলে গেল, পর দিনের কাগজটাও সাজিয়ে রাখতে দত্ত মশাই বৌমাকে হুকুম করেছিলেন।

বুল্টনের অভিজ্ঞতা, যতবার এবং যতদিন কাগজ নিয়ে সে দাদাইকে চ্যালেঞ্জ করেছে একবারও জিততে পারেনি। অথচ, একটিই সংবাদপত্র সকালে পড়ার পর দাদাই শুয়ে শুয়ে চোখ বোলান। খবরগুলো কোন পৃষ্ঠায় কোন স্তম্ভের তলায় যে লুকিয়ে থাকে দাদাই-এর জন্য বুল্টনের কাছে এ রহস্যটির আজও সমাধান মিলল না। খুব কনফিডেন্স নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও পরে দেখেছে, ঘেঁটেঘুটে দাদাই ঠিক খবরটি খুঁটে নিতে জানেন। অথচ বোন আর সে সকালে চার চারটি চোখ মেলে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে কাগজ পড়েছে। বুল্টনের এখন বিশ্বাস, দাদাই ম্যাজিক জানেন। আসলে, ওর খবরগুলো বানানো কিন্তু আমাদের চোখে ছাপা অক্ষরের হ্যালোসিনেশন দেখিয়ে দিতে পারেন।

বুল্টন ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট কাগজটি হাতে নিয়ে এঘরে চলে এল। ভাবখানা এমন আজকের চ্যালেঞ্জ সে জিতবেই। আলিয়ার মধ্যেও একটু আধটু দোলাচল শুরু। বলল, দাদাই ধরেই নিলাম ওদের করোনা হয়েছে! ... আমাদের সমস্যা হবে কেন? কলকাতায় হাজির হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের মতো সংক্রমণ ছড়াতে তো পারবে না?

সুকুমার দত্ত গম্ভীর মাথা নেড়ে বল্লেন, সমস্যাটা সেখানে নয় রে! ... আরও গভীরে! তিরিশ সেকেন্ড নীরবতা চলল।

দেখি বুল্টন! দাদাই এবার শান্তভঙ্গিতে হাতটি বাড়ালেন। বুল্টন এগিয়ে দিল। হাইপাওয়ারের চশমায় খুঁজতে খুঁজতে দাদাই শেষমেশ একটি পৃষ্ঠার কোণা থেকে একটা ফটোগ্রাফ তুলে ধরলেন।

দেখতে পাচ্ছ? স্ট্রেচারে শুইয়ে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? টাইগার নয় অবশ্য এটা, ... টাইগ্রেস, বাঘিনী। ... দু'বছর বয়সের। ... মুখে মাস্ক পরানো দেখতে পাচ্ছ? বুল্টন থ। চারজন মিলে একটা স্ট্রেচারকে বহন করছে। ঘাড় এলিয়ে মাস্কপরা মুখ। চার পা আর লেজটা এলানো। এ ছবি তো চোখে পড়েনি কোনও দিন?

পড়ে শোনালেই টের পাবে। দাদাই এবার চশমা নামিয়ে চোখ মুছলেন, ফের চাপালেন। ইঙ্গিত দিতেই কাচের গ্লাসে জল এল, উনি সামান্য গলা ভেজালেন। তারপর ধীরে ধীরে শোনাতে থাকলেন, কখনো বা চোখ দুটো রহস্যে জড়িয়ে এদের মুখে কিছুক্ষণ ফোকাস করে রাখেন।

আমফানে কান্ধুলিমারি গ্রামটির ক্ষতি সবচেয়ে বেশি ছিল। দু'চারটে মাটির ঘর ছাড়া, বাকি কিছুই আস্ত ছিল না। তো, একটা কুঁড়ে ঘরের বুড়ি সারা রাত অনিদ্রায় কাটায়। এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা জীবনে দেখেনি। খুব ভোরে দেখতে গেছে ছাগলের ঘরটায় বাচ্চাগুলো ঠিকঠিক আছে কিনা। জানবে কি করে আমফানের ভয়ে বাঘও জলজঙ্গল ছেড়ে এখানে উঠেছে। বস্তা ভেবে বাঘের পিঠে হাত

বুলিয়ে দিল বুড়ি। রয়্যাল বেঙ্গলটি রাতভর ওখানে আতিথ্যে কাটিয়ে পরদিন একটু বেলা বাড়লে ছেড়ে চলে গেল আপনা থেকেই। বুড়িকে কিচ্ছুটি করল না।

খবর পেয়ে যে যে অবস্থায় ছিল, পড়শিদের মধ্যে আতঙ্ক। বাঘ পথ দিয়ে হেঁটে গেলে যাকে পাবে, ঘাড় মটকাবে। সারারাত দানাপানি না পেয়ে মারমুখী হয়ে আছে।

কিন্তু বাঘ কিছুই করল না। এমন কি হাঁকডাক গর্জন অবধি নয়। ধীরে ধীরে কাদাজল পেরিয়ে সরু খালটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। তার আগে একটু একটু পেছনে তাকাল। যেন, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়ার জন্য বুড়িকে টা-টা জানাচ্ছে।

কিন্তু ঝামেলা বাধল বন্দরডুবি গ্রামে। গ্রামটা ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দুর্গম অঞ্চল। নৌকো বা লঞ্চে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া কঠিন। তো, একটা পরিবারে বউ রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে টের পেল বাঘ বসে আছে। বাঘিনী নয়, বছর তিনেকের যুবক একটি বাঘ। আর তা নিয়েই বাধল ঝঞ্ঝাট।

খবর গেল বন দপ্তরে। সব্বনাশ! ক্যাজুয়ালটি হলে হই চই বাধবে। বনকর্মীদের সাসপেন্ড হবার ভয়। তাই সাজো সাজো আয়োজন।

চটপট সরকারি দলবল নিয়ে অভিযান চলল ২৪ ঘন্টা। নেতৃত্বে থাকলেন সামসুর আলি নাসের, অভিজ্ঞ বাঘের ডাক্তার।

এমন বিপদ বহুবার সামলেছেন তিনি। রয়্যাল বেঙ্গল সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা। বাঘের মনও খুঁটিয়ে বুঝতে পারেন। মনে পড়ে গেল, দশ এগারো বছর আগে সুন্দরবনে যে আয়েলা ঝড় আছড়ে পড়েছিল, প্রকল্পের কোনও বাঘ এভাবে গেরস্থ বাড়িতে আশ্রয় নেয়নি। এবার যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

করোনার অতিমারী চলছে দেশজুড়ে, বিশেষত কলকাতানগরীতে। তার ওপর আমফান কলকাতাকে শুইয়ে দিয়ে সোজা এসেছে সুন্দরবন। সঙ্গে নিয়ে এসেছে হাজার হাজার ভাইরাস। কোভিড-১৯। রয়্যাল বেঙ্গল বরাবর সোস্যাল ডিসট্যান্স রেখে চলাচল করেই, স্যানিটাইজার ও মাস্ক পাবে কোথায়? যদি আগাম হিসাব থাকত, দপ্তর থেকে সাপ্লাই করা যেত। কিছুদিন আগেই টাটকা বাঘসুমারি হয়ে গেছে, আমাদের হিসাব আছে বাঘের সংখ্যা সর্বশেষ কত।

বন দপ্তর আবহাওয়া অফিসের সতর্কবাণী শুনে থাকলেও আগের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে ঠিক ঠিক মান্যতা দেয়নি। সেবার ফনি নিয়ে কম কাণ্ড গেছে। কোমর বাঁধো, লোকলস্কর ফিট রাখো, সীমানার জাল সারিয়ে রাখো– কম হ্যাপা গেছে? শেষে দেখা গেছিল পথ ঘুরে ফনি ভেন্ন রাস্তা ধরেছে। বন দপ্তর ভাবল, এবারও তাই-ই ঘটতে যাচ্ছে। মাস্ক স্যানিটাইজারের কথা আগাম মাথায় আসেনি।

আলিয়ার আঙুল ওঠে, যেন অবজেকশন প্লিজ বলছে।

কথা আছে দাদাই!

সুকুমার দত্ত থেমে যান। চোখে চোখে তাকিয়ে থাকেন।

ভাইরাস তো চোখে দেখা যায় না ... লালা পরীক্ষা না করে কি করে বুঝল ভাইরাসে আক্রান্ত? এবার দাদাই চোখ নাচিয়ে সামান্য হাসলেন।

সঙ্কট আসলে এখানেই। ... ডাক্তারের স্টেটমেন্ট কাগজে বেরিয়েছে। ... তারই নেতৃত্বে নাকি ও পরিবারের সকল সদস্যকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি, আশপাশের কয়েকটা পরিবারকেও ওই সময়টায় ওখানে রাখা হয়নি। রান্নাঘর মানে তো ভাঙা চালা একখানা। লাফিয়ে যদি অন্য কারও দাওয়ায় ঢুকে পড়ে? বন দপ্তর ভেবেছিল রাতভর বন্দি অবস্থা কাটিয়ে ভোর ভোর বাঘবাবু চলে যাবেন। সকালেই ওদের খিদেটা চমমন করে ওঠে কিনা। দেখা যায়, সুন্দরবনে মাছমারা কিংবা মউলেরা অধিকাংশ ভোরেই বাঘের কবলে পড়ে। সকাল হলেও, বাঘটির বেরুনোর কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তখন বাধ্য হয়েই ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত হয়। আর গুলিটা ছোঁড়েন স্বয়ং সামুসল। তারপর মাস্ক পরিয়ে চার পায়ে ভালো করে স্যানিটাইজার মাখিয়ে, এমনকি লেজেও, স্ট্রেচারে নিয়ে যাওয়া হয় পশু উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে। ... এই যে তার ছবিটা দেখতে পাচ্ছ! ... তারপর ওখানে গিয়ে বাঘের ঘুম ভাঙে। বিপন্মুক্ত হয়। আর তখনই গভীর সমস্যাটা ধরা পড়ে। দেখা যায়, ঘুম ভাঙলে ও বাছাধন গর্জন করছে না। মিটিমিটি তাকায়, হাই তোলে জিভ দিয়ে চেটে মাটির গামলার জল খায়। আশ্চর্য! হেতালের ডাল মুখের সামনে ধরলে, আরামে সে চিবোতে থাকে। ডাক্তার সামসুল আলি সঠিক বিপদটা ধরে ফেল্লেন।

বিপদ কেন? কিসের? আলিয়া কিছুই ধরতে পারে না। দাদাই বল্লেন, ডাক্তারের অভিজ্ঞ চোখ! বুঝে গেছে রয়্যাল বেঙ্গলকে আসলে করোনা ভাইরাসে ধরেছে। বাঘ মানুষের মতো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয় না বা মরেও যায় না। অবশ্য সুস্থও হয় না। স্বভাবটা আমূল বদলে যায়। পুরো অহিংস হয়ে পড়ে। মানুষের কাছাকাছি থাকতে চায়। তাতে আমাদের বিপদ কোথায়?

দাদাই এবার একটু শব্দ করেই হাসলেন।

বুঝলে না দাদাই বিপদটা? বাঘের সৌন্দর্য হিংসার জন্য। দুনিয়ার মানুষ এজন্যই চিড়িয়াখানায় নানা প্রকারের বাঘ দেখতে যায়। আমরা অহিংস জাতি হিংসাকে সম্মান জানাই বলেই তো বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। নইলে, কলকাতার পথে পথে গোরু ষাঁড় ভেড়া বা ময়দানের মাঠে বেচারা ঘোড়াগুলোর মতো, পালে পালে নিরীহ রয়্যাল বেঙ্গল হেঁটে বেড়ালে, বাঘের দাম থাকবে? কেউ তাকিয়েও দেখবে না। তালে আর ব্যাঘ্রপ্রকল্প বা চিড়িয়াখানা বানিয়ে সরকারের ঘরে টাকা আসবে? বহু মানুষের চাকরি চলে যাবে না? দেশে বেকারত্ব বাড়বে। ... এমনিতেই করোনা ভাইরাসে দেশের অর্থনীতি ধসে গেছে। কত মানুষ চাকরি খুইয়েছে। করোনায় বাঘের স্বভাব বদলানো কি সাঙ্ঘাতিক বিপদ নয়?

বুল্টন হঠাৎ 'দেখি দাদাই কাগজটা' বলে হাত বাড়ায়। সুকুমার দত্ত বল্লেন, কেন? চ্যালেঞ্জে হেরে গিয়ে অন্য কিছুর মতলব পাকাবে?

বুল্টন কিছু বলে না। কাগজটা হাতে পেয়ে খুঁটিয়ে প্রতিবেদনটি পড়তে যাচ্ছে হঠাৎ মুখ তুলে, ভুরু কুঁচকে বলে দাদাই, কাজিরাঙাটা কোথায়? বন্যা চলছে? সুন্দরবনের ভেতরে কি?

সুকুমার দত্ত সংবাদপত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে বল্লেন, জানিনে বাপু। ... ওটা ভূগোলের সমস্যা ... আমি করোনা সমস্যা বুঝি! ... বউমা, এক রাউন্ড চা হবে কি?

সুকল্যাণী হেসে সায় দেয়।

অবশ্যই বাবা! ... তোমরা রুমে গিয়ে ডেস্কটপে রেডি হও। ... অনলাইন ক্লাস একটু পরই শুরু হবে!

ভ্রূণমুকুল

মন্দাক্রান্তা সেন

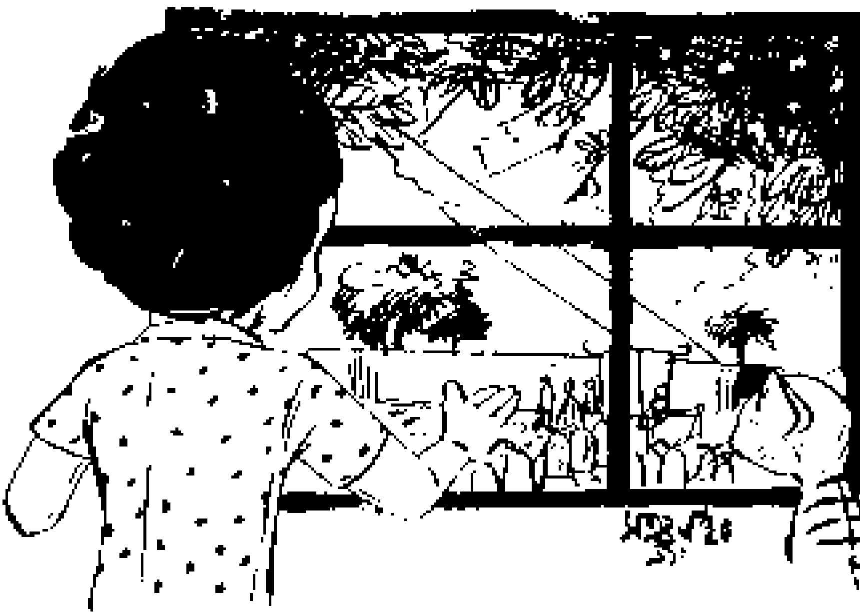

অঙ্কন ■ সঞ্জয় কাঞ্জিলাল

করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন চলছে। অফিস কাছারি স্কুল কলেজ সব বন্ধ। পাপানেরও স্কুল বন্ধ। খেলাও বন্ধ। পাপানের আর কিচ্ছু ভালো লাগে না। অন্যান্য অনেক বাচ্চার মতো মোবাইলে গেম খেলায় তার আসক্তি নেই। টিভিতে কার্টুন দেখতেও তার বেশিক্ষণ ভালো লাগে না। খেলনা নিয়ে খেলতেও মন বসে না। মা বইয়ের আলমারি থেকে অনেক বই বার করে দিয়েছেন। ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, টিনটিন, নানা দেশের রূপকথা। পাপান পড়তে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু কতদিন আর বাড়ি বসে থাকা যায়! সে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে।

—মা, স্কুল কবে যাব?

মা গম্ভীর মুখে উত্তর দেন— দেরি আছে।

—কেন মা!

—তুমি তো জানো পাপান। দেশে একটা অসুখ এসেছে। শুধু দেশে কেন, সারা পৃথিবী এতে আক্রান্ত। এর মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোলে ইনফেকশনের ভয়। এখন বেরনো বন্ধ।

—কতদিন?

মা বিরক্ত হন। বলেন— উফ, পাপান। সময় হলে, দেশ থেকে অসুখটা চলে গেলে তারপর। ততদিন বাড়িতে থাকতে হবে। অধৈর্য হলে চলবে? টিভি দ্যাখো, বই পড়ো। আমি টাস্ক দিচ্ছি, বসে বসে সেগুলো করো। ছটফট কোরো না।

পাপান করুণ মুখে সরে আসে। সে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী এমনটা নয়। তার বয়সি অন্য ছোটদের মতোই একটু দুষ্টু, একটু ফাঁকিবাজ। আজকাল অবশ্য ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। স্কুলে অসম্ভব পড়ার চাপ।

তার ওপর আছে কোচিং ক্লাস। বাড়িতে মায়েরও কড়া শাসন। অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ কম। তবু এখন সে ওই পড়াশোনাটাই মিস করছে খুব। মা বাড়িতে টাস্ক করাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তার বন্ধুরা, দীপ অভি শুভ রাজ প্রিয়াঙ্কা পূজা, এদের মা কোথা থেকে এনে দেবেন! এদের ছাড়া পাপান যে হাঁপিয়ে উঠছে।

সে মায়ের ফোন থেকে শুভর সঙ্গে কথা বলছিল কাল। শুভরও একই অবস্থা। তবে বাড়িতে ওর দিদি আছে, সে মোটে দু'বছরের বড়। তার সাথে শুভর সময় ভালোই কেটে যায়। সেই কথাই হচ্ছিল ওর সঙ্গে।

পাপান বলল– তোর মতো আমার একটা দিদি থাকলে ভালো হতো। মজা করতাম। তোরা কী কী মজা করিস?

–আমরা? ক্যারাম খেলি, চাইনিজ চেকার খেলি। বিকেলে ছাদে গিয়ে ব্যাডমিন্টনও খেলি।

–কী ভালো! আমার তেমন কেউ নেই যে বাড়িতে খেলব। কিচ্ছু ভাল্লাগছে না।

–এক কাজ কর। আমার মা আর আন্টির ফোন থেকে রোজ ফোনে কথা বলব। ঠিক আছে?

–হ্যাঁ, তা করলেও হয়। মা'কে বলে দেখি।

–দ্যাখ। তাহলে একটু মজা করা যাবে।

পাপান টিভিতে কার্টুন না দেখলেও, টিভিটা তো বাড়িতে সারাক্ষণ চলছে। খবরের চ্যানেল। ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে মা-বাবা টিভি দ্যাখেন। হ্যাঁ, মা-বাবা দু'জনেরই অফিস বন্ধ। অফিস যখন খোলা ছিল, কাজের দিদি এসে ঘরের কাজ করে দিয়ে যেত। এখন তাকেও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরের কাজ মা-বাবা ভাগাভাগি করে চালিয়ে নিচ্ছেন। একদিন মা রান্না করেন তো পরের দিন বাবা। সেই সঙ্গে ঘর পরিষ্কার বাসন মাজা কাপড় কাচা– সবই দু'জনে মিলেমিশে চালাচ্ছেন। পাপানও তার বইপত্তর খেলনাপাতি নিজেই গুছিয়ে রাখে। মা-কে একটু সাহায্য করা আর কী! কিন্তু তার মন বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য হাঁসফাঁস করে। মা-বাবার আরও একটা কাজ অবশ্য বেড়েছে। পাপান দেখেছে, বাড়িতে মাঝে মাঝে ভ্যানগাড়িতে চেপে বিরাট বিরাট বস্তা আসে। তার মধ্যে চাল-ডাল-আলু এসব থাকে। তাদের বাড়িটা দোতলা। একতলায় একটা উঠোন আছে। সেখানে মা-বাবা আর পাড়ার কিছু কাকু-পিসিরা মিলে কীসব কাজ করেন। পাপান জানলা দিয়ে নিচে তাকালে দেখতে পায়। সব খাবার জিনিস মেপে ভাগ করে প্যাকেটে প্যাকেটে ভরে রাখা হয়। সেগুলো আবার কয়েকজন এসে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায় সে জানে না। ভাবে মা'কে জিজ্ঞাসা করবে। ফাঁক পায় না। সেদিন খেতে খেতে সে মা'কে বলল– মা, ওগুলো দিয়ে কী হয়?

–কীগুলো দিয়ে?

–ওই যে তুমি বাবা আর কাকুরা পিসিরা যেসব চাল ডাল প্যাকেটে ভরো। ওগুলো কারা নিয়ে যায়? মা যেন খুশি হলেন পাপানের প্রশ্নে। বললেন– তুমি কী করে জানলে পাপান?

–আমি যে জানলা দিয়ে দেখি!

–তাই? ওগুলো যায় যারা খেতে পাচ্ছে না, গরিব মানুষ, তাদের বাড়িতে।

–কেন খেতে পাচ্ছে না মা?

–তারা গরিব বাবা। তাদের বাড়ির লোক, যারা বাইরে কাজ করে টাকা রোজগার করত, এখন তাদের কোনও কাজ নেই। তাই তারা খাবার কিনতে পারছে না। তাদের বাড়িতে আমরা যা পারি, যেটুকু পারি, দিচ্ছি।

–ওরা খেতে পাচ্ছে না, মা?

–না বাবা, বললাম যে!

–মা, কী হয়েছে আমাদের দেশের, বলো না? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–আমাদের দেশে, না শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে একটা নতুন অসুখ এসেছে। করোনা ভাইরাস বলে একটা জীবাণু থেকে ওই রোগটা শরীরে ছড়ায়। এর কোনও ওষুধ এখনও আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। একে বলে মহামারী। এতে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে। আমাদের দেশের অবস্থা তার মধ্যে আরও খারাপ। রোজ রোজ বেশি বেশি মানুষের এই অসুখ ধরা পড়ছে।

–এই অসুখে কী হয় মা?

–কাশি হয়, নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। পাপান, তোমার সঙ্গে এখন আর বকবক করতে পারছি না। কাজ আছে। ভাত ক'টা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দেখি। দেরি কোরো না। পাপানের মনে হলো মা তাকে যেমন বললেন তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, ওই যারা গরিব মানুষ, যাদের ঘরে খাবার নেই, তারা কি তাদের ছেলেমেয়েকে বলতে পারে– তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও? ওদের যে খাবারই নেই! তাড়াতাড়ি কী খাবে?

পাপানের মনটা দুঃখে ভরে ওঠে। তার মা-বাবা দুঃখী মানুষের জন্য কাজ করছেন, তাতে তার ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু এটাও মনে হয়, সে যদি মা-বাবার সঙ্গে কাজ করতে পারত। তার খেলনাগুলো দুঃখী বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে? দূর, ওরা খেতেই পাচ্ছে না, খেলনা নিয়ে খেলবে কী করে? সে অসহায় বোধ করে। বিষয়টা নিয়ে ভাবে। কিছু একটা করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু করবেটা কী? তার তো টাকা নেই। মা-বাবা তার হাতে কোনও টাকা দেন না। ছোটরা টাকা নিয়ে কী করবে? এই নিয়ে পাপানের কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু এখন তার কেমন আপশোস হয়। সে কী করতে পারে? না, একটা উপায় তার হাতে আছে। পাপান ভেবে ভেবে বার করেছে। গরিব মানুষ যারা, যারা এই মহামারীর সময় খেতে পাচ্ছে না, তাদের বাড়িতে তার মতো ছোট ছেলেমেয়ে কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। তা মা-বাবা আর পাড়ার কাকু-পিসিরা তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। তাঁরা ইদানীং নতুন একটা কাজ করছেন। পাপান দোতলার জানলা থেকে দ্যাখে, নিচে একটা বিরাট ডেচকিতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে রোজ। কত লোক লাইন দিয়ে সেই খিচুড়ি খেতে আসছে। তাদের সঙ্গে তার মতো ছোটরাও আছে। আচ্ছা, ওরা কি স্কুলে পড়ে তার মতো? এখন স্কুল বন্ধ বলে কি তাদেরও পড়া বন্ধ? ব্যাপারটা ভাববার। ওরা সারাদিন কী করে? শুধু খিদে সহ্য করে?

পাপান ঠিক করে নিল সে কী করতে চায়। এটা কতটা কি ঠিক বা ভুল, দরকারি বা অদরকারি, সে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না। সে শুধু কিছু করতে চাইছে।

কিন্তু নিজে নিজে তো আর কিছু করা যায় না। একা কিছু করা যায় না। অনেকে মিলে করতে হয়। সে মা'কে গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করেই ফেলল,

–মা!

–কী রে?

–আচ্ছা, ওই যারা খিচুড়ি খেতে আসছে, আমি দেখেছি তাদের মধ্যে আমার মতো ছোটরাও আছে।

–আছে তো।

–আচ্ছা মা, ওরা সবাই স্কুলে যেত?

–হ্যাঁ বাবা। অনেকেই যেত।

–এখন আমি যেমন স্কুলে যেতে পারছি না, ওরা নিশ্চয়ই পারছে না।

–পারছে না তো।

–মা, একটা কথা বলব?

–কী?

–তুমি আমাকে যেমন টাস্ক দাও, ওদেরও দেবে? আমার সঙ্গে ওরাও পড়বে? দেবে?

মা হঠাৎ কেমন অবাক হয়ে যায়। বলেন– কী বলছিস?

–বলছি, আমরা যদি একসঙ্গে পড়াশোনা করি? পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলে বড় হব কী করে? তুমিই তো বলো! মা চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন,– কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস পাপান। এই খারাপ সময়ে বাচ্চারাও লেখাপড়া করতে পারছে না, ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে খুব। শুধু তাদের ক্ষতি নয়, দেশের ক্ষতি। আচ্ছা দেখি।

পাপানের মা বাবার সঙ্গে আলোচনা করলেন। পাপানের সামনেই। বাবাও বললেন– পাপান ঠিক বলেছে। আমাদের এই দিকটাও নজর দেওয়া উচিত।

মা বললেন– আমি ওদের পড়াব। পাপানের সঙ্গেই। সহজ সহজ অঙ্ক করাব। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সবই। শুধু বাংলা ইংরেজিটা তুমি দেখিয়ে দিও।

–শুধু আমি আর তুমি নই। ইন্দ্রজিৎ, শিখা, সুরূপাকেও বলব পড়াতে। এখন তো সবার হাতেই অনেক সময়। ওই সময়টা বাচ্চাদের পড়াশোনায় ব্যয় করতে পারলে তো খুব ভালো। পাপান! তুই ঠিক বলেছিস। পাপান ভয়ে ভয়ে আরেকটা কথা বলল। বলল– মা, আমার বার্থ ডে আসতে কত দেরি?

–আর দশদিন তো। কেন রে?

–মা, ওইদিন আমাকে যে দামি দামি জামা আর খেলনা কিনে দাও, এবার সেটা দিতে হবে না। ওই টাকাটা দিয়ে সবার বই খাতা পেনসিল রাবার কিনে দিও।

বলে সে ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে একবার বাবার দিকে একবার তাকায়। দ্যাখে– ওমা! মা কাঁদছে কেন! বাবারও যেন চোখ ছলছল! বাবা তাকে কোলে তুলে নেন। মাথার চুলগুলো আদর করে ঘেঁটে দিয়ে ধরা ধরা গলায় বলেন– পাপান! তুই অনেক বড় হ’।

কয়েকদিন পর দেখা যায়, পাপানদের বাড়ির চওড়া বারান্দায় পনেরো ষোলো জন বাচ্চা ছেলেমেয়ের ভিড়। কুটুস, বাবলা, মুন্নি, রহিম, আসমা, ববি, জয়া, হাসান– আরও বেশ কয়েকজন। সবাই জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করছে। বিজ্ঞানের বই থেকে পড়ছে কীভাবে বীজ থেকে ভ্রূণমুকুল বেরোয়। পাপান তার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ অনেকটাই ভুলতে পেরেছে।

তার জীবন থেকে মাথা তুলেছে নতুন ভ্রূণমুকুল। মানুষকে ভালোবাসতে শেখার, মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখার। এই ভ্রূণমুকুল, আশা করা যায়, একদিন মহীরুহ হয়ে অনেক মানুষকে ছায়া দেবে।

ধাঁধায় টাঁধায়

সুস্মেলী দত্ত

মাথা মানে ভরা চুল
টুল মানে পায়া
কান দুটো দুই দিকে
টান সস্তি ভায়া–
কথায় কথায় মানে
এক হয়ে যায়
চুল টুল কান টান
ডাঁয়ে মানে বাঁয়ে।
কথাগুলো কথা সব
ঠোঁট শুধু নাড়ে
দুর ছাই বাড়ি টাড়ি
ঘরে মানে টরে।
হাত দিয়ে গাল চেপে
ভাবে শুভ বয়
সব ছেড়ে টেরে দিয়ে
চাঁদে গেলে হয়...
এই বলে গুটি পায়ে
পাড়ি মহাকাশ
কথা নেই কাজ নেই
নেই দিন মাস
এমন সময় কে গো
পিঠে দিল ঠ্যালা
ঘুম থেকে উঠো খোকা
হল বেলা টেলা।
শুভবয় ইসকুলে
গটগট চলে
লেখা টেখা বই টই
পিছে দলে দলে।

সোনার কাঠি

রূপশ্রী দত্ত

মফঃস্বলের স্কুল ছিল এক, মাধ্যম তার বাংলা,
'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু' এবং 'বুড়ো আংলা'–
গল্পের বই পড়তে হলে এরাই আবশ্যিক।
ছাত্রীরাও সেই কথাটি চলত মেনে ঠিক।
হেনকালে এল খবর–নিকট ভবিষ্যতেই
দিদিমণি আসছেন এক, বাংলা কোনোমতেই
বলতে কিংবা বুঝতে তিনি পারেন না কোন মোটে
দুশ্চিন্তায় ছাত্রী সবাই ঘেমেনেয়েই ওঠে।
নির্ধারিত দিনে এলেন নতুন দিদিমণি।
স্মিতহাসি, মিষ্টকথন–আনন্দেরই খনি
নাম জানলেন সব ছাত্রীর, প্রশ্নও নয় 'টাইট'
উৎসাহ দেন, সবাই বলেন–'ইয়েস, দ্যাট ইজ রাইট'।
ইংরাজি তাঁর জলের মতন, যাচ্ছে তো বেশ বোঝা
শক্ত তো নয় একেবারেই বরং লাগে সোজা।
মফঃস্বলের স্কুলটার সেই ছাত্রীগুলোর পরে,
দিদিমণি সোনার কাঠি ছোঁয়ান কি মন্তরে।

সাম্প্রতিক

রত্নেশ্বর হাজরা

লেগেছে আগ আমার খোড়ো ঘরে
উড়ছে ধোঁয়া দগ্ধ হচ্ছি তাপে
পুড়ছি আমি– কষ্ট শুধু আমার!
ভুগছি আমি কার বা কাদের পাপে!

জ্ঞানত দোষ করিনি কক্ষনো
দিইনি কাউকে একটা দুটো দুষো
বলিনি কেউ আমার শত্রু আছে
যার কিছু নেই তাকেও বলিনি ভুয়ো।

জল নেই নেই–জল নেই কোনোদিকে
শুধু কাদা-কাদা শুকনো পুকুর বিল
নদী খুঁজে ফেরে এই দিকে ওই দিকে
ঠা-ঠা রোদ্দুরে উড়ন্ত গাংচিল–

আমার ঘর তো খাক হচ্ছে আগ লেগে
খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হাসছে যারাই
একটা স্ফুলকি হঠাৎ যদি হাওয়ায়
পড়ে কোনোভাবে তার বা তাদের ঘরে
সেই দাহ থেকে ছুট পাবে কি তারাই!

বিশেষ রচনা

মধু কুণ্ডু

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

গোরু নিজের দুধ খেতে পারে না। নিজের বাঁটে মুখ দিয়ে টানার জিমনাস্টিক গোরুর জানা নেই। গোরুর চেয়ে ভালো জিমন্যাস্ট ছাগল। খুব তিড়িং বিড়িং লাফায়, কিন্তু নিজের দুধ নিজে খেতে পারার এলেম নেই। ছারপোকার খুব খিদে পেলেও নিজের রক্ত খেতে পারে না। মধুবাবুও নিজের মধু নিজে খেতে পারে না। মধু নাম হলেই মধুবান হয় নাকি? এটাই ভাবছো তো? বলছি তো হয় না। সূর্য বাবুরা জ্বলজ্বল করে না, গোলাপিদের গায়ে গোলাপের গন্ধ হয় না, টফি দে টফি দেয় না, বাড়ির দারোয়ান দরবেশ খান একেবারেই দরবেশ খায় না। চুনিলাল সাধু মোটেই সাধু প্রকৃতির লোক নয়, মুকুন্দ সিংহ লোকটা ভেড়ার চাইতেও ভীতু। সে যাইহোক আমাদের মধুবাবু নিজেই একটা মৌচাক বহন করেন। তাঁর থুতনিতে একটা মৌচাক হয়েছে, এবং দিনে দিনে এটা বাড়ছে। একেবারে প্রথম দিকে দূর থেকে মধু কুণ্ডুকে দেখে লোকে ভাবতো চাপ দাড়ি রেখেছে,

কাছে এলে বলতো– সে কি মধুবাবু, আপনার থুতনিতে টিউমার হয়েছে দেখছি, সে কী, টিউমার তো পচেও গেছে। ওই তো পোকা। মধু কুণ্ডু বলতো, পোকা ঠিকই, তবে ওগুলো মধুপোকা। মৌমাছি। কেউ ভাবছিল মধু কণ্ডু পাগল হয়ে গেছে, কেউ আবার নিরাপদ দূরত্ব রেখে কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা দেখতো, তবে বেশিরভাগ লোকজন ভয়েই পালাতো।

মধু কুণ্ডুর যা বর্ণনা দিলাম, ভাবছো আজগুবি। আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা। ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করাটা বুঝি মিথ্যে? হাঁসজারুটা বুঝি মিথ্যে? গোঁফ চুরি, খুড়োর কলের সামনে গাজর ঝুলিয়ে লোভ দেখানো সব সত্যি। এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি।

এই যে মধু কুণ্ডুর কথা বলছি, আসলে ওর পিতৃদত্ত নামটা হলো অতীন। ওদের পারিবারিক পদবি হচ্ছে কুণ্ড। কুণ্ডু নয় কিন্তু। কুণ্ড মানে কুয়ো বা পুকুর। পাব্লিক কিন্তু কুণ্ডুই বলে। মধু কুণ্ডু। আমরা অবশ্য কুণ্ডই বলব। এই আমাদের মধু কুণ্ড হচ্ছে মধু কুণ্ড দি ফোর্থ। মানে চতুর্থ মধু কুণ্ড। অতীন কুণ্ড এখন মধু কুণ্ড দি ফোর্থ। অতীন কি করে, কিংবা কেন মধু হলো– সেটা পরে বলছি। তার আগে বলি অনেকে মাথা চুলকাচ্ছে– কী আজগুবি কথা মধু দ্য ফোর্থ এরকম আবার হয় নাকি? কে বলল হয় না? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হতে পারে, পঞ্চম জর্জ হতে পারে ষষ্ঠ ফিলিপ হতে পারে, চতুর্থ মধু কুণ্ড হতে পারে না? কোথায় অতীন কুমার, আর কোথায় মধু। ঘটনাটা হলো ওদের পরিবারের একটা ইতিহাস আছে। বেশ কয়েক পুরুষ পরপর ওদের বংশে এমন কেউ জন্মায়, মৌমাছিরা তাঁকে ভালোবাসতে থাকে, ওদের শরীরে মৌমাছি বাসা বাঁধে।

বহু যুগ আগে থেকেই এমন কাণ্ড হচ্ছে। আগেই বলেছি ওদের পারিবারিক পদবি কুণ্ড। কুণ্ড থেকেই কুণ্ডু হয়ে গেছে লোক মুখে আমরা কিন্তু কুণ্ডই বলব। যখন ওদের কারুর শরীরে মৌমাছি চাক বানাতে শুরু করে, তখনই নাম পরিবর্তন হয়ে মধু হয়ে যায়। তৃতীয় মধু কুণ্ডর নাম ছিল ব্রজবিহারী। স্বদেশি আন্দোলনের তীব্র সময়ে ওর গলায় মৌমাছি চাক বাঁধে। ব্রজবিহারীকে স্বদেশিরা খুব খাতির করত। তখন বিলিতি সিরাপ, স্কোয়াশ ইত্যাদি বর্জনের ধুম চলছে, তখন একটা জ্যান্ত মধুকুণ্ড পাওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। বড় বড় জাতীয় নেতারা এলে তৃতীয় মধু কুণ্ডকে নিয়ে যাওয়া হতো। চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে আপ্যায়ন করা হতো। দ্বিতীয় মধু কুণ্ডকে নাকি পর্তুগিজ দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। পর্তুগালে কুণ্ড বংশের একটা প্রশালা রয়ে গেছে। কারণ স্পেনের রাজা ফিলিপ দ্য ফিফথ মানুষ মধুভাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দ্বিতীয় মধু কুণ্ডকে অপহরণ করে এক মিশরীয় দাসীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের রাজপরিবারে রেখে দেন। রানিরা এবং রাজপরিবারের মেয়েরা টাটকা মধু পেয়ে যেত, সেই মধু ওরা প্রসাধনে ব্যবহার করত। মধুর অনেক গুণ। উপকারী খাদ্য হিসাবে তো বটেই, প্রসাধনেও কাজ লাগে। মধু মাখলে গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয়, ত্বক মসৃণ হয়, যাকে বলে লাবণ্য, সেটা হয়। প্রথম মধু কুণ্ড কে ছিল এখন আর জানা যায় না। কেউ বলে– সেই চরকের আমলে প্রথম মধু কুণ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞানী চরককে সাহায্য করেছিল, নানা ভেষজ সংরক্ষণের জন্য মধু দরকার হতো। কারণ মধুর মধ্যে জলের পরিমাণ খুব কম থাকে। নানা রকমের এনজাইম থাকে, যা জীবাণু সহায়ক নয়। কোনও পদার্থকে পচে যেতে হলে কিছু খারাপ জীবাণু দরকার হয়, মধুর ভিতরে সেই জীবাণু বাড়তে পারে না। দু'হাজার বছর আগে কী করে ভেষজবিজ্ঞানী চরক প্রথম মধু কুণ্ডর খোঁজ পেলেন সেটা কেউ জানে না। তবে মধু কুণ্ডর এক অধ্যাপক মেসোমশাইয়ের মতে প্রথম মধু কুণ্ড আসলে মিশরীয়। তখন মিশরীয়রা মনে করত শরীরে ভিতরে একটা আত্মা থাকে, মৃত্যুর পর আত্মাটা কিছুদিন এধার ওধার ঘোরাঘুরি করে ফের সেই দেহটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। সেই জন্য দেহ সংরক্ষণ করত। পেট আর বুকের ভিতরেও যন্ত্রপাতি বের করে নানা ভেষজ মধু দিয়ে মাখিয়ে ভিতরে দিয়ে বাইরে মোমের প্রলেপ দিত। মৌচাকের যেটা আস্তরণ, সেটা হলো মোম। খুব বড়লোকেরা ছাড়া মমি করতে পারত না। যাক সে কথা। আমরা চতুর্থ মধু কুণ্ড বা মধু কুণ্ডুর কথা বলি।

প্রথমে ওর আঠারো বছর বয়সে ওর থুতনির কাছে একটা বড় ধরনের মৌমাছি ঘুরঘুর করতে থাকে। এরপর গাদাখানেক ছোট মৌমাছি। পরে জেনেছে বড় মৌমাছিটা রানি মৌমাছি, ছোটগুলো কর্মী মৌমাছি। ওদের শ্রমিক মৌমাছিও বলা যায়। সমস্ত রকম খাটুনির কাজ শ্রমিক মৌমাছিরাই করে। ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে ফুলের মিষ্টি রস বা সুধা সংগ্রহ করে। করে শরীরের মধ্যেই একটা ছোট্ট ট্যাঙ্কিতে রাখে। সেখানেই একটা জটিল রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। ফুলের মিষ্টিরস, বা সুধা, ইংরাজিতে যা নেকটার, সেটা মধুতে পরিণত হয়। এই মধুর ভিতরে থাকে সুক্রোজ, গ্লুকোজ, ফ্রটকোজ, নাজরাম এনজাইম, কিছু খনিজ, যা নেকটারেই ছিল। সব নিয়ে এক আশ্চর্য বস্তু, যা পুরুষ মৌমাছি এবং রানি মৌমাছি খাবে। এক কিলোগ্রাম মধুর জন্য একটা মৌমাছিকে দেড় লক্ষ বার মৌচাক থেকে ফুলগাছ পর্যন্ত উড়তে হয়। মৌচাক থেকে গাছের দূরত্ব যদি ১৫০ মিটারও হয়, তবে এক কিলোগ্রাম মধুর জন্য একটা শ্রমিক মৌমাছিকে পঁয়তাল্লিশ হাজার কিলোমিটার পথ উড়তে হয়। মৌচাক তৈরি হয় শ্রমিক মৌমাছির শরীর থেকে বের হওয়া মোমের কুচি দিয়ে। শ্রমিক মৌমাছির শরীরে একটা মোম গ্রন্থি আছে। সেখানে মোম তৈরি হয়, আর দেহ থেকে ছোট্ট ছোট্ট কুচি বের করে। এক কিলোগ্রাম মোমে চল্লিশ লক্ষ কুচি থাকে। এক একটা কুচি হলো মৌচাকের এক একটা ইট। মৌচাকের প্রত্যেকটা ঘর হয় ষড়ভুজ। সমান সাইজ। মধু কুণ্ড এসব জানে। একটা সমবাহু ত্রিভূজ আঁকতে পাঁচবার রবার দিয়ে মুছতে হতো, অথচ এই পোকাগুলো কী সহজে সমবাহু ষড়ভুজ বানিয়ে যাচ্ছে।

চাকটা যখন হলো থুতনিতে, অতীনের ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন। তিনিই বললেন আমাদের বংশে আবার মধু এল। ফ্যাসাদ আছে। প্রত্যেকটি মধুকে নিয়েই ফ্যাসাদ হয়েছে।

এই অতীন কুমার বা পরবর্তীকালের মধু দ্য ফোর্থ যখন কলেজের ফাস্ট ইয়ারে, ওর নতুন নতুন দাড়ি, তখনই থুতনিতে চাকটা হয়। মধু যেখানে যায়, মৌমাছিরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। কলেজের ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়ে গেল, প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করল, প্রিন্সিপাল বলল ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কলেজে আসা বন্ধ করো অতীন। অতীন তাই করল বাড়িতেই মৌমাছির চাক বড় করতে লাগল। মৌমাছিদের ভাষা শিখল। ওদের ভাষা হলো ওদের নাচ। ওরা উড়ন্ত অবস্থায় নাচে। ওদের ভাষা ছন্দেরই ভাষা, নৃত্যেরই ভাষা। ওড়ার নানা রকম ছন্দ আছে, তা দেখে একটা মৌমাছি বোঝে অন্যজন

কী বলতে চায়। এই নাচের মানে আমাদের মধুও কিছুটা বোঝে। আবার মধু একটা অদ্ভুত শব্দ করতে পারে ওর গলা দিয়ে। সেই শব্দে মৌমাছিরা পালায়। তখন চাকের কিছুটা কেটে নেয়। আবার অন্য এক ধরনের শব্দ করলে মৌমাছিরা ফিরে আসে আবার। মৌমাছিরা ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না। উগ্র গন্ধও সহ্য হয় না মোটে।

মধুর বাবার একটা চালু মুদি দোকান আছে। কাছাকাছি একটা শপিংমল হয়েছে যদিও, ওদের মুদি দোকানটার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কারণ পাশেই একটা বেশ বড় বস্তি আছে। বস্তির লোকগুলো ঝকমকে শপিং মলে যেতে ভয় পায়। ওরা দু'টাকার তেল, দুশো সুজি, পাঁচ টাকার কালো জিরে, দু'টাকার শুকনো লঙ্কা নেয়। মধু ছোট ভাই, দুই দাদা মুদি দোকানটাই চালায়, মধু নিজের থুতনিতে মৌমাছি পোষে।

মৌমাছিরা ফুলের সুধা রস নিয়ে টেনে নিজের পেটে মধু বানিয়ে মৌচাকে উগরে দেয়। যে ফুলের রস নেয় মধুতে সেই ফুলের চিহ্ন থাকে। কমলালেবুর বাগানের কাছাকাছি মৌচাক হলে মৌমাছি কমলা ফুলের রস নিয়ে কমলা মধু বানায়। দার্জিলিঙে শিলঙে কমলা মধু পাওয়া যায়। সরষে ফুলের রস থেকে সরষে মধু সুন্দরবনের গেওয়া, কেওড়া, গরান ফুলের রস থেকে সুন্দর বনের মধু, এরকমভাবে আপেল মধু, ল্যাভেন্ডার মধু, ইউক্যালিপটাস মধু এরকম নানা মধু হয়। প্রত্যেকটা মধুর রঙ একটু আলাদা, গন্ধও কিছুটা আলাদা। ফুলটুল না পেলে মৌমাছিরা চিনি থেকেও মধু বানাতে পারে। (গোরু যেমন ঘাস না পেলে খড় খেয়েও দুধ দেয়) আশপাশের রাস্তার ধারের গাছে, পার্কের নানান গাছে নানারকম ফুল হয়, যা মানুষ জানে না, মৌমাছিরা জানে। কিন্তু বসন্তকালে অসুবিধে নেই, শীতকালে রাস্তার ফুলের অভাব হয়। মৌমাছিরা বড়লোকদের বাড়ির ছাদের শখের বাগানে মরশুমি ফুলের কিছু মিষ্টিরস নিয়ে আসে বটে, কিন্তু তাতে হয় না। মধু কুণ্ডু জানে মৌমাছিদের একটা গুণ আছে, চিনির রস থেকেও মধু তৈরি করে নিতে পারে। এজন্য মধু কুণ্ডু বাটির মধ্যে একটা চিনি-

কুণ্ড করে রাখে। চিনির রস। মৌমাছিরা সেই চিনির রস পেটে ঢুকিয়ে নানা এনজাইমের সাহায্যে মধু বানায়। মৌমাছিদের অনেক সময় গ্রাম মফঃস্বলের মিষ্টির দোকানের কাচের বাক্সের ভিতরেও ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। আসলে ওরা চিনির রস চুরি করতে মিষ্টির দোকানে ঢোকে। এটা লক্ষ্য করেছিল মধু। এটা দেখেই বাড়িতে চিনির রসের বাটি রেখে দেয়। মধুর চাক হয় থুতনিতে। ওজন বাড়ে, ঘাড়ের উপর চাপ পড়ে যদিও, কিন্তু একটা গর্ব হয় যে ও নিজেই মধুভাণ্ড।

বস্তিতে রোগা প্যাংলা বাচ্চাকাচ্চারা আছে। ওদের একটু একটু মধু বিতরণ করে আমাদের মধু। দু'জন বুড়ো আছে, মধু দিয়ে মেড়ে কবিরাজ বাড়ি যায়, ওদের ও খাঁটি মধু দিয়ে যায়। চাকরি বাকরি করে না বলে ওর বাবা বা দাদাদের কোনও ক্ষোভ নেই। ঘরের একটা ছেলে তো তবু দুটো মানুষের উপকার করছে, আর অন্যের একটু উপকার হবে বলে নিজে কষ্ট সইছে। ক'জন এমন করে? একটু করে চাক কেটে মধু বার করে নেয়, এতে মৌচাকের তেমন ক্ষতি হয় না। করিৎকর্মা শ্রমিক বাহিনী আছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি আবার ওইটুকু ভরাট করে দেয়। সত্যিকথা বলতে কি, যদি একটু করে না কাটতো, চাকটা বেশি বড় হয়ে গেলে ও সামলাতে পারতো না। কতটা ওজন সহ্য করতে পারে মানুষের ঘাড়?

ওদের বাড়িতে একদিন একটা সাফারি স্যুট পরা লোক এল, আর একটা তিলককাটা লোক। তিলককাটা লোকটা 'ওং মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরান্ত সিন্ধবঃ' বলতে বলতে এলেন। কে আছেন এখানে এখানে মধুবান? দর্শন করতে এলাম।

দেখা হলো। সাফারি স্যুট পরা লোকটা মধু কুণ্ডর বাবাকে বলল ছেলেটাকে আমাদের দিয়ে দেন, খুব ভালো থাকবে। আলাদা ঘর, খাট-পালঙ্ক, সেবাদাসী, আপনারাও যাবেন। এমন মানুষকে ঘরে রাখা তো ভাগ্যের কাজ আছে। আমরা ক'দিন সেবা করতে চাই। যদি অসুবিধা হয় চলে আসবে। দরজা তো খোলা আছে, কুন অসুবিধা নাই।

নানারকম ভুজুং ভাজুং দিয়ে ওরা ছেলেটাকে নিয়ে ওঠালো একা খুব সুন্দর ঘরে। শ্বেতপাথরের মেঝে, ঘরে ধুনোর গন্ধ। একটা সিংহাসনের মতো দেখতে চেয়ার। সাফারি পরা লোকটা বলল– আপনি এবার থেকে মধুবাবা। এই যে গরদের পাঞ্জাবি এনেছি কয়েক সেট, ভালো ধুতি, উত্তরীয়। আমাদের লোক সব পরিয়ে দেবে। লোকজন আসবে, আপনার সামনে জোড় হাত করে বসবে, কেউ পায়ে প্রণাম করবে, আপনি আশীর্বাদ করবেন। হিন্দিতে করাটাই বেটার, যেমন সদা খুশ রহো, মনোবাঞ্ছা পূরণ হো যায়গা। সংস্কৃতিতে দীর্ঘজীবী ভবও বলতে পারেন। আর তেমন ছাপোষা লোকজন দেখলে বাংলাতেই আশীর্বাদটা দিয়ে দেবেন। এবার মধু কুণ্ড লোকটার ভিতর থেকে আসল অতীন কুমার বেরিয়ে এল। বলল– না-না, আমি এসব পারব না, একদম পারব না। আমি সাধারণ ঘরের সাধারণ মানুষ, আমি আশীর্বাদ করার কে?

তিলক কাটা বলল– আরে যত্র জীব তত্র শিব। সবার মধ্যেই ভগবান আছেন। তোমার মধ্যেও আছেন। তুমি আশীর্বাদ করছো না, তোমার ভিতরে যে ভগবান আছে, তিনি করছেন।

সাফারি স্যুট বলল– দেখুন তুমাকে যখনি এই সিংহাসনে বসিয়েছি, তখন থেকে তুমাকে আপনি আজ্ঞে করছি। রাবড়ি-জিলাবি ব্রেকফাস্ট করালাম। দুপুরে পোলাও খিলাবো। আপনি এখন বাবা মধুস্বামী। মধুবাবা বলবে লোকে। আমরা সব পাবলিসিটি দিব। আপনি ভগবান হয়ে যান। যাত্রা-নাটক-সিনিমায় যারা কিষণ জী হোয়, রাম জী হোয়, শিব জী হোয়, তখন কী করে? অ্যাক্টিং করে। আর ভালো অ্যাক্টর যারা করে, মনে মনে সেই ভগোবান ভি হয়ে যায়। আপনি সিটাই করবেন। লোকজন আসবে, আপনার কাছে উদের প্রবলেম বাতাবে, আপনি বলে দিবেন সব ঠিক হয়ে যাবে, এই নে, দু'ফোঁটা মধু খা। যেমন বুঝবেন, তেমন করবেন। সামনের থালায় প্রণামী আসবে। তিন মাসে আপনাকে লাখপতি বানিয়ে দিব গ্যারান্টি দিচ্ছি।

অতীনকুমার অতীব হতভম্ব। এত ভালোঘর, এত আরাম এত সুখাদ্য জীবনে পায়নি। টিভি-তে নাকি ওর থুতনির চাক দেখিয়ে বিজ্ঞাপন হয়েছে। লোকজন আসছে। প্রথম দিকে দেখছিল কিছু একই মুখ এসে হাত জোড় করে বসে থাকতো। বুঝতে পারতো এটা ওদেরই লোক এরপর বাইরের লোকজন আসতে শুরু করল। প্রণামীও পড়ছিল। অতীন কুমারের এসব আর ভালো লাগছিল না। মাসখানেক পরই বলল এবার বাড়ি যাব। ওরা বলল বাড়ি তো এটাই। মধুবাবা স্বামীর বাড়ি। নামডাক হয়ে গেছে, এখন আগের বাড়ি ভুলে যান। বিহা সাদি করিয়ে দিব। আরামে থাকবেন।

অতীন কুমার বুঝতেই পারল ওদের ব্যবসা ভালো হচ্ছে। এবং ও এখন কলে পড়ে গেছে। বাড়িতে নিশ্চই কিছু দেয় টেয়। দাদারা মাঝে মধ্যে দেখে গেছে। বলেছে দিব্যি আছিস দেখচি, এখানেই থাক। অতীন বোঝে বাবা ভালোবাসতো ঠিকই, কিন্তু দাদাদের সংসার আছে, ও দাদাদের বোঝা হয়েছিল। কিন্তু এ জীবন আর ভালো লাগে না। ফেরেব্বাজি। এক ফোঁটা মধু তিলক কর, তিন ফোটা সেবন কর, শরীর ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ির দরজায় দু'ফোঁটা মধু লাগিয়ে রাখো– সব অশুভ শক্তি দূর হয়ে যাবে– এসব আর পারা যায় না। একদিন পালাতে হবে। কিন্তু পালানোর উপায় নেই, পাহারা।

মৌমাছিরাই ওকে বাঁচালো। একটা চাকের অধিষ্ঠাত্রী হলো রানি মৌমাছি। শ্রমিকরা রানির জন্য সব করে। রানির জন্য রানির স্পেশাল মধু বানায়, রানির সন্তানদের দেখভাল করে, কিন্তু শ্রমিকরা যদি রানির উপর ক্ষেপে যায়, সবাই মিলে হুল ফুটিয়ে রানিকে মেরে ফেলে। এখানেই তাই ঘটল। ধূপের গন্ধ, এসি মেশিনের ঠান্ডা ভাব, ভজন গান এসব শ্রমিক মৌমাছিদের ভালো লাগছিল না। ওরা ভাবলো সমগ্র মৌমাছি সমাজের এই বিপত্তির জন্য দায়ী ওদের রানি। রানিকে ঘিরে ধরে রানিকে চাক থেকে তাড়িয়ে দিল, কিন্তু নতুন রানি এল না। রানিই কেবল ডিম পাড়তে পারে। ডিম না হলে নতুন মৌমাছি জন্মাবে কি করে? আর নতুন মৌমাছিদের জন্যই তো মধু তৈরি করতে হয়। মৌমাছিদের আয়ু দেড় মাসের বেশি হয় না। সুতরাং অতীন কুমার তথা মধু কুণ্ডর মধুভাণ্ড মৌচাক শুকিয়ে গেল। অতীন কুমার আর মধুবাবা রইল না। সাফারি স্যুট বলল– যা, বাড়ি যা।

বাড়ি ফিরে এল। অতীন কুমার। কি আর করবে। ও মনে মনে নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো দেখতে চাইলো নিজেকে। দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। দুই হাতের তলায় মৌচাক হয়েছে দুটো, থুতনিতে একটা। মধু জমছে, মোম জমছে। ভাবছে– নোংরা আর বিষ দিয়ে নয়, নিজেকে, নিজেদের মৌচাক করে মানবজাতিকে দিয়ে যাবে সেরা দুটি জিনিস।

মিষ্ঠতা, আর আলো।

কালুর শিক্ষালাভ

সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ সুদীপ্ত মণ্ডল

মুখের ওপর কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া ফুল টপ টপ করে পড়তেই কালুর ঘুম ভাঙল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দেখে আজ রাস্তাঘাট একদম শুনশান। বেশ কিছুদিন ধরেই কালু লক্ষ্য করছে রাস্তায় লোকজন কম বেরোচ্ছে। আর যারা বেরোচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের মুখই মুখোশ দিয়ে ঢাকা। কাজেই গন্ধ শুঁকেই কালুকে বুঝতে হচ্ছে, লোকগুলো তার পরিচিত নাকি অপরিচিত। তবু এতদিন অল্প হলেও লোকজন রাস্তায় বেরতো, আজ কেউই বেরোয়নি।

প্রতিদিন সকালে কালু উলটোডাঙার একটা বড় হাউসিং কমপ্লেক্সে গিয়ে গেটের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সেই কমপ্লেক্সের যেসব কাকু-কাকিমারা মর্নিং ওয়াক করতে বেরোয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কালুকে রোজ বিস্কুট দেয়। আর কালুও মহানন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে ব্রেকফাস্ট সারে। আজও গিয়ে হাজির হলো গেটের বাইরে। কিন্তু আজ কারোর দেখা নেই। হঠাৎ করে মানুষগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে কেন! মহা চিন্তায় পড়ল কালু। কেননা ব্রেকফাস্ট টাইমে দু-চারটে বিস্কুট, লাঞ্চটাইমে দু'মুঠো ভাত আর ডিনারটাইমে এক-আধপিস রুটি মানুষদের থেকে জুটেই যেত। তাই মানুষেরা বাড়ির বাইরে না বেরোলে রীতিমত খাদ্যসঙ্কটে পড়তে হবে কালুকে। কী করা যায় ভেবে না পেয়ে কালু সল্টলেকে ছুটল, অন্য কুকুরদের পরামর্শ নিতে।

২

প্রথমেই হাজির হল ওর বিদেশি বড়দার বাড়ি। বড়দা অর্থাৎ একটা জার্মান শেপার্ড, সল্টলেকের এক বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে পোষ্য। সেখানে পৌঁছে দেখে বড়দা এখনো বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। তিন-চারবার ডাকার পর ঘুম ভাঙল। জড়ানো গলায় কালুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে ছোট, সাতসকালে কী ব্যাপার?"

"সর্বনাশ হয়ে গেছে বড়দা। শহর থেকে সব মানুষগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে।"

"ইডিয়ট! কী যা তা বলছিস!"

"হ্যাঁ গো। রাস্তাঘাটে কেউ নেই, কোনও গাড়িও চলছে না।"

"কিছুই খবর রাখিস না নাকি! আজ থেকে তো লকডাউন শুরু হয়েছে।"

"কী? লকআউট?"

"উফ! তোদের মানে এই রাস্তার নেড়িকুকুরদের পেটে একদম শিক্ষা নেই। যতসব ভুলভাল ইংরেজি বলিস।"

"তুমিই বুঝিয়ে বলো না বড়দা, কী হয়েছে?"

"ওকে, শোন তবে। কোরোনা নামের একটা ভয়ঙ্কর ভাইরাস শহরে ছড়িয়েছে। এখন কোনও মানুষ বেরোলেই অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই সরকার থেকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে, আগামী কয়েকদিন সবাই বাড়িতে। কেউ বেরোবে না।"

"বলো কি! তাহলে আমাদের কী হবে! আমাদের পেটে যা জোটে, তার বেশিরভাগই তো মানুষের দেওয়া খাবার। তারা রাস্তায় না বেরোলে, আমরা সেই খাবার পাব কেমনে?"

উঠে দাঁড়াল বড়দা, তারপর কালুর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "সে তুই ভাব। আমার ওসবের চিন্তা নেই। আমার সারাদিন এমনিই খাবার জুটে যাবে। তোদের মতো ওমন..." কথাটা শেষ করার আগেই গলায় টান পড়ল বড়দার, একটা মোটা চেন বারান্দার থামের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

কালু মনে মনে বলল, "তুমি থাকো তোমার খাবার নিয়ে। এমন বন্দিজীবন আমার চাই না।"

৩

এখন কী করা যায়! বড়দা তো কোনও সমাধানের রাস্তাই দেখালো না। এবার বরং মেজদার বাড়ি যাওয়া যাক। মেজদাও এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে পোষ্য ঠিকই, তবে সে জাতে দেশি কুকুর। তাই কালুর দুঃখ ঠিক বুঝবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখে মেজদা নিজেই মনমরা হয়ে গেটের পাশে শুয়ে আছে। কালুকে দেখেই বলল, "আয় ছোট আয়, কী হয়েছে শুনেছিস? কী চিন্তায় পড়লাম বলতো ভাই!"

"হ্যাঁ, বড়দার থেকে শুনলাম এক্ষুণি। তবে তোমার আর চিন্তা কী! তুমিও তো বড়দার মতোই পোষ্য, সারাদিন ঠিক খাবার জুটে যাবে।"

"ধুর, কী যে বলিস! বড়দা তো এক রিটায়ার্ড সরকারি দম্পতির বাড়িতে থাকে। তাই লকডাউন, ভূমিকম্প যাই হোক না কেন, ওর মালিক ঠিক পেনশন পাবেই। কিন্তু আমার মালিক তো ব্যবসা করে। এখন দোকান বন্ধ, তাই রোজগারও বন্ধ। নিজেরা খেতে না পেলে কী আর আমায় পুষবে! কাল লকডাউন ঘোষণা হওয়ামাত্রই আমাকে ইশারা করে মালকিন কিসব বিড়বিড় করছিল মালিকের কানে। কী করা যায় বলতো ভাই?"

"এতো চিন্তা করো না। এই কয়েকদিনেই তোমার মালিকের সব টাকা শেষ হয়ে যাবে না। চিন্তা তো আমার করা উচিত। আমার অবস্থাটা একবার ভাবো তো।"

কালুর অবস্থা ভাবা তো দূরের কথা, কালুর কথাগুলো মেজদার কানেই ঢুকল না। সে নিজের চিন্তাতেই মগ্ন।

৪

আশাহত হয়ে কালু উলটোডাঙায় ফিরে এল। বেশ খিদে পেয়েছে, গলাও শুকিয়ে গেছে। ও সেই কমপ্লেক্সের গেটের বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল, যদি কেউ বেরোয়। কিছুক্ষণ পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের জিপ এল। অ্যাম্বুলেন্স থেকে আপাদমস্তক ঢাকা কিছু লোক বেরিয়ে কমপ্লেক্সের এক বাসিন্দাকে ধরে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা কী হলো, বুঝতে পারল না কালু। এমনসময় পিছন থেকে ডাক পড়ল। মুখ ঘুড়িয়ে দেখে পাড়ার নেড়িকুকুরের একটা দল এসে হাজির। দলপতি গোছের একটা কুকুর বলল, "কী রে, বিস্কুটের জন্য বসে আছিস? ওসব আদুরে অভ্যাস ছাড়ো খোকা। সময় বদলাচ্ছে। খেতে চাস তো আমাদের সঙ্গে চল।"

"কোথায়?"

"চোপ! আবার প্রশ্ন করছে! খাবার চাস তো চুপচাপ চল। নাহলে পেট শুকিয়ে মর।"

কালু আর বাক্যব্যয় না করে ওদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করল। ওদের ব্যবহার কালুর পছন্দ হয়নি ঠিকই, কিন্তু ওরা খাবারের সন্ধান দেবে বলেছে। বড়দা আর মেজদার মতো শুধু জ্ঞান দেয়নি।

কিছুক্ষণ ছোটার পর ওরা হাজির হলো পাশের বস্তির একটা ভাগাড়ের সামনে। সেখানে একগাদা পচাগলা খাবার পড়ে রয়েছে। দলপতি বলল, "ভাইলোগ, পার্টি শুরু হোক তবে।" দলপতির কথাটা শোনামাত্রই অন্যান্য কুকুররা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাগাড়ের ওপর। কালু একটু দূরে নাক সিঁটকে দাঁড়িয়ে রইলো। ব্যাপারটা খেয়াল করে কালুর পাশে গিয়ে দলপতি বলল, "কী রে খোকা, খিদে পাইনি?"

"আমি কোনোদিনও এমন ডাস্টবিন বা ভাগাড় থেকে খাবার খাইনি।" কাঁদো কাঁদো গলায় উত্তর দিল কালু।

"এসব নেকুপুষু মার্কা কথা ছাড়। নেড়িকুকুর হয়েই জন্মেছিস যখন, নেড়িকুকুদের মতোই বাঁচতে শেখ। কটাদিন মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া খাবার খেয়েছিস বলে নিজেকে পোষা কুকুর ভাবছিস! তাহলে কোনও এক মানুষের পা চেটে, তার বাড়িতে গলায় শিকল বেঁধে পড়ে থাক।"

কথাগুলো শুনতে খুব খারাপ লাগলেও কালু বুঝলো এটাই বাস্তব। তাই আর সাতপাঁচ না ভেবে ভাগাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। একটা অর্ধেক পাউরুটির টুকরো পড়ে আছে। গন্ধ শুঁকে ওটাই মুখে পুড়ে নিল। পাউরুটিটা পচা হলেও খিদের মুখে অমৃত মনে হলো।

৫

শুরু হলো কালুর নতুন অভ্যেস। এখন আর মানুষের আশায় বসে থাকতে হয় না। সকাল-বিকেল ভাগাড়ে গিয়েই ভরপেট খাওয়া হয়ে যায়। এভাবেই কটা দিন কেটে গেল। একদিন দুপুরে কালু একটু ভাতঘুম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় দেখে বড়দা আর মেজদা এসে হাজির। কালুকে উদ্দেশ্য করে ওরা বলল, "কিছু খাবার হবে ভাই?"

অবাক হলো কালু। কী হয়েছে জানতে চাওয়ার আগেই বড়দা বলল, "দাদুর করোনা হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আর দিদাকে কোথায় নিয়ে গেছে জানি না। বাড়িতে কেউ নেই। দু'দিন প্রায় না খেয়ে আছি।"

মেজদা বলল, "আমার কী হয়েছে বুঝতেই পারছিস। প্রথমে মালিক আমাকে রেখেছিল, তারপর লকডাউন বেড়ে যাওয়ায় আমাকেও বার করে দিয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে রে।"

বড়দা আর মেজদার কথা শুনে কালুর খারাপ লাগল। ওদের নিয়ে হাজির হলো ভাগাড়ের সামনে। ওরাও প্রথমে কালুর মতো নাক সিঁটকালো। কিন্তু মিনিটখানেক বাদেই, কালু বোঝানোর পর আর পেটের জ্বালায় ভাগাড়ের খাবার মুখে তুলে নিল। এমনসময় আবার একটা অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি এসে বস্তি থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল। কালু বলল, "এটা কী হচ্ছে তোমরা জানো? একটা একটা করে মানুষকে তুলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?"

বড়দা আর মেজদা দু'পাশে মাথা নাড়ল। "চলো তো, গাড়িটার পিছু নিই। তাহলেই জানতে পারব।" কালু কথাটা বলামাত্রই তিনজন মিলে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে ছুটতে লাগল। অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে পৌঁছালো একটা সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডের সামনে। কিছুক্ষণ পর ওরাও সেখানে পৌছে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তারপর ওয়ার্ডের একটা জানলা খোলা পেয়ে সেখান দিয়ে ভেতরে তাকাতেই অবাক হলো কালু। সেই কমপ্লেক্সের যে বাসিন্দাটাকে কিছুদিন আগে ধরে এনেছিল, সে ওয়ার্ডের ভেতর একটা খাটে শুয়ে আছে। আর ঠিক তার পাশেই শুয়ে আছে সদ্য আনা বস্তির লোকটা। এটা বেশ আশ্চর্য দৃশ্য। কালু সবসময় দেখেছে, শহরের বড় বড় বিল্ডিংয়ে যারা থাকে, তারা সবসময় বস্তির লোকেদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যায়। আর আজ তারা একসাথেই আছে, পাশাপাশি। এই অবাক দৃশ্যটার কথা ভাবতে ভাবতেই ওরা তিনজন বাইরে বেরিয়ে এসে একটা চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়ালো। কয়েকটা লোক চা-বিস্কুট খাচ্ছে আর মাঝেমাঝে ওদের দিকে বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছে। বড়দা আর মেজদা মহানন্দে সেই বিস্কুট খেলেও কালুর খাওয়ায় মন নেই। সে ভাবছে এখনকার পালটে যাওয়া পরিস্থিতির কথা। মানুষ হোক অথবা কুকুর, এমনি সময়ে নিজেদের মধ্যে নানারকম ভেদভেদ থাকলেও এরকম বড় বিপদের সময়, সমস্ত ভেদাভেদ মুছে সবাই সমগোত্রীয় হয়ে যায়।

আকাশে মেঘ করছে, একটু পরেই কালবৈশাখীর ঝড় উঠবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কালু। এই লকডাউনে আর কী হয়েছে জানি না। তবে জীবন সম্পর্কে কালুর যে একটা বড় শিক্ষালাভ হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ছেলেবেলার বন্ধু

অয়ন চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ অয়ন চট্টোপাধ্যায়

আমার ছেলেবেলার একটা ছোট্ট অংশ কেটেছে উত্তরবঙ্গে। আট বছর বয়সে বাবার চাকরির সূত্রে এসে পড়ি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙায়। এক পাশে জলঢাকা, আর এক পাশে তার একটা শাখানদী সুটুঙ্গা– এই দুইয়ের মাঝখানে ছোট্ট এক মফস্বল শহর এই মাথাভাঙা। নদী, গাছপালা, মাঠঘাট, খেত, ছোট ছোট টিনের চাল দেওয়া ঘরবাড়ি, দোকান, দূরে আবছা দৃশ্যমান পাহাড় এবং সেখানকার সরল সাদাসিধে মানুষগুলোর মিশেলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জায়গাটা আমার মনে ধরে গিয়েছিল। সেখানে ক্লাস থ্রি-এ ভর্তি হই একটা স্থানীয় স্কুলে।

মাথাভাঙার পশ্চিম পাড়ায় একটা সরকারি বাংলোয় থাকতাম আমরা। আমরা মানে আমি, মা আর বাবা। গরম, শীত কিংবা পুজোর ছুটিতে মাঝেমধ্যে কলকাতা থেকে আসতেন ঠাম্মা-দাদু। তখন আমার আনন্দের সীমা থাকত না। কারণ, এমনিতে বাবার কাজের ব্যস্ততায় আমাদের খুব একটা ঘুরতে বেরনোর সুযোগ হতো না। কিন্তু ঠাম্মা-দাদু এলে প্রতি রোববার কোথাও একটা ঘুরতে যাওয়া আমাদের নিয়মের মধ্যে পড়ত। তাছাড়া ঠাম্মার হাতের সুস্বাদু রান্না, দাদুর গল্পের ঝুলি– সব মিলিয়ে সে দারুণ মজা। এছাড়া মজার আরেকটা কারণ ছিল অবশ্য আমার বন্ধু ফারহাদ। সে-ও যোগ দিত আমাদের সঙ্গে।

ফারহাদের পুরো নাম ফারহাদ আলম। শান্ত স্বভাবের, রোগা চেহারা, গায়ের রঙ ফর্সা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল আর উজ্জ্বল দুটো চোখের ওপর একটা পুরু চশমা। তার চুলগুলো অদ্ভুত রকমের কোঁকড়া, অনেকটা ব্রাজিলের ফুটবলার ডেভিড লুইজের মতো। ওরকম চুল আমাদের এখানে আর কারোর দেখিনি। আমাদের বাংলো থেকে অল্প দূরে থাকত ফারহাদরা। এক স্কুল, তায় আবার একই ক্লাস। তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটত তার সঙ্গে। স্কুলে যাওয়া, বিকালে মাঠে খেলতে যাওয়া, সন্ধ্যায় পড়তে বসা এমনকি অনেক

দিন রাতের খাওয়াটাও হতো একসঙ্গে। ওর বাবা মহম্মদ কাকুর একটা ছোট্ট দোকান ছিল মাথাভাঙার মূল বাজারে। সেখান থেকে কাকু মাঝেমধ্যে টুকটাক খেলনা, খেলার বল, চকলেট– এসব এনে দিতেন আমাকে। মহম্মদ কাকুর সঙ্গে আবার বাবার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ছোট শহর, তাই আশপাশের লোকজনের সাথে আলাপ পরিচিতিগুলো ঘটে সহজে। ফারহাদের যখন বছর তিনেক বয়স, তার মা মারা যান কি যেন এক রোগ! তাই বোধ হয় সে আমার মা-কে নিজের মায়ের মতোই ভালবাসত। মাথাভাঙা ছেড়ে চলে আসার সময় আমি তো কেঁদেছিলাম, কিন্তু মা বাইরে থেকে কিছু প্রকাশ না করলেও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেয়েছিলেন খুব।

ফারহাদ পড়াশুনায়ও ভীষণ ভালো ছিল। প্রতি পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম দশের মধ্যে আর কারোর নাম নিয়মিতভাবে না থাকলেও তার নামটা কিন্তু থেকে যেত। এই নিয়ে অবশ্য তার কোনও অহঙ্কার ছিল না। বরং সকলকে সাহায্য করা ছিল তার ধর্ম। ক্লাসের মাস্টারমশায়ের শাস্তির মুখে পড়া থেকে সে যে আমায় কতবার বাঁচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কারণ আমি ছিলাম যাকে বলে 'ব্যাকবেঞ্চার স্টুডেন্ট'।

একবার ক্লাস টেস্টে ফারহাদের পাশে আমার সিট পড়েছিল। আমি ছিলাম অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। অঙ্ক পরীক্ষার নাম শুনলেই বাঘ দেখার মতো ভীতির উদ্রেক হতো। আর সেইবার পরীক্ষার প্রশ্নও হয়েছিল বেশ কঠিন। আমি তো প্রশ্ন দেখে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। ফারহাদ পাশে না থাকলে পাশ নম্বরটুকুও তুলতে পারতাম কিনা সন্দেহ ছিল। তার দৌলতে সেইবার একশোয় ষাট পেয়েছিলাম। যদিও অন্যের সাহায্যে পরীক্ষায় পাশ করার পক্ষপাতী আমি একেবারেই নই।

আরেকটা ঘটনা মনে আছে। দিনটা ছিল শিশু দিবস। স্কুলে অনুষ্ঠান শেষে সকলকে দুটো করে চকলেট দেওয়া হয়েছিল। আমরা তো ভীষণ খুশি। ফেরার পথে চকলেটের প্যাকেটটা খুলতে যাব এমন সময় ফারহাদ আমার ডান হাতটা ধরে দাঁড় করালো। তার দিকে ঘুরে বললাম, "কী হলো?"

"ওই বাসস্টপটায় দেখ।"

রাস্তার ওপারে ভাঙা বাসস্টপটার দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে বেঞ্চের এক কোণায় একজন অল্পবয়সি মহিলা বসে রয়েছেন একটা বড় পুঁটুলি নিয়ে। তার মুখ ফ্যাকাসে, চোখে মুখে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট, যত্নের অভাবে মাথার চুল অবিন্যস্ত ও শুকনো আর পরনের কাপড়টা দেখে বোঝা যায় যে সেটা বেশ কয়েকদিন কাচা হয়নি। তার কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে ক্রমাগত কেঁদে চলেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো যদি কিছু সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু তখন আমাদের কারোর পকেটে এক পয়সাও অবশিষ্ট নেই। তবু ফারহাদ তাদের দিকে তাকিয়েই বলল, "আয় আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?" বিস্মিতভাবে প্রশ্নটা করলাম।

"দেখি না যদি কিছু সাহায্য করতে পারি", বলে সে একটা দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। দোকানদার ফারহাদের চেনা। তাই দাম বাকি রেখেই একটা বিস্কুটের প্যাকেট আর জলের বোতল কিনল সে। কথা দিয়ে এল পরেরদিন সে দাম মিটিয়ে দেবে। যদিও দোকানদার কাকু পরে আর দামটা নিতে চাননি। কারণ উনিও সেদিন দেখেছিলেন ফারহাদের কাণ্ডটা। সেই বিস্কুটের প্যাকেট, জল আর তার দুটো চকলেট সেই মহিলার হাতে দিয়ে সে বলল, "আপনি এগুলো রাখুন। আর আজ চিলড্রেন্স ডে, তাই ওর জন্য এই চকলেটগুলো।"

মহিলার ফ্যাকাসে মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। ফারহাদের এমন কাণ্ড দেখে আমার মনে তার জন্য ভালোবাসা ও মুগ্ধতা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। তার দেখাদেখি আমিও সেদিন আমার চকলেট দুটো সেই মহিলাকে দিয়ে এলাম।

ক্লাস সিক্সের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যায় বাবা অফিস থেকে ফিরে বললেন, "বাবু, আবার নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় এসেছে।" অর্থাৎ বাবা বদলি হয়ে যাচ্ছেন। কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করলাম, "এবার কোথায়?"

"দুর্গাপুর।"

বদলির খবরটা শুনে প্রথমটায় বেশ আনন্দই পেয়েছিলাম। কারণ নতুন জায়গা দেখার আমার ভারী শখ। কিন্তু আবার পরক্ষণে ফারহাদের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম তাকে খবরটা জানালে সে-ও নিশ্চয়ই কষ্ট পাবে। তাই অনেক কষ্টে পরেরদিন তাকে জানালাম আমাদের আসন্ন স্থান পরিবর্তনের খবরটা। স্বাভাবিকভাবে সেটা শোনার পর সে খানিকক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। যদিও বাইরে থেকে বিশেষ কিছু প্রকাশ করল না। এটাও তার একটা বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে– নিজের আবেগগুলোকে এইটুকু বয়সেই সে বেশ কন্ট্রোল করতে পারে। কিন্তু তবুও তার সেদিনের হাবভাব, কথাবার্তা সবকিছুর আড়ালে ধরা পড়ছিল চাপা কষ্টটা।

আস্তে আস্তে আমাদের মাথাভাঙা ছাড়ার দিন এসে পড়ল। সেদিন সকাল থেকে আমাদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। বাক্স-প্যাটরায় শেষ পর্বের গোছগাছ চলছে জোর কদমে। মাঝেমধ্যে বাবার বিভিন্ন কলিগ, পাড়ার অন্যান্য প্রতিবেশীরা এসে দেখা করে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছেন। মহম্মদ কাকুও এলেন। আমার হাতে একটা দামি কলম দিয়ে গেলেন বিদায়ী গিফট হিসাবে। কিন্তু, ফারহাদ সকাল থেকে একবারও এল না। শেষে দুপুরে গাড়িতে ওঠার মুখে তার দেখা পেলাম। দূর থেকে দেখি সে হনহন করে হেঁটে আমার দিকেই আসছে। তার হাতে মাঝারি সাইজের চৌকো মতো কিছু একটা খবরের কাগজে মোড়া। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "আর বলিস না রে, একটা বিশেষ কাজে এমন আটকে পড়েছিলাম।"

তার আবার কি বিশেষ কাজ! ওইটুকু ছেলের এমন বড়দের মতো কথা শুনে খানিক হাসিই পেয়ে গেল। আমার হাতে সেই কাগজে মোড়া জিনিসটা দিয়ে বলল, "এই নে ভাই। তোর জন্য ছোট্ট একটা গিফট। যেখানেই যাস আমায় ভুলে যাবি না আশা করি?"

কাগজটা খুলে দেখলাম ফ্রেমে বাঁধানো একটা আঁকা ছবি। ফারহাদই এঁকেছে– দুই বন্ধু কাঁধে হাত রেখে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। নিচে এক কোণায় লেখা 'ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে– ভালো থাকিস। ইতি, ফারহাদ।' তার গিফটটা দেখে চোখে জল এসে গেল।

চলে আসার পরে ফারহাদের সঙ্গে বার কয়েক চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল। তখন ল্যান্ডফোনের যুগ, তাই ফোনে যোগাযোগ রাখাটা বিশেষ সম্ভব ছিল না। তারপর পড়াশুনার চাপে এবং কালের নিয়মে আস্তে আস্তে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মাথাভাঙা ছাড়ার আজ প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন দিল্লিতে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি

করছি, এই বছর পাঁচেক। এই ক'বছর একটানা ভালো কাজ করায় এবং কয়েকটা বড় প্রজেক্ট সফলভাবে উতরে দেওয়ায় আমার প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল। 'ছিল' বলছি কারণ এই বছর আর সেটা হলো না। সঙ্গে আবার মাইনেও খানিক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসবের জন্য দায়ী অবশ্য একটা মারণ ভাইরাস। যার কারণে এই বিশ্বব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য লকডাউন, অর্থনৈতিক ক্ষতি, মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানি এবং আরও কত কি!

সেদিন ফ্ল্যাটে বসে লকডাউনের অন্যান্য দিনগুলোর মতোই অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। সারাদিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পরে রান্না বসাতে গিয়ে দেখি কিছু দরকারি জিনিস গিয়েছে ফুরিয়ে। অগত্যা না বেরিয়ে আর উপায় নেই। তাও ভাগ্য ভালো এখন লকডাউন খানিকটা শিথিল হওয়ায় দোকানপাটগুলো আবার নিয়মিত খুলছে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগিয়েই বড় রাস্তা। রাস্তার পাশে একটা মুদিখানার দোকানে ঢুকতে গিয়ে দেখি ওপারের ফুটপাতে কিছুটা দূরে কয়েকটা মানুষের একটা জটলা। ব্যাপার কী তা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল ওখানে নাকি প্রতি সপ্তাহে এক ভদ্রলোক তার দলবল নিয়ে আসেন এই অঞ্চলের ফুটপাতবাসীদের দেখাশোনা করতে। তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, জামাকাপড়, খাবারের জোগান দিয়ে যান। শুনে আমার বেশ কৌতূহল হলো। কারণ এই মহামারীর সময় দুঃস্থ, অসহায় মানুষগুলোর পাশে যতটা থাকা যায় তত মঙ্গল। ভাবলাম ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে ওনাদের সংস্থার মাধ্যমে যদি আমার সাধ্যমতো সাহায্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায়। সে উদ্দেশ্যেই কেনাকাটা সেরে রওনা দিলাম ওদিকে।

গিয়ে দেখি সেখানে লাইন করে ফুটপাতবাসীদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে খাবারের প্যাকেট, জল, ওষুধ, জামাকাপড় এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী। স্বেচ্ছাসেবীদের একজনকে হিন্দিতে বললাম আমার ইচ্ছের কথাটা। সে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনের দিকে দেখিয়ে বলল যে সে-ই এই কর্মকাণ্ডের প্রধান উদ্যোক্তা, তার সঙ্গেই যেন আমি সরাসরি কথা বলি। তার কথা মতো এগিয়ে গেলাম সেই ভদ্রলোকের দিকে। তিনি অন্যদিকে ঘুরে তখন মোবাইল ঘাঁটছিলেন।

"নমস্কার, একটু কথা বলা যায়?" আমি যদিও হিন্দিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং সেই ভদ্রলোকটিও হিন্দিতেই জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে বাংলাতে লিখছি।

"হ্যাঁ, বলুন", আমার দিকে ঘুরে বললেন ভদ্রলোক। লম্বা, সুঠাম চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল, চোখে চশমা আর ফর্সা মুখের অর্ধেকটা মাস্ক দিয়ে ঢাকা। পুরু চশমার কাচের ভিতরে উজ্জ্বল চোখ দুটো দেখে আমি চমকে উঠলাম। আরে, এ যে ফারহাদ! হ্যাঁ, আমার ছেলেবেলার বন্ধু ফারহাদ আলম। না, চিনতে কোন ভুল হয়নি - সেই উজ্জ্বল দীপ্তিমান দুটো চোখ আর মাথার সেই অদ্ভুত কোঁকড়া চুল যে আমার মাথাভাঙার সেই প্রিয় বন্ধুর তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও বাকি মুখটা এখন দেখা সম্ভব নয়।

আমি উত্তেজিতভাবে বাংলাতেই বলে ফেললাম, "ফারহাদ! তুই এখানে?"

সে যদিও প্রথমে আমায় চিনতে পারেনি। তাই ইতস্তভাবে বলল, "হ্যাঁ। আমি... কিন্তু ঠিক চিনতে পারলাম না যে!"

আমি হুট করে মুখ থেকে মাস্কটা খুলে ফেললাম, যা মোটেই এই পরিস্থিতিতে করা উচিত নয়। বললাম, " আমি অর্কদীপ নন্দী। ৯৮ সালে মাথাভাঙা হাই স্কুলের ক্লাস থ্রি..."

আমার কথাটা আর শেষ হলো না। ফারহাদও এবার উত্তেজিত হয়ে তার মাস্কটা খুলে ফেলে বলল, "ও হো, ভাই তুই! সরি রে, মাস্কটার জন্য একদম চিনতে পারিনি প্রথমে।"

"আমিও যে তোকে একবারে চিনতে পারতাম তা কিন্তু নয়। তোর ওই ট্রেডমার্ক কোঁকড়া চুলগুলোই আসলে চিনতে সাহায্য করল, হে হে হে হে..."

ফারহাদের মুখের হাসিটা লেগেই রইল। বুঝলাম আমার মতো সে-ও ভীষণ খুশি হয়েছে এই রি-ইউনিয়নে। জানতে পারলাম সে পেশায় একজন কার্ডিওলজিস্ট, বর্তমানে দিল্লির এইমসে রয়েছে। ডাক্তারির পাশাপাশি এই এনজিও-টা চালায় ফুটপাতবাসীদের নিয়ে। প্রতিদিন তার কাজের পরে দিল্লির কয়েকটা অঞ্চলের ফুটপাতে এভাবেই তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেয় বিনামূল্যে। ফারহাদের যদিও এখন বেশিরভাগ দিন ওভারটাইম চলে, কিন্তু তবুও সে চেষ্টা করে প্রতিদিন কিছুক্ষণ অন্তত এই অসহায় মানুষগুলোর সঙ্গে সময় কাটানোর। এতেই সে শান্তি পায়।

আরও কথাবার্তায় বুঝলাম সেই ছোট্ট ফারহাদের অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার খিদে, সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার অভ্যেসগুলো একেবারেই পালটায়নি। বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। আর আজ আবার তাকে দেখে আমিও অনুপ্রাণিত হয়ে তার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম।

লকডাউন আমার চাকরির প্রমোশন কেড়ে নিয়েছে, আমার মাইনে দিয়েছে কমিয়ে, কিন্তু সেই লকডাউনই আবার আমার ছেলেবেলার বন্ধু ফারহাদকে ফিরিয়ে দিয়েছে প্রায় কুড়ি বছর পর – সেটাই বা কম কি!

লকডাউনে বন্দি জীবন

গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম

অঙ্কন ■ শুভনীল ঘোষ

কিংশুক স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে। আজ থেকে অনির্দিষ্টকাল ওদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। শমীন্দ্র স্যার বলে দিয়েছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সরকারিভাবে লকডাউন ঘোষণা হয়েছে। যতদিন করোনা সংক্রমণ না কমবে ততদিন স্কুল কলেজ কোর্ট কাছারি যানবাহন বন্ধ থাকবে। টিভি রেডিও খবরের কাগজে অন্য সব খবর চাপা পড়ে যাচ্ছে। দিনদিন লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। ষাটের ওপরে যাদের বয়স তাদের আক্রান্ত হওয়ার ভয় বেশি। শিশু-কিশোরদেরও রেহাই নেই। লকডাউন কতদিন চলবে তার নির্দিষ্ট সময় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কেউ বলতে পারছেন না। সারা পৃথিবীতে যখন এই মহামারী রোগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তখন আতঙ্ক যে নিছক গালগল্প প্রচার, এটাও ঠিক নয়। চীন আমেরিকা ব্রাজিল ইতালি ফ্রান্স এমনকি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এর দাপটে লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা পড়েছে। শহর শুধু নয় গাঁ গঞ্জেও এর থাবা পড়েছে।

কিংশুক সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সহপাঠীদে সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মন ভালো নেই। লকডাউনে গৃহবন্দি জীবন। বাড়িতে দিদির সঙ্গে নানা মতান্তর। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। ছোট বোন হেমলতাকে দুপুরে ফুল ছেঁড়ার অপরাধে পিঠের উপর দুমাদুম কিল চড় দিয়েছে। মাও ওকে আচ্ছা মতো বকুনি দিয়েছে। মার বকুনি খেয়ে কিংশুক দুপুরের ভাতও খাইনি। চুপচাপ বসে আছে। এই গৃহবন্দি জীবনে পড়াশোনা খেলাধুলা একেবারে দূরে সরে গেছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিংশুকের বাবা সুধাংশু বাবু সবার জন্য মাস্ক এনে দিয়েছেন। সেও আরেক কাণ্ড দিদির যে রং পছন্দ সেটাই কিংশুক দাবি করেছিল। দিদি সেটা অবশ্য কিংশুককে সন্ধ্যাবেলা মার সুপারিশে দিয়ে দেয়। তাতেও ওর মন ভালো নেই। মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরনোর উপায় নেই। বাজার হাট স্কুল কলেজ যানবাহন এমনকি রেল গাড়ির চাকা ঘুরছে না। গতদিনের থানার জিপ গাড়ি অলিতে গলিতে ঢুকে মাইক দিয়ে ঘোষণা করে গেছে। বাজার বন্ধ।

মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বেরনো নিষেধ।

পাড়ার সোমনাথ মাস্ক ছাড়া চৌমাথায় গিয়ে ঘুরছিল। পুলিশ তাকে লাঠিপেটা করেছে। তমাল দৌড়ে পালাতে পারেনি। পুলিশ তাড়িয়ে ধরে ফেলে কান ধরে ওঠবস করে নিয়ে তবে ছেড়েছে। ঘটনাগুলো মানুষের মুখে মুখে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। চৌমাথায় চারজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। বহু রোগীকে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে। যে বাড়িতে একজন আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে বেড নিচ্ছে। তার সঙ্গে যাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এমন সন্দেহ ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যিনি মারা পড়েছেন। তার লাশ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী দাহ করার অনুমতি নেই। এমনকি আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়াও নিষেধ। কী সাংঘাতিক রোগ করোনা! করোনা রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে যে কোনও মানুষ যখন তখন আক্রান্ত হচ্ছে। করোনা রোগের ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। কবে হবে তাও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলতে পারছেন না। সরকারি সূত্রে এইটুকু শুধু প্রচার করেছে, মাস্ক পরে হাটেবাজারে যান, রাস্তায় দূরত্ব বজায় রেখে চলুন, হাঁচি কাশি হলে মুখে রুমাল চাপা দিন, নাকমুখে ঘনঘন হাত দেবেন না। অসুস্থ রোগী থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। এই দাওয়াই ছাড়া এদের হাতে আর কোনও পরামর্শ।

কিংশুক মাস্ক পরে থাকলেও তার চোখে-মুখে আতঙ্ক ভাব এতটুকু কম নেই। এমন গৃহবন্দি জীবন কেউ চাইনি। দুই হাজার কুড়ি সালে তা এই পৃথিবীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে একটা চূড়ান্ত অস্বস্তি পৌঁছে দিল। তার উপর আমফান ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল দাপটে জনজীবন যখন স্তব্ধ তখন কিংশুক, রাকেশ, শ্যামল, কুন্তল, শকুন্তলা– এদের মানবিক যন্ত্রণাকে আর কে উপলব্ধি করবে? কিংশুকের গৃহশিক্ষক গোবিন্দ স্যার এসেছিলেন, বারান্দায় ওঠেননি। দূরত্ব বজায় রেখে বলে গেছেন, তোদের এখন কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ থাক। লকডাউন উঠে গেলে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলে হবে। কিংশুক বলেছিল, স্যার বিকেলবেলা খেলার মাঠে খেলতে যাওয়ার অনুমতি পাবো কি?

না, কিংশুক এ ঝুঁকি তোমরা নিও না। কোন বাড়িতে কে আক্রান্ত সে তোমরা জানো না। কোনও বাড়িতে যদি করোনা আক্রান্ত রোগীর রোগ চাপা থাকে তাহলে সেই ভাইরাসে যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে যায় তার জন্য সাবধান হওয়ায় বুদ্ধিমানের কাজ।

-স্যার বিকেল হলেই যে খেলার মাঠে মন চলে যায় তার উপায়?-হইচই করে যে আনন্দ পায় সেটা ত আমরা পাবো না। -ওরে পাগল লকডাউন উঠে গেলে দেখবি আবার হইহই করে আনন্দ করে বেড়াবি। কেউ তখন আর বাইরে বের হতে বাধা দেবে না।-কতদিন পর এই জরুরি লকডাউন উঠতে সময় লাগবে?-সে এখনই বলা যাচ্ছে না।

-স্যার একটা কথা বলবো?-বলো!-আমার বন্ধুদের সঙ্গে একটু দেখা করর সুযোগ করে দেবেন?-না কিংশুক, এখন কোনও বন্ধুবান্ধব নয়। নিজের জীবন বাঁচানোর এখন প্রাণপণ চেষ্টাটাই হচ্ছে সকলের কাছে বড়ে প্রয়োজন, নিজের জীবন বাঁচলে পরে বন্ধুবান্ধব মিলবে, পড়াশোনা হবে। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ফিরে পাওয়া যাবে। সুতরাং সাবধানে থাকো। সাবধানের মার নেই। যে অসাবধান হবে তার পতনও অনিবার্য। প্রকৃতির শাসন, এই শাসন না মানলে উপায় নেই। একদিক দিয়ে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা শেখার এই যে সুযোগ এসেছে, এটা তোমরা কেউ হাতছাড়া করো না। নিজেকে শাসনে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে শেখাও, পরবর্তী জীবনে এই মূলধন কাজে লাগাতে পারবে। হাসি হুল্লোড়ে জীবনে অনেক আসবে কিন্তু এই কঠোর নিয়ন্ত্রণটা রপ্ত করলে এটাও একটা সঞ্চয় হয়ে থাকল।

তবে মন সব সময় উৎফুল্ল রাখবে। ভয় মনে আর বনে। মন যদি উৎফুল্ল থাকে দেখবে অনেক বিপদকে জয় করা যায়। যাই হোক তোমরা ভেঙে পড়ো না। শরীর সুস্থ রাখো, মন ভালো থাকবে। এই দুই হাজার কুড়ি সালের পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। চার মাস যদি লেখাপড়া বাইরের যোগাযোগ মাইনাস হয়ে যায় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা অজানা শূন্যতা থেকেই যায়। কিংশুকের মা নিষেধ করেছেন, বাইরে বেরোবি না। কিন্তু চঞ্চল ছটফটে ছেলেটা কতক্ষণ গৃহবন্দি হয়ে থাকতে পারে? প্রতিদিন বিকেলে খেলার মাঠে মন চলে যায়, খেলার সঙ্গী রাকেশ, শ্যামল, বিমল এদের সঙ্গে খুনসুটি দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলা বন্ধ। সত্যিই কিংশুক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাড়িতে তার একদম ভালো লাগছে না। মন বসে না। কিসের একটা অস্বস্তি কিশোর মনকে কুরে কুরে খেয়ে নেবে বোধ হয়। কিংশুক মাকে বলল, মা করোনা নাকি সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে? মা বললেন, ওষুধ যখন আবিষ্কার হয়নি তখন আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে দাপুটে দাদা, তিনি মঙ্গলে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি দিচ্ছেন, যুদ্ধবিমান ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে উৎসাহ দিচ্ছেন, আর এই করোনা ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারলেন না।-তাহলে আমরা সবাই কি এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবো? কিংশুকের গলায় উদ্বেগ।-এই করোনা নিয়ে গবেষণা কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। ভারতের এক মন্ত্রী বললেন, পাঁপড় খেলে করোনা পিছু হটবে। আবার একজন মন্তব্য করলেন গোমূত্র খেলে রোগ পালাবে। নতুন কিছু ভাবনা চিন্তার বদলে স্রেফ ভাঁওতা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। মা আমি একটু রাজুদের বাড়ি যাবো। বাবাকে বলে দেবে না তো? না গিয়ে কাজ নেই, তোর বাবা জানতে পারলে বকাবকি করবেন। কেন ফালতু বকাঝকা খাওয়ার শখ?

মন ভালো নেই ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি গিয়ে। না ওই বাড়িতে কারো যদি করোনা হয়ে থাকে, হয়তো রোগটা চাপা আছে। তুই ওখানে গেলে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়বি। গিয়ে কাজ নেই, আমারও মন ভালো বলছে না।

মনমরা কিংশুক বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। মন চাইছে বন্ধুর কাছে যেতে, মার নিষেধ অমান্য করতেও পারছে না। এই যন্ত্রণা তাকে পিষে-পিষে একসময়ে অস্থির করে তোলে। সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিলে মন বসে না। কতক্ষণ আর মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাটি ভালো লাগে? গেম খেলতে ইচ্ছে করে না, কার্টুন দেখে দেখে সময় কাটে না। টিভি সিরিয়ালেও মন বসে না। ইদানীং বাবাকে অফিসে সপ্তাহে একদিন যেতে হয়। বাড়িতে ফিরে হ্যান্ড গ্লাভস খুলে হাতে স্যানিটাইজার, জামাকাপড়ে সাবান জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফ্রেশ হয়ে ঘরে ঢোকেন। তখন ভরসা হয় যে তিনি করোনায় এখনও আক্রান্ত হননি তো? বন্দিজীবন কেন নেমে এল? কে দেবে উত্তর! কী মর্মান্তিক বাস্তব জীবন যন্ত্রণা। আমহার্স্ট স্ট্রিটে একজন প্রৌঢ় করোনায় আক্রান্ত রোগী মারা গেছেন। দুদিন লাশ পড়ে থাকল, কেউ তুলে নিয়ে

দাহ করতে এগিয়ে এল না। আশ্চর্য! মহামারীর দাপট কোথাও বাদ নেই। লকডাউন মিটলেও স্বস্তি নেই। হাসপাতালেও সিট নেই। রোগী ভর্তি করতে ঝামেলার শেষ নেই। পুলিশ ডাক্তার নার্স সমাজসেবী মন্ত্রী প্রধান জেলাশাসক বিডিও সাংবাদিক রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউকেই করোনা ভাইরাস আক্রমণ করতে পিছু হটছে না। বাবা ফ্রেশ হয়ে কিংশুকের টেবিলের সামনে এসে বসলেন, বললেন, অঙ্ক যেটা বুঝতে পারবে না আমাকে বলো। কিংশুক কেমন যেন মনমরা হয়ে বসে ছিল। মৃদু কণ্ঠে বলল, বাবা আমার কিছু করতে ভালো লাগছে না। সুধাংশু ঘোষ বললেন, ধনী-গরিব সবার মনে একটা আতঙ্ক কী হয় কী হয়! এই মহামারীর প্রথম সূচনা হয় চীনে। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র চীনে। সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য আমেরিকা দোষ দিচ্ছে চীনকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ অবশ্য আমেরিকার অভিযোগ মানতে পারেননি। বিশ্বাস করেনি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কিংশুক জানতে চেয়েছে, কীভাবে এ রোগ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সঠিক কিছু বলতে পারছেন না, আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই মহামারী কোথা থেকে এল, কীভাবে নির্মূল হবে, সেই নিয়ে এখনও অন্ধকারে হাতড়ে চলেছেন, বাতাসের মধ্য দিয়ে করোনা ভাইরাস শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময় এটা ছড়াচ্ছে, অনেকেই বলছেন। কোথা থেকে এল এই রোগ সেটা এখনো অজ্ঞাত। তবে সবাই অনুমানভিত্তিক সর্তকতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। মাস্ক পরা, দূরত্ব বজায় রাখা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মন ভালো রাখা এই একমাত্র করোনা থেকে দূরে থাকার সাবধান বাণী। এই মহামারীর প্রতিষেধক কি কখনো আবিষ্কার হবে? কিংশুক হতাশা মিশ্রিত কণ্ঠে জানতে চেয়েছে। সুধাংশুবাবু বললেন, হবে হয়তো কখনো, তবে তার মধ্যে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করবে। এই যে কয়েকদিন আগে আমার এক বন্ধু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে থাকতেন, সামান্য কাশি গলা ব্যথা শ্বাসকষ্ট নিয়ে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হলেন। একদিন বাদেই জানা গেল তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমরা মৃত্যুর খবর পেয়ে গেলাম মরা মুখটা দেখতে এবং দেহ আনতে। হাসপাতাল দিল না। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাউকেই মৃত্যু মুখটা পর্যন্ত দেখতে দিল না। ছত্রিশ গজ দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে তাদের কর্তব্য শেষ করলেন। দাহ করা তো দূরের কথা দেহ স্পর্শ করার অধিকার কারও থাকল না। অত বড় একজন ভালো মানুষের দেহ কোন অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হলো কেউ জানতেও পারল না। স্যানিটাইজিং যারা করছে না তাদের দিয়েই কি এই মারণ ভাইরাস ছড়াচ্ছে? জানি না। এত সতর্ক থাকার পরেও এক বিডিও আক্রান্ত। তিনি মাস্ক পরতেন, কাজ করে বাড়ি ফিরে গাড়ি ধুতেন। হ্যান্ড গ্লাভস খুলে স্যানিটাইজার করে জামা প্যান্ট ধুয়ে ঘরে ঢুকতেন। তবু তাকে করোনা ছাড়ল না। আক্রান্ত হলেন। বাড়িতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল।

স্ত্রী-পুত্র কাজের মেয়ে সকলেই আক্রান্ত। বিডিও তিনদিন শ্বাসকষ্ট গলা ব্যথা কাশি নিয়ে লড়াই করে মারা গেলেন। সুতরাং এত সাবধান থাকার পরও যদি মহামারী দোরগোড়ায় এসে হানা দেয় করার কিছু নেই। বিডিও-র স্ত্রী কাজের মেয়ে সকলেই হাসপাতালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বাবা আমাদের স্কুল বন্ধ রাখতে বলছে সরকার। তোমাদের অফিস একদিন খুলছে কেন? আমাদের অফিস একেবারে

বন্ধ রাখলে যারা অফিসে কাজ করেন, যারা শিক্ষকতা করছেন বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। পরিবারগুলো না খেয়ে মারা পড়বে। এই ভেবেই খুব সতর্কতার সঙ্গে অফিস করার নির্দেশ। এই নির্দেশ অমান্য করলে দেশে আরেক অরাজকতা দেখা দেবে। বাবা একটা অঙ্ক করে দিয়ে উঠে যান। পাশে এসে দাঁড়ায় ফাইভে পড়া বোন হেমলতা। বলল, দাদা তোর এত মন খারাপ কেন? আমি দেখ কেমন ফিটফাট আছি। দেখিস করোনা আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় ঘেঁষতে পারবে না। কিংশুক তখনও অন্ধকারে হাতড়ায়। বলল, জীবন থেকে চারটে মাস মাইনাস হয়ে গেল। বন্দিজীবন কত অদেখা জগৎ মিস করলাম। কত কি অন্ধকারে তলিয়ে গেল। এত ভাবিস কেন দাদা? বলতে পারি না। ভাইবোনের মধ্যে আজ আর খুনসুটি নেই। কারো উপর রাগ তাপ নেই। যেন সারা পৃথিবীর স্বজন হারানোর শোক তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে। করোনা ভাইরাসে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে, এই মহামারী থেকে মুক্তির পথ কোথায় সেটা ভাবতে গিয়ে কিশোর বয়সে তাকে একেবারে প্রৌঢ় করে দিয়েছে। অন্ধকার আকাশে বাতাসে তামাম পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে গেছে। সেই ভাইরাস যদি কেউ নির্মূল করে মুছে দিতে পারতো তাহলে কিংশুকের মন ভালো হয়ে যেত।

কিংশুকের খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তবুও মার তাগাদায় কোনরকমে কিছু মুখে দিয়ে বিছানায় চলে যায়। বাবা মা দিদি বোন সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে জানালা খুলে বসে থাকে। ঘুম আসে না। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। জোনাকির জ্বলা নেভা। আকাশ থেকে ঝরে পড়া চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ঝিকমিক করছে। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হলো সমস্ত পৃথিবী যেন গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে এগিয়ে চলেছে। সেই নিস্তব্ধতায় একটা পাহাড়প্রমাণ ঢেউ অদৃশ্য থেকে এগিয়ে আসছে। কিশোর জীবনের তীর্থভূমি থেকে অথৈ অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে। তারই তোলপাড় শুরু। নিস্তব্ধ জনহীন রাতে কিংশুক ভাবতে থাকে যদি এই বাড়িতে কেউ করোনায় আক্রান্ত হয় তাহলে কে তাকে বাঁচাবে? পরক্ষণেই ভেসে ওঠে ছোট বোনের মুখটি। সেই তো অভয় দিয়ে বলছে, দেখিস করোনা আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় ঘেঁষতে পারবে না। নিশ্চুপ চরাচর নিশুতি রাতে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ কোটি মানুষের বসত। শান্ত এই মোহময় পৃথিবীতে কিংশুক নতুন করে আবিষ্কার করল, বাঁচার লড়াই চলতেই থাকুক। আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা নিয়েই বাঁচতে হবে।

মা

ঋতুপর্ণ বিশ্বাস

অঙ্কন ■ শুভ্রনীল ঘোষ

হাতে মোবাইল ফোন তুলে নিল স্বর্ণময়ী। চেষ্টা করল ছেলেকে ধরার। না, এখনও কোনও সাড়া নেই। রিং-ই হলো না। আশ্চর্য, হলো কী ছেলের!

তার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছে গতকাল সকালে। মোবাইল বেজে উঠতেই দৌড়ে এসেছিল ঘরে। খোকা ফোন করছে, খোকা অন করেই চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'হ্যাঁ বাবা–'

'সব ঠিক আছে তো?'

'একদম। তোমার খবর বলো।'

'আমরা ঠিক আছি।'

'কত দূর এলে?'

'মাইল চল্লিশেক এসেছি। সামনে একটা ছোট শহর, গুজরি। ওটা ছাড়িয়ে গিয়ে আবার তোমাকে ফোন করব।'

আর ফোন করেনি ছেলে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে বারবার। কিন্তু ওপারে রিং হয়নি। কোথাও কী আটকে পড়ল সে? তার কথা মতো তেমন তো হবার কথা না। কাল যখন কথা হয়েছিল– জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেউ কোথাও আটকাচ্ছে নাতো বাবা?'

সে বলেছিল, 'নাহ্। কত লোক ফিরছে।'

'হ্যাঁ, খবরে বলছিল, মুম্বাই থেকেও অনেকে ফিরছে সাইকেলে।'

'ফিরছে তো। হেঁটেও ফিরছে।'

'শুনেছি। পারবে?'

'পারতেই হবে। উপায় কী! প্রথমে তো মানুষকে ফেরায়নি, এখন ফেরাচ্ছে। হাতে গোনা ট্রেন। হাজার হাজার শ্রমিক। জায়গা পাওয়া যেমন কঠিন– গাদাগাদি করে যাওয়াও বিপজ্জনক। কার ভিতরে কী আছে! উঠবে ভালো মানুষ– নামবে আক্রান্ত হয়ে।'

'ঠিকই বাবা। তার চেয়ে সাইকেল বা পায়ে হেঁটে আসা নিরাপদ। শুধু কতদিন যে লাগবে!'

'যা লাগবে লাগবে।'

'তোমরা চিঁড়ে-মুড়ি-বিস্কুট নিয়েছো তো প্যাকেট ভরে?'

'নিয়েছি। আমাদের নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি চিন্তিত তোমার ওখানকার ঝড় নিয়ে। ক'দিন ধরেই শুনছি বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড়, আমফান। কাল দুপুরের আগেই আছড়ে পড়বে দীঘায়। তারপর দুই চব্বিশ পরগনা সহ কলকাতায়। ঝড়বৃষ্টিতে তছনছ করে দেবে সব। সাবধানে থেক মা।'

'থাকবো।'

'আবহাওয়া কেমন এখন?'

'মেঘ করে আছে। ঝড় ঝড় ভাব।'

'কাল দুপুরের পর ওটাই ঝড় হয়ে যাবে। সন্ধে নাগাদ তা প্রবল আকার নেবে।'

'নিক। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমি আছি বাড়িঘরে।' ছেলের গলায় চিন্তা ফুটেছিল, 'সেটাই তো আমার ভয়। আমাদের ছাদের অবস্থা ভালো না। রান্নাঘর, টয়লেটের চাল টালির। এক ঝটকায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে সব। তার উপর নরেন কাকাদের গাছপালা যেভাবে ঝুঁকে আছে আমাদের চালের উপর! শোনো মা।'

'বলো।'

'কাল সকালেই তুমি দু'বেলার মতো রান্না করে নেবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আর বাইরেই বেরোবে না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। তুমি সাবধানে। এই যে কথা বলছো– সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে বলছো তো?'

'হ্যাঁ মানে, এখন রাখছি মা। গুজরি এসে গেছে–'

চেঁচিয়ে উঠেছিল স্বর্ণময়ী, 'মানে! এই তো বললি সামনে গুজরি। তার মানে তুই সাইকেল চালাতে চালাতে কথা বলছিস! খোকা হ্যালো– হ্যালো–'

আর জবাব পাওয়া যায়নি ছেলের। খড়মড়–ঘড়াম করে একটা শুধু আওয়াজ শুনেছিল স্বর্ণময়ী। চমকে উঠেছিল সে। কী যে করে ছেলেটা! প্রথমে বলল সামনে গুজরি। এখন বলছে গুজরি এসে গেছে। মানেটা কী! নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল না। সাইকেল চালাতে চালাতে কথা বলছিল। উঃ, পারা যায় না। লকডাউনে রাস্তায় গাড়িঘোড়া কম। কিন্তু একেবারেই নেই তা তো না। নিজেই তো বলল, মাঝে মধ্যেই মাল বোঝাই লরি আসা যাওয়া করছে পাশ দিয়ে।

তখনও মোবাইল কানে স্বর্ণময়ীর। হ্যালো– হ্যালো করেই যাচ্ছিল। নাহ্, আর ফোন ধরেনি ছেলে।

তারপর থেকে স্বর্ণময়ী কাঁটা হয়ে আছে। ফোন করলেই বলছে সুইচড অফ। না হলে বলছে পরিষেবা সীমার বাইরে। ফোন কী ছেলে বন্ধ করে রাখল? কারখানার সময়টুকুনি ছাড়া তেমনটা তো কখনও সে করে না। তাহলে? তার সঙ্গে আরও দু'জন আছে। একজন বর্ধমানের, একজন মেদিনীপুরের। তাদেরও নিশ্চয়ই ফোন আছে। কিন্তু তাদের নম্বর তো নিয়ে রাখেনি স্বর্ণময়ী!

মহারাষ্ট্রের এক লোহা কারখানায় ঠিকা শ্রমিকের কাজ করে ছেলে। কাজ অনুযায়ী ডেকে নেয় ঠিকাদার। এখান থেকে সে গেছে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। ফেরার কথা পুজোর আগে। হঠাৎ এই লকডাউন। দোকানপাট, অফিস-আদালত, কারখানা– সব বন্ধ। খেটেখাওয়া মানুষদের বসে খেলে চলে! টাকা ফুরিয়েছে। খাওয়া নেই, থাকার জায়গা নেই। দূরের যারা, বাড়িঘরে ফিরবে, গাড়িঘোড়া নেই। চারদিকে কেবল করোনা আর মৃত্যুর খবর। চীনের উহান প্রদেশে সর্দিকাশি, গলা ব্যথা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং তা থেকে মৃত্যুর কারণ হওয়া এই করোনা রোগ এত তাড়াতাড়ি যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে কেউ আন্দাজ করতে পারেনি। কেউ ভাবতে পারেনি– গোটা বিশ্বে এত লোকের মৃত্যু ডেকে আনবে করোনার এককোষী ভাইরাস। এদেশে যখন বিদেশ থেকে আসা আক্রান্ত লোকদের হাঁচি-কাশি-শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছিল লোকজন– তখনই সব রকমের মেলামেশা বন্ধ করার জন্য বাইরের আর পাঁচটা দেশের মতো দেশে লকডাউন ঘোষণা করে দেয় সরকার। ধীরগতিতে যেভাবে সংক্রমণ শুরু হয়েছিল– মনে হয়েছিল অল্পদিনেই মিটে যাবে সব। মিটল না। এখন প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর হারও বাড়ছে অন্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

রোজ ট্রেন ধরে বড় বাজারের এক কাপড়ের দোকানে কাজে যেত ছেলে। বছর তিনেক আগে সেখানেই আলাপ হয় এক ঠিকাদারের সঙ্গে। হাওড়ার এই ঠিকাদারই তাকে প্রথম নিয়ে যায় ওখানে। তারপর থেকে প্রতিবারই যায়। গড়ে পাঁচ থেকে ছ'মাস কাজ হয়। তাতেই কাপড়ের দোকানে সারা বছরে যা পেত তার চেয়ে বেশি আয় করে আনে ছেলে। তাই না করতে পারে না স্বর্ণময়ী। একটাই ছেলে, বাড়ি ঘরে আর কেউ নেই, তবু সে ছাড়ে ছেলেকে। বাকি ছ'মাস যে সারাক্ষণ কাছে পায় তাকে। কাপড়ের দোকানে কাজ করার সময় ভোরের ট্রেন ধরে বেরিয়ে যেত। ফিরতো অর্ধেক রাতে। ক্লান্ত, বিরক্ত। সেখানে যা খাটিয়ে নিত! এই রোগা হয়ে গিয়েছিল। আর এখন বালাই ষাট! ভালো থাক আমার ছেলে। বিড়বিড় করতে করতে ঘরবার করছিল স্বর্ণময়ী। বাড়ি এসেও সে বসে থাকে না। ফেরার ক'দিন পর থেকেই সবজি নিয়ে বসে বাজারে। বেলা দুটো আড়াইটে পর্যন্ত বিক্রিবাটা করে– তারপর বাড়ি। বিশ্রাম করে আর তার হাতের কাজ করে।

আরও একবার ছেলেকে ধরার চেষ্টা করল স্বর্ণময়ী। ভারী মুখে বাইরে বেরিয়ে এল। নাহ, এমনি করে পারা যাবে না। সংসারে যত জ্বালাই থাক সহ্য করা যায়। মানুষ না থাকার জ্বালা সহ্য করা যায় না। তার বাবা অকালে গেছে, সহ্য করেছে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তখন বয়স কম ছিল। কষ্ট হয়েছে কিন্তু পেরেছে। এখন আর পারবে না। সংসারে তার এত জ্বালাই বা কিসের! ঘরে বাইরে দুটিই তো প্রাণী। মা আর ছেলে। বাড়ি আসুক, আর যেতে দেবে না। না, একদম না।

বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল স্বর্ণময়ী। তাকাচ্ছিল পাশের বাড়ির গাছপালার দিকে। মানুষ গাছপালা লাগায় সীমানা ঘেঁষে। গোড়া তার দিকে থাকবে, ডালপালা অন্যের দিকে। একী ঠিক? পাশের বাড়ির আম কাঁঠাল গাছ, নারকেল গাছের মাথা ঝুঁকে আছে তাদের রান্নাঘর, বাথরুমের টালির চালের উপর। ভাঙলে গুঁড়ো করে দেবে সব। অনেকবার বলা হয়েছে, ডালপালা যাতে একটু ছেঁটে দেয়। কানেই নেয় না। কালকের ঝড় ভাবটা এখন বেড়েছে বেশ দুলছে গাছপালা। নজর নামিয়ে পাঁচিলের ভিতর আনল স্বর্ণময়ী। ফুলের গাছই বেশি। জবা, গন্ধরাজ, টগর। বাতাবি লেবু গাছে এবারই ফল এসেছে। পেঁপে গাছ দুটো সারা বছরই ফল জুগিয়েছে। এখনও ঠাসা। নরম গাছ। এখুনি দুলছে অসহায়ের মতো। দুটোরই গোড়ায় উচ্ছে গাছ। যাবার আগে শুকনো ডালপালা, চটা চুটি দিয়ে তাদের মাচা করে দিয়ে গেছে ছেলে। দুটোতেই ফলন এসেছে। গাছভরা হলুদ ফুল, সবুজ উচ্ছে নুয়ে পড়ছে ঝড়ঝড় হাওয়ায়। বেরিয়ে যাওয়া উচ্ছে লতা মাচায় তুলে দিল। এগিয়ে গিয়ে উঁচু করে দিল ঝুলে পড়া জবা ফুলের ডাল। সব গাছের গায়েই হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল স্বর্ণময়ী। বলছিল, 'শক্ত

হয়ে থাকবি তাহলে কেউ তোদের কিছু করতে পারবে না।' কোথায় ছিল– মিঁয়াও মিঁয়াও করে এসে দাঁড়ালো বিড়াল। সঙ্গে তার ছানা। কোণের ঘরের পিছন বারান্দায় থাকে তারা। ছেলে খুব যত্ন করত। সে বাড়ি থেকে যাওয়ার পর ডেকে ডেকে বেড়াতো বিড়াল। খুঁজতো তাকে। কালো কুচকুচে ছানার গা। পায়ের পাতা চারটে শুধু সাদা। কালো মুখের মধ্যে চোখদুটো যেন দুটি হলুদ কাচের মারবেল। তাকালেই ঝকঝক করে। স্বর্ণময়ী জিজ্ঞেস করল, 'কী, কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব? সারা সকাল দেখা নেই!'

রাগী গলায় মিঁয়াও করে ছানার দিকে তাকাল বিড়াল।

স্বর্ণময়ী বলল,'দুষ্টুটা কোথাও চলে গিয়েছিল, তাই তো?'

মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে ছানা। ডাকল, মিউ মিউ স্বর্ণময়ী হেসে বলল, 'খিদে পেয়েছে? যাচ্ছি।'

খাবার রাখা ছিল। এনে দিল স্বর্ণময়ী। এক-দু'গাল খেয়েই সরে দাঁড়ালো মা। ছানা খাচ্ছে। তার পেট ভরে যাবার পর যদি কিছু পড়ে থাকে তবেই সে খাবে আবার। রোজ এমনটাই করে সে। দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে স্বর্ণময়ী। আজও খানিক দেখল। তারপর ঘরে আসছিল। নিজের পাঁচিলের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল পিছনের বাড়ির তারক মণ্ডল, 'কী বড়দি, ছেলের কোনও খবর হলো?'

দাঁড়ালো না স্বর্ণ। কী বলতে চায় লোকটা! ছেলে ফিরছে– সে খবর তো কেউ জানে না। বলল, 'ভালো আছে।'

তারক চেঁচাল, 'ভালো তো আছে। ট্রেনে কী চান্স পেল? সরকার থেকে তো পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাচ্ছে।'

'চেষ্টা করছে। পেলে চলে আসবে।'

ঘরে ঢুকে পড়ল স্বর্ণময়ী। ভারী কুচুটে এই লোকটা। খালি এর খবর তারে দিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। কিছু জানতে পারলেই বলবে একে ওকে। ভিন রাজ্যে খেটে খাওয়া মানুষদের এখন নাম দেওয়া হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক। তাদের থাকা খাওয়া মেলামেশা নিয়ে এখন মহা শোরগোল চারদিকে। তাদের প্রত্যেককেই মনে করা হচ্ছে করোনা আক্রান্ত। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন তেমন। সাবধানতার নামে তাদের হেনস্তাই করা হচ্ছে বেশি। কিছু জানতে পারলে এই তারকই পাড়াতুতো নেতাদের ডেকে আনবে। হই হল্লা বাঁধিয়ে দেবে। ওরা তো মানে না, কারও চেয়ে কম সাবধান নয় তার ছেলে। বলেই দিয়েছে, 'মা, ভিতরে কী আছে তা তো জানি নে। তুমি কোণের ঘরখানা পরিষ্কার করে রেখ। আমি গিয়ে ওই ঘরেই ঢুকব। বেরোবো চোদ্দদিন পরে।'

লকডাউনের ক'দিন পর থেকেই সবজি মাছ বাড়ির সামনে দিয়ে যায়। নেয় স্বর্ণ। একলার জন্যে মাছ কোটা-বাছার হাঙ্গামা করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ছেলের জন্যে করতে হয়। যখনই ফোন করবে– জিজ্ঞেস করবে, 'আজ কী রান্না করেছো? সপ্তায় দু'দিন অন্তত মাছ খাওয়া দরকার। মাছ নেবে। অবশ্যই।' পরশুদিন নিয়ে ছিল। কিন্তু খেতে গেলেই যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছেলের মুখ! আগে ঠিক ছিল। এখন যে তার খাওয়া থাকার ঠিক নেই! ভালোমন্দ খাওয়া যায়, না ঘরে থাকা যায়! তবু তার হুমকির ঠেলায় সবই তাকে করতে হচ্ছে। ছেলেপুলের খাওয়া ভালো না হলে মা বাবা ভালো করে খেতে পারে! ওই খেয়েছে কোনোরকম। অর্ধেকখানিই রেখে দিয়েছিল বেড়ালদের জন্যে। মা ছানা খাবে, দেখবে সে বসে। সারা সকাল আসেনি। ভাত কাটাকুটি রাখা ছিল গুছিয়ে। এখন তাই-ই ওদের এনে দিয়েছে স্বর্ণময়ী।

ঘরে এসে ফোন খুলল। দেখল চালু আছে কি না। মিসকল উঠে নেই তো? নাহ। ফোন এলে কী সে শুনতে পেত না! ছেলে আবার কায়দা করে দিয়ে গেছে খুব। অন্যদের ফোন এলে একরকম বাজবে। তার ফোন এলেই গান বেজে উঠবে, মা-আমার মা-আমি এলাম তোমার কাছে। তখন যে কী হয় ভিতরটায়! যেখানেই থাকে ছুটে আসে। ছেলে জানে তা। তাই ফোন ধরলেই জিজ্ঞেস করে, 'গ্যাস জ্বালা নেই তো মা? দরজা খুলে রেখে আসোনি তো?'

গতি বাড়ছে হাওয়ার। ঝড় ভাব ঝড় হয়ে যাচ্ছে। শুরু হয়েছে বৃষ্টি। ছেলে ফোন করলেই জিজ্ঞেস করবে, 'রান্না হয়ে গেছে, তো তোমার? দু'বেলার মতো করে নিয়েছো তো?' রান্নায় গেল স্বর্ণময়ী দরজার পাশে টুলের উপর রাখল মোবাইল।

ঝড় শুরু হয়েছে। ভাতে ভোতে দিয়ে দিব্যি চালিয়ে নিতে পারে সে। মুশকিল হয়েছে ছেলের জন্যে। মিথ্যে বলতে পারে না, আবার সত্যি, বললেও রাগ করে সে। 'এই দিয়েই খাওয়া হয়ে যাবে! এমনি করলে শরীর থাকবে? কে দেখবে তোমাকে! আমি বাড়ি যাই তারপর এসব কোরো।'

পেঁপে ভাতে দিয়ে ভাত নামালো। এদিন ছোট্ট একটা কালবোস মাছ পেয়েছিল। তার মুড়ো আর পোঁছা ছিল। রাঁধবে পটল দিয়ে। চাপিয়েও দিয়েছে। টালির চালে হুড়ম করে এসে পড়ল কিছু। ছুটে ঘরে এল স্বর্ণ। ভয়ে ভয়ে গেল ফের। তাকালো মাথার উপর। কী আর পড়বে! চালের উপর ঝুঁকে থাকা পাশের বাড়ির নারকেল গাছ থেকে পড়েছে কিছু নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ওই তো পড়ে আছে ভাঙা টালি। ফাঁকা হয়ে গেছে খানিকটা জায়গা। জল আসছে। আর এখানে থাকা যাবে না।

তরকারি যতটা হয়েছে নামিয়ে নিয়ে ঘরে চলে এল স্বর্ণময়ী। পারা যায় না। পরের জন্যে এই ভোগান্তি। খোকা বাড়ি আসার পর প্রথমেই টালি বদলাবার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে ওঘরে কাজ করা যাবে না। সামনে বর্ষাকাল।

নমো নমো করে স্নান খাওয়া সারল। বেড়ালদের খেতে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। বাড়ছে ঝড়। সঙ্গে জোর শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

তিনটের পর থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেল ঝড়। বেড়ে গেছে বৃষ্টিও। দরজা জানলা বন্ধ করে মশারির ভিতর বসে আছে স্বর্ণময়ী। খুলে দিয়েছে টিভির তার। মোবাইল বন্ধ করতে গিয়ে থামল। খোকা ফোন করলে পাবে কী করে! যে কোনোসময় আলো চলে যাবে। হাতের কাছে এনে রেখেছে টর্চ, চার্জার লণ্ঠন। ভয়ঙ্কর শব্দে ডেকে উঠল মেঘ। মোবাইল চেপে ধরল স্বর্ণময়ী। যেন খোকাকে ধরেছে। চলে গেল আলো। সকালের খবরে বলেছিল, দীঘা থেকে কোনাকুনি এসে ঝড় ঢুকবে উত্তর চব্বিশ পরগনায়। একশো কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়ে নলহাটা, পারুলডাঙার উপর দিয়ে বনগাঁ হয়ে চলে যাবে বাংলাদেশে। তিনটের পর বাড়বে। কিন্তু শেষ হবে কখন– বলেনি। আরও বাড়ছে ঝড়, আরও। শোঁ শোঁ, মড়মড়, ঝপাস, দুদ্দাড়, ঝড়াং কত রকমের শব্দ হচ্ছে চারদিকে। কারও গাছপালা কাঁচা বাড়ি অক্ষত থাকবে না। তার টালির চালটাও যাবে। ঝড় একএক বার এমন করে এসে পড়ছে দরজা জানলার উপর মনে হচ্ছে ভেঙে ঢুকে পড়বে। পুরানো ছাদ। ফেটে গিয়ে প্লাস্টার খসে গেছে দু'এক জায়গায়। বুকের মধ্যে দুমদুম করছে স্বর্ণময়ীর। মাঝখানে নয়। সরতে সরতে খাটের এক পাশে সানসেটের নিচে জড়সড় হয়ে বসে আছে। এঝড় কী থামবে না! কখন!

এমনিতেই আলো গেলে আসতে চায় না। এই দুর্যোগে যে কখন আসবে, আদৌ আসবে কিনা, বলা যায় না। এই ঝড়ে বিদ্যুতের তার কিংবা ঘুঁটি কোনওটাই আস্ত থাকবে কিনা সন্দেহ। অতি প্রয়োজনে জ্বালবে বলে লণ্ঠন জ্বালেনি স্বর্ণময়ী। টর্চ রেখেছে হাতের কাছে। মাঝে

জ্বেলে দেখছিল দেওয়াল ঘড়ি। রাত বাড়ছে। আটটা সাড়ে আটটা– ন'টা সাড়ে ন'টা। ঘনঘন ডাকছে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এত তীব্র তার আলো জানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ছে ঘরে। অঘটন ঘটার ভয়ে বন্ধ করে দিয়েছে মোবাইল। এ ঝড় বোধহয় থামবে না! বাড়ছে কেবল। বেড়েই যাচ্ছে। এই বয়সে কম ঝড় তো দেখেনি! কিন্তু কখনও এমন একটানা দেখেনি। শোনেওনি কারও মুখে। টানা ঝড়। শোঁ শোঁ শনশন হুড়ুম দাড়ুম ঝড়াং। কী যে ভাঙছে, ফেলছে কোথায়! কারা শাঁখ বাজাচ্ছে। পবনদেবকে থামতে বলছে নিশ্চয়ই! কেউ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল কোথাও। মড়মড় ঝড়াং। হুড়মুড় হুড়। একেবারে গায়ের উপর ভেঙে পড়ল শব্দটা। কী ভাঙল! কী! রান্নাঘরের চালটা? নাকি অন্য কিছু! মাথা ঘুরছিল। বিছানার এক কোণে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল স্বর্ণ।

সময় যাচ্ছে। দশটা সাড়ে দশটা। কমছে যেন! হ্যাঁ, কমছে ঝড়। কমছে। এবার দমকা আসছে থেকে থেকে। সেটাও কমল। টর্চ জ্বালল স্বর্ণময়ী। এগারোটা পাঁচ। অনেক কমেছে ঝড়। কমে গেল। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দও আর প্রায় নেই।

এতক্ষণে গলা পাওয়া যাচ্ছে দু'-একজনের। চার্জার লণ্ঠন জ্বেলে খাট থেকে নামল স্বর্ণময়ী। অল্প করে জানলা খুলল। কানে এল পড়শি নরেন মণ্ডলের খেদোক্তি, 'সব গেছে গো– সব গেছে–।' অন্ধকারে এদিক ওদিক ওড়াউড়ি করছিল তার টর্চের আলো। সেই আলোয় দেখল পাশের বাড়ির একটা গাছও আর আস্ত নেই। সরে এসে পিছনের দরজা খুলল। ধক ধক করছে বুকের ভিতর। কী অবস্থায় দেখবে টালির চালের রান্নাঘর, বাথরুম। যা, গাছ পড়ে ভেঙে পড়েছে রান্নাঘরের চাল। বাথরুমের কিছু হয়নি, বোধহয় নীচু বলে। ফুলবাগান তছনছ। পেঁপে গাছ দুটো ভেঙে পড়ে আছে। উড়ে আসা হাজার পাতা-লতার ভিতর ছড়িয়ে আছে কাঁচা পেপেরা। কোনার বাড়ির সুপারিগাছ ভেঙে এসে পড়েছে পাঁচিলের ভিতর। তার ভারী মাথার তলায় ছিন্নভিন্ন স্বর্ণময়ীর জবাগাছ, বাতাবি গাছের আধখানা। কোথায় কী আছে নামতে সাহস হয় না। আলো উঁচু করে দেখছিল স্বর্ণময়ী। শুনতে পেল মা বেড়ালের ডাক। বাচ্চাটাকেই তো এমন করে ডাকে সে। সে কী তার কাছে নেই? আলো দেখেই লাফিয়ে এল। ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে এল। দরজা খোলা দেখে ঝুঁকে পড়ে ডাকল ক'বার। পিছিয়ে এসে ঘরমুখী হয়ে ডাকল। ডাকতে ডাকতে দৌড়ে নেমে গেল রান্না ঘরের পিছন দিয়ে। বাচ্চাকেই খুঁজছে। কোনও মানে হয়! এই দুর্যোগেও মা ছাড়া হবি তুই!

বৃষ্টি পড়ছে হালকা হয়ে। মেঘের ডাক নেই। ঝড় নেই। ঘরে এল স্বর্ণময়ী। মোবাইল খুলল। নাহ্ এখনও ঢুকল না। আশ্চর্য! না যাচ্ছে ফোন, না আসছে। কাল থেকেই কেন ফোন করছে না ছেলে! কেন! কী হলো তার? হ্যালো হ্যালো করে যখন সে তাকে ডাকছিল– ঘড়মড় ঘড়াম করে একটা আওয়াজ পেয়েছিল। তারপর থেকে আর ফোন করেনি বা ধরেনি ছেলে। কিসের ছিল ওই আওয়াজ? কোনও গাড়িঘোড়ার সামনে পড়ে যায়নি তো সে? মুখে আঁচল চেপে ডুকরে উঠল স্বর্ণময়ী।

রাত বাড়ল। খিদে তেষ্টা গেছে। জানলার নিচ দিয়ে ছানাকে ডাকতে ডাকতে ফিরল বিড়াল। টয়লেট সেরে এসে দরজা দেবে বলে বাইরে এল স্বর্ণ। বিড়াল ডাকছে ফুলবাগানের ভিতর। নিজের না হয় ইচ্ছে নেই, ওকে তো দুটো খেতে দেওয়া যায়। ঘরে এসে মাছের মুড়ো ভেঙে ভাত মেখে নিয়ে এল। ডাকল, 'আয়– আয়–'

এল। কাগজের প্লেটে তার সামনে খাবার নামালো স্বর্ণময়ী। চোখ চকচক করে উঠল বিড়ালের। ব্যস্ত হয়ে চলে গেল ছানাকে ডাকতে।

খানিক অপেক্ষা করল স্বর্ণ। সে এল একলা। কী হলো বাচ্চাটার! খালি ছোটাছুটি করে। ঝড়ের সময় বেরিয়ে কোথাও চাপাটাপা–। ভাবনাটা শেষ করতে পারল না স্বর্ণ। বলল, 'পাসনি, তাইতো? চিন্তা করিসনে। ঝড়ের সময় কোথাও গিয়ে ঢুকেছে। সকাল হলেই বেরিয়ে আসবে। তুই খেয়ে নে। খেয়ে নে তুই।'

বিড়াল খাবারের পাশে এসে বসল।

ঘরে এসে দরজা দিল স্বর্ণ। বিছানায় এল। এরাত কী কাটবার! চোখের পাতা এক হলেই দুঃস্বপ্ন দেখছে। কখনও দেখছে, ভারী গাড়ির সামনে ছেলে। কখনও দেখছে, সে লাফ দিয়েছে খাদের ভিতর। কখনও দেখছে, সে শুয়ে আছে রাস্তার উপর। স্বর্ণ জেগে উঠছে ধড়মড় করে।

চোখ লেগে এসেছিল ভোর রাতে। আলো ফুটেছে। উঠে বসেই মোবাইল খুলল স্বর্ণময়ী। ছেলের নাম বের করে টিপে দিল। নাহ, ঢুকল না। আর একবার চেষ্টা করল। আরও একবার। কেঁপে উঠল দুর্ভাবনায়। ছটফট করতে করতে বেরিয়ে এল বাইরে। একী! খাবার খায়নি বিড়াল! সামনে নিয়ে এখনও বসে আছে! এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসল স্বর্ণময়ী। বলল, 'কী হলো, খাসনি কেন এখনও! বাচ্চা আসেনি? আমিও আমার ছেলের খোঁজ পাচ্ছি নারে!'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো বিড়াল। স্বর্ণ বলল, 'হ্যাঁরে। তুই চারদিকে দেখেছিস ভালো করে?'

কিঁউ কিঁউ করে কেঁদে উঠল বিড়াল।

স্বর্ণময়ী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ফুঁপিয়ে উঠল মুখে আঁচল চেপে।

এবার দেখি

হা ন না ন আ হ সা ন

ওই তো এল কাশফুলেরা
ওই তো এল পেঁজা তুলো
ওই এসেছে মনভোলানো–
শিউলি ফুলের গন্ধগুলো।
ওই তো এল শিশির কণা
ওই তো এল পাখপাখালি
ওই এসেছে স্নিগ্ধ কোমল–
জোছনা মাখা ঘাস-বিচালি।
ওই তো এল আতশবাজি
ওই তো এল ঢাকের কাঠি
ওই বেজেছে ছুটির বাঁশি–
ঘর ছেড়ে তাই বাইরে হাঁটি।
ওই তো এল ছন্দ নিবিড়
ওই তো এল ঋতুর রানি
ওই ফুটেছে পদ্ম শালুক–
ঢেউ ভেঙে খুব বৈইঠা টানি।
ওই তো এল রোদপরিরা
ওই তো জমিন মাতোয়ারা
কিন্তু মাগো এবার দেখি–
খুশির ছবি মুছলো কারা !

হেডিংলের ক্রিকেট মাঠে আমি

ম ঞ্জু ভা ষ মি ত্র

ক্রিকেটকে ভালোবাসি, ক্রিকেট আমার প্রিয় কবিতার মতো ছোটবেলা গলিতে এবং পার্কে দল বেঁধে ক্রিকেট খেলেছি কত
মায়াঘন টেস্ট ম্যাচ অবিরাম রেডিওতে ছিল রিলে শোনা
বেরি সর্বাধিকারীর নামটা এখনও মনে করে আনাগোনা ভারত-ইংল্যান্ডে যেত গ্রীষ্মকালে, উরস্টারশায়ার ও সারে, ল্যাঙ্কাশায়ার, কেম্ব্রিজ,
অক্সফোর্ড অথবা হয়তো ইয়র্কশায়ারে ঘুরে ঘুরে খেলতো ক্রিকেট ম্যাচ কাউন্টি দলের সাথে
টেস্ট ক্রিকেটের রিলে শোনা যেত বিকেলের থেকে, সন্ধ্যা আর রাতে
মহারাজা অব ভিজিয়ানাগ্রাম–কণ্ঠ কানে আসে, স্মৃতির জানালা খুলি
অল রাউন্ডার গ্যারি সোবার্সের প্রতিভাকে কি করে যে এ জীবনে ভুলি
গোপনে স্পোর্টস অ্যান্ড পাস্ট টাইমের পাতা থেকে ক্রিকেটের ছবি কেটে
ছাদে বসে গদের আঠায় খাতার পাতায় সব রাখতাম এঁটে মানকড় অথবা পঙ্কজ রায় নামগুলি রূপকথা-নায়কের মতো উইকস ও ওয়ালকট,
পতৌদি, হানিফ মহম্মদ–আরও নাম কত
সেই আলি এবারের শীতকালে ইংল্যান্ডে লিডসে এসে হেডিংলের মাঠে
লেন হাটনের নামাঙ্কিত গেটের সামনে দাঁড়িয়েছি হৃদয় কপাটে
সময়ের করাঘাতবাজে মৃদু তালে; ইয়র্কশায়ার! জেগে স্বপ্ন দেখি
জীবনে এখন লগ্ন ঠিক এরকমভাবে কোনোদিন কাছে এসেছে কি
ধন্য হে ক্রিকেট খেলা, ভক্তকে তোমার কত নাম দিলে উপহার
কম্পটন, গডফ্রে ইভান্স, মার্চেন্ট, হাজারে, লিন্ডওয়াল, মিলার
রামাধীন, ওরেল, উমরিগড়, গিবস, পোলক, কানহাই, গাভাসকর
জিম লেকার, ট্রুম্যান, হ্যাডলি ও ইমরান খান, সৌরভ, তেন্ডুলকর,
কপিলদেব ও মুরলিধরণ, কুম্বলে, দ্রাবিড়, কোহলি ও ধোনি–তারা
স্বপ্নের সবুজ মাঠে আমাদের মুগ্ধ করে, ভুলে যাই মৃত্যুর পাহারা।

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

লকডাউনের আঁকিবুকি

স্কুল নেই, মাঠ-পার্কে যাওয়ার হাতছানি থাকলেও উপায় নেই। অসুখ না হয়েও অমলের মতো ঘরবন্দি। ওর তো তাও গল্প করার দইওয়ালা ছিল। আমাদের? হয় টিভি নয়তো বাবা-মায়ের মোবাইল হাতে পেলে একটু গেম! অনলাইনে পড়ার ঝক্কি তো আছেই। অগত্যা হাতের কাছের ড্রয়িং খাতাই ভরসা। তাতেই রঙ-তুলিতে মনের কথা।

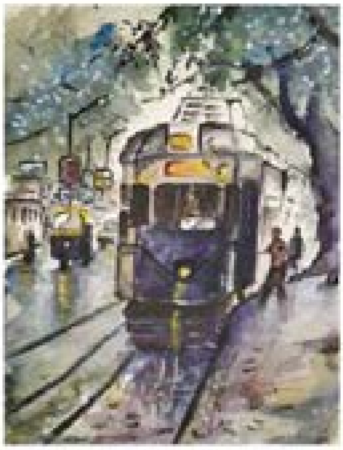
জিৎ রাহা, সপ্তম শ্রেণি

সৃজন মৈত্র, দ্বিতীয় শ্রেণি

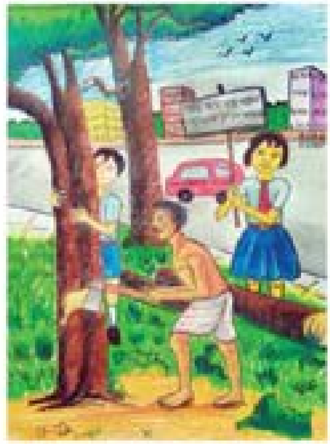
ঐশী পাল, চতুর্থ শ্রেণি

রম্যা চ্যাটার্জি, দ্বিতীয় শ্রেণি

স্বস্তিদেব গুহমজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি

সংযুক্তা পাল, দশম শ্রেণি

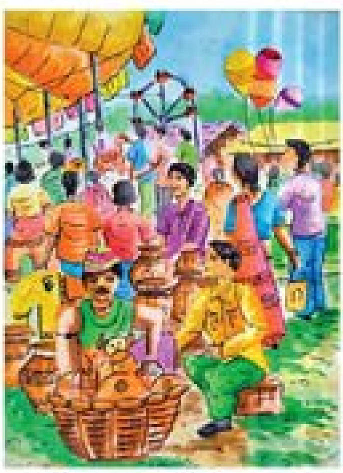
সামরা বিশ্বাস, ষষ্ঠ শ্রেণি

সুজা দে, সপ্তম শ্রেণি

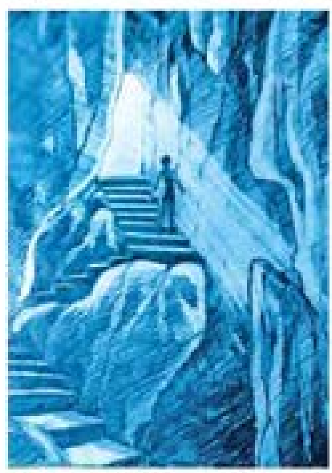
তৃষিতা চ্যাটার্জি, সপ্তম শ্রেণি

ছোটদের পাতা

অবিত্রিকা চক্রবর্তী, কেজি

অহন রায়, তৃতীয় শ্রেণি

মেঘনা পাত্র, ষষ্ঠ শ্রেণি

সমারোহ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণি

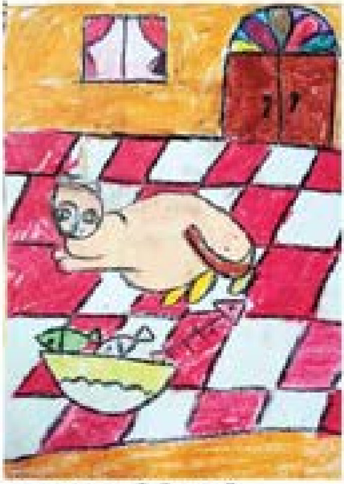

রূপকথা ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণি

সৌম্যাভ সাহা, পঞ্চম শ্রেণি

সুবনসিরি সরকার, তৃতীয় শ্রেণি

সৃজিতা দাস, দশম শ্রেণি

তৃণাঞ্জনা চ্যাটার্জি, ষষ্ঠ শ্রেণি

তৃষিত ব্যানার্জি, দ্বিতীয় শ্রেণি

অঙ্কিতা মুখার্জি, সপ্তম শ্রেণি

বরণিকা অরুণকার্তিক, দ্বিতীয় শ্রেণি

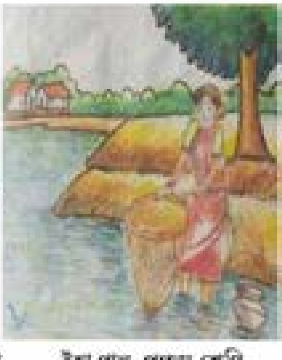

ইশা পাল, পঞ্চম শ্রেণি

ওদের কয়েকজনের রঙবেরঙের মনের কথা ধরা পড়লো শারদ সংখ্যায়।

করোনা আমফান পরিযায়ী কিংবা পলি মিনু

সনৎ বসু

অঙ্কন ■ প্রদীপ গোস্বামী

বিড়ালটা শুয়ে আছে গোপাল দাদুর জানালায়। সানসেটের উপরে। তার গায়ে গাছগাছালি। পেয়ারা, সজনে, বেল। পেঁপে কলা ডুমুর। মাটিতে উচ্ছে কুমড়ো জবা গাছের জঙ্গল।

বিড়ালটা সাদা, ধবধবে। একেবারে যেন পাক্কা সাহেব। ছটফটে আর শিকারি, পাখি ধরতে ঝাঁপায়। গুটিগুটি পায়ে ঘোরে।

কুকুরটা থাকে রাস্তার ওপারে। দেবযানী আন্টির বারান্দায়। ওটাই ঘুমানোর জায়গা। ওর একটা ফুটফুটে খয়েরি রঙের বাচ্চা আছে। নাম রকি। পূজা আন্টির ছেলে গুবলু নিয়ে গেছে। পুষবে বলে।

চারদিকে করোনা ভাইরাসের ভূত। দেখা যায় না, বোঝা যায় না। সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। কখন কাকে যে ধরে।

হঠাৎ খবর এল দেবযানী আন্টিকে ধরেছে। পজিটিভ। আন্টি কলকাতার মেডিক্যাল হাসপাতালের নার্স।

মহল্লা তোলপাড়। ঘরে ঘরে ফিসফাস, চোখমুখে আতঙ্ক। মোড়ের মাথায় গার্ডরেল, লাঠি হাতে পুলিশ। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা।

অহনা এবছর সবে টু থেকে থ্রিতে উঠেছে। নতুন ক্লাসে যেতে পারেনি। স্কুল বন্ধ, কবে খুলবে কে জানে,

মা বাবা দাদু আম্মা– কারো মুখে কথা নেই। সবার চোখ টিভিতে, অহনার একদম ভালো লাগছে না।

অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে। মার মোবাইলে প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়েছিল অহনার, এখন হয় না। ঠিক বুঝতে পারে। ম্যামরা হোয়াটস অ্যাপে কোশ্চেন করে। অহনা উত্তর দেয়। কোথাও আটকে গেলে মা বুঝিয়ে দেয়। বাবা বলেছে এখন এভাবেই চলবে।

বাড়িতে দুটো নাম অহনার। মার নাম বুকু, মাকে খুব ভালোবাসে বুকু। আবার ভয়ও করে। মার সবকিছু টাইম বাঁধা। স্নান-খাওয়া ঘুমানো, খেলাধুলা সব। মা তাকে স্মার্ট ফোনে অনেক গেম দেখতে দেয়। ওর প্রিয় গেম ডোবারম্যান। অবাধ্য হলে পিঠে দু-চার চড় থাপ্পড়। অহনা তখন ভ্যা ভ্যা করে কাঁদে। শব্দ পেয়ে আম্মা ছুটে আসে। মাকে বকে। ছোটদের গায়ে হাত দিতে নিষেধ করে। দাদু এসে অহনাকে আদর করে। মার কথা শুনে চলতে বলে। না হলে যে বড় হওয়া যাবে না।

কুকুরটা কালো-হলুদ রঙের। খুব শান্ত। হঠাৎ সেদিন মাঝরাতে কী ডাক। ঘেউ ঘেউ ঘেউ। থামতেই চায় না। অহনার ঘুম ভেঙে যায়, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মা বলে, নিশ্চয় চোরটোর দেখেছে। নয়তো নতুন কেউ। দিনকাল ভালো না।

দু'দিনের মধ্যে কুকুর উধাও। পুলিশ কি নিয়ে গেল? কি যে সব হচ্ছে অহনার মন খারাপ।

কুকুরটা কী ভালো ছিল। অহনা উপর থেকে পলি পলি বলে ডাকলে ঘাড় তুলে লেজ নাড়াতো। কোনোদিন গলা তুলে কুই কুই করতো। হয়তো কিছু বলতো, অহনা তা বুঝবে কী করে?

বিড়ালটা কিন্তু দিব্যি আছে। ঝোপ ঝাড়ে ঘুরছে, খেলছে, ছুটছে। কখনো ফড়িং, কখনো মশা। স্থির থাকতে দেয় না যে। হঠাৎ দুপুর থেকে মিউমিউ, থামে আর না। কানের বারোটা বেজে দফারফা। ধমক দিলেও থামে না। খিদেটিদে পেয়েছে বোধহয়।

ওকে কে খাওয়াবে? গোপাল দাদু? ও বাড়িতেই তো থাকে। আবাস যোজনার খুপরি। নিচু মেঝে, ছোট ছোট দরজা জানলা। তার সানসেট, বিড়ালের দু'বেলা শোয়ার জায়গা।

ছাদ থেকে সানসেট তো বেশ নিচু। কী করে ছাদ থেকে নামে বিড়াল? এক দুপুরে নিজের চোখে দেখলো অহনা প্রথমে বেলগাছে পা, অন্য পা সজনের ডালে। তারপর টুক করে লাফ। সোজা সানসেটে। আরামে ঘুমানোর জায়গা।

হঠাৎ টিভিতে খবর, ঝড় আসছে। ভয়ঙ্কর ঝড়। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। সবাই সাবধান, সাগর দিয়ে ঢুকবে। দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, বাংলাদেশের হাতিয়া নয়তো এরাজ্যের কাকদ্বীপ, সাগর, পাথরপ্রতিমা, বকখালি, সুন্দরবন।

গত বছর মা-বাবার সঙ্গে দীঘায় গিয়েছিল অহনা। সমুদ্রে স্নানও করেছিল। কত বড় বড় ঢেউ। বার বার তীরে এসে ভাঙছে। কত লোক, কত আনন্দ, তারপর অমরাবতী লেকে নৌকা, রোপওয়ে। ঢোকার মুখে আইসক্রিম খাওয়া। ক্রিমবেল।

ঝড়ে সব তছনছ হয়ে যাবে। মা বলে।

–আর কাজলদিঘির টয়ট্রেন? অহনা বাবার দিকে তাকায়,

–সব ঠিক বলা যাবে না, আগে ঝড় আসুক। বাবা মার দিকে তাকায়।

অহনারও সব কেমন গুলিয়ে যায়। কিন্তু ভয় আর যায় না। মা বাবাকে সাবধান করছে, হুটহাট বাইরে বেরোতে নিষেধ করছে, বুকুর দিকেও নজর।

–জানলা সবসময় বন্ধ রাখবি বুকু। কখন ঝড় এসে যায়।

এক বিকালে সত্যিই আমফান ঝড় এসে হাজির। সঙ্গে সেকি বৃষ্টি আর হাওয়া। হাওয়া তো নয় ঝড়। ভীষণ ঝড়। বুক কাঁপানো শনশন আওয়াজ, লাইট চলে গেল। সারা বাড়ি অন্ধকার। অনেকক্ষণ ধরে চলল তাণ্ডব। থামতেই চায় না। অহনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না।

পরদিন সকালে শুনল ধ্বংসের কাহিনি। বাড়ির রাস্তায় এক কোমর জল। জল অনেক বাড়ির ঘরের ভিতর।

বাবা বলল, কত গাছ উপড়ে পড়েছে গোনাগুনতি নেই। মা বলল, লাইটপোস্ট ভেঙে গেছে, ছাদের জলের ট্যাঙ্কের ঢাকনা উড়ে কোথায় চলে গেছে।

চারিদিকে মানুষের হাহাকার। দিন যায়, রাত যায়, জল আর নামে না। যাবে কোথায়। সব জায়গাই তো জল। নিকাশির পথ কোথায়। অহনা জীবনে এসব দেখেনি। তার যেমন সব অবাক লাগছে, ভয় হচ্ছে। আনন্দও কম হচ্ছে না।

বাবা খবর নিয়ে বলল সুন্দরবন শেষ। মানুষের চরম দুর্দশা। মাটির বাড়ির চাল উড়ে গেছে, নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে গ্রামে। প্রাণ নিয়ে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছে অসহায় লোকজন। সঙ্গে অবুঝ শিশুরা।

কলকাতার অবস্থাও ভয়াবহ। পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, গাছপালা ভেঙে একের পর এক রাস্তা বন্ধ।

ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ, খাবার নেই। তার উপর করোনা। কোভিড নাইনটিন। মানুষ কোথায় যাবে?

তারমধ্যেই নিচে কলিংবেল। গোপাল দাদুর গলা, তার মিনুকে ক'দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না।

–যাবে কোথায়? বিড়াল জলকে ভয় পায়। চারদিকে তো সমুদ্র। বাবা নিচে গিয়ে বলে।

গোপালদাদুর হাতের বাটিতে খাবার। মিনু তিনদিন খায়নি। কোথায় যে গেল। দাদুর চোখের কোণে জল। এত ভালোবাসে।

দিন গিয়ে রাত। সারাদিন দোতলার জানলার বক্সে অহনা। চুপচাপ বসে থাকে। আর বাইরে দেখে। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কী করবে ভেবে পায় না স্কুল নেই। পড়ার তাড়া নেই, কুকুর বিড়াল পলিমিনু তারও কোনও খবর নেই।

ওদের যে খুব ভালোবাসতো। সারাদিন ওদের কাণ্ড দেখে সময় কাটতো।

বাবাও এখন অফিস থেকে এসে গল্প বলে না। মাও লুডো খেলে না। বাবা দু'মাস ধরে অফিস যায়নি। কী করে যাবে? ট্রেন বাস অটো, টোটো, সব বন্ধ।

মা বলল, বাবার মনমেজাজ ভালো না। অফিস থেকে মাইনে দেয়নি, সারাদিন গুম হয়ে বসে কীভাবে, মা-র মুখ ভার।

কী খারাপ সময় যে এল। কবে সবাই প্রাণ খুলে হাসবে। অহনা বসে বসে ভাবে।

আবার টিভি চালু হয়। সাতদিন পর। খালি ঝড়ের খবর। করোনার

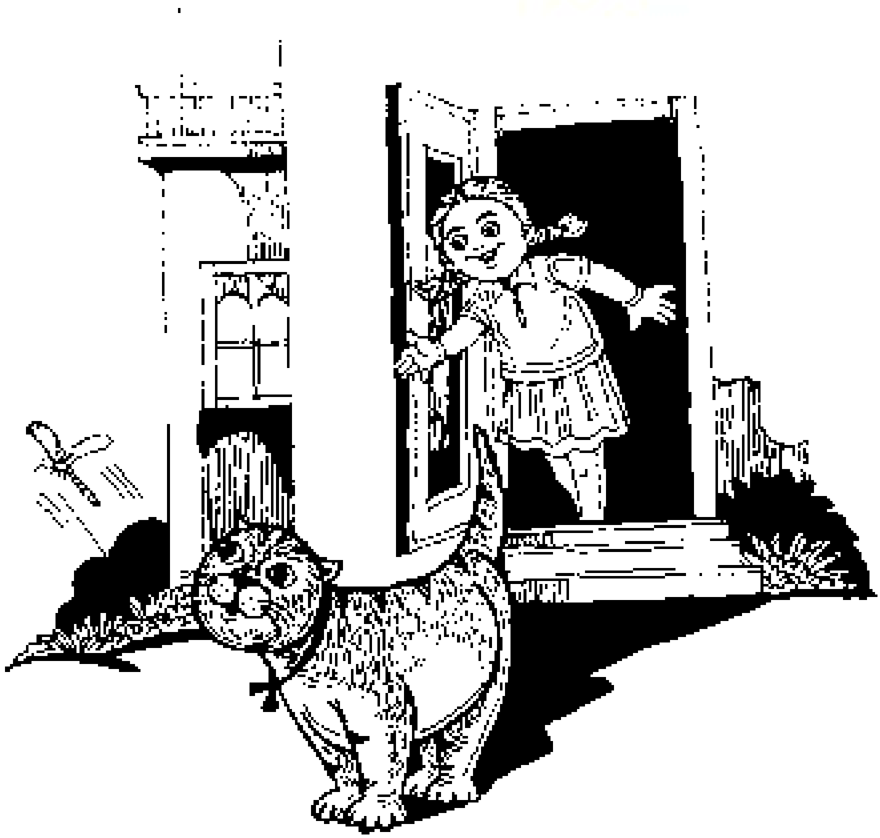

খবর। আর মৃত্যুর খবর। অহনার টিভি দেখতে আর ভালো লাগে না।

ছোটদের খিদেতে কাঁদতে দেখলে অহনার চোখেও জল এসে যায়। মা দেখতে পেয়ে কোলে টেনে নেয়। অত নরম মন হলে চলবে? আরও শক্ত হতে হবে, সামনে আরও খারাপ দিন আসতে পারে। শক্ত মনের মানুষরা ভয় বাধা সব জয় করে সামনে এগিয়ে যায়, অহনা মা'র গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে শোনে।

ছোট হলেও অহনা এখন একটু একটু করে অনেক কিছু বুঝতে শিখছে। ওদের স্কুল কি আর খুলবে না। কতদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। শুভ্রা, জান্নাত, জসপ্রীত– ওরা সবাই ভালো আছে তো? কে জানে।

কেন জানিনা অহনার মনে হয় শহরের মানুষরা বেশি চালাক। খুব বুঝে শুনে কথা বলে। যেমন ওর হোমটিউটর মৌসুমী আন্টি। এমনিতে খুব ভালো। কিন্তু পড়ানোর সময় গম্ভীর। হাসে না, মজা করে না। যাবার আগে ঘন ঘন ঘড়ি দেখে। কী দেখে আন্টিই জানে।

একটু একটু করে জল নামছে। চারদিনের মাথায় দেখা দিল রাস্তা। তারপর দিন গোপাল দাদুর বাড়ির উঠোন।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে সব।

সাতদিনের মাথায় কুকুরটাকে দেখা গেল দেবযানী আন্টির বারান্দায়।

–আয় পলি, আন্টি ডাকে।

পলিও সুরসুর করে নেমে যায়। সিঁড়িতে বসে দুধ পাউরুটি খায়।

অহনাও বারান্দ থেকে ডাকে, এই পলি, জেলি খাবি, মাখন পরোটা? পলি ঘাড় উঁচু করে। একটু একটু লেজ নাড়ায়, তা দেখে অহনা খুব খুশি।

পরদিন সকাল। রোদ উঠেছে। সকালের রোদ। আকাশ পরিষ্কার। মিষ্টি হাওয়া আসছে জানালায়।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অহনার। কানে আসে বিড়ালের কান্না। খাট থেকে নেমে ছুটে অহনা জানালায়। না, সানসেটে তো নেই।

খাটে উঠে শুয়ে রইল। আবার কান্না স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মিউ মিউ মিউ...। মনে হলো সিঁড়ির নিচে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক।

–আরে কে এটা? কি করে ঢুকলো। নিচের দরজা খোলা ছিল বোধহয়।

– মা, মা, দেখে যাও। অহনা ছুটে এসে কোলে তুলে নিল।

কিচেন থেকে চায়ের কাপ হাতে মা তখন সামনে।

–মা এ কিন্তু মিনু। গোপাল দাদুর বিড়াল।

–চিনেছি, তাড়াস না। ও এখন পরিযায়ী। মানুষের মতো প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়েছে।

–আগে খেতে দে। আমি দুধ গরম করে আনছি।

অহনাও মনেপ্রাণে তাই চাইছিল। মিনু কটাদিন এ বাড়িতে থাকুক। ওকে গায়ে হাত বুলিয়ে যতখুশি আদর করবে। তারপর গোপাল দাদুর হাতে তুলে দেবে।

মা তার মনের ইচ্ছেটা কি করে বুঝলো? এই জন্যই তো মা। মা তার সন্তানের মনের কথা বুঝবে না তো কে বুঝবে।

হায়রে!

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অঙ্কন ■ প্রদীপ গোস্বামী

বুড়োর মা, বুড়োর হাতে ১০০টা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, যাও, মাস্টারমশাইকে তোমার যা খাওয়াতে ইচ্ছে কিনে আনো। আজ বুড়োর জন্মদিন। গতকাল বুড়ো দুঃখ করছিল, এখানে সবাই তাদের জন্মদিনে স্যারেদের খাওয়ায়। আমি খাওয়াবো না?

বুড়োরা তো হাউজিংয়ে থাকে। এখানে বুড়োর মতো অনেকেরই প্রাইভেট টিউটর আসে, পড়াতে। বুড়োকে পড়াতে আসেন বিভূতিবাবু। বুড়ো অঙ্কে বড় কাঁচা কিনা, তাই একজন প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়েছে। বুড়োর বন্ধু, রানা, সে কিন্তু দারুণ অঙ্ক কষে। প্রতিবারই রানা অঙ্কে হাইয়েস্ট নাম্বার পায়। এ নিয়ে বুড়োর বাবা, প্রায়ই রাগারাগি করেন। মাঝখানে দাদু না থাকলে, বুড়োকে মাঝেমধ্যে চড়-থাপ্পড়ও খেতে হয়। দাদুই ওর বাবাকে থামিয়ে দেন। বলেন, থাক থাক, অত শাসন ভালো নয়। ও বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এবারেও রানা ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। অঙ্কে ৯৭ পেয়েছে। বুড়োর বাবা বলল– পাবেই তো। বন্ধু পেল অঙ্কে ৯৭, আর উনি পেলেন ৩৭। সারাদিন ফেসবই, মোবাইলে গেমস খেললে, আর কতইবা পাবে।

ফেসবই? সেটা আবার কী বই? দাদু জানতে চাইলেন। বুড়োর বাবা বলল, ফেসবই জানো না? ফেসবুক শোননি।

শুনেছি, শুনেছি। ওরাই বা কী করে বলো। ওদের বড় হওয়ার সিলেবাসে, খেলা বলে কিছুই নেই। না আছে একটা পার্ক, খেলার মাঠ। সারাদিন বাচ্চাগুলো ফ্ল্যাটে বন্দি। ওদের খেলা মানে এখন ওই ফেসবুক।

বুড়োর বাবা বললেন, এবার একদিন ওই মোবাইলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। বুড়োর বাবা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মা বললেন, আজকের দিনটা যাক না। আজ তো ওর জন্মদিন।

বুড়ো এবার গিয়ে লাইন দিলো, ভুজাওয়ালার দোকানের সামনে। লম্বা লাইন। সবাই সেফ ডিসটেন্ট বাঁচিয়ে লাইন দিয়েছে তো। সবাই দাঁড়িয়েছে তিন হাত দূরে দূরে। মাথায় টুপি, মুখে মাস্ক, কোনটা যে কে চেনাই যাচ্ছে না। বুড়ো হঠাৎ দেখল, পাশের লাইনে ওর বাবা। বেশ একটু দূরে, রানার বাবা। কিশোর আঙ্কেল, ওর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করছে। আশ্চর্য, ওরা দু'জনেই বুড়োকে চিনতে পারল না। মুখে মাস্ক পরলে যা হয় আর কী! বুড়ো কিন্তু ওদের ঠিকই চিনেছে। বুড়ো এবার চেষ্টা করল, ওদের আলোচনাটা কী নিয়ে, সেটা শুনতে। ওদের কথাগুলো কানে আসতেই বুড়োর মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। শুনল, বুড়োর বাবা, কিশোর আঙ্কেলদের সঙ্গে সামনের শনিবার বকখালি যাচ্ছে। অনলাইনে হোটেল বুক হয়ে গেছে, দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে। রানার মা আর শুভ্রা আন্টিও যাচ্ছে। সব শুনেটুনে বুড়োর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আজ দু'মাস, ওরা সবাই ঘরবন্দি। ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে, কোথাও। স্কুলটাও এখন বন্ধ। আশ্চর্য, বাবা একলা যাবে রানাদের সঙ্গে? ওদের কাউকে নেবে না। বুড়োর বাবা, বুড়োকে একদমই ভালোবাসেন না। যত ভালোবাসা, ওই রানার জন্যে। কারণ, বুড়ো রানার চেয়ে কম নম্বর পায়।

বুড়ো কচুরি, সিঙ্গাড়া, কালোজাম, জিলিপি নিয়ে বাড়ি ফিরল।

আজ সকাল থেকেই মেঘলা, মেঘলা। মনে হয় বৃষ্টি হবে। দিনেরবেলাতেও আলো জ্বালাতে হয়েছে। হঠাৎ ডোর বেলটা বেজে উঠল। মা বলল, বুড়ো দরজা খোলো। মাস্টারমশাই এলেন। বুড়ো গিয়ে দরজা খুলল, দু'জনের মুখেই মাস্ক বাধা। কেউ কাউকেই তেমন সঠিক চিনতে পারল না। ইতিমধ্যে বুড়ো ওর দাদুকে নালিশটা করেই দিয়েছে, বাবার বিরুদ্ধে। বলেছে, জানো দাদু, বাবা রানাদের ফ্যামিলির সঙ্গে সামনের শনিবার বকখালি যাচ্ছে। দাদু বললেন, সেকি, আমরা যাব না? বুড়ো বলল, না। আমরা সবাই বাদ। দুটো ঘর ভাড়া করেছে। একটা গাড়িও ভাড়া করেছে। বাবা ওদের নিয়ে যাবে বকখালি।

মা বললেন, কে কে যাচ্ছে? রানার মাসি? শুভ্রা সে নিশ্চয় যাবে? বুড়ো বলল, হ্যাঁ।

দাদু বললেন, ঠিক আছে, মন খারাপ করো না। খালি গাড়িটা কোথা থেকে ভাড়া করেছে, সেটা আমায় জানিয়ে দাও। আমি জানি, ওদের যাওয়া কী করে আটকাতে হয়। আমাদের ফেলে, বকখালি যাওয়া আমি বন্ধ করবই। বুড়োর মা বললেন, যাও দরজাটা খোলো। মাস্টারমশাই তো এসে পড়েছেন। বুড়ো এগিয়ে গেল, দরজার দিকে।

দাদু ভাবলেন, মাস্টারের তো আসার কথা ১২টায়। আজ বেশ তাড়াতাড়ি এলেন?

মাস্টারমশাই এসেই সোফায় বসে পড়লেন।

দাদু বললেন, 'স্যার, আজ বুড়োর মনটা ভালো নেই। ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন।

স্যার বললেন– ঠিক আছে। আজ কটা অঙ্ক কষিয়েই ছেড়ে দেব। মা বললেন, দাঁড়ান। আগে একটু মিষ্টি মুখ করুন। আজ বুড়োর জন্মদিন।

মাস্টারমশাই বললেন, খাওয়া তো যাবে না। আপনি বরং বেঁধে দিন। করোনার সময়ে বাইরে কিছু খাচ্ছি না। সরি।

মা বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে। কী দিনই না এল! ছেলের জন্মদিনে তার স্যারকে একটু মিষ্টি মুখ করানো যাবে না।

স্যার এবার বুড়োকে একটা অঙ্ক দিলেন। বললেন– এটা করতেই হবে। খুব সহজ। বুড়ো অঙ্কটা দেখে বলল, এমন অঙ্ক আমি আগে কখন করিনি। স্যার বললেন, সে কী, এতো খুবই সহজ। এটাও পারবে না? কথাটা একটু জোরেই বললেন, আর অমনি সেটা শুনে ফেলল বুড়োর বাবা। উনি তখন, ওর ঘরে বসে ল্যাপটপে 'ওয়ার্ক ফরম হোম' করছিলেন। কথাটা কানে যেতেই বুড়োর বাবা বললেন, 'পারবে কী করে। মোটে পড়াশোনা করে না। সারাদিন পড়ে আছে মোবাইল নিয়ে।

দাদু বললেন– ওকে বোকো না। ওর আজ মুড অফ। বুড়োর বাবা বললেন, ওর মুড তো রোজই অফ।

দাদু বললেন, সে তো হবেই। দু'মাস বাড়িতে আটকানো।

আটকানো তো আমরা সবাই। ওর বন্ধু, রানা সেও তো আটকানো দু'মাস। কিন্তু সে অঙ্কে ফার্স্ট হলো। আর ও পেল মাত্র ৩৭।

দাদু বললেন, পেতেই পারে। ওর বাবা ওকে নিয়ে কত চিন্তা করে। এই তো, সামনের শনিবার ওর বাবা, রানাকে নিয়ে যাচ্ছে বকখালি বেড়াতে। বুড়োকে কে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বলো।

বুড়োর বাবা অবাক হয়ে বলল, আমরা বকখালি যাচ্ছি, আপনি কী করে জানলেন? কে বলল?

হয়তো, তুমিই বলেছো। ভেবে দেখ।

বুড়োর বাবা মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

বুড়োর মা বলল, কী অদ্ভুত মানুষ। বুঝুন। দাদু ইশারায় বললেন– থামো। স্যার পড়াচ্ছেন।

বুড়োর মা বললেন, এমন শুনলে কেউ চুপ করে থাকতে পারে? স্যারের হাতে টিফিন কৌটোটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, স্যার, আজ থাক।

আপনি বরং কাল এসে–

স্যার বললেন, সেই ভালো। তবে এমন একটা সোজা অঙ্ক ও কষতে পারল না, ওকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

বুড়ো বলল, ওই অঙ্কতো আমাদের সিলেবাসেই নেই। এমন সময় ফের ডোর বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলতেই এবার ঘরে ঢুকলেন বিভূতি স্যার। বিভূতি স্যার তো কানন স্যারকে দেখেই অবাক!

আপনি এখানে? আপনি তো পড়ান সাততলায়। ঈশান কে। হরিহরবাবুর ছেলেকে।

কানন স্যার বললেন, এটা সাততলা নয়?

না, না। এটা তো, ৬তলা।

তাই। ঠিকই। ঈশান তো পড়ে ক্লাশ এইটে।

আমি ওর ক্লাশের একটা অঙ্ক, ভুলে বুড়োকে কষতে দিয়েছিলাম।

তাই তো ও বলছে, এটা ওর সিলেবাসেরই অঙ্কই নয়।

বুড়োর মা বললেন, যাক গে ওমন ভুল তো মাঝে মাঝেই হয়। এই তো, গত সপ্তাহে ঈশানদের বাড়ির, ফলের ঝুড়িটা, আমাদের বাড়ি দিয়ে গেসলো।

দাদু বললেন, এমন ভুল তো রোজই হচ্ছে। আপনি বরং ওপরে চলে যান। এই তো কটা সিঁড়ি। স্যার বলল, আজ আবার আমার জ্বর হয়েছে। শরীরটা তেমন ভালো নেই। ভাবছিলাম, নাই গেলুম।

দাদু বললেন, না না অবশ্যই যাবেন। পড়াশোনা বলে ওদের তো এখন কিছুই তেমন হচ্ছে না। ওই যা, অনলাইনে কি যেন রোজ হয়। ওকে কী পড়ানো বলে। স্যার বললেন, তাহলে যাই। বিভূতি স্যার বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ। বেরিয়ে পড়ুন।

বিভূতি স্যারকে দেখে, দাদু বললেন, বুড়ো এতক্ষণ তোমায় কে পড়াচ্ছিল? উফ এই মাস্কটা পরলে, মানুষের চেহারাটা একদম পালটে যায়। মা বললেন, এখন আমি কী করি। টিফিন কৌটোটা তো সাততলার স্যারকে দিয়েদিলাম! দাদু বললেন, যাকগে বিভূতি স্যারকে আর জন্মদিনের কথাটা না বললেই হলো।

কানন স্যার এবার গিয়ে ঢুকলেন। সাততলায় –ঈশানদের বাড়ি।

একী, এত ভিড় কেন আজ ঈশানদের বাড়ি?

ঈশান বলল, এরা সবাই আমার বন্ধু। এই হাউজিংয়েই থাকে। ওরা বেরিয়েছে– দুর্গাপুজোর চাঁদা তুলতে। আর মাত্র ১৪দিন বাকি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ছেলে বলল, স্যার আপনাকেও চাঁদা দিতে হবে। এখানে সব স্যারেরাই চাঁদা দিয়েছেন।

কানন স্যার বললেন– কত?

ঈশান বলল– ১০০ টাকা।

ইশ, কী মরতে আজ কেন যে পড়াতে এলুম। বুড়োর দাদুটা ঠেলে পাঠাল। এখন দাও ১০০ টাকা।

ঈশান বলল– স্যার, আজ আপনাকে এমন শুকনো লাগছে কেন?

কানন স্যার বলল– আমার জ্বর হয়েছে।

জ্বর? সেকী। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, কাশি আছে?

আছে তো। ঈশান বলল, শ্বাস কষ্ট?

তাও আছে। এই দেখ না, ১২টা সিঁড়ি ভেঙে ৬তলা থেকে ৭ তলায় পৌঁছে হাঁফাচ্ছি।

এ্যাঁ– সেকী! আপনি হাঁফাচ্ছেন। কিন্তু ৬ তলায় কেন গেসলেন?

কানন স্যার বললেন ভুলে। চিনতে পারিনি। লিফটে সাততলায় নামার কথা, নেমে পড়েছিলাম ৬তলায়। লিফটের ভেতরে থেকে, চিনতে পারিনি।

এমন সময়, ঈশানের মা বললেন, ছতলায় কতক্ষণ ছিলেন। কানন স্যার বলল, তা আধ ঘণ্টা তো হবেই।

সর্ব্বনাশ! এবার ফোনটা তুলে, ঈশানের মা ৬তলায় ফোন করলেন। হ্যালো, কে বলছেন, বুড়োর দাদু। শুনুন, আপনাদের বাড়ি ঈশানের স্যার গেসলো?

হ্যাঁ, ভুলে। কিন্তু ওর তো করোনা!

সে কী! হ্যাঁ, সবমিলে যাচ্ছে। জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট। আপনাদের এখন আইসোলেশনে যেতে হবে। দরজায় তালা দিন।

আর শোনো। ঈশানের বন্ধুদের ফের বললেন, তোমাদের নামের লিস্ট করো। আমাকে দাও।

সেকী, কেন?

একটা করোনা রোগীর সঙ্গে তোমার এতক্ষণ ছিলে। তোমাদেরও সবাইকে আইসোলেশনে যেতে হবে। ১৪দিন।

১৪দিন। ঈশান বলল– তখন তো পুজো শেষ হয়ে যাবে!

বুড়োর বাবা বললেন, আমাদের তার মানে শনিবার, বকখালি যাওয়া হচ্ছে না?

না। দাদু বললেন, কথাটা কিশোরদের জানিয়ে দাও। তোমাদের বকখালি যাওয়া ক্যানসেল্ড। তোমরা যাবে এখন আইসোলেশনে।

বুড়োর মা বললেন– ঠিক হয়েছে। যেমন আমাদের ফেলে যাওয়া। থাকো এখন আইসোলেশনে। বুড়োর বাবা বললেন– হা কপাল!

এখন সময় যেমন

অমল কর

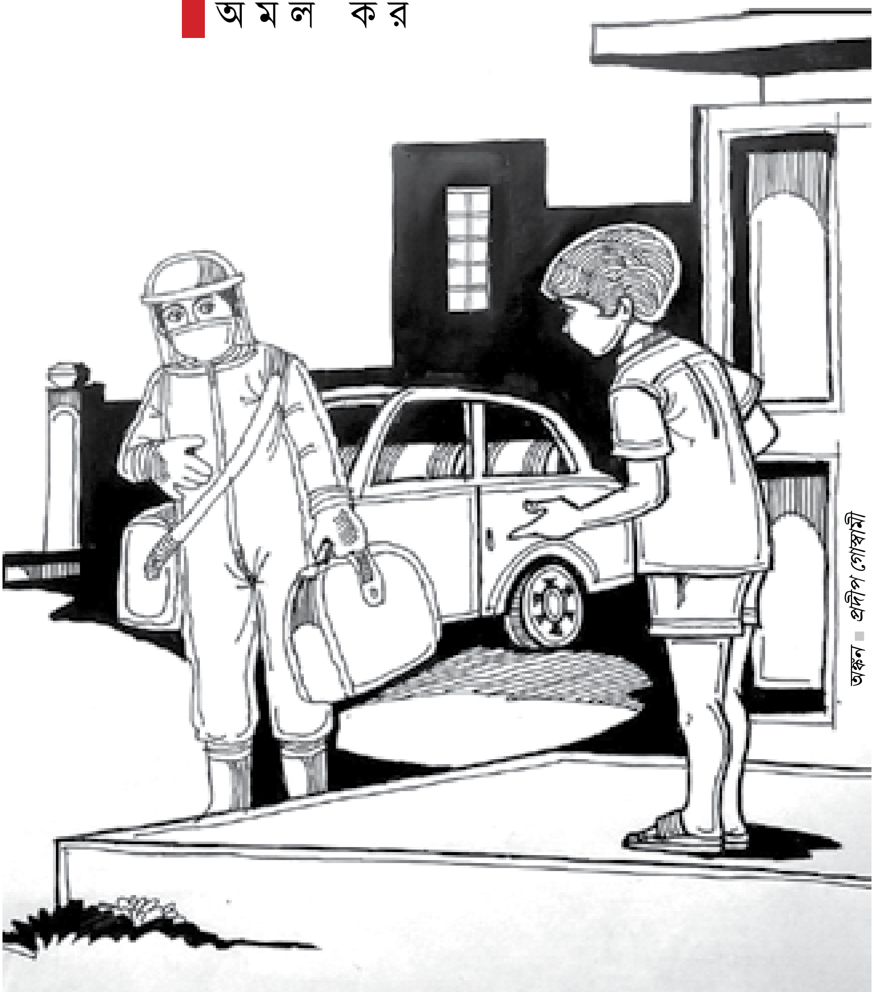

—ওমা, কবে গো আবার ইস্কুলে যাব?

—করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউন চলছে। এখন স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত বাজার-হাট, দোকানপাট সব বন্ধ।

—আমার যে আর ভালো লাগছে না। কতদিন হয়ে গেল ঘরবন্দি। ইস্কুলে যেতে পারছি না। বন্ধুদের সাথে গল্প করতে পারছি না। খেলা বন্ধ। ঘুড়ি ওড়াতে পারছি না। সাঁতার কাটতে পারছি না।

—কী করবি বল! বিশ্বত্রাস এই রোগ মহামারীর মতো শহর-গঞ্জ ছেয়ে গেছে। সব দেশেই কমবেশি একই হাল।

—আচ্ছা মা, একা একা ছাদে গিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো যায় না!

—তা যায়। তবে রোদ্দুরে নয়, বিকেল বিকেল।

—আমার একই পড়া বারবার পড়তে ভালো লাগছে না। এসো না একদান দাবা খেলি।

—বিটলু, দেখছিস তো, কতদিন ধরে কাজের মাসি যমুনা আসতে পারছে না। প্রতিদিন বাসন মাজা, কাপড় কাচা ঘর ঝাঁট দেওয়া ঘর মোছা, আনাজপাতি কাটা, মশলাপাতি জোগাড় করা, রান্না করা, সন্ধে থেকে অন-লাইনে ছাত্র পড়ানোর হ্যাপা এক হাতে পোয়াতে গিয়ে আমি একেবারে জেরবার। এখন খেলার সময়? তোর আবদারের একটা সীমা থাকবে তো!

—নন্দিনী, শুনেছ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শালাবাবু আসছে। লকডাউনের আগেই কলকাতায় চলে এসেছে। হোটেলে আছে। অফিসের কাজে ব্যস্ত। বেশ কয়েকদিন এখানেই থাকবে।

—ওমা, তাই!

—কী মজা, নন্টেমামা আসছে। যাও মা, আর তোমাকে বিরক্ত করব না।

—হ্যাঁ, আগে থেকে বলছি বিটলু, করোনা মারণ ভাইরাস। নন্টের কাছে ঘেঁষে বসবি না। মুখোশ পরে থাকবি। ইস্কুল নেই বলে সারাদিন গপ্পো আর খেললে চলবে না। অন-লাইনে ক্লাসের পড়া করে রাখতে হবে। তাছাড়া, নন্টেকে একটু বিশ্রাম করতে দিবি।

—কইরে বিটলু! কোথায় গেলি!

—নন্টেমামা! এই তো আমি। যাই। গাড়ির হর্ন শুনেই বুঝতে পেরেছি তুমি এসে গেছ।... একি! কোথায় নন্টেমামা! তোমাকে তো দেখতেও পাচ্ছি না, চেনাও যাচ্ছে না! শুধু গলার স্বরটা চেনা চেনা।

—হ্যাঁ, হাতে দস্তানা। মুখে মুখোশ। গামবুট। পিপিই পরা। মাথায় টুপি। চেনা তো যাবে না।

—ওমা, দেখে যাও, ভূতের মতো এই লোকটা নাকি নন্টেমামা!

—বাবা! অচেনা নন্টে। ধরাচুড়ো খুলে স্নানে যাও। ড্রাইভারকে বলে দে, বাইরের স্নানঘরে ঢুকতে গাড়ি গ্যারেজ করে। জিনিসপত্র লটবহর স্যানিটাইজ করে ঘরে তুলতে হবে।

—তা দিদি, তোমাদের বাজারহাট, ওষুধপত্র কি সব অন-লাইনে? নাকি অ্যাডভোকেট জামাইবাবু মক্কেল ছেড়ে নড়েচড়ে চুপিসারে মাছ-সবজি জোগাড়ে বের হচ্ছেন?

—ওরে না! তোর জামাইবাবু ঘরকুনো। বইয়ে মুখ গুঁজে বিপক্ষকে ঘায়েল করার কৃৎকৌশলে ব্যস্ত, তিনি যাবেন বাজার!

—কেন নিন্দে দিচ্ছ নন্দিনী। মাঝে মধ্যে তোমার কাজে সাহায্য দিচ্ছি না? এই তো সেদিন আলু কেটে দিলাম, পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে দিলাম, থালায় ভাত বেড়ে দিলাম!

—ফিরিস্তি দিও না তো! যা আলু কেটেছ! তেড়া-বাঁকা, ওটা কাটা হলো? আমার কাজ বাড়ল।

—তা বলে, নন্দিনী, অ্যাডভোকেটকে ঘর ঝাঁট দিতে বলো না।

—কেন বলব না, অধ্যাপক আমি যদি ওসব করতে পারি, তুমি কেন পারবে না। দশের লাঠি একের বোঝা।

—দিদি, তোমরা লাইনচ্যুত হয়ে গেলে! বাজারের কথা থেকে হেঁশেলে ঢুকে পড়লে?

—মাছওয়ালা, সবজিওয়ালা, বাজারছাড়া চড়া দরে দিয়ে যায় জ্যান্ত রুই-কাতলা-মাগুর, আর তাজা সবজি-ফল। হাতের কাছে পাই বলে আমাদের দিন চলে যায়। তা তুই জোড়া ইলিশ পেলি কোথায় এমন বড়!

—হোটেলে মাছ সাপ্লায়ারকে বললাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিন কেজি মাছ দিল।

—হ্যাঁ, বোঝার উপর কলমিশাক। লকডাউনে আমাদের তিনজনের তো রোজই রোববার। রান্নাবান্না শেষের মুখে জোড়া ইলিশের দু'-তিনপদ রান্নার খিদমদগারি তো আমাকেই পোয়াতে হলো।

—কেমন খেলে নন্দিনী ইলিশের তেল, ডিমভাজা, সরষে-ইলিশ!

—তুমি খাওনি? কাটা-ধোওয়া, রান্না করে পাতে বেড়ে দিল কে? একটুও সাহায্য করেছ?

—না, মানে শালাবাবু এতদিন পরে এল। অতিথির সাথে দু'-চার কথা না বললে হয়, তুমিই বলো নন্দিনী!

—কথা কি ফুরিয়ে যাচ্ছিল? খেতে খেতে কম কথা বলেছ? অজুহাত দিও না। নন্টে আমার ভাই, এতদিন পর এল, আমি কি দু'-চার কথা বলতে পেরেছি কাজের চাপে!

—নন্টেমামা, ইলিশ আর খাওয়া-দাওয়ার গল্প করলে চলবে! আমার যে কত প্রশ্ন, তার কি হবে?

—হবে হবে, আমি কিন্তু এবার চটজলদি যাচ্ছি না। যাচ্ছি না মানে, প্লেন-ট্রেন না চললে আমার তো যাওয়া হবে না। তাই খাও-দাও আড্ডা মারো—তবে তো লকডাউনের মজা। একা একা নিঃসঙ্গ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখ-নাক ঢেকে বেঁচে থাকার কী যে বিড়ম্বনা, সবাই বুঝতে পারছি। পৃথিবীতে প্লেগ, ফ্লু, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, ডেঙ্গু, ডিপথেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা ইত্যাকার কত রোগ এসেছে। চিকিৎসার কাছে বিজ্ঞানের কাছে সব দমিত হলেও, কোভিড-১৯ একটু বেয়াড়া ধরনের অতিমারী রোগ। যা ভেলকি দেখাচ্ছে, ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত খুব ভোগাবে এই রোগ। শঙ্কায় ভয়ে অতিষ্ঠ মানুষ।

—নন্টে, ভ্যাকসিন না হলে প্রতিটি মানুষের মৃত্যু তবে আসন্ন? টেঁসে যাবে।

—শোনো দিদি। চিকেনপক্স ১৯৫৩ সালে শনাক্ত হলেও ১৯৫৫ সালে ভ্যাকসিন এসেছে। হেপাটাইটিস বি ভাইরাসকে ১৯৮১ সালে কবজা করা গেছে, শনাক্ত হয়েছে ১৯৬৫ সালে। ইবোলা ভাইরাস শনাক্ত হবার ৪৩ বছর পর ২০১৯ সালে ভ্যাকসিন এসেছে। এইডস ১৯৮১ সালে শনাক্ত হলেও, আজও ভ্যাকসিন অধরা।

—তা শালাবাবু, তুমি দেখছি কেমন মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলে। তা তুমি তো সারা দুনিয়ার খবর রাখো। আমাদের এমন হাল হলো কেন?

—সরকারের সদিচ্ছা থাকলে পরিকল্পিতভাবে লকডাউন করা যেত। আচমকা প্রস্তুতি না নিয়ে লকডাউনই এই অতিমারীর কারণ। জানেন জামাইবাবু, ভারতে ১১০৮২ জন মানুষ-পিছু একজন ডাক্তার, ৫৫৫৯১ জন মানুষের জন্য একটা হাসপাতাল, ১৮৪৪ জন মানুষের জন্য একটি বেড। চিকিৎসা হবে কি করে?

—বলো কি শালাবাবু!

—পরিযায়ী শ্রমিকদের কী হাল! না কাজ, না আশ্রয়, না ঘরে ফেরার ব্যবস্থা, না খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, না চিকিৎসা। পথেঘাটে পড়ে মরে আছে শত শত মানুষ। হাজার হাজার কারখানা বন্ধ। দিনমজুরদের রুজি নেই, রুটিও নেই। কত মানুষ আত্মহত্যা করছে। করোনার চিকিৎসার জন্য ঘটিবাটি, ঘরবাড়ি বেচে দিচ্ছে। গরিবরা

খেতেও পাচ্ছে না। চিকিৎসাও পাচ্ছে না।

—নন্টেমামা, কারা গো গরিব বানায়? আমাদের ক্লাসের সইদুল, বিজন, জনসন, বাবলু, পুচকে—এরা সবাই নাকি গরিব। বস্তিতে থাকে।

—আমাদের শাসনব্যবস্থাই গরিব বানায়। ধনীরা আরও বড়লোক হয়। টাকার পাহাড় বানায়। গরিবরা খেতে না পেয়ে মরে। সব পালটাতে হবে এসব ব্যবস্থা। তাই তো ছুটছি এদেশ-ওদেশ বড় হলে বুঝবি।

—হ্যাঁ রে নন্টে, চীনের সাথে জোরদার যুদ্ধ লাগবে শুনছি।

—৩৮,৯০০ কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র কিনছে চীনকে জব্দ করতে।

—শালাবাবু, রামমন্দির!

—হাজার হাজার কোটি টাকায় রামমন্দির বানাচ্ছে এই সময়। তা দিয়ে কত হাসপাতাল, চিকিৎসার সরঞ্জাম, গবেষণা, ওষুধপত্র, পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করা যেত। বললাম না, সরকারের সদিচ্ছাই নেই।

— তা নন্টেমামা, তোমার কি আদৌ সদিচ্ছা আছে আমাকে সময় দেবার, আমার কথা শুনবার, আমার সমস্যা মেটাবার?

—ও, সিওর। চলো বিটলুবাবু। আমরা ওঘরে যাই। এবার তুমি আর আমি। নো দিদি, নো জামাইবাবু।

—নন্টেমামা, বলছিলাম কি, ওই যে বললাম না, আমার গরিব বন্ধুরা। আমফানে সইদুলের বাড়ির চাল উড়ে গেছে। সরকারি সাহায্য কাল পর্যন্ত পায়নি। ওর বাবা রিকশা চালায়। এখন রোজগার নেই। কালকে শুধু মুড়ি খেয়েছে, ছাত্র-যুবরা খাবার দিয়েছে। বাবার ওষুধ কিনতে সইদুল আলু-ডাল-চাল বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের তো অনেক আছে। আমরা দিতে পারি না?

—অবশ্যই পারি।

—জনসনের মা'র করোনা। কোথাও ভর্তি করতে পারেনি। রাস্তায় মারা গেছে মা। ওর দুটো ভাইবোন। আমার জন্মদিনের টাকা, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে চার হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা আছে।

—বেশ, তারপর। ওদের বাড়ি চিনিস?

—ঠিকানা আছে। তোমার গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না?

—যাবে। অলি-গলি হলে গাড়ি ঢুকবে না। হেঁটে যেতে হবে।

—ফোনে সব জেনে নেব।

—পুচকের মা লোকের বাড়ি কাজ করে। কাজ তো এখন বন্ধ। অন্য গ্রাম থেকে এসেছে বলে রেশন কার্ড নেই। ওদের চাল-ডাল, তেল-নুন, সবজি কিনে দিতে পারলে ভালো হতো।

—কিন্তু এখন তো দোকান বন্ধ।

—অন-লাইনে ফোন করলেই দিয়ে যাবে।

—হুঁ, বেশ। আর?

—বিজনের জ্বর। সকালে সবজি বেচতো। এখন বন্ধ। দু'দিন আগে বলল মাথা ব্যথা, সর্দি।

—ডাক্তার দেখাতে পারেনি? হাসপাতালে তো যেতে পারত!

—একা একা, কে নেবে?

—কেন, ক্লাবটাব নেই? আশপাশে ছেলেছোকরা নেই। কিচেন আছে। ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি ওষুধ পথ্য দিচ্ছে। ওর কোনও যোগাযোগ নেই? কাউকে দিয়ে খবর দিতে পারেনি? ওর তো ফোন আছে, তোর সাথে কথা হয়। মা-বাবাকে বললে পারতিস।

—ঠিক বলেছ। বলা হয়নি। আসলে আমার তো যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলিনি। কে দিয়ে আসবে সাহায্য?

—ওরা কেউ তো আসতে পারত। বড় হচ্ছিস, এসব বুদ্ধি করতে হয়।

—গরিবই তো গরিবকে দেখে। বাবুল তো সুস্থ। চুপচাপ কেন সে! বন্ধুদের সাহায্য করতে হলে জিনিসপত্র, জমাকাপড়, টাকা-পয়সা, ওষুধপত্র ছাড়াও গায়ে-গতরে খেটেও সাহায্য করা যায়। বিটলু, এখানেও সদিচ্ছা দরকার।

—চলো না নন্টেমামা। তুমি গেলে আমি মা-বাবাকে বলে মাস্ক পরে এদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিতে পারি। আমার টাকাগুলো আর জামাকাপড় দিতে পারি।

—তোর ওটুকু টাকায় অতবড়ো সমস্যা মিটবে নারে বিটলু! ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। তুই একটু বিশ্রাম কর, আসছি আমি।

—বিটলু, এই নে তোর পিপিই, গামবুট, মাস্ক, টুপি, দস্তানা। আমি তো জানি, কোনও না কোনও কারণে লকডাউনে তোকে নিয়ে বাইরে কোথাও না কোথাও যেতেই হবে। তোর জন্য একটা স্মার্ট ফোনও এনেছি, এই নে। দিদি-জামাইবাবুর জন্য পিপিই ইত্যাদি আছে। ফোন করে ঠিকানা আর পথনির্দেশ জেনে নে। দিদিকে বলেছি, আধঘণ্টার মধ্যে অনলাইনে জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। তোর জামাকাপড় আর টাকা-পয়সা নিয়ে নে। জামাইবাবু দশ হাজার টাকা দেবেন। অনলাইনের জিনিসের দাম দিদি দেবে। বাকি সব আমার। গেট রেডি। আমরা অভিযানে যাচ্ছি আধঘণ্টা পরে।

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

ভালোবাসা

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

‘ভাইরাস করোনা’ অতি ছোটো, বড়ো না,
তবু তার দাপটে থরহরি বিশ্ব।
ধর্ম বা জাতপাত, সম্প্রীতি-সংঘাত
তার কাছে সব এক, ধনী কিবা নিঃস্ব।
মুখে ‘মাস্ক’ স্ট্যাচু সব, থেমে গেছে জনরব
এলোমেলো বেসামাল জীবনের ছন্দ।
নেই সাড়াশব্দ, ঘরে ঘরে জব্দ
‘লকডাউন’-এর জেরে সব তালাবন্ধ!
প্রকৃতির মহারোষে, মানুষের সব দোষ
অতিলোভ, দম্ভ, বুদ্ধির হুঙ্কার!
জঙ্গল কেটে সাফ, সবুজের অভিশাপ
ঝড় ভূমিকম্প মহামারী লাগাতার!
পশুপাখি গান গায়, মাঠে-ঘাটে-রাস্তায়
বাতাসে দূষণ কম, আকাশটা আরও নীল।
সাগরের কথকতা, সবুজের জয়গাথা
প্রকৃতির খেলাঘরে আলোছায়া ঝিলমিল!
ছোটোশিশু জানলায় ‘আয় আয়’ ডেকে যায়
বোঝে না সে ‘ভাইরাস’, অতিমারী সন্ত্রাস,
বোঝে শুধু এক ভাষা– অনাবিল ‘ভালোবাসা’
একটাই ‘মন্ত্র’ দিতে পারে আশ্বাস!

আমার ঘুড়িটা

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

এই হাতে আমি ঘুড়িটা ওড়াই আকাশের গায়ে ভাসে
পাখিদের সারি ডানা মেলে দেয় সূর্যের চারপাশে।
আমার হাতের রক্তনিশান তোমাদের কাছে ডাকে
কানে কানে বলে হাতে হাত ধরো, আজও যারা দূরে থাকে।
নদীটাকে দেখি ছুটে চলে ওই দূর থেকে আরও দূরে
মানুষের স্রোত রাজপথে নেমে গান গায় এক সুরে।
দুর্যোগ আসে তুমুল তুফান, ঘর ভেঙে যায় ঝড়ে
ওই ছুটে আসে লুটেরার দল লকলকে জিভ নড়ে।
বাজপাখি হয়ে ছুটে আসে কেউ অধিকার কেড়ে নিতে
জোট বেঁধে সব অনাচার রুখি মাটির শক্ত ভিতে।
এই দ্যাখো হাতে বই তুলে নিই হাতিয়ার আজও এটা
লুকোবেই ওরা নিজেদের মুখ, ভাবে যারা কেউকেটা।
দেয়ালের গায়ে পিঠ ঠেকে গেলে সামনের দিকে হাঁটি
ভেঙে দিতে হবে সব ব্যারিকেড বাস্তুসাপের ঘাঁটি।
মানুষের পাশে থাকতেই হবে দুঃখের এই দিনে
সমাজের যারা শত্রু তাদের রাখতেই হবে চিনে।
অত্যাচারীর ইতিহাস কেউ ভুলব না একটিও
মনে রবসন, মোলায়েজ আছে সফদার হাসমিও।
আমার ঘুড়িটা রক্তনিশান উড়ে চলে সবখানে
সবার স্বপ্ন শেখাবে আবার বাঁচার নতুন মানে।

শার্দুলরাজ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঘ নিয়ে লিখিনিতো
একটাও ছড়া
গুঁফো দক্ষিণরায়
গায়ে-পিঠে ডোরা

লিখিনিতো একটাও
ছড়া নিয়ে বাঘ
বন্দুক থাক প’ড়ে
দৌড়িয়ে ভাগ্

বাঘ নিয়ে তো লিখিনি
ছড়া একটাও
সোঁদরবনের লঞ্চ,
তুমি ফিরে যাও

বাঘ নিয়ে একটাও
ছড়া তো লিখিনি
অমন বলতে নেই–
‘মামা’ হন তিনি!

বায়ো ওয়েপন রহস্য

মনজিৎ গাইন

অঙ্কন ■ দেবনাথ নন্দী

সতুকার কাছে একটা ফোন এসেছে। আমি তখন খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে হেডিংগুলোয় সবে চোখ বোলাচ্ছি। তবে সতুকার ফোন আসা মানে আমার মনোযোগ বেশ অনেকটা ওদিকেই চলে গেল। সতুকার ফোন মানে সেটা সাধারণত নতুন কোনও কেস নিয়েই আসে।

সতুকা বলছে, ‘মিস্টার আনন্দ, আপনি কি সিওর এই ব্যাপারে?’

‘সিওর মানে, পুরো টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। কিছু একটা গন্ডগোল আছে। আর সেই গন্ডগোলের মাত্রাটা বেশ বড় মাপের।

‘তাহলে আমাকে কী করতে হবে এখন?’‘আপনাকে এই পুরো ব্যাপারটাই তদন্ত করে দেখতে হবে। আমরা ভারত সরকারের তরফ থেকে তদন্তের ভার দিলাম মিস্টার সাত্যকি সোমকে। আপনার প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল মেল আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার মেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘কিন্তু মিস্টার আনন্দ, আমাকে এই কেসে তদন্ত করতে যে বিদেশে যেতে হবে।’

‘হ্যাঁ, সেটা আপনাকে যেতে হবে। সেই বিদেশ সফরের যাবতীয় খরচা আমরা ভারত সরকার বহন করব। তবে একটা কথা।’

‘কী কথা, মিস্টার আনন্দ?’‘আপনার এই তদন্ত আর বিদেশ সফর পুরোটাই কিন্তু সরকারিভাবে হলেও চূড়ান্ত গোপনীয়। আপনি আপনার সফরের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যেন প্রকাশ করবেন না।’

‘না, সেই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। তবে আমারও একটা কথা আছে।’

‘কী কথা, মিস্টার সোম?’‘আমি কিন্তু আমার কোনও তদন্তই একা করি না, আমার সঙ্গে আরও দু’জন সঙ্গী থাকে।’

হ্যাঁ, এখানেও তাই হবে। আপনার দু’জন সফর সঙ্গীর বিদেশ সফরের সব খরচাও আমরাই বহন করব।’

আমার তখন কাগজ পড়া মাথায় উঠেছে। তার মানে আমাদের এবারের তদন্ত করতে বিদেশ যেতে হবে? সতুকা ফোন রাখতেই আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সতুকা, এবারে কী তদন্তে আমাদের বিদেশ যেতে হবে?’

আমার কথা শুনে সতুকার মুচকি হাসি। আমি তখন আবার চূড়ান্ত অধৈর্য। আমি তাই আর না থাকতে পেরে বললাম, ‘ সতুকা, ওইভাবে হাসছ কেন? বলো না, আমাদের এবারের তদন্তে সত্যি কি বিদেশ যেতে হবে?’

‘হ্যাঁ, শেরু আমাদের এবারের তদন্তে অবশ্যই বিদেশ যেতে হবে।’

সতুকার কথা শুনে আমার তখন মনে খুব খুব আনন্দ। আমি সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সতুকা, আমাদের তদন্তে কোন দেশে যেতে হবে?’

‘চীন দেশে।’

‘বাঃ, এক্সিলেন্ট! এবারের তদন্ত তাহলে খুবই দুর্দান্ত হবে।’

‘তবে শেরু, এই কেসটা বেশ কঠিন। বলা যায় বেশ ঝামেলার।’

‘কীরকম সতুকা?’‘আন্তর্জাতিক একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে এই কেসটার মধ্যে। ফ্রান্সের কয়েকজন সেনা খুবই অসুস্থ। আর তাদের অসুস্থতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে।’

আমি সতুকার কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কিন্তু সতুকা, অসুস্থ হয়েছে ফ্রান্সের মানুষ আর তার তদন্ত করতে আমাদের চীনে যেতে হবে কেন?

‘হ্যাঁ শেরু, এটা তুই ঠিকই বলেছিস, ফ্রান্সে সেনা অসুস্থ হলেও আমরা তদন্ত করতে কেন চীনে যাব। তার উত্তর হচ্ছে ফ্রান্সের ওই সেনারা অসুস্থ হওয়ার আগে চীনে গিয়েছিল একটা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আর সেখান থেকে ফিরে গিয়েই তারা অসুস্থ হয় নিজেরা আর তাদের অসুস্থতাকে বহন করে নিয়ে যায় এবং ফ্রান্সেও ছড়িয়ে ফেলে। তবে শেরু, তোর মনে আরেকটা প্রশ্নও আসা উচিত ছিল।’

‘কোন প্রশ্ন?’‘মনে করো ফ্রান্সের সৈনিকরা অসুস্থ হয়েছে আর তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে চীন দেশে গিয়ে। তার তদন্তভার এই ভারতের একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ সাত্যকি সোমকে কেন দেওয়া হলো?’‘হ্যা, সতুকা, সেটাও সত্যি এক জানার মতো বিষয়। তুমি বলতে পারবে কেন?’‘তার কারণ এটা পুরোটাই একটা আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমাসির ব্যাপার। চীনে যে আন্তর্জাতিক মিলিটারি গেমস হয়েছিল সেখানে যদি ফ্রান্সের কয়েকজন সেনা সংক্রমিত হয় তাহলে তার পিছনে রহস্য খুঁজতে গেলে ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা তাদের দেশের সরকারি বা বেসরকারি কাউকে দিয়ে এই তদন্ত না করিয়ে করাচ্ছে বা তদন্ত করানোর দায়িত্ব দিয়েছে ভারত সরকারকে। আবার তুই এটাও দেখ ভারত সরকার তাদের সরকারি কোনও তদন্ত সংস্থা দিয়ে এই তদন্ত না করে দায়িত্ব দিয়েছে আমার মতো একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে।’

‘হ্যাঁ, সতুকা কেসটা খুবই জটিল এবং গোলমেলে। আমাদের খুব সাবধানে এই কেসে এগোতে হবে। তাহলে আমরা কবে যাচ্ছি চীনে?’‘সেটা আমি ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্থা র-এর বিশেষ অফিসার মুকুল আনন্দর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। আমাদের তিনজনের ভিসার ব্যবস্থা আর প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি আমাদের উনি করে দিতে পারবেন, তত তাড়াতাড়ি আমরা তিনজনে চীনে রওনা দিতে পারব।’

‘তাহলে সতুকা, আমি বটুকবাবুকে আমাদের আসন্ন চীন যাত্রার কথা জানিয়ে দিই।

‘হ্যাঁ, অবশ্যই তুই বটুকবাবুকে জানিয়ে দে।’

সতুকার অনুমতি পেয়ে আমি বটুকবাবুকে আমাদের চীন যাত্রার কথা জানাতেই বটুকবাবু মনে হয় উত্তেজনায় পুরো লাফাতে লেগেছে আর চ্যাঁচাচ্ছে, ‘ও শেরু এ কী কথা তুমি আমায় শোনালে। আমরা এবারে যাবো গ্রেট চায়নাতে। ও, আমি ওখানে গিয়ে অবশ্যই বিগ চায়না ওয়ালে উঠব!’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, উঠবেন তার আগে আপনার প্রাথমিক গোছগাছ এগিয়ে রাখুন।’

সতুকা এখন কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত। শুধু ল্যাপটপে আর মোবাইলে গুগুল সার্চ করে বিভিন্ন তথ্য নিচ্ছে। তার সঙ্গে চলছে বেশ অনেক জায়গায় ফোন। সব দরকারি তথ্য সতুকা নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে। এমনিতে সতুকার স্মৃতি খুবই জোরদার। মাঝে মাঝে আমি নিজেই তো সতুকাকে মজা করে বলি, ‘সতুকা, তোমার মাথায় কি মেমোরি কার্ড ফিট করা আছে?’

সতুকা আমার প্রশ্ন শুনে শুধু হাসে। এখন তো আবার নিজের মাথা ছাড়াও সতুকা মোবাইল আর ল্যাপটপের আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের সাহায্য নিচ্ছে।

এর মধ্যে র-এর মুকুল আনন্দর ফোন এসেছে। আমাদের তিনজনের ভিসা রেডি। বিমানের টিকিটও রেডি। সতুকা আমাকে সেই খবর দিয়ে বলল, ‘আওয়ার জার্নি স্টার্টস টুমরো।’

আমরা দমদম থেকে সরাসরি ফ্লাইট পাইনি চীনে যাওয়ার। আমাদের দমদম থেকে যেতে হচ্ছে দিল্লিতে তারপর সেখান থেকে আমরা বেজিংয়ের প্লেন ধরব। সতুকা দমদমে ফ্লাইটে উঠতে উঠতে বটুকবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘বটুকবাবু, চীনে আমাদের কোথায় যেতে হবে জানেন?’

‘না, সাত্যকিবাবু। তবে আমার ধারণা আমরা চীনে আর কোথাও যাই বা না যাই আমাদের অবশ্যই যেতে হবে চীনের পাঁচিলে!’বটুকবাবুর কথা শুনে সতুকার মুখে হাসি।

‘তা যা আপনি বলেছেন বটুকবাবু! চীনে আমরা আর কোথাও যাই বা না যাই আমাদের অবশ্যই যেতে হবে চীনের পাঁচিলে! চীনে এসে বিখ্যাত চীনের পাঁচিলে না গেলে কখনও হয় নাকি?’

সতুকার কথা শুনে বটুকবাবুর মুখে একগাল পরিতৃপ্তির হাসি। আমি অবশ্য সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সতুকা, আমরা চীনের ঠিক কোথায় যাব বলো তো?’

‘আমরা যাব চীনের হুবাই প্রদেশের রাজধানী উহান শহরে।’

‘ওখানে নিশ্চয়ই ওই আন্তর্জাতিক মিলিটারি গেমস হয়েছিল?’‘হ্যাঁ শেরু, ওখানেই এবারে ২০১৯ সালের ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি গেমস হয়েছিল।’

আমরা দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের চীনের ফ্লাইট। আমরা তিনজনে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছি। সতুকা এবারে বেশ গম্ভীর গলাতেই আমাদের দু'জনকে বলল, 'আমরা তিনজনেই এটা খুব ভালো ভাবে মনে রাখব যে আমাদের এবারের অভিযানে প্রতি পদে পদে যে বিপদের আশঙ্কা থাকে তা এবার অন্যভাবে আসতে পারে।'

বটুকবাবুর তাই শুনে মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'এবারে কি আমাদের চীনের পাঁচিল থেকে কেউ কিডন্যাপ করতে পারে?'

'সেরকম সম্ভাবনা না থাকলেও, অন্য একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে আর সেটা হচ্ছে আপনার থেকে আপনার প্রাণটিই হয়তো কেউ কিডন্যাপ করে নিতে পারে!'সতুকার এই কথা শুনে অজানা কোনও শত্রুর কাছ থেকে এই ভয়ঙ্কর বিপদ আসার সম্ভাবনা শুনে বটুকবাবু বলল, 'কে আমার থেকে আমার প্রাণটা কিডন্যাপ করতে পারে?'

'কে আবার, কোনও এক ভয়ঙ্কর জীবাণু!'সতুকার কথা শুনে বটুকবাবুর চোখ-মুখে চরম এক বিপদের আশঙ্কার মেঘ। বটুকবাবু এতদিন আমাদের গোয়েন্দা অভিযানে যত শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে সবই মানুষ। তাই বটুকবাবুর প্রশ্ন, 'এবার তাহলে কী হবে, সাত্যকিবাবু'?'

'কী আবার হবে, আমাদের উপযুক্ত প্রোটেকশন নিতে হবে তাহলেই হবে।'

এটা বলে সতুকা আমাদের দু'জনের দিকে দুটো প্যাকেট এগিয়ে দেয়। প্যাকেটের মধ্যে আছে ওষুধ, মাস্ক, গ্লাভস। ওষুধটা আবার ভিটামিন সি আর জিঙ্ক সালফেটের মিশ্রণ। সতুকা বলল, 'আজকে থেকে আমরা তিনজনেই এই ওষুধ খাওয়া শুরু করে দেব। আর বিমানে ওঠা থেকে আমরা মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরে নেব। আর আমার কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে তাই দিয়ে মাঝেমাঝেই হাতটা পরিষ্কার করে নেব।'

'সতুকা, রোগটা কী?''এটা এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। চীন দেশের হুবাই প্রদেশের উহান শহরে যে মিলিটারি গেমস হয়েছিল সেখান থেকেই এই রোগ ছড়িয়েছে আর সেই রোগ থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই হতো।'

'আর সতুকা, ওই ওষুধটা কী জন্য?''এই ওষুধটাতে ভিটামিন সি আর জিঙ্ক রয়েছে যা যে কোনও ফ্লু বা সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি করে।'

সতুকা এইসব কথা বলে গেলে কী হবে বটুকবাবু তখনও পুরো স্বাভাবিক হয়নি। আমি বটুকবাবুর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বটুকবাবুর জিজ্ঞাসা, 'শেরু, কী হবে বলো তো দেখি!'

'কী আবার হবে, সতুকা যখন আমাদের রক্ষাকবচ দিয়ে দিয়েছে, আর আমাদের কোনও চিন্তা নেই।'

আমরা বেজিঙের বিমানে উঠে পড়েছি। সতুকা অবশ্য বেশ গম্ভীর। বেজিঙে পৌঁছে ওখান থেকে আবার আমাদের বিমান পরিবর্তন করতে হলো। এবারে আমাদের গন্তব্য সেন্ট্রাল চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান। বটুকবাবু খুবই উত্তেজিত। বটুকবাবু প্রায়ই প্লেনের জানলায় চোখ রেখে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে। সতুকা তাই দেখে বটুকবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও বটুকবাবু আপনি প্লেনের জানলা দিয়ে কী দেখছেন বলুন তো?'

'আমি দেখছি নিচে চীনের গ্রেট ওয়াল দেখা যায় কি না!' বটুকবাবুর এই উত্তর শুনে আমি প্রায় খুক-খুক করে হেসে ফেলেছি আর কী! তাই দেখে সতুকার আমার ওপর কড়া মন্তব্য, 'শেরু, এখন কিন্তু খুক-খুক করে হাসি বা কাশি দুটোই বারণ!'

আমরা উহানে পৌঁছে গিয়েছি। আগে থাকতে আমাদের জন্য একটা হোটেলে রুম বুক করা ছিল। হোটেল যেতেই সতুকা বলল, 'আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি, আমাদের জন্য যদি কোনও গাইড পাই তাহলে ভালো হয়'।

হোটেলের রিসেপশনে একজন চীনা তরুণী ছিল। সে বলল, 'ওকে স্যার, আপনাদের জন্য আমি একজন ভালো গাইডের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যে আপনাদের পুরো উহান শহরে ঘুরে দেখাবে।'

আমরা হোটেলে ঢুকতে না ঢুকতে আমাদের গাইড চলে এসেছে। জিং হুয়াং আমাদের গাইড। ঝকঝকে স্মার্ট একজন চীনা তরুণ। সে এসেই বলল, 'আপনারা কি উহান শহরের কোথায় কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন, না কি আমি ঠিক করে দেব?'

সতুকার জিং হুয়াং-এর প্রশ্নে উত্তর, 'না, আমরা ঠিক করেই রেখেছি কোথায় কোথায় যাব। তুমি শুধু আমাদের একটু গাইড করো।'

সতুকা পরের দিন সকালে জিং হুয়াং-কে আসতে বলল।

পরের দিন একেবারেই সকালেই জিং হুয়াং হাজির। আমরাও রেডি। জিং হুয়াং-এর আমাদের দেখে প্রশ্ন, 'প্রথমে আপনারা কোথায় যাবেন বলে ঠিক করেছেন?'

'আমরা প্রথমে যাব যেখানে অক্টোবরে মিলিটারি গেমস হয়েছিল সেখানে।'

'কিন্তু সেখানে তো এখন সেরকম কিছুই নেই।'

'আমরা শুধু ওই জায়গাটা দেখব। তুমি আমাদের নিয়ে চলো।'

জিং হুয়াং আমাদের সেখানে নিয়ে গেল। এখনও সেখানে কিছু পরিকাঠামো রয়েছে। বাকি প্রায় সবটাই ভাঙা বা খোলা হয়ে গিয়েছে। জিং হুয়াং বলল, 'এখানেই মিলিটারি গেমসের গেমস ভিলেজ হয়েছিল।'

সতুকা সেটা শুনেই বলল, হ্যাঁ, মিলিটারি গেমসের জন্য গেমস ভিলেজ এবারই প্রথম। আর এই গেমসটা তো টোটাল ৩৫টা ভেনুতে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ মিস্টার সোম, একদম তাই। তবে সেরা খেলাগুলো এই উহান শহরেই হয়েছিল যেমন ফুটবল।'

জিং হুয়াং খুব আন্তরিকভাবেই পুরো গেমস ভিলেজ আমাদের ঘুরে দেখালো। বটুকবাবুর তাই দেখে আমাকে প্রশ্ন, 'শেরু, তোমার সতুকা এই ভাঙাচুরো কাঠামোর মধ্যে কি রহস্যের সন্ধান করছে বলো তো?'

আমি তাই শুনে বললাম, 'কী আবার, মনে হচ্ছে জীবাণু রহস্যের!'

আর আমার মুখ থেকে জীবাণুর কথা শুনে বটুকবাবু একেবারে আঁতকে বলল, 'উরিব্বাস, এখানে জীবাণু আছে, তাহলে তো খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

এই বলে বটুকবাবু নিজের মুখের মাস্কটা ঠিক করে নিল আর হাতটা একবার স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে নিল।

সতুকার জিং হুয়াং-কে প্রশ্ন, 'আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারো এখানে যে বিশেষ ধরনের ফ্লু জ্বর শুরু হয়েছে, সেটার শুরু কবে

আছে।

বটুকবাবু ওদিকে দেখে নাক সিঁটকোচ্ছে। সতুকা বলল, 'দেখুন বটুকবাবু, কোন মাংস আপনার পছন্দ হচ্ছে। যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা একবার শুধু আমাদের বলুন। তারপর দেখুন কীরকম পার্সেল করে আপনার জন্য সেই মাংস হোটেলে নিয়ে গিয়ে রান্না করে খাওয়াই।'

সতুকার এই কথা শুনে বটুকবাবু মারাত্মক চিৎকার করে বলে উঠল, 'না-না, আমি এইসব কোনও মাংস খাব না। আমার পছন্দ একমাত্র হেদুয়ার রেওয়াজি খাসির মাংস। সাত্যকিবাবু, কোথায় যে আমাকে নিয়ে এসেছেন?'

'এখানেও কিন্তু রেওয়াজি মাংস আছে। নেবেন?''কোথায় রেওয়াজি মাংস?''ওই তো ঝুলোনো আছে রেওয়াজি গড়গিলে বা গোসাপ, একটু টেস্ট করে দেখবেন না কি?

বটুকবাবু সতুকার কথায় সেইদিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'না-না, আমি ওসব খাই না।'

সতুকা এরমধ্যে উহান সি-ফুড মার্কেটেও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে শুনে নিয়েছে এখানে এই ফ্লু-জ্বরটা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, সবারই মোটামুটি সেই একই উত্তর– উহানে এই ফ্লু জ্বর শুরু হয়েছে অক্টোবর মাসের পর থেকেই।

অবশ্য এই মার্কেটে কথা বলতে গিয়ে বেশ সমস্যা হচ্ছিল সতুকার কারণ অনেক চীনারাই ইংরেজি ভাষাটা ঠিকঠাক জানে না। তারা শুধু চীনা ভাষাতেই সড়গড়। তবে এরমধ্যে দিয়েই সতুদা তার অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। সতুকা আবার বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করল,

নাগাদ?'

'সেটা এখানে মোটামুটি অক্টোবরের পরের থেকেই শুরু হয়েছে। অনেক মারাও গিয়েছে আর খুব সংক্রামক এই ব্যাধি।'

'তাহলে বলা যায় এই মিলিটারি গেমসের পরেই শুরু হয়েছে এই ফ্লু জ্বর?''হ্যাঁ, সেটা বলা যেতেই পারে।'

সতুকা আরও খানিকক্ষণ ওই গেমস ভিলেজ ঘুরে দেখল। তারপর জিং হুয়াংকে বলল, এবারে আমরা আরেকটা জায়গায় যাব।'

'এবারে কোথায় যাবেন?''উহান সি-ফুড মার্কেটে।'

'ওকে, আমি এখান থেকে আপনাদের সরাসরি ওখানে নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

খুবই বাধ্য ছেলে আমাদের এই গাইড জিং হুয়াং। আমাদের ওখান থেকে সোজা উহান সি-ফুড মার্কেটে নিয়ে গেল। সেখানে বিশেষত্ব সি-ফুডের বা সামুদ্রিক মাছ বা অন্য খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন পশু, সরীসৃপ, পাখিরও মাংস বিক্রি হয়। আমরাও সেখানে গিয়ে দেখলাম কীসের মাংস সেখানে নেই? বাদুড়, সাপ এমনকি বাঘের মাংসও সেখানে

'এখানে কি অক্টোবর মাসের আগেও বাদুড়ের মাংস বিক্রি হতো।'

'হ্যাঁ, সে তো হতো।'

'সেই বাদুড়ের মাংস খেয়ে কারো ফ্লু জাতীয় জ্বর আসেনি তো?''না-না, সেটা কখনই হয়নি।'

'তার মানে, বাদুড়ের মাংস থেকে এই বিশেষ ফ্লু জ্বর ছড়ায়নি?''হ্যাঁ, একদম তাই। এখানে বাদুড়ের মাংস খাওয়ার চল অনেকদিন ধরেই। আমরা সবাই এই বাদুড়ের মাংস খাই কিন্তু কোনোদিন আমাদের কেউ ফ্লু জ্বরে আক্রান্ত হইনি এই বাদুড়ের মাংস খেয়ে। বরং আপনারাও খেয়ে দেখতে পারেন আমাদের এই উহানের বাদুড়ের মাংস খুবই সুস্বাদু।'

সতুকা এই কথা শুনে বটুকবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বটুকবাবু, খাবেন নাকি বাদুড়ের মাংস? সবাই তো বলছে খুবই সুস্বাদু।'

'না-না, আমায় রক্ষে করুন সাত্যকিবাবু। এখান থেকে বেরিয়ে চলুন তো, এইসব মাংসের মধ্যে আমার গা-টা যেমন কেমন যেন

ঘুলিয়ে উঠছে।'

সতুকার কাজও উহান সি-ফুড মার্কেটে মোটামুটি মিটে গিয়েছে। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ওখান থেকে বেরোতে বেরোতেই আমাদের মোটামুটি বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। তখন প্রায় বিকাল বা বটুকবাবুর কথায় একেবারে চৈনিক বৈকাল আর কী।

জিং হুয়াং আমাদের জিজ্ঞাসা করল, 'আর কোথাও কি আপনারা আজকে যেতে চান?'

সতুকার এই প্রশ্নে উত্তর, 'এখনও হাতে সময় আছে, আমরা বিকালে আরেকটা জায়গায় যেতে চাই।'

'বিকালে আপনারা ঠিক কোথায় যেতে চান?''আমরা বিকালে একটু উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে যেতে চাই।'

সতুকার এই কথা শুনে আমাদের গাইড জিং হুয়াং যেন একটু চমকে যায় আর বলে, 'কিন্তু সেখানে তো কোনও পর্যটক বা সাধারণ মানুষের প্রবেশের অনুমতি নেই।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি ভালোভাবেই জানি। আমরা শুধু বাইরে থেকে এই উহানের তথা সারা চীনের গর্ব ওই ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি একবার দেখতে চাই।'

'ঠিক আছে, আপনারা যখন এত করে বলছেন তখন আমি আপনাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওটা চীনের একেবারে টপ সিকিউরিটির জায়গা।'

জিং হুয়াং-এর কথাবার্তায় পরিষ্কার এটা বোঝা যাচ্ছে সে ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে আদৌ আগ্রহী নয়। শুধু আমাদের অনুরোধে বলা যায় বাধ্য হয়েই ওখানে নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা ওখানে পৌঁছানোর অনেক আগে পথেই ব্যারিকেডের মুখে পড়তে হলো। চীনা সেনাদের কড়া প্রহরা। আমাদের ওখানে যাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলো। আমরা শুধু পর্যটক শুনেও আমাদের ওই ব্যারিকেড পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার কোনও অনুমতি প্রদান করা হলো না। আমরা ওখান থেকেই ফিরে এলাম।

ফিরতে ফিরতে জিং হুয়াং বলল, 'আমি বারবার বলেছিলাম ওখানে সরকারি নিরাপত্তার খুব কড়াকড়ি। ওখানে প্রবেশের অনুমতি কোনোমতেই পাওয়া যাবে না।'

'রিল্যাক্স হুয়াং, তুমি তোমার যতদূর সাধ্য করেছ খুবই আন্তরিকভাবে, আর তারজন্যে তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমরা এখান থেকে সরাসরি হোটেলে যাব।'

'তাহলে আজকের মতো উহান শহর ঘোরায় আপনাদের ইতি। তাই তো?''হ্যা, একেবারেই তাই। তবে কাল সকালে আবার মোটামুটি এই সময়ে এসো। আমাদের আরও কয়েক জায়গায় ঘোরা বাকি আছে।'

'একদম টাইম মতোই আমি কাল সকালে চলে আসব।'

জিং হুয়াং অ্যাপ ক্যাবে আমাদেরকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সারা দিনের জার্নির ধকলে আমরা তিনজনই তখন ভালোই ক্লান্ত। সতুকা বলল, 'শেরু, এবারে তাহলে হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিতে হবে।'

আমার উত্তর দেওয়ার আগেই বটুকবাবু প্রায় লাফিয়ে বলে উঠলো, 'তার আগে আমাদের চান করে নিতে হবে।'

'হ্যাঁ বটুকবাবু, চান না করলে এই চৈনিক ক্লান্তি কিছুতেই দূর হবে না।'

আমরা হোটেলে ঢুকে পড়ে চান, খাওয়া-দাওয়া করে নিয়েছি। সতুকা নিজের মনে ল্যাপটপে কিছু একটা করছে। আমি সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সতুকা, তুমি কী করছ বলো তো এত মনোযোগ দিয়ে।'

'আমি হ্যাকিং শিখছি, এবারে হ্যাকিং করতে হবে।'

'সে কী। তুমি তাহলে ক্রাইম করবে?''কেন এথিক্যাল হ্যাকিং হয় না? সরকার তো হ্যাকারদের চাকরিও দেয়।'

'হ্যা, সেটাও ঠিক।'

সতুকার তারপরেও অনেকক্ষণ ধরে ল্যাপটপে নানান কাজ করে যাচ্ছে। এরমধ্যে বটুকবাবু একটা ভালো ঘুম দিয়ে নিয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পরেও দেখে সতুকা আপনমনে ল্যাপটপে কাজ করছে। সতুকাকে তাই বটকুবাবুর জিজ্ঞাসা, 'ও সাত্যকিবাবু, আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ল্যাপটপে কী করছেন বলুন তো?'

বটুকবাবুর কথা শুনে সতুকার হাসি মুখে উত্তর, কী আর করব, এই একটু সবার ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখছি।'

সতুকার এই কথা শুনে বটুকবাবুর খুব অবাক হয়ে আবার জনাতে চাওয়া, 'সে কী সাত্যকিবাবু, আপনি তাহলে এবার গোয়েন্দগিরি ছেড়ে ঘটকগিরি ধরেছেন, সেও আবার চীনে বসে।'

সতুকার কথা শুনে বটুকবাবুর আবারও হাসি মুখে উত্তর, 'না-না বটুকবাবু, আমার এই ঠিকুজি-কোষ্ঠী দেখা আমার গোয়েন্দাগিরিরিই অংশ।'

'তাহলে কাদের ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখছেন, আপনি আপনার এই গোয়েন্দাগিরিতে?''আমি এই মিলিটারি মেসে অংশ নেওয়া সবারই ঠিকুজি-কোষ্ঠী খুঁটিয়ে দেখছি।'

এটা শুনেই আমার বক্তব্য, 'তুমি কি কিছু পেলে সব অংশগ্রহণকারীর যাবতীয় তথ্য নিয়ে?'

'দেখ শেরু, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এই গেমস থেকে ফিরে অনেক দেশের অ্যাথলিটরাই অসুস্থ হয়েছে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে তাদের এলাকায় ও দেশে ছড়িয়েছে।'

'তাহলে তারা এখান থেকেই এই জ্বর নিয়ে গিয়েছে?''হ্যাঁ, এই জ্বর যার নাম দেওয়া হয়েছে কোভিড-১৯, তা এই উহান থেকেই শুরু।'

'তাহলে তুমি কী সন্দেহ করছ বলো তো?''আমার কাছে এখন এই কোভিড-১৯ ছড়ানোর অনেক সম্ভাবনাই রয়েছে।'

'কীরকম।'

'উহানের সি-ফুড মার্কেটে অনেক প্রাণীর মাংস বিক্রি হয় যেমন বাদুড়ের সেখান থেকেই এই জ্বর আসতে পারে বা উহানে চীনের যে জৈব গবেষণাগার রয়েছে সেখান থেকেও ছড়িয়ে যেতে পারে, অথবা...'

'অথবা কী, সতুকা?' 'কোনও দেশ তাদের অ্যাথলিটদের মধ্যে দিয়ে এই সংক্রামক ব্যাধি চীনে ছড়িয়ে দিতে পারে।'

'সেটা কোন দেশ হতে পারে বলো তো?''সেটা অনেক দেশই হতে পারে আর তারজন্য আমাকে ওইসব দেশের লিমিটারি গেমসে অংশগ্রহণকারীদের ঠিকুজি-কোষ্ঠী দেখতে হচ্ছে আর হ্যাকিং করতে হচ্ছে।'

'তাতে তুমি কিছু বুঝতে পারলে?''না, তবে নতুন সম্ভাবনার কথা আমার সামনে চলে আসছে।'

‘কীরকম?’‘চীন হয়তো নিজের থেকেই এই ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে এই মিলিটারি গেমসের মাধ্যমে।’

‘তাতে চীনের লাভটা কী হবে?’‘চীনের হাতে হয়তো এর ওষুধ বা টিকা আছে যা কিছুদিন বাদে বাজারে এনে চীন সারা বিশ্বে অনেক টাকা লাভ করবে।’

‘হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে। কিন্তু সতুকা, এটা চীন না করে অন্য কোনও দেশ বা কোনও বড় ওষুধের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিও তো করতে পারে?’‘হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব।’

‘তাহলে এই রহস্যের সমাধান কী?’‘আরও বেশি এই নিয়ে তদন্ত করতে হবে। খোঁজখবর করতে হবে। তাহলেই আসল সত্যি বেরিয়ে আসবে।’

সতুকা রাতে খাওয়ার পরেও ল্যাপটপ অনলাইনে অনেক কিছু করতে লাগল। আমরা দু’জন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম থেকে আমরা রেডি হয়ে নিলাম, বেরোতে হবে। আমাদের গাইড চলে আসবে। আমি সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সতুকা, কিছু বুঝতে পারলে?’

আমার প্রশ্ন শুনে সতুকার মুখে হাসি আর বলল, ‘চল, গাড়িতে বলছি।’

বোঝা গেল সতুকা এই রোগ নিয়ে রহস্য অনেকটাই উদ্ধার করে ফেলেছে। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে যেই রাস্তায় গিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো আর আমাদের কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের সামনে কিছু স্প্রে করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আমরা অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

তারপর আমাদের যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আমরা একটা বদ্ধ ঘরে, আর আমাদের জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় স্ক্রিনে কয়েক জনের মুখ ভেসে উঠল। তারা জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা চীনে কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তোমরা চীনকে বদনাম করবার জন্যে এখানে এসে বিভিন্ন সেনসিটিভ জায়গা যেমন উহানের সি-ফুড মার্কেট, মিলিটারি গেমস ভিলেজ আর উহানের বায়ো গবেষণাগারে গিয়েছ। তোমাদের সঙ্গে যাদের কথা হয়েছে তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেছো কোথা থেকে কোভিড-১৯ জ্বর হয়েছে। তোমরা এসেছ ওই কোভিড-১৯ ব্যাধি চীন থেকে ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রচারের স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে। বলো তোমাদের কারা পাঠিয়েছে?’

সতুকা বুঝতে পারল চীনের সামরিক শাসকের কড়া নজরে তারা পড়ে গিয়েছে। তারা যে খুবই কড়া সেটা আমরা সবই জানি। সতুকা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘না, আমাদের কেউ পাঠায়নি। আমরা নিজেরাই এসেছি। আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আর আমরা এখানে এসেছি কোভিড-১৯ সংক্রমক ব্যাধি কোথা থেকে ছড়িয়েছে সেটা খুঁজে বার করতে।’

‘এই তো তোমরা স্বীকার করলে তোমরা করোনা রোগের উৎস চীনের কোথায় সেটা খুঁজতে এসেছ। তার মানে চীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর রাষ্ট্রদ্রোহ। আর এর শাস্তি তোমাদের তিনজনেরই মৃত্যুদণ্ড।’

এই কথা শুনে বটুকবাবু ধপাস করে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সতুকা বলল, ‘কিন্তু আমি এই রোগ কারা ছড়িয়েছে তা বার করতে পেরেছি।’

‘কারা ছড়িয়েছে এই রোগ?’‘একটি বিদেশি রাষ্ট্র, আমেরিকা।’

‘না, আবার তুমি মিথ্যা কথা বলছ, নিজেদের মৃত্যুদণ্ড রোধ করতে এখন আমেরিকার উপরে দোষ চাপাচ্ছ। তুমি কীজন্যে বললে আমেরিকা চীনে এই রোগ ছড়িয়েছে?’‘তার কারণ উহানে মিলিটারি গেমসের পরপরই এই রোগ ছড়িয়েছে। আর আমেরিকার খেলোয়াড়দের সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের সবারই এই রোগ হয়েছে। আমেরিকার খেলোয়াড়রা কোনও খেলাতেই সেভাবে পারফর্ম করতে পারেনি। আর ওরা ফিরে যাওয়ার পরে ওদের নিজেদের অঞ্চলেও করোনা বিশালভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।’

‘এই সবই অনুমান, কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে তোমার কাছে?’‘হ্যাঁ আছে।’

‘কোথায়?’‘আমার ল্যাপটপে কিন্তু সেটা তো এখন আমাদের হোটেলের রুমে।’

‘না, সেটা আমাদের কাছে। আমরা তোমাদের সব জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছি।’

‘তাহলে সেটা আমায় দিন। আমি প্রমাণ দেখাচ্ছি।’

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরের দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। সেখান থেকে যান্ত্রিক একটা হাত সতুকার ল্যাপটপটা নামিয়ে দিয়ে গেল। সতুকা ল্যাপটপটা খুলে সরাসরি কিছু সাইটে চলে গেল। সেগুলোতে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ’র পাঠানো বেশ কিছু মেল দেখালো। প্রতিটা কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা।

পরিষ্কার সেখানে লেখা আছে অপারেশন উহানের কথা। আমেরিকা সরকার কীভাবে চীনের কাছে অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি সবকিছুতে পরাজিত হয়ে চীনকে অন্যভাবে পরাজিত করার জন্যে এই ষড়যন্ত্র করেছে। আর ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমেরিকার ফোর্ট ডেট্রিকের জৈব গবেষণাগারে এক মারাত্মক জীবাণু তৈরি করে আমেরিকার সৈনিকদের শরীরে প্রয়োগ করে চীনের মিলিটারি গেমসে পাঠানো। আমেরিকার প্রত্যেক প্রতিযোগীই ছিল এক-একজন বায়ো ওয়েপুন বা জৈব অস্ত্র।

সতুকা এইসব দেখিয়ে জানতে চাইল, ‘কী এবারে সন্তুষ্ট তো?’ আর এই জন্যেই আমেরিকার প্রতিযোগীরা চীনের সিয়েতেলের যে ট্যাকোমা বিমানবন্দর দিয়ে এসেছিল, সেখানে করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।’

‘কিন্তু এইসব সিআইএ’র ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন মেল আইডি-তে তুমি অ্যাকসেস পাচ্ছ কী করে?’‘কী করে আর, হ্যাকিং করে, আর এই হ্যাকিং চীনের ক্ষেত্রে এথিক্যাল হ্যাকিং কী, আমি ঠিক বলছি তো? আর আমি যে আমেরিকার কোড ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সহজে পাঠোদ্ধার করতে পারব তা তোমরা আমার ল্যাপটপের কোড খুলে না বার করতে পারা থেকেই বুঝতে পেরেছ।’

এইবারে স্ক্রিনের সবার মুখে হাসি। তারা বলল, ‘ওয়েল ডান মিস্টার সাত্যকি সোম, তুমি চীনকে এক বড় অপবাদের থেকে বাঁচালে। এই মুহূর্ত থেকে তোমরা তিনজন চীন রাষ্ট্রের অতিথি। কাল তোমাদের তিন জনকে চীনের ঐতিহ্য চীনের প্রাচীর দেখিয়ে আনা হবে।’

আর সেই সময়েই বটুকবাবুর জ্ঞান ফিরে আসছিল। তার মুখে তখন একটাই কথা, ‘শেষপর্যন্ত আমাদের চীনের পাঁচিল থেকে ফেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।’

তাই শুনে আমরা প্রাণ খুলে হাসছি।

(কল্প কাহিনী)

NAUGHTY BOY
বান্টি
সুদীপ্ত মণ্ডল
কি ব্যাপার বলতো বান্টি ?
এইটা তোকে দেখাবো বলে ডেকেছি রে !
উরিব্বাস!! লেজার পিস্তল।
অনলাইনে অর্ডার দিয়ে বেশ সস্তাতেই পাওয়া গেছে।
টেস্ট করে দেখ
তখন দেয়ালের অন্য প্রান্তে ....
টাকার থলি না গলার নলি ! জলদি বলো কাকু
কাকুকে ডাকুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি একমাত্র আমি।
এ..এই স্টপ!!

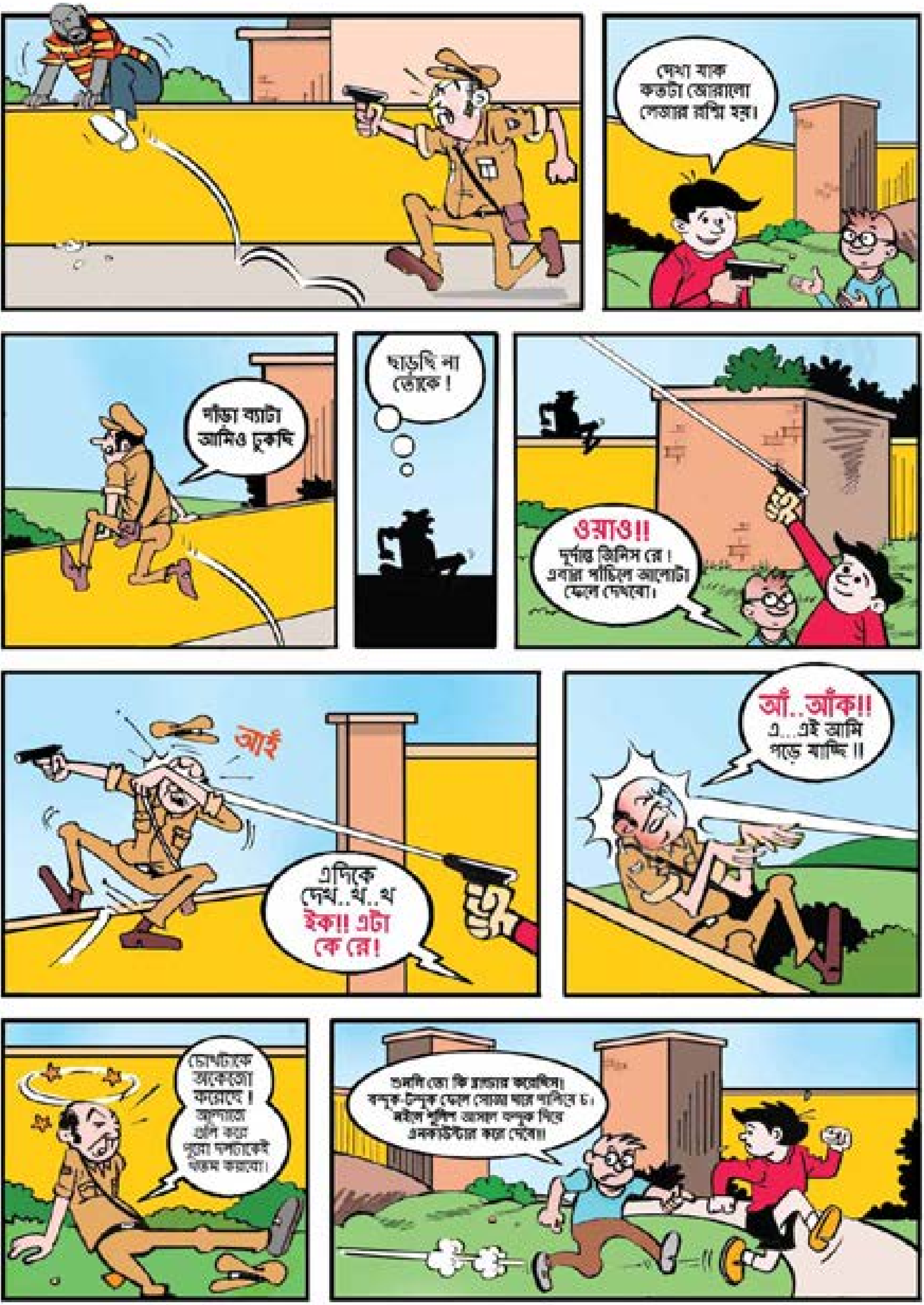
দেখা যাক কতটা জোরালো লেজার রশ্মি হয়।
দাঁড়া ব্যাটা আমিও ঢুকছি
ছাড়ছি না তোকে !
ওয়াও!! দুর্দান্ত জিনিস রে। এবার পাঁচিলে আলোটা ফেলে দেখবো।
আঁই
এদিকে দেখ..থ..থ ইক!! এটা কে রে!
আঁ..আঁক!! এ...এই আমি পড়ে যাচ্ছি !!
চোখটাকে অকেজো করেছে।
বন্দুক-টন্দুক ফেলে সোজা ঘরে পালিয়ে চ। নইলে পুলিশ আসল বন্দুক দিয়ে এনকাউন্টার করে দেবে।।

কয়েক দিন পর বাড়িতে ....
তোরা দুই বন্ধু বাড়িতে থাক। আমি একটু ব্যাংকের কাজ সেরে আসি।
ঠিক আছে বাবা।
ওকে আঙ্কেল।
একদম দুষ্টুমি করবি না কিন্তু।
আমরা শুধু টিভি দেখবো।
আমি একঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবো
মিনিট দশেক পর...
আইডিয়া!!
শোন, টিভিতে যেরকম দেখাচ্ছে সেই রকম আমরাও দুজনে কুস্তি লড়ি !
তুই আগে আমাকে অ্যাটাক কর। তারপর আমি তোকে...
নে সামলা....
আমার গরিলা আক্রমণ !!
অন্যদিকে....
সরি স্যার !
লিংক ফেইলওর !
BANK
রোজ এই এক কেচ্ছা !

অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছি।
কি...কিসের আওয়াজ !!
এটা কুস্তির নতুন প্যাঁচ !!
বাঁচাও!!
আঁইক!!
নে এবার যত খুশি কুস্তি কর।

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

বকুলের ভাবনা

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা বলেছেন, বেরোবে না তুমি রাস্তায়
মাও বলেছেন, খেলাধুলো সব বন্ধ–
অনলাইনেই ইশকুল তবু চলবে
মোবাইলে নাকি মিলবে পড়ার গন্ধ?
বন্ধুর মুখ কতদিন দেখা হয়নি
ভাবছে বকুল, ভাবছে শরৎ-সকালে
করোনা, তোমার ভয়ে জড়সড়ো সব্বাই–
বলো, তুমি কেন এইভাবে আজ ঠকালে?
আকাশের নীল, ভেসে-যাওয়া মেঘ দেখতে
জানালা দিয়েই চোখ মেলে দিই বাইরে–
ঝকঝকে গাছে নতুন পাখির সঙ্গে
কথা বলি রোজ, তবু তো সঙ্গী পাই রে!

বেতন কমছে, বাবা বলেছেন, ভাবছি
কাজের মাসিকে ছাড়ানো এবার দরকার–
মায়ের গলায় থমথমে স্বর, বলেন তো
কিভাবে এবার চলবে ওদের সংসার!
নীতুর বাবার চাকরিটা আর নেই
মোবাইলে তার সে কি বুকফাটা কান্না!
আজকে জেনেছি লুকিয়ে লুকিয়ে মা রোজ
পাঁচটা বাড়িতে করতে বেরোয় রান্না।
এমন যে হবে আগে তো কখনো ভাবিনি
বাইরেটা যেন কেমন বদলে যাচ্ছে ...
মুখ ঢাকা মুখ, চিনতে পারি না কাউকেই
সবাই বোধহয় এসব কথাই ভাবছে!

করোনা মা ও ছেলের ভাষ্য

জগদিন্দ্র মণ্ডল

মা, মা– এ কী হলো বলো না–
আগে মাঝে মাঝে বলতে,
এটা কোরোনা, সেটা কোরোনা
এখন শুধু বলছ 'করোনা করোনা'।
এদিকে স্কুল বন্ধ, বন্ধু নেই খেলা নেই–
টিভি খুললে আবার সেই করোনা:
যাই কোথা ঘর বন্দি আর যে পারি না!
'মা বলো না, দেখতে কেমন করোনা'
দৈত্যি কালো, হাতে বড় নখ মাথায় ঝুঁটি,
মা বলে না রে না, ও অদৃশ্য হয়ে করে ছুটোছুটি,
সুযোগ পেলেই মুখে চোখে লেপ্টে বসে
শরীরে ঢুকে পিলপিলিয়ে ফুসফুসটা খেয়ে বসে,
"বুঝলে বাছা করোনা হলো একটা ভাইরাস
বলি ও একটা মানুষ খেকো 'পাইরাস'।"
"মা মা করোনা নিয়ে কবিতা লিখেছি
মন দিয়ে একটু শোনো না–"
দিব্যি তুই করোনা, চষে বেড়াস সব দেশ,
বাদ নেই কোনো দেশ– সারা দেশ হাঁপাচ্ছে
কী করে এমন হলো বুঝতে হলে শোনো তবে –
মানুষের শরীর-মন বাইরে দেখতে ভিন্ন,
আসলে তা একটা নিয়মে এক রসদে গড়া–
কম বেশি এদিক ওদিক তাই বাইরে চেহারা ভিন্ন!
এই ভিন্নতাকে রসদ করে কিছু মানুষ বলে,
"জাতে জাতে মানুষ ভিন্ন, করোনা তাই
বুঝিয়ে দিল মানুষ আসলে এক অভিন্ন!
সব দেশ সব মানুষ এক হয়ে তাই করো যুদ্ধ
ঘোচাও মানুষে মানুষে সব বিভেদ-ভাইরাস
পালাবে মুখ কাচুমাচু করোনা ভাইরাস।"

মা বলে "অনেক হয়েছে, অনলাইনে–
এখন তোর ক্লাস আছে না!"

কেমন যেন দিনগুলো

মানস সরকার

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

চারিদিকে শিউলির গন্ধ। হালকা বাতাসে সাদা আকাশ তার মাথা দোলাচ্ছে। একটু একটু করে দিন এগিয়ে আসছে। উৎসব আসতে আর বেশি দেরি নেই।

বাবার মুখখানা বড় অসহায়। ওই মুখের দিকে তাকাতে ভারি কষ্ট হয়। এমন মুখ দেখে কী কিছু বলা যায়? সেই কবে থেকে বাবার দোকান বন্ধ। যেদিন থেকে ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল অফিস কাছারি সব। আমাদের বেলঘরিয়ার দোকানটাও। উৎসবের সময় কত কাজ থাকত। এবছর কেউ আর আসছে না।

– মাকে বললাম, আবার কবে ভালোদিন আসবে?

কোন উত্তর এল না।

ছটফটানির সঙ্গে এক ধরনের চাপা আতঙ্ক। কবে কী হবে? কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। এসব আলোচনা হলে মা বারবার ভিজে চোখ মুছে নেয়। কেন ভিজে যায় বলতে পারব না। এ এক ধরনের কষ্ট। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়।

পাড়ায় পুলিশের গাড়ি ঢুকে পড়েছে। গাড়ির সামনে পিছনে মাইক লাগানো। মাইক থেকে কথা বেরোচ্ছে। এতদিন ধরে যা শুনছি। সেই এক কথা। দোকান বাজারে কেউ অযথা ভিড় করবেন না। মুখে মাস্ক পরুন। সর্দি, কাশি, হাঁচি বা জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেখা করুন। বলতে বলতে চলে যায়, আবার আসে।

জিৎ ভ্রু কুঁচকে তাকায় আমার দিকে।

– কী রে কিছু বলবি? তোর মনখারাপ লাগছে?

জিৎ একটু হাসল তেমন মন খুলে হাসি মনে হল না। কিছু একটা গোপন করল।

—আমিও ছাড়ার পাত্র নই। তেমন মন খুলে হাসি মনে হল না। কিছু একটা গোপন করল।

—আমিও ছাড়ার পাত্র নই। বলতেই হবে কী হয়েছে, কী হয়েছে তোর বল?

—না-না তেমন কিছু নয়।

—ঠিক উত্তর হল না মনে হয়। ওর কাছে জানতে চাইলাম। কিছু একটা হয়েছে, তুই লুকিয়ে রাখছিস আমাদের কাছে।

জিৎ চুপ করে থাকে। চোখমুখের বদল ঘটে।

—আসিফ জিৎকে কাছে টেনে জানতে চায় বল না কী হয়েছে? সত্যি করে বল।

—জিৎ-এর চোখে জল। কেঁদে ফেলে বলে আমি এমন উৎসব চাই না।

আমরা আঁতকে উঠি। কেন, কী হয়েছে?

—একটা জামা হবে না। প্যান্ট হবে না জুতো তাও হবে না। তাহলে উৎসবের দরকার কী? বলতে বলতে জিৎ মাথা নিচু করল। তখন তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে।

আবারও বলে, বাবা টাকা কোথায় পাবে? জমানো যা কিছু ছিল একদিনে সব শেষ। বাবা এখন সাইকেলে করে লেবু কলা নিয়ে সকাল বিকাল বেরিয়ে পড়ে। যা আনে দু'বেলা ঠিকমত চলে না।

আমি আর আসিফ ওর দিকে তাকালাম। সত্যি তো কিছু বলার নেই। কারোর মন ভালো নেই। হাতে পয়সা নেই।

—আসিফ বলল, ভেবেছিলাম এবার আমার বোনুকে একটা চাবি দেওয়া পুতুল কিনে দেব। তা আর হল না। কাল আমার ঘট ভেঙে মা সব টাকা নিয়ে নিয়েছে। বলেছে পরে দেবে। কী জানি কবে দেবে।

দিন দিন আকাশের চেহারা পালটে যাচ্ছে, সাদা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে নীল আকাশ পাড়ায়, সবুজ গাছের মাথায় ঝিলমিল করছে রোদ। শরৎ এসে গেছে। প্রকৃতি সেজে উঠছে। শিউলির হাসি, কাশের দোলা, নীলকণ্ঠ পাখি কিছুই বাদ নেই। কিন্তু কী হবে? মানুষের হাতে তো টাকা নেই। উৎসবের সেই খুশি নেই। দর্জির দোকানে রাতজাগা নেই।

ছোটদের কত ইচ্ছে হয়। বাবা-মার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এক অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটছে সময়।

—আসিফ বলল দেখিস, সব ঠিক হয়ে যাবে সময়ের হাত ধরে।

— আমি বললাম, আরে ইস্কুলে যেতে পারছি না। অনলাইনে পড়াশোনা করতে হচ্ছে, ভালো ফোন না থাকায় বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পড়তে হচ্ছে।

—জিৎ বলল, ঠিক বলেছিস, কি জানি কী হবে, আর কতদিন। আগামী দিনের কথা ভেবে আমার পা-হাত-পা কাঁপছে।

—আসিফ জিৎ-এর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, যা হবার হবে। একটু হাসতে চেষ্টা কর। আমার মা বলে আঁধার যত কালো হয় হোক, ভয় পাবি না। তার পেছনেই নতুন দিনের সূর্য লুকিয়ে থাকে।

টেনো

শাশ্বতী দাশগুপ্ত

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

নাক্কু বাবুর জীবনে অনেক প্রশ্ন। সব বিষয় নাক গলাতে গলাতে আর প্রশ্ন করতে করতে নাক্কুর নাকটাই গেছে বেঁকে। তাই সে 'কেন' বলতে পারে না, বলে 'টেনো'? একদিন সকালে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন সামনে আর এক ভদ্রলোক, সাথে কুকুর, হাঁটতে হাঁটতে কী কারণে যেন ভদ্রলোক কুকুরটাকে ডেকে উঠলেন "টুবি" - ব্যস! নাক্কুর মনে সাথে সাথেই প্রশ্ন জেগে উঠলো, কেন? কুকুরের নাম টুবি কেন হবে? টমি হয়, টবি হয় খামোকা টুবি কেন? তবে কি তার মতন ওই ভদ্রলোকেরও উচ্চারণের সমস্যা আছে? আর একবার প্রশ্ন জাগলো তো হলো, তখন নাক্কুবাবু তো নিজের বাধাও মানেন না। ছুটে ছুটে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন , "দাদা ওর নাম টুবি কেন?" ভদ্রলোক প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও, বেশ উৎসাহিত হলেন তা বোঝা গেল। বললেন আরে আর বলবেন না, আমার এই কুকুরের একটা ইতিহাস আছে। ও কিন্তু খুব ভালো জাতের সেন্টবার্নাড, প্রায় মরো মরো অবস্থাতে কেউ একে আমার বাড়ির সামনে ফেলে রেখে যায়। একেবারে 'টু বি অর নট টু বি' অবস্থাতে বলতে পারেন। সেই 'নট টু বি' অবস্থা থেকে কেবলমাত্র আমার পরিচর্চায় এখন 'টু বি', বলে প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। নাক্কুবাবুও খুশি। কিন্তু সব সময় সবাই যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নাক্কুর টেনোর জবাব দেয়, এমনটা নয়। একবার নাক্কুবাবু কাঞ্চনকন্যা ট্রেনে ফিরছেন উত্তরবঙ্গ থেকে, হঠাৎ-ই কিছু লোক নাক্কুকে আদেশের সুরে বললো "সিটের নিচটা খালি করে দিন।" নাক্কু বাই ডিফল্ট বলে উঠলো "টেনো"? ব্যস চোখ লাল হয়ে উঠলো তাদের, কোমর থেকে উঁকি দিলো আগ্নেয়াস্ত্র। প্রমাদ গুনলো নাক্কুর বউ, সাথে ছোট বাচ্ছা। বউ বলল, ছাড়ো, চলো সরিয়ে দিই মালপত্র। কিন্তু নাক্কু নাছোড়, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন টেনোর উত্তর না পাওয়া অবধি কোন মাল সরবে না। আসলে দলটা ছিল স্মাগলারদের, বেঞ্চের নিচের পাটাতন সরিয়ে এভাবে নিয়মিত চোরাই মাল পাচার চলে, এদের হাবভাবে ট্রেনের যাত্রীরা, খুব একটা নাক গলায় না এদের কাজকর্মে, কিন্তু নাক্কুর নাক তো গলবেই। শেষ অবধি টেনোর পিছনে ধাওয়া করে একেবারে লালবাজার অবধি দৌড়, ধরা পড়লো গোটা গ্যাং, খবরের কাগজে চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হলো।

যাইহোক এ ভাবে টেনোর পিছনে ধাওয়া করতে করতেই নাক্কু নিজের জীবনে যখন কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌছায়, তখন সেই সিদ্ধান্ত থেকে সে সচারাচর নড়ে না। যেমন নাক্কু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ধর্ম বিষয়টা অনেকটা মানুষের শরীরের অ্যাপেন্ডিস-এর মতো। জন্ম থেকে লেজুড় হয়ে সঙ্গে জুড়ে গেছে, কোনো কাজে লাগে না, মাঝেমধ্যে কেবল যন্ত্রণা বাড়ায়। তাই একে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু সে বাদ দেবে ভাবলেই তো আর বাদ হয়ে যায় না। পরিবার পরিজন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে নাক্কুর টেনোর অত্যাচারে। নাক্কুর মা মারা গেলে সে বিপত্তি আরও চরমে ওঠে। নাক্কু সিদ্ধান্ত নেয় যে, মাকে দাহ করা হবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য

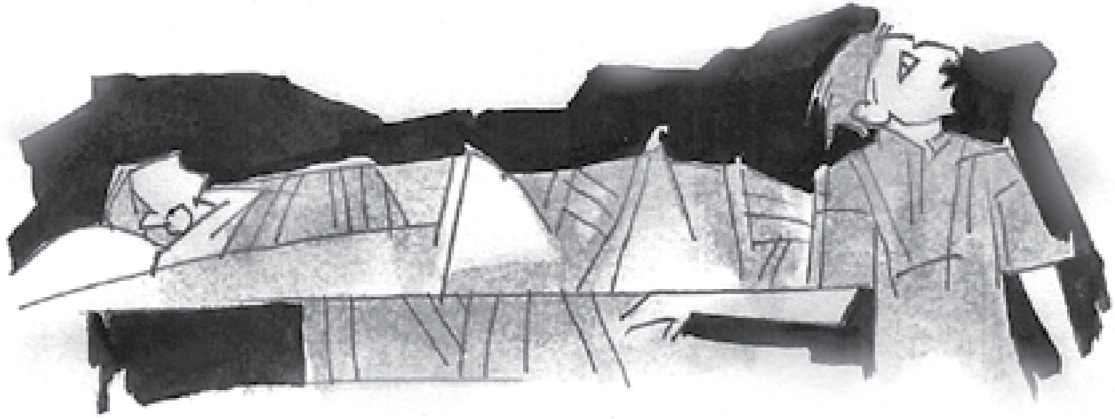

মরণোত্তর দেহদান করা হবে। নাক্কুর বাবা সাত্ত্বিক মানুষ, সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত গীতা পাঠ করেন, আত্মীয় বন্ধুরা তার শরণাপন্ন হয়, নাক্কুবাবুর বাবা ধীর স্বরে বলেন, "মৃত্যুর পরে জীবনের আর কোন অস্তিত্বের কথা বলে না হিন্দু দর্শন, জীবনের পরম সত্য মৃত্যু। যেহেতু মৃত্যুর পর বাবা-মায়ের পার্থিব শরীরের উপর আইনত সন্তানের অধিকার, তাই এক্ষেত্রে ছেলে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই মান্যতা পাবে।" এরপর কারো আর কিছু বলার রইলো না। কিন্তু কেউ বিষয়টা ঠিক ভালোভাবে মেনে নিতে পারলো না। নক্কুর জ্যাঠামশাই অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। অত্যন্ত ব্যথিতভাবে তিনি শেষবারের মতো বোঝানোর চেষ্টা করলেন নাক্কুকে, বললেন, " শোন তুমি ধর্ম নাই মানতে পারো, কিন্তু আমি দীর্ঘ ৫৮ বছর ওকালতি করছি। আইনে বলে, Hindu means a person who is Hindu by birth or by conversion into Hindu religion or who professes the Hindu religion whether or not such person believe in God and Temple worship. অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাস করো বা না করো, মন্দির পুজোয় বিশ্বাস কর বা না কর বংশপরম্পরায় তুমি হিন্দু, তোমার মা আমাদের বংশের বধু, সকালের অত্যন্ত স্নেহের প্রিয় পাত্রী, মৃত্যুর পর তার শরীর দশজনের সামনে বেআব্রু হবে তার এমন অসম্মান তুমি কোরোনা, চক্ষুদান করেছ, সে ঠিক আছে। তার চোখ দিয়ে দৃষ্টি ফিরে পাক অন্ধজন, কিন্তু দেহদান? না না এমন অনাচারী হয়েও না তুমি, মায়ের আত্মাকে কষ্ট দিয়োনা।

এমন একটা গুরু গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেই নাক্কু হঠাৎ বলে বসলো "টেনো"? অনাচার টেনো বলছেন জ্যাঠামশাই ? আচার, অনাচার তো মানুষেই তৈরি করেছে । প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে চতুর্থ হিম যুগের কাছাকাছি সময় নিয়াল্ডারথাল মানুষ প্রথম কৃত্রিম উপায়ে আগুন জ্বালানোর কৌশল রপ্ত করে, সেই পর্যায়েই মৃত্যু পরবর্তী প্রাণের কল্পনা করা শুরু করে মানুষ। অতি পরিচিত কেউ মারা গেলে সে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল এ ধরনের করুণ সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে আপাত সান্ত্বনা লাভের উপায় মৃত্যু পরবর্তী আচার অনাচারের জন্ম। Upper palaelithic যুগে ক্রোমাগনন বা বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ Homo sapiens, ধর্ম, আত্মা, পরমাত্মা এই ধারণা গুলো আরও সুসংহত করেছে। নাক্কু আরও কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু জ্যাঠামশাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে সেখানেই থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, থাক থাক তোমার জ্ঞান তোমার কাছেই রাখো, বলে কারো সাথে দেখা না করেই সেই মুহূর্তেই তিনি হনহন করে নাক্কুদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহদান সম্পন্ন হল নাক্কুর মায়ের, গুটি কয়েক আত্মীয়, বন্ধু নাক্কুর সাথে। বাড়ি ফিরে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত মনে সে বাবার কাছে এসে বসলো, কি যেন একটা যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে আসছে গলার কাছে। বাবা ধীরে ধীরে উঠে এসে হাত রাখলেন ছেলের মাথায়, বললেন জীবনে কোনো কাজ করে অনুতাপ কোরোনা। আমি আজ তোমাকে অনুমতি দিলাম আমার মৃত্যুর পরে তোমার মন চাইলে তুমি আমারও দেহদান করতে পারো। নাক্কু অদ্ভুত চাহনি নিয়ে তাকাল বাবার মুখের দিকে, মানুষটাকে বোঝার প্রবল বাসনা নিয়ে। এ কি বাবার অভিমানের কথা? মুখে বললো, কিন্তু বাবা, দেহ দাহ না হলে যে শ্রাদ্ধশান্তিও হয় না। স্মিত হেসে বৃদ্ধ বললেন উপনিষদ বলে, মৃত্যু অনাড়ম্বর, অসত্য থেকে সত্যের পথে যাত্রা, অন্ধকার থেকে আলোয়। সে পথে একবার যাত্রা শুরু হলে পিছনে ফিরে তাকানোর উপায় থাকে না। আমার শ্রাদ্ধ শান্তি না করে মানবকল্যাণে কিছু করতে পারলে কোরো। বাবার কোলে মাথাটা রেখে সেই ছোট্টবেলার মতো ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে নাক্কু, মনের ভার যেন অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায় তার, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারে সে।

বছর কাটে, পৃথিবী নিজের ছন্দে পাক খায়। নাক্কুর টেনোর পিছনে আবর্তনও চলতে থাকে। নাক্কুর ছেলে বড় হয়ে বিজ্ঞানের জটিল গবেষণায় ব্যস্ত ইদানীং। ওর কথাবার্তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না নাক্কু। ফলে টেনোর প্রকোপ পাল্লা দিয়ে বাড়ে। এদিকে পৃথিবীজোড়া প্যান্ডেমিক বা কোভিড ১৯ ভাইরাস জনিত অতিমারী শুরু হয়েছে। চিন্তিত নাক্কু ছেলেকে সাবধান করতে গেলে ছেলে উল্টে বলে, প্যান্ডেমিক পৃথিবীতে কোন বিরল ঘটনা নয়। নাক্কু বলে "না তবুও সাবধানে থাকো, দেখো ঘরে ঘরে..." ছেলে বলে, এ আর নতুন কি? মহামারী বা অতিমারীতে তো এটাই স্বাভাবিক।

নাক্কুর জীবনে যত প্রশ্ন, যত "টেনো", ছেলেটা হয়েছে ততটাই নির্লিপ্ত। রাগই হয় মাঝে মাঝে। রোজই কিছু না কিছু খারাপ খবর, এই তো কদিন আগেই নাক্কুর এক ঘনিষ্ট বন্ধু মারা গেল। মন ভারাক্রান্ত।

ছেলেকে বলতেই ছেলে বললো, আচ্ছা মারা যাওয়া বলতে কি বোঝায়? ব্রেন ডেথ নাকি হার্ট ডেথ? ব্রেন-এর মৃত্যু মানে চেতনায় মৃত্যু, কিন্তু তখনও অনৈচ্ছিক পেশি হৃদস্পন্দন চালিয়ে দেহে রক্ত সংবহন চালিয়ে যায়। হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলেই কি মৃত্যু? শরীরের বাকি যে এতগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের কি কোন দাবি নেই শরীরের উপর? সব দাবি কি কেবলমাত্র ব্রেন আর হার্ট-এরই? মৃত্যু ঘোষণার পরে যে চোখের কর্নিয়া নিয়ে অন্যের চোখে প্রতিস্থাপন হয়, সেই কর্নিয়ার কোষগুলো জীবন্ত থাকে বলেই না এ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়? নাক্কু ভাবতে বসে সত্যিই তো। এভাবে তো ভাবিনি। ছেলে বলে, বছরের পর বছর চাপা পড়ে থাকা প্রাণীর ফোসিল-এর একটা মাত্র ডিএনএ থেকে নতুন করে প্রাণ সৃষ্টির চেষ্টাও করছেন আজকের বিজ্ঞানীরা। যে কোন দিন সে যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েই যেতে পারে ল্যাবরেটরিতে। বাবাকে এমন জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে দিতে মজাই পায় নাক্কুর ছেলে। বাবাকে চিন্তিত দেখে হাসতে হাসতে বলে চলে, শক্তির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আছে শুধু রূপান্তর।

কথার মাঝে ফোন বেজে ওঠে। নাক্কুর জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে ফোন, জেঠিমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, কোভিড পজিটিভ। খবরটা সপ্তাহ খানেক পরেই পৌঁছালো নাক্কুদের কাছে। আসলে নাক্কুর মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল সেটা থেকে গিয়েছিল সবারই মনে মনে। নাক্কুর জ্যাঠতুতো ভাই জানালো, দিন দশেক আগে জেঠিমাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে, রুগী ঠিক কী অবস্থায় আছে হাসপাতালের হেল্পলাইন-এ ফোন করে তার সঠিক কোন খোঁজখবর আসছে না। তাই বাড়ির সবাই উদ্বেগে রয়েছে, নাক্কুর যদি হাসপাতালে কোন চেনা জানা থাকে, তাই জ্যাঠামশাই একবার খোঁজ নেবার জন্য বলেছেন। নাক্কু ভাইকে আশ্বস্ত করে বলে জ্যাঠামশাই কে একদম চিন্তা করতে বারন করো, আমার এক বাল্যবন্ধু ওই হাসপাতালের ডাক্তার, আমি এখনি কথা বলছি তার সাথে। ভাইয়ের ফোন রেখেই বাল্যবন্ধুকে ফোন করে নাক্কু, ডাক্তারবাবু বললেন "তুই ১০টা নাগাদ চলে আয় হাসপাতালে, আমি থাকব।" দেরি না করে, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নাক্কু বেরিয়ে পরে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। ডাক্তার বন্ধুও পৌঁছে গিয়েছিল, সে জানালো, যে বেড নম্বর নাক্কু দিয়েছে সেই বেড নম্বরে নাক্কুর জেঠিমার নামে কোন রোগী ভর্তি নেই। নাক্কু অবাক হয়, তার ভাইকে চলে আসতে বলে হাসপাতালে। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পরে জানা গেল জেঠিমা মারা গেছেন। কবে কোন সময় তা ঠিক স্পষ্ট নয়। মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়ে ভাই। সরকারি নথিপত্রতে সই করে দিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি ফিরে আসে ওরা তিনজন। বাইরের বারান্দাতে অপেক্ষা করছিলেন বৃদ্ধ, দীর্ঘ জীবনের সঙ্গিনীকে শেষ বারের মতো দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা বুকে। নাক্কুকে দেখেই বলে উঠলেন এতো বছরের জীবনে যা শিখিনি আজ তোমার জেঠিমার মৃত্যু আমাকে তা শিখিয়ে দিলো। কত ঠুনকো আমাদের মনে পুষে রাখা সংস্কারের বেড়াজাল। আমার দুই মেয়ের পর ছেলে হতে সবাই হাফ ছেড়েছিলাম, যাক মুখাগ্নি করার লোক এলো। আজ দেখো জানতেই পারবো না আদৌ কবে শেষকৃত্য হবে। মুখাগ্নির তো কোন প্রশ্নই নেই। দেহ দাহ না হওয়া অবধি পারলৌকিক কাজ কর্মও হবে না। তোমারা স্বেচ্ছায় তোমার মায়ের দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে দিয়েছিলে। সেদিন তোমার নিন্দা

করেছিলাম আর আজ আমরা বাধ্য প্রিয়জনের দেহ সরকারের হাতে তুলে দিতে, পরিণতি না জেনেই। সব শেষ হয়ে গেল বাবা!

নাক্কুর ছেলে এগিয়ে গিয়ে বসলো দাদুর পাশে। বললো দাদু পরলোকের ভাবনাতে আমরা ইহলোককে ভুলে যাই, অথচ আমাদের যা থাকে তা এই পৃথিবীতেই থাকে। মৃত্যুকে, সহজ ভাবে মেনে নিতে অভ্যাস করতে পারি না আমরা? বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে দাদু, আমরা ধর্মকে তো দীর্ঘদিন সুযোগ দিলাম, এবার বিজ্ঞানকে সুযোগ দাও না। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ মানুষটি, চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে তার জীবনভোর যাপন করা, আগলে রাখা সামাজিক সংস্কার। বললেন, দাদুভাই কী করতে পারলো তোমার বিজ্ঞান? শেষ হয়ে গেল মানুষটা এভাবে? নাক্কুর ছেলে বললো, দাদু তুমি সামলে ওঠো। জানি না তুমি খেয়াল করেছো কিনা, খবরের কাগজের একটা খবর। কয়েকদিন আগে দিল্লির গাজিয়াবাদের বাসিন্দা, ৪৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তির কোভিড আক্রমণে, দুটো ফুসফুসই সংক্রামিত হয়ে একেবারে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট এ চলে যান। ভেন্টিলেটর-এও কাজ হয় না, তাকে চেন্নাইতে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তখন নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর দেহে সফলভাবে এক মৃত ব্যক্তির ফুসফুস প্রতিস্থাপন করেন। ভদ্রলোক এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। যে মৃত ব্যক্তির ফুসফুস এই ভদ্রলোক এর প্রাণ বাঁচালো, সেই একই ব্যক্তির একটা হাত প্রতিস্থাপন হয়েছে আর একজন মানুষের শরীরে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় যার হাত বাদ দিতে হয়েছিল। দাদু বিদেশে তো পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত প্রতিস্থাপন হচ্ছে। আমাদের দেশেও কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে, আমাদের সবার সহযোগিতায় এ কাজ আরও দ্রুত এগোতে পারবে। এখন থেকে আমরা সবাই ভাবা অভ্যাস করি যদি, মৃত্যুর পর অন্য কোথাও নয়, এই পৃথিবীর জল মাটি হাওয়ায় মিশে যাবো আমরা, অনিবার্যভাবে। তাহলে গোটা জীবনযাপন পরলোকের কথা ভাবা ছেড়ে এ পৃথিবীটাকেই আরো আপন করে আগলে রাখতে পারবো সবাই। অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে পৃথিবী। নাক্কু অনেকক্ষণ চুপ ছিল। তার নাকটা চুলকোচ্ছিল, আর পারলো না, শেষে বলেই ফেললো, বিজ্ঞান যখন এতোটাই উন্নতি করছে তখন মানুষ অমর হবে না "টেনো"? নাক্কুর ছেলের চোখ পাকিয়ে বাবার দিকে তাকালো।

অঙ্কন ■ মনীষ দেব

এই পৃথিবীর প্রাণকে বাঁচাও

শৈলেন্দ্র হালদার

দুঃখমাখা গাছগুলিকে
একটু আদর করতে চাই,
জোছনা ধোয়া মেঘগুলিকে
বুকের ভেতর ধরতে চাই;
তুমিই আমার বন্ধু হবে
এটাই শুধু শর্তে চাই।

তোমার জন্য বৃষ্টি দেব
মিষ্টি রোদেও পুড়তে চাই,
একটি বোবা ভয়ের পাখির
সঙ্গী হয়েই উড়তে চাই;
থমথমে কি গুমোট বাতাস?
ডানায় সাহস জুড়তে চাই।

ক্লোরোফিলের বাতাস দেব
কান্নাবিহীন আকাশ চাই,
পরমাণুর চুল্লি থেকে আর যেন না বেরয় ছাই।
ভয় না পাওয়া নিঃস্ব যারা
মানুষকে আজ ভাবুক ভাই।

ছবির দেশের রংবাহার

রানা সরকার

পথ ভুলেছি এখন আমি বন্দি আছি নিজ ঘরে
আমার চেনা স্কুলবাড়ি একলা ভীষণ ওই দূরে;
আঁকছি আমি গাঁয়ের ছবি তালগাছটি দাঁড়িয়ে সরে,
খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যায় ফেরিয়ালা ভিন সুরে।

পথ নিঝুম এই দুপুরবেলায় আঁকছি ছবি অনেকগুলো,
ঘরকুনো যে করল আমায় ছবির দেশের রংবাহার;
কোথায় খুঁজি বন্ধুকে আজ ফিরছে দেশে পথ ভুলো;
বন্দি দশা কাটবে জানি, রাখব ধরে চিত্রাহার।

ছবির মেলা অনেক বড় পাখপাখালির দেশে
রং মেখেছে শালুকফুল, পুকুর জলে হাসছে একাই
এই ছবিটি আঁকতে যেয়ে অদেখা রং মিলল এসে,
আকাশপথে উড়ছে ঘুড়ি, ছাড়ছে সুতো বাঁশের লাটাই।

ছবির খাতায় বন্দি আমি বন্দি দিনের বেলায়
পড়ার ফাঁকে একটুখানি তুলিতে রং মেশাই
ভয়ে ভয়ে কাটছে দিন ধরল বুঝি করোনায়
ঝুলি কাঁধে বদ্যি হাঁটে, সঙ্গে এক লম্বা সেপাই।।

ওদের কথা

দেবাশিস বসু

নুন-ভাত জোটে না
ফুল বুঝি ফোটে না
কেউ কাছে থাকে না
প্রিয় নামে ডাকে না
আলো নেই ছায়া নেই
কারো বুঝি মায়া নেই
সবাই মারে ধমক!

দিন নেই রাত নেই
ঘর আছে ছাত নেই
বাঁচবার প্রাণ নেই
বুক ভরা গান নেই
মরে গেলে শোক নেই
কাঁদবার লোক নেই
বেঁচে থাকাই চমক!!

খেলা

করোনা আতঙ্কে ক্রীড়াজগৎ

চি র ঞ্জী ব

খেলার মাঠে সকলেই সদা চঞ্চল। খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, আম্পায়ার, জাজ। সবার উপরে দর্শকরা, বাদ এই আমরা, সাংবাদিকরাও, এখন সব কার্যত স্তব্ধ। যা এখানে ওখানে হচ্ছে, তা খেলার মাঠের বাস্তব রূপ নয়। স্তব্ধতার শুরু চীনের উহানে ২৪ জানুয়ারি লকডাউনের পর। খেলাধূলা বন্ধ হয়ে যায় ওই প্রদেশে। তারপর অন্যান্য জায়গায়। ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে। এশিয়াতেও। বেশ কিছু দিন নিরোগ ছিল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। এই ওশিনিয়াও এখন কোভিড-১৯'র থাবায়। ক্রীড়াঙ্গন বা ক্রীড়াজগৎ তো জনজীবনেরই অঙ্গ। বাদ থাকবে কেমনে! সামাজিক দূরত্ব আসলে শারীরিক দূরত্ব। এই ফতোয়া বা নিয়ম লাগু হলে খেলাধূলা চলবে কেমন করে! অনেক কিছু ভার্চুয়াল হতে পারে, স্পোর্টস নয়। এর থেকে যে তৃপ্তি মেলে, তার অবসান হয়েছে। লন টেনিস, টেবল টেনিস, স্কোয়াশ, দাবা হয়তো কিছুটা চলতে পারে, যেহেতু শারীরিক ছোঁয়াছুঁয়ি নেই

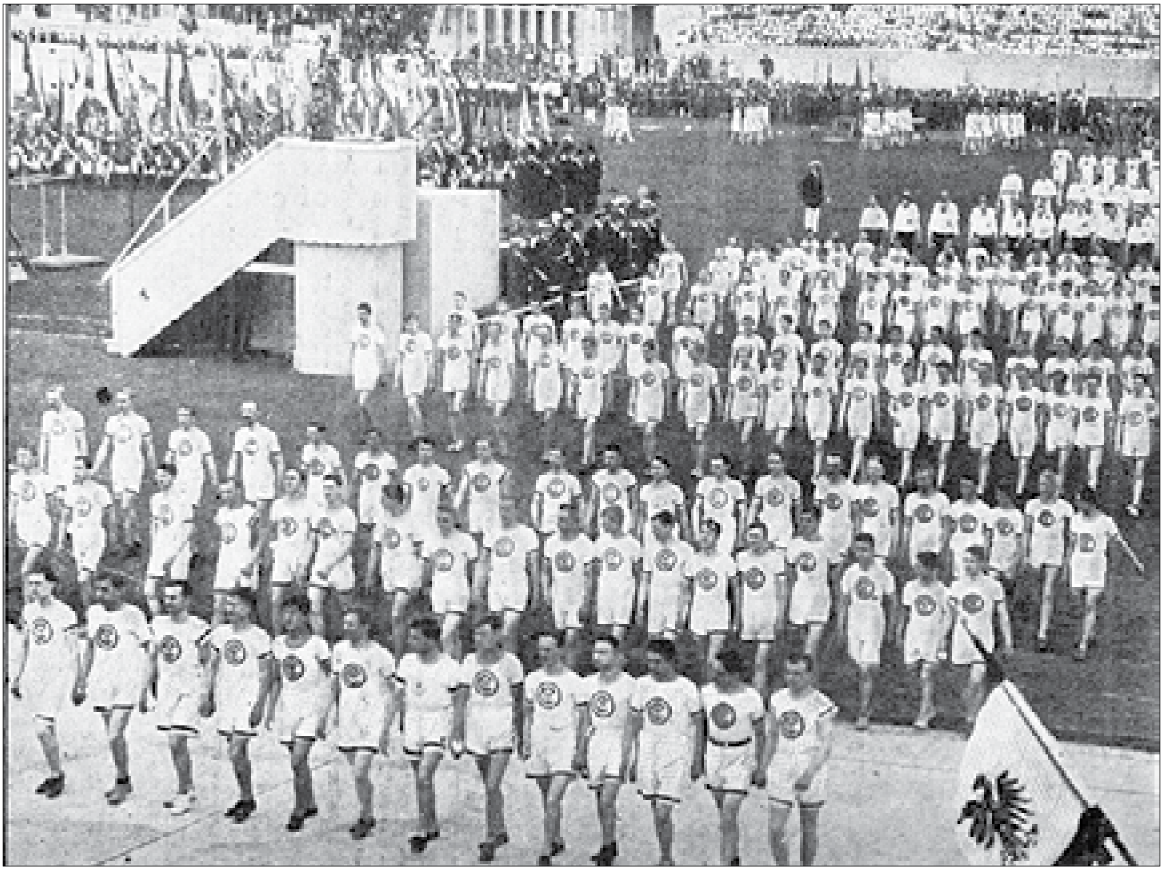

খেলার সময়ে। আবার লন টেনিস-টেবল টেনিসের ডাবলসে একই দলের দু'জনে ছোঁয়াছুঁয়ি হতেই পারে।

এ সব খেলাতেও টস দূরে দূরে। খেলা শেষে হাত মেলানো বন্ধ। কিন্তু কতক্ষণ মেনে চলা যায়। আবেগের বশে হঠাৎ জড়িয়ে ধরা, কোলে তুলে নেওয়া হতেই পারে। ক্রিকেটে 'সংঘর্ষ' নেই, কিন্তু ফিল্ডিংয়ের সময়ে ধাক্কাধাক্কি হতেই পারে। 'থুতু' ব্যাপারটা না-ই বা হলো, ঘাম থেকে কি ভাইরাস ছড়াতে পারে না?

লকডাউনের পূর্ণ ইতি হয়নি। করোনার দাপট একটু কমতেই ইউরোপের ফুটবল দেখছিলাম টিভিতে। দর্শক নেই গ্যালারিতে। কিন্তু মাঠের মধ্যে জয়ের পর একাধিক ম্যাচে দেখলাম, টিম-সাথীরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে। ১ আগস্ট যেমন লন্ডনের আকাশ জুড়ে আর্সেনাল। চ্যাম্পিয়নদের হাতে এফএ কাপ উঠতেই আবেগ থামাতে পারেনি শারীরিক দূরত্বকে। একই ঘটনা লিসবনেও। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর বায়ার্ন মিউনিখের ফুটবলাররা কোলাকুলি করলেন একে অপরকে জড়িয়ে। ফিফার আইনে শাস্তির ব্যবস্থা নেই। হয়তো অতঃপর হবে।

সমাজজীবনে যে ধাক্কা এল, তা সামলাতে কত কাল লাগবে জানি না। জীবনের সব স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ চুষে নিল এই কোভিড-১৯। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা বিশ্বে খেলাধূলা স্বাভাবিকভাবে না হওয়ায় আনুমানিক আর্থিক ক্ষতি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৪ বিলিয়ন বা চোদ্দশো কোটি ডলার। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রো কলেজ ক্রীড়া, এনবিএ, এনএইচএল ইত্যাদি ধরা হয়নি। যোগ করলে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন হবে।

শতবর্ষ আগে

প্রায় একশো বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু। নাম 'স্প্যানিশ' হলেও সৃষ্টি আমেরিকায়। সে বার ভারতেই মৃত্যু হয়েছিল কমবেশি সতেরো লক্ষ মানুষের। তবে এঁদের বেশ খানিকটা অংশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয়। ফ্লু হতেই ওঁদের ইউরোপ থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। ব্রিটিশ ভারতে আর্থিক ক্ষতির সঠিক হিসাব নেই। আর ক্রীড়াঙ্গনে ক্ষতি? তখন তো খেলাধূলার তেমন চল ছিল না এখনকার মতো। আর ব্রিটিশরা নেটিভ প্রজাদের তথ্যাবলী রাখবেই বা কেন?

গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর, এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত ভারত সহ সারা বিশ্বের হাল হকিকৎ পাঠক মাত্রই জানেন। গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ, ২০২০-র টোকিও অলিম্পিকও পিছিয়ে গেল এক বছর। ২০২১-এও হবে কি না অনিশ্চিত। হলেও 'স্বাভাবিক' হবে না। ইতিমধ্যে ২০২১-য়ে চীনে অনুষ্ঠেয় শীতকালীন অলিম্পিক নিয়ে অনিশ্চয়তা, হয়তো বাতিল হবে।

একশো বছর আগে কী হয়েছিল? ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্তব্ধ ছিল ক্রীড়াঙ্গন। হয়নি ১৯১৬-র বার্লিন অলিম্পিক। তারপর ১৯১৯-এ স্প্যানিশ ফ্লু। যুদ্ধের পর নানা দেশের ক্রীড়াঙ্গন একটু চঞ্চল হবে, ভাবা হয়েছিল। এসে গেল অতিমারী স্প্যানিশ

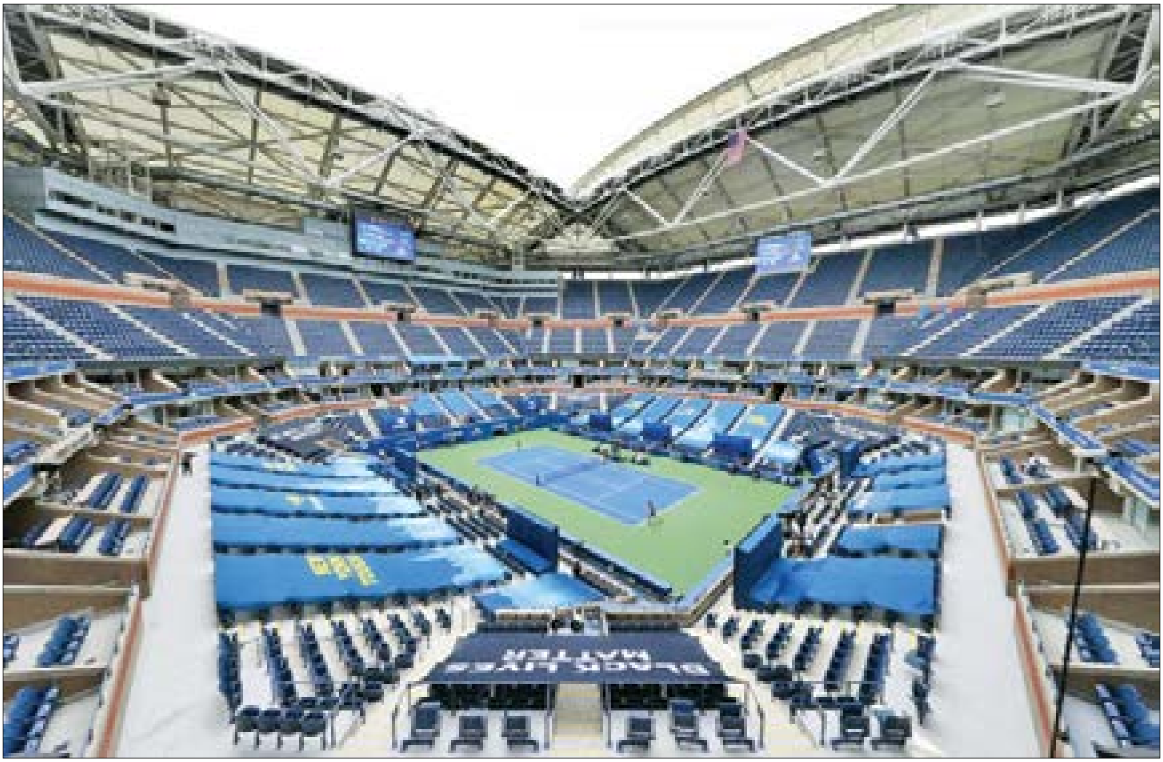

ফ্লু।

সারা বিশ্বে মোট মৃত ৫ কোটি। আমেরিকায় ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ ইউরোপের নানা দেশে। ক্ষত দগদগে। ক্ষতি যত, ক্ষত তত। এরই মাঝে ইউরোপের ১৪টি দেশের জওয়ানরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তখনই পিয়েরে দ্য কুবারতোঁর আদর্শ কোনও প্রভাব ফেলেছিল– বোঝা যায়, খেলা সকলের মধ্যে ঐক্য এনে দেওয়ায়। দৌড়, সাঁতার, বাস্কেটবল, গল্ফ, টাগ অব ওয়্যার, বেসবল ইত্যাদি সূচিতে।

ফ্রান্সের উপকূল অঞ্চলে ৯০ দিনের মধ্যে ২৫ হাজার আসনের স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে গেল। মিলিটারিদের ব্যাপার তো! যুদ্ধের সময়ে অতি তৎপরতায় যা করে– রাস্তা, সেতু। ঠিক সেইভাবে স্টেডিয়ামও। তখনকার নিরিখে যথেষ্ট উন্নত মানের। উদ্বোধনী 'প্যারেড'-এ (মার্চপাস্ট) হেজাজ (এখন সৌদি আরব) থেকে আরব দল চারটি উট নিয়ে অংশ নেয়। বিশ্বযুদ্ধে বেশি মারা যান আমেরিকার সৈন্যরা। কিন্তু ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এঁরা পিছিয়ে থাকেননি। দেশ থেকে জাহাজে করে ৪০ জন দক্ষ সেনা খেলোয়াড়কে পাঠানো হয়। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

বলা হলো, এটি হচ্ছে 'মিনি অলিম্পিক্স', ১৯১৬-র বদলে। এতে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, যদিও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বহু মহিলা সেনা ছিলেন। তাঁদের অনেকেই ফুটবলে দক্ষ। কিন্তু মাত্র এক জন মহিলা খেলোয়াড়কে এই 'সেনা অলিম্পিক্স'-এ দেখা গিয়েছিল। বিধি ভেঙেই খেলেন। টেনিসে তখন ফ্রান্সের সুপারস্টার সুজানে রাচেল ফ্লোরে দাপাচ্ছেন। পুরুষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলেন এবং চ্যাম্পিয়নও হন। দেশের মাটিতেই খেলা, সেই সুবাদে সুবিধা পান উনি।

অতিমারীর থাবা বেশ কম থাকায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় ও দর্শকের জন্য ৩৯ হাজার লিটার আইসক্রিম ও দু' লক্ষ গ্যালন লেমনেডের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশ্ব জুড়ে অতিমারীর মধ্যে এই 'সেনা ক্রীড়া' ব্যাপক সাফল্য লাভ করে।

১৯১৬-য় অলিম্পিক্স হয়নি। পরের অলিম্পিক্স হল ১৯২০-তে, বেলজিয়ামের এন্টওয়ার্পে। যুদ্ধ শেষে মাত্র কুড়ি মাস সময় পেয়েছিল এন্টওয়ার্পে গেমস-এর প্রস্তুতিতে। এদিকে অতিমারীতে বেলজিয়ামে সংক্রমণ ও মৃত্যু একটু কম, ৩৮ হাজার। কম হওয়ায় তবুও পিয়েরে দ্য কুবারতোঁর তৎপরতায় যে গেমস হয়, তাতে দেখা যায়, ১৯১৯'র 'মিনি অলিম্পিক্স'-এর অনেক সেনাকর্মীও অংশ নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক জন পদকও জেতেন। যুদ্ধ, অতিমারী তাঁদের মানসিকতায় বৈকল্য আনেনি। খেলাই ওঁদের চনমনে রেখেছিল। ফরাসি টেনিস দলে ছিলেন সেই সুজানে রাচেল। মেয়েদের সিঙ্গলসে সোনা জেতেন। প্লেগ, অতিমারী, যুদ্ধ তাঁকে কাবু করতে পারেনি। তিনি যেন ছিলেন, 'ভয় করব না'। ফ্লুতে প্রায় আট লক্ষ আমেরিকানের মৃত্যু হয়। কিন্তু অলিম্পিক্সে সেরা। পদক ৪১-২৭-২৮।

খেলা ওদের কাছে রিক্রিয়েশন, বিনোদন, এন্টারটেইনমেন্ট। এই মানসিকতা ভারতীয়দের অধিকাংশর মধ্যে আজও গড়ে ওঠেনি। তবে ১৯২০-তে ২৮ দেশের মধ্যে ভারতীয় দলও ছিল। অতিমারীতে মৃত্যু, ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও ওটাই ভারতের প্রথম অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ। ১৯২০-র টেনিস তারকা সুজানে রাচেলকে ২০২০ তো মনে করালো, 'কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে

খেলাই পরিবর্তন ঘটাতে পারে'।

করোনার মধ্যেই প্রত্যাবর্তন

দুঃসময়কে জয় করে এই এপ্রিলেই ইউরোপে ফিরল খেলাধূলা। বেলারুশে মৃত ৩৩। এপ্রিলের ১৫ তারিখে আবার বল গড়ালো প্রিমিয়ার লিগে, যখন মাঠ দর্শকহীন। নিকারাগুয়ায় করোনায় মৃত ৯ জন। তবে প্রিমিয়র ডিভিসন লিগে তার আতঙ্ক প্রবেশ করেনি। কিন্তু খেলোয়াড়রা নিয়ম মেনেছেন। করমর্দন নয়। গোলের পর উচ্ছ্বাসে জড়াজড়ি নয়। তাইওয়ানে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করোনাতে মৃত্যু মাত্র ৬ জনের। তাই সরকার ফুটবলের অনুমতি দেয়। স্টেডিয়ামে দু'টি টিম, রেফারি ও দর্শক মিলে মোট ২০০ জন।

টিভি ও ডিজিটাল মাধ্যমে খেলা দেখানোয় ফুটবলপ্রেমীরা খুশি। মিডিয়া বিজ্ঞাপন পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতি হয়নি। ফুটবল ফেডারেশন যেমন, তেমনই টিমগুলিও আয়ের অংশ পেয়েছে। আসল কথা মানসিকতা, সুপরিকল্পনা। দীর্ঘক্ষণ হয়তো করোনা থাকবেই কমবেশি। তা বলে কী সব থমকে যাবে! আতঙ্কে থাকলে তা বেড়ে যাবে! প্লেয়ারদের শরীর জবুথবু হবে। সদাচঞ্চল জীবনস্রোত থেমে গেলে বসুন্ধরা তো আরও বিপন্ন হবে।

করোনায় খেলাধূলা বন্ধ হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে এক সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বললাম। সমাজবিজ্ঞানী ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বললেন, ''আপনি খেলার মাঠের লোক। ওদের বলুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলায় ফিরুক। ওরাই পারে সমাজকে চাঙ্গা রাখতে। দর্শকরা মাঠে না-ই বা গেলেন।''

এখন বাড়ির মেয়েরা হেঁসেল সামলাতে সামলাতে ক্রিকেট, ফুটবল বা অন্য বড় খেলা হলে ছুটে আসেন টিভি'র দিকে। 'মন ভালো নেই' কাটাতে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, লকডাউনের আগে ভারতে মনোরোগী ছিল ৮ শতাংশ। লকডাউনের প্রথম ছয় মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ শতাংশে। একাকিত্ব, কিছু না পাওয়া ইত্যাদি থেকে চটজলদি মুক্তি দিতে পারে ক্রীড়াঙ্গন। সরকারি নিয়মের কঠোরতায় নিরোগ থাকা যায় না। মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। মুক্ত বাতাস চাই। সব দরজা-জানালা খুলে দিন। তা না হলে গ্যাস চেম্বার দেখবেন।

মনে করুন ফুটবল খেলছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। ভারত খেলছে ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট। দেশে চলছে অলিম্পিক গেমসের মতো কিছু। তবে করোনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মেনে চলুন স্বাস্থ্যবিধি। উন্নত দেশগুলির স্বাস্থ্য সচেতনতা ভারতেও লাগু হোক, এমন কথা বলার মতো এক জনও নেই এই বিশাল দেশে।

ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরতে হবে!

মানসিকতার বদল না হলে খেলোয়াড়দেরও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে। পঞ্চাশেও ম্যানমেড মন্বন্তরে মানুষ 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' বলে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরত। তেমন পরিস্থিতি ফের হতে পারে। করোনার আতঙ্কে আইপিএল চলে গেল ইউনাইটেড আরব এমিরেটস-এ। দেশটা তো ভিয়েতনামের মতো করোনাহীন নয়। তবুও ওদেরকেই দায়িত্ব। সে অন্য আলোচনা।

কিন্তু আইপিএল'র নেটবোলার বসিরহাটের বিবিপুরের জিন্না মণ্ডল মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করছে। এখন আইপিএল তারকাদের সঙ্গে লাঞ্চ করাটা যেন তার কাছে দূর অতীত। দু' বেলা খাবারের জন্য চলছে কঠিন লড়াই, যা কখনও কল্পনাতেই ছিল না জিন্নার।

ভলিবলের ঋত্বিকা সাঁতরার কথা বলি। ঋত্বিকা গত দুই বছরে জাতীয় পর্যায়ে তিনটি পদক পেয়েছে। ব্যান্ডেলের নারায়ণপুরের কুড়ি বছরের মেয়েটি শুরুতে সবজি বিক্রি করত বাবার সঙ্গে। এখন বাজারের কাছে কোভিড হাসপাতাল হওয়ায় তাও বন্ধ। ফুটপাতে দোকান করা চলবে না সঙ্গত কারণেই। লিগ চললে সালকিয়া এসি টাকা দিত। করোনার জন্য এখন লিগ বন্ধ। টাকা দেয় না। সবজি বিক্রিও বন্ধ। কী খাবে সে। তার পরিবার? সব স্বাভাবিক, মানে খেলা শুরু হলে তার উপযোগী হতে হবে। ফিটনেস, স্কিল ইত্যাদিতে দ্রুত ফেরা তো সহজ নয়। কত দিন যে লাগবে! তবুও হাল ছাড়তে রাজি নয় ঋত্বিকা।

এমন কত জিন্না, কত ঋত্বিকা যে আছে বাংলা ও ভারত জুড়ে, কে তার হিসাব রাখে! আমাদের দেশের ক্রীড়াজগৎ তো ৭৩ বছর আগের মতোই ঢিলেঢালা। প্রশাসনে অপদার্থদের ভিড়, যাদের মানসিকতা আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। 'আমাদের খেলা হবে আমাদের মাঠেই। ওরা খেলবে নিজেদের মাঠেই। দেশের মানুষকে অক্সিজেন দিতে হবেই'।

ফুটবল শুরু ২১৭ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটেনের ডার্বিশায়ার ও চেস্টারের মধ্যে। প্রথম ফুটবল ম্যাচটি চলেছিল টানা কয়েক দিন। দুই দলে ছিলেন কয়েকশো খেলোয়াড়। ফুটবল নিয়ে কত ঘটনা! মারপিট, দাঙ্গা, মৃত্যু ইত্যাদিতে ভারতও পিছিয়ে নেই। আর দর্শকহীন মাঠেও খেলা হয়েছে নানা দেশে। কিন্তু কখনও দু' মাস খেলা বন্ধ! এমন ঘটনা এই প্রথম করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে। তাই চিকিৎসকদের নানা বিধিনিষেধ। ফলে ট্যাকল নিষিদ্ধ। গোলের আনন্দে সতীর্থকে জড়িয়ে ধরা যাবে না। খেলার আগে দুই অধিনায়কের করমর্দন নয়। ক্রিকেটে বলে পালিশ তুলতে থুতু, নৈব নৈব চ।

আগেই বলেছি, উন্নত দেশগুলির মানসিকতাই আলাদা। করোনা বিরতির পর ইউরোপের প্রথম বড় লিগ শুরু হলো, বুন্দেশলিগা। ডর্টমুন্ডের ফাঁকা স্টেডিয়ামে। ফুটবল লিখিয়েদের বইয়ে থাকবে ৬৬ দিন পর প্রথম গোল করলেন ডর্টমুন্ডের এর্লিং হ্যালান্ড, ২৯ মিনিটে। ডর্টমুন্ড ৪-০ গোলে হারায় শালকেকে।

ম্যাচ শুরুর আগে বল স্যানিটাইজ করা হলো। রিজার্ভ বেঞ্চে দূরত্ব বজায় রাখা হলো। কোচরা মাস্ক পরে কথা বলছেন। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতেই ফুটবলারকে মাস্ক ধরিয়ে দিচ্ছেন দলের স্বাস্থ্যকর্মীরা। নতুন ইতিহাস রচিত হবে। গল্প উপন্যাসেও থাকবে এই সব।

৮১,৩৬৫ সিটের ইদুলা পার্কের যে গ্যালারি সব সময় কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, করোনা আতঙ্কে সব মিলিয়ে মাত্র ২০০ জন। গোলের পর অতীতের বুকে জড়িয়ে ধরার বদলে কনুইয়ে-কনুইয়ে টাচ করে সেলিব্রেশন। দর্শকদের উল্লাস টিভির সামনে মুঠোফোনের মুখবইয়ে।

মাঠ ছাড়াই রেকর্ড দর্শক!

দর্শকহীন গ্যালারি। কিন্তু জার্মান ওয়েবসাইট 'ডিডব্লিউডিএল' জানালো, গড়ে ৩.৬৮ মিলিয়ন (৩৬ লক্ষ ৮০ হাজার) মানুষ খেলা দেখেছেন। এটি রেকর্ড। তাহলে আর দর্শকরা ঘাম ঝরিয়ে, লাইন লাগিয়ে মাঠে ঢুকবেন কেন? টিকিট ছাপাতে হবে না। কাজ কমে গেল। করোনা 'এই করেছে ভালো'। তবে এসব ভার্চুয়াল আনন্দ। কিন্তু বুন্দেশলিগার দ্বিতীয় দিনে বায়ার্ন মিউনিখ গোল করতেই জড়িয়ে ধরায় বিধিভঙ্গ। মাঠে থুতু ফেললে হলুদ কার্ড দেখবেন সেই খেলোয়াড়। মে'র শুরুতে ফিফা'র এই নির্দেশে অবাক সবাই। ৯০ মিনিটে তা কী করে সম্ভব! অতএব থুতু গিলতে হবে। তা কি স্বাস্থ্যকর! ফিফা তার আইন পরে নিশ্চয়ই বদল করবে। হবে নতুন সংস্করণ।

যুদ্ধ, অতিমারী ধ্বংস করে নিশ্চয়ই। মার্কিনি বোমায় হিরোশিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলার মর্মান্তিক ঘটনা অজানা নয়। উনিশ বছরের মধ্যে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ১৯৬৪ সালে টোকিওতে আয়োজন করল 'সর্বোত্তম' অলিম্পিক গেমসের। কী অসাধারণ মানসিকতা।

খেলা শুধু নয়। এই রচনার সীমানা ছাড়িয়ে একটু বাইরে যাই। রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'। আরও আগে ১৮৯৮'র এপ্রিল-মে মাসে কলকাতায় হানা দিয়েছে মারণ ব্যাধি প্লেগ। কবি লিখলেন: 'মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে'। 'দুঃসময়' ওর এক বছর আগে। 'কালের যাত্রা'। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্লেগের ভয়ে রেঙ্গুন যাননি। চাকরির কারণেই জাহাজ যাত্রা। বোঝেন কোয়ারান্টিন কী! ওর থেকেই সৃষ্টি হলো 'অভয়া ও শ্রীকান্ত'। আলবেয়ার কামু ১৯৪৭-এ লেখেন 'দ্য প্লেগ'। জিনাকোলাতা-র 'ফ্লু'। সেই মহাসঙ্গীত 'দ্য প্লেগ ডেঞ্জার' আজও শুনি। ওর ভিডিও দেখলে কোভিড-১৯'র চিত্র ধরা পড়বে।

রাজা রামমোহন রায়ের গান 'মনে কর শেষের সেই দিন ভয়ঙ্কর/ অন্য বাক্য কবে তুমি, কিন্তু তুমি নিরুত্তর'।

এবার কোভিড-১৯ এইভাবে ছড়াতে থাকলে 'কাব্য কইবার মতো বেশ কিছু বক্তাও হয়তো' বিপন্ন বসুন্ধরা থেকে অদৃশ্য হতে পারেন। মাঠে দেখব না হয়তো বহু খেলোয়াড়কে। কিছু সাংবাদিকেরও ইতিমধ্যে ইন্তেকাল হয়েছে। অনেকটা পিছিয়ে মহাকবি শেক্সপিয়ারের কালে গেলে দেখা যাবে, ১৬০৪ সালে লন্ডন শহরে প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তিরিশ হাজারের বেশি। প্লেগের কারণে রঙ্গালয় বন্ধ। রাজা হয়েও জেমসের অভিষেক স্থগিত।

এক বছর অতিমারীর বিরতি। খুলে গেল রঙ্গালয়। ফের ১৯০৬-এ মৃত্যু মিছিল। কারণ ওই প্লেগ। ফের রঙ্গালয় বন্ধ। শেক্সপিয়ার তখন বেশ নাম করেছেন। তাঁকে তো নাটক লিখতে তাড়না দিচ্ছে সাহসী মন। নাটক লিখতেই হবে। তাই প্লেগের থাবা কম, এমন অঞ্চলে চলে যান। ছোট্ট ঘরে নিভৃত নিবাস। লিখলেন 'ম্যাকবেথ', 'কিং লিয়র', 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা'। শেক্সপিয়ারের গবেষকরা আজও প্রশ্ন করে চলেছেন, মহামারী কী তাঁর কাছে আশীর্বাদ ছিল? মেলেনি উত্তর।

কিছুটা আশার বাণী দিলেন অলিম্পিকে আমাদের একমাত্র ব্যক্তিগত সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রা। শুটার বিন্দ্রা চিন্তিতও, সেফটি প্রোটোকল বৃদ্ধিতে খেলার প্রতি আকর্ষণ কমতে পারে। কিন্তু ভারতের ইতিবাচক দিক হলো, পরিকাঠামো উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। শুটিং হয়তো নতুন রূপ নেবে।

ইতিমধ্যেই সর্দার সিং বলেছেন, কোভিড-১৯ শেষে হকি খেলাটি একেবারে নতুন পরিকল্পনায় গড়ে উঠবে। কোনেরু হাম্পির

ধারণা, ভারতে আউটডোর গেমস স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। কিন্তু দাবার মতো ইন্ডোর গেমসগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব থাকবে না। জোৎসনা চিনেপ্পার ভয়, স্কোয়াশ খেলতে ঘন ঘন বিদেশ যাত্রা হ্রাস পাবে। বিমানযাত্রার নানা কড়া নিয়ম তো এখনই।

শচীন তেন্ডুলকর আতঙ্কিত

২৫ মার্চ ভারতে লকডাউন শুরু হতেই খেলার মাঠে আঁধার নেমে আসে। খেলোয়াড়রা রোজগারহীন। তাঁদের জীবনজীবিকার হাল কী হতে পারে ভেবে এই মুহূর্তে সকলেই চিন্তিত। খেলোয়াড়রা ছাড়াও লক্ষাধিক মানুষ এই 'ইন্ডাস্ট্রি'র সঙ্গে জড়িয়ে।

এর ক্ষতি দ্রুত পূরণ হওয়ার নয়। খেলোয়াড়দের মানসিকতা তলানিতে। খুব ক্ষতিগ্রস্ত ক্রীড়া শিক্ষাকেন্দ্র, আকাদেমিগুলি। তাদের তহবিল শূন্য। মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে খেলাধূলারও যেন দুঃসময়। মানুষকে নির্মল আনন্দ প্রদানের মাধ্যমটিকে এমন করুণ দশার মধ্যে পড়তে হয়নি গত একশো বছরে।

খেলায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব অসরকারি সংস্থার দরাজ সাহায্য মিলত, তারাই এখন দেউলিয়া। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান লকডাউনের তিন-চার মাসের মধ্যেই যেন ভেন্টিলেশনে। মাঠে, পুলে, রেঞ্জে খেলা নেই। পুলের মধ্যে ফিটনেস ব্যায়াম বা বাড়ি বসে ভার্চুয়াল এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস। খেলা কি ভার্চুয়াল হতে পারে? সম্ভব? এর দ্বারা খেলোয়াড়দের শরীর যেমন তরতাজা থাকতে পারে না, মানসিকভাবে তাঁদের চাঙ্গা করাও যায় না।

যখন গণশক্তির শারদ সংখ্যার জন্য এই নিবন্ধ লিখছি, তখন ক্রীড়ায় উন্নত দেশগুলিতে খুঁজে পেলাম না সরকারি বা অসরকারি ক্ষেত্রে তেমন কোনও সুপরিকল্পনা– যা খেলোয়াড়দের দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে পারে।

আশার আলো

না, সব শেষ হয়ে যায়নি। হঠাৎ আলোর ঝলকানি মিলেছে ছোট্ট দ্বীপদেশ নিউজিল্যান্ডে, যার জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের সামান্য বেশি। ২০২০-তে ওদের স্পোর্টস বাজেট ঘোষণায় বরাদ্দ ছিল ২৬৪.৬ মিলিয়ন বা ২৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ডলার। করোনার আবির্ভাবের পরেই স্বল্পকালীন অর্থ সাহায্য ঘোষণা করা হয় ৮২.৬ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ২৬ লক্ষ ডলার। এ ছিল আপতকালীন বরাদ্দ। করোনা হ্রাস পেলে ক্রীড়াঙ্গন স্বাভাবিক করতে মিডিয়াম টার্ম বরাদ্দ ১০৪ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। ভবিষ্যতের জন্য ২০২০-তেই অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে আরও ৭৮ মিলিয়ন বা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। অবশ্যই আলোর ঝলকানি, কিন্তু সূর্য মধ্য গগনে দেখা যাবে কি!

ক্রীড়ামন্ত্রী গ্রান্ট রবার্টসন অভয় দিয়ে বলেছেন, ''লকডাউনের আগের অবস্থায় ফিরে এস তোমরা। সরকার তোমাদের পাশেই। চাই, রেফারির বাঁশির আওয়াজ দর্শকদের উল্লাসের উচ্ছ্বাসে চাপা পড়ুক। এমন দিন ফিরিয়ে আনবে তোমরা।''

আমাদের দেশে কে দেবেন এমন আশ্বাস? এই ১৩৩ কোটি জনসংখ্যার দেশকে পথ দেখাবেন কে? দূষণ যাদের ভূষণ, দারিদ্র ও বঞ্চনা যাদের নিত্যসঙ্গী– সেই তাদের? এখন তো দোহাই করোনা ভাইরাসের। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে 'গো-ও-ল' ধ্বনি বেলেঘাটায় আর ভেসে আসবে কি! হয়তো আসবে, নব নব রূপে।

কৃতজ্ঞতা: ব্রিটিশ মিউজিয়াম। দ্য কমপ্লিট বুক অব অলিম্পিক্স। এন সাইক্লোপিডিয়া অব দ্য মডার্ন অলিম্পিক্স মুভমেন্ট। ফ্রম অ্যাথেন্স টু মস্কো। এনসাইক্লোপিডিয়া অব

খেলা

দেশেরও প্রতিনিধিত্ব করছি এটাই বড় কথা

বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব রেঞ্জার্স এফসি'র ওয়েবসাইটে তাদের 'মহিলা দল' বিভাগটি খুললে জার্সি নম্বর সহ ফুটবলারদের নাম লেখা রয়েছে। আক্রমণভাগের ফুটবলারদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে 'দেবী ১০'।

বালা দেবী। ভারতীয় ফুটবলে অতি পরিচিত নাম। জাতীয় দলের স্ট্রাইকার। মণিপুরের ছোট্ট একটা গ্রাম থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার বর্তমানে খেলেন স্কটিশ লিগের রেঞ্জার্স এফসি'তে। এশিয়া এবং ভারতের প্রথম মহিলা ফুটবলার হিসাবে ইউরোপের ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। ভারতীয় ফুটবলে সাফল্যের তালিকা দীর্ঘ। জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সে। তাঁর দক্ষতা এখান থেকেই বেশ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। ছোট্ট গ্রাম থেকে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন ইউরোপীয় ফুটবলের মঞ্চে। রেঞ্জার্স এফসি'র মহিলা ফুটবল দল যেভাবে প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে, হয়তো খুব দ্রুত মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও খেলতে দেখা যেতে পারে তাঁকে। বালা দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে **দীপঙ্কর ঘোষাল**।

শারদোৎসবের প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করি। দুর্গাপুজোয় কখনও কলকাতায় সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল ?

বালা: ম্যাচ এবং অনুশীলনের জন্য বহুবার কলকাতায় গিয়েছি। আবার দুর্গাপুজোর সুন্দর মুহূর্তও কলকাতায় দীর্ঘ সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে। শুধু কলকাতা কিংবা ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের অন্যতম বড় উৎসব এটি। বন্ধু বা সতীর্থদের সঙ্গে প্যান্ডেলে ঘুরেছি। মন থেকেই বলছি, প্যান্ডেলগুলি খুবই সুন্দর করে সাজানো হয়। আর কলকাতার মিষ্টি, আমার খুবই প্রিয়।

করোনা অতিমারীতে সকলের দৈনন্দিন জীবন এলোমেলো। পেশাদার ফুটবলার হিসাবে এই দীর্ঘ বিরতি আপনাকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

বালা : দীর্ঘদিন প্রস্তুতি বন্ধ ছিল। এমনকি স্কটিশ প্রিমিয়ার লিগের ২০২০ মরশুমও বাতিল হয়ে যায়। তবে এখন পরিস্থিতি তুলানমূলক স্বস্তির। পুরোদমে অনুশীলন চলছে। অক্টোবরে নতুন মরশুম শুরু হবে। সেটারই অপেক্ষা।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মেয়েরা ব্যতিক্রমী কিছু করতে চাইলে, সমাজে চারিদিক থেকে নানা বাধা আসে। এমনকি পরিবারের থেকেও। আপনার ক্ষেত্রে পরিবার এবং চারপাশের মানুষজনকে বোঝানো কতটা কঠিন ছিল যে, পেশাদার ফুটবলার হতে চান এবং এটাকেই কেরিয়ার বানাতে চান?

বালা : ইম্ফলের ছোট্ট একটা গ্রামে আমার বেড়ে ওঠা। ছোট থেকেই ফুটবল খেলতাম। উত্তর-পূর্ব ভারতের পিছিয়ে থাকা একটা গ্রাম। কাছাকাছি কোনও শহরে যেতে প্রায় দু'দিন সময় লাগে। আমার বাবা ফুটবল খেলতেন। সুতরাং, পরিবারের দিক থেকে তেমন সমস্যা হয়নি। ছোট থেকেই বাবার মনে হয়েছিল ফুটবলটা আমি ভালো খেলি। পরিবার আমার পাশেই থেকেছে। প্রথমে গ্রামের দলে খেলা শুরু করি। মেয়েদের আলাদা কোনও দল ছিল না, ছেলেদের সঙ্গেই খেলতাম। নজর থাকত, ওদের চেয়ে কোনও অংশে পিছিয়ে না পড়ি। খেলাটা উপভোগ করতাম এবং মনে হয়েছিল, এটাই আমার জন্য সঠিক পথ। আমি যখন খেলা শুরু করি, সেসময় পরিকাঠামো এতটাও ভালো ছিল না। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। হয়তো সে কারণেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে জাতীয় দলে সুযোগ পাই।

রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে বয়সভিত্তিক দল, সিনিয়র জাতীয় দলে সাফল্য পেয়েছেন। তবে খেলার ধরন, আবহাওয়া এবং পরিবেশের দিক থেকে স্কটল্যান্ড পুরোপুরি অপরিচিত মঞ্চ। মানিয়ে নেওয়া কতটা কঠিন ?

বালা : স্কটল্যান্ডে খুবই ঠান্ডা, প্রায় সারাবছরই এমন থাকে। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। তবে ভারতীয় খাবার খুব মিস করছি। খেলার ধরন প্রসঙ্গে বলি, ভারতীয় ফুটবলের থেকে পুরোপুরি আলাদা। বলের মুভমেন্ট, পাসের গতি এবং শারীরিক দিক থেকেও এখানকার ফুটবলের স্তর অনেকটাই উঁচু। পুরোটা পেরেছি বলা ঠিক হবে না, তবে ক্রমশ মানিয়ে নিচ্ছি।

ভারতবর্ষ থেকে বিদেশের ফুটবল ক্লাবে, বিশেষত ইউরোপের ক্লাবে খেলা খানিকটা 'মিশন ইমপসিবল'র মতোই। অভাবনীয় এই সাফল্য জীবনে কেমন পরিবর্তন এনেছে?

বালা : প্রথম ভারতীয় পেশাদার মহিলা ফুটবলার হতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আমার বরাবরের স্বপ্ন ছিল, সর্বক্ষণ অনুশীলনের সুযোগ পাব এবং ফুটবলকেই প্রধান পেশা হিসাবে নিয়ে এগিয়ে যাব। ভারতে লিগের

সময় তুলনামূলক অনেকটাই ছোট। সে কারণে, সারাবছর অনুশীলনের সুযোগও ছিল না। এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবলার হিসাবে এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার সময় এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। স্কটিশ লিগ সম্পর্কে ধীরে ধীরে জানতে পেরেছি, অনেকটাই বুঝতে পারছি। ক্রমশ এখানকার ফুটবলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে।

হয়তো তুলনায় যাওয়াটা ঠিক নয়। স্কটল্যান্ডে মহিলা ফুটবলের সঙ্গে ভারতের কতটা পার্থক্য, ভারতে মহিলা ফুটবলের চিত্রটা কতদিনে বদলাতে পারে ?

বালা : মহিলা কিংবা পুরুষ বলে নয়, ফুটবল খেলাটাই এখানে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছে। খেলাধুলাকে ওরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সে কারণেই বিশ্ব ফুটবলে উজ্জ্বল উপস্থিতি স্কটল্যান্ডের। এখানকার ফুটবল পরিকাঠামো অনবদ্য। সঙ্গে দক্ষ কোচ, সাপোর্ট স্টাফেরা রয়েছেন। স্কটিশ লিগ দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সেরা ফুটবলাররা খেলেন। আমার মনে হয়, ফুটবল পরিকাঠামো এবং কোচ, সাপোর্ট স্টাফের দিক থেকে ভারতীয় ফুটবলও ক্রমশ উন্নতির দিকে এগচ্ছে। আগামী বছর ভারতে অনূর্ধ্ব ১৭ মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপ। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে এই টুর্নামেন্ট অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের এই টুর্নামেন্টে ভালো খেলে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। বিশ্বের দরবারে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের আদর্শ মঞ্চ ভারতের উঠতি মহিলা ফুটবলারদের কাছে।

নিঃসন্দেহে ফুটবল জীবনের শুরুর দিকে অনেকেই হয়তো আপনার প্রেরণা ছিল। এখন আপনিই অনেকের, বিশেষত মহিলা ফুটবলারদের জন্য অনুপ্রেরণা। বড় শহর হোক বা প্রত্যন্ত অঞ্চল, উঠতি ফুটবলারদের জন্য আপনার কী বার্তা থাকবে...

বালা : আমি যেটুকু ভালো জায়গায় পৌঁছেছি, বেমবেম দেবী আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। জাতীয় দলে তাঁকে সিনিয়র হিসাবে পেয়েছি। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে। বেমবেম দেবী সবসময় বলতেন, পরিশ্রম করতে এবং নিজের সেরাটুকু দেওয়ার চেষ্টা করে যেতে। রেঞ্জার্স এফসি-তে যোগ দেওয়া এবং খেলা, আমার কেরিয়ারের বড় পদক্ষেপ। এখানে ভালো পারফর্ম করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইউরোপের বড় ক্লাবে খেলার রাস্তা গড়ে দিতে চাই। আমাদের দেশে মেয়েরা যারা ফুটবলকে আঁকড়ে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের জন্য পুরো সময়ের লিগ প্রয়োজন, যাতে সারাবছর অনুশীলনের মধ্যে থাকে। আমাদের দেশের মহিলা ফুটবলাররা দক্ষ, ওদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে।

রেঞ্জার্স এফসি'র শুধু বর্ণময় ইতিহাস রয়েছে তাই নয়। মহিলা ফুটবলেও বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব। সেই ক্লাবে ১০ নম্বর জার্সি পড়ে খেলছেন। শুধু মাঠের সমর্থকরাই নয়, ভারতের বহু ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের প্রচুর প্রত্যাশা আপনাকে ঘিরে। পারফরম্যান্সের পাশাপাশি প্রত্যাশার চাপ কীভাবে সামলাবেন ?

বালা : স্কটিশ লিগে এশিয়ার এবং প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসাবে যোগদান নিঃসন্দেহে অনেক বড় ব্যাপার। পাশাপাশি প্রবল চাপেরও। ইউরোপের ক্লাবে আমি নিজের প্রতিভা কিংবা নিজেকেই শুধু তুলে ধরছি তা নয়, আমার দেশকেও প্রতিনিধিত্ব করছি। প্রচুর সংখ্যক উঠতি ফুটবলার আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কোনও মূল্যে তাদের আশাহত করতে চাই না। দেশের মাটিতে সমর্থকদের অনেক প্রত্যাশা আমাকে ঘিরে, আশাকরি সেগুলো পূরণ করতে পারব।

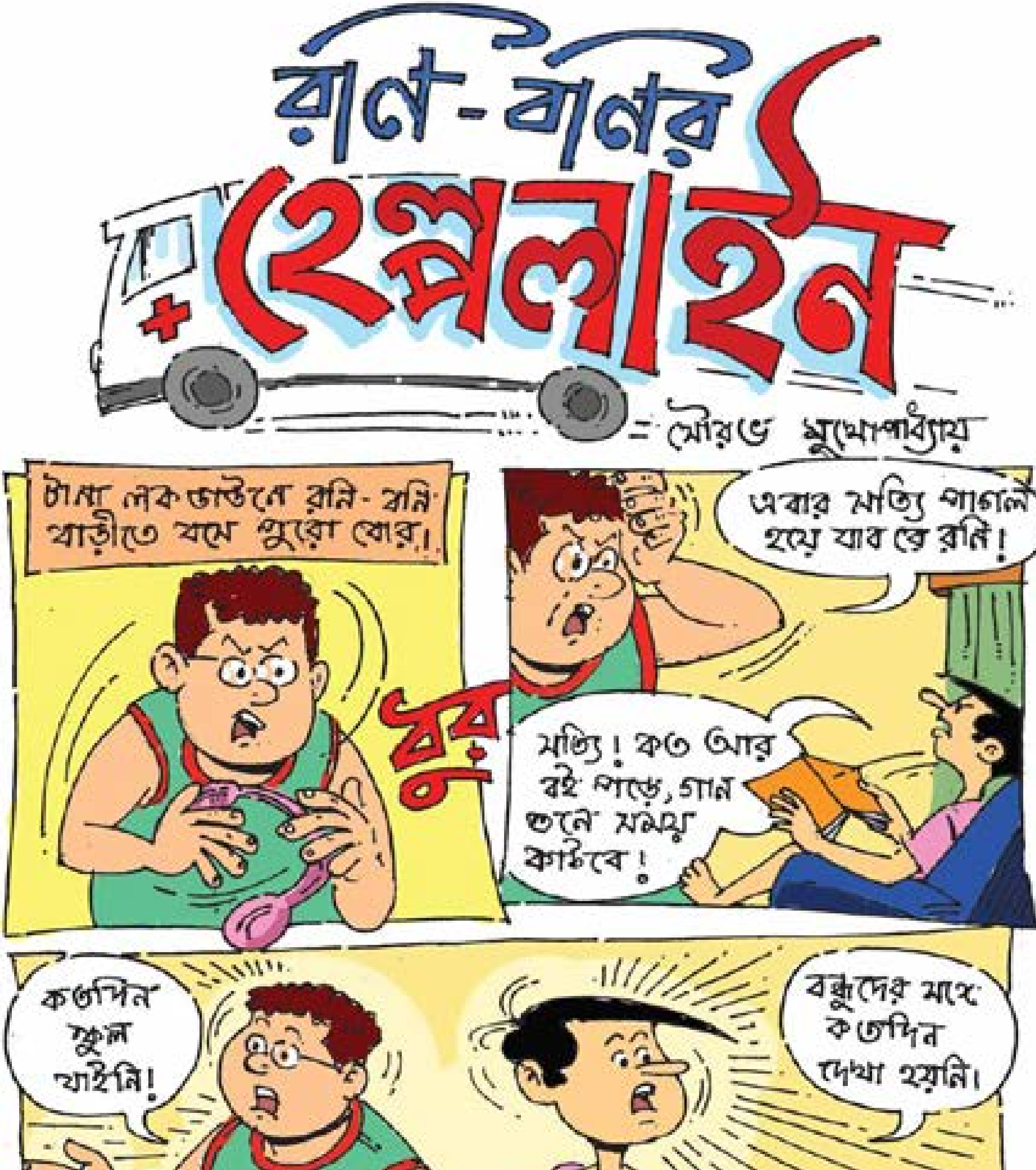
রনি-বনির
হেল্পলাইন
সৌরভ মুখোপাধ্যায়
টানা লকডাউনে রনি-বনি বাড়ীতে বসে পুরো বোর।
ধুর
এবার সত্যি পাগল হয়ে যাব রে রনি!
সত্যি! কত আর বই পড়ে, গান শুনে সময় কাটবে!
কতদিন স্কুল যাইনি!
বন্ধুদের সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি।

কিছু একটা করতেই হবে। যাতে সময়টা ভালোভাবে কাটে।
হ্যাঁ। হ্যাঁ। ইন্টারেস্টিং কিছু একটা।
একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। ব্যাপারটা জমে যেতে পারে বলি।
কি! কি আইডিয়া?
আজকাল ইউটিউবে অনেকে অনেকরকম জিনিস শেখাচ্ছে। ভিডিও আপলোড করে।
কি রকম ব্যাপারটা?
যে যেটা ভালো পারে সেটাই শেখাচ্ছে।
যেমন ধর, রান্নাবান্না।
বাগান করা।
অথবা ধর, যোগব্যায়াম।

আমরা তাহলে কি শেখাবো?
একটু অন্যরকম কিছু — কিন্তু সেটা কি হতে পারে!
ইয়েস! আমরা কিক্ বক্সিং শেখাবো! এটা ব্যাপক হিট্ হয়ে যাবে।
কিক্ বক্সিং! কিন্তু আমরা তো —
আরে, কোনো চাপ নেই—
আমি স্কুলের রজতস্যারের কাছে দু-বছর শিখেছিলাম। একেবারে ফাটাফাটি শেখাবো।
আর আমি?
আরে ভাই, তুইই তো আসল লোক। তোকে ছাড়া এটা হবেই না। চল্, লেটস্ স্টার্ট!
ইয়েস বস্।

একবার প্র্যাকটিস করে নিই। আমি পাঞ্চ করলে সময়মতো মুখটা সরিয়ে নিবি। দেখে মনে হয় যেন খুব লেগেছে। স্টার্ট।
বাঁ হাতটাকে এইভাবে গার্ড করে ডানহাতের সলিড একটা পাঞ্চ —
উফ্
আবার ঠিক উল্টো ভাবে বাঁ হাতের আরেকটা —
ওপস্ —
ওপস্
নাহ্! অন্য কিছু ভাবতে হবে। তোকে দিয়ে এটা হবে না।

কি ভাবছিস তাহলে?
আইডিয়া। ম্যাসাজ অ্যান্ড ফিটনেস শেখাবো। এখন মার্কেটে খুব চলছে।
সিম্পল ব্যাপার। তুই চেস্টে শুয়ে থাকবি। তোকে আমি ম্যাসাজ দেবো। এতে তোর আরামও হবে। তারপর কিছু ফিটনেস টিপস্।
বাঃ! এটা হেব্বি হবে।
এই যে আপনারা দেখছেন পিঠের কোণে ব্যাথার জন্য—
আর যদি ঘাড়ে ব্যাথা হয় তাহলে এইভাবে ঘাড়টাকে ধরে—

উঁফ্
একটা ছোট্ট চাপে এইভাবে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিলেই ব্যাথা গায়েব। মনে রাখবেন—
—ঘাড়ের ব্যাথা সারানোর এর থেকে ভালো ম্যাসাজ আর-আর-
আঁআআআ
তোর ইউটিউব ভিডিওর চক্করে আমার কি হাল হয়েছে! উফ-ফ!
পাড়ার সেলুনের শিবুদাকে দেখে ম্যাসাজটা শিখেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা
এমন সময় ওদের মোবাইলে একটা ফোন আসে। ওপরের ফ্ল্যাটের সেনদাদু।
হ্যাঁ বুনি। বাবাকে ফোনে পাচ্ছি না। ওঃ- ফোনটা রেখে বেরিয়েছে — খুব প্রবলেম হয়েছে- তোর দিদার প্রচণ্ড জ্বর- হয়াসপিটালে ভর্তি করতে বলেছে- অ্যাম্বুলেন্স আসছে না- কি করব এখন- তোর বাবাকে একটু—

হেবি প্রবলেম হয়ে গেল তো— মেনদাদুরা খুব হেল্পলেস্ ফিল্ করছে— দিদাকে এক্ষুনি হস্পিটালে না দিলে— এদিকে বাবারও আসতে দেরী আছে— কি করা যায়!
রনি, আমাদের ক্লাসের শুভঙ্করের বাবা তো ডাক্তার, ওনাকে যদি—
ঠিক বলেছিস। ওনার তো নিজের নার্সিংহোমও আছে, শুভঙ্করের কাছে শুনেছি।
তুই এক্ষুনি শুভঙ্করকে ফোন করে আঙ্কেলের নম্বরটা নিয়ে সরাসরি কথা বল। যাতে উনি এক্ষুনি ব্যবস্থা করেন।
হ্যাঁ-হ্যাঁ রনি। তোমাদের বিল্ডিংএ তো — ওকে ওকে — আধঘন্টায় মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যাবে— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এখানেই ভর্তি হয়ে যাবে।
আধঘন্টা বাদে।

ULANCE
AMBULANCE
আজ তোদের দুজনের জন্যই তোদের দিদাকে সময়মতো হসপিটালে ভর্তি করা গেল। না হলে কি যে হত!
চল্ আমরা দুজনে মিলে নেটে একটা হেল্পলাইন খুলি। এটাই বেস্ট আইডিয়া।
দুর্দান্ত হবে এটা। সেনদাদুর মতো হেল্পলেস এই লোকগুলোর সত্যিই সাহায্য দরকার।
নাম দেবো রুমি-বুমি হেল্পলাইন।
ফাটাফাটি! আর এটাতে আমার চোখ পাওয়ারও কোনো চান্স নেই।
সমাপ্ত

INSPIRING SUCCESS
CALCUTTA INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT
Prasanta Sur Campus
17 YEARS OF GLORY
AFFILIATED TO MAKAUT AND APPROVED BY AICTE
ACCREDITED BY NAAC
HEART OF THE CITY
TOLLYGUNGE
ADMISSION GOING ON
(INCLUDING LATERAL ENTRY)
NEAR NETAJI METRO
STATION, KUDGHAT
100% Ragging and
Addiction free
B.TECH
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (C.S.E)
INFORMATION TECHNOLOGY (I.T)
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (E.C.E)
ELECTRICAL ENGINEERING (E.E)
CIVIL ENGINEERING (C.E)
MANAGEMENT
B.B.A (H)
M.B.A
COMPUTER APPLICATION
B.C.A
WINNER
SMART INDIA
HACKATHON
2020
OUR RECRUITERS
Infosys
TATA
BYJU'S
IBM
Capgemini
Cognizant
genpact
FROSTEES
Mindtree
Actively participating industry academia connect program in association with BCC&I
FOR MORE DETAILS:
6289566429 / 6289571783
24/1A CHANDI GHOSH ROAD
KOLKATA-700040, WB, INDIA
WWW.CIEM.AC.IN

KSFE

CIN: U65923KL1969SGC002249

+91 94470 97907

pravasi@ksfe.com

KSFE Pravasi Chitty

An initiative by the Govt. of Kerala for KIIFB Projects

CHITS RANGING FROM

₹ 1 Lakh to ₹ 50 Lakhs

Monthly installments from ₹2500 to ₹1.25 Lakhs

Different durations from 25 to 60 Months.

Required Documents

- Soft copies of Passport,Visa, Photo, National/Labour ID for expats outside India.
- Expats inside India need soft copies of Aadhaar/Voter ID, Photo and Proof of Residence of residing state.

Value Additions

- Liability Waiver
- Free Pravasi Pension Premium

Kerala expats inside and outside India can join through our website or mobile app.

www.pravasi.ksfe.com

24/7

+91 471 6661888

+91 471 4449111

Complete Everything Online

Google play

Download on the App Store